পরিচয়



মাঘ, ১৩৫৯—৯০
22 শ—৩৯৭—
756·3
·017/8

*

সুশীল জানা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

বোরিস পলেভয়

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

যোগানন্দ দাস

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রভাতকুমার দত্ত

ও অন্যান্য

*

সম্পাদক

গোপাল হালদার : ননী ভৌমিক

দাম: দশ আনা

CUK-H0695-40-P3041

40

বারো আর সাড়ে ষোলো

কয়েকজন পাঠক অনুযোগ করেছেন, গত কয়েক সংখ্যায় পরিচয়-এর পাঠ্যবস্তুর পৃষ্ঠাসংখ্যা কমে গেছে।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমেছে এ-অনুযোগ সত্য; কিন্তু তার ফলে পাঠ্যবস্তুর পরিমাণ তো কমেই নি, বরং কিছুটা বেড়েছে। আমাদের কথায় বিশ্বাস করতে হলে ছাপাখানার দু-একটি খবর জানা দরকার।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ সংখ্যা থেকে পরিচয় লাইনোটাইপে কম্পোজ করা হচ্ছে; তার আগে হাতে কম্পোজ করা হত।

ছাপাখানার টাইপের প্রস্থ মাপবার একটি মাত্রা আছে—তার নাম 'পয়েণ্ট'। যখন হাতে কম্পোজ করা হত তখন ১০½ পয়েণ্টের টাইপ (স্মল পাইকা) ব্যবহার করা হত। হাতে-কম্পোজের ব্যবস্থায় টাইপের আয়ুক্ষয় ঠেকাবার জন্য প্রত্যেক লাইনের নিচে দুখানি সীসের পাত ('লেড') ব্যবহার করতে হয়, তাদের প্রস্থ ৬ পয়েণ্ট। অর্থাৎ প্রত্যেক হাতে-কম্পোজ লাইন সাড়ে ষোলো পয়েণ্ট স্থান অধিকার করে। ফলে, প্রত্যেক পাতায় তিরিশ লাইন ধরে।

এই দিক থেকে লাইনোটাইপে কম্পোজ করা অনেক লাভজনক, কারণ এতে প্রত্যেক লাইনের নিচে ৬ পয়েণ্ট সীসার পাত ('লেড') ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। আমরা এ-যাবত লাইনোটাইপের ১২ পয়েণ্ট ব্যবহার করে আসছি। ফলে প্রত্যেক লাইন আগেকার সাড়ে ষোলো পয়েণ্টের জায়গায় বারো পয়েণ্ট স্থান অধিকার করে

তার ফলে (১) প্রত্যেক লাইনে সাড়ে ৪ পয়েণ্ট বাঁচে, (২) প্রত্যেক পাতায় ৩০ লাইনের জায়গায় ৩৮ লাইন ধরে, এবং (৩) প্রতি ফর্মায় (১৬ পাতায়) ১২৮ লাইন অর্থাৎ আগেকার তুলনায় আরো ৪½ পাতা লেখা বেশি ধরে।

এত জটিল হিসাবের মধ্যে যদি না যেতে চান তবে এই এক কথায় হিসাবটুকু মনে রাখা যায়ঃ **আগে ষোলো পাতায় যা লেখা ধরত এখন পৌনে বারো পাতায় তা ধরে।**

এই হল লাইনোটাইপের ১২ পয়েণ্ট ব্যবহার করার লাভের হিসাব। ১২ পয়েণ্ট টাইপ আমরা ব্যবহার করি প্রায় ৫০ পাতায়। 'পুস্তক পরিচয়', 'সংস্কৃতি সংবাদ' ইত্যাদি বিভাগগুলিতে আমরা আরো ছোটো টাইপ (১০ পয়েণ্ট) ব্যবহার করি। তার ফলে ১২ পয়েণ্টের ৪ পাতার লেখা ১০ পয়েণ্টের ৩ পাতায় ধরে।

এর আগে 'পরিচয়'-এ পাঠ্যবস্তু থাকত মোটামুটি ৮৮ পাতা; উপরের হিসাব অনুসারে ৬২ পাতার মধ্যেই সেই পরিমাণ লেখা ধরে। আমরা তার জায়গায় ৭২ পাতার পাঠ্যবস্তু দিয়ে আসছি—**অর্থাৎ আগের চেয়ে ১০টি লাইনো পাতা বেশি দিচ্ছি।**

আশ্চর্য করি, পরিচয়-এর পৃষ্ঠাসংখ্যা কমলেও পাঠ্যবস্তু কমেনি —আমাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকেরা এখন একমত হবেন।

দ্বাবিংশ বর্ষ
২য় খণ্ড। ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৫৯।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

সুশীল জানা

কথাটা উঠেছিল 'বিন্দুর ছেলে'-প্রসঙ্গে।

একজন প্রবীণ কবি-সমালোচক এবং শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠও বটেন—একটু হালকা হেসে বলেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের কৌশল তো! ও হলো করুণকে অতি-করুণ আর ঘৃণ্যকে অতি-ঘৃণ্য করে তুলে ধরা।' —যেন তিনি স্মরণীয় এক কথাশিল্পীর মস্ত একটা চাতুরী ধরে ফেলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও ঘোষণা করলেন যে, তিনি একেবারে হালের তথাকথিত বাস্তববাদীদের মতো উপরোক্ত শরৎ-ধারার বিরোধী। তাঁর এ মন্তব্যে,—'বিন্দুর ছেলে'-প্রসঙ্গে সেখানে যাঁরা কান্নাকাটি করেছিলেন, তাঁদের মনের সুখের অবস্থাটা কতখানি বিকৃত হয়েছিল জানিনে, কতখানিই বা তাঁরা সেকেলে প্রতিপন্ন হয়ে লজ্জিত হয়েছিলেন তাও জানিনে, তবে এইটুকু বুঝেছিলুম যে হালের তথাকথিত বাস্তববাদীদের সঙ্গে শরৎ-ধারার একটা বিরোধ আছে—তা সত্যি মিথ্যে যাই হোক, এবং হালে শরৎচন্দ্রের 'চাতুরী' নামক বস্তুটা ধরা পড়ে গেছে। 'বিরোধ' কথাটা স্পষ্ট—তা পরে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু 'চাতুরীর' মতো অস্পষ্ট অস্বচ্ছ কথাটা বড় গুরুতর। ওই চাতুরীর মতো একটা মিথ্যার জন্যে বাঙলার বৃহত্তম পাঠক সংখ্যা আজও কি কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, ঘৃণায় বিক্ষুব্ধ হয়? সত্যিই কি তাই? এ কি শুধু একজন ওস্তাদ কথাশিল্পীর পাঠক-ভোলানো কৌশলমাত্র—না,তারও গভীরে কাহিনী ও কারুকর্মের অন্তরালে অতি বড় সত্য কোনো একটা প্রাণস্পন্দন আছে যা আজও পর্যন্ত বাঙলার পাঠক সাধারণকে গভীরভাবে বিচলিত করে?

বিচলিত যে করে—এ সম্পর্কে বেশি কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সেটা কি? সে কি তাঁর উপন্যাস বা কাহিনীর অঙ্গসৌষ্ঠব বা রূপ—না, উপন্যাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ? বলা বাহুল্য, সাহিত্যের অঙ্গের সৌষ্ঠব হল তার ভাষা, বলার ভঙ্গি ও কাহিনীর গাঁথুনি এবং চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্য বা গুণ হল তার বক্তব্য—অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের উপলব্ধি। আলোচনার ক্ষেত্রে রূপে ও গুণে মণ্ডিত এ সাহিত্যকে আলাদা আলাদা করে একটু দেখে নিতেই হয় এই জন্যে যে, এর আসল সেই ধার বা ভারটা কোথায়। নইলে এ আলোচনা এইখানেই এই বলে খতম করে দেওয়া যেতে পারে যে, দেহ ও প্রাণের এ জাতীয় ভাগ-বাঁটোয়ারার দ্বন্দ্বে দেহহীন প্রাণের যে তত্ত্ব তা অধ্যাত্ম-দর্শনের বিচার্য বিষয় এবং প্রাণহীন যে দেহের কথা তা, কোনো মড়া-কাটা টেবিলে ভয়ানক মূল্যবান হলেও সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণে তার স্থান কতটুকু? সাহিত্যের স্মরণীয় ঐতিহ্য বহন করে আনেন যে সব সাহিত্যগুরু তাঁদের উজ্জ্বল সৃষ্টি -চিহ্নগুলি থেকে এ কথাটা সাহিত্য-পাঠকমাত্রের কাছেই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আছে যে, সুষ্ঠু দেহ ও জীবন্ত প্রাণ নিয়েই একটি সৃষ্টি সাহিত্য-কীর্তি বলে গণ্য হয়, এবং তার বক্তব্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা অনুসারে হয়তো বা অবিস্মরণীয় হয় মহাকালের দরবারে। সেই সব সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে এক-একটি যুগ, সমসাময়িক সামাজিক মানুষের যুগ-মানস, কাল ও সভ্যতার তরঙ্গ। যে আধুনিক অর্থে উপন্যাসকে নবরূপের মহাকাব্য বলা হয়—বিশেষ কোনো স্থান কাল ও পাত্র যেখানে সুস্পষ্টভাবে তাদের চিহ্নিত করে রেখেছে, উপন্যাস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি হল সেই জাতের। এই প্রসঙ্গে 'চিরন্তন' বলে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়—যেটা সাহিত্যকীর্তি-গুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। ফলে প্রশ্ন উঠতে পারে এই বলে যে, নব-রূপের ওই মহাকাব্য যদি বিশেষ কোনো স্থান কাল পাত্রের মধ্যেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তবে তা আবার একই সঙ্গে 'চিরন্তন' হয় কেমন করে? শব্দ ও অর্থ বিবোধের এই গোলমালে আধুনিক কালের এক শ্রেণীর শিল্পী ও তাঁদের সমা-লোচকরা একান্ত বায়ুরোগগ্রস্তের মতো ওই 'চিরন্তন' কথাটাকে শেষ পর্যন্ত নর-নাবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ বা প্রেমের ঘাড়ে চাপিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু তথাকথিত সাহিত্য-কীর্তিগুলির চিরন্তনতার ধর্ম কেবল মাত্র ওই নর-নারীর প্রেম নয়, তা প্রেম বটে—কিন্তু অনেকখানি বৃহত্তর অর্থে, তা হল বিশেষ বিশেষ যুগের শ্রেয় বা কাম্য ব্যাপক ও গভীরমূল মানব-সম্পর্ক। সভ্যতার তরঙ্গে প্রত্যেকটি যুগ শ্রেষ্ঠ এই মানব-সম্পর্কের জন্যেই তার সর্বাঙ্গীণ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। 'চিরন্তন' হল এই শ্রেষ্ঠ মানব-সম্পর্কের আগ্রহ।

এখন কথাটা হল, শ্রেষ্ঠ এই মানব-সম্পর্কের পরম আগ্রহটি প্রকাশ পাবে কোন মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, সে মাধ্যম মানুষ—সে মাধ্যম 'চরিত্র'। এই 'চরিত্র' ফুটে ওঠে শিল্পদক্ষতায়ঃ A typical character in a typical situation এই 'চরিত্র'ই আধুনিক সমাজে 'টাইপ' বলে কথিত। এই 'টাইপ' কথাটায় মনে হয় আমাদের কিছু গোলমাল আছে—না থাকলেও, এইটে প্রায়ই দেখা যায় যে অত্যন্ত তুচ্ছ ক্ষুদ্র অর্থেও বর্তমানে ওই শব্দটিকে হামেশা ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই রকম ক্ষুদ্র সংকীর্ণ অর্থে লম্ফঝম্পের দ্বারা রামায়ণের পবনতনয় যেভাবে লক্ষণাক্রান্ত তাতে তিনিও 'টাইপ' বটেন কিন্তু তা হালের ওই ব্যবহারিক অর্থে। এবং বিভ্রান্ত সাহিত্যে 'শিব গড়তে বাঁদর'-এর ইতিহাস আকস্মিকও নয়, নতুনও নয়। হালের

সাহিত্যে 'অভিনব' নামধারী এই সব টাইপ নায়ক-উপনায়কের ভিড়ে আসল 'চরিত্রের' সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে। 'চরিত্র' সৃষ্টিতে উপরোক্ত অভিনবত্বের কোনো স্থান নেই, 'বিস্ময়কর' কিছু নেই—বিস্ময়ের যদি কিছু থাকে সে হল তার আবিষ্কার। সে 'চরিত্র' চিরকালের শ্রেষ্ঠ সেই মানব-সম্পর্কের মহান আবেগ নিয়ে বিশিষ্ট স্থান ও কালের সমাজ-সম্পর্ক থেকে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত অন্তরঙ্গ একজনের মতোই সামনে এসে দাঁড়ায়—তার মধ্যেই একটা বিশেষ স্থান ও কালের সমগ্র আশা, আবেগ ও কল্পনা বিধৃত হয়ে থাকে। এই হল 'নায়ক'—এই হল 'চরিত্র'। এই চরিত্রের আবিষ্কারকই হলেন Engineer of the Soul—মানবাত্মার কারুকর্মা, দ্বিতীয় বিধাতা।

আমাদের দেশে, একদিকে মনু মহারাজের সনাতনী দণ্ড আর একদিকে সাম্রাজ্যবাদের অনুশাসন—একদিকে সামন্তযুগের আদর্শ আর একদিকে পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা—দো-আঁসলা এই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে বলা বাহুল্য যে অতীতের সাহিত্যে এই 'চরিত্র' এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনের নাগালের বাইরে এক চূড়ান্ত আদর্শলোক থেকে—আদর্শবাদ রূপে। এদের দেখি বঙ্কিমের আনন্দমঠে, ভবানী পাঠকের পরিকল্পনায়, গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রের নিয়তিলাঞ্ছিত অনুশোচনায়, রবীন্দ্রনাথের 'গোরায়' এবং শেষ বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের ছোট ছোট মানুষ—বাঙালী মধ্যবিত্তের ছোট ছোট জীবনে, ছোট ছোট আদর্শে—চিরকালের সেই সামাজিক মানব মহাবন্ধনের মেলায়। তার পরে আর সেই 'চরিত্র' কই বাঙলা দেশের? কোথায় স্থান ও কালের সেই প্রতিনিধিরা যাদের মধ্যে একটি বিশেষ কালের আশা আনন্দ ও বেদনা, শ্রেয় মানব-সম্পর্কের জন্যে মহান সামাজিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে?

লিপি-কৌশল বা কাহিনী-কৌশলই শুধু নয়—এই 'চরিত্র' সৃষ্টিই বাঙালী মধ্যবিত্তের কাছে শরৎচন্দ্রকে আত্মার আত্মীয় করে তুলেছিল একদিন—আজও তার শেষ নেই। সে চরিত্রগুলির মধ্যে মহামানবত্ব নেই ঠিকই—কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারেব ছোট ছোট 'মানুষগুলি' আছে। বিরাট তারা কেউ নয় কিন্তু স্বরাট ; বাঙালী পরিবারের ছোট উঠোনে সঞ্চারমান আজন্ম সামন্তশাসন-নিপীড়িত মেয়ে বউ মা। নগর-সভ্যতার কেন্দ্রে মুষ্টিমেয় উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত তারকার আন্তর্জাতিক ভাববিলাস তাদের মধ্যে ছিল না বটে—তবে তাদের সৃষ্টির উপাদানে ছিল এই মহাপৃথিবীর অত্যন্ত এক কোণে বাঙলা নামক একটি দেশ, যেখানে ইংরেজ প্রভুরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে অতীত গ্রাম-জীবনকে ভেঙে চুরমার করে সৃষ্টি করেছিল নিতান্ত অবজ্ঞাত এই মধ্যবিত্তের। আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে—সেটি জীবনের আলোড়ন। সে আলোড়ন তখন এদেশের কয়েকজন ধনী মুখপাত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—তা তখন নেমে এসেছে ব্যাপকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে, এই শ্রেণীর মধ্যেই তখন সমাজ-শক্তি কেন্দ্রীভূত। এদের চরিত্রে ছিল সে সময়ের দ্বন্দ্ব ও বেদনা—দ্বন্দ্ব ছিল গ্রাম ও নগরের, অতীতের কিছু কিছু ভালোর সঙ্গে ভাবী কালের ভালোর; তার সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিল সেই ছোট ছোট মানুষগুলি—একটা ফয়সালা করতে চেয়েছিল, পারেনি। তাদের মানব-সম্পর্কের আনন্দমেলায় বেদনা তাই ঘন হয়ে ওঠে—'নিষ্কৃতি' যার চূড়ান্ত উদাহরণ, 'পল্লীসমাজ'—

যা আজও অসংখ্য পাঠক বার বার করে পড়ে। আন্তর্জাতিক ভাব-বিলাসের রাজ্যে শরৎচন্দ্র কোণঠাসা ঠিকই। কারণ বিরাট পৃথিবী, অসংখ্য তার রাষ্ট্র—বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চিন্তার টানা-পোড়েন,—কিন্তু তার মাঝখানে কোথায় রাখি আমরা 'পোড়া কাঠ'কে, কোথায় বা রাখি 'বামুনের মেয়ে'কে? কোথায় রাখি 'অন্নদা দিদি', 'অভয়া', 'কমললতা'কে—কোথায় রাখি 'জ্যাঠাইমা'কে? তাদের জন্যে এবং শরৎচন্দ্রের জন্যে বিরাট পৃথিবীর একটি কোণায় শুধু আছে এই বাঙলা দেশ—হোক সে সাহিত্য আঞ্চলিক, তবু সে যে স্বয়ং শরৎচন্দ্রের কাছে কতখানি ছিল তা জানা যায় শ্রীকান্ত-র (৩য় পর্ব) প্রথম পরিচ্ছেদে। সেকালের মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুগভীর আবেগ প্রকাশে এতটুকু ত্রুটি নাই কোথাও। সেই বেদনাঘন অতীতরন্ধ্র দিয়ে যেন এখনও শুনতে পাইঃ

> ...'দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ীর চাকা হইতে কতকটা ধুলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃপিতামহের সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে হাসি-কান্নায় ভরা ধূলা-বালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহুকোটি অকৃতজ্ঞ সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালোবাসি নাই—আর কোনদিন তোমার সেবায় তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কিনা জানি না, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।'

শরৎচন্দ্রের কথা বলতে গেলে তাঁর নারী-চরিত্রগুলিই ভিড় করে আসে মনে। আসে এই জন্যে যে পুরাতন গলিত সামন্ত-সমাজের প্রতি যে ঘৃণা আর বিক্ষোভ এবং মহৎ জীবনের প্রতি যা কিছু আবেগ, তা কোথাও যদি ভালো করে ফুটে উঠে থাকে—তা তাঁর এই নারী-চরিত্রেই হয়েছে। চিরকালের সর্বহারার প্রতিরূপেরা সেইখানেই কথা বলে উঠেছে তীব্র জ্বালায়। সামন্ত-সমাজের প্রবল শক্তি যে ধর্ম এবং সাধারণভাবে ধর্ম নামক বস্তুটার ধমক এবং ধর্মধ্বজীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ বোধ করি 'গৃহদাহ' উপন্যাসের উপসংহারেই স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে রোমান্টিক সাহিত্য আত্মার যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে লক্ষণাক্রান্ত, মানবতার ধর্মে অভিসিঞ্চিত এবং পুরাতন সমাজ-শৃঙ্খলের বন্ধন মোচনে উদ্‌গ্রীব—শরৎচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি নারী-চরিত্রগুলি সেই ধারারই। পিতৃশাসনের সমাজে বিরোধী শক্তি হিসেবে নারী-চরিত্র যেভাবে প্রাণ পেয়েছে পুরুষ-চরিত্রে তা হয়নি—একথা সত্য। পুরুষ-চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে একমাত্র সেইখানে—যার মধ্যে সামন্তযুগের শয়তান তার দন্তনখর লুকিয়ে রেখেছে। যেমন রমেশ বা মহিমের চেয়ে বেণী-জীবনানন্দ-গোলক চাটুজ্যেরা। নর-নারীর এই সব চরিত্র সমাবেশে বাঙলার একটি কালের কথা বিধৃত হয়ে আছে। আগেই বলেছি—অভয়া কমললতা বা সাবিত্রীদের জীবনে আন্তর্জাতিক মানবতার অতি বড় বড় তত্ত্ব বা তথ্য কিছুই নেই—যা আছে তা হল ছোট অবজ্ঞাত বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের প্রথম জীবন-কথা,—যার মধ্যে দিয়ে

সামন্তশাসনে নিপীড়িত বাঙালী মেয়ের মহৎ সমাজবন্ধনের জন্যে সুস্থ একটি আবেগ বার বার প্রকাশ পেয়েছে। পুরানো হলেও গৃহ ও গৃহধর্মের সুস্থ কথাটিকে, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের কল্যাণময় মানবীয় আবেগটিকে তিনি এমনি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবেই উপস্থিত করতে পেরেছিলেন যাতে সেকালের মধ্যবিত্ত সমাজের আশা ও স্বপ্ন প্রাণ লাভ করেছিল। বাঙালীর শান্ত গৃহ-পরিবেশের বোধকরি সেই হল শেষ চিত্র। তার পরে পরে বণিকযুগ তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে—সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ব্যক্তি ও ব্যক্তিসত্তা, বহু রকমের ফাটল ধরেছে আমাদের গৃহ ও গৃহধর্মে। চার্লস ডিকেন্সের Good old England-এর মতোই ডিকেন্স-শিষ্য শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিলোক আজ কেবল একটা দীর্ঘশ্বাসমাত্র। এবং সাহিত্যে বাঙালী মধ্যবিত্তেরও সেই বোধকরি সার্থক ভূমিকা অভিনয়।

এই ভূমিকা সম্পর্কেও একটা প্রশ্ন ওঠে—তা কতখানি বাস্তবপন্থী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শোনা যায় এ প্রশ্ন তুলেছিলেন 'ষোড়শী' সম্পর্কে। মেসের ঝি 'সাবিত্রী' সম্পর্কেও সাধারণভাবে এ প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে। ভাবাদর্শের পুরোধা কবি রবীন্দ্রনাথ যদি সামান্য মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবেশে অঙ্কিত ষোড়শী সম্পর্কে যথেষ্ট বাস্তব নয় অর্থাৎ ন্যক্কারজনক নয় এই অর্থে ও উক্তি করে থাকেন তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। আমরা বরং শরৎচন্দ্রকে এই জন্যে ধন্যবাদ দেব যে, তিনি 'স্থূল বাস্তবতার নামে, প্রকৃতিবাদের নামে ষোড়শীকে পঞ্চ ম-কার সাধনচক্রে না বসিয়ে অবাস্তব কিছুই করেননি। 'ষোড়শী'র জীবনের সূত্রপাতই হল ধর্মশাসন ও নারী-জীবনের প্রখর দ্বন্দ্ব থেকেই। অবাস্তব তিনি কিছুই করেননি সাবিত্রীর চরিত্রায়নেও। কলকাতার কুখ্যাত মেসের ঝিটির জীবন শুরু হয়েছে তার কলুষিত অতীত ও বহু আকাঙ্ক্ষিত পরিপূর্ণ এক প্রেমের জন্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত থেকে। এরই এক-পাশে সেই বিকৃত জীবনখণ্ডের একটা চিত্র আছে বটে—যেটা তার অবধারিত ভাগ্য হতে পারত; সাবিত্রীর অভিযান সেই অতীত থেকে তার পরিপূর্ণ প্রেম ও গৃহ-কামনার ভাবীকালে। চিরকালের কাঙ্ক্ষিত সুস্থ ও সুন্দর মানব-সম্পর্কের জন্যে যে আবেগ—শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল সেই দিকে, অবজ্ঞাত মধ্য-বিত্তের সংকীর্ণ সীমা থেকে তিনি এইখানে উঠে এসেছিলেন—এ ক্ষেত্রে তাঁকে আদর্শবাদীই বলতে হয়। এবং এ-ও সত্য যে, তাঁর বাস্তব দৃষ্টি বিরুদ্ধ-শক্তির প্রতি অন্ধ ছিল না। তবে হালের এক শ্রেণীর বাস্তববাদীদের মতো স্থূলভাবে ন্যক্কারজনক ক্লিন্নতায় নিমজ্জিত হয়ে যাননি এবং অভিনব বলে বার বার বাস্তববাদের দোহাইও পাড়েননি। তাঁর আবির্ভাবের কিছু পর থেকেই আমাদের সাহিত্যে, বিদেশাগত ক্ষয়িষ্ণু ধনবাদের ক্ষতলাঞ্ছিত একটা ধারা এসে তার ছায়াপাত ঘটিয়েছিল—যাতে বাস্তবতার নামে মানস-বিকারের মতো চূড়ান্ত একটা কাণ্ড ঘটতে থাকে। চাপা পড়ে যায় মানবাত্মার সংগ্রামী বাস্তবতা, বড় ও স্পষ্ট হয়ে উঠল খোলসটাই এবং বিস্ময়কর সব স্রষ্টাদের বিকৃত-মানস বা মর্বিডিটি। ফলে একই সঙ্গে ধনবাদী ও সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থার ঘৃণিত ক্ষতলাঞ্ছিত চেহারাটাই যেন একমাত্র সত্য বলে প্রতিভাত হল। বাস্তববাদের নামে হালের সৃষ্টি-সাহিত্যের গায়েও ঢাকা দেওয়া হচ্ছে সেই

পুরাতন ধনবাদের ক্ষতলাঞ্ছিত নামাবলী। অধিকন্তু কোথাও বা বিভ্রান্ত প্রগতিশীলতার নামে ক্ষয়িষ্ণু একটা সমাজের বস্তাপচা উপকরণ দিয়ে রঙ বা রোমান্স সৃষ্টি করে চিরকালের কাঙ্ক্ষিত মহান মানব-সম্পর্ক ও গৃহধর্মে প্রচণ্ড আঘাত করা হচ্ছে। এদিক থেকে বাঙলার ভেঙেপড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছোট ছোট মানুষগুলির মস্ত বড় একটি আবেগ শরৎ-সাহিত্য পর্যন্ত এসে থমকে আছে। তার পরে আর বাঙলার বাঙালী মধ্যবিত্তের চরিত্র তেমন করে আর কোথাও দেখেছি বলে তো মনে হয় না—আর কোথায় বা পেয়েছি কালের নবতর পরিপ্রেক্ষিতে মহান জীবনের আবেগ? সেদিক থেকে শরৎচন্দ্র আজও শেষ চরিত্রস্রষ্টা।

কবিতা

দুটি পাহাড়ী নদীর উদ্দেশে

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

হঠাৎ দেখেছি কোনো আশ্বিনের
প্রখর সোনায়,
ত্রিকালজ্ঞ অস্তিত্বের খনি
কালাকাল ব্যেপে থাকে মাটির গভীরে—
হঠাৎ দেখেছি তাই,
ছুটির পাখায় পাখা নীল করে মিশে গেছে চিল
আকাশের তীরে।

এ নগরে হিম জমে,
নিরুৎসাহ জীবনের তুষার কৈলাসে—।
এ নগরে মরা-বাঁচা-আন্দোলন-মোটর চাপায়-
ট্রাম-বাসে-ভিড়ে চলন্ত বৈশাখী—
চলা-না-চলার মাঝে ছেদ আনে
হওয়া-না-হওয়ার।
মনের মণিতে মাটি বাসা তো বাঁধে না—
কৃত্রিম উৎসাহে মরে ক্লান্ত হয়ে গানের আওয়াজ—
প্রাণে শান্তির কামনা জ্বলে—
নিরুদ্দেশ শিখা।

আমি চাই এ জীবনে
আশ্বিনেব ব্যস্ত অভিযান—
আলিঙ্গনে বিজয়া দশমী।
চিত্রময় অনুভবে,
বিপুল গ্রামের দীঘি কালো জলে
দাঁড় টানা শাদা।
হাজার কণ্ঠের সারি গানের সে গ্রামে।
অথবা চলেছি কোনো পাহাড়ের ঢেউ-এর চূড়ায়,
থাকে থাকে হাতে গড়া খেত—
গেরুয়া-সবুজ-নীল-হলুদের ছবি।
আকণ্ঠ সূর্যের রসে পরিপূর্ণ কালো দুই মেয়ে
মহুয়া-শালের রাজ্যে আদিম শালীন ভঙ্গি হানে—
প্রবল শান্তির সেই নিষ্কলুষ দ্যুতি॥

আদালতের মাঠ

অজিত দাশ

আদালতের মাঠে এখন আর কেউ নেই।
নিরিবিলি নির্জন সব।
বুড়ো বটগাছটাও স্তব্ধ।

এখানে দুপুরে ঘটে গেছে একটা ছোটোখাটো খণ্ড-যুদ্ধ।
তার কথাই ভাবছে। সবাই ভাবছে।
তার কথাই বলাবলি করছে পুলিস-সাহেব
সামনের বাংলোয় বসে, পরিবারবর্গের সঙ্গে।
একটা সাজানো ভুখ-মিছিল এসেছিল স্লোগান দিয়ে
তাতে যোগ দিয়েছিল হুজুগে ছাত্রছাত্রী;
তারা শিক্ষা পেয়েছে।
তারা জব্দ হোক কিছু দিন ধরে।

আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে যারা ফিরে গেছে,
ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে সরে পড়েছে যে পলাতকেরা
ভুলেও তারা আর এমুখো হবে না কোনোদিন,
তারা আর আসবে না।

সত্যি নাকি?
তারা আসবে না কেউ?
প্রশ্ন জেগেছে বুড়ো বটগাছের পাতায় পাতায়,
তাই দুলছে পাতাগুলো।
সত্যি নাকি?
ক্ষুধাকে বাঁধবে বেড়া দিয়ে?
সারা মাঠের ঘাসে ঘাসে কানাকানি
আর একটা শানিত জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে সেইখানটা থেকে
ক্ষুধিত মানুষটার মাথা ফেটে ধুলোর মধ্যে
যেখানে রক্ত পড়েছিল।

আর নির্বাক আদালত-ঘরটা
সেইদিকে তাকিয়ে থাকে আতঙ্কে।

তোমাকেই প্রাণ দিই

সুধাংশু গুপ্ত

তোমাকেই প্রাণ দিই,
তোমাকেই দিই এই প্রাণের যন্ত্রণা,—
দেখো এই যৌবনের বেদনা-পাঁজরে আছে
ক্রোধোদ্ধত ফণা।

আরো দিই, তোমাকেই দিই
মধ্যাহ্ন-হৃদয়-জোড়া মরুভূমি-চর,
তোমাকেই দিই খর-বৈশাখের রৌদ্রপোড়া
গানের অম্বর।

আমি তো তোমাতে ঢালি
যত কথা, যত আছে কথা,
তোমারি ঝড়ের যজ্ঞে,—হয়েছি প্রস্তুত, হবো
বিদ্যুৎ-বারতা।

শুধু চাই, চাই এই
বুকের প্রান্তরে
ফুটুক একটি ফুল অগ্নিকোণ-তপস্যায়—
ঝড়ে॥

সুর

রানু দেবী

বহুদূরে কাঁপা কোন্ সে বাঁশির সুরে
নাগ-নাগিনীরা তুলেছে এখানে ফণা।
ঝড় উঠেছে তো শুনেছি অনেক দূরে,
খাঁচার পাখিরা মেলতে চাইছে ডানা।
বুঝিবা ফুলেরা ফুটেছে সে কোন্ দেশে
এখানেতে তার সুবাস এসেছে ভেসে,
প্রাণের জোয়ার এনেছে ওখানে ভল্গা
এখানে স্রোতের টানেতে উতলা গঙ্গা॥

পরমেশ মাস্টার

বিমলচন্দ্র ঘোষ

(১)

বড়লোক বন্ধুর বৈঠকখানায় বসে আছি
কার্যোদ্ধারের ফিকিরে ;
ছাইচাপা আগুনের মতো ভারিক্কিচালের অন্তরালে
ধিকি ধিকি জ্বলছে উমেদারির দৈন্য!
মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি সতর্ক বিস্ময়ে
প্রত্যেকটি আসবাবে ফুটে উঠেছে ঐশ্বর্যের দম্ভ
চেয়ারে টেবিলে
অপঠিত গ্রন্থরাজির সোনার জলে বাঁধানো মলাটে।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
কী দিলখোলা হাসি!
মাছি-পিছলে-পড়া নিটোল স্বাস্থ্যে
বন্ধু হাসলেন,
যেন আভিজাত্যের হ্রেষা!
সুবেশধারী 'বয়' দু পেয়ালা কফি দিয়ে গেল
কাছ ঘেঁসে বসলুম বিগলিত বন্ধু-বাৎসল্যে।
বন্ধু বললেন, "ঘাব্‌ড়ো না সবুরে ম্যাওয়া ফলে
এই দ্যাখো না একেই বলে মা-লক্ষ্মীর দয়া!
কাল সামান্য চেষ্টায়
সামান্য পরিশ্রমে
দশ হাজার কর্‌করে টাকা লাভ করেছি.
ব্যবসা নয় বাণিজ্য নয়
সেরেফ মার্কিনী ঝুটো মাল বিক্রির কমিশন।"

কফিতে এক চুমুক দিয়ে জিভটা রসিয়ে উঠলো
বললুম, "বলো কি?—দ-শ হা-জা-র!"
বন্ধু বললেন, "বিশ্বাস হল না?
লেগে পড়ে থাকো দুদিনেই দেখতে পাবে
যাকে বলে হিংয়াকা মাটি হুঁয়া, হুঁয়াকা মাটি হিংয়া—
বুঝলে ভায়া, গাছের ফল গাছে রইল বোঁটা গেল খসে!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!"
বন্ধু রসিকতায় ফেটে পড়লেন।

(২)

একটি শীর্ণকায় মলিনবেশ যুবক
সসঙ্কোচে এসে দাঁড়ালো।
উদাত্ত-সারল্যে বন্ধু বললেনঃ
"হ্যাল্লো পরমেশবাবু কি মনে করে?"
যুবক দ্বিধাজড়িতকণ্ঠে বললেঃ
"আজ্ঞে আজ তিন তারিখ—আপনি বলেছিলেন—!"
অসমাপ্ত কথার ওপর বন্ধু বলে উঠলেনঃ
"তিন তারিখ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.
তুমি যে আজকাল সাহেব হয়ে উঠলে হে মাস্টার?
বলি এটা কোন্ সাল মনে আছে?"
যুবক সবিস্ময়ে বললেঃ
"আজ্ঞে উনিশ্‌শো বাহান্ন!"
দিলখোলা ভাষায় বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেনঃ
"বাঃ বাঃ চমৎকার স্মরণশক্তি
তাহলে ইংরেজ ক'বছর হল ভারত ছেড়েছে?"
যুবক বিমূঢ় কণ্ঠে বললেঃ
"আজ্ঞে তিন তারিখের সঙ্গে এসব কথার কি অর্থ
বুঝতে পাচ্ছি না।"
কপট গাম্ভীর্যে বন্ধু বললেনঃ
"বলি, এটা স্বাধীন ভারত এ কথাটা মনে আছে কি?
মনে রেখো মাস্টার
ইংরেজদের কেতাদুরস্ত নিয়ম স্বাধীন ভারতে অচল
ওসব বদ্ অভ্যাস ছাড়তে হবে।
তাছাড়া তিন তারিখে আসতে বলেছি বলেই
তুমি যে তিন তারিখেই আসবে তার কি মানে আছে?"
"আজ্ঞে গত তিনমাসের মাইনে
পনের টাকা হিসাবে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা!
এই সামান্য টাকার জন্য আর ঘোরাবেন না।"
যুবক এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললো।
বন্ধু হৃদয়বিদারক গাম্ভীর্যে উত্তর দিলেনঃ
"পরমেশ বাবু, আপনার ঐ পঁয়তাল্লিশ টাকা
মেরে দিয়ে কি আমি বড়লোক হব?
বেশ, আজ থেকে আর আমার মেয়েকে
পড়াতে হবে না—"
তারপর দেয়ালপঞ্জীর দিকে তাকিয়ে
মনে মনে একটা দুর্বোধ্য হিসাব করে বললেনঃ
"সামনের ২৩শে তারিখে তোমার টাকা নিয়ে যেও
আজ হবে না।"

যুবক ব্যাকুল কণ্ঠে বললেঃ
"২৩শে তারিখ?—এখনো কুড়ি দিন স্যার?
আজ টাকা না পেলে আমার ভীষণ ক্ষতি হবে
চিকিৎসার অভাবে আমার ছেলেটা মরণাপন্ন,
ওষুধ কেনবার হাতে একটিও টাকা নেই!
তাছাড়া—আজ রেশন না নিলে—
সপরিবারে উপোস করতে হবে—"
পিশাচের মতো অট্টহাস্যে বন্ধু বললেনঃ
"হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হা—
পরমেশবাবু
তোমাদের ঐসব প্রগতি-সাহিত্যের পাতা মুখস্ত করা কাহিনী
অনেক শুনেছি,
শুনে শুনে কান অসাড় হয়ে গেছে,
ওতে আর মন গলে না হে ভায়া—
যাও এখন যাও
সেই ২৩শে তারিখে এসো দেখি কি করতে পারি!"
স্তম্ভিত যুবক তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে
বন্ধু তার দিকে তাকিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বললেনঃ
"দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ হবে না পরমেশ বাবু
তোমার মরণাপন্ন ছেলেটাও বাঁচবে না!
রেশনও আসবে না!
যাও সরে পড়ো এখন আমার অনেক কাজ
তোমার সঙ্গে বক্ বক্ করবার সময় নেই!
ভজুয়া! আর দু পেয়ালা কফি দিয়ে যা—"
যুবক নিঃশব্দে চলে গেল—
দু'জনেই নীরব
ঘড়িতে টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে!

(৩)

"বাপি! বাপি! পাপি—"
চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি
বন্ধুর আদুরে মেয়ে মিস্ সুলভা সান্যাল
বহুমূল্য শাড়ির আঁচল লুটিয়ে
লাফাতে লাফাতে ঘরে এসে বাপের গলা জড়িয়ে ধরলো!
মধুর কণ্ঠে বন্ধু বললেনঃ
"কি মা সু, কিছু বলবে?"
"এক্ষুনি একশো টাকা দিতে হবে বাপি
আজ আমার পুতুলের বিয়ে—

দেরি কোরো না বাপি শিগ্গির দাও—"
মেয়ে আদরে গড়িয়ে পড়লো।
বন্ধু টেবিলের ড্রয়ার খুলে একতাড়া নোটের মধ্যে থেকে
একখানি একশো টাকার নোট মেয়েকে দিলেন।
মেয়ে আহ্লাদে নোটটা নিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল।
বন্ধু মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে বললেনঃ
"ঐ আমার একটি মেয়ে!
আমার মা লক্ষ্মী!
ওরই জন্যে তো সব!
কত টাকা যে নষ্ট করে!
কিছু বলতে পারি না।"
বয় কফি দিয়ে গেল
আমি নির্বাক
বুকের মধ্যে নিঃশব্দ শিখায় উমেদারের চিতা জ্বলছে
মুখে শুধু বললুমঃ
"আজ আর কফি খাওয়া হল না
এখুনি উঠতে হবে।"
বন্ধু বলে উঠলেনঃ "সেকী হে—
এরি মধ্যে উঠছো?
যাক সামনের শনিবারে এসো
আইসেনহাওয়ার আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন
মার্কিন সাহেবদের একটা পার্টি দিচ্ছি
মন্ত্রীরাও আসছেন—
তোমারও নিমন্ত্রণ রইল—এসো—
ভুলো না যেন—"
চলে এলুম—নির্বাক-নিস্পন্দ—
উমেদারের চিতার আগুন বুকে নিয়ে
মড়াপোড়ার ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে
দুর্গন্ধে শ্বাস রোধ হয়ে আসছে
চলে এলুম দাঁতে দাঁত ঘষে—

(৪)

চলে এলুম পথে!
লোকারণ্য!
জীবন-সংগ্রামের প্রাণান্তকর ভিড়
ফেরিওয়ালার চিৎকার—
অর্ধভুক্ত কেরানীর শবযাত্রা!
কারখানার ধূমোদ্গারিত চিমনির ভেতর থেকে
মজুর-মারা ডাইনীর বাঁশি শোনা যাচ্ছে—

ট্রামের ঘড়ঘড়ানি
মোটরের হর্ণ
মহানাগরিক সভ্যতার বিক্ষুব্ধ আত্মায়
পরমেশ মাস্টারের চোখ জ্বলছে
শত শত প্রবঞ্চিত পরমেশ মাস্টারের চোখ
এক জোড়া
দু'জোড়া
হাজার জোড়া—
মহাকালের রক্তবর্ণ পটভূমিকায় হাজার হাজার মশাল জ্বলছে!
সেই জ্বলন্ত আলোয় দেখছিঃ
শ্বেতশুভ্রপক্ষসঞ্চারী শত শত শান্তি-বিহঙ্গমের অন্তহীন অভিসার!
শান্তিকামী বিশ্বমানবতার আকুল প্রার্থনা—
বেঁচে থাকবার—সুখে থাকবার—আনন্দে থাকবার—
শাশ্বত অধিকার!
আমার চোখে পলক নেই!
কণ্ঠে ভাষা নেই!
শুধু প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রগতির গতিছন্দে মুক্ত বেগবান—!

পরমেশ মাস্টার তুমি আমাকে বাঁচালে!
আত্মাবমাননার নারকীয় অন্ধকার থেকে
যুদ্ধবাদী নর-পিশাচের চক্রান্তজাল ছিন্ন করে
তুমি আজ আমাকে বাঁচালে!



ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদের মূলসূত্র ও প্রয়োগ

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

মার্কসীয় দৃষ্টি থেকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গবেষণার পরিপ্রেক্ষিত কি হবে সে সম্বন্ধে আগের প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এবার সেই গবেষণার মূল সূত্র এবং ধারা অর্থাৎ মার্কসীয় দৃষ্টি থেকে ভাষাতত্ত্বের তত্ত্বগত দিক সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

এজন্য প্রথমে স্তালিনের নির্দেশিত সাধারণ সূত্রগুলির কিছু উল্লেখ করে তারপর সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদেরা বর্তমানে কিভাবে তাঁদের গবেষণার ধারা ঠিক করেছেন তা দেখা যাবে।

১। ভাষা হল সমাজের জনগণের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদ্যানের মাধ্যম। ভাষার সঙ্গে চিন্তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভাষা চিন্তাকে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে; শব্দগুলিকে সুসঙ্গত বাক্যের আকারে সাজিয়ে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। তবেই চিন্তা তথা জ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলাফল মানুষের বোধগম্য-ভাবে রূপায়িত হয় এবং তার দ্বারা মানব-সমাজে ভাবের আদানপ্রদান সম্ভব হয়।

বহিঃপ্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধেই হোক বা সমাজের জীবনের জন্য জরুরী জিনিস উৎপাদনের কাজেই হোক, সমাজের জনসমষ্টির কাজের ভিতর সামঞ্জস্য স্থাপন একান্ত দরকার। নতুবা সাফল্য দূরে থাকুক, সামাজিক উৎপাদনের অস্তিত্বই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সামঞ্জস্য বিধানের কাজ সম্ভব হয় শুধু ভাবের আদান ও প্রদানের মারফত। সুতরাং সমাজের সমস্ত লোকের পক্ষে বোধগম্য ভাষা ছাড়া সমাজের অস্তিত্বই নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভাষা একদিকে যেমন ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম তেমনি সমাজ-বিকাশের লড়াইতে মানুষের হাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই হল সামাজিক ঘটনা বা প্রক্রিয়া (phenomenon) হিসাবে ভাষার প্রকৃতি এবং ভূমিকা।

২। কোনো জাতির ভাষা হল সেই জাতির সমগ্র জনগণের সমবেত ঐতিহাসিক সৃষ্টি। অর্থাৎ ভাষা সমাজের বিকাশের একটি বিশেষ স্তরের অথবা বিশেষ কোনো শ্রেণীর সৃষ্টি অথবা সম্পত্তি নয়। সমাজের সমগ্র জন-সমষ্টি তাদের বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে পুরুষানুক্রমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমবেতভাবে ভাষার সৃষ্টি এবং উন্নতি করে। তাদের ইতিহাস-সঞ্চিত সমবেত অভিজ্ঞতা ভাষার মারফতে রূপায়িত হয়। ভাষার সৃষ্টি হয় সমগ্র সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে। অর্থাৎ বিশেষ একটি শ্রেণীর প্রয়োজন মিটানোর জন্য নয়, সমস্ত শ্রেণীর প্রয়োজনে; সমস্ত শ্রেণীর ভিতর ভাবের আদানপ্রদানের তাগিদে। সেই হিসাবে ভাষা শুধু বিশেষ একটি শ্রেণী বা বিশেষ সামাজিক স্তরের নয়, সমস্ত স্তরে সমস্ত শ্রেণীর সমান কাজে লাগে। যেমন পুরাতন মুমূর্ষু সমাজের কাজে লাগে তেমনি উদীয়মান সমাজেরও প্রয়োজন নির্বাহ করে।

শ্রেণী-নির্বিচারে সমাজের সকলের আদানপ্রদানের প্রয়োজন নির্বাহের

ঐতিহাসিক তাগিদে ভাষার উৎপত্তি। যদি তার সেই ভূমিকা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ তা বিকৃত হয়ে সকলের বোধগম্য হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন আর তার ভাষাত্ব থাকে না। তা তখন বিশেষ শ্রেণী বা সমাজের কোনো বিশেষ অংশের কথনভঙ্গিতে (jargon) পরিণত হয়।

সমাজ-বিকাশের প্রত্যেক স্তরে দেখা যায় যে সমগ্র সমাজের জনগণের মধ্যে ভাবের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে একটিমাত্র সাধারণ ভাষাই কাজ করে।

সাধারণ ভাষার পাশাপাশি অনেক আঞ্চলিক বা স্থানীয় উপভাষা প্রচলিত থাকে সত্য। কিন্তু সেগুলি মূল ভাষা থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয়। তারা আসলে ঐ সাধারণ ভাষারই অঙ্গ বা শাখা-প্রশাখা। তারা একই মূল থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করে। সাধারণ ভাষার ব্যাকরণ ও মৌলিক শব্দাবলীকে ভিত্তি করেই উপভাষার অস্তিত্ব।

স্থানীয় বা আঞ্চলিক উপভাষা ছাড়াও সমাজে বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ কথনভঙ্গির (jargon) অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা থেকে এই ধারণা করা ভুল হবে যে এক এক শ্রেণীর এক এক ভাষা। ভাষার সামাজিক সাধারণ চরিত্রের বদলে শ্রেণী-চরিত্রের মতবাদ মার্কসবাদবিরোধী। সোবিয়েত ইউনিয়নে কিছুদিন আগে এন, ওয়াই, মার সেই ইতিহাসবিরোধী মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদেরা প্রতিবাদ করেন। এইভাবে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল তার নিরসন হয় স্তালিনের হস্তক্ষেপ এবং মার্কসীয় বিশ্লেষণে। স্তালিন মারের তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে শ্রেণীগত কথনভঙ্গিকে কি বলা হবে, তার বৈশিষ্ট্যের কারণই বা কি? স্তালিন সেই প্রশ্নেরও পরিষ্কার জবাব দিয়েছেন। ভাষা যদিও শ্রেণী-নির্বিচারে সমাজের সকলের সমান কাজে লাগে কিন্তু বিশেষ শ্রেণী ভাষাকে নিজেদের বিশেষ কাজে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহারের চেষ্টা করে। তারা সাধারণ ভাষার উপর নিজেদের বিশিষ্ট শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি চাপাতে চায়। সচেতনভাবে এই প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে সমাজের উপরতলার লোকেরা, যারা জনসাধারণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যারা জনসাধারণকে ঘৃণা করে। কিন্তু তবু কথা বলার বিশিষ্ট কায়দা বা কিছু কিছু বিশেষ শব্দের দরুন তাদের কথনভঙ্গি একটা নতুন ভাষায় পরিণত হয় না। তা সাধারণ ভাষারই অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ অংশ মাত্র এবং সেই সাধারণ ভাষা থেকেই নিজের মূল উপাদান সংগ্রহ করে।

৩। এবার ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য বা প্রাণবস্তু এবং ভাষা-বিকাশের নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

কোনো ভাষার প্রাণবস্তু হল তার মৌলিক শব্দাবলী এবং ব্যাকরণগত কাঠামো। কোনো ভাষার শব্দসমষ্টিই শব্দাবলী (vocabulary) নামে পরিচিত। শব্দাবলীর মধ্যে প্রধান বা মেরুদণ্ড-স্বরূপ হল মৌলিক শব্দ-সমূহ—ধাতু এবং সেই জাতীয় শব্দ যাঁর ভিত্তিতে নতুন নতুন শব্দ রচিত হয়। এই মৌলিক শব্দাবলীকে ভিত্তি করেই কোনো ভাষার শব্দসমষ্টিতে পরিবর্তন সাধিত হয়।

কোনো ভাষার শব্দ-সমষ্টির মারফত তার উন্নতির স্তর নির্ণয় করা যায়। শব্দসমষ্টি যত ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ হবে ভাষাও সেই পরিমাণে সমৃদ্ধ এবং উন্নত হবে।

কিন্তু শুধুমাত্র শব্দসমষ্টি বা শব্দাবলীর দ্বারাই ভাষা গঠিত হয় না। ওগুলিকে স্তালিন বলেছেন ভাষা গড়ার মাল-মশল্লা। সেই মাল-মশল্লাগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে ভাব প্রকাশের উপযোগী মাধ্যমে পরিণত করে ব্যাকরণ।

ব্যাকরণের প্রধান অঙ্গ হল শব্দের রূপ পরিবর্তন (Morphology) এবং বাক্য-রচনা (Syntax) প্রক্রিয়া। শব্দের রূপ-পরিবর্তন বা প্রত্যয় এবং শব্দগুলিকে সাজিয়ে বাক্যের আকার দেওয়ার নিয়মাবলীর সমষ্টিই হল ব্যাকরণ। সুতরাং ব্যাকরণের দৌলতেই মানুষের চিন্তা এবং জ্ঞান ভাষায় অভিব্যক্তি পায়।

ব্যাকরণের কারবার বিশেষ বিশেষ বা আলাদা আলাদা শব্দ নিয়ে নয়। তার কাজ হল সাধারণভাবে শব্দের রূপান্তর বা পরিবর্তনের নিয়ম নির্ধারণ করা। তেমনি বাক্যের ব্যাপারেও বিশেষ কোনো বাক্য অথবা বিশেষ কর্তা ও কর্ম নিয়ে কারবারের বদলে ব্যাকরণ সাধারণভাবে সমস্ত বাক্য-রচনার নিয়ম নির্দেশ করে। বাক্য ও শব্দ, দুইয়ের সম্বন্ধেই ব্যাকরণের কাজ বিশেষকে বাদ দিয়ে সাধারণকে নিয়ে। অর্থাৎ ব্যাকরণ বিমূর্তীকরণ (abstraction) পদ্ধতির সাহায্যে সমস্ত শব্দ পরিবর্তন এবং বাক্যরচনার প্রক্রিয়ার সার সংগ্রহ করে ও তাকে সাধারণ সূত্র বা নিয়মের আকারে উপস্থিত করে। এইভাবেই ব্যাকরণের নিয়ম এবং সূত্রের উৎপত্তি। এই প্রক্রিয়া কৃত্রিমভাবে, একজন দুইজন লোক বা এক দুই পুরুষের দ্বারা সাধিত হয় না। সুদীর্ঘ কাল ধরে মানবমন সমষ্টিগতভাবে বিমূর্তীকরণের পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণের কাঠামো তৈরি করে। একজন দুইজন খ্যাতনামা বৈয়াকরণিকের বিশিষ্ট অবদান এই যে তাঁরা সেই সমষ্টিগত শ্রমের ফলকে সাজিয়ে গুছিয়ে মার্জিতভাবে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেন। মূলত ব্যাকবণ হল মানুষের চিন্তাশক্তির উন্নতির এক বিরাট অবদান।

৪। এর পরের আলোচ্য বিষয় হল ভাষার বিকাশ এবং অগ্রগতির নিয়ম। ভাষা মানুষের কাজের সমস্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। উৎপাদনের কার্যকলাপের সঙ্গেও তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। সেইজন্য ভাষার শব্দাবলীতে অবিরাম পরিবর্তন হতে থাকে। পরিবর্তন সম্বন্ধে শব্দাবলী খুব স্পর্শকাতর। তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। মানুষের জীবনে এবং তা থেকে অভিজ্ঞতায় সামান্যমাত্র পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অঙ্গে তার ছাপ পড়তে বাধ্য। কিন্তু সেই পরিবর্তনের ধারার বিশেষত্ব হল যে তা প্রচলিত শব্দাবলীকে ধ্বংস করে তার বদলে আগাগোড়া নতুন শব্দবলী সৃষ্টি করে না। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে কিংবা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রগতির ফলে যে সব নতুন শব্দের সৃষ্টি হয় সেগুলি প্রচলিত শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার আয়তন বৃদ্ধি করে ও সম্পদ বাড়ায়। অবশ্য সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শব্দ অকেজো হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘদিন অ-ব্যবহারের দরুন লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভাষার ভাণ্ডারে নতুন নতুন শব্দ যোগ হয় তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে। ভাষার মৌলিক শব্দাবলীর পরিবর্তন হয় অনেক মৃদু গতিতে, তার মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সাধারণ শব্দাবলীর ভিত্তি বা

বনিয়াদী কাঠামো হিসাবে তার ভূমিকা অব্যাহত থেকে যায়। এটাই খুব স্বাভাবিক। কেন না অনেকগুলি ঐতিহাসিক যুগ ধরে ভাষার যে মূল শব্দ-ভাণ্ডার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কাজ চলতে পারে তাকে নষ্ট করার প্রয়োজন হয় না। আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে মূল শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তাকে ধ্বংস করে রাতারাতি তার স্থান নেওয়ার মতো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সে চেষ্টার ফলে বরং সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

যে কোনো ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামো পরিবর্তন হয় মৌলিক শব্দাবলীর পরিবর্তনের চাইতেও অনেক ধীরগতিতে। সময়ের গতির সঙ্গে ব্যাকরণ পদ্ধতিতেও পরিবর্তন হয় সত্য। তার মানে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে ব্যাকরণ আরও উন্নত হয়, সূত্রগুলি হয় আরও উন্নত এবং স্পষ্ট। নতুন সূত্র এবং নিয়ম সৃষ্টি হয়। কিন্তু মোটের উপর ব্যাকরণের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকে, যুগ যুগ ধরে সমান উপযোগীভাবে কাজ করে যায়। সেই জন্যই বলা হয় যে কোনো ভাষার ভিত্তি ও তার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হবে ব্যাকরণগত কাঠামো এবং মৌলিক শব্দাবলীতে।

কোনো ভাষার স্থায়িত্ব এবং অন্যের গ্রাস-চেষ্টার বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিরোধ-ক্ষমতার যে নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায় তার গোড়া হল এইখানে। ব্যাকরণ-গত কাঠামো বা পদ্ধতি এবং মৌলিক শব্দাবলীর দীর্ঘ জীবনীশক্তির দরুনই ভাষার জীবনীশক্তি। তুর্কী শাসকেরা বহু শত বছর ধরে বলকান জাতি-সমূহের ভাষাগুলিকে বিকৃত, চূর্ণ ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। সেই সময় ঐ সব ভাষার শব্দাবলীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক তুর্কী শব্দ, বাক্যাংশ বা প্রকাশভঙ্গি ভাষাগুলির মধ্যে প্রবেশ করেছে। তা সত্ত্বেও বলকান ভাষাগুলি মরে নাই, কারণ তাদের ব্যাকরণ-পদ্ধতি এবং মৌলিক শব্দাবলী মোটের উপর অব্যাহত ছিল।

৫। ভাষা, ভাষার ব্যাকরণ ও মৌলিক শব্দাবলী অনেকগুলি যুগের পরম্পরাগত সৃষ্টি। কাজেই ভাষার তথা ভাষার বিকাশের ইতিহাস অধ্যয়ন করার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। স্তালিন বলেন যে প্রাচীনতম যুগে, দাস-ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার আগে আধুনিক ভাষাগুলির অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়েছিল। সেই যুগের ভাষা ছিল খুব সাধাসিধে, শব্দ-ভাণ্ডার ছিল স্বল্পায়তন। তবু তার একটি ব্যাকরণ ছিল, সে ব্যাকরণ যত অনুন্নত বা আদিমই হোক না কেন।

ভাষা-বিকাশের ক্রমিক স্তর হিসাবে স্তালিন দেখিয়েছেন যে কৌম (clan) ভাষা থেকে উপজাতির ভাষা, তা থেকে জাতি-সত্তার (Nationality) ভাষা এবং তারপর জাতীয় ভাষা—এই ভাবে অগ্রগতি হয়েছে।

আদিম যুগের পর উৎপাদনের অগ্রগতি, বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি, লিপির প্রচলন, এবং রাষ্ট্রের জন্ম, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা চালানোর জন্য চিঠিপত্রের অল্প বিস্তর আদানপ্রদান, বাণিজ্যের বিস্তার ও তার ফলে চিঠিপত্রের সুনিয়মিত আদানপ্রদানের ব্যবস্থা, মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার ও তার পর সাহিত্যের উন্নতি ইত্যাদির ফলে ভাষার বিকাশের উপর বিরাট প্রভাব পড়েছে। পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অনেক। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু উপজাতি ও জাতি-

সত্তা ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে ; বিভিন্ন উপজাতি এবং জাতিসত্তা একে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছে। তার পরবর্তী কালে জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় রাষ্ট্রের উদয় হয়েছে, বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, এক সমাজ-ব্যবস্থার স্থান দখল করেছে নতুন আর এক সমাজ-ব্যবস্থা। সব কিছুরই প্রতিফলন হয়েছে ভাষায়, বিরাট পরিবর্তন এবং অগ্রগতিতে।

কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে উক্ত সব পরিবর্তন এবং অগ্রগতি এক গুণগত অবস্থা (Quality) থেকে অন্য গুণগত অবস্থায় পরিবর্তন হয়েছে কোনো একটা বিরাট বিস্ফোরণের মারফত নয়। প্রচলিত ভাষাকে ধ্বংস করে তার স্থানে নতুন ভাষা প্রতিষ্ঠার দ্বারাও নয়। সে পরিবর্তন হয়েছে মন্থরগতিতে। নতুন গুণগত অবস্থার উপাদানগুলি ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত হয়েছে। ভাষার নতুন কাঠামোর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে মৃদু পদক্ষেপে এবং পুরনো গুণগত অবস্থার উপাদানগুলি মরে ঝরে পড়ে গেছে মন্থরগতিতে।

অতীত ইতিহাসে দুইটি ভাষার মিশ্রণের যে-সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সে-গুলিকে স্তালিন বিশ্লেষণ করেছেন। দুটি ভাষা মিশ্রণের ফলে কোথাও গুণগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ভাষার জন্ম হয় নাই। ভাষা মিশ্রণের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে দুইটি ভাষার মধ্যে একটি অপরটির উপরে জয়লাভ করেছে, তার নিজস্ব ব্যাকরণ এবং মৌলিক শব্দাবলী বজায় রেখেছে এবং তার অন্তর্নিহিত নিয়ম অনুযায়ী বিকাশলাভ করেছে। আর অপরটি পরাজয়ের ফলে নিজস্ব ব্যাকরণ ও মূল শব্দভাণ্ডার হারিয়ে ভাষা হিসাবে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হঠাৎ বা অল্পকালের মধ্যে ঘটে না। একটি চূড়ান্ত আঘাতে শেষ হওয়ার বদলে ভাষা-মিশ্রণ বা দুইটি ভাষার সংঘাতের প্রক্রিয়া চলতে থাকে দীর্ঘকাল ধরে, শত শত বছর জুড়ে। অবশেষে একটি ভাষা জয়ী হয়। বিজিত ভাষা বিজয়ীর অঙ্গে নিজের ছাপ রেখে যায়। বিজয়ী ভাষার শব্দভাণ্ডারে বহু নতুন সম্পদ সঞ্চিত হয়। তাতে তার শক্তি-বৃদ্ধিই হয়।

কাজেই ভাষা মিশ্রণের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে ভাষার এক গুণ-গত অবস্থা থেকে অন্য গুণগত অবস্থায় অগ্রগতি হয় বিস্ফোরণের মারফত। ভাষা-মিশ্রণ ভাষা-বিকাশের সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ মন্থরগতিতে পরিবর্তন, নতুন গুণগত অবস্থার উপাদানগুলির ধীরে ধীরে সঞ্চিত হওয়া ইত্যাদির ব্যতিক্রম প্রমাণ করে না।

উপরোক্ত মূল সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করে সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদেরা তাঁদের গবেষণার কাজকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করেছেন—

১। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে ভাষার মূল প্রকৃতি ও ভূমিকা, চিন্তার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক, একটি জাতির সমগ্র জনগণের মধ্যে আদানপ্রদানের সাধারণ মাধ্যম হিসাবে ভাষার কাজ এবং সমাজের অগ্রগতিতে ভাষার তাৎপর্য।

প্রসিদ্ধ জর্জীয় অধ্যাপক চিকোবাভার মতে ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজই হল ভাষার ভূমিকার প্রধান এবং সারবস্তু।

ভাষা চিন্তাকে প্রকাশ করার কাজ করে। চিন্তার প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে

ভাষার কাজের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কিন্তু এই দিকটি ভাবের আদান ও প্রদানের মাধ্যমের কাজের তুলনায় গৌণ। কেন না যে ভাষা সেই ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছে তা মৃত ভাষায় পরিণত হয় এবং তার দ্বারা চিন্তা প্রকাশের কাজ হয় না।

ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম না হয়ে কোনো ভাষা তাই চিন্তাপ্রকাশের মাধ্যম হতে পারে না। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তা সম্ভব তবু সে ক্ষেত্রে সে ভাষার বিকাশ হতে পারে না।

ভাষার উৎপত্তি হয়েছে ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে, পরে তা চিন্তাপ্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। কেন না সমাজ ছাড়া মানুষ ও তার চিন্তার বিকাশ সম্ভব নয় এবং আদানপ্রদানের মাধ্যম ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সেইজন্যই যে ভাষা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভাব বিনিময়ের কাজে ব্যবহৃত হয় না তার দ্বারা চিন্তাকে প্রকাশ করার কাজও অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং আদানপ্রদানের কাজের দিক দিয়ে অধ্যয়ন করলেই ভাষার সারকে অধ্যয়ন করা হবে এবং সে অধ্যয়ন হবে পূর্ণাঙ্গ ও বৈজ্ঞানিক।

সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদেরা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস নিয়েও গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক কন্দ্রাচভ এই বিষয়ে এঙ্গেল্‌সের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে গবেষণা শুরু করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি পারীর "ভাষাতত্ত্ব পরিষদের" তীব্র সমালোচনা করেছেন। উক্ত পরিষদ মনে করেন যে ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা ভাষাতত্ত্বের গবেষণার ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না। বলা বাহুল্য যে সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদেরা এরূপ মত সমর্থন করেন না।

কন্দ্রাচভের মতে "বুর্জোয়া ভাষাতত্ত্ববিদদের ধারণা যে, ভাষার মূল প্রকৃতি আবিষ্কারের উপযোগী উপায় বিজ্ঞানের হাতে নেই। দ্বিতীয়ত তাঁরা ভাষা-তত্ত্বের গবেষণার সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের গবেষণাকে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত করতে চান না। তৃতীয়ত তাঁদের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির দরুন তারা বস্তুবাদীপদ্ধতিতে সমাধানের উপযোগীরূপে প্রশ্নটি তুলতে অক্ষম।"

২। ভাষার গঠন ও তার মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী ব্যাকরণগত কাঠামো এবং মৌলিক শব্দাবলী ও অন্যদিকে বিরামহীনভাবে পরিবর্তনশীল সাধারণ শব্দাবলী।

স্তালিনের শিক্ষার আলোকে ব্যাকরণ সম্বন্ধে জানা ও গবেষণার তাৎপর্য অনেক বেড়ে গেছে। তাই এই বিষয়েও খুব বিস্তৃত এবং পরিশ্রমীভাবে গবেষণা চলেছে। অধ্যাপক পস্‌পেলভের মতে ব্যাকরণগত কাঠামো ও মৌলিক শব্দাবলী দুটির মধ্যে প্রথমটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারই স্থায়িত্ব আরও বেশি।

ব্যাকরণ ও মৌলিক শব্দাবলীর আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্ন ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয়-সাহিত্যের ভাষাগুলির গঠন ও কাঠামো সম্বন্ধে গবেষণা চলেছে। ব্যাকরণ, লিপি ও বানানের পদ্ধতি সমস্তই ভাষাতাত্ত্বিকদের মনোযোগের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

মৌলিক শব্দাবলীর প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করছেন বিশেষভাবে

অধ্যাপক চার্নিখ। তিনি মৌলিক শব্দাবলীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।

(ক) মৌলিক শব্দাবলী স্বভাবতই সাধারণ শব্দাবলীর তুলনায় আয়তনে ও সংখ্যায় কম। এইসব শব্দ মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে সব চাইতে জরুরী এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলিকে প্রকাশ করে।

(খ) ভাষার ইতিহাসে এদের জীবন খুব দীর্ঘ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা ভাষার মূল ধারাকে বহন করে চলে। অবশ্য তারাও পরিবর্তনরহিত নয়, সময়ের গতিতে তাদের রূপান্তর এবং সমৃদ্ধি হয়। তবে তা হয় খুব ধীর গতিতে।

(গ) মৌলিক শব্দাবলীগুলিতেই ভাষার জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। মৌলিক শব্দাবলীর সব সার হল ধাতু বা সেই জাতীয় শব্দ (root word, radicals)। তার ভিত্তিতেই নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়।

৩। ভাষা-বিকাশের এবং অগ্রগতির সাধারণ নিয়মগুলি অর্থাৎ নতুন কাঠামো এবং নতুন গুণগত অবস্থার উপাদানগুলি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়, নতুন গুণগত অবস্থায় পরিবর্তন হয় ক্রমে ক্রমে: ভাষার ভিত্তি অর্থাৎ ব্যাকরণ ও মৌলিক শব্দাবলীর তুলনায় সাধাবণ শব্দাবলীর পরিবর্তন হয় অনেক বেশি দ্রুতগতিতে।

মানবচিন্তার দীর্ঘ দিনের বিমূর্তীকরণ প্রক্রিয়ার (process of abstraction) ফলে ব্যাকরণের উৎপত্তি—এই সূত্রকে ভিত্তি করে সেই বিমূর্তীকরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্নস্তর এবং প্রধান প্রধান রূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে। চিন্তার বিমূর্তীকরণ প্রক্রিয়া যদি সঠিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয় তাহলে তা মূর্ত (concrete) থেকে বিমূর্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় কখনও বাস্তব ও সত্যের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলে না। বরং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে রেখে চলে। সুতরাং ব্যাকরণের বিমূর্তীকরণের ধারার প্রধান প্রধান স্তর ও রূপের অনুসন্ধান আমাদের ভাষা-বিকাশের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য যোগাবে। ব্যাকরণের ভিন্ন ভিন্ন দিক যথা বাচ্য, কাল ইত্যাদি সম্বন্ধে অধ্যয়নের উপর নতুন আলোকপাত করবে।

শব্দ-গঠন, শব্দ-গঠনের প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান, তার অন্তর্নিহিত নিয়ম এবং শব্দ-গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ও নতুনভাবে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে।

৪। সমাজের গোটা জনসমষ্টির সাধারণ ভাষা ও তার শাখাপ্রশাখা আঞ্চলিক উপভাষা ও বিশেষ শ্রেণীর কথনভঙ্গি; জনসাধারণ তথা সমাজের ইতিহাসের পটভূমিতে সাধারণ ভাষা, উপভাষা ইত্যাদির বিকাশের নিয়ম অধ্যয়ন।

ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদের অন্যতম প্রধান কথাই হল যে, কোনো ভাষাকে অধ্যয়ন করতে হলে সেই ভাষাভাষী জনগণের ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত হিসাবে অধ্যয়ন করতে হবে। সে কথা আগে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বিস্তৃত পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

ভাষা-বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে সাধারণ ভাষার বিভিন্ন উপভাষার

P3004

মধ্যে কোনো একটি বিভিন্ন কারণের যোগাযোগে অন্যান্য উপভাষাগুলির চাইতে প্রাধান্য লাভ করে। সেইটিই পরে জাতীয় ভাষার আধারে পরিণত হয়। সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদেরা দেখিয়েছেন যে কুর্স্ক-ওরেল অঞ্চলের উপভাষাই রুশের জাতীয় ভাষার আধারে পরিণত হয়। জাতিবিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে অধ্যয়ন করলে তবেই উপরোক্ত ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং কারণ পরিষ্কারভাবে জানা সম্ভব।

৫। সমাজের ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরে কথা এবং লিখিত ভাষার ভিতর যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ।

৬। সাহিত্যের ভাষা, জাতীয় ভাষার সঙ্গে লেখকের ভাষার সম্বন্ধ; লেখকের ভাষার ব্যক্তিগত ও সাধারণ প্রকৃতি, লেখকের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি, শিল্পরীতি ও বিশ্বদৃষ্টি।

সাহিত্যের ভাষার বিকাশের ধারা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করাব জন্য ভাষার এক গুণগত অবস্থা থেকে অন্য গুণগত অবস্থায় ক্রমপরিবর্তনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। সেজন্য ভাষার ভিত্তিতে অর্থাৎ ব্যাকরণ এবং মৌলিক শব্দাবলীতে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে কথ্য ভাষা ও সাহিত্যের ভাষার ভিতর কি সম্বন্ধ ছিল তা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা এই গবেষণার অন্যতম অঙ্গ। তার পর জাতীয় ভাষায় পরিণতির প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করার গুরুত্বের কথা বেশি না বললেও চলে।

জাতীয় ভাষার বিকাশ জাতিবিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতিবিকাশের প্রক্রিয়া আবার পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে জড়িত। এই দিকটি নিয়ে গবেষণা করছেন অধ্যাপক সন্‌জিভ এবং ভাষা ও উপ-ভাষার সম্পর্ক হল অধ্যাপক আভানেসভের অধ্যয়নেব বিষয়বস্তু।

আভানেসভ এঙ্গেল্‌সের "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নামক বইটিকে অবলম্বন করে অনুসন্ধান শুরু করেছেন। সমাজে শ্রেণীভেদ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হওয়ার আগের অবস্থা থেকে শুরু করে সামন্ত-যুগ পর্যন্ত ভাষার বিকাশ এবং ভাষা ও উপভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধ, সাধা-রণ ভাষার কাঠামোর ভিতর উপভাষাগুলির স্থান, উপভাষাগুলির (আঞ্চলিক) বৈশিষ্ট্যের কারণ ইত্যাদি নিয়েই প্রধানত তাঁর আলোচনা চলেছে। সমাজের কৌম (clan) ভিত্তিক কাঠামোর ভাঙন এবং উপজাতি সঙ্ঘ গড়ে ওঠা পর্যন্ত উপভাষার ভিত্তি বা ক্ষেত্র ছিল উপজাতি।

শ্রেণীভেদ এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি, জাতিসত্তা (Nationality) গঠন, শহরগুলিকে কেন্দ্র করে জনগণের স্থায়ীভাবে বসবাস ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে উপভাষাগুলি উপজাতীয় প্রকৃতি বদলে আঞ্চলিক উপভাষায় পরিণত হল।

আভানেসভ উক্ত প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখিয়েছেন যে স্লাভ জনগণের প্রাচ্য শাখাগুলির লোকেরা আঞ্চলিক ভিত্তিতে মিলে যাওয়ার ফলে তাদের পুরনো উপজাতীয় নামগুলি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। এক একটি প্রদেশের জনসমষ্টির নামকরণ হতে লাগল সেই সেই প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহরের নামে যেমন

"স্লোভেনের" বদলে "নভগরোদীয়", "ভিসাতাচি", বদলে "রিআজানি" ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে এই পরিবর্তন হঠাৎ সাধিত হয় নাই। সমাজের উপজাতিভিত্তিক কাঠামোর ভাঙন সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যান্য পরিবর্তনের ফল হিসাবেই তা ঘটেছে।

উপভাষাগুলির আঞ্চলিক প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য দানা বাঁধে সামন্তযুগে। সামন্ত-সমাজে দুই ধরনের প্রক্রিয়া দেখা যায়। একদিকে এক একটি সামন্ত এলাকা বা অঞ্চলের ভিতর পুরনো উপভাষাগুলি মিশে গিয়ে আঞ্চলিক উপভাষাতে পরিণত হতে লাগল। আবার অন্যদিকে বিভিন্ন সামন্ত-অঞ্চলের ভিতর বিচ্ছিন্নতা ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাবের দরুন উপভাষাগুলি নিজ নিজ আঞ্চলিক গণ্ডির ভিতর বদ্ধ হয়ে রইল। ফলে তাদের প্রত্যেকের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি স্থায়ী এবং পরিস্ফুট হতে লাগল।

বিকাশের পরবর্তী স্তর, অর্থাৎ জাতীয় ভাষায় পরিণতি অধ্যাপক সন্‌জিভ-এর গবেষণার বিষয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার বিকাশের ফলে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অর্থনৈতিক যোগাযোগের ঘনিষ্ঠতা, বিনিময়, ব্যবসা ইত্যাদির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ হল খুব নিবিড়। ঐক্যবোধ গড়ে উঠল। জাতিগঠনের এই পরিবেশে জাতির জনগণের বিভিন্ন অংশের ভিতর ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম জাতীয় ভাষা গড়ে ওঠে।

জাতীয় ভাষার প্রধান লক্ষণ এবং কাজ হল এই যে তা জাতির সকলের কাছে শ্রেণী-নির্বিচারে বোধগম্য হবে, বিশেষত ভাষার সেইসব দিকগুলি যা সামাজিক উৎপাদনের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়কে প্রকাশ করে। তাই এই যুগে কথ্য ভাষা ও আনুষ্ঠানিক (সরকারী কাজে ব্যবহৃত ইত্যাদি) ভাষার মধ্যে তফাত ক্রমশ কমে আসতে থাকে; কথ্যভাষাই জাতির জীবনের ও কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

সমাজ-বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই কথ্য ভাষা ও সাহিত্যের ভাষার ভিতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। সাহিত্যের ভাষার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাকে কতকগুলি নির্দিষ্ট মান অনুসরণ করে চলতে হয়।

তাছাড়া তার বিশিষ্ট লক্ষণ হল প্রকাশভঙ্গির তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা এবং শিল্পরীতির বৈচিত্র্য। কিন্তু সব সময়েই সাহিত্যের ভাষা প্রাণরস সংগ্রহ করে জীবন্ত কথ্য ভাষা থেকে। যখন সেই সংগ্রহের পথ রুদ্ধ বা ক্ষীণ হয়ে আসে তখন সাহিত্যের ভাষা তার সজীবতা হারিয়ে ফেলে।

জাতি-বিকাশের প্রক্রিয়ার পটভূমিতে সাহিত্যের ভাষার সামাজিক ভূমিকা বা কাজের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়। যে উপভাষাটি জাতীয় ভাষার আধারে পরিণত হয় তারই শিষ্ট 'কথ্যরূপ জাতীয় সাহিত্যের ভাষার আধার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় ভাষার বিশিষ্ট রূপ হিসাবে জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে সমগ্র জনগণের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদেরা জনগণের ভাষা তথা কথ্যভাষার প্রকাশভঙ্গি

সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং সে সম্বন্ধে তথ্য খাড়া করছেন। জাতীয় ভাষা ও উপভাষার পরস্পর সম্বন্ধ, সাহিত্যের ভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতি ও ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে সামগ্রিক ধারণা লাভের জন্য ঐ অনুসন্ধানের একান্ত প্রয়োজন আছে। আর কথ্যভাষার সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার উপরও তাঁরা জোর দিচ্ছেন। জাতীয় ভাষার মান ঠিক করা, কথ্যভাষা যাতে বিশেষ কথনভঙ্গি (jargon) ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের (localism) অযথা ভারে বিকৃত না হয় সেজন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রশ্ন তুলেছেন।

সাহিত্যেব ভাষা কথ্যভাষার প্রকাশভঙ্গিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। সাধারণ জাতীয় ভাষা, তার ব্যাকরণগত কাঠামো, সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র শব্দভাণ্ডারকেই সাহিত্যে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই ভাষাকে যে কাজ করতে হয় তা আরও উন্নত এবং জটিল ধরনের কাজ। সেখানে তার প্রধান ভূমিকা হল বাস্তব সামাজিক সত্যকে শিল্পরূপ দেওয়া। সাহিত্যিক তাঁর কোনো ভাবকে শিল্পসৃষ্টির সমস্ত কৌশল ও প্রতীকের মারফত রূপায়িত করে তোলেন। কাজেই তাঁর ভাষা সেই বিশেষ ভাব প্রকাশের উপযোগী হওয়া চাই। সাহিত্যের ভাষার প্রকাশভঙ্গি শিল্পীমানসের ভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সাহিত্যিকের শিল্পরীতি ও প্রকাশভঙ্গি হল প্রধানত তাঁর সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, বাস্তব সম্বন্ধে মনোভাব এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি। তাই সাহিত্যিক তথা সাহিত্যের ভাষার এই বিশেষ দিককে উপেক্ষা করা চলে না। তাহলে সমাজে সাহিত্যের যে ভূমিকা অর্থাৎ সামাজিক চেতনার একটি বিশিষ্ট সৃজনশীল অভিব্যক্তি হিসাবে কাজ করা, তাকে ছোট করে দেখা হয়। সামাজিক রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় বিষয়ে রচনা এবং সুকুমার সাহিত্যকে সেক্ষেত্রে একই পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হয়।

সামাজিক-রাজনৈতিক বা দার্শনিক ইত্যাদি চিন্তাধারাকেও একই জাতীয় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সাহিত্যের কাজ তো শুধু কোনো ভাব বা চিন্তাকে প্রকাশ করাতেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যিক বা শিল্পী বাস্তবকে সৃজনশীলভাবে উপলব্ধি করেন এবং সেই উপলব্ধিকে এমন ভঙ্গিতে রূপায়িত করেন যে পাঠকদেব অনুভূতির উপর তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সেই খানেই সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তার বিভিন্ন অঙ্গ হল যথাক্রমে শব্দ-চয়ন, শিল্প রূপায়ণের বিশেষ কায়দা, নায়ক নায়িকাদের চরিত্রগুলিকে একাধারে "টাইপের" প্রতিমূর্তি অথচ জীবন্ত ব্যক্তিত্ব হিসাবে ফুটিয়ে তোলার উপযোগী কথাবার্তা এবং ঘটনা-সমাবেশ, কথোপকথনের বহু বিচিত্র রূপ ও কথা-শিল্পের (verbal artistry) ঐশ্বর্যভাণ্ডার ইত্যাদি।

কোনো ভাষার সাহিত্যে শিল্পসৃষ্টির রীতিনীতি ও ভাষার অন্যান্য দিকের মতো ঐতিহাসিক সৃষ্টি অর্থাৎ এক পুরুষ পূর্বপুরুষের সাহিত্যিক রীতিনীতি, প্রকাশভঙ্গিকে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করে এবং এগিয়ে নিয়ে চলে। সাহিত্যের সৃষ্ট অনেক শব্দছবি, শব্দ-চয়ন ও ভাবের বিশেষ ধরনের অভিব্যক্তি কথ্যভাষার মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। এইভাবে তারা জাতীয় ভাষাবই অচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। সুতরাং শিল্পরূপায়ণেব বিভিন্ন ধরন,

আকার ও উপাদানের বিকাশের ইতিহাস আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেন না ঐগুলির মধ্যে দিয়েই সাহিত্যের নিজস্ব জাতীয় চরিত্র প্রকাশ পায়।

সাহিত্যের ভাষা ও তার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গি, শিল্পরীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পক্ষে সমার্থবাচক শব্দবিজ্ঞানের (Synonymics) উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া দরকার। একই ভাবকে কতরকমভাবে প্রকাশ করা হয় এই বিষয়টির গুরুত্ব যথেষ্ট। কেন না যে কোনো উন্নত ভাষার মধ্যে বহু ধরনের প্রকাশভঙ্গির দেখা পাওয়া যায়। সেই ভঙ্গিগুলির পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক, তাদের পরস্পরের মধ্যে বহু যোগসূত্র আছে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্র এবং কাজ এক নয় ও এক ক্ষেত্রে একটি ভাব প্রকাশের জন্য যে ভঙ্গিকে ব্যবহার করা হয় তা থেকে ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহারের চেষ্টার ফল হয় বিসদৃশ বা হাস্যকর।

কোনো জাতীয় ভাষার সমার্থবাচক শব্দ বা বাক্যাংশগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলে ভাষার জীবন্ত, সক্রিয়, বহুমুখী প্রকাশভঙ্গিগুলি ও তাদের বিকাশের নিয়ম সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে সাহায্য হয়। ঐগুলি সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি ভাবে ব্যবহৃত হয় তা না জানলে কোনো ভাষার প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়।

৭। সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলির ভাষা-বিকাশের নিয়ম।

স্বভাবতই সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদেরা এ-বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। সমাজতন্ত্রের পরিবেশে, যেখানে জাতিগত দ্বন্দ্ব ও অত্যাচারের অবসান হয়েছে সেখানে বিভিন্ন জাতির ভাষা কিভাবে বিকাশলাভ করছে এবং তাদের পরস্পরের ভিতর সম্বন্ধ কিভাবে গড়ে উঠছে সে বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র খুব বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ।

৮। ভাষার ইতিহাসঃ

ভাষাতত্ত্বের প্রধান কাজ হল ভাষা-বিকাশের নিয়ম অধ্যয়ন করা। ভাষা-বিকাশের নিয়মকে সমাজ-বিকাশের নিয়মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হিসেবে অধ্যয়ন করতে হবে সত্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমাজ-বিকাশের সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেই ভাষার বিকাশ তথা ইতিহাস সম্বন্ধে সব কিছু জানা হয়ে যাবে। ভাষা-বিকাশের নিজস্ব বিশিষ্ট নিয়ম আছে। তাই ভাষা-বিজ্ঞান সাধারণ সমাজ-বিজ্ঞানেব একটি বিশিষ্ট শাখা। সমাজ-বিকাশের সাধারণ নিয়মের সাহায্যে ভাষার ইতিহাসকে বোঝার পক্ষে সহজ হয় বটে। কিন্তু দুটোকে গুলিয়ে ফেলা আসলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শিক্ষার বিরোধী।

আবার প্রত্যেক ভাষার বিকাশের ধারার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক ভাষার অগ্রগতি হয় তার অন্তর্নিহিত নিয়ম অনুসারে। সুতরাং ভাষা-বিকাশের সাধারণ নিয়ম জানাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব নিয়ম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে চীনা, কোরীয় এবং জাপানী তিনটি ভাষারই ইতিহাসে চিত্রলিপির (hieroglyph) অসাধারণ গুরুত্ব আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত তিনটি ভাষার সুদীর্ঘ জীবনকালে কোনোটিই নিজস্ব মৌলিক পার্থক্য হারিয়ে ফেলেনি।

৯। তুলনামূলক ঐতিহাসিক (comparative-historical) পদ্ধতি।

ভাষা-বিকাশের সাধারণ নিয়ম আবার প্রত্যেক ভাষার বিকাশের নিজস্ব বা অন্তর্নিহিত নিয়মের কথা থেকে ভাষাতত্ত্বে তুলনামূলক ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এন, ওয়াই, মারের মার্কসবাদবিরোধী মতবাদ উক্ত পদ্ধতিকে বাতিল করে দিয়েছিল।

কিন্তু স্তালিন দেখিয়েছেন যে এই পদ্ধতির সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও ভাষাতত্ত্বের গবেষণার পক্ষে তার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদেরা উক্ত পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করছেন যে তার কোথায় কি ত্রুটি আছে, কোন ক্ষেত্রে তা কতখানি কার্যকরী ইত্যাদি।

১০। বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর (পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাষা) গঠন বিকাশ; বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধে নির্ণয়ের পদ্ধতি; ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের সম্পর্ক; উৎপত্তির উৎস বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা-গুলিকে বিভিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে ভাগ করা।

১১। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ধ্বনিতত্ত্বের (Phonetics) স্থান।

বর্তমানে সোবিয়েত ভাষাতত্ত্ববিদদের গবেষণা প্রধানত ভাষার ইতিহাস, বিশেষত সোবিয়েত জাতিগুলির ভাষা-বিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধানেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু অন্যান্যবিষয় যথা গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার ইতিহাস, একই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং তুলনামূলক-ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

এই আলোচনা শেষ করার আগে সোবিয়েত ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণার একটি দিকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ভাষাতত্ত্বের বেলাতেও সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার ভিত্তিতেই বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার অগ্রগতি হওয়া সম্ভব। সেই নীতিকে অবলম্বন করেই তাঁরা কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।



গবরমিন্টের দেশ

সুধীর করণ

বাঁশবনটার দিকে চাইলে, লখাই সাঁওতালের বুকটা টন্‌টন্‌ করে ওঠে।

খালি-পেটের যন্ত্রণা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু বুকের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জ্বালা-যন্ত্রণার শুরু হয়, তার কূলকিনারা খুঁজে পাওয়াই যায় না। বাঁশবনটার দিকে নজর গেলে, লখাই সাঁওতালের দেহ-মন যে কেমন হয়ে ওঠে—তা সে বলতে পারবে না। শুধু একটা অব্যক্ত, অপ্রকাশ্য বেদনার অনুভূতি। একটা হারিয়ে-যাওয়া কোনো কিছুর জন্যে অদ্ভুত একটি আকাঙ্ক্ষার আঘাত। বিলুপ্ত হয়ে যায় তার চিন্তাশক্তি। হাজার হাতুড়ির আঘাতে বুকটা যেন ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যেতে চায়। মনের জ্বালা যেন চোখ দিয়ে ফুটে উঠতে চায়। লখাই-এর মনে হয়, চোখ দিয়ে তার জল পড়বে ঝরে ঝর্ণাধারার মতো। চোখের পাতাগুলি ঘনঘন ওঠাপড়া করে দীর্ঘশ্বাসের মতো। কিন্তু একফোঁটা জলও গড়িয়ে আসে না বিশীর্ণ চক্ষুকোটর থেকে। চেষ্টা করেও কাঁদতে পারে না সে। ঘষে ঘষে চোখদুটোকে লাল করে ফেলে। চোখে যেন আগুন জ্বলছে।

বাঁশবনটা, তার লিকলিকে সবুজ কঞ্চির প্রাচুর্য নিয়ে বেড়ে উঠছে ক্রমশ। কেয়ারী দিয়ে লাগানো বেণুকুঞ্জ। নিচে শ্যামল ঘাসের আস্তরণের বুকে মাথা উঁচু করে আছে নানা রঙের ঘাসফুল। বাঁশবনটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে একটা সাইনবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে। সাইনবোর্ডের গায়ে আগে ছিল বাঙলা হরফে আর বাঙলা ভাষায় নির্দেশনামা; একপোঁচ কালি বুলিয়ে বাঙলা অক্ষরগুলোকে মুছে ফেলে, তার ওপরেই আজকাল রাষ্ট্রভাষা ফুটে উঠেছে। বিহার সরকারের রক্ষিত বনভূমি।

বনের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে লালরঙের সুদৃশ্য রাস্তা। বাঁ পাশে মাথা উঁচু করে আছে কচি আর কিশোর শালগাছ। বনের ভেতরটা পর্যন্ত ঝকমক করছে। ডানদিকে সারি করে লাগানো সেগুন আর গামার গাছের চারা। তারপরেই সযত্নরচিত বাঁশবন। রাস্তার দুপাশে তৃণভূমির সৌন্দর্য। বিহার সরকারের বনবিভাগের একটা ঘরও আছে। সেখান থাকে বনরক্ষক আর চারাগাছ তদারকের মালী। আধমাইল দূরে শুরু হয়েছে বাঙলা দেশ। বনভূমির কোল ঘেঁসে প্রসারিত বন্ধ্যাভূমি সর্বহারা হয়ে পড়ে আছে। ক্বচিৎ দু' একটা সাঁওতাল আর মাহাতোদের গ্রাম নজরে পড়ে।

লখাই সাঁওতালের ঘরের দাওয়া থেকে বাঁশবনটা দেখা যায়। বাঁশবনের বাতাস গিয়ে লাগে তার কুঁড়ে ঘরে। কতবার চেষ্টা করেছে সে বাঁশবনটার কথা ভুলে থাকতে, কিন্তু তার জো কি!

তার তিন বিঘে জমি এবং আরো কয়েকজনের জমির ওপর তৈরি হয়েছে ঐ বাঁশবন। নিজের হাতে মাটি কেটে সেই বন্ধ্যা-ভূমির বুকে ফসল ফলাবার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টাই সে না করেছিল। অব্যবহার্য পড়ো মাটির বুকে ঝপঝপ করে কোদাল চালিয়েছে সে। লাল কাঁকরের বুকে সে-আঘাত পড়েছে

ঠন্‌ঠন্‌ করে। দা, কুড়ুল দিয়ে কেটে সাফ করেছে আগাছার জঙ্গল। কাঁকর আর কুচো পাথর ভেদ করে বের করেছে বেলে মাটি। কয়েক বছরের পরিশ্রমের রক্তকণিকা যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ওই মাটির বুকে। মাটি! মাটি! সোনালী ফসলের সম্ভাবনা তার সর্বাঙ্গে!

কিন্তু একি হল!

লখাই সাঁওতাল, বুধাই সাঁওতাল, টুলা হেমরম, হারান মাঝি—এদের রক্ত-জলকরা মাটি সরকারের সম্পত্তি হল কি করে—! কি করে সেখানে তৈরি হল বাঁশবন—যেখানে মকাই হত, 'কদো' হত, বাজরা হত, এমন কি জল আট্‌কে ধানও হত!

পুরনো স্মৃতি যেন দুটো বড় বড় বীভৎস চোখ আর দশ আঙুলের তীক্ষ্ণ দীর্ঘ দশটা নখ নিয়ে বিভীষিকার মতো গ্রাস করতে আসত লখাই সাঁওতালকে।

মাত্র দশ বারটি কুঁড়ে ঘর নিয়ে একটি গ্রাম। সাঁওতাল পল্লী। এত আকালেও ঘরদোরগুলি ঝকমক করছে। ঘষে ঘষে চক্‌চকে করা হয়েছে দেওয়ালগুলিকে। 'মেয়েদের অবসর সময়ের শিল্প। লাল-কালো-হল্‌দে-সাদা মাটির বর্ণসমাবেশে একটি সহজ, অনাড়ম্বর, সরল পরিচিতি—।

তিনদিন ধরে কোথাও কোনো কাজ খুঁজে পায়নি লখাই। কেউ আর জন খাটতেও ডাকে না এ সময়টাতে। খেতখামারের কাজ শেষ হয়ে গেছে কবে। বড় বড় চাষীদের বাড়িতেও টানাটানি চলছে এই কার্তিকমাসের গোড়ার দিক-টায়। ধানকাটার মরশুম না আসা পর্যন্ত এমনি অভাব-অভিযোগের ভেতর দিয়েই কাটিয়ে দেয় অধিকাংশ লোক। জনমজুরী খেটে যারা অন্নসংস্থান করে, এ সময়টা তারা একেবারে বেকার। তাই উপোস দেওয়াটাও সয়ে এসেছে তাদের।

মহুয়া গাছের তলায় বসে খেজুরপাতার চাটাই বুনছিল লখাইর বৌ। বছর দেড়েকের একটা ছেলে ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে তারই পাশে। লখাই তার দাওয়ার এক কোণে বসে ভাবছিল ঐ বাঁশবনটার কথা—। হঠাৎ চমক ভাঙল তার—

এমুন করি বসি বসি কাটাবে? লখাইর বৌ আলগোছে একটা প্রশ্ন করে।

এ্যাঁ! লখাইর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায় একমুহূর্তে। বলেঃ আমাকে বলছিস—? তা আমি কি যাই নাই কাজ খুঁজতে? পরশু তরশু কাল—তিনদিন ধরে ঘোরাঘুরি করি নাই বড়শাল বাজারে, জয়পুরে আর কদম-ডিহিতে? কাজের সময় ডেকে লিয়ে যায় উরা, আজকাল কাজ খুঁজতে গেলে বলে—কাজ কুথা পাবি আজকাল, কি কাজ আছে খেতে-খামারে যে পাবি! করুণ একটা শব্দ করে লখাই যেন সহানুভূতির সুরেই বলে ওঠেঃ আজকাল উয়ারাই খাতে নাই পাচ্ছে তো কাজ দিবে কুথার থেকে।

লখাইর বৌ তার কালো কালো আঙুলগুলিকে তাড়াতাড়ি চালিয়ে যায় খেজুরপাতার ওপর। একটা চাটাই বুনে শেষ করতে না পারলে স্বস্তি নেই তার। কাল জয়পুরের হাটে বিক্রি করে যা দু পয়সা আসে; না হয় বাঁচবার

আর পথ নেই কোনো। লখাইর কথা শুনে জবাব দেয় না কোনো, কাজ করে যায়।

নিজের মনেই বলে যায় লখাইঃ দুটো বিঘা জমি থাকলে কি আজ এমুন দশাটা হত। সব মারি লিলেক শালারা। এত কষ্ট করি জমি বানালম,—শালা সব গেল। 'বোড়াম-থান'টাও লিয়ে লিল। দেও-দেব্‌তা কিচ্ছু মানবেক নি উয়ারা—। আমার আউশ ধানের জমিটা থাকলে কি না খাতে পাই ই সময়টাতে। শালা আমিনকে কোদালের একটা চোটে ফাঁক করি দিবার কথা ভাবিছিলম— তা ডরও লাগল। একটা মানুষ মারা কি আর এমন—

মৃদু একটা ধমক দিয়ে মাঝপথেই থামিয়ে দেয় লখাইকে তার বৌঃ উ কথা বলি আর লাভটা কি আছে। এখুন তো উ ভাবলে আর পেট ভরবে নাই।

লখাই তার জমি হারানোর কাহিনীটা বারবার সবিস্তারে বলতে চায় সবাইর কাছে। কাহিনীটা পুরোনো হয়ে গেছে অন্য সকলের কাছে। বারবার বলে খানিকটা হাল্কা হতে চায় তার মন। কিন্তু তাতে পেট ভরবে না। পেট ভরে এমন কিছুই নেই কোথাও। শুধু ওই জঙ্গলটা ছাড়া। ওই জঙ্গলের কাঠ কাটা ছাড়া। কিন্তু জঙ্গলে ঢুকতে রাজী নয় লখাই। যারা ওর জমি নিয়েছে তাদের জঙ্গলে ঢুকবে না। জমি হারিয়ে কিরা করেছিল লখাই সাঁওতাল।

ছোটো ন্যাংটা ছেলেটা ধুলো ছেড়ে মায়ের বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খিদে পেয়েছে। লখাইর বৌ তার মুখে গুঁজে দেয় একটা স্তন। চুক্‌চুক্‌ করে শব্দ হয়। কিন্তু স্তনও বুঝি শুকিয়ে গেছে অর্ধাহারে, অনাহারে। দুধের সন্ধানে ছেলেটা জোরে জোরে টান দেয় স্তনের বোঁটায়। যন্ত্রণা অনুভব করে লখাইর বৌ। তার মাতৃহৃদয় ঠেলে উপছে পড়তে চায় এক-মুঠো কান্না। নীরবে নিঃশব্দে আঙুলগুলি চালিয়ে যায়— চাটাইটা শেষ না করলে একমুঠো পান্তাভাতও জুটবে না। কিন্তু হাট তো আজ নয়, কাল। আজ কি করে চলবে? উঠোনের গাছে কয়েকটা আতা ফলেছিল। তাই সম্বল।

শালপাতার আধপোড়া বিড়ি একটা গোঁজা ছিল লখাই-র ট্যাঁকে। ধরাতে চায় সে। কিন্তু আগুনও নেই যে! আগুনের দরকারই-বা কি? বনে-বাদাড়ে একটা খরগোসের টিকিও দেখা যায় না আজকাল যে, মেরে পুড়িয়ে খাওয়া চলবে।

আগুনের খোঁজে লখাই বেরিয়ে পড়ে পাড়ার দিকে—।

মায়ের বুক ছেড়ে ছেলেটা আবার ধুলোর বুকে লুটোপুটি খায়। বাচ্চা একটা কুকুরছানা কোত্থেকে ছুটে এসে যোগ দিল তার খেলায়। একটা ধাড়ী মুরগী একপাল বাচ্চা নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে এক কণা শস্য, দু'একটা ফড়িং...

চাটাই বুনতে বুনতে দশটি বছর আগেকার একটি দিনে ফিরে যায় লখাইর বৌ। তখন তার নাম ছিল টুনি। বিয়ে হবার পর থেকে টুনি বলে কেউই ডাকেনি তাকে। সে হল লখাই-র বৌ।

পরিপূর্ণ যৌবনের আদিম দীপ্তি নিয়ে ষোড়শী টুনি সেদিনও তার বাপের বাড়ির দাওয়ায় বসে চাটাই বুনছিল। দিগন্তবিস্তৃত বন্ধুর রাঢ়ভূমির বুকে ডুলং নদীর ধারে সেদিন সে ছুটে বেড়াত আরণ্যক উন্মাদনায়। নিটোল দেহের ভাঁজে ভাঁজে মাদকতা ছিল প্রচুর।

দশ বছর আগে তার বাপের বাড়ির দাওয়ায় বসে চাটাই বুনছিল টুনি। উচ্ছল আনন্দ আর যৌবনের দীপ্তিতে সে-দিন সে ছিল চঞ্চলা হরিণীর মতো।

লখাই সাঁওতাল শিকারপর্ব শেষ করে একটা মরা খরগোস কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে ফিরছিল। সুদর্শন সাঁওতাল যুবক। একটা গান ধরেছিল সে। টুনির আজও মনে আছে গানের কয়েকটা কলি—ঃ মেয়েটি দাওয়ায় বসে বুনছো চাটাই বুঝি—।

টুনি মুচ্‌কি হেসে পা বাড়িয়েছিল ঘরের ভেতর—। লখাই সাঁওতালকে দেখে বেশ ভালো লেগেছিল তার—।

গান গাইতে গাইতে আড়চোখে তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। টুনি ঘর থেকে বেরিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিল লখাইর গমন। যেন একটি সুন্দর ডোরাকাটা বাঘের বাচ্চা এগিয়ে যাচ্ছে। চঞ্চল আর সুন্দর।

গানের শেষ কলিটা শুনে ধড়াক্ ধড়াক্ করে উঠল টুনির বুক—ঃ ও মেয়ে আড়চোখেতে চাও—, রাস্তা ছেড়ে আড়নয়নে কোথায় চলে যাও।

স্তব্ধ দুটি চোখ তুলে দূরের শালবনটার দিকে তাকাল লখাইর বৌ। সরু খেজুরপাতার ওপর তার শিল্পী-আঙুল ঘন ঘন চলাফেরা করছে। ছেলেটা কুকুরবাচ্চার গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করছে আনন্দে।

গানের শেষ কলিটা বার বার মনে পড়তে লাগল তার—, সাঁওতালী ভাষায়, —যে ভাষায় লখাই সেদিন গেয়েছিলঃ

আম্ হর্‌তে চালাকানা টেরা টেরাতে
চেদায়েম বেঙেৎ পারমেয়া।

কটাক্ষপাত করে, ওগো মেয়ে, কোথায় তুমি চললে?

ধাড়ী মুরগীটার তীব্র চিৎকারে চম্‌কে ওঠে লখাইর বৌ। ছোঁ মেরে একটা চিল বাচ্চা একটি মুরগীকে নিয়ে নীল আকাশের সীমায় পাড়ি দিয়েছে।

হায় হায় রে—,চেঁচিয়ে ওঠে লখাইর বৌ—। ছুটে যায় চাটাই ছেড়ে। ধাড়ী মুরগীর ডানার নিচে অন্য বাচ্চাগুলি তখন নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে। কঁক্ কঁক্ করে আর্তাঙ্কিত মুরগীটা তখনো তার হারানো বাচ্চাটার জন্যে চেঁচাচ্ছে।

নিজের বাচ্চাটাকে কাছে টেনে আনল সে। বুকের ওপর চেপে ধরল অকারণেই।

বেলাটা বাড়ছে ক্রমশ। মহুয়া গাছের তলাটা বেশ স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে—। উনুনে আগুন জ্বালবার জন্যে পা বাড়ায় সে। তারপর একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে ফিরে আসে অসমাপ্ত চাটাইটার কাছে। আগুন ধরিয়ে কি করবে সে?

বাচ্চাটা তখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। একটা খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে আস্তে চাপড় দেয় তার বুকে।

আবার তার খাপছাড়া মনটাকে নিবিষ্ট করে দিতে চায় চাটাই তৈরির কাজে।

মনে পড়ে যায় তার বিয়ের দিনটির কথা।

লখাইকে দেখেই তার পছন্দ হয়েছিল।

সাঁওতালদের সমাজে কন্যাহরণ করে বিয়ে করার প্রথাটি আজও টিকে আছে। যে-কোনো কন্যাকে যে-কোনো বর হরণ করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে পারে। তার জন্যে বরকে নিজের জীবন বিপন্ন করতে হয়। ধরা পড়লে মেরে মেরে আধমরা করে ছেড়ে দেওয়া হয় হরণকারীকে। ছিনিয়ে নেওয়া হয় কন্যাকে।

আজকাল একটু অন্য উপায়ে কাজটা শেষ করা হয়। বরপক্ষ এবং কন্যা-পক্ষের সম্মতি নিয়েই বর হরণ করে কন্যাকে। ধরা যাতে না পড়ে তার জন্যে আগের থেকেই ব্যবস্থা করা হয়। কনের মাথায় এক খাব্‌লা সিঁদুর লেপে দিয়ে পালিয়ে গেলেই হল। সে কনেকে অন্য কেউ আর বিয়ে করতে পারে না প্রথা অনুসারে।

লখাই কিন্তু হরণই করেছিল টুনিকে। পাহাড়পুজোর মেলায় দলবল নিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে হাজির হয়েছিল লখাই। সখীপরিবৃতা টুনিও এসেছিল মেলায়। হাজার হাজার সাঁওতাল জমেছিল। তার ভেতর থেকে টুনির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে পালিয়ে গেল লখাই। তার সখীদের আর্ত চিৎকারে সে-গাঁয়ের সাঁওতালরা যখন আসল ঘটনার কথা শুনল, তখন লখাই আর টুনি শালবনের গভীর অংশে ঢুকে গেছে। হৈ হৈ করে ছুটল কয়েকজন সাঁওতাল। কিন্তু লখাইর বন্ধুরা আটক রাখল তাদের। মারা-মারি বাধাবার উপক্রম হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত একটা মিটমাটও হয়ে গেল। টুনির বাবাকে একটা এঁড়ে বাছুর আর কুড়িটা টাকা দিয়েছিল লখাই। এটাও নিয়মের মধ্যে। কোনোদিন যদি সাঁওতাল মেয়ে তার স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্য কারুর ঘরে বউ হিসেবে যায়, সে-দিন সেই মেয়ের বাপকে ফিরিয়ে দিতে হয় তার পূর্ব-পাওনা। ব্যাপারটা সহজ আর সরলভাবেই মিটিয়ে নেয় দু'পক্ষ।

লখাই-র বৌ-র আজো মনে পড়ে—গভীর শালবনের মধ্যে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল লখাই। লজ্জায় ভয়ে টুনির সর্বাঙ্গ থেকে

একটা খেত! কিন্তু খেত কোথায়? কোথায় জমি?

মাটি কেটে, জন খেটে, চাষীগৃহস্থদের বাড়িতে আর খেতেখামারে কাজ করে লখাই আর লখাইর বৌ সংসারযাত্রা নির্বাহ করছিল সেদিন, আজও করে। আপন খেত তাদের আর হয়নি। শুধু বছর বছর যেন আকাল পড়ছে বেশি করে। সাঁওতালী নাচের মধুছন্দটুকুও যেন ভুলে গেছে লখাই-র বৌ। চাঁদনীরাতেও পা আর উঠতে চায় না।

আর দুটো সরু পাটি বুনলেই চাটাইটা বোনা হয়ে যায়।

জয়পুরের হাটে বিক্রি করে কমপক্ষে টাকা দেড়েকও যদি পাওয়া যায়, তাহলেও দিন দুয়েকের অর্ধাহারের খরচটা ওঠানো যাবে।

অসমাপ্ত চাটাইটার ওপর মনোনিবেশ করে লখাই-র বৌ।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, পরনের গামছার খুঁটে আধসেরটাক চাল বেঁধে ফিরে আসে লখাই।

এই লাও চাল।

কুথায় পেলে চাল? বুধাইর ঘরে? উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লখাই-র বৌ।

হুঁ। গম্ভীরভাবে জবাব দেয় লখাই—।

হল কি উয়ার—লখাইর বৌ অবাক হয়ে যায়। চাল পেয়েও লোকটার মনে সুখ নাই যে—। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দুটি লখাই-র দিকে তুলে ধরে সে।

আধবোনা চাটাইটার ওপর বৌ-এর পাশেই বসে পড়ে লখাই, হাহাকার করে বলে, কিরা করছিলাম, কিরা রাখতে পারলাম নাই!

কাঠ কাটতে যাবি তাহলে? উৎসুকভাবে জিগ্যেস করে লখাই-র বৌ। কারণ কাঠটা সত্যিই এখন ওদের ভরসা।

হুঁ। ভাঙা গলায় বলে লখাই। উয়ারা চুরি করে কাঠ কাটে জঙ্গলে। আর টাকায় দশটা করে শাল 'রলা' বিক্রি করে আসে বড়শাল বাজারে।

কোনো কথা বলে না লখাই-র বৌ। মুখটা নিচু করে চালগুলো কুড়োতে থাকে চাটাইর ওপর থেকে।

উয়াদের জঙ্গলে ঢুকবো নাই বলে কিরা খাইছিলম। চুরি করতে গেলেও তো ঢুকা-ই হবেক। আপন মনে বলে যায় লখাই—। শালারা আমার জমি লিয়ে বাঁশবন করেছে। উহাদের মাথাটা তো ছিঁড়ে লেওয়া উচিত ছিল। তোর জন্যেই তো করি নাই সে কাজ। তুই যদি মানা নাই করতিস্, তাহলে শালা আমিনের—।

একশো টাকা দিবি? জমিটাকে জঙ্গলের শামিল নাই করব। আমরা শালা গা-গতর দিয়ে খাটলম, মাটি কাটলম, বন কাটলম, 'ডাহি জায়গাকে জমি করলম, আর উয়াদের দিতে হবে টাকা। আর দিতমই বা কুথার থেকে—! তোদের জঙ্গল কেটে তো আর জমি করি নাই। পড়া-মাঠ কেটে জমি করেছি।

দূরের বাঁশবনটার দিকে তাকিয়ে থাকে লখাই। টাকা ঘুষ দিতে পারেনি বলে লখাই, বুধাই এবং আরো কয়েকজনের জমিকে আমিন হরদৎ সিং রিজার্ভ ফরেস্টের ম্যাপে 'জঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত এলাকা' বলে চিহ্নিত করে গেছে। সেই জমির ওপর লাগানো হয়েছে সরকারী বাঁশের চারা।

ঝুপ্‌ঝুপ করে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর রাত। চাঁদ উঠতে ঢের দেরী এখনো। কাঁধে এক একটা কুড়ুল ফেলে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চলেছে লখাই, বুধাই, হারান, নারান আর সোনা সাঁওতাল।

মাঠের পথ দিয়ে একটু ঘুরে জঙ্গলে ঢুকবে ওরা।

ফিসফিস্ করে বলে লখাইঃ শেষতক্ উয়াদের জঙ্গলেই ঢুকতে হল! চোর হলাম শেষতক্!

—সাধে কি আর চোর হলম। খাতে দিবেক আমাদের উয়ারা? জমি কারি লিলেক, জঙ্গলে ঢুকে একটা পাতাও তুলতে নাই দিবেক আইন কল্লেক—, আমরা শালা খাতে নাই পাচ্ছি—,কাজকাম নাই জুটছে—। বুধাই মৃদুস্বরে, যেন অভিযোগ জানায়।

হ', তাতো বটে। লখাই আর কথা খুঁজে পায় না। কাঠচুরির কাজটা কিন্তু তার ভালো মনে হচ্ছে না। এতদিন পর্যন্ত জঙ্গলেই ঢোকেনি সে। দারুণ ঘৃণায় একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলঃ গবরমেটের জঙ্গলে নাই ঢুকব। শালারা জমি লিছে—,নাই ছুঁব উয়াদের জিনিস।

অবশ্য আইনতই, জঙ্গলে ঢুকে একটা পাতা তোলাও নিষিদ্ধ।

মাত্র দু' কোপেই এক একটা কিশোর শালগাছ ভেঙে পড়ছে। যথাসম্ভব আস্তে আস্তেই কোপ দিচ্ছে ওরা, যাতে শব্দটা বেশিদূরে না পৌঁছুতে পারে।

প্রত্যেকেই কাটল সাত-আটটা করে। তারপর সেইখানে বসে ছালগুলো ছাড়িয়ে ফেলল সবাই। জংলী লতা দিয়ে বেঁধে এক একটা লম্বা বোঝা তৈরি হল।

চল ইবার। জঙ্গলটা পেরিয়ে সদর রাস্তা। সদর রাস্তার একপাশ দিয়ে সরু পথ। সেই পথ দিয়েই এগিয়ে চলল ওরা।

পায়ের চাপে বালিভরা রাস্তার ওপর খস্ খস্ করে শব্দ হচ্ছে।

কোন হ্যায়! খাঁড়া রহো। কর্কশ একটা আদেশের সুর, সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঝল্‌সানো টর্চের আলো এসে পড়ল দলটার ওপর।

মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। লখাই-র বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগল, ঠিক যেন গাছের ওপর কুড়ুল মারার শব্দ।

না, আর সময় নেই। ওরা এগিয়ে আসছে। জন পাঁচেক লোক—, খাকি পোশাকপরা ঝুপ্‌ঝুপ্ করে কাঠের বোঝাগুলো ফেলে দিয়ে কে-যে কোন্ দিকে ছুটল তার ঠিকানা নেই।

ধরা পড়ে গেল লখাই। পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। উঠবার আগেই দু' তিনজন বনরক্ষক এসে জাপটে ধরল তাকে।

শালা—চোট্টা। গর্জন করে ওঠে ফরেস্টার দীপনারায়ণ সিন্‌হা।

ফরেস্টার সেই দিন বিকেলের দিকেই তার অফিস থেকে পেঁাছেছে এখানে। মাঝে মাঝে এসে দেখাশুনা করে যায় বনবিভাগের কাজকর্ম। পরিদর্শন করে যায় সযত্নরচিত বেণুকুঞ্জ।

লে চলো শালাকো। গর্জন করে ওঠে ফরেস্টার সিন্‌হা।

লখাইকে আটকে রাখা হয় গোটারাত ধরে পিঠমোড়া করে বেঁধে। সঙ্গী-সাথীদের নাম বলতে রাজী হয়নি বলে মারও সহ্য করেছে অনেক।

ভোরের দিকে একজন বনরক্ষক এসে যথেষ্ট সহানুভূতি জানায় তাকে। লখাই-র ইচ্ছে হয়, কেঁদে ফেলে। কিন্তু না, কাঁদে না সে।

ফিস্ ফিস্ করে বলে বনরক্ষক—শ' খানিক টাকা যদি দিতে পারিস তো বল্। ফরেস্টার বাবু দয়ালু লোক। ছেড়ে দিতে পারেন—। না হয় বুঝলি তো, তিনটি মাস জেল হয়ে যাবে নির্ঘাত! ঘানি টানতে টানতে দিন যাবে—।

টাকা? অবাক্ হয়ে যায় লখাই—

হ্যাঁ হে, টাকা, মাত্র একশো টাকা—

খাতে পাচ্ছি নাই, টাকা কুথার থেকে আনব—

—তা তোর ইচ্ছা। তোর ভালোর জন্যই বলছিলাম। উঠে যায় বন-রক্ষক।

ভেবে চিন্তে কূলকিনারা খুঁজে পায় না লখাই। মানুষ জাতটারই ওপর যেন বিতৃষ্ণা জন্মে যায়, তার। লখাই চুপ করে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

বনরক্ষকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ফেলে লখাইঃ একশো টাকা দিব আমরা। ছাড়ি দে।

দিবি একশো টাকা?

হাঁ দিব। বাকি আজ নাই পারব। দু'দিন সময় দিতে হবেক। গরু-বাছুর, বিক্রি করি দিব।

ফরেস্টারের অনুমতি নিয়ে ছেড়ে দেয় লখাইকে। বনরক্ষক বলেঃ একটা দিন সময় পাবি। কাল সকালে দিতে হবে টাকা। সাহেব না হয় মানবে না। কাল সকালে টাকা দিয়ে যাবি তোরা, আর কানমলে যাবি নিজেদের, নাকে খত দিয়ে যাবি—বুঝলি। তোদের নাম ধাম তো লেখাই থাকল। পালিয়ে বাঁচবি কি করে? শমন জারী করে কোর্টে হজির করাবো।

হ' দিব। লখাইকে ছেড়ে দেয় ওরা—।

বাড়ি পেঁাছেই লখাই দেখে, বুধাই, নারান কেউ নেই বাড়িতে।

লখাই-র বৌ বলে—ছাড়ি দিল তুমাকে? উয়ারা পালাইছে। উধারের জঙ্গলে লুকাই আছে।

সন্ধের সময় আঁধারে গা-ঢেকে চুপি চুপি ফিরে আসে বুধাই, নারান, সোনা-রা।

তুকে ছাড়ি দিল। উৎসুক প্রশ্ন করে ওরা। গম্ভীরভাবে জবাব দেয়

লখাইঃ আজ রাতেই পালাতে হবেক। কাল সকালে উয়াদেরকে একশ' টাকা দেওয়ার কথা। কুথা পাব? আজই পালাব।

ঘর দুয়ার ছেড়ে? আর আসব নাই? বুধাই বলে।

কি হবে এসে? গবরমেটের দেশে নাই থাকব আর। আজ রাতেই চল পালাই। না হয় কাল সকালে জিহলে যেতে হবে। জিহল থেকে ফিরলে কি কাজকাম কেউ দিবে আমাদের? দাগী চোর বলবে।

কিন্তুক যাব কুথা। সব্ দিকে তো গবরমিট আছে।

যিখানে গবরমিণ্ট নাই, উইখানে যাবো। খুঁজে খুঁজে যাতে হবে।

রাতের অন্ধকারে পুঁট্লি পোঁটলা ঝুলিয়ে ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বুক শূন্য করে এগিয়ে যায় একটি দল। দশ বারোটি কুঁড়ে ঘর খাঁ খাঁ করতে থাকে। নয়া উদ্বাস্তুর দল খড়্গপুরে গিয়ে ট্রেন ধরবে। ঠিকানাহীন পথের বুকে পদচিহ্ন এঁকে যায় তারা। গোটারাত হেঁটে খড়্গপুরে যখন পোঁছুল, তখন ভোর হয়েছে। সাম্নে তাদের, লাল সূর্য। সিং বোঙা।

সে-দিন সকালে দু'জন বনরক্ষক গ্রামে এসে দেখল, কুঁড়ে ঘরগুলো খাঁ খাঁ করছে। ঘরের ভেতর উঁকি দিতেই কয়েকটা মুরগী পালিয়ে গেল ছুটে।

শালারা পালিয়েছে—বনরক্ষক বলে।

যাবার সময় একজন একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে ছুঁড়ে দেয় খড়ো চালের ওপর।



বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

॥ ১ ॥

'দেবী চৌধুরাণী' বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও ছেপে প্রকাশ করেননি; কেননা, ইংরেজরা তো 'বহুবিবাহ পছন্দ করিবে না'।* উক্তিটি সামান্য, কিন্তু এর মধ্যেই বঙ্কিম-চন্দ্রের সামাজিক দৃষ্টি তথা শিল্পী-মানসেরও পরিচয় বিধৃত রয়েছে।

'দেবী চৌধুরাণী' বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা। সুতরাং এ-গ্রন্থের বিশ্লেষণে লেখকের শ্রেণী-চেতনা তথা শিল্পী হিসেবে তাঁর ভূমিকা নির্ধারণ নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে। উপন্যাসের নায়িকা প্রফুল্ল স্বামিপরিত্যক্তা; ঘটনাচক্রে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হন এবং ভবানী পাঠকের নজরে পড়েন—সেই থেকেই তাঁর জীবনে দেবী চৌধুরাণী অধ্যায়ের সূত্রপাত। লোকশ্রুতিতে দেবী চৌধুরাণী 'ডাকাইত' কিন্তু লেখকের ব্যাখ্যানুযায়ী তিনি দাত্রী-মাত্র—দেবীত্ব তাঁর 'দেবীরাণীর দোকানদারি'। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের জন্যেই ভবানী পাঠকের শিক্ষামত দেবীরাণী নিষ্কাম ধর্মের ব্রত গ্রহণ করেছেন। পরে প্রমাণ পাওয়া গেছে ভবানী পাঠকের শিক্ষা প্রফুল্লকে পরিচালিত করেছে বটে, কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীরে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। তাই দেবী আবার নতুন বৌ হয়ে ব্রজেশ্বরের বাড়ির পুকুরঘাটে বাসন মাজতে গেছেন—নিষ্কাম ধর্মসাধনার প্রীতিমন্ত্রে সতীনদের চিত্ত জয় করেছেন। অর্থাৎ সমগ্র উপন্যাসটির মূল বক্তব্য—পতিযুক্তা নারীর সংসারই বিধেয়—প্রচলিত বিশুদ্ধ হিন্দু নারীর জীবন-ধারণারই শিল্পসম্মত প্রতিষ্ঠা।

পরিশেষে লেখক যে প্রফুল্লকে কৃষ্ণের সঙ্গে এক করে দেখেছেন, সেটুকু মূল উপন্যাস থেকে অনায়াসে বাদ দিয়ে বিচার করা চলে। কেননা, প্রফুল্লের অবতারত্বের চেয়ে তাঁর মানবীত্বই বেশি পরিস্ফুট, এবং সেজন্যেই তাঁর চরিত্র আমাদের আকর্ষণ করে।

এখন প্রফুল্ল-চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। দেবী চৌধুরাণীর সমগ্র পরিকল্পনাই যে-কোনো ফিউডাল দয়াবতী রাণীর আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজাসাধারণের আত্মাবলম্বী হওয়ার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি, কেবল মুক্তহস্তে দান করে তাদের অভাব মেটাতে চেয়েছেন। এই নীতি অবলম্বন করে লক্ষ কুবেরের ধন বিতরণ করলেও কোনো দেশের গরিব প্রজাসাধারণের আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তিনি কোনোদিন জনজীবনের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সংযোগ রাখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। রঙ্গলাল, নিশি, দিবা বা অন্য অনুচর-অনুচরীদের মারফত পরোক্ষতও যে দেবী রাণী প্রজাদের দুঃখদুর্দশার সংবাদ রাখতেন এমন ইঙ্গিত দেওয়া গ্রন্থ-কারের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তাদের কারুর ব্যক্তিগত দৈন্যে তাঁর হৃদয় সমবেদনায় আলোড়িত হতে দেখা যায়নি—দয়ার দানেই তাঁর একমাত্র পরিচয়।

---

* সুরেশ সমাজপতির কাছে বঙ্কিমের উক্তি।

এ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়ের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, ভবানী পাঠকই প্রথম দেখালেন **'উপযুক্ত গুণ** থাকিলে নেতা যে-কোনো শ্রেণী হইতে আসিতে পারেন, এমন কি নারী হইলেও আটকায় না। বঙ্কিমের যুগের পক্ষে এই ভবিষ্যদ্‌দর্শিতা বিস্ময়কর'। অর্থাৎ যে-কোনো জন-আন্দোলনের পক্ষে যে নেতৃত্বের শিক্ষা অপরিহার্য, শ্রদ্ধেয় সমালোচকের ধারণানুসারে বঙ্কিমচন্দ্র এ-উপন্যাসে সেইদিকে আলোকপাত করেছেন।

মার্কসবাদ অনুযায়ী সার্থক নেতৃত্বের শিক্ষা হয় তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ে। মনে হতে পারে, প্রফুল্ল তত্ত্বগত জ্ঞানের জন্যে যেমন যোগদর্শন ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতালাভের জন্য ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্কাম ধর্মের শিক্ষাগুলিকে প্রয়োগ করেছিলেন—তা-ই বুঝি মার্কসীয় সমাজকর্মীর আদর্শ। তাই শ্রীযুক্ত রায়ের মতো 'প্রকৃত মার্কসবাদী'-ও অধীর হয়ে উঠেছেনঃ 'প্রায় সত্তর বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র নেতৃত্বের শিক্ষার যে উচ্চ আদর্শ দেশের কর্মীদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণে আমাদের দেশের মার্কসবাদী নেতারা মার্কসীয় বিজ্ঞান সেইভাবে আয়ত্ত করিলে দেশের বর্তমান দুরবস্থার অবসান হইত, চীন দেশের উদাহরণের পর তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।'

কিন্তু এখানেও গোড়ায় গলদ। ভালো করে অনুধাবন করলেই স্পষ্ট হবে যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেন যে প্রফুল্লকে ভবানী পাঠকের 'উপযুক্ত পাত্র' (পাত্রী?) বলে মনে হল তার **কোনো** কারণ পাওয়া যায় না। পূর্ব-পরিচয় না জেনেই ভবানী পাঠকের প্রফুল্লকে দেবীরাণী করে গড়ে তোলা উচিত হয়েছে কি?

লেখক বলেছেন, দেবীরাণী ডাকাইত নয়, কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক ছাপ দিতেও তিনি সমর্থ হননি। ব্যক্তিগত জীবনে স্বামিপরিত্যক্তা বলেই ভবানী পাঠকের আরোপিত আদর্শকে না অনুসরণ করে তাঁর উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁর প্রজাপালনের মূলে রয়েছে ব্যর্থপত্নীত্বের অসহায় অবস্থা, নারীমনের আন্তরিক দরদ নয়। শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন সম্বন্ধেও দেবীর কোনো সত্যিকারের বলিষ্ঠ কল্পনা নেই। (পাঠক মহাশয়েরও ছিল না)। শ্বশুর, স্বামী, সতীন ইত্যাদির প্রতি ব্যক্তিগত কর্তব্যের কাছে সমষ্টির দাবিকে তুচ্ছ করা হয়েছে। দৈবের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এবং নিশ্চিত নির্ভরেই প্রমাণিত হয় যে দেবীর নেত্রী-বুদ্ধি কুসংস্কারের দাসী।

এসব ছাড়াও অভিযোগ আছে। আন্দোলনে নীতির ভুল হতে পারে; কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর কাছে ধরা দেওয়ার মধ্যে কোনো রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই ('ভবিষ্যদ্‌দর্শিতা বিস্ময়কর'?) আভাস নেই। ভবানী পাঠকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির চরমপন্থী নেতারা পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করলেই কি যথার্থ কাজ হত?

দেবীরাণীকে নেত্রীপদে অধিষ্ঠিত করার কারণস্বরূপ ভবানী পাঠক বলেছেনঃ **'বিশেষ** এত ধন কোন পুরুষের নাই। ধনের ধার বড় ধার'। জানিনে, নীরেন বাবুর মতেও 'ধনের ধার'-ই প্রফুল্লর নেত্রী হবার 'উপযুক্ত গুণ' কিনা।

সুতরাং দেখা গেল, দেবী চৌধুরাণীর মূল প্রতিপাদ্যঃ (১) গতানুগতিক

হিন্দু ধারণা—নারী-জীবনে পতিই দেবতা, ব্রজেশ্বরে ও বৈকুণ্ঠেশ্বরে কোনো ভেদ নেই; (২) বহুবিবাহের দার্শনিক সমর্থন—নিষ্কাম কর্মযোগিনী প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে বলেছে, 'আমায় যেমন ভালোবাস, উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালোবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি'। এবং দুটি প্রতিপাদ্যবিষয়ই যে সামন্তবাদী জীবনধারার অঙ্গ সে-বিষয়ে বিশেষোক্তি বাহুল্য। বঙ্কিমের শিল্পীমানসে সামন্তবাদী জীবন-চেতনার সঙ্গে ধনবাদী চেতনার একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল একথা যেমন সত্য, তেমনি এও সমান সত্য যে **বিকাশোন্মুখ ধনবাদী চেতনাকে দুর্বলতার মতো পরিহার করার দিকেই তাঁর মূল প্রবণতা ছিল।** সমগ্র সাহিত্যসাধনাতেও বঙ্কিম এই প্রবণতাকেই সচেতনভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ ছাড়া)।

॥ ২ ॥

বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৬৪-৬৫ সালে। এ-সম্বন্ধে নীরেন্দ্রনাথ রায় ঠিকই বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের মানসে প্রতিভাত হইয়াছিল নূতন ধনবাদী সমাজচেতনার একটি অবশ্যম্ভাবী দিক—নারীর স্বাধিকার তাহার প্রেমাস্পদকে নির্বাচন করিবার—শুধুমাত্র তাহার অন্তরের তাগিদে'। আয়েষার উক্তিঃ 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'—সত্যিই সেকালের পাঠকমনকে আন্দোলিত করেছিল। মুসলমান দুর্গরক্ষকের কন্যা হয়ে বন্দী হিন্দু রাজপুত্রকে প্রকাশ্যে প্রেমিক বলে স্বীকার করা যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচায়ক। জগৎসিংহকে ঘোড়াদান এবং তার বদলে শাস্তিগ্রহণে স্বীকৃতিও এই স্বাধিকার ঘোষণারই প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর। পিতা কতলু খাঁর প্রতি আয়েষার স্নেহ কিছু কম নয়—কতলুর মৃত্যুশয্যায় তার সম্যক পরিচয় মেলে, কিন্তু প্রণয়াস্পদের নিরাপত্তার জন্যে পিতৃদ্রোহিনী হতেও তিনি দ্বিধা করেননি।

তিলোত্তমার কাছে শেষ বিদায়ের দৃশ্যটির কারুণ্য যেকোনো সংবেদনশীল পাঠকের চিত্তকে আজো দ্রবীভূত করে। কুশলী লেখক হীরকাঙ্গুরীয় লেহনে আয়েষার জীবনাবসান করেননি। তার ব্যর্থ জীবনের নিশ্চুপ শান্ত প্রতীক্ষা আমাদের মনের গভীরে সামাজিক বিধির অচলায়তনের নির্মমতাকে পরিপূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করে দেখায়।

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর 'যুগান্তকারী ভূমিকা' স্বীকার করেও একথা স্বীকার করা যায় না যে, এ-গ্রন্থেই 'নারীর ব্যক্তিস্বরূপ প্রথম কথা কহিয়া উঠিল'।

কেননা, ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস—'অঙ্গুরী-বিনিময়' এর অন্তর্ভুক্ত কাহিনী। ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে ভূদেব যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ হয়েও মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী ও আওরঙ্‌জেবের নীরস দ্বন্দ্বকাহিনীর অবকাশে রোসিনারা-শিবাজীর যে পূর্বরাগ এবং প্রেমনিবেদন বর্ণনা করেছেন তা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব কল্পনাশক্তির পরিচায়ক।

রোসিনারা এবং আয়েষা উভয়েরই কারুণ্য শিল্পশ্রীসম্মত হয়েছে তাই উভয়েরই ব্যর্থ নারীজীবনের কাহিনী সমাজের স্মার্তদের কাছে একটা বিরাট

সামাজিক প্রশ্নকেই তীব্রভাবে তুলে ধরেছে। মৃত্যুশয্যায় অস্ফুটোক্তির মধ্যে কতলু কন্যার এই স্বাধীন প্রেমকে অঙ্গীকার করেছেন। অঙ্গুরি-বিনিময় কাহিনীতেও অনুরূপভাবে লক্ষ্য করা যায় পিতামহ শাজাহানের সমর্থন। ধর্ম, স্বজাতি সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শিবাজী যখন ছদ্মবেশিনী বারবনিতাকে দূতী করে রোসিনারার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন রোসিনারা বলেছে, 'আমার কি যাওয়া উচিত হয়?' শাজাহান উত্তর দিয়েছেন, 'কিসে অনুচিত? সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়াবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এ পর্যন্ত আসিয়া ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে. এখানে তুমি এমন কি সুখে আছ যে যাইতে অনিচ্ছা হয়'। ধনবাদী চেতনায় উন্মেষিত সে-যুগের অগ্রস্রিয়মান বাঙালীরই মনন-চিন্তনের ধারার বাহক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন শাজাহান। আয়েষার মতো রোসিনারাও প্রকাশ্যে তাঁর প্রণয়কে ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এমনকি সেজন্যে বন্দিনী-জীবনের নিগ্রহও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। শিবাজীকে লিখিত পত্রে রোসিনারা স্পষ্টই বলেছে, 'তুমিই আমার স্বামী!'

ইতিপূর্বেও নারীর স্বাধিকার ঘোষণার প্রচেষ্টা রোসিনারা চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। বন্দিনী অবস্থায় সে একটি পারসিক কবিতার অনুবাদ করে শিবাজীকে শুনিয়েছে—"গুরুজনের অসম্মত কর্ম পরিণামে মঙ্গলাবহ নহে' কিন্তু তাহার কোন উপায় হইলে উভয়েই সুখী হই।" নারীর প্রণয়সঞ্জাত হৃদয়াবেগই এখানে পারসিক কবি-প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত হয়েছে।

ললিতমোহন ঘোষের 'অচলবাসিনী' ('৭৫) ভূদেব-বঙ্কিমেরই ব্যর্থ অনুকরণ। বাংলা-সাহিত্যে তখন যে এই ধর্মবন্ধনবিমুক্ত প্রেম যথেষ্ট আন্দোলন জাগিয়েছিল তার মূলে রয়েছে সদ্য উন্মেষিত ধনবাদী সমাজচেতনা। দুর্গেশ-নন্দিনীতে বঙ্কিম নিঃসন্দেহে ধনবাদী সমাজচেতনারই শ্রেষ্ঠ প্রতিভূরূপে উপস্থিত; কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যে আর দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটেনি। কেবলমাত্র হৃদয়ের দাবির ওপরেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা—দুর্গেশনন্দিনীর এই সুর পরবর্তী আর কোনো উপন্যাসেই ক্ষীণতমভাবেও প্রতিধ্বনিত হয়নি। ধর্ম ও প্রেমের প্রতিকূলতায় ধর্মের অন্তর্নিহিত নির্মমতাকে এমনভাবে আর কোথাও দেখানো হয়নি। 'মৃণালিনী'-তে স্পষ্টই বলা হয়েছে—প্রেম মহৎ, কিন্তু ধর্ম মহত্তর। 'ধর্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে'। দুর্গেশনন্দিনীর একেবারে বিপরীত সুর। এই সুরেই বঙ্কিম তাঁর প্রতিভার 'বীণাযন্ত্রে' একটির পর একটি তার যোজনা করে গেছেন পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে। দুর্গেশনন্দিনীর ধারা বঙ্কিমের মানসিক গঠনের অনুরূপ নয়—তাই পরে আর এমনতর কাহিনী-বিন্যাস অনুসৃত হয়নি। এ-সত্ত্বেও তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টিকে ধনবাদী চেতনার সার্থক প্রতিফলন বলা চলে কি?

'কপালকুণ্ডলা'-য় নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা দুটি ভিন্ন পরিবেশের নর-নারী। কপালকুণ্ডলা প্রচলিত সমাজবন্ধন থেকে দূরে নির্জন দ্বীপে লালিতা ও বর্ধিতা। তাই বিবাহমন্ত্র তার কাছে তাৎপর্যহীন। নবকুমার সামন্ত-তন্ত্রীয় সমাজ-পরিবেশের মানুষ, তাই কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তাঁর কোথায় যেন একটা ব্যবধান রয়েছে—সহজভাবে কখনোই তিনি কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই অবিশ্বাস, সংশয় সর্বদাই তাঁর চিত্তকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে।

অজ্ঞাতকুলশীলা কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ এবং স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদাদানের মধ্যে যে সামন্তবাদ-বিরোধী জীবনচেতনার আভাস রয়েছে তার প্রকৃত কারণ অন্য। নবচেতনায় অনুপ্রাণিত feudal hero নবকুমারের ব্যক্তিগত ঔদার্য-ই এর কারণ, পরের জন্যে কাষ্ঠ-আহরণে যার সূচনা, কপালকুণ্ডলা-গ্রহণে তারই যথার্থ পরিণতি।

তথাপি উপন্যাসের পরিণামে ধনবাদী সমাজচেতনারই বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রীয় সমাজে নারীর প্রেমের সম্যক স্বীকৃতি অসম্ভব। তাই নায়িকাকে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করতে হল। এ-সমাজ তাকে ঠাঁই দিতে পারল না। সুতরাং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে 'শান্ত প্রতিবাদ' কপালকুণ্ডলা দেখিয়েছে, উনিশ শতকের অপরিণত ধনবাদী চেতনার পক্ষে তা বৈপ্লবিক বিরোধিতারই সমান।

কিন্তু নীরেনবাবু বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টির ক্রমিক বিশ্লেষণে **নতুন সমাজচেতনার যে ধারাবাহিক পরিণতি** লক্ষ্য করেছেন, আমার ধারণায় তা বিদগ্ধ সমালোচকের স্ব-কল্পিত। অন্য কথায়, দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলায় যে প্রগতিশীল উপাদান প্রাপ্তব্য, তার কারণ বঙ্কিমের শিল্পপ্রেরণা তখনও যুগ-চেতনার সার্থক প্রতিনিধিরূপেই উপস্থিত—অন্তরপ্রোথিত সামন্তবাদী সংস্কারগুলির কাছে পরাভব মানেনি। দুই বিপরীত-মুখী সভ্যতার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ধনবাদী চেতনা **স্থায়ী অভিনন্দন** লাভ করতে পারেনি। ১৮৬৪-'৮৮ পর্যন্ত তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি* অনুধাবন করলেই একথা স্পষ্ট হবে।

'ধনবাদী সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দ্রুত পরিবর্তনশীল বলিয়া তাহার সাংস্কৃতিক উপরিতলেও ঘন ঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়' (নীরেন্দ্রনাথ রায়)। আমারও ঠিক তাই বক্তব্য। '৬৪ থেকে '৮৮-এর মধ্যে ধনবাদী চেতনা যথা-সম্ভব পরিপক্ক হয়েছে—সামন্তবাদী ধারণার সঙ্গে সংগ্রামে সর্বত্র অপ্রতিহত-ভাবে তার জয় না হলেও মোটামুটিভাবে তার যে সর্বতোমুখী প্রসার ঘটেছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। অথচ চোখের সামনে ঘটমান এই বাস্তব ব্যাপার বঙ্কিম-মানসে সমর্থনসূচক সাড়া জাগাতে পারেনি। উপরন্তু প্রগতি-শীল ধারার পরিপন্থী যে নব্যহিন্দুবাদী আন্দোলন তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বঙ্কিমের মন ক্রমশ সেদিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলন ধর্ম—এই সব নামের অন্তর্গত বিষয়বস্তু এবং মীমাংসায় কোনো নতুনত্বই নেই, প্রচলিত সামন্তীয় সংস্কারগুলিকেই তিনি মেনে নিয়েছেন। কোনো কোনো জায়গায় শশধর তর্কচূড়ামণি-অক্ষয় সরকারের মতো (তাঁদের মতে টিকি শরীরের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র)-বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন সেইসব সংস্কারগুলির সমর্থনে (যেমন চন্দ্রশেখর, সীতারামে); আবার কখনো তিনি প্রগতিশীল চিন্তাবিদ্‌দের পদ্ধতি অনুযায়ী পুরনো রীতি-নীতি-বিশ্বাসগুলিকে rationalize করার চেষ্টা করেছেন (যেমন রজনীতে)। কিন্তু অধিকাংশস্থানেই এই উদ্দেশ্যমূলক rationalization হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---

* ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলনধর্ম বা অন্য প্রবন্ধগ্রন্থ আমি এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি। কিন্তু 'কমলাকান্তের দপ্তর'-কে 'রূপসৃষ্টি নহে' বলে বাতিল করে দিতে আমি নারাজ।

'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস। দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলার চেয়ে এ-গ্রন্থে লেখক ঘটনাবিন্যাসে, কাহিনীগ্রন্থনে, ভাষায় ও অন্যবিধ আঙ্গিকের ব্যবহারে উন্নত শ্রেণীর ঔপন্যাসিকবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাই পূর্বরচিত গ্রন্থ অপেক্ষা মৃণালিনীতে তাঁর নিজস্ব শিল্পনীতিরও সম্যক প্রতিফলন পড়েছে।

নায়ক হেমচন্দ্র হিন্দু, মৃণালিনী বৌদ্ধ। সমাজ-অনুশাসন এবং গুরুজনবচন অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে প্রণয় নিষিদ্ধ। এই সামাজিক ব্যবধানটুকুকে অবলম্বন করে অনায়াসেই বিবাহ ও প্রেম সম্পর্কিত ব্যাপারে লেখক অগ্রগামী মনের চিহ্ন রাখতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে-পথে কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ না করে পারেননি। তিনি স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন যে, নরনারীর প্রণয় সমাজঅনুশাসনের অধীন নয়। বহুদূরে রাষ্ট্রনৈতিক কাজে লিপ্ত থেকেও হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে বিস্মৃত হননি। মাধবাচার্যের সকল প্রয়াস ব্যর্থই হয়েছে। মৃণালিনীও সকল বিপদ হেলায় তুচ্ছ করে দেশে-বিদেশে তাঁর প্রণয়াস্পদকেই অনুসরণ করেছেন। এমনকি লেখক এ-উপন্যাসে প্রেমের কোনো লীলাচাপল্যকেই দেখাতে কার্পণ্য করেননি। বাপীতটে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের চুম্বন পর্যন্ত এ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু পরে জানা গেছে তারা পরস্পর বিবাহিত—অর্থাৎ হেমচন্দ্র-মৃণালিনী স্বামী-স্ত্রী; এবং যথারীতি সম্প্রদান করেই তাদের বিবাহ হয়েছিল —সুতরাং গান্ধর্ব বিবাহ নয় (তাহলে তো তবু কিছুটা নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিমনের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হত! অথচ গ্রন্থে সেইরকমই উল্লেখ আছে)।

বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর পারস্পরিক প্রণয়ের সব উপসর্গকেই স্বীকার করেছেন—কিন্তু সে-স্বীকৃতি শর্তাধীন। তাঁর ধারণানুযায়ী প্রেম দাম্পত্যগণ্ডি বহির্ভূত নয়। বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রেমের অনুরাগ-বিরাগ সর্বত্রই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। হেমচন্দ্র, ব্রজেশ্বর, শ্রীশ একাধিকবার তাঁদের প্রণয়িনীকে চুম্বন করেছেন—কিন্তু সব ক্ষেত্রেই হয় আগে থেকেই জানা গেছে, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী; নতুবা পরে অকস্মাৎ প্রকাশ পেয়েছে তাঁরা পরস্পর বিবাহিত। মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয় ও ইন্দিরা-তে একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারের উল্লেখ আমার অনভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু শ্রীযুক্ত রায়ের মতো সমালোচকও যখন বিশিষ্ট যুগ-পরিবেশে সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা-নিয়েও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসেন, তখন দুঃখের সঙ্গেই এসব ব্যাপার উল্লেখ করতে হয়।

নীরেনবাবু বলেছেন, 'ধনবাদী সমাজে নারীর স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নারীচরিত্রে রূপান্তরও ঘটে। মনোরমা সেই জটিল নারীচরিত্রঅঙ্কনে বঙ্কিমের প্রথম প্রয়াস'। ব্রজেশ্বরের প্রথম অংশটি নিঃসংশয় সত্য; কিন্তু আমার তো মনে হয়; মনোরমা চরিত্রেই বঙ্কিমের উৎকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। এমনকি জয়ন্তী-ও মনোরমার চেয়ে যথেষ্ট স্বাভাবিক। তার হাতে লেখক মন্ত্রপূত ত্রিশূল এবং মুখে নিষ্কাম ধর্মের উপদেশ দিলেও নারী হিসেবে তার স্বাভাবিকতা তাতে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়নি। কিন্তু মনোরমা কখনো চপলা বালিকা, কখনো প্রৌঢ়া—তাঁর মুহূর্তে মুহূর্তে এই যথেচ্ছ

বয়স-পরিবর্তন পূর্ণত অলৌকিক, একদেহে স্থান-কাল-পাত্রভেদে কৃষ্ণকালী প্রকাশেরই সদৃশ ব্যাপার।

রোমান্সের খাতিরে অলৌকিকতাটুকু মেনে নেওয়া গেলেও মনোরমা-পশুপতির প্রেমের ব্যাপারেও অনুরূপ অভিযোগ চলে। পশুপতি বিশ্বাস-ঘাতক হতে পারে, কিন্তু তার প্রেম যে আন্তরিক নয় এমন কোনো লক্ষণই দেখানো হয়নি। বরং তার উগ্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষাই যেন তাকে বিশ্বাসহন্তার কাজে প্রেরণা দিয়েছে। পরে জানা গেছে, তারাও পূর্ব-বিবাহিত। অথচ উপন্যাসের বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ-তথ্য অপ্রয়োজনীয়। পশুপতি তো শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হবেই, সুতরাং উগ্র সমাজদ্রোহিতা না দেখিয়েও লেখক সহজেই পশু-পতি-মনোরমার প্রেমকে দাম্পত্য-বিধির বাইরে মুক্তি দিতে পারতেন।

বালিকা মনোরমার সহমরণপ্রসঙ্গ সহানুভূতিহীন এবং গতানুগতিকভাবে উল্লেখ করায় সতীদাহ রীতিকে সর্বজনগৃহীত সত্য বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। সতীদাহের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ যদি 'অবাস্তব' বলে মনে হয় (আমার তা মনে হয় না) অন্তত কল্পনাকুশল বঙ্কিম সহজেই সতীদাহদৃশ্যের কারুণ্য ফুটিয়ে তুলে পরোক্ষ প্রতিবাদ জানাতে পারতেন। তিনি অপ্রয়োজনে অল্পপ্রয়োজনে শুধুমাত্র বর্ণনার প্রলোভনে বহু অধ্যায় বাড়িয়েছেন। এখানে মনোরমার বালিকা শরীরের কুসুমকোমললাবণ্য এবং সতীদাহ-আয়োজনের পুঙ্খানুপুঙ্খ একটা ছবি আঁকলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারত। অন্তত পক্ষে বিদ্যাসাগরের মতো তিনি যদি শুধু উপসংহারে দীর্ঘশ্বাসও ফেলতেনঃ 'হা অবলাগণ! জানি না কোন পাপে তোমরা ভারতবর্ষের নারীকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ!' তাহলেও বলা যেত, তিনি তৎকালীন যুগচেতনাকেই শিল্পরূপ দান করেছেন। অথচ এ-ধরনের উল্লেখে যে তাঁর সাহিত্যে শৈল্পিক হীনতা প্রবেশ করত, এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই।

সতেরো অশ্বারোহী নিয়ে বাংলাজয়ের সংবাদে বঙ্কিমের অবিশ্বাস থেকে বিশেষ কোনো সিদ্ধান্তেই আসা চলে না। মিনহাজউদ্দীনের উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমের পরিবর্তে লেখক স্বয়ং যে উৎকাল্পনিক ইতিহাস সংযোজিত করেছেন তার বিভ্রান্তিও উদ্দেশ্যমূলক।

'বিষবৃক্ষ'-উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গভীর জীবনবোধ, উদার মানবিক সহানুভূতি ও উচ্চশ্রেণীর ঔচিত্য-বুদ্ধি উপন্যাসের ছোটবড় সকল চরিত্রগুলিকেই যথোচিত স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছে। উনিশ শতকের বাংলাদেশের পারিবারিক আবহাওয়া বিষ-বৃক্ষের আগে বঙ্কিম আঁকতে সমর্থ হননি। কাল্পনিক-ঐতিহাসিক, অলৌ-কিক ও অতিপ্রাকৃত—শস্যের পেছনে পঙ্গপালের মতো অধিকাংশস্থলেই বঙ্কিম-সাহিত্যে শিল্পশ্রী ব্যাহত করেছে। বিষবৃক্ষ যেন স্বতন্ত্র শিল্পীর রচনা। কুন্দের স্বপ্নের অলৌকিকতাটুকু অনায়াসেই উপেক্ষা করা চলে। নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর মূল কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বাস্তব—অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতের স্পর্শমাত্র নেই। হীরা-দেবেন্দ্র উপকাহিনীও সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমের সমকালীন যুগ-প্রেক্ষিতের চিহ্নই উন্মোচিত করেছে।

নায়ক নগেন্দ্র গ্রামের বিত্তশালী পরিবারের সন্তান—ছ'মহলা বাড়ির বর্ণনায়

লেখক ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের যুগের একান্নবর্তী পরিবারের ছবিটি সম্পূর্ণ করেই এঁকেছেন। গতানুগতিক একটি গ্রাম্য পরিবার নয়; এ-পরিবারের কন্যা এবং বধূ মিস্ টেম্পেলের কাছে ইংরেজি শিখেছে, স্বয়ং নগেন্দ্র তৎকালীন 'ফ্রি ট্রেড'-এর অংশীদার উদীয়মান ভদ্র বণিকসম্প্রদায়ের প্রতীক—স্বাধীন ব্যবসায়ের খাতিরে তাঁকে বহু অচেনা গ্রামেও যাতায়াত করতে হয়। কমলমণি ও শ্রীশ নতুন সংস্কৃতির পাদপীঠ কলকাতার বাসিন্দা বলে স্বভাবতই আরও নব্যপন্থী। রামমোহন রায় থেকে শুরু করে নব অভ্যুত্থিত বাঙালী সমাজের প্রায় সকলেই তখন ইওরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে দেওয়ান-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির কাজ করেছেন। শ্রীশ তাঁদেরই উত্তরপুরুষ।

ব্যক্তিস্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অনিবার্য ফল পারিবারিক জীবন-গঠনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। তাই কমলমণি-সতীশকে নিয়েই শ্রীশের সংসার, অন্য পোষ্য কেউ নেই। সারা উপন্যাসের মধ্যে শ্রীশের মা কখনও গ্রাম্য ভিটের নেপথ্য থেকে বাইরে আসেননি।

আবার প্রসঙ্গত ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিধবাবিবাহ-বহুবিবাহ বিষয়ক সমস্যারও অবতারণা করেছেন। এমনকি অক্ষয়কুমার দত্ত প্রবর্তিত 'হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর'-মূলক রচনারীতিরও উল্লেখ আছে। সমস্ত খুঁটিনাটি মিলিয়ে সেকালের-সমাজবাস্তবের এমন পরিপূর্ণ উপস্থাপন অন্য কারো উপন্যাসে দেখা যায় না।

কিন্তু বঙ্কিম-প্রসঙ্গে হঠাৎ অধ্যাপক রায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্তের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন কেন? হিরণকুমার সান্যাল, শ্রীযুক্ত রায়ের 'বক্তব্যের সুসীম নিশ্চয়তা'র দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উক্ত গুণের অধিকারী সব সমালোচকই নিঃসন্দেহে সাধুবাদের পাত্র। কিন্তু একথাও সত্য যে, সব সমালোচকই প্রথমত সহানুভূতিশীল ও উদার হবেন, যাঁর যতটুকু সম্মান ও তিরস্কার ন্যায়ত প্রাপ্য তা থেকে তিনি যেন বঞ্চিত না হন। মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারও নিশ্চয়ই এর ব্যতিক্রম নয়। বিষবৃক্ষ-প্রসঙ্গে 'স্বর্ণলতা', 'সংসার' ও 'সমাজ' এবং 'আধুনিক সমালোচকের' 'সাহিত্যিক মূল্য'-বোধের ওপর শ্রদ্ধেয় সমালোচক যে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন তা তাঁর মতো রসজ্ঞ-বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে আশা করা যায়নি। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন ছাড়া যাঁদেরই তিনি নামোল্লেখ করেছেন (বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত) সকলের প্রতি তাঁর এই উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। কোনো শিল্পীর মহত্ত্ব প্রমাণের তাগিদে অন্য শিল্পীদের ভূমিকাকে খর্ব করে দেখা অমার্জনীয় অপরাধ। 'মার্কসবাদী বঙ্কিম-বিচার' পড়তে গিয়ে বারেবারেই মনে হয়েছে এ-অপরাধ নীরেনবাবুকে স্পর্শ করেছে।

অবশ্য 'বিষবৃক্ষ'-সম্বন্ধে তাঁর আসল বক্তব্যের সঙ্গে আমার কোনো মত-দ্বৈধ নেই, কোনো মার্কসবাদীরই থাকতে পারে না। কুন্দ সমাজের হৃদয়-হীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে ভালোই করেছে, সমাজের প্রতিটি শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের হৃদয়ের কাছে সে করুণ মিনতি জানিয়েছে, এই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করিয়েছে। তাছাড়া, শুধুমাত্র শৈল্পিক বর্ণেও তার এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-বিরতিই উপযুক্ত হয়েছে। তার সম্বন্ধে বলা

চলে—'Gentleness gives the prevailing tone of her character. Gentleness in its excess—gentleness verging on passiveness—gentleness which does not only resent but also cannot resist.' বিরুদ্ধতাচরণে অক্ষমতাই, তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই দেবেন্দ্র-হীরার হীন ষড়যন্ত্র সহজেই সার্থক হতে পেরেছে এবং এই বৈশিষ্ট্য হেতুই সূর্যমুখী এ-গ্রন্থের প্রধানা নায়িকা হলেও কুন্দনন্দিনীর কাহিনীই আমাদের করুণা উদ্রিক্ত করে সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু শুধুমাত্র 'বাস্তবানুরূপ্য' বজায় রাখার জন্যেই কি কুন্দনন্দিনী বিধবা? সত্যিই কি 'বঙ্কিমের আমলে অবিবাহিতা বয়স্থা নারী ভদ্রসমাজে ছিল অতি দুর্লভ?' যোগ্য পাত্রের অভাবে বয়স্থা কুলীনকন্যার কৌমার্য এবং অবশ্যম্ভাবী নানা দুর্নীতি তো সেকালের সমাজের অন্যতম প্রধান কলঙ্ক, এবং তার দূরীকরণের জন্যে যেমন বিদ্যাসাগর-দ্বারকানাথ প্রমুখ মনীষীরা সমাজ-আন্দোলন করেছিলেন, প্যারীচাঁদ-হুতোম প্রমুখ লেখকরাও তেমনি সাহিত্যিক অভিযান চালিয়েছিলেন। এমনকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামনারায়ণের রচনাতেও এ-সমস্যার উল্লেখ আছে। এবং বলা বাহুল্য, রামনারায়ণ-বিদ্যাসাগরের চেয়ে 'বঙ্কিমের আমলে' সমাজে কোনো মৌলিক পরিবর্তনই সাধিত হয়নি। বরং 'অভদ্রসমাজে' বয়স্থা কুমারী হয়তো দুর্লভ ছিল। [ক্রমশ



ইতিহাসের শব্দানুলিখন

বোরিস পলেভয়

সাম্যবাদী পরিকল্পনায় যে-সব বৃহৎ নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে তার একটিতে একটি দল সংবাদচিত্র তুলছিল। প্রতিদিন কাজ যতটুকু এগোয় তাকে পর্যায়-ক্রমে ফিল্ম-এ তুলে রাখা—কাজটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু মোটেই সহজ নয়। কাজের সময় যা কিছু শব্দ ওঠে তা পর পর ধরে রাখলে কেমন হয় তা শোনাবার জন্যে একদিন সন্ধ্যায় এই দলটি ব্যবস্থা করল।

এই অভাবিতপূর্ব অনুষ্ঠানে অভ্যাগত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। একটি বড় রকমের জল-যন্ত্রব্যবস্থা নির্মাণকার্যের কর্মকর্তা তিনি, গঠনমূলক কর্মী হিসেবে বিশিষ্টনামা সাম্যবাদী গঠনকার্যের সর্বজয়ী অগ্রগতিকে উপজীব্য করে লেখা একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের মূল প্রেরণা। হোটেলের ছোট ঘর লোকে ঠাসাঠাসি কিন্তু তার মধ্যেই বিশেষ সম্মানের নিদর্শন হিসেবে টেবিলের ধারে পাতা ঘরের একমাত্র আর্মচেয়ারটি তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট। পরিবেশকে অধিকতর কার্যকরী করবার জন্যে ঘরের বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শব্দ-যন্ত্রটি চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অতি-পরিচিত নানা রকম শব্দে সেই ছোট্ট গুমোট ঘরটি মুখর হয়ে উঠল। আমি কোনো দিন কল্পনাও করিনি যে শব্দগুলোকে যথাযথভাবে সোজাসুজি ধরে রাখতে পারলেই এমন কতগুলো জীবন্ত দৃশ্যের অবতারণা করা যায়। শব্দগুলো এক-একবার একসঙ্গে মিশে গিয়ে একটা সুরব্যঞ্জনার ঐকতান সৃষ্টি করছে, আবার এমন-ভাবে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে যে প্রতিটি শব্দকে আলাদা করে চেনা যায়।

ইস্পাতের অবলম্বন-দণ্ডের উপর বাষ্পচালিত দণ্ডপ্রক্ষেপক ছন্দের তালে তালে প্রচণ্ড শব্দে ঘা মারছে। তারপরেই চলমান মাটিকাটা যন্ত্রের বৈদ্যুতিক মোটর চলবার তীক্ষ্ণ চাপা গুঞ্জনধ্বনি, চামচের সঙ্গে লাগানো শেকলের এক-ঘেয়ে ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ। মাটি উদ্গীরণের শব্দ পুরনো সৈন্যের কাছে কামানের গোলা ফাটার শব্দের মতো মনে হবে। সব মিলিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই মাটিকাটার যন্ত্রদানবটি কত সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করে। তারপরে শোনা গেল পঞ্চোদ্ধার বাষ্পযানের বড় বড় দাঁড়ওলা চাকার প্রণালীবদ্ধ ঘর্ষণের শব্দ, সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ আদেশধ্বনি, প্রকাণ্ড ঘূর্ণ্যমান পেঁচকলের ঘড়ঘড় আওয়াজ। বাষ্পযানের গতিপথে চৌচির হয়ে ফেটে যাওয়া পাড়ের মাটি ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দে খসে পড়ছে। তারপরেই শক্তিশালী বুল্‌ডোজার ইঞ্জিনের গর্জন, ইস্পাত-শলাকা কঠিন শৈলশ্রেণীর গা কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে। বড় বড় চামচের মতো পাত্রে মাটি তোলার ঘস্‌ ঘস্‌ আওয়াজ, কংক্রীটবহনকারী গাড়িগুলোর অবিচ্ছিন্ন শোরগোল। এবং এই সমস্ত শব্দকে ছাড়িয়ে একজন মানুষের উদাত্ত গলার স্বর—কংক্রীটের উঁচু উঁচু গাঁথুনিগুলোতে সেই স্বর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই গলার স্বর পরিচালকের, লাউড্‌স্পীকারের

সাহায্যে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁরই নির্দেশে এই অসংখ্য মানুষ ও অসংখ্য যন্ত্রের কাজ নির্দিষ্ট গতিতে চলেছে—যেন এই যান্ত্রিক শব্দমণ্ডলের সুর-ব্যঞ্জনা তিনি পরিচালনা করছেন।

'চমৎকার, অপূর্ব! মানুষ! যে-মানুষ গড়ে এবং যে-মানুষ স্রষ্টা—এইসব ইস্পাতের তৈরি যন্ত্রদানবের হৈ-হট্টগোল, গর্জন, ফোঁসফোঁসানির অনেক উপরে দাড়িয়ে সে!' অন্ধকারে ছোট্ট ছেলের মতো গলায় কে যেন উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠল। এই গলার স্বর একজন শিল্পীর যাকে ছবি আঁকার খাতা ও পেন্‌সিল নিয়ে নির্মাণ-অবস্থানে সবাই ঘুরে বেড়াতে দেখে।

সবাই তাকে চুপ করিয়ে দিল।

এর পরের শব্দানুলিখন আগের সপ্তাহের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর। যে-সব শব্দ আবার শোনা যাচ্ছে তা এখান থেকেই উঠেছিল, এখানেই মিলিয়ে গেছে, কোনোদিন আর এই শব্দের পুনরাবৃত্তি হবে না।

'খাদ থেকে সরে দাঁড়াও!' লাউডস্পীকারে কর্মকর্তার নিখাদ গলা ভেসে আসছে, 'এবার আমরা ডন্‌নদীর গতিপথ এই বাঁধের ভিতর ঘুরিয়ে দেব।'

কাঠের পাটাতনের খস্‌ খস্‌ আওয়াজ, ফটক্‌উত্তোলনকারী ক্রেন চালু হচ্ছে। স্লুইস্‌গেটের ঘড়ঘড় শব্দ, তারপরেই স্লুইসগেটের নিষ্কাশন-পথে প্রথমে চাপা জলোচ্ছ্বাস, ক্রমে তা বাড়তে বাড়তে প্রচণ্ড গর্জন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বহু মানুষের কণ্ঠে জয়োল্লাস: শ্রমিকরা খুশি ও আনন্দে ফেটে পড়েছে, তাদের তৈরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কংক্রীটের আধারে জল এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিস দিচ্ছে।

এর পরের শব্দমণ্ডল ডন্‌নদীর পুরনো গতিপথ বন্ধ করে দেবার কাহিনী—ঠিক সেই মুহূর্তটি যখন সোবিয়েত কর্মকর্তার নির্দেশে এই বিশাল নদী পুরনো আশ্রয় ছেড়ে মানুষের তৈরি নতুন আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

তারপর আমরা শুনতে পেলাম, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আঞ্চলিক নির্মাণকার্যের কর্মকর্তা উদাত্ত স্বরে শ্রমিকদের কাছে সোবিয়েত জনসাধারণ ও বলশেভিক পার্টির কথা বলছেন। শুনতে পেলাম, নদীর পুরনো গতিপথ বন্ধ করার কাজ শুরু করে দেবার জন্যে তিনি আদেশ দিচ্ছেন। প্রচণ্ড শক্তি-বিশিষ্ট সারি সারি অসংখ্য লরি পাথর-বোঝাই হয়ে কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দে চলেছে—সেই সুগম্ভীর ধ্বনি! লরিগুলোর বোঝা খালি করবার সময় যে শব্দ হচ্ছে তা শুনে যুদ্ধের সময়কার হাউই-কামানের সমবেত বিস্ফোরণের কথা মনে পড়ে। বিভিন্ন শব্দের বিচিত্র মিশ্রণ—নদীর ক্রুদ্ধ জলোচ্ছ্বাস, পর্যায়ক্রমে পাথর গড়িয়ে পড়বার কামানধ্বনি, নদীর সঙ্গে মানুষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম। ধীরে ধীরে নদী বশে এল, স্রোতের গর্জন হ্রাস পেতে পেতে এক সময়ে প্রায় অস্পষ্ট ঝরনার কলধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার শোনা যাচ্ছে কর্মকর্তার গলার স্বর, বিজয়ী কিন্তু ক্লান্ত, নির্ধারিত পঁয়ত্রিশ ঘণ্টার পরিবর্তে আট ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ডন্‌নদীর গতিপথ বন্ধ করতে পারার জন্যে তিনি শ্রমিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

হোটেলঘরের মানুষগুলোর পক্ষে চুপ করে থাকার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আর

কিছুতেই সম্ভব হল না, উচ্চকণ্ঠ জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ে সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলঃ

'অপূর্ব! চমৎকার! জীবন্ত ইতিহাস—এমনটি আর কখনো ঘটবে না!'

'ভুল বলছ—আবার ঘটবে, বারবার ঘটবে, এর চেয়েও বড়োভাবে ঘটবে। কিন্তু আসল কথা তা নয়। আসল কথা এই যে, একবিংশ শতাব্দীতেও যে কোনো সময়ে সোবিয়েত নারী ও পুরুষ আজকের দিনের এই নির্মাণকার্যের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করতে পারবে, এর সর্বাঙ্গীণ বিরাটত্ব দেখতে পাবে।'

'আপনার মত কি? আপনার ভালো লেগেছে?' কর্মকর্তার দিকে ফিরে একজন চিত্রপরিচালক জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি কোনো কথা বললেন না।

এই সময়ে কে যেন সুইচ্ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিল। আমরা দেখলাম —যে-লোকটি এত ধীর স্থির ও অবিচলিত, যিনি সেই চূড়ান্ত জয়ের মুহূর্তে অসমাপ্ত বাঁধের উপর ব্রোঞ্জমূর্তির মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছেন ডন্‌নদীর জলোচ্ছ্বাস খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছে, এক বছর ছ'মাস যিনি শ্রমিক-পরিবৃত হয়ে দূরপ্রসারী পরীক্ষায় সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োগ করেছেন, টেবিলের প্রান্তভাগ শক্ত মুঠোয় আঁকড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে যাঁর সমগ্র উপস্থিতি একটা গভীর আবেগের আলোড়নের মতো বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে—সেই মানুষটি সমস্ত ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝট্‌কায় দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

না বলে কয়ে এভাবে আলো জ্বালানোটা ঠিক হয়নি!

অনুবাদঃ অমল দাশগুপ্ত



ভ্রম-সংশোধন

গত পৌষ-সংখ্যা পরিচয়-এ দুটি গুরুতর ছাপার ভুল রয়েছে। (১) ৪২৯ পৃষ্ঠায় ৩১ লাইনের "সমাজ অচলায়তন . দেশ"-এর পরিবর্তে হবে—"-বেন প্রশস্ততর পাঠকসমাজ। কিন্তু চাইলেই কি তা পাওয়া যাবে? দেশ-"। (২) ৪৩২ পৃষ্ঠার ১২নং লাইন হবে—"বইতে তাঁর লজ্জা হত। ভারি জিনিসে হাত লাগাতে অন্য ছাত্রদের মতোই তাঁরও কুণ্ঠা"। । স, প,।

শান্তির স্বপক্ষে

বৃহৎ পঞ্চশক্তির সরকারগুলির নিকট শান্তি মহাসভার আবেদন

আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার উপায় হিসাবে শক্তি প্রয়োগ পরিহার করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিদিন আরো বেশি জরুরী হয়ে উঠছে।

সারা দুনিয়ার ষাট কোটি নরনারী ইতিমধ্যেই একটি দাবির নিচে তাঁদের নাম দিয়েছেন। সে দাবি হল বৃহৎ পঞ্চশক্তিকে আলোচনা করতে ও একটি শান্তি-চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে।

জনমতের গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতিনিধিরাও তাঁদের এই অভিপ্রায় জানিয়েছেন, যে আলাপআলোচনার নীতির অনুকূলে পরিত্যাগ করতে হবে শক্তির প্রয়োগ।

১৯৫২ সনের ১২ই ডিসেম্বর ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জনগণের শান্তি মহা-সম্মেলন মানবজাতির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন জনগণের সাধারণতন্ত্র, গ্রেট ব্রিটেন, আর ফ্রান্সের সরকারগুলির কাছে আলাপ আলোচনা শুরু করুন, তার ওপরে শান্তি নির্ভর করছে।

বৃহৎপঞ্চশক্তির মধ্যে বোঝাপড়া হলে, একটি শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হলে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনার অবসান হবে, চরম দুর্দৈবের হাত থেকে দুনিয়া রক্ষা পাবে।

এই হচ্ছে জনগণের দাবি।

সংস্কৃতি রক্ষার জন্য

[আন্তর্জাতিক উত্তেজনা উপশম সম্পর্কে শান্তি মহাসম্মেলনের দ্বিতীয় কমিশনের প্রস্তাব থেকে]

সংস্কৃতির ওপর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলাফলে গভীর শঙ্কা বোধ করে আমরা আবেদন জানাচ্ছি বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, ও সমস্ত বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের কাছে, আপনাদের সাধারণ উত্তরাধিকারকে রক্ষা করুন।

এই আবেদন বিশেষ করে

(ক) সংস্কৃতির সমস্ত মানুষের কাছে, যাতে তাঁরা যুদ্ধপ্রচারের জন্য পুস্তক, সংবাদপত্র, রেডিও ও সিনেমার ব্যবহারের বিরোধিতা করেন;

(খ) শিক্ষক, পিতামাতা, ও শিশুদের পালন করার ভার যাঁদের ওপর তাঁদের সকলের কাছে, যাতে তাঁরা পুস্তক, সংবাদপত্র, ফিল্ম ও রেডিও মারফত অপরাধ, জাতিবৈষম্যমূলক ঘৃণা ও যুদ্ধে উস্কানি দেবার বিরোধিতা করেন;

(গ) সঙ্গীতকার, চিত্রকর, ভাস্কর ও সকল শিল্পপদ্ধতির শিল্পীদের কাছে, আপনাদের শিল্পকর্মে শান্তিকে কীর্তিত করুন, জীবনের আনন্দকে তুলে ধরুন।

বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের কাছে আবেদন প্রসঙ্গে আমাদের সুপারিশ এই যে, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হোক, আন্তর্জাতিক ধরনের প্রদর্শনী, উৎসব ও সমাবেশের অনুষ্ঠান হোক।

আমরা আশা করি যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে মানবতার মহান প্রতিনিধিদের নিয়ে স্মৃতিসভা ও উৎসব উদ্যাপিত হবে।

সমস্ত জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক রাখীবন্ধনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করে, এমন বাধা বর্তমান। আমরা চাই সে-বাধা ভেঙে ফেলতে। আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাবকে অগ্রসর করার জন্য প্রত্যেকটি জাতির গবেষণা, বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও শিল্পকর্ম থেকে উপকার পাওয়া উচিত সমস্ত মানবজাতির।

সমস্ত জাতীয় সংস্কৃতিকে সম্মান করার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাদের সমানাধিকার ও পারস্পরিক উপযোগিতার কথা মনে রেখে শিল্প ও চিন্তা-গবেষণার বিনিময় ঘটিয়ে শান্তি রক্ষা ও সংহত করতে সাহায্য করতে হবে।

আমরা দেখতে চাই যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের গ্রন্থাগার, আমাদের গবেষণাকেন্দ্রগুলি তাদের রচনাবলীর বিনিময় ব্যবস্থা করছে, এবং তাদের অধ্যয়নের ফলাফল প্রকাশ করছে।

আমরা দেখতে চাই যে পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হোক ক্লাসিকাল ও আধুনিক

শিল্পকর্মগুলি (সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, সিনেমা, থিয়েটার, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, লৈখিক শিল্প ইত্যাদি)।

অন্যজাতির কাছে প্রত্যেক জাতির প্রেরণ করা উচিত তাদের বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের, শান্তির আদর্শে নিষ্ঠাবান অধ্যাপক, ক্রীড়াবিদ, শ্রমিক ও কৃষকদের।

আমরা আমন্ত্রণ জানাই বৈজ্ঞানিকদের এবং বিশেষ করে অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে, আপনারা সেইসব নীতি ও নিয়মকানুন রচনা করুন, যার ভিত্তিতে সমঝোতা, সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতির দাঁড়ানো উচিত।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে এবং জনগণের কাছে আমাদের আবেদন, ভাবাদর্শ ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের অবাধ প্রচারের অধিকার রক্ষা করুন; যতখানি ব্যাপকতম ভিত্তিতে সম্ভব, ততখানি ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় অংশ নিন, তা না হলে বিজ্ঞানের সার্বজনীন চরিত্র বিনাশ পাবে।

মৃত্যু এবং ধ্বংসের হাতিয়ারগুলিকে সম্পূর্ণ ও উন্নত করার জন্যে যাঁরা কাজ করছেন এমন সমস্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে আমরা আবেদন জানাই। তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিশ্বের সেইসব বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আপনারা আসুন, যাঁরা বিজ্ঞানের সম্মানের জন্য প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, তাকে নিয়োজিত করতে মানবজাতির সেবায়।

সভ্যতা এবং তার সর্বোচ্চ প্রকাশ সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য আমরা জারী করব শান্তি।

[সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত, ভিয়েনা ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫২]



পুস্তক পরিচয়

একটি অপমৃত্যু

নাগিনী কন্যার কাহিনী—(দ্বিতীয় প্রকাশ)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি, এম, লাইব্রেরি। দাম চার টাকা ; পৃঃ ২৬৪।

প্রিস্টলি সম্পর্কে জনৈক সোবিয়েত লেখক যেমন বলেছিলেন সেইভাবে বলা যায় যে বাঙলা দেশেও একদা এক লেখক ছিলেন। সে লেখকের নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙলা দেশ সাহিত্যের দেশ এবং কিছু সাহিত্যিক প্রতিভারও দেশ। সেই দেশে ভালোয়-মন্দয় জড়িয়ে তিনি কয়েকটি বই লিখেছিলেন যেগুলি বাঙলা দেশের মানুষ পছন্দ করেছিল। কারণ, বইগুলি যথেষ্ট সুসঙ্গত না হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে তিনি বাঙলা দেশ এবং এখানকার মানুষের জন্য দরদ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। এবং এই প্রাপ্তিটুকুর জন্যেই বাঙলার পাঠকেরা এই লেখককে শ্রদ্ধা জানাতে কখনো কুণ্ঠা বোধ করেনি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই লেখকের ভাগ্যে দুর্ঘটনা দেখা দিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের অন্যান্য অনেক সাহিত্যিকের মতো ছিলেন না। তিনি শুধু লেখক নন ব্যক্তিও বটেন। ব্যক্তি হিসাবে তিনি কংগ্রেস নেতাদের নিকটেই থাকতেন, এবং তাঁদের মতোই দেশ ও জনগণের নামে শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। কিন্তু পরে উচ্চতন কংগ্রেস নেতাদের প্রয়োজন দেখা দিল সুস্পষ্টভাবেই দেশ ও জনগণকে পরিত্যাগ করার। এই অবস্থায় অনেক সৎ ব্যক্তি দ্বিধায় ও সংকটে পড়েন এবং এখনো সংকটে পড়ে আছেন। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিধা ছিল না। গান্ধীজীর কিছু শিষ্যের মতো তিনিও ত্যাগ করতে শুরু করলেন জনগণকে। তারপর একদিন 'স্বাধীনতা' পরবর্তী ক্ষুধার্ত জনসাধারণ লক্ষ্য করল, কংগ্রেস মঞ্চে এবং পরিষদে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার জন্য দিশী মন্ত্রীদের অদূরে আর একটি কণ্ঠ আবির্ভূত হয়েছে। সে কণ্ঠ ব্যক্তি তারাশঙ্করের। এবং তার ঘোষণা যা বহন করে এনেছিল, তা আসলে হচ্ছে ব্যক্তি তারাশঙ্করেরই অপমৃত্যুর সংবাদ।

ভাবাবেগের আনুষ্ঠানিক নাটকীয়তা সত্ত্বেও অবশ্য জনগণের প্রতি বিশেষ করে আত্মশক্তির জন্য সংগ্রামী জনগণের প্রতি কমবেশি বিরাগ তারাশঙ্কর এর আগেও গোপন করেননি। তাই এ অপমৃত্যু একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। তবু আর এক তারাশঙ্কর বাকি ছিলেন। শিল্পী তারাশঙ্কর। তার অপঘাত কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কিন্তু সেই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদই বহন করে এনেছে তারাশঙ্করের সাম্প্রতিক কালের একটি রচনা 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'।

কাহিনীটি হল মোটামুটি এই ঃ— ভাগীরথীর তীরে ভয়ঙ্কর হিজল দীঘি। 'যমরাজার দক্ষিণ দুয়ার হিজলেরই বিল'। তার আদিম ঘাসবনে সাপ আর বাঘের একটা বন্য আস্তানা। অদূরে আছে সাঁতালী পাহাড়। সেখানে বাস করে বিষ-বৈদ্যদের একটা গোষ্ঠী। তাদের ধারণা, তারা হচ্ছে চাঁদ সওদাগরের বিষ-বৈদ্যদের বংশধর। কালোকন্যের আকার ধরে কালনাগিনী তাদের আদি পুরুষকে ছলনা করেছিল। তাইতে মারা যায় লক্ষিন্দর। চাঁদ সওদাগর তাদের অভিশাপ দিয়ে নির্বাসিত করে। নির্বাসিত বৈদ্যেরা হয় বেদে, ঘর বাঁধে রাঢ়ের এই নতুন আস্তানা সাঁতালী পাহাড়ে। কালনাগিনী অবশ্য তাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে কন্যারূপে সে জন্মজন্মান্তরে বিষবৈদ্যদের ঘরে এসে জন্মাবে।

সেই কন্যাই নাগিনী কন্যা। নাগিনী কন্যা চিনতে হবে তাদের অপ্রাকৃত লক্ষণ দেখে। কন্যের স্বামী মারা যাবে অল্প বয়সে। যৌবনের প্রারম্ভেই কালো মেয়ের কপালে ফুটে উঠবে শাদা শাদা চক্রচিহ্ন।

পুরুষানুক্রমে এমনিভাবেই বিষবেদেরা পেয়েছে তাদের নারীরূপী নাগিনী-কন্যেকে। তার হাতেই তুলে দিয়েছে বিষহরির আটন। এই মেয়ের পুণ্যফলেই নাকি বেদেদের সব অনাচার দেবতার চোখে মাপ হয়ে যায়।

এই বিষবেদেদের শেষের দিককার সর্দার—'শিববেদে' মহাদেব। তাদের নাগিনীকন্যা শবলা। তারা সাপ ধরে বিষ বিক্রি করে আসে বিখ্যাত কবিরাজ ধুর্জটির কাছে, খেলা দেখায় নাচে গেরস্তদের বাড়ি বাড়ি। তারপর একদিন দেখা যায় শিরবেদের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে নাগিনী কন্যার। শিরবেদে সন্দেহ করে যে নাগিনী কন্যা বুঝি মর্ত্য নারীর মতো কামনার প্রভাবে পড়েছে। বেদের মেয়েমাত্রই অবিশ্বাসিনী! নাগিনীকন্যা দেখে যে শির-বেদে অনাচার করছে, আর এই বৃদ্ধের চোখে কন্যাস্বরূপা নাগিনী কন্যার জন্যই লালসা ঝরছে। নিষেধ না মেনে এক বেদে জোয়ান ভালোবাসে শবলাকে। কিন্তু শিরবেদের কুটিল চক্রান্তে তাকে প্রাণ দিতে হয় সাপের কামড়ে। শবলা একদিন শিরবেদের আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে তার ধর্মনষ্ট করে শিরবেদেকে হত্যা করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নদীর জলে। বেদে-দের জীবনে শুরু হয় নতুন শিরবেদে গঙ্গারাম আর নতুন বেদিনীকন্যা পিঙলার আমল। গঙ্গারাম আরো কুটিল আরো অধঃপতিত অনাচারী। সাপধরা ছাড়াও সে জানে যাদুবিদ্যা, কবিরাজী জুড়ি বটির গুণ, জমিদার বাড়িতে বখশিস নেবার জন্য সে নিজেদের সাপ লুকিয়ে নিয়ে যায় তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার ধরে দেখাবে যেন আসল সাপ ধরেছে। কিন্তু ধরা পড়ে নাগঠাকুর নামে এক যোগী ব্রাহ্মণের চোখে। বিষবেদেব লজ্জা থেকে বাঁচায় পিঙলা। সে একলা সত্যি সত্যিই দুই হাতে দুই সাপ ধরে নিয়ে আসে। পিঙলার মূর্তি দেখে আকাঙ্ক্ষা জাগে নাগঠাকুরের। সে তাকে বিয়ে করে ভৈরবী করতে চায়। কিন্তু আপত্তি জানায় বেদেরা। এদিকে শবলা মরেনি। সে এক ইসলামী বেদের নৌকায় গিয়ে ওঠে, তারপর মুক্তির জন্য যোগিনীর বেশে তীর্থ ভ্রমণ করে। সে বলে—উসব মিছা কথা, মানুষ কি কখনো নাগ হয়? কিন্তু পিঙলা বলে, না মিছে নয়, সে যে দেখেছে মানুষের বুকে নাগকে। পিঙলা অপেক্ষা করে নাগ ঠাকুব একদিন দেবতাব কাছ থেকে তার মুক্তির প্রমাণ নিয়ে আসবে। গঙ্গারামেব ব্যাভিচারেব বিরুদ্ধে দাঁড়াব পিঙলা। তাই গঙ্গারাম রটিয়ে দেয় যে পিঙলার দেহ থেকে চাঁপা ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কামার্ত নাগিনীর দেহ থেকে নাকি চাঁপা ফুলেব মতো গন্ধ বার হয। বেদের বিশ্বাস নাগিনীকন্যার দেহ থেকে যখন অমনি গন্ধ বার হবে, তখন বুঝতে হবে সে কামার্তা হয়েছে, তার মনে পাপ ঢুকেছে। এই গন্ধের লজ্জা ঢাকতে পিঙলা সাপের ছোবল দেহে নিয়ে আত্মহত্যা কবে। এদিকে নাগ ঠাকুব দেবতার প্রত্যাদেশ নিযে এসে দেখে পিঙলা নাই। গঙ্গারামকে হত্যা করে সে তাব প্রতিশ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং খ্যাপা ভৈরবের মতো হাহাকার করে ঘুরে বেড়ায় ভাগীরথীর পাবে। তার শিষ্যবা বেদেদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়। বিষহরির আটন জ্বালিয়ে দেয।

তাই কি নিযে আর বেদেরা থাকবে। নাগিনীকন্যার মুক্তি যখন হয়ে গেছে, তখন সাঁতালী পাহাড় ছেড়ে একদল বেদে চলে যায় বনের মধ্যে, আর একদল আস্তানা গাড়ে মানুষেব বসতির কাছে।

এই হল গল্প।

তারাশঙ্করেব অধিকাংশ উপন্যাসই অনায়াসপাঠ্য নয়। এই বইটি পাঠ করা আরো কঠিন। কষ্ট করে যদি বা পাঠ শেষ করা যায়, তখন অনিবার্যভাবেই একটি প্রশ্ন জাগে, কিন্তু কি হল? এত কাণ্ড, এত আবেগ, লালসা, মন্ত্র, হত্যা, বহস্য, নিবুদ্দেশ যাত্রা কিসেব জন্য?

দুর্ভাগ্যক্রমে এর সবচেয়ে নিরীহ উত্তবটাই হল যে কিছুর জন্যই নয়। খারাপ, ভালো, স্থূল অথবা অর্ধসত্য যাই হোক না কেন, তারাশঙ্করের অতীত উপন্যাসগুলিব একটি বড়ো গুণ ছিল তার বক্তব্য-প্রচেষ্টা। কিন্তু এ কাহিনীব বক্তব্যটা কি? সত্যি সত্যিই এর কোনো বোধগম্য (বাস্তব) বক্তব্য নেই। 'নাগিনী কন্যাব কাহিনীর' বৈশিষ্ট্যই হল তার বক্তব্যের পরিহারে।

তাই বলে তার উদ্দেশ্য নেই, এটা ঠিক নয। সে উদ্দেশ্য গল্পের প্রধান কথক কবিবাজ শিবরায়ের বর্ণনাতে পবিস্ফুট 'চিকিৎসকেব কৌতূহল আর ঐ বন্য আদিম মানুষেব একটি কন্যার কাহিনী তাকে প্রায় মুগ্ধ করে রেখেছিল'।

তাবাশঙ্করেব একমাত্র ব্যক্ত উদ্দেশ্যই হল শুধু এই মুগ্ধ দৃষ্টি, আর কিছু নয। কোনো বক্তব্য নয় শুধু একটা রহস্যময় আবিষ্ট মোহ। কোনো বাস্তব বার্তা নয় শুধু এক সতৃষ্ণ আমেজ।

কল্পনাশক্তিকে অবশ্য খানিকটা লম্বা করে ধরে উপন্যাসের শেষ কয়েকটা লাইন তুলে হয়তো কেউ বলতে পারেন যে এ কাহিনী অন্তত কুসংস্কার-পীড়িত বেদেদের মুক্তি ও তাদের মনুষ্যসত্তার প্রতিষ্ঠার দিকে ইশারা করেছে।

কিন্তু এটি নিতান্তই জোর কবা কৈফিয়ত। কারণ, এই ইশারাকে সত্য ইশারা করতে হলে সারা উপন্যাস দিয়ে তাব বাস্তব ভিত্তি রচনা করতে হয়। তাবাশঙ্কবের অন্যান্য কোনো কোনো উপন্যাস যদি পাঠযোগ্য হয়ে থাকে, তবে তা তাঁর শেব লাইনগুলির জন্য নয়, কাবণ এই শেষ লাইন ও পরিণতি চিরকালই তিনি ভ্রান্তভাবেই ইঙ্গিত কবে এসেছেন। এগুলি ভালো হযেছে তাঁর অবাস্তব দর্শন সত্ত্বেও বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজ ও মানুষের বাস্তব গতি-প্রকৃতিব প্রতিফলনের কমবেশি সততায়।

সেই সততা কি এই উপন্যাসে আছে?

আদৌ নয়। এই উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্যই হল যে এটি কোন্ যুগের ঘটনা, কোন্ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এব চবিত্র ও ঘটনার বিকাশ তার কোনো উত্তর মিলবে না। অথচ তারাশঙ্কর পরিচিত হয়েছিলেন, তার উপন্যাসের স্থান-কাল-পাত্রের নির্দিষ্টতার সততায। তাঁব কালিন্দী, পঞ্চগ্রাম, গণদেবতা প্রভৃতি উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবেই একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে অনুসরণ করাব চেষ্টা করে এসেছে। যা বিগত তাব প্রতি একটা নির্বিচাব রুগ্ন মোহ সত্ত্বেও এই সব উপন্যাসে ইংরেজ-শাসিত ভাবতবর্ষে নিষ্ঠুর ভাঙন ও জনগণেব বাস্তব গতিব একটা ছায়াপাত ঘটেছিল। রাঢ় অঞ্চল এবং তাব মানুষদের সঙ্গে খানিকটা পবিচয় ছবিগুলিতে যে জীবন্তরস সঞ্চাব করে, তাই তারাশঙ্কবকে শিল্পী করে তোলে।

কিন্তু নাগিনীকন্যাব এই কাহিনীটি থেকে স্থান-কালের সমস্ত সাক্ষ্য মুছে দেবার জন্যই তারাশঙ্কর ব্যস্ত হয়েছেন। ভাঙা নবাববাড়ি রাজবাড়ির উল্লেখ থেকে কখনো মনে হবে বুঝি এটা আধুনিককালের ঘটনা। কিন্তু দেখা যাবে আধুনিককালের বৈশিষ্ট্যসূচক কোনো ঘটনাই এতে নেই। না আছে জমিদাব এবং জমিদাবের অত্যাচার (অন্য উপন্যাসে

তারাশঙ্কর যা অনিবার্যভাবেই আনেন) না আছে জনগণের বাস্তব অগ্রগমনের পথচিহ্ন (ধাত্রী-দেবতা, গণদেবতায় যা মূল্যবান সম্পদ) না আছে এমন কি একটা রেললাইন পর্যন্ত (এমনকি 'কবি'র মতো উপকথা এবং 'হাঁশুলী বাঁকে'র মতো অতিকথাতেও যা না এনে তারাশঙ্কর পারেননি)।

ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট পটভূমিকাকে মানলেই, মানতে হয় সত্যকথনের দাবিকে। ইতিহাসকে বর্জন করে শুরু করে তাই তারাশঙ্কর সত্যকথনের ক্ষীণ বিবেকটুকুও বর্জন করতে অনায়াসে সক্ষম হয়েছেন। কাহিনীটি একটি প্রতীকী কাহিনীমাত্র বলে মনকে প্রবোধ দিতে গেলেও এই সত্যবিকৃতি চোখে না পড়ে পারে না, কারণ, প্রতীক হলেও তাকে হতে হয় একটি বাস্তব ঘটনা ও গতিরই প্রতীক। নাগিনী কন্যার কাহিনীতে তারাশঙ্কর যে সমস্যা, যে প্রশ্ন, এবং বিকাশের যে ধারা উপস্থিত করেছেন তা সমস্তই তাঁর মনগড়া, সত্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, আদিম ধরনের কুসংস্কার থেকে বিষবেদে-দের অনুরূপ পশ্চাৎপদ একটি গোষ্ঠীর মুক্তির বাস্তব সূত্র হল এদেশে তাদের চিরাচরিত ব্যবসায়ের সংকট, যে গ্রাম্যব্যবস্থার অবাধিত পটভূমিকায় একদা তারা বাঁচতে পেরেছিল ইংরাজ শাসনে তার ধ্বংস, তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে ইংরাজ শাসন, ধনতান্ত্রিক বাজারের অনুপ্রবেশ, নতুন ভূস্বামীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা; তাদের নির্জনতার অবকাশ ভেঙে বাইরে থেকে আধুনিক জ্ঞান, ও যুক্তির প্রবেশ ইত্যাদি। কিন্তু মনগড়া এই বিষবেদেদের বিবর্ত-নের যে সূত্র তারাশঙ্কর হাজির করেছেন তা হচ্ছে নারীদের অবদমিত কামপ্রবৃত্তি, কন্যার প্রতি শিরদেবের 'চিরন্তন' ধর্ষণ-কামনা; মানুষের মধ্যে রহস্যময় নাগ-লক্ষণের জটিল ধূমবাদ (obscurantism) এবং বড়জোর এক কুসংস্কারের সঙ্গে নাগঠাকুরের বেশে এক অধিকতর শক্তিমান কুসংস্কারের সংঘাত! বলা বাহুল্য আদিম জাতি সম্পর্কে এই ধরনের যৌন 'কম্প্লেক্সের' ধারণা আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়। তার ফলে সত্যকথা বলতে গেলে তারা-শঙ্কর এই ধরনের পশ্চাৎপদ নরনারী সম্পর্কে তাদের জীবনের প্রকৃত বঞ্চনার জন্য এক ফোটা দরদ প্রকাশ না করে আসলে তাদের সম্পর্কে কুৎসাই প্রচার করেছেন, তাদের সম্পর্কে 'ভদ্রলোকের' মনগড়া সমস্ত কুসংস্কার উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন।

এই 'ভদ্রলোকটিকে' তারাশঙ্কর অবশ্য ভদ্রতার এবং একটা আপাত যুক্তিবাদের পোশাক পরাতে চেয়েছেন, যাতে সমস্ত কাহিনীটিকে নিতান্ত একটা তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দী ফিল্ম বলে কেউ ভুল না করে। উপন্যাসের এই প্রধান কথক শিবরাম কবিরাজের মুখ দিয়ে তারা-শঙ্কর অবশ্য বলানঃ 'তোদের বিশ্বাস মিথ্যে আমি বলছিনে। তবে দেবতাই হোক আর যক্ষরক্ষ-নাগ-কিন্নরীই হোক, মানুষ হয়ে জন্মালে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। নাগিনী যদি হোস তবুও তুই মানুষ। মানুষের দেহ তোর। তোর দাঁতে বিষ নাই, থাকে তো বুকে আছে।'

কিন্তু লক্ষণীয় যে তাদের ওপরটা মানুষ বললেও তারাশঙ্কর বলতে চান না যে তাদের শুধু দাঁত নয় বুকেও নাগিনী নেই, আছে মানুষের সুস্থ জীবন কামনা, এবং প্রয়োজন হলে বাস্তব অভিশাপের বিরুদ্ধে সমবেত সংগ্রামের বিশ্বাস, বলতে চান না যে তাদের ধর্মীয় অন্ধকুসংস্কার প্রকৃতই মিথ্যা।

তুলনায় কালিন্দীর সাঁওতালদের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ সাঁওতালদেরও অনেক অন্ধবিশ্বাস আছে. গোষ্ঠীজীবন তাদেরও সমান আদিম। কিন্তু নাগিনী কন্যার কল্পিত বিষবেদেরা যখন শুধু চাঁদ সদাগর আর বিষহরির কথা বলে এবং আর কিছুই বলে না, 'কালিন্দীর' সাঁওতালরা তখন তাদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেও স্মরণ করে এক

বাস্তব ঐতিহাসিক সত্যকে—সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই বিষবেদেরা যখন আবর্তিত হয় শুধুই যৌন ও ধর্মের রহস্যময় শক্তিতে, তখন এই সাঁওতালরা আবর্তিত হয় জমিদারী শোষণের বাস্তব সংঘাতের টানে, মানুষ হয়ে দাঁড়াতে চায় বাস্তব সংগ্রামের আবেগে। 'কালিন্দী'তে ইতরজনেব মূর্তি মোটামুটি সত্যের দিকে। নাগিনীকন্যায় তাদের চিত্রন মিথ্যা।

এবং সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা হয়ে গেছে তারাশঙ্করের শিল্পদক্ষতার জাদুটি পর্যন্ত। বাস্তব বিষবেদের কথা আনতে না চাইলে আনতে হয় তাদের মুদ্রাদোষ; বাস্তব জলা, পতিত জমি, লোকালয় আনতে না চাইলে আনতে হয় উপকথার পাতা থেকে ছেঁড়া কল্পনার হিজল বিল, রাঢ় অঞ্চলের বাস্তব প্রকৃতি বর্ণনার কাব্যের পরিবর্তে আনতে হয় অপরিণত শিশু-মনের নির্বাচনহীন শিহরণ, রাঢ়-মানুষেব কথনভঙ্গির অর্থময় বাস্তব সৌন্দর্যের বদলেও আনতে হয় ধ্বনি-নির্ভর পুনবাবৃত্তি, এবং তাতেও জমাতে পারেননি। পাত্রটি ফুটো বলে তাঁর লেখনীদক্ষতাও বার বার অন্তর্হিত হয়েছে। রস আব ভরে ওঠেনি।

এবং আশ্চর্য এই যে 'স্বদেশী' তারাশঙ্কর শেষপর্যন্ত জমাবার জন্য যে প্যাঁচের আশ্রয় নিয়েছেন, সেটি ঠিক সনাতনী ভারতের ঐতিহ্য বলা যায় না, কারণ সেটি হল একেবারে পশ্চিমের অর্ধরপ্ত ফ্রয়েড তত্ত্বের প্যাঁচ—দুহিতার প্রতি পিতার 'চিরন্তন' কাম প্রবৃত্তি ; এবং যে বিশেষ সুরে তিনি উপন্যাসটি বেঁধেছেন সেটিও নিগ্রো প্রভৃতি 'আদিম' জীবন নিয়ে খেপে ওঠা এক ধরনের অবক্ষয়ী পশ্চিমী শিল্পীদেরই কথা মনে করায়। তাদের তুলনায় তারাশঙ্করের কৌশল অনেক নিম্নস্তরের এইমাত্র তফাত।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' শিল্পী তারাশঙ্করের যে অধঃপতন ঘটে ছিল তার সকরুণ পরিণতি হল 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'। এই দুই কাহিনীতেই তারাশঙ্কর নিঃশেষে বর্জন করেছেন বাস্তব মানুষকে, এবং নিজেকে ও পাঠকদের আচ্ছন্ন করতে চেয়েছেন শুধু ভঙ্গি দিয়ে, শুধু বাচালতা দিযে, শুধু অলীক আবেশ দিযে।

কংগ্রেসী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই আরো অনেকদিন বেঁচে থাকবেন। কিন্তু 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' যদি বেঁচে থাকে তবে থাকবে একজন শিল্পীর অপঘাতের ইতিকথা হয়ে।

ননী ভৌমিক

MY SONG IS FOR ALL MEN—Peter Blackman. Lawrence and Wishart. London. 1s. 6d.

প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, কলিকাতা ১২।

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান আব ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি বিশ্বসাহিত্যে যে-কাব্যরীতির চল করেছিলেন, একালে যে-রীতিকে আরও পরিপুষ্ট করেছেন পাব্‌লো নেরুদা, পিটর ব্ল্যাক-ম্যানের 'মাই সঙ ইজ ফর অল মেন' নামের কাব্য-পুস্তিকাটি কবিতার সেই ধারারই সব-চেয়ে আধুনিক সংযোজন।

উনিশ শতকে হুইট্‌ম্যান একদিন কবিতার মুক্তি ঘটিয়েছিলেন অভাবনীয় উপায়ে। কবিতাব জগতে আকাঁড়া জীবনকে আর তার প্রকাশের উপযোগী আবেগবহ গদ্যে চড়া সুবে কথা বলার ভঙ্গি আমদানি করে কবিত্বের প্লাবনে গদ্য-পদ্যের ব্যবধানকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, কবিতাকে করে তুলেছিলেন জীবনের মতোই বিচিত্র, সর্বত্রগামী। বিশ শতকে আর একদিন মায়াকভ্স্কি তাঁব নিজস্ব ধবনে সেই ধারাকেই আবো প্রসারিত করেছিলেন, পরিপুষ্ট করেছিলেন। চড়া সুরের কথ্যভঙ্গিতে কবিতায় সাংবাদিকতা ও সুরাসরি রাজ-

নীতির আমদানি করেছিলেন তিনি। অথচ ছন্দোবন্ধ পদ্যই ছিল তাঁর কবিতার বাহন, যদিও সে-পদ্যের সঙ্গে গদ্যের তফাত ছিল যৎসামান্য, গদ্যের মতোই সে-পদ্য ছিল সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। আর একালে 'স্পেন ইন দি হার্ট' ও 'লেট্ দি রেইল-স্প্লিটার এ্যাওয়েক'-এর কবি নেরুদা তাঁর কাব্যে মায়াকভ্স্কির অগ্রসর সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে হুইট্ম্যানের প্রাণোচ্ছল দরাজ গলাকে মিলিয়েছেন। এই নেরুদারই প্রত্যক্ষ উত্তরসাধক আমাদের আলোচ্য কবি পিটর ব্ল্যাকম্যান।

হুইট্ম্যানের 'আমি'ত্ব যেমন গণতন্ত্রী আমেরিকার আত্মঘোষণা, মায়াকভ্স্কির যেমন সমাজতন্ত্রী সোবিয়েতের আত্মপ্রতিষ্ঠা, পিটর ব্ল্যাকম্যানের 'আমি' তেমনি দুনিয়ার শৃঙ্খলিত মানবসমাজের, বিশেষ করে সে-সমাজের সবচেয়ে নির্যাতিত সবচেয়ে শোষিত অংশ কালোচামড়া-মানুষের 'কালা-আদ্মি'র প্রতিনিধি-কণ্ঠ ঃ

I am the black man
I hide with pigmies in the hot depth of the forest that is Africa's girdle
I am the Zulu striding hot storm over the brown whispering veldt..
I am all that is Africa I reach out to embrace those who have left me

চার পর্বে সম্পূর্ণ ষোলো পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ কবিতাটির প্রথম অংশে আছে আশ্চর্য করিত্বে উদ্ভাসিত আরও এমন আত্মপরিচয়-সূচক পঙক্তি যা শুধু হুইট্ম্যানকেই স্মরণ করায় ঃ

I bring rough hands calloused in the tumult of weariness
Strong-boned not given to prayer force strained to hard bruising
Bearing rough burdens to enrich men in England America
France Holland Brazil. I work for my bread

কিংবা ঃ

A woman comes with me long-limbed high-bosomed proud of countenance
She walks abroad her presence dressed
Fluent of Earth and love
Sweet as the fresh-rained corn at early morning

একে শুধুমাত্র নির্যাতিত-শোষিত মানুষের কণ্ঠ বলে ভুল করা চলে না। আলজেরিয়া-লিবিয়া থেকে কেনিয়া, গোল্ড কোস্ট থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা—বহিমান আফ্রিকা মহাদেশের বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর এ। এ-কণ্ঠস্বর অভ্রান্ত। দেশে দেশে, আলাবামা-বার্বাডোস-লণ্ডন-টেক্সাসে 'কালা-আদ্মি'র উপস্থিতিতে যারা অস্বস্তি বোধ করে, জোহানেসবার্গে যাদের শিশুরা বয়স বাড়লে গায়ের রঙ্ শাদা হওয়ার অধিকারে কালো মানুষকে লাথি মেরে ফেলে দেয় নর্দমায়, আমেরিকায় মার্টিন্স্ভিলে শ্বেতাঙ্গ বেশ্যার মুখের কথায় যারা কালো-চামড়ার মানুষকে শূলে চড়ায় আর নিজবাসভূমে মানুষকে পরবাসী করে রাখে মানুষের যে-শত্রুরা, সাম্রাজ্যমাতাল সেই শ্বেতাঙ্গ প্রভুশ্রেণীর বিরুদ্ধে অপরূপ ক্রোধের অভিব্যক্তি এ-কণ্ঠস্বর ঃ

Strong anger is knotted to my every desire
Bathing my limbs and refreshing the promises
Made for the reckoning
You will remember the reckoning

কিন্তু পিটর-ব্ল্যাকম্যান এও জানেন যে এই সাম্রাজ্যলিপ্সু শাসকগোষ্ঠী শুধুই নিগ্রো মানবগোষ্ঠীর প্রভু নয়, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের ওপর এদের প্রভুত্ব। এদের অত্যাচার

শুধু আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ নেই, ইওরোপ-আমেরিকা-এশিয়া-অস্ট্রেলেশিয়া সর্বত্রই এদের হাতে মানুষের রক্ত, মালয়-কোবিষা-হিরোশিমা-মাদাগাস্কাব-বেল্‌সেন-বুকেনওয়াল্‌ডের বন্দী-শিবির সর্বত্রই এরা শাদা-কালো-তামাটে-পীত সমগ্র মানবসমাজের শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাই এদেব বিরুদ্ধে ক্রোধ তাঁর তীব্রতর, ঘৃণা পর্বতপ্রমাণ ঃ

....Oh men of Europe Asia America and all the sea islands
Come near and look at these faces....
You will find them to-day
In London Paris New York Buenos Aires Madrid and Berlin
One and all for themselves very superior persons
The Bitch of Belsen too was a very superior person...

কাব্যালঙ্কাব, শব্দঝঙ্কার দূরে সরিয়ে তাই এদেব মৃত্যুপরোয়ানা লেখেন তিনি সহজ সরল ভাষায়—আর মানুষের ক্রোধ আর ঘৃণার সে-ভাষা হযে ওঠে অমোঘ ঃ

I shall forget nothing
I lay it all to your account
I shall forgive nothing
I shall not mime with withered fingers
In the days not far off when we measure our strength

এই চরম বোঝাপড়ার অনিবার্যতা ও তার ফলাফল সম্পর্কে কবির মনে কোনও দ্বিধা নেই। তিনি নিশ্চিত জানেন, সারা পৃথিবী জুড়ে বঞ্চিত ও পদানতদের শেষ বিজযের দিন আসছে। তিনি জানেন, প্রভুশ্রেণী যে নিজেব পাপে নিজে ডুবতে বসেছে, পৃথিবী আর তার পাপের বোঝা বইতে পারছে না, এইটেই শুধু একমাত্র সত্য নয়। সবচেয়ে বড় সত্য এই যে, পৃথিবীব সব মানুষের যন্ত্রণা এক, সে-যন্ত্রণার উৎস থেকে উৎসারিত প্রতিরোধের ধরনও এক আর সেই প্রতিরোধই আজ দেশে দেশে মানুষকে বাঁধছে রক্তের রাখিবন্ধনে। দেশে দেশে যন্ত্রণার কাঁটা উপড়ে ফেলে সুখী জীবনের উৎস-সন্ধানে মানুষ ক্রমশ একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ। ব্ল্যাকম্যানের কণ্ঠস্ববে তাই শেষপর্যন্ত ক্রোধের বজ্রনির্ঘোষ ছাপিয়ে মানবমৈত্রীর সাত সাগরের কল্লোল শোনা যায়। তিনি বলেন, মার্কস-লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বেই এক-মাত্র মানবসমাজের মুক্তি আসন্ন, তিনি স্বপ্ন দেখেন মানুষের মুক্তিতীর্থ মস্কোব, জুলিয়াস ফুচিকের আত্মদান, নাজিম হিকমত-পাবলো নেরুদা-এমি সিয়াও-পল রোবসনের প্রতিরোধ তাঁকে উজ্জীবিত করে, দূবে কোরিয়ার মুক্তিযুদ্ধ হৃদযের রক্তগোলাপকে তাঁব আরও রাঙিয়ে তোলে ঃ

On my heart is a rose a red rose a whole land scarleted courage
For the roses are red in Korea all the earth is a rose staunched
in the blood of its people

আব তিনি অনুভব কবেন, শৃঙ্খলিত পৃথিবীব মুক্তির সঙ্গেই কালোচামড়া-মানুষেব মুক্তিব সমস্যা জড়িয়ে আছে; কালো মানুষরা আর বিচ্ছিন্ন নয, তিনি একা নন ঃ

From Paris Morocco Alaska Calcutta the echoes come back to
batter the door of my prison
Brown hands black hands white hands yellow hands
Flatten the walls of my cell
Now I go into the daylight to continue my song, my song this
strong hope
The pledge that today we shall live the assurance of all our
tomorrows

আর এই উদার আহ্বান যখন সুদূর কলকাতায় বাদামিচামড়ার মানুষ আমাদের কানে এসে পৌঁছয় তখন অনুভব করি আমরাও আর একা নই, আমাদের জীবন আর সংগ্রামও বিচ্ছিন্ন নয়।

মানবমুক্তির হাজার কণ্ঠের স্তোত্রে আরও একটি শক্তিশালী নতুন কণ্ঠ যুক্ত হল।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সংগীতের সামাজিক ভিত্তি

HOW MUSIC EXPRESSES IDEAS: Sidney Finkelstein. Lawrence & Wishart, 1952. 8s. 6d.

সমাজে যন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ইওরোপে মানবচেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐদেশের সংগীত যতটা মিশ্ররূপ গ্রহণ করেছে আমাদের দেশে ততটা হয়নি। ইওরোপে অপেরা কিংবা সিম্‌ফনি সংগীতে সামাজিক ভাবধারাকে প্রকাশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ভাগ্‌নারের (Wagner) যেকোনো অপেরা, বিটোফেনের পঞ্চম সিম্‌ফনি, কিংবা আধুনিককালে শস্তাকোভিচের 'লেনিনগ্রাদ' সিম্‌ফনির কথা উল্লেখ করতে পারি। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে এধরনের কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। এখানে যে-সমস্ত রাগ-রাগিণী তা দিনরাত্রির বিভিন্ন ক্ষণের মনোভাব কিংবা বিভিন্ন ঋতুতে মনের আবেগকেই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। এদিক থেকে পাশ্চাত্য সংগীতের সামাজিক ভিত্তি যতটা প্রত্যক্ষ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ততটা নয়। তাছাড়া, সমাজব্যবস্থার দ্রুত বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের কাঠামোয় নানা রকমফের হয়েছে যা আমাদের দেশে হয়নি। এথেকে আমরা বুঝতে পারি ইওরোপীয় সংগীতের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা যতটা সহজসাধ্য ব্যাপার ভারতীয় সংগীতের ততটা নয়।

কিন্তু এই ইওরোপীয় সংগীত সম্পর্কেও মার্কসবাদী আলোচনা সহজলভ্য নয়। সংগীতের সামাজিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা সম্পর্কে লিখিত সিডনি ফিঙ্কেলস্টিনের আলোচ্য বইটি নানাদিক থেকে প্রণিধানযোগ্য। এই বোধহয় প্রথম মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ইওরোপের গত তিন-চারশ বছরের সংগীতধারাকে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলেই বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে মূল দৃষ্টিভঙ্গির শুধুমাত্র একটি খসড়া ১১৮ পৃষ্ঠার পরিসরে উপস্থিত করা হয়েছে। এবিষয়ে ব্যাপক আলোচনার পথ প্রশস্ত করাই লেখকের আসল উদ্দেশ্য। সংগীতের উৎপত্তি যে সামাজিকভাবেই একথা আজ আর কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। প্রাচীন গোষ্ঠীসমাজে নানা ক্রিয়াকলাপ, শস্যবপন, বৃষ্টি আনা প্রভৃতি যে-সমস্ত নাচগানের অনুষ্ঠান হত, তা থেকেই পাশ্চাত্য সংগীতের সামাজিক ভিত্তির শুরু। কৃষিপ্রধান সমাজে প্রথমে গ্রামে নানা আচার-অনুষ্ঠানে সংগীতের প্রচলন এবং পরে ফিউডাল রাজদরবারে ও চার্চে এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। গোষ্ঠীগত সমাজে সংগীতের যে প্রত্যক্ষ আবেদন বজায় ছিল তা পরেকার যুগে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই অপ্রত্যক্ষ ও মার্জিত রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু এসত্ত্বেও সংগীতের সামাজিক রূপের বিষয়টি মোটেই বিনষ্ট হয়নি। যেমন চার্চ-সংগীতে দেখা যায় এর বাহন ধর্ম হলেও বহুলোক সমবেত হয়ে একসঙ্গে এতে অংশগ্রহণ করছেন এবং সকলেই সমভাবে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। এরপর ধনতন্ত্রের যুগে এল কনসার্ট হল অর্থাৎ সমবেতভাবে যন্ত্রী এবং শ্রোতার একত্র সমাবেশ। কনসার্ট হল-এর প্রবর্তনের ফলে একমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সংগীতের প্রচার ব্যাপকতম রূপ গ্রহণ করল। ধনতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় অবশ্য এক বিরাট জনসমষ্টি অর্থাৎ শ্রমিক-

শ্রেণী সংগীতের প্রকৃত উপভোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব এক-মাত্র সমাজতান্ত্রিক ওয়ার্কার্স ক্লাব, কালচার প্যালেস, এ্যামেচার সংগীত-দল প্রভৃতির দ্বারা। যাই হোক এ থেকেই বোঝা যায় পাশ্চাত্য সংগীতের সামাজিক টান সব সময়েই বজায় থেকেছে।

সাহিত্যের তুলনায় সংগীতের আবেদন অনেকটা অ্যাবসট্রাক্ট, কারণ সংগীতের ভাষা হচ্ছে ধ্বনি। সুতরাং প্রশ্ন করা যেতে পারে কোনো সংগীত প্রগতিশীল কি নয় তা বিচারের উপায় কি? প্রথমে মনে রাখতে হবে ধ্বনি এক ধবনের নয়। ধ্বনির গতিপথকে নানাভাবে ব্যাহত করে তার বিভিন্নতা সৃষ্টি করা হয়। একেই ইংরেজীতে Percussion বলা হয়ে থাকে, এবং যে-সমস্ত যন্ত্রে ধ্বনির গতি এইভাবে পরিচালিত তাকেই Percussion instrument বলা হযে থাকে। ইওরোপীয় অর্কেস্ট্রায wind-জাতীয় যে-সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা এর মধ্যে পড়ে। এ ছাড়াও অবশ্য ইওরোপীয় সংগীতের মূল পিযানো ও তারের যন্ত্রগুলির ধ্বনিবৈচিত্র্য তো রযেছেই। যাঁদের কনসার্ট হল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা দেখেছেন সিমফনিতে কত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখন ধ্বনির এই যে বিভিন্ন স্তর তাকেই ব্যবহার করে কালোপযোগী সংগীত সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমরা জানি, প্রত্যেক সমাজেরই একটা আবেগগত পটভূমিকা (emotional background) আছে। এর সৃষ্টি অবশ্য আধিভৌতিক ভাবে নয, বরং সমাজবদ্ধ মানুষের ঐ বিশেষ কালের সম্পদ এটি। এখন পর্যন্ত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রেণী তাদের নতুন কর্মপ্রেরণা ও ঐশ্বর্য অনুযায়ী এক ভাবসম্পদ সৃষ্টি করে নিযেছে। যে সংগীত বা ধ্বনিসমন্বয় ঐ বিশেষ যুগের ভাবসম্পদকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে সেটাকেই প্রগতিশীল পর্যাযে ধরা হয়েছে। এখানে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিটোফেনের সময়ে সমাজটা ছিল সামন্ততন্ত্রের অবসানের ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার—সামন্ত-তান্ত্রিক রীতিনীতির নিগড় থেকে ব্যক্তির মুক্তি ছিল তার লক্ষ্য। সুতরাং এই সময়ে কোনো সংগীতকার যদি সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত আবহাওযার উপযোগী হালকা আর উচ্ছল সংগীত রচনা করতেন তবে তাঁকে নিশ্চযই প্রগতিশীল বলা চলত না।৯ অন্যদিকে বিটো-ফেনের মধ্যে আমরা ধ্বনির যে বলিষ্ঠ বিস্তার ও উচ্চ সুর লক্ষ্য করি তা একটা দ্রুত পরি-বর্তনশীল জগতের খুবই উপযোগী। বিটোফেনের সিমফনিতে আবেগের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সংঘাতের যে বিশেষ স্থান, লেখক তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিটোফেনের সংগীত যাঁরা শুনেছেন তাদের কাছে এ-কথা আর পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে না। ইওরোপীয় সংগীতের ধারায় প্রগতিশীল শিল্পী বিটোফেনের স্থান তাই এতটা উঁচুতে। আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা তুললে তো এ জিনিসটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে লেনিনগ্রাদের অবরোধের মধ্যে বাস করে সেই সংগ্রামী পরি-স্থিতির ভাবগত রূপ দিলেন শস্তাকোভিচ তাঁর লেনিনগ্রাদ সিম্‌ফনি'তে। এই সংগীত-কারই মহাযুদ্ধের পরে সোবিয়েত দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মানুষের মনে যে শান্তির কামনা উদগ্র হয়ে উঠেছে তার উদ্দেশে 'সং অব ফরেস্ট' সংগীত সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া সোবিয়েতের বিভিন্ন ফিল্মে, বিশেষ করে 'ফল অব বার্লিন'-এ সংগীতের সার্থক প্রয়োগও আমরা লক্ষ্য করেছি।

বিটোফেনের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। তাঁর সংগীতের বলিষ্ঠ আঙ্গিকের কথাও উল্লেখ করা হযেছে। কিন্তু বিটোফেনের সময উঁচু সুরের সৃষ্টি যা ছিল একান্ত

স্বাভাবিক সেই জিনিসটাই পরেকার অনেক শিল্পীর কাছে বাতিক (ফেটিশ) হয়ে দাঁড়াল। উদাহরণস্বরূপ ভাগনারের কথা ধরা যেতে পারে। তিনি অনেক সংগীতসৃষ্টিতে যে-পরিমাণ বিরাট অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করেছেন তা ইওরোপীয় সংগীতের ধারায় আর কোনো পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় না। ভগবান সবকিছুকেই বড়ো করে উপস্থিত করার চেষ্টা করে-ছিলেন। তাঁর অর্কেস্ট্রাতে অতীতের সমস্ত কিছু সংগীতের একটা মিলিত রূপ উপস্থিত করার চেষ্টা দেখা যায়। তাঁর রচনাগুলিও অত্যন্ত দীর্ঘ, কণ্ঠসংগীত অত্যন্ত চড়া, এবং মঞ্চসজ্জাও জাঁকজমকপূর্ণ। কিন্তু নতুন টেকনিকের নামে এই যে আড়ম্বর তার অর্থ কি তা ভাগনারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর সংগীতে প্রকৃতিকে ধ্বনির মারফত উপস্থিত করার সার্থক প্রচেষ্টা আছে; তবে এ 'ন্যাচারালিজম' বাস্তবকে জানার সাহায্য করে না। আধুনিক টেকনিককে ব্যবহার করেও ভাগনারের সংগীত পিছনের দিকে পদ-ক্ষেপ। এ ছাড়া তাঁর নাটকের অংশে যে ভাবধারা তাও অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। ভাগনারের সঙ্গে তুলনা করলে অন্যান্য কয়েক জন শিল্পীর, যেমন ইতালির গুমেন ভার্দি কিংবা রাশিয়ার মুসর্গস্কি, গ্লিন্‌কা, বালাকিরেফ, রিম্‌স্কি-কর্‌সাকফ প্রভৃতির প্রগতিশীল ভূমিকা সম্বন্ধে সহজেই সচেতন হতে পারি। ভার্দি ইতালির লোকসংগীতকে তাঁর সৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে স্থান দিয়েছেন। তিনি জনগণের সংগীতকেই নতুনভাবে পরিবেশন করেছেন। রাশিয়ার যে কজন শিল্পীর নামোল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সৃষ্টি এই কারণেই মহৎ যে তা জাতীয় সংস্কৃতি আন্দোলনের অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি রাশিয়ায় এই জাতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয় পুশকিন থেকেই। যাঁরা রাশিয়ান ফিল্ম 'মুসর্গস্কি' দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে এই একজন শিল্পী রাশিয়ার জাতীয় সংগীত সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। মুসর্গস্কির 'বোরিস গোদুনফ', রিম্‌স্কি কর্‌সাকফের 'গোল্ডেন কক্‌রেল', গ্লিন্‌কার 'ইভান সুসানিন', চাইকভ্‌স্কির 'ইউজিন অনেগিন', ও 'কুইন অব স্পেড্‌স্' পাশ্চাত্য সংগীতের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এই সমস্ত রচনায় রাশিয়ার জাতীয় চরিত্রের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে বলে রাখা ভালো-ভাগনারের মধ্যে আমরা যে বিচ্যুতি লক্ষ্য করি তারই পরিণত রূপ (অর্থাৎ বাস্তব থেকে সরে দাঁড়ানো) পরবর্তী শিল্পী শুমান্, বেরলিঅজ ও লিস্ত্ প্রভৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য সংগীতের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ফিঙ্কেলস্টিন দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি atonal music এবং দ্বিতীয়টি polytonal। ফিঙ্কেলস্টিনের মতে atonal সংগীতের সংজ্ঞা এইরূপ: It carries forward the subjective uses of harmony, the movement from key to key and the use of chromatic tones or half-steps outside the key, to the point where all sense of key of a tonal resting place is lost. এই ধরনের সংগীতে ইওরোপীয় সুরের যে বাদী (consonances) প্রতিবাদী (dissonances) ধারা তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এখানে সব সময়েই এক অস্থিরতার ভাব লক্ষণীয় যা শ্রোতাদের মোটেই নাড়া দেয় না। অনেকের হয়তো মনে আছে কয়েক-বছর আগে সোবিয়েত রাশিয়ায় শিল্পসাহিত্যের সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল সে সময়ে জ্‌দানভ্ সোবিয়েতের কয়েকজন সংগীতকারের সৃষ্টির এই atonality-র ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বর্তমানে পাশ্চাত্যে এই সংগীতের প্রধান ধারক হচ্ছেন ভিয়েনার আর্‌নল্ড্ স্কোন্‌বার্গ। এর পর polytonal সংগীত

সম্পর্কে ফিঙ্কেলস্টিন বলেছেন: It offers music as an exercise in pure form, and presents musician as an artisan, or sometimes as a 'scientist' of acoustics. বর্তমানে পাশ্চাত্যে এ সংগীতের ধারক হচ্ছেন রাশিয়া থেকে ১৯১৭ সালে পলাতক জমিদার আমেরিকানিবাসী ইগর স্ট্রাভিন্‌স্কি।

ফিঙ্কেলস্টিনের বইয়েব শেষের দুটি অধ্যায় নানাদিক থেকে মূল্যবান। একটিতে তিনি 'সংগীত ও সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; অপরটিতে আমেরিকায় সংগীতের বর্তমান অবস্থার উপর মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের দেশে লক্ষ্য করা যায় যে সংগীতকারেরা সব সময়েই তাঁদের সৃষ্টিকে উন্নত এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপযোগী করে তোলার প্রতি সচেষ্ট। এ ব্যাপারে তাঁরা আত্মসমালোচনার একান্ত পক্ষপাতী। সোবিয়েতের মানুষ যে সৃষ্টিশীল কর্মপ্রেরণার পথে অগ্রসর হয়ে চলেছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে সত্যিকার মহান এবং গাম্ভীর্যময় সংগীত রচনার অফুরন্ত সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে। সোবিয়েতের নতুন সমাজব্যবস্থায় সজীব ভাবসম্পদকে পরিপুষ্ট করে তোলার জন্যই শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন। সোবিয়েত শিল্পীর উপব দায়িত্ব বড় কম নয়। একদিকে ১৯১৭ সালের আগে মুসর্গ্‌স্কি, গ্লিন্‌কা, চাইকভ্‌স্কির যে জাতীয় সংগীতের ঐতিহ্য তাকে এগিয়ে নিযে যেতে হবে। অপর দিকে সোবিযেতের মানুষের নতুন সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও মেটাতে হবে। এদিক থেকে সোবিয়েত সংগীতকারেরা ভুয়া আন্তর্জাতিকতার পিছনে না ছুটে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রকৃত উৎকর্ষের মধ্য দিযে সংগীতে আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে আমেরিকায় বর্তমান সংস্কৃতির দুর্দশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংগীতকে এখানে পুরোপুরি 'কর্মাশিযাল' করে ফেলা হয়েছে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে আমেরিকায় ইওরোপেব বিভিন্ন জাতিব লোকেদের সমাবেশ ঘটায় এখনও পর্যন্ত সংগীতেব ক্ষেত্রে কোনো পরিষ্কার ধারা লক্ষ্য করা যায় না। সবচেয়ে বড়ো কথা, নিগ্রো সংগীত—যা একমাত্র আমেরিকার জাতীয় সংগীতের ঐতিহ্য সৃষ্টিতে প্রধান সহাযক—তাকে নানাভাবে ব্যাহত করাব চেষ্টা চলেছে। এ ছাড়াও আমেবিকায কৃষিক্ষেত্রের অঞ্চলগুলিতে বহু লোকসংগীত রয়েছে যা সংগীতের বিকাশে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু সেদিকে কোনো দৃষ্টিপাত করা হয়নি।

ফিঙ্কেলস্টাইন তাঁর বইয়ের শেষে সংগীতের টেকনিকাল শব্দগুলির অর্থবোধক সংজ্ঞা জুড়ে দিয়ে বইটিকে যথেষ্ট মূল্যবান কবে তুলেছেন। আলোচনার অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও আলোচ্য বইখানি পাশ্চাত্য সংগীতের প্রত্যেক প্রগতিশীল রসগ্রাহীকে সংগীতের সামাজিক মূল্য অনুধাবন করায় সাহায্য করবে।

প্রভাতকুমার দত্ত

কর্মবীরদের কাহিনী

TOP-QUALITY TEAM: Alexander Chutkikh. As. 2.
NOTES OF AN ENGINEER: Lev Podvoisky. As. 3.
A QUARTER OF A CENTURY AT THE OPEN-HEARTH FURNACE: V. Amosov. As. 6.
NOTES OF A STAKHANOVITE: Illarion Yankin. As. 3.
Current Book Distributors: 3/2, Madan St. Cal.—13.

সমাজতন্ত্রের দেশ সোবিযেত ইউনিয়নে শ্রমিকদের জীবনে; তাদের কর্মপদ্ধতিতে যে বিবাট বৈপ্লবিক পবিবর্তন ঘটেছে তাবই বিবরণ পাওয়া যায় উপরের এই চারখানা বইতে। বইগুলির লেখকেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সারা দেশজুড়ে বিখ্যাত। উৎপাদন-পদ্ধতির নবতব বিকাশে, অধিকতর উৎপাদনের ব্যাপারে এঁরা প্রত্যেকেই পথিকৃৎ। লোহাব কারখানাই হোক আর কাপড়ের কলই হোক বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টায় যে কত দ্রুত উন্নতি ঘটছে তারই কাহিনী এতে আমরা পাই।

'নোট্‌স অব এ ইঞ্জিনিযার'-এর লেখক লেভ্‌ পদ্‌ভইস্কি মস্কোর বিখ্যাত 'কাস্তে ও হাতুড়ি' কাবখানার ইঞ্জিনিয়ার। কলেজের পড়া শেষ করে তিনি এই কাবখানায় আসেন কাজ করতে। পুরনো কাজের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি পালটে নতুন কর্মপদ্ধতি ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতি তৈরি ও ব্যবহারের কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী। দেশের শিক্ষা শেষ করে বিদেশে গিয়ে যেসব সোবিয়েত যুবক পুঁজিবাদী শিল্পের শ্রেষ্ঠ কর্মপদ্ধতি হাতে-কলমে শিখে এসে, সেই শিক্ষাকে সমাজবাদী চেতনার সঙ্গে যুক্ত কবে সোবিয়েত শিল্পের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন তারই সুন্দর বিবরণ পাওয়া যাবে পদ্‌ভইস্কির এই গ্রন্থে। বইটি শুধুমাত্র পদ্‌ভইস্কির ব্যক্তি-জীবনের কাহিনী-নয়। এই বই-এর মারফত আমবা সোবিযেত ইঞ্জিনিয়ারিঙ্‌ শিল্পের ক্রমবিকাশের সুন্দর চিত্র পাই। সোবিয়েত ইঞ্জিনিযারিঙ্‌ শিল্পের ক্রমোন্নতি আবও বেশি ভালো করে বুঝি পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে তার তুলনামূলক বিচারে। শুধু কর্মক্ষেত্রে উন্নতিই নয়, শ্রমিকদের জীবনে যে সামগ্রিক পরিবর্তন এসেছে—কর্মে ও চিন্তায়—তারও বিবরণ মেলে এতে।

'টপ কোয়ালিটি টিম'-এ আমরা পাই যুদ্ধোত্তর সোবিযেত কাপড়-কলের উন্নতির এক সুস্পষ্ট ছবি। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার সময় দ্রুত যুদ্ধ-ক্ষতি সামলে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবাব প্রযাসের ভিতরই জন্ম হয় 'টপ কোয়ালিটি টিম' আন্দোলনের। এই আন্দোলন স্তাখানোভাইট আন্দোলনের মতো ব্যক্তির উন্নতির আন্দোলন নয়, এ আন্দোলন পুবো টিমেব সামগ্রিক উন্নতির। শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতও। উৎপাদন বাড়ালেই চলবে না, সেইসঙ্গে বাড়াতে হবে উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মানও। যদিও এ আন্দোলনের শুরু মস্কোব অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাপড়-কল ক্রাসনোহল্‌ম মিলে আলেকশান্দর চুত্‌কিখ্‌-এর নেতৃত্বে, এ আন্দোলন কিন্তু সীমাবদ্ধ রইল না কাপড় কলেব মধ্যেই। ট্রেড ইউনিযন, কমিউনিস্ট পার্টি ও সোবিয়েত সবকারের সমর্থনে এ আন্দোলন খুব শিগ্গিরই ছড়িয়ে পড়ে সোবিযেত শিল্পের বিভিন্ন শাখায়। যেমন কযলাখনির মজুর স্তাখানোভ-এব আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়েছিল সারা দেশের প্রতিটি শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে, কৃষিও বাদ যাযনি। স্তাখানোভ আন্দোলন যেমন জন্ম দিয়েছিল হাজার হাজাব স্তাখানোভাইটদের, তেমনি চুত্‌কিখেব নেতৃত্বে তাঁর টিম যে আন্দোলনের শুরু করে সামগ্রিক উন্নতির তা-ও ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। উৎপাদন ক্ষেত্রে সমাজবদী পদ্ধতি ও চেতনা পা বাড়ালো আর এক ধাপ।

'ওপন্‌-হার্থ ফার্নেসে পঁচিশ বছর' বইটি সোবিয়েতের অন্যতম স্তাখানোভাইট ইস্পাত-শ্রমিক ভি, আমোসভের আত্মজীবনী। সোবিয়েত বিপ্লবের পবে আমোসভ দনবাস-এর এক ইস্পাত কাবখানায যোগ দেন। আস্তে আস্তে সামান্য শ্রমিক থেকে তিনি উন্নীত হন বিখ্যাত স্টীল-মেল্টারে। অল্প সময়ে উঁচু মানের (হাই গ্রেড) ইস্পাত তৈরির ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। এ কাজে তিনি অবশ্য একমাত্র নন আর দশজনের মধ্যে একজন।

শুধু নিজের একার চেষ্টাতে নয়, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শ্রমিক, সোবিয়েত সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায়—তাঁর নিজের ও সোবিয়েতের ইস্পাত-শিল্পের ক্রমোন্নতির পরিচয় মিলবে এই বইটিতে।

'নোট্‌স অব এ স্তাখানোভাইট' বইটিও স্তাখানোভাইট শ্রমিক ইলারিঅন ইঅনকিন-এর আত্মজীবনী। সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে কি করে ইঅনকিন ধীরে ধীরে সোবিয়েত্‌ ইউনিয়নের তামাখনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রমিক হন তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে এই ছোট বইতে। ১৯৩৫ সালে দনবাস-এর কয়লা খনির মজুর স্তাখানোভ উৎপাদনবৃদ্ধির যে নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি করেন তা সারা সোবিয়েতের শ্রমিকদের মধ্যে আনে নতুন উদ্দীপনা। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিকতর উৎপাদন সম্ভব করতে যেসব শ্রমিক অগ্রণী হন ইঅনকিন তাঁদেরই একজন। কিন্তু স্তাখানোভাইটরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ থাকেন না। নিজের অভিজ্ঞতা ও কর্মপদ্ধতি আরও অনেক শ্রমিককে শিখিয়ে শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিরও চেষ্টা করেন। তাঁরা জানেন যে শুধু নিজের উন্নতি ও অভিজ্ঞতার কোনো দাম নেই, যদি না তা আর দশ-জনকে উন্নত করতে সাহায্য না করে। শুধু অপরকে শেখানোই নয়, নিজের চেয়ে উন্নততর শ্রমিকের কাছ থেকে শেখাও স্তাখানোভাইটদের বৈশিষ্ট্য। ফলে লাভবান হয় সমস্ত শ্রমিক ও সারা দেশ। সোবিয়েতের অভূতপূর্ব উন্নতি ও সাম্যবাদে অগ্রসর হবার পথে ইঅনকিন, চুতকিখ, পদ্‌ভইস্কি প্রভৃতিদের দান অপরিসীম।

শোষণহীন শ্রমিক রাষ্ট্রে দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও ব্যক্তিমানুষের বিকাশের নিদর্শন লেখকদের এই চারটি আত্মজীবনী। এই চারজনই শুধু নয়, আজকের সোবিয়েতে এমন হাজার হাজার শ্রমিক মিলবে যাঁরা নিজেদের দেশের উন্নতির জন্য, তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য কাজ করছেন। শিল্পের উন্নতির মূলে বিভিন্ন শ্রমিকের কি দান রয়েছে, নতুন সমাজে শ্রম সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকদের কি উন্নতি ঘটেছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই কখানি বই থেকে। পরিচয় পাওয়া যাবে সমাজবাদী চেতনা-সম্পন্ন কমিউনিস্ট শ্রমিকের।

সুবিমল সেন

ভারতের উপর আমেরিকার ছায়াপাত

AMERICAN SHADOW OVER INDIA: L. Natarajan: People's Publishing House Ld., Bombay 4. National Book Agency Ld., 12, Bankim Chatterjee Street, Calcutta 12. Price Rs. 5/-.

পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে আজ কোনো দেশই,—সে-দেশ যত বড়ো বা শক্তিশালীই হোক না কেন,—একলা, কেবলমাত্র নিজের জোরে, টিকতে পারে না। নিজে বাঁচবার জন্যও তাকে অন্য একটি বা একাধিক দেশের সঙ্গে পারস্পরিক বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে হয়। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো যে-সব দেশ দীর্ঘকাল ধরে বিদেশীর শাসনে ও শোষণে সর্বস্বান্ত হয়েছে, যেখানে বারো আনার বেশি লোক অশিক্ষিত, যেখানে চাষ অনুন্নত, ভালো শিল্প গড়ল না, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে-মহামারীতে কুকুর-বেড়ালের মতো মরে, বিদেশী শাসক পরিত্যক্ত ছোবড়ার মতো যে-দেশকে দেউলিয়া করে রেখে গিয়েছে, সেই ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার মতো পূর্ণ নূতনভাবে গড়ে উঠতে গেলে বিদেশীর সাহায্য যে অপরিহার্য, এ-বিষয়ে কোনো

সন্দেহ থাকতে পাবে না। সুতরাং তাকে কারো না কারো সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে হবে, কারো না কারো কাছ থেকে সাহায্য নিতেই হবে। কিন্তু সাহায্য নেওয়া আর নিজেকে বিকিয়ে দেওযা এক কথা নয়।

'একথা সকলেই জানে যে, পৃথিবীর আন্তর্জাতিক শক্তিপুঞ্জ আজ দুইটি জোটে বা 'ব্লকে' বিভক্ত। একটি হল আমেরিকার নেতৃত্বে পুরাতন ধারার ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, অন্যটি হল রাশিয়ার নেতৃত্বে নূতন ধারার সমাজতান্ত্রিক বা সমাজতন্ত্রাভিমুখী দেশসমূহ। তাদের মধ্যে চীন প্রধান।

ভৌগোলিক ও সামরিক দিক থেকে আজ ভারতবর্ষের মূল্য আন্তর্জাতিক জগতে খুব বেশি, বিশেষভাবে চীন যেদিন থেকে আমেরিকার হাতছাড়া হয়েছে। সেইদিন থেকেই আমেরিকার দৃষ্টি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের উপর পড়েছে এবং পড়াটাই স্বাভাবিক।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট 'স্বাধীনতা' লাভের পর থেকেই ভারত সরকার আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে বাববার 'নিরপেক্ষতা' ঘোষণা করে এসেছেন। তাঁরা বাববাব বলেছেন, কোনো 'ব্লক' বা জোটেতেই তাঁরা যোগ দিতে চান না, যখন যে-সব দেশেব কাছ থেকে যেরূপ সাহায্য নেওয়া ভারতের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হবে, তখন তাঁরা তারই কাছ থেকে সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

কিন্তু গত সাড়ে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় কার্যত দেখা গেল, ভারত সরকার ক্রমেই বেশি করে সাহায্য নিতে আরম্ভ করলেন আমেরিকার কাছ থেকে। শুধু যে সাহায্যের পরিমাণ ও দফাই বাড়ল তাই নয়, প্রত্যেক দফায় শর্তের কড়াকড়িও খুব বেড়ে চলেছে। এমন কি, এরই মধ্যে (মার্চ, ১৯৫১) আমেরিকার সঙ্গে ভাবতবর্ষ পাবস্পরিক সামরিক সাহায্য চুক্তিতেও আবদ্ধ হয়েছে, যদিও ভারত সরকার জনসাধারণেব কাছে প্রকাশ করেন নি, কোন্ কোন্ শর্তে তাঁরা আমেরিকার কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন।

এমন বেড়াজালে ভারতবর্ষ আমেবিকাব কাছে আবদ্ধ হয়ে পড়তে চলেছে যে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীব কাছে তা দিন দিন উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে উঠছে। হয়তো ব্রিটিশ দাসত্বেব দীর্ঘ দুই শতাব্দী পাব হতে না হতে আবার নূতনভাবে আমেরিকার কাছে দাসত্বের পর্যায় শুরু হতে চলল।

এই সময়ে আজ ভারতবাসীর কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে আমেরিকাকে জানবার, চেনবার ও তার সঙ্গে যে-সম্বন্ধ ভারত সরকার মাবফত দ্রুতগতি গড়ে উঠছে তার স্বরূপ বোঝবাব। কারণ, সময থাকতে সাবধান না হলে এই সম্বন্ধেব ফল ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের পক্ষে অদূব ভবিষ্যতে অত্যন্ত বিষময হযে উঠতে পাবে। এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কেব সঙ্গে ভারতবাসীব বাঁচা-মরার বিষয়টি অতিশয ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

অথচ আজ সঠিক চিত্র পাওয়া কঠিন। আমেরিকার ব্যযবহুল, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদূব-প্রসারী প্রচার বিভাগের জন্য যেমন একদিকে শিক্ষিত ভাবতবাসীব কাছে আমেরিকাকে ভারতের পরম উপকাবী উদারহৃদয় বন্ধু হিসেবে দেখানো হচ্ছে, ছবি-গল্প-সিনেমা-বক্তৃতা মারফত এবং রাশিযার বিরুদ্ধে কটূক্তিতে দেশ ভবে যাচ্ছে, তেমনি অপর পক্ষে সোবিয়েত, চীন প্রভৃতি দেশ কর্তৃক যেখানে তীব্র ভাষায় আমেরিকার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে সেগুলোকে রাশিযাব 'প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা' বলে উড়িয়ে দেবার প্রয়াস বেড়ে চলেছে।

এই আমেবিকা কর্তৃক রাশিয়ার ও রাশিয়া কর্তৃক আমেরিকাব পবস্পর দোষাবোপেব মধ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য সম্বন্ধে অল্পসন্ধানী সাধাবণ ভারতবাসীব পক্ষে প্রকৃত পক্ষ

খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠছিল। ঠিক এই সময়েই শ্রী এল্, নটরাজন্ দেশবাসীর প্রভূত উপকার করেছেন একটি অপূর্ব পুস্তক প্রণয়ন করে। বইটির নাম 'আমেরিকান্ শ্যাডো ওভার্ ইণ্ডিয়া' বা 'ভারতের উপর আমেরিকার ছায়াপাত'। বইখানি সমান ওজনের সোনার চেয়েও বেশি মূল্যবান, যদিও দাম মাত্র পাঁচ টাকা।

আজ শতাধিক বর্ষ ধরে আমেরিকার আন্তর্জাতিক নীতি, ভারত ও আমেরিকার সম্বন্ধ, আমেরিকায় ভারতীয়দের ভাগ্য ও ভাগ্যবিপর্যয়, বিশেষ করে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা কোন্ দৃষ্টিতে ভারতকে দেখতে শুরু করেছে এবং তার বিষয়ে কোন্ নীতি অবলম্বন করে চলেছে, সেই সব কথা গ্রন্থকার পক্ষপাতহীনভাবে ও ভূরি ভূরি তথ্যাদি-সমেত আলোচনা করেছেন।

বইখানি উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতার বা কটূক্তির বই নয়, দীর্ঘকাল কঠিন পরিশ্রমের ফলে গভীর গবেষণা-প্রসূত অথচ অত্যন্ত সহজ সাবলীল সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় অসংখ্য প্রমাণ-সমেত লিখিত বই। গান্ধীশিষ্য সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত শ্রীযুত জে, সি, কুমারাপ্পার মতো অ-কমিউনিস্ট নেতাকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, বইখানি হল 'a mine of information', বা 'তথ্যের খনি'। বইখানির ভূমিকাও তাঁরই লেখা।

এই বইয়ের শেষে যে গ্রন্থোক্ত প্রমাণপঞ্জী দেওয়া হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, বইয়ের মধ্যে গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বক্তব্যের সমর্থনে যে-সমস্ত প্রমাণাদি বিভিন্ন সূত্র থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার মোট সংখ্যা হল ৪৯২ বা পাঁচশোর কাছাকাছি। গ্রন্থকারের সব চেয়ে বাহাদুরি হল যে, অধিকাংশ তথ্য-প্রমাণ নেওয়া হয়েছে আমেরিকার সরকারী দফ্তর বা প্রামাণ্য মার্কিনী সংবাদপত্র বা পত্রিকা প্রভৃতি থেকে এবং ভারত সরকারের ইস্তাহার প্রভৃতি থেকে। রাশিয়ার বা কমিউনিস্ট দেশের প্রমাণ সামান্যই গৃহীত হয়েছে।

বইখানিতে আমেরিকার অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতি, অতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে লগ্নীকৃত মার্কিন মূলধনের পরিমাণ, এদেশে মার্কিন ও মার্কিন-সংযুক্ত ও প্রভাবিত যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা থেকে শুরু ক'রে ভারতে মার্কিন ধর্মযাজক ও ধর্ম ছাড়াও তাঁদের দ্বারা অন্যান্য নীতি প্রচারের কাহিনী, মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার এবং মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ ও তাদের কাজ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় অপর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদি-সমেত আলোচিত হয়েছে।

১৯৫২ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে নয়াদিল্লীতে যে 'কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়, সেই পুরো চুক্তিটি এবং তার উপর গান্ধী-পন্থী অর্থনীতিবিদ খ্যাতনামা শ্রীসুরেশ রমাভাই যে-সমালোচনামূলক পুস্তিকা লিখেছেন, সব সেই পুস্তিকাটি পর্যন্ত শ্রীনটরাজন্ তাঁর তথ্যবহুল গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত করাতে গ্রন্থটির মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে।

এই বইয়ে উল্লিখিত প্রায় চৌদ্দ আনা খবর সাধারণ ভারতবাসী জানতেন না, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এদেশের খুব অল্প-সংখ্যক সাধারণ সংবাদপত্রপাঠকই আমেরিকার 'হিমালয় নীতি'র খোঁজ রাখেন। অথচ শ্রীযুক্ত নটরাজনের বই পড়লে দেখা যায়, এই মার্কিনী 'হিমালয় নীতি'র আসল স্বরূপ কি এবং তার ভারতীয় নীতির সঙ্গে এই নীতি কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

যাঁরা আজ এদেশে আমেরিকার প্রচার-বক্তৃতা শুনতে যান, এবং আমেরিকার প্রচারণা লাইব্রেরি থেকে কেবলমাত্র মার্কিনী বন্ধুত্বসূচক ও উদার মহত্ত্বব্যঞ্জক গ্রন্থ নিয়ে পড়েন, সেই সব সাধারণ ভারতবাসীদের মধ্যে কজন এ-সংবাদ রাখেন যে, আজ অর্ধশতাব্দীরও

আগে ১৯০৭ সালে, আমেরিকানরা সেই দেশে বসতিকারী ভারতীয়দেব ঘরবাড়ি থেকে টেনে এনে জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিয়ে, শহরের মাঝখান দিয়ে তাঁদের ছাগল-ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শহরের বার করে দিয়েছিল, কারণ ভারতবাসী ছিল আমেরিকায় সবচেযে অবাঞ্ছিত অতিথি? কজন সংবাদ রাখেন যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ যে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাচ্ছিলেন, সেই আন্দোলনকে সমর্থন করবাব 'অপরাধে' জাত-মার্কিনী নাগরিককেও মার্কিন সরকার জেলে পুরেছিলেন?

কয়জন শিক্ষিত রবীন্দ্রভক্ত বাঙালী বা ভারতবাসী ও বছর-বছর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবকারী ছাত্রছাত্রী সংবাদ রাখেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের প্রথম আমেরিকা সফরকালে সেখানে তাঁর বিবুদ্ধে যে মিথ্যা কুৎসা রটনা করা হয়, দেশে ফিরে এসে তাব তীব্র প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় প্রকাশার্থে পাঠান আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্‌কে, অথচ ঐ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বিশ্ববরেণ্য ভারতীয়েরও ন্যায্য প্রতিবাদপত্র বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সম্মানরক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেণ্টা করেন নি, তাঁকে আত্মপক্ষসমর্থনেব সুযোগ দেন নি?

আজ যাঁবা গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণ করতে দেশবাসীকে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা কি জানেন যে, ইংলণ্ডের রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কন্‌ফারেন্সের পরে গান্ধীজীকে আমেরিকায় সফর করতে অনুরোধ করায় তিনি কি বলেছিলেন? তিনি সেই প্রস্তাব অস্বীকার করে জবাব দিয়েছিলেন 'আমেরিকায় গিয়ে আমি আমার দেশের দুঃখ ঘোচাতে পারব না। তারা অন্যের কথা শুনবে না। তারা লোকের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিতে, আকাশে তুলতে খুব দড়ো, কিন্তু কাজেব বেলায় ঠিক নিজেদের মতলবমতো চলে।'

এবূপ বহু সংবাদ প্রমাণ-সমেত বইখানিতে আছে। বইটি পড়লে বর্তমান পবিস্থিতিতে ঐ-সব পুরানো কথাও নূতন মূল্য নিয়ে আমাদের চোখের সামনে দেখা দেয়। 'স্বাধীন' ভারত সরকার গোড়ার দিকে সমস্ত প্রধান শিল্পের জাতীয়করণেব কথা, জমিদারী উচ্ছেদের কথা বার বার বলেছেন। আজ তাঁদের নীতি বদলেছে এবং আরো বদলাচ্ছে, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু কেন বদলালো বা বদলাচ্ছে তার আসল বাস্তব কারণ অনেকেই জানেন না, এই বইয়ে তার সন্ধান মিলবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালেব নীতিতে ও আজকের নীতিতে কিভাবে পবিবর্তন এসেছে এবং কেন এসেছে, সকলের মূলে ভিতর ও বাইরে থেকে আমেরিকার প্রভাব কিভাবে কাজ করছে, অকাট্য যুক্তি ও ভূরি ভূরি তথ্য সহযোগে যে-ভাবে গ্রন্থকার এই বইয়ে তার রহস্য উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন, তাতে পাঠকের চোখ খুলে যাবে। অথচ কোনো কটূক্তি নেই।

আজকাল খবরের কাগজ পড়েন প্রায় প্রত্যেকেই। অথচ সকলেই জানেন যে, খবরের কাগজে পুরো সত্য অল্পই বেরোয়। তার প্রধান কারণ হল, যে-সকল আন্তর্জাতিক সংবাদ-পরিবেশক প্রতিষ্ঠান আছে, তারা নিজেদের মতো ও তাদের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী কাটছাঁট কবে তবে খবর পরিবেশন করে। সুতরাং জাগতিক ঘটনা এবং মার্কিন-ভারত-সম্পর্কিত ঘটনা সম্বন্ধেও পাঠকদের যে-জ্ঞান হয়, সে-টা অধিকাংশ সময়েই অসম্পূর্ণ, একপেশে, এমন কি অনেক সময়ে একেবারে মিথ্যাব উপর প্রতিষ্ঠিত।

আজকের জাগতিক পবিস্থিতিকে বিশেষ করে নিজের দেশকে ও পশ্চিমী জোটের নেতা আমেরিকাকে ঠিকভাবে বুঝতে গেলে প্রত্যেক সংবাদপত্র পাঠকের এই বইখানি পড়া অত্যাবশ্যক। এই বই পড়া থাকলে তবে এদেশীয় ঘটনাগুলিকে তাদের আসল পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাবে। এ বই না পড়ে এদেশীয় বা আন্তর্জাতিক পলিটিক্স আলোচনা কবলে সেটা

যে কতখানি অজ্ঞতাপ্রসূত ও হাস্যকর হবে, বইখানি ভালো করে ও মন দিয়ে না পড়লে তা বোঝা কঠিন।

পরিশেষে, পরবর্তী সংস্করণের জন্য তিনটিমাত্র প্রস্তাব আমার আছে। প্রথম, কারিগরী সহযোগিতার মূল চুক্তিনামাটি যেমন গ্রন্থকার পরিশিষ্টে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে ঐ-সম্পর্কে অন্যান্য চুক্তিগুলিও (অন্তত আটটি প্রোজেক্ট-চুক্তি ভারত সরকারের সঙ্গে আজ পর্যন্ত হয়েছে) পরিশিষ্টে যোগ দিলে আরো ভালো হয়। দ্বিতীয়, সুরেশ রমাভাইয়েব পুস্তিকা-খানি যেমন পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে, তেমনি গান্ধীজীর অন্যতম কর্মী-শিষ্য ঠাকুরদাস ব্যাঙ ঘটনাস্থলে গিয়ে কমিউনিটি প্রোজেক্টের কাজ ও তার ফলাফল হাতেকলমে দেখে এসে যে-রিপোর্ট ছাপিয়েছিলেন, সেটিও সংগ্রহ করে পরিশিষ্টে যোগ করে দিলে বইখানির মূল্য আরো বেড়ে যাবে।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ প্রস্তাবটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। চিয়াং চীনে আমেরিকা দফায় দফায় মোট কত 'সাহায্য' করেছিল এবং কিভাবে তা ব্যয়িত হয়েছে ও সেই 'সাহায্য' সত্ত্বেও চীনের অবস্থা কি থেকে কিসে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং কেন দাঁড়িয়েছিল তার তথ্যাদি প্রকাশ করা ; এবং তুর্কী গ্রীস ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে যে-সব 'সাহায্য'-চুক্তি আমেরিকা আজ পর্যন্ত করেছে সেই চুক্তিনামাগুলি (যা পাওয়া যায়) ও সেই 'সাহায্যের' ফল সেই সব দেশে কিভাবে ফলতে শুরু করেছে—বিশেষভাবে দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, মধ্য-বিত্ত ও ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে সেই সব তথ্যাদি ও ঐ বিষয়ে প্রধানত মার্কিন সূত্র থেকে প্রমাণপঞ্জী উদ্ধৃত করে আর একটি পরিচ্ছেদ যোগ করা অথবা প্রয়োজন হলে একটি নূতন 'কম্প্যানিয়ন্ ভলিউম্' বা সহযোগী গ্রন্থ-প্রণয়ন করা। আশা করি সুযোগ্য গ্রন্থকার এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি স্মরণে রাখবেন।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, দেশকর্মী ও মধ্যবিত্তের বিশেষ করে ছোট-খাটো ব্যবসায়ীদেব এই বই অবশ্য পঠনীয়। ভারতের প্রত্যেকটি ভাষায় বইখানির অনু-বাদ হওয়া অবিলম্বে প্রযোজন।

যোগানন্দ দাস



ভ্রম সংশোধন

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীহেমন্ত মিশ্রের চিত্রপ্রদর্শনীর আলোচনা-প্রসঙ্গে কয়েকটি আপাতঃ তথ্যের ভুলেব প্রতি শিল্পী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ৩৭৩ পৃষ্ঠার ২য় লাইনে 'গুর্খালি' কথাটা 'খাসিয়া' হওয়া উচিত ছিল। ওই পৃষ্ঠারই চতুর্থ লাইনে 'কোহার'দের আমি আদিবাসী বলে উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু তাঁবা তা নন—এঁবা কাঁসারি-কাবুকর্মী। ৩৭৪ পৃষ্ঠার ২১ লাইনে শ্রীযুত মিশ্রের প্রদর্শনীর ৫৭নং ছবির আলোচনায় আমি যাঁদের চা-বাগানের শ্রমিক বলে উল্লেখ করেছিলাম, আসলে তাঁবা শ্রমজীবী হলেও চা-বাগানের শ্রমিক নন—স্ববোঝাবাহী ক্ষুদে ব্যাপারি। এই ভুলগুলো খুব গুরুতর কিছু না হলেও তথ্যের দিক থেকে নিশ্চয়ই 'পরিচয়'-পাঠকদের জানিয়ে রাখা উচিত। বলা বাহুল্য, এর জন্যে শ্রীহেমন্ত মিশ্রের চিত্রকলা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছুমাত্র বদ্‌লাচ্ছে না।

রবীন্দ্র মজুমদার

সংস্কৃতি সংবাদ

বিজ্ঞান কংগ্রেস এবং বিজ্ঞান

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪০তম বাৎসরিক অধিবেশন হয়। বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতবাসীর একটি গভীর শ্রদ্ধা বর্তমান। ভারতের পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উন্নতির একটি পথই হল বিজ্ঞানের গভীর অনুশীলন ও প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানের প্রচারের ব্যবস্থা। স্বভাবতই দেশের মানুষ ভারতের স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানকর্মীদের সম্মেলনের দিকে চিরকালই গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থেকেছেন, এবারও ছিলেন। বিশেষ করে স্বাধীনতার পরে তাঁদের এই প্রত্যাশা বেড়ে গেছে অনেকখানি।

কিন্তু এবার যেভাবে বিজ্ঞান কংগ্রেসটি পরিচালিত হল তাতে প্রত্যেকটি সৎ বিজ্ঞান-কর্মী ও জনগণ একটা তীব্র ব্যর্থতা বোধ না করে পারেননি। ভিড়াক্রান্ত প্রোগ্রাম ও শ্রুতিসুখকর প্রচারের অভাব ছিল না। কিন্তু অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিকই সমস্ত ব্যাপারটিকে একটি শখের মেলা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতেন না। কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক স্পষ্টভাষাতেই তাঁদের বিরক্তি প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মেজর জেনারেল শেখে তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে বিজ্ঞান কংগ্রেস তার চরিত্র হারাতে বসেছে এবং ভারতীয় ও বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের একটি প্রমোদসভায় পরিণত হতে শুরু করেছে। এই স্পষ্টোক্তিতে রাষ্ট্রনেতাদের মহলে খানিক অস্বস্তি জাগে বটে, কিন্তু কত-টুকু কর্ণপাত তাঁরা করবেন তা বলা কঠিন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্যই হল, বিজ্ঞান-কর্মীরা সারা বছরে যে সব গবেষণা করেছেন তার আলোচনা-সমালোচনার ব্যবস্থা করা এবং বিজ্ঞানগুরুদের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা ও উপদেশ গ্রহণ করে আরো ভালো বিজ্ঞান-অনুশীলন ও গবে-ষণার পথ উন্মুক্ত করা।

কিন্তু ঠিক এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকেই এবার ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এর জন্য প্রোগ্রামে বিশেষ কোনো সময়ই দেয়া হয়নি। তা নিয়ে কোনো আলোচনা হল না। তার বদলে সময় দেয়া হল শুধু রাষ্ট্রনেতা ও মন্ত্রীদের অভিভাষণের জন্য, আমন্ত্রিত বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের বক্তৃতার জন্য। এমন কি একটি বিদেশী ওষুধের কোম্পানির প্রতিনিধির নিজ পেটেণ্টগুলির প্রচারের জন্য। বাকি সময়টুকু চলে গেল চা-পান সভা ও সামাজিক মেলামেশার গহ্বরে। শেষ পর্যন্ত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ হোর যে সভা-পতির অভিভাষণ দেবেন ঠিক ছিল সেটিও বাতিল করতে হল রাষ্ট্রনায়কদের বক্তৃতার চাপে।

কংগ্রেসের আর একটি লজ্জাকর কীর্তি হল সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন, অথবা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের বৈজ্ঞানিকদের বর্জন করা। সকলেই জানেন এই সমস্ত দেশে আজ বিজ্ঞানের বিপুল প্রসার ঘটছে। তাঁরা নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করছেন। সকলেই জানেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেয়াল তুলতে গেলেই বিজ্ঞান তার বিশ্বতাৎপর্য হারিয়ে বসে।

অথচ সাম্প্রতিককালে এই প্রথম ভারতবর্ষ থেকে নিমন্ত্রণ গেল সবদেশে, শুধু নিমন্ত্রণ করা হল না সোবিয়েত চীন প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিকদের।

বিজ্ঞান কংগ্রেস এইভাবে জ্ঞান ও বুদ্ধির এমন এক চরম দৈন্য ও সংকীর্ণতা প্রকাশ করেছে যা বিজ্ঞানকেই রুদ্ধ করবে।

বিজ্ঞান কংগ্রেস দেশবাসীকে হতাশ করেছে, কিন্তু আশান্বিত করবে বিজ্ঞান কর্মী-দেরই আর একটি সংস্থা, বিজ্ঞান-কর্মী সমিতি। কংগ্রেস অধিবেশনের পরে ১৫০০ সদস্যবিশিষ্ট এই সমিতিরও বাৎসরিক অধিবেশন হয় লক্ষ্ণৌতেই। এঁদের সম্মেলনের একটা বৈশিষ্ট্যই হল বিজ্ঞানকর্মীদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে গভীর সচেতনতা। তাঁরা একটি প্রস্তাবে দাবি করেছেন আণবিক ও জীবাণু অস্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হোক, এবং এই ধরনের মারণাস্ত্র শানিত করার জন্য গবেষণা পরিত্যাগ করার জন্য তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছে যে, মোনাজাইট ধরনের সামরিক কাঁচামাল বাইরে চালান না দিয়ে দেশেই সেগুলির নিষ্কাশন করা হোক এবং বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে পেট্রল পাওয়া যায় কিনা তার অনুসন্ধান শুরু করা হোক।

উল্লেখযোগ্য যে মোনাজাইট সম্পর্কে ভারত সরকার একটি বিদেশী ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করেছেন কিন্তু চুক্তির শর্তাবলী প্রকাশ করা হয়নি। বঙ্গোপসাগরেও একটি আমেরিকান কোম্পানি ফোটোগ্রাফ প্রভৃতি সমেত একটি বিশদ অনুসন্ধানকার্য ও সার্ভে করেছেন, কিন্তু তার ফলও গোপন রাখা হয়েছে।

সম্মেলনে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট প্রতিবিধানের জন্যেও দাবি জানানো হয়েছে, কারণ এই সংকটের অবসান করতে পারলেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ ও অনুশীলন সম্ভব হতে পারে।

বিজ্ঞানকর্মী সম্মেলন যে দেশ-প্রেম ও বিশ্বশান্তির জন্য দায়িত্ববোধের দৃঢ় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন তাকে আমরা সাগ্রহ অভিনন্দন জানাই। **পরিমল চৌধুরী**

শিক্ষা এবং সরকারী হস্তক্ষেপ

শিক্ষা-সংকোচনের যে সরকারী নীতি চালু করা হইতেছে, তাহা এদেশের সমস্ত সংস্কৃতি কর্মীকেই চিন্তিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে জনগণ এবং ছাত্র-শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতি-কর্মীদের পক্ষ হইতে প্রতিবাদও গড়িয়া উঠিতেছে।

সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে আরো এক ধরনের যে বিপদ দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিও সমস্ত সংস্কৃতি কর্মী ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। এই বিপদটি হইল মার্কিন প্রভৃতি রাষ্ট্রের মতো শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারের ক্রমবর্ধমান হস্ত-ক্ষেপ এবং বিশেষ করিয়া 'অবাঞ্ছিত' নাম দিয়া খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের বিতাড়ন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশক্রমে বালীগঞ্জ মুরলীধর গার্লস কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল শ্রীভোলানাথ ঘোষের দশ বছরের চাকুরী খতম হইতে চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগীয় অধিকর্তা তাঁহার বিরুদ্ধে 'অবাঞ্ছিত' এই অস্পষ্ট অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই অভিযোগের প্রকৃত কারণ কি তাহা জানাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও শিক্ষা-দপ্তরের অধিকর্তার নীরবতা ভঙ্গ হয় নাই। উল্লেখযোগ্য যে শ্রীযুত ঘোষ এই কলেজে দশ বছরের বেশি কাজ করিতেছেন এবং শিক্ষক হিসাবে তিনি রীতিমত খ্যাতিমান। এই সরকারী নির্দেশের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থার অবৈতনিক সম্পাদক এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে জাতীয় সরকার যেরূপ হস্তক্ষেপের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা সত্যই পরিতাপের বিষয়—শিক্ষার প্রতি যাহাদের সত্যকার দরদ আছে

তাহাদের এই সরকারী হস্তক্ষেপ রোধে ব্রতী হওয়া আজ অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ সরকারী হস্তক্ষেপেব নীতিতে এখন, শিক্ষার সহিত সম্পর্কহীন কারণে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যায়তনের শিক্ষকদের শাস্তিদানের লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

আশা করি প্রত্যেকটি সংস্কৃতিকর্মী শিক্ষক-সংস্থার এই দাবিকে সমর্থন করিবেন এবং খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের বিতাড়নের এই জঘন্য আদেশের প্রতিবাদে দাঁড়াইবেন।

নগেন্দ্রচন্দ্র সেন

সংস্কৃতির তৃষ্ণা

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মতো বনেদী প্রতিষ্ঠানগুলির নায়কেরা যখন প্রত্যহ তাঁদের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন, যখন কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বর্তমান আয়োজনগুলিকেও সংকুচিত করার জন্য বদ্ধপরিকর, সেই সময় অন্যদিকে আরো কতকগুলি ঘটনা ঘটছে যা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

এটি হল, সরকারী দাক্ষিণ্যের অভাব সত্ত্বেও, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী গুরুদের ব্যর্থতা ও বিরূপতা সত্ত্বেও জনগণের সাংস্কৃতিক সৃষ্টি ও আয়োজনের এক স্বতস্ফূর্ত, সাংস্কৃতিক উদ্যম। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপিত স্তম্ভে দৃষ্টি দিলেই আন্দাজ করা অসম্ভব হবে না যে জেলায় জেলায়, পাড়ায় পাড়ায়, সংস্কৃতি সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠান এবং তরুণদের উৎসাহে রচিত হচ্ছে জনগণেব নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার কী বিস্ময়কর কাহিনী।

তার সব কাহিনী জানি না। তার সব খবর হাতে এসে পড়ে না। তবু যেটুকু খবর আমাদের দপ্তরে এসে পেঁছিচ্ছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট উৎসাহোদ্দীপক। এমনি এক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন—কলকাতার জাহাজী শ্রমিকেরা। বিলাতী মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতেই, এই অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কিন্তু বীর শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্য থেকেই খুঁজে নিয়েছেন তাঁদের নাট্যকারকে। নিজেদের সংগ্রামের বাস্তব কাহিনী নিয়েই সেই নাট্যকার নাটক লিখেছেন, জাহাজী শ্রমিকরা নিজেরা অভিনয় করেছেন সেই নাটকে।

এমনি এক কাহিনী এসেছে মুর্শিদাবাদের গ্রাম থেকে। গ্রামের চাষী গোপাল মণ্ডল। পুরনো ধরনের যাত্রায় আর তাঁব মন বসেনি। নিজের যতটুকু শিক্ষা আছে, ততটুকুব জোবেই তিনি লিখেছেন এক যাত্রা। কৃষকদের দুর্ভাগ্য এবং জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধের সংগ্রামের ডাকই হল সে-যাত্রার বিষয়।

এমনি কাহিনী আছে বজবজ শ্রমিকদেব মধ্যে, বারাকপুরের হিন্দুস্তানী শ্রমিকদের মধ্যে, কালিঘাটের বস্তীবাসীদের মধ্যে এবং হয়তো আরো অনেক কৃষক অঞ্চলেব মধ্যে।

সবচেয়ে নিঃসম্বল মানুষদের এই নতুন ধবনের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আছে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের নতুন করে সঙ্ঘ, পাঠাগার ও সংস্কৃতি আলোচনার এক ব্যাপক সাড়া। গত কয়েকমাসের মধ্যেই নিজস্ব উদ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে নতুন পাঠাগার ; নতুন নতুন সংস্কৃতি সঙ্ঘ, গরিফাব সংস্কৃতি-রূপনাট্য, উত্তরপাড়াব জিজ্ঞাসা-সংস্কৃতি পরিষদ, বাগনানের হারপ গ্রামের হারপ প্রগতি সঙ্ঘ থেকে শুরু করে বেলঘরিয়া, কেষ্টনগর, আন্দুল প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে অনেক নতুন সংস্কৃতি কেন্দ্র এসে পেঁছিচ্ছে। এই অনুষ্ঠানগুলি থেকে ক্রমেই দাবি উঠছে জানার, আবো জানার, এবং পুরাতন সংস্কৃতি সঙ্ঘগুলিব নতুন কর্মপ্রচেষ্টার দৈনন্দিন সংবাদ আমাদের কাছে আরো অগ্রসব হবার।

এবং সত্যসত্যই আরো অগ্রসর হতে হলে, জনগণের এই স্বতস্ফূর্ত শক্তিকে সত্যই আরো সার্থক করে তুলতে হলে বিশেষ প্রয়োজন হল এই সংস্কৃতিপ্রচেষ্টাগুলিব আজ এক হয়ে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাশ করা, অগ্রগমনের পথ স্থির করা।

আসন্ন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলন এই এক হওয়ার একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। সাহিত্যগত ও শিল্পগত প্রধান প্রশ্নগুলির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকতর সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি প্রশ্নেরও আলোচনা এখানে উপস্থিত করা অবে তা থেকে উপযুক্ত পথনির্দেশও সম্ভব হবে। প্রবীণ ও নবীন, অগ্রগণ্য ও সদ্যআগত, দক্ষ ও অনিপুণ, নাগরিক ও গ্রামীন সমস্ত প্রকার সংস্কৃতি-প্রচেষ্টা ও প্রতিভার এক উপযুক্ত মিলনক্ষেত্র হোক এই সম্মেলন।

সম্মেলনের জন্য যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে তাতে বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ ছাড়াও স্বভাবতই বহু সংস্কৃতি-সংঘেব প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন। প্রস্তুতি কমিটি থেকে কযেকটি সাব-কমিটিও গঠিত হয়েছে। প্রস্তুতি কমিটি একটি প্রস্তাবে স্থির করেছেন যে সম্মেলন থেকে প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ প্রগতি সাহিত্যিকদের সম্মানিত করার জন্য কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নামে এক বা একাধিক পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

আশা করি, এই সম্মেলন উপলক্ষে দলমতনির্বিশেষে প্রত্যেকটি শিল্পী প্রত্যেকটি লেখকের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি অঞ্চল ও প্রত্যেকটি সংস্কৃতি-কর্মীও উদ্যোগী হযে উঠবেন। বাঙলা শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতি-জীবনের জন্য সমবেত হোক বাঙলার সমগ্র সাংস্কৃতিক উদ্যম।

ননী ভৌমিক

সারা ভারত গণনাট্য সংঘের সপ্তম সম্মেলন

আগামী ৬ই থেকে ১০ই মার্চ সারা ভারত গণনাট্য সংঘের সপ্তম সম্মেলনের অনুষ্ঠান। কোথায হবে সেটি এখনো চূড়ান্তরূপে স্থির হয়নি। আশাকরি শীঘ্রই তা জানানো সম্ভব হবে।

গণনাট্য সংঘের জন্মের পর দশ বছরেরও বেশি দিন পার হয়ে গেল। এই শতাব্দীর পঞ্চম দশক থেকে ফ্যাসিবিরোধী ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য থেকে জন্ম নিয়ে সংঘ চেষ্টা কবে এসেছে, যাতে তার সঙ্গীত ও নাটকের মধ্য দিয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ পায়, যাতে জনগণের জন্য কাজ করার সাধাবণ আদর্শ যাঁরা গ্রহণ কবেন, তাঁবা সকলেই সমবেত হতে পারেন এই মঞ্চটিতে।

সংঘের আগামী সম্মেলন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। কারণ এই দীর্ঘ দশ বছরের অস্তিত্বের মধ্যে গণনাট্য সংঘ যেমন গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের গর্ব করতে পারেন, তেমনি, তার কতকগুলি দুর্বলতারও হিসাব করার প্রয়োজন হবে। জন্মের প্রথম ছয় বৎসরেই সংঘ, কতকগুলি অঞ্চলে শক্তিশালী ইউনিট গড়ে তুলতে সমর্থ হয়, অনেক জনপ্রিয় ও শক্তিশালী লোকসঙ্গীত ও শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে, এবং তার সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, ও ছায়ানৃত্য দিয়ে বিভিন্ন অংশের নরনাবীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে গণনাট্য সংঘ অংশ নেন, জনগণের অধিকারের গান গেয়ে, সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতার স্বরূপ দেখিয়ে, ১৩৫০-এব দুর্ভিক্ষ, ৪৬ সালের দাঙ্গা, এবং যুদ্ধ পরবর্তী গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে গণনাট্য সংঘ তার শিল্পে নিয়ে এসেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ, স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা; জনগণের সংগ্রামের বাণী। অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পী এই সময় সংঘে যোগ

দেন ও সংঘের উদ্যোগে অনেক নতুন শিল্পীও সৃষ্ট হন। কিন্তু সংঘ অবশ্য আরো নতুন লেখক শিল্পী সৃষ্টি করতে পারেনি, সংঘের মধ্যে খানিক উন্নাসিকতা দোষ দেখা দেয়, জনগণের সংগ্রামের বাণী তেমন সবলে প্রকাশ পেতে পারে না; ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সংঘের যোগাযোগ সংকীর্ণ হতে থাকে। পরবর্তী বছরগুলিতে আহ্‌মেদাবাদ সম্মেলনের পর সংঘের ওপব নেমে আসে নৃশংস সরকারী আঘাত। এই আঘাতের সামনে সংঘের কর্মী ও শিল্পীরা অপূর্ব দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংঘ এই সময়ে আবার ক্রমেই জনগণ ও প্রকৃত শিল্পী ও সংস্কৃতি-কর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সংঘের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে দেখা দেয় শিল্পমানের প্রতি অবহেলা, জীবন বিচ্ছিন্ন স্লোগান-সর্বস্বতা এবং নানা ধরনের সংকীর্ণতা।

সৌভাগ্যক্রমে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে আবার একটি নতুন হাওয়া আসে। সাধাবণ নির্বাচন এবং তার পরবর্তী সময় থেকে জনগণের মধ্য থেকে ব্যাপকভাবে ক্রমেই দাবি উঠতে থাকে প্রগতিশীল গান, নাটক ও শিল্প-সৃষ্টির। প্রগতিশিল্পীদের সম্মিলিত ও গণনাট্য সংঘের পুনর্গঠন ও প্রসাবের এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ দেখা দেয়। এই পুনর্গঠনের দিকে কিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু এখনো বহু কাজই বাকি।

এই পরিস্থিতিতে সংঘের সপ্তম সম্মেলন। এই সম্মেলনে তাই দীর্ঘ দশ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ের সাফল্য ও দুর্বলতা থেকে সংঘকে গ্রহণ করতে হবে উপযুক্ত শিক্ষা, এবং এক বিপুল অগ্রগমনের পথ করে নিতে হবে।

সম্মেলনেব জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মধ্যে আছে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনা—(১) সঙ্গীত (২) থিয়েটার (৩) নৃত্য ও ছায়ানৃত্য (৪) ফিল্ম (৫) সংগঠন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদল এই সমস্ত বিষয়ের ওপর যে নিবন্ধগুলি রচনা করবেন, সম্মেলন সেগুলি বিভিন্ন কমিশনে ভাগ হয়ে শুনবেন ও আলোচনা করবেন। এই বিষয়গুলির ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও জীবন্ত আলোচনার মধ্য থেকে সম্মেলন উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

সম্মেলন থেকে বিশেষ করে সংঘের সংগঠনটিকে শক্তিশালী করে তোলার কথা বিবেচনা করা হবে। সারাভারত কেন্দ্র; দৈনন্দিন কাজ চালানোর মতো উপযুক্ত সংগঠন, সাংস্কৃতিক দল এবং সৃষ্টিমূলক সামগ্রীর লেনদেন, আন্তর্জাতিক শিল্পীদেব সঙ্গে সম্পর্ক, শিক্ষা শিবিব, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই আলোচনার মধ্যে পড়বে।

সম্মেলনে একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হবে তার সাংস্কৃতিক উৎসব। গণনাট্য সংঘ এবং অনুরূপ সহধর্মী সংগঠনগুলি এই অনুষ্ঠানে তাঁদের ধারণাগুলির বাস্তব রূপ দান করবেন। তাই এই অনুষ্ঠান সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিভিন্ন ভাষাভাষী এক শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশ থেকে যে বিভিন্ন লোক-শিল্প এবং নাটক-সঙ্গীত-নৃত্যাদির এই অনুষ্ঠান দেখানো হবে তার ওপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে সমালোচনা ও মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থাও হবে। এই অনুষ্ঠানগুলির ওপর 'ইউনিটি' পত্রিকা থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

আশাকরি, ভারতের জনগণের বিভিন্ন জাতিব বিভিন্ন কণ্ঠ এক অপূর্ব ঐকতানে বেজে উঠবে এই সম্মেলন থেকে। এই সম্মেলন সবদিক দিয়ে সফল করার জন্য বাঙলার শিল্পী ও লোক-শিল্পীরাও পিছিয়ে থাকবেন না।

নিরঞ্জন সেন

সূচীপত্র

দ্বাবিংশ বর্ষ ঃঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃঃ দ্বিতীয় সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৫৯

সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে	ননী ভৌমিক	৭৩
কবিতা	পল এলুয়ার	৮৪
	সাঁওতালি	
	চিত্ত দাস	
	পূর্ণেন্দু পত্রী	
	দেবব্রত সেনগুপ্ত	
	রাম বসু	
	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	
পরিচয়-এর কুড়িবছর	হিরণকুমার সান্যাল	৯৩
একশো চারজন (গল্প)	সমরেশ বসু	১০০
বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা	রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত	১১৬
আমার দেশের শিশু	নাজিম হিকমত	১২২
পুস্তক-পরিচয়	গোপাল হালদার	১২৬
	রবীন্দ্র মজুমদার	
সংস্কৃতি-সংবাদ	রবীন্দ্র মজুমদার	১৩৪
	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	
	পরিমল চৌধুরী	
সম্পাদকীয়		১৩৯
পাঠকগোষ্ঠী		১৪১
লেখক ও শিল্পীদের কাছে আহ্বান		১৪৫

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড থেকে মুদ্রিত ও 'পরিচয়' কার্যালয় ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।

TWO SOVIET PUBLICATIONS

THIS IS AMERICA

This Soviet publication, containing 23 American short-stories by some of the most well-known and popular writers of the U.S.A., gives the direct lie to the propaganda that the Soviets spread hatred against the Americans. Here is revealed the America of the people, their toils and troubles and their struggles to defend their heritage of democracy and liberty from the mad attacks of their present-day rulers.

416 pages. Rs. 3/-

MARTIN CHUZZLEWIT

By Charles Dickens

In this immortal novel by one of the great British novelists you will find a ghastly but specious picture of American manners in the nineteenth century. A severe condemnation of the want of principles in business, which Dickens had found admired in America as smart than condemned as immoral.

In two volumes ; each volume Rs. 4-11-0

Postage Extra

For all Soviet Publications
Please contact :

CURRENT BOOK DISTRIBUTORS
3/2, Madan Street,
Calcutta-13.

দ্বাবিংশ বর্ষ
২য় খণ্ড। ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৫৯

সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে

ননী ভৌমিক

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাশীল মহলে একটি আলোড়ন দেখা দিয়েছে। একথা প্রায় সকলেই অনুভব করছেন যে বাংলা সাহিত্য সত্য-সত্যই কতকগুলি বিপদের সম্মুখীন। এই অনুভূতিটা কোথাও প্রকাশ পাচ্ছে অন্ধ আক্ষেপে কোথাও অস্পষ্ট প্রতিবাদে। কিন্তু প্রকাশ যাই হোক, কোনো সন্দেহ নেই যে কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় দিক সম্পর্কে আমাদের সচেতন হয়ে ওঠার দারুণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে যে আবেদনপত্র প্রচারিত হয়েছে তাতে 'বিদেশের বিকৃত সংস্কৃতির কুপ্রভাব' সম্পর্কে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বস্তুত এ সম্পর্কে চেতনা এবং ব্যাপক আলোচনা একান্ত জরুরী। কারণ, কতকগুলি জিনিস খারাপ তা অস্পষ্টভাবে জানাটাই যথেষ্ট নয়। রোগকে প্রতিহত করতে হলে রোগের প্রকৃতি এবং লক্ষণ সম্পর্কেও জ্ঞান প্রয়োজন। বিদেশের বিকৃত সংস্কৃতি প্রতিহত করতে হলেও আগে তার সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রয়োজন।

বিশেষ করে এইজন্য, যে এদেশে অন্ধভাবে একটা ধারণা আছে যে এ সংস্কৃতি পশ্চিমের বলেই বুঝি খারাপ। পণ্ডিত নেহরুর মতো শিক্ষিত ব্যক্তিও সম্প্রতি তাঁর পূর্বের নানা উক্তি বিস্মৃত হয়ে এই অস্পষ্টতারই প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছেন। গত বৎসর লেক ময়দানে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে নেহরু বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে জড়িত থাকাটাই বুঝি দোষের। বলা বাহুল্য, এটি একটি হাস্যকর ভ্রান্তি। আমাদের দেশের চাষীরা লাঙলের সঙ্গে জড়িত থাকাতে 'মুর্শিদা' গান ভ্রষ্ট হয়নি, নৌকোর সঙ্গে জড়িত থেকে ভাটিয়ালিও বিকৃত হয়নি, বরং স্ফূর্তিই পেয়েছে। পশ্চাৎপদ হলেও এ-গুলিও যন্ত্র। তবু উপরোক্ত সংস্কৃতি যে বিষাক্ত তার কারণ এ সংশ্লিষ্ট একটি বিষাক্ত শ্রেণীর সঙ্গে—পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী-যুদ্ধবাদী পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যের অতীত ও ভবিষ্যৎকে যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই, তবে এই বিপদটির প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ এবং তার হিসাবনিকাশ একান্ত প্রয়োজন।

মার্কিনী সংস্কৃতি

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য একটি প্রভাব হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক অভিযান। এই সংস্কৃতির কতকগুলি দিক এমনিই নগ্ন, এমনই কদর্য যাতে এদেশের সাধারণ মানুষের মনে অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া না জেগে পারেনি। মার্কিন সংস্কৃতির

এমনি একটি দিক হল তার অসুস্থ কামোন্মাদনা। প্রতিক্রিয়া যখন একটি শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে, তখন তার সাহিত্য হয় শুধু যৌনবিকার। আমাদের দেশের অনতি-অতীতের বাবু-জমিদারী ও রাজদরবারী সংস্কৃতি তার একটি বড়ো দৃষ্টান্ত। কিন্তু মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আশ্রয়ে যৌনবিকৃতির যে বান ডেকেছে তার বর্বরতা সম্ভবত সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তকেই ছাপিয়ে গেছে। রাশি রাশি সচিত্র যৌন পত্রিকা থেকে শুরু করে হলিউড ফিল্মের রঙীন নারীদের ও এমনকি ধর্ষণের দৃশ্য প্রদর্শন প্রভৃতি পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুখের বিষয় এই বিশেষ ধরনের বিকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের দেশে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ এত ব্যাপক হয়ে ওঠে যে, এমনকি মন্ত্রী কেশকারকে পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে হয়।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে মার্কিনী সংস্কৃতির বিকৃতি শুধু এই যৌন মাদকতাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি তার একটি দিক মাত্র। মার্কিনী সংস্কৃতির বিকৃতির আর একটি দিক হল তার অবাস্তব রোমহর্ষপ্রিয়তা। তথাকথিত ডিটেকটিভ কাহিনী, লক্ষ্যহীন নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ডের এই স্রোত যে কি সুচিন্তিত বীভৎসতায় নামতে পারে, সে সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। এই খুনজখমী 'সাহিত্য'র প্রধান লক্ষ্যই হল বীভৎসতার গুণকীর্তন। 'রোপ' নামক ফিল্মের নায়ক খুন করে কিন্তু সে উন্মাদও নয়, খুনের কোনো উদ্দেশ্যও নেই। মানুষের সুস্থ চিত্তবৃত্তিকে ধীরে ধীরে অসার ও বর্বর করে তোলার জন্য এমন ছবি তোলা হচ্ছে, যেখানে দেখানো হয় কিভাবে ধীরে ধীরে একটি মানুষকে পিষে মারা হচ্ছে, কিভাবে উপর্যুপরি ঘুসি খেয়ে বক্সিং প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখ গলে যাচ্ছে, কিভাবে কোজে দ্বীপে শায়েস্তা করা হচ্ছে বন্দীদের। খুনের জন্য খুন থেকে ধ্বংসের জন্য ধ্বংসের এক উদ্দেশ্যহীন বিভীষিকাও সম্প্রতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে শুরু করেছে। আণবিক বোমায় সোবিয়েত দেশ ধ্বংসের বিস্তারিত সচিত্র কল্পনা স্থান পায় 'কলিয়ার' পত্রিকায়। 'হোয়েন ওয়ার্লড্স্ কোলাইড', বা 'ডেস্টিনেশন মুন' নামক ছবিতে একমাত্র উপজীব্য হল উদ্দেশ্যহীন ধ্বংসের এক কল্পিত বিভীষিকা।

এর তৃতীয় একটি দিক হল তার বিকট আত্মনিগ্রহ ও তীব্র নৈরাশ্য প্রচার। আত্মশক্তিতে মানুষ ও জনগণ যে অভিশাপের ওপর জয়ী হতে সক্ষম, নিজ ভাগ্য রচনার ক্ষমতা যে মানুষেরই হাতে, এই সত্যটি চাপা দেওয়ার মতো একটি 'সাহিত্য-সংস্কৃতি' আজ মার্কিন শাসকদের বড়োই প্রয়োজন। যৌন মাদকতা ও রোমহর্ষ উত্তেজনার স্থূলতায় যাদের আচ্ছন্ন করা সম্ভব নয়, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে এই নৈরাশ্যবাদ। হতাশা ও নৈরাশ্যের বাণী ইতিপূর্বেও শোনা গেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মার্কিন প্রকাশকদের উদ্যোগে সম্প্রতি পৃথিবীর সেরা নৈরাশ্যবাদীদের সবচেয়ে সুকৌশল রচনাগুলিকে যেভাবে সুচিন্তিত-রূপে প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে তার অমানুষিকতার তুলনা বিরল। এলিঅট, পাউন্ড, কোয়েসলাব, কাফকা প্রভৃতি কয়েকটি নামের উল্লেখই যথেষ্ট। এলিঅটের কাব্যে মানুষ নেই, আছে শুধু শ্মশানভূমির অনিবার্যতা। কাফকার কলা-কৌশল শুধু মানুষকে ইতর প্রাণীতে পরিণত করার এক বিকৃত ছায়াজগত সৃষ্টির দক্ষতায়। বুদ্ধি ও বিচারের একটা ভান খাড়া করে এই সব বুদ্ধি-

জীবীদের সৃষ্ট চরিত্রেরা হঠাৎ আবিষ্কার করে যে 'নাজী' (বা অন্য কোনো) আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অর্থহীন, মনুষ্যসমাজের আসন্ন মুক্তির আদর্শটি নিন্দনীয়, ভবিষ্যতের জন্য জনগণের সংগ্রাম নির্বুদ্ধিতা।

এই সংস্কৃতির চতুর্থ দিক হল তার যুক্তি বিরোধিতা, রহস্যবাদের দিক। মানব সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল যুক্তি ও বিজ্ঞান। মার্কিন আধিপত্যে এই বিজ্ঞান আজ নিষেধের সম্মুখীন। শুধু যুদ্ধ, শুধু ধ্বংসশক্তির দিকেই আজ চালিত করার চেষ্টা হচ্ছে বিজ্ঞানকে। অন্যদিকে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক অগ্রগতি; জনগণের মঙ্গল সাধনের জন্য তার ক্ষমতাকে, উৎপাদন শক্তির অভূতপূর্ব সম্ভাবনাকে চেষ্টা হচ্ছে রোধ করে রাখার। সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত হচ্ছে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রত্যেকটি ঐতিহ্য। প্রকৃত যুক্তি ও চিন্তার সম্পদে সাহিত্যকে মূল্যবান না করে তুলে শূন্য হয়েছে যুক্তি বিসর্জনের ওকালতি, বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী চিন্তার 'অনিবার্য' ব্যর্থতার প্রচার, শিল্প আচ্ছন্ন হচ্ছে এলিঅট ও মরিয়াকের ধর্ম-রহস্যবাদের আত্মসমর্পণে, ধূমবাদের বিকৃতিতে। বিশেষ করে, সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যুক্তি-বিসর্জন ও অপবিজ্ঞানের প্রাবল্য ভয়াবহ। এই অপবিজ্ঞান প্রচার করে চলেছে, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য পৃথিবীর মানবজাতির বিপুল অংশের ধ্বংস নাকি সভ্যতার জন্যই প্রয়োজন! জন্মগতভাবে কিছু জাতি নাকি অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! জনগণের সংগ্রাম 'দাঙ্গা'মাত্র এবং বাস্তব কারণের মধ্যে তার প্রতিকার খোঁজা অর্থহীন কারণ তার উৎস নাকি মানুষের 'মনোবিকলনী' কোনো কম্‌প্লেক্সের মধ্যেই নিহিত!

এর পঞ্চম দিক হল তার তীব্র জাতি-বিদ্বেষী অহঙ্কার। আমেরিকার নিজ দেশে নিগ্রো নির্যাতনের বীভৎস কাহিনী এবং তাকে আবৃত অথবা সমর্থন করে রাখার মতো সংবাদ, উপন্যাস ও ফিল্মের দৃষ্টান্ত এদেশেও অজানা নয়। এরই সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে এই জাতি-অহঙ্কার মাত্র নিগ্রোদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য, তা নয়। সমগ্র কৃষ্ণকায় ও পীতকায় জনসাধারণ, সমগ্র এশিয়াবাসী, রাশিয়ান, বুলগেরিয়ান প্রভৃতি সমগ্র স্লাভজাতিগোষ্ঠী তো বটেই, এমনকি ফরাসি, ইংরাজ, ইতালিয়ানও তা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এই কলকাতাতেই 'পিকিং এক্সপ্রেস' নামে একটি ফিল্ম দেখানো হয়েছে, যেখানে মহান চীনবাসীদের চিত্রিত করা হয়েছে অসভ্য, ক্রুড, কোলাহলপ্রবণ 'জাতি' হিসাবে। নিউজ রীল দেখানো হয়েছে যেখানে বীর কোরিয়াবাসীদের উপস্থিত করা হয়েছে দুর্বোধ্য মূক পশুর সমতুল্য করে। পত্র-পত্রিকা মারফত দৈনন্দিন সোবিয়েতবিরোধী কুৎসার তো লেখাজোখা নেই। স্বভাবতই, কৃষ্ণকায় প্রাচ্যদেশীয় ভারতবাসীও এই জাতি অহঙ্কারের অপমান থেকে রেহাই পায়নি। আমেরিকার মিস মেয়ো একদা ভারতবর্ষ সম্পর্কে অবাধ কুৎসা প্রচারে কুখ্যাত হয়েছিলেন। আমেরিকার কাছে একদা রবীন্দ্রনাথকেও তাচ্ছিল্য সইতে হয়েছিল। কিন্তু এরকম ঘটনা শুধু অতীতেরই ঘটনা নয়। এখনো, পশ্চিম বাংলার আমেরিকা-দরদী প্রধানমন্ত্রীকেও আমেরিকার হোটেলে দুর্ব্যবহার পোয়াতে হয়, এখনো মার্কিন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝেই গালিবর্ষিত হয় শান্তিকামী ভারতবাসীর উদ্দেশে, এখনো এমন চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, যেখানে ভারতবাসীর প্রকৃত মর্যাদা আদৌ রক্ষিত হয় না। 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির'

মানববিদ্বেষী থিয়োরি প্রচারের সময় আজও দলিল পুস্তকে ভারতবাসীকে উল্লেখ করা হয় 'ভারত ও চীনের দঙ্গলগুলো' বলে। কয়েক বছর পূর্বে বোম্বাইয়ে যে সংস্কৃতি সম্মেলন হয়, তাতে ভারতের সংস্কৃতিকে 'গোরুর সংস্কৃতি' বলে যে উপহাস করা হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই অনেকে ভোলেননি।

একই মার্কিনী জাতি-অহঙ্কারের ঠিক উল্টো পিঠেই আছে অন্য জাতির জন্য জাতিসত্তাহীনতার (কস্‌মোপলিটানিজম্‌) এক বিষময় মতবাদ। এই মতবাদ আহ্বান করে, বিশ্ব সরকার, বিশ্ব সভ্যতা ইত্যাদির নামে বিভিন্ন জাতির জাতীয় সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করতে, 'মার্কিনী জীবন যাত্রার' অনুকরণে নিজ দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় রুচি ও স্বাজাত্যবোধকে বিসর্জন দিতে। কৃত্রিম বর্ণ-গন্ধ-স্বরের এক লক্ষ-যন্ত্র প্রচার ও আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অনবরত এই কথাটাই পেশ করা হচ্ছে যে অন্যজাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য মূল্যহীন, মার্কিনী হাওয়াই শার্ট ও কোকোকোলার তুলনায় অন্যদেশের ধুতিচাদর, অন্যদেশের কুয়োর জল, অন্যদের বাউল-ভাটিয়ালি হাস্যকর, অন্যদেশের স্বাধীনতা-প্রিয়তা কূপমণ্ডুকতা মাত্র। অন্যজাতির জাতিসত্তাহীনতা, এবং তাদের সবার ওপরে মার্কিন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এই হচ্ছে বিশ্বের জন্য মার্কিন সংস্কৃতির নির্দেশ।

সর্বোপরি, এই সংস্কৃতির একটি প্রকাশ্য দিক হল তার উলঙ্গ যুদ্ধ প্রচার। সংবাদপত্র সাহিত্য ও অসংখ্য নিউজ রীল মারফত, ভয়েস অব আমেরিকার পঁচিশটি ভাষা মারফত, প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা চলেছে এই যুদ্ধের জন্য প্রচার, আণবিক বোমা ও জীবাণু অস্ত্র নিয়ে উন্মাদ অহঙ্কার এবং আনুষঙ্গিক কুৎসার স্রোত। এই প্রচারের একমাত্র উপজীব্য হচ্ছে মিথ্যা। গোয়েবল্‌স্‌-এর নীতি রপ্ত করে মার্কিন শাসকেরা স্থির করেছেন যতো বড়ো মিথ্যা, তত উচ্চকণ্ঠে চাই তার ঘোষণা।

এই হচ্ছে 'মার্কিনী' সংস্কৃতির কয়েকটি প্রধান দিক। লালসা অথবা রোমহর্ষ উত্তেজনা, নৈরাশ্যবাদ অথবা রহস্যবাদ—যখনই যে রূপেই এর আত্মপ্রকাশ ঘটুক না কেন, তার একমাত্র নৈতিক বাণীই হল তীব্রতম মানব বিদ্বেষের বাণী। এ সংস্কৃতি জীবন্ত মানুষকে দেখে ভীত ; জীবন্ত মানুষের আত্মবিস্মৃতি বিকৃতি ও ধ্বংসসাধনই তার চরম ক্রিয়া।

এবং তার প্রধান লক্ষ্যই হল ডলার কর্তৃক সর্বোচ্চ মুনাফার 'পবিত্র' অধিকার প্রতিষ্ঠা, অন্য জাতি ও রাষ্ট্রের ওপর মার্কিন জাতি শ্রেষ্ঠত্বের আধিপত্য স্থাপন। এর কণ্ঠে তাই যুদ্ধের হুঙ্কার, এর উল্লাস তাই শুধু লালসা বীভৎসতা ও দস্যুতার দৈনন্দিন গুণকীর্তনে, এর কৌশল তাই শুধু নির্বিচার মিথ্যাচারে।

ব্রিটিশ আধিপত্য

প্রধানত মার্কিন উদ্যোগে প্রচারিত সংস্কৃতির এই কদর্য মূর্তি তার ব্যাপকতা ও প্রচারদক্ষতায় আমাদের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করলেও, মনে রাখা প্রয়োজন যে, এগুলি আমাদের কাছে একেবারে নতুন নয়। মূলত এমনি ধারা কতকগুলি আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে নানা সময়ে দাঁড়াতে হয়েছে। কংগ্রেসী নায়কেরা আজ তা ভুলতে চাইলেও, বাংলা ভুলতে পারে না

যে বিকৃতির এই বনেদী কেন্দ্রটি ছিল ভারতের প্রভু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বয়ং। ভারতের সংস্কৃতি শুধু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছেই উপহাস্য নয়; ঠিক একই উপহাস ধ্বনিত হয়েছিল একশ বছর আগে মেকলের উক্তিতে 'ইওরোপীয় গ্রন্থাগারের একটিমাত্র শেলফের কাছে ভারতবর্ষ ও আরবের সমগ্র দেশজ সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না।'

মার্কিন কর্তৃক ব্যবহৃত আজকের এ্যাঙলো-স্যাক্‌শন জাতিকৌলিন্যের ঠিক এই বুলিটিরই ব্যাপক প্রচার ঘটান ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক জোসেফ চেম্বারলেন স্বয়ং—'কী গর্বিত, কী অধ্যবসায়ী, আত্মবিশ্বাসপরায়ণ ও দৃঢ়চিত্ত এই এ্যাঙলো-স্যাক্‌শন জাতি...বিশ্বসভ্যতা ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের প্রধান শক্তি তারা হবে অনিবার্যভাবেই'(!)

'পশ্চাৎপদ দেশের' জন্য ট্রুমানী 'পয়েন্ট ফোর'-এর সঙ্গে ভেদ নেই ব্রিটিশ উদ্ভাবিত 'শ্বেতজাতির বোঝা'র সঙ্গে। সংস্কৃতির নামে যুদ্ধের যে গুণকীর্তন আমাদের স্তম্ভিত করছে তার সূত্রপাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আদরের বৈতালিক কিপলিঙ্‌-এর মধ্যে।

এবং শুধু সূত্রপাত নয়, দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীদের একাংশ থেকে যে বিকৃত ভাবধারা সৃষ্ট এবং আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবাধে প্রচারিত হয়ে আসছে, বহুক্ষেত্রে তাই নতুন করে চালান আসছে মার্কিন প্রকাশালয় থেকে।

মার্কিন ছাপমারা কামোন্মাদনার যে চিত্র আজ আমাদের শিহরিত করেছে, কয়েক দশক আগে থেকে তারই সূচনা 'আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের' নামে এখানকার বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে মুগ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিল; সর্বক্ষেত্রে অপবিজ্ঞানের যে প্রাবল্য আজ আমাদের উদ্বিগ্ন করতে শুরু করেছে, ইংরাজি প্রকাশকদের উদ্যোগে ফ্রয়েড ও হাক্‌সলি প্রভৃতির সেই মতবাদ বহু পূর্ব থেকেই আমাদের চিন্তাকে বিকৃত করতে শুরু করে। যে রহস্যবাদ আজ মার্কিন প্রতিক্রিয়ার পক্ষেও বড়ো আদরের, এদেশে বহু পূর্বেই তার প্রচার শুরু হয়েছে হোয়াইটহেড আর হাক্সলির চমকে।

বস্তুত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি শিক্ষার ভার চাপিয়ে আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে পিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিকৃত করারও আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে। সেই ভাষার পাষাণভার এবং সেই প্রচেষ্টা আজো বর্তমান। আজো আমাদের আইন ইংরাজি ধারণা ছাড়া চলে না। আজো একটা ইংরাজি সংবিধানই আমাদের ওপর চাপানো। ইংরেজ অথবা মার্কিন—দুটি পৃথক বৈষয়িক গোষ্ঠীর লক্ষ্য সাধন করতে চাইলেও সাংস্কৃতিক ভাববস্তুর ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃতিটা মূলত তফাত নয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদের একই সাধারণ অধঃপতনে উভয়ে চিহ্নিত।

একই এলিঅট উভয় সাম্রাজ্যবাদেরই কবি; ব্রিটিশ ইশারউড আর অডেন আশ্রয় পায় ডলারের ছত্রছায়ায়; এটম বোমার মতো মারণ অস্ত্রের সমর্থনে এগিয়ে আসেন ব্রিটিশ দার্শনিক রাসেল। মার্কিনী নয়া ম্যালথাসবাদকে সজোরে সমর্থন করে ব্রিটিশ হাক্সলি ঘোষণা করেন—'মানব ইতিহাসের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। নিজেদের জন্মগত গুণাবলী অথবা জীবন ও

অভিজ্ঞতার গুণাবলীর প্রশ্ন না বিচার করে জীবের পরিমাণগত বুদ্ধিমাত্রই যে ভালো, ভগবানের দোহাই এমন কথা বিশ্বাস করতে হবে কেন?'

আত্মবিস্মৃতির বিরুদ্ধে

আমরাও বলি, ভগবানের দোহাই, মানব ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই সাম্রাজ্যবাদী বীভৎসতার কোনো প্রয়োজন নেই বাংলার, কোনো প্রয়োজন নেই ভারতবর্ষের। এর স্পর্শ কুষ্ঠরোগের মতোই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত ঐতিহ্যের পক্ষে মারাত্মক। চণ্ডীদাস-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের নাম আঁকা যে সাহিত্যে আমাদের উত্তরাধিকার নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার এমন একটা মূল্য আছে, যার সঙ্গে এই ধরনের বিকৃতির কোনো তুলনাই সম্ভব নয়। দেশ ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার গৌরবে এ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি মহান। একথা আজ স্মরণ করার প্রয়োজন আছে যে একদা আমাদেরই কবি চণ্ডীদাস বলেছিলেন—সবার উপরে মানুষ সত্য। বাংলার এই বাণীর সঙ্গে কি এলিঅটের 'নেড়ী কুকুরের খেঁকি কান্না'র এতটুকু তুলনাও সম্ভব? সৌন্দর্যের খনি উদ্ধার করে গেছেন বাংলার লোক কবি, বৈষ্ণব কবিরা, বাংলার রবীন্দ্রনাথ। এর পাশে কি স্বপ্নেও দাঁড় করানো সম্ভব চিউইংগাম আর কোকোকোলাকে, হাওয়াই শার্ট আর জ্যাজ নৃত্যকে?

সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে বাংলা দেশের মানুষ গড়ে তুলেছেন ক্রমেই বাস্তবমুখী একটা রীতি, ক্রমেই জনগণ-মুখী একটা প্রবণতা। আমাদের এই দীনবন্ধু, শরৎচন্দ্র, নজরুলের সঙ্গে কি কোনো বিচার সম্ভব পশ্চিমের আধুনিক রক্তশূন্য, প্লটশূন্য, রিক্ত হতাশার?

বাংলায় চিন্তাশক্তি একদা সারা ভারতের শ্রদ্ধাই শুধু নয়, বিশ্বের গণ-তান্ত্রিক জনমতের প্রশংসাও আকর্ষণ করেছিল। অতীতের দীপঙ্কর আর উত্তর-ভারতী থেকে শুরু করে এ-যুগের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রমেশ দত্ত অথবা রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী অথবা জগদীশচন্দ্র—শুধু অল্প কয়েকটি নামের উল্লেখই যথেষ্ট। বিজ্ঞান এবং সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের শ্রেষ্ঠ-সন্তানেরা যে অবদান দিতে চেয়েছেন অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার মধ্যে ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে জেগেছে যুক্তি ও বিচারের প্রতি একটা আনুগত্যের ধারা অন্ধতা ও কুসংস্কারের প্রতি ক্ষমাহীনতার পৌরুষ।

বাংলার এই বিচার প্রিয়তা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা কি গ্রহণ করবে সাম্প্রতিক অদৃষ্টবাদ ও মানুষের বুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের দর্শনকে?

সর্বোপরি বাংলার একটি প্রধান মন্ত্র হল তার অভয় মন্ত্র, নিজ ভাগ্য রচনার জন্য জনগণের অধিকার ও শক্তিতে আস্থাস্থাপনের মন্ত্র। উদ্ধত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রক্ত আঁখি তুচ্ছ করেই আমাদের নজরুল, আমাদের রবীন্দ্রনাথে জেগেছিল মাভৈ আহ্বান, 'শেষ পর্যন্ত মানুষের ওপর বিশ্বাস' রেখে যাবার ডাক। এই অপূর্ব নৈতিক বাণীর কি সহ্য করতে পারে আইসেনহাওয়ার এবং তার সমগ্র মানববিদ্বেষী সংস্কৃতির মনোহারী পসরাকে।

এবং ঠিক এই ঐতিহ্যটিই আজ আক্রান্ত। কারণ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে যদি ভালো লাগাতে হয়, তবে সবার আগে ছিঁড়ে ফেলতে হয় চণ্ডীদাসকে, তবে সবার অলক্ষ্যে ভুলে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথকে।

সে দুর্ভাগ্য যেন না আসে।

আমরা জানি, এক লজ্জার ইতিহাস আমাদের পেছনে রয়ে গেছে। বাংলার জীবনে একদা এসেছিল আত্মবিস্মৃতির এক চরম মুহূর্ত। বাঙালীকে তখন শেখানোর চেষ্টা হয়েছিল ইংরাজিতে কথা বলতে, ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখতে। যখন আপন ভুলে পরদ্বারে হাত পাতাতেই ছিল সভ্যতার পাশ-মার্ক।

কিন্তু সে মুহূর্ত ক্ষণস্থায়ী। শাসকদের ব্যবস্থা ও দণ্ড সত্ত্বেও বাংলার গর্বে বুকটান করে দাঁড়াবার মতো মানুষের অভাব হয়নি; এমন প্রতিভা বাংলার মাটিতেই জন্ম নিয়েছে, যা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃত সম্পদের মূল্য অনুভব করেও একথা জানিয়ে গেছেন—'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।'

কিন্তু ঠিক এইখানেই কংগ্রেসী নায়ক ও সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে ঐতিহ্য সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচারিত করা হচ্ছে, তা ঠিক উল্টো কাজই করবে। লোক ময়দানের উক্ত অধিবেশনে অতুল্য ঘোষ প্রমুখ অসাহিত্যিক এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক বাংলা দেশ এবং বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে বিকৃত করে স্থির করেছিলেন—আমাদের ঐতিহ্য নাকি, মুসলিম ও যুক্তিনিষ্ঠ বাঙালীদের বাদ দিয়ে শুধু হিন্দু ধর্মগুরুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ! পণ্ডিত নেহরু স্থির করে দেন যুক্তি, মানবতা, এবং স্বাজাত্যবোধ নয়, আমাদের সংস্কৃতির প্রাণ নাকি শুধু "মাধুর্য!"

স্পষ্টতই ভারতীয় সংস্কৃতির এই ঐতিহ্য হলে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির সম্পর্কে প্রতিরোধের প্রশ্নই থাকে না। কারণ ধর্মরহস্যবাদের সঙ্গে মার্কিনী সংস্কৃতির মিলটাই বেশি। এলিঅট, হাক্সলি প্রভৃতির মতবাদ থেকে পরম-হংসবাদ বেশি তফাতে নয়। ঐতিহ্যের এই 'কংগ্রেসী ধারণা তাই আমাদের জাতীয় সাহিত্য থেকে বর্জন করে যুক্তিবাদকে এবং পথ করে দেয় যাতে রবীন্দ্র-নাথ দীনবন্ধু মাইকেল নজরুলকে মানুষ ভুলতে পারে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ এবং কংগ্রেসী নায়কদের ইচ্ছা সত্ত্বেও বাংলার প্রকৃত ঐতিহ্যকে বাংলা ভুলবে না, ভুলতে পারে না।

আত্মবিস্মৃতির আর একটা তরঙ্গ যদি আজ আবার বাঙলাকে ও ভারত-বর্ষকে নতুন মূর্তিতে আচ্ছন্ন করতে এসে থাকে, তবে তাকে প্রতিহত করার মতো শক্তিও এই বাংলার মাটিতে, ঐতিহ্যে এবং তার মানুষের মধ্যেই বর্তমান।

দেশীয় অন্ধতা

কিন্তু এ তরঙ্গ প্রতিহত করা যায় না, যদি না সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরেও যে অন্ধতার জঞ্জাল, যে অধঃপতিত কুসংস্কারের স্রোত বর্তমান তার বিরুদ্ধেও আমরা সচেতন হয়ে না উঠি।

দুর্ভাগ্যের কথা এই যে দেশের অভ্যন্তরে এমনি কতকগুলি মধ্য-যুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণা দীর্ঘদিন আমাদের জনসাধারণকে এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে অচলায়তনে বেঁধে রাখতে চেয়েছে এবং আজো চাইছে। অথচ আজকের বাংলা সাহিত্যকে এই সামন্ততন্ত্রীয় অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করেই বিকশিত হতে হয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা একদা বাংলা ভাষায়

লিখনপঠনের জন্য নরকের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মৌলবীরা ফতোয়া দিয়েছিলেন যে আঙুল বাংলা লিখবে, তাকে কেটে ফেলার। কিন্তু বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে এমনিধারা ফতোয়া অগ্রাহ্য করেই। ধর্মীয় কুপ্রথাগুলি প্রয়োজনীয় এই কথা প্রমাণ করার জন্য 'সাহিত্য' বাংলা দেশেও কম লেখা হয়নি। কিন্তু তাকে বর্জন করেই এগিয়ে এসেছে বাংলা সাহিত্য—এগিয়ে এসেছেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন। রামমোহনের বিরুদ্ধে যে ছড়া কাটা হয়েছিল বাংলা দেশ তাকে সাহিত্য বলে তুলে রাখেনি, আধুনিক বিচারশীলতাকে নিন্দা করে যে হিন্দু গোঁড়ামির সূত্রপাত হয়েছিল কলকাতার অধিকাংশ 'বাবু' জমিদার, রাজাবাহাদুরদের প্রশ্রয়ে তাকে প্রকৃত বাংলা-সাহিত্য বলে বাংলাদেশে আজ আর কেউ মনে রাখেন না, কিন্তু মনে রাখেন বিদ্যাসাগরকে, মধুসূদনকে।

কিন্তু কুসংস্কারের যে জঞ্জালের বিরুদ্ধে আমাদের সাহিত্য ও আমাদের জনগণকে দাঁড়াতে হয়েছে, আজো তার জের মেটানো সম্ভব হয়নি। নির্মল বিচারের প্রতি নিষ্ঠা নয়, বাংলা দেশের অভ্যন্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আজো ধুয়া উঠছে 'হিন্দু' সংস্কৃতির, নতুন করে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ধর্মীয় অবতারবাদ ; শ্রীরামকৃষ্ণ অরবিন্দ প্রভৃতি নামের আড়ালে ডাক আসছে ধর্মরহস্যের নামে পরিত্যাগ করো যুক্তি ও বিজ্ঞানকে।

সামাজিক যে কুপ্রথাগুলি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজকে পঙ্গু করে রাখছে, আজো সেই পণপ্রথা, জাতিভেদ, নারীর প্রতি বৈষম্য, আমাদের সাহিত্যে ও সমাজের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমর্থন পেয়ে আসছে।

সর্বোপরি, অদৃষ্টবাদের সনাতনী কুসংস্কার দীর্ঘদিন আমাদের জনগণের শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে চেয়েছে, স্বামী, ভূস্বামী ও উচ্চ শ্রেণীবর্ণের প্রতি নির্বিচার আনুগত্যের অনুশাসন আজো কার্যক্ষেত্রে বর্তমান, আজো আমাদের সাহিত্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়ে চলেছে মানুষ ও জনগণের নিজস্ব প্রচেষ্টার প্রতি ঔদ্ধত্য ও বিদ্বেষ, ব্যক্তির সুস্থ বিকাশের প্রতি অশ্রদ্ধা।

সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে যদি আমাদের সাহিত্যকে রক্ষা ও অগ্রসর করতে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরের এই মিথ্যা ও ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধেও আমাদের দাঁড়াতে হবে। কারণ, দেশজ প্রতিক্রিয়াশীল এই ধ্যানধারণাগুলির একটা আপাত বৈদেশিক বিরুদ্ধতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেলেও তা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম নয়, বরং কার্যক্ষেত্রে এই ধ্যান-ধারণাগুলি সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করেছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রচারে সবচেয়ে যদি কারো লাভ হয়, তবে তা এখানকার ভূস্বামীদের শুধুই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও। ধর্মীয় রহস্য ও অদৃষ্টবাদের প্রচারে যদি কেউ তুষ্ট হন, তবে তা শুধু এখানকার কায়েমী স্বার্থরাই নন, ইংলণ্ড আমেরিকার কায়েমী স্বার্থেরাও। অরবিন্দ অথবা পরমহংসের রহস্যবাদ অবিলম্বে প্রশ্রয় পায় ইওরোপে, 'গান্ধীবাদ' গৃহীত হয়ে যায় সরাসরি ইউনেস্কোর অন্যতম সরকারী মতবাদ হিসেবে।

অন্যদিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ঠিক এই অন্ধতার

বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হবার ইতিহাস। সত্য যে অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও ইংরাজি আচারের প্রতি বিতৃষ্ণা জ্ঞাপন করেছিলেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য যাঁদের হাতে অগ্রসর হয়েছে তাঁরা হলেন সেই মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, যাঁরা নিজদেশের ক্ষুদ্রতার প্রতিও ক্ষমাহীন, দেশজ প্রতিক্রিয়ার প্রতিও নিষ্করুণ।

ভাবাদর্শের খোলাহাওয়া

সাম্রাজ্যবাদী বিকৃতি ও দেশীয় অন্ধতার বিরুদ্ধে যদি আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে রক্ষা ও অগ্রসর করতে হয়, তবে আমাদের একান্ত প্রয়োজন হল সংস্কৃতির অবাধ বিনিময়।

বাংলা সংস্কৃতির পক্ষে মারাত্মক শুধু সেই সংস্কৃতি যা সাম্রাজ্যবাদের পোষক। কিন্তু ইওরোপ বা আমেরিকা সর্বত্রই এই বিকৃতির উল্টোদিকে আরো এক সাহিত্য ক্রমবর্ধমান, যার দিকে চোখ বুঁজে থাকা আমাদের পক্ষে হবে দারুণ অন্ধতা। আমেরিকা শুধু আইসেনহাওয়ারের নয়, আর এক আমেরিকা আছে, যেখানে জন্ম নেন হুইটম্যান, মার্ক টোয়েন, যেখানে কণ্ঠ জাগে রোবসনের, হাওয়ার্ড ফাস্টের। আর এক ইংলণ্ড আছে যেখানে আবির্ভাব হয় শেকস্‌পীয়র আর নিউটনের, শেলি আর র‍্যালফ ফক্সের। প্রকৃত ইংলণ্ড এবং প্রকৃত আমেরিকার এই ঐশ্বর্য থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে রাজী নই। তেমনি রাজী নই, দুনিয়ার যেখানেই হোক না কেন, নতুন যে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা চলেছে তাকে বাদ দিতে। এমনি নতুন সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হল সোবিয়েত দেশ। এমনি নতুন সংস্কৃতির কাহিনী আসছে চীন এবং অন্যান্য জনগণতন্ত্রের দেশগুলি থেকে। এই সংস্কৃতির যে বাণী, তা হল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বাণী, তা প্রতিষ্ঠিত করছে মানুষকে, তা শ্রদ্ধা করছে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং শান্তির পবিত্র মূল্যগুলিকে।

ধ্যানধারণাকে দেয়াল চেপে রাখা অসম্ভব ; যুক্তি ও বিজ্ঞানের চার পাশে নিষেধ টানার অর্থই হল তাকে অকার্যকরী করে তোলা। সারা বিশ্বে ভাবের এই অবাধ খোলা হাওয়ায় আমরাও চাই কিছু দিতে, কিছু নিতে। আমাদের নিজস্ব জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস থেকেই আমরা জানি যে ইংরাজ শাসনকে ধিক্কার দিলেও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির প্রতি আমরা অন্ধ থাকিনি বলেই সম্ভব হয়েছে মেঘনাদবধ কাব্যের, সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। সোবিয়েত দেশ থেকে শুরু করে আজকের দুনিয়াতেও জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নতুনতর অগ্রগতি ঘটছে, তার পথে খিল তুলে দেবার অর্থই হবে আত্মঘাতী। তা সাম্রাজ্যবাদী বিকৃতির প্রতিরোধ করতে প্রকৃতই সক্ষম হবে না, যেমন একদিন এমনি খিল তুলে দিয়ে সক্ষম হতে পারেননি আমাদের পণ্ডিত ও মৌলবীরা, সক্ষম হতে পারেননি মহারাজা রাধাকান্তদেব।

অথচ ঠিক এই উপদেশটিই আজ পুনরায় আসছে কংগ্রেসী নায়কদের কাছ থেকে। লেক ময়দানের উক্ত অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই উপদেশ দিয়েছিলেন শুধু সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি নয়, সোবিয়েত সহ বিদেশের সমগ্র সংস্কৃতি থেকেই মুখ ফিরিয়ে থাকতে। কিন্তু এ হল অন্ধতা। আমাদের সমগ্র জাতীয় সাহিত্যই এ অন্ধতার বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড সাক্ষ্য। এ মতবাদের নাম তৃতীয় শিবির দিলেও তা অন্ধতা। এবং

শুধু অন্ধতা নয়, দারুণ একটি প্রবঞ্চনা। কারণ আমরা জানি কার্যক্ষেত্রে রেল বই-স্টল থেকে সোবিয়েত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই বিতাড়িত হলেও আজো এদেশের ওপর চাপানো আছে ইংরাজিভাষা, ইংরাজি আইন, গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে আমেরিকান পত্রপত্রিকা ফিল্মের ও প্রচারকদের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা। একে তৃতীয় শিবির বলে না, বলে ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরের নিকট আত্মসমর্পণ।

জনগণের জন্য

অবাধ বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে প্রয়োজন একটা মাটির। সেই মাটি হল বাংলাদেশের জীবন্ত জনগণ। এই মাটি থেকে সরে গেলে সাহিত্য আর সাহিত্য থাকে না। সমসাময়িক জীবন্ত জনগণের ওপর নির্ভর করতে না পারলে, সাম্রাজ্যবাদী বিকৃতির স্পর্শকে রোধ করা অসম্ভব। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নির্দশনগুলির থেকেও আমরা এই শিক্ষাই নিতে পারি।

আমাদের দেশের প্রাকৃত জনগণ একদা নিপীড়িত হচ্ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু প্রতিক্রিয়া ও 'তুর্কী' শাসকদের নিপীড়নে। একজন কবি সেদিন ব্রাহ্মণদের দিকে না তাকিয়ে কার্যক্ষেত্রে ভরসা করেছিলেন এই ব্রাহ্মণেতর জনগণের ওপর। তার ফলে আমরা পেলাম চণ্ডীদাস এবং গভীরতর বাংলা সাহিত্যকে।

আমাদের দেশের জনগণ দীর্ঘদিন যাবত ইংরাজ শাসন ও জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে নানারূপে নানাধরনের প্রচেষ্টায় জেগে উঠছিলেন। এমন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার বাংলা দেশে ছিলেন, যাঁরা এই জনগণের পক্ষে কার্যক্ষেত্রে নানা ধরনে, নানা মাত্রায় না দাঁড়িয়ে পারেননি। তার ফল আমাদের বহুপল্লবিত আধুনিক জাতীয় সাহিত্য।

আজকে যদি আমাদের প্রকৃতই বিদেশের বিকৃত সংস্কৃতির কুপ্রভাব রোধ করতে হয়, তবে শতাব্দী পূর্বের বঙ্গসন্তানদের মতোই তাকে রোধ করতে হবে নতুন সৃষ্টি দিয়ে, এবং এই নতুন জীবন্ত সৃষ্টির জন্য সচেতনভাবেই নির্ভর করতে হবে শুধু জনগণের ওপর, আর কারো ওপর নয়। মাও-সে-তুং-এর কথায় 'সৃষ্টিমূলক শিল্প সাহিত্যের জন্য অফুরন্ত কাঁচামাল সরবরাহ করাব একমাত্র উৎস হল জনগণের জীবন। এবং যেহেতু এটা একমাত্র উৎস, তাই আর অন্য কোনো উৎস থাকতে পারে না।'

কিন্তু এ জনগণ একটা মনগড়া ধারণা মাত্র নয়, এ একটা জীবন্ত সত্তা, লেখকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ একটা বাস্তব শক্তি। আজ এই জনগণ অগ্রসর হয়ে চলেছেন তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, উন্নত ভবিষ্যতের জন্য। মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা শান্তি তাঁদের কাছে একটি পবিত্র আদর্শ, গণতন্ত্র এবং জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা তাদের সামনে একটি মহৎ কর্তব্য। সাহিত্যে বিকৃতির যারা উৎস সেই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধেই তাদের সংগ্রাম।

মহৎ ভবিষ্যতের জন্য অগ্রসরমান এই জনগণই হল সেই নতুন সৃষ্টির উৎস ও প্রেরণা, যা সবচেয়ে সফলভাবে সাম্রাজ্যবাদী বিকৃতিকে রোধ করতে সক্ষম।

এবং ঠিক এইখানেই কংগ্রেসী নায়ক ও সাহিত্য-নায়কদের ঘোরতর আপত্তি। উক্ত অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু উপদেশ দিয়েছিলেন—"সাহিত্য যেন বিরোধ সংঘর্ষ ও রুক্ষতা পরিহার করে" এবং মাধুর্যকে আশ্রয় করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আরো অগ্রসর হয়ে আহ্বান করেন, "নিন্দা বিক্ষোভ ও ঘূর্ণি-বাত্যায় অবিচল থেকে যাঁরা কর্মশক্তি দিয়ে দেশকে নতুন করে সৃষ্টি করছেন, তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে দেশের মনন শক্তিকে।"

ভাষাটি সাহিত্যিক হলেও এ হল মাধুর্যের নামে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে বর্জন করার এবং কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রীদের পেছনে দাঁড়ানোর আহ্বান।

সম্প্রতি কটকে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে বনফুলও একই ভাবে ধিক্কার দিয়েছিলেন সাহিত্যে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের প্রচেষ্টাকে এবং অপেক্ষা করতে বলেছেন কোনো অতিমানব প্রতিভার জন্য।

ধর্মগুরু, প্রতিভা বা প্রধান মন্ত্রীর নামে নিজদেশের অগ্রসরমান জনসাধারণের প্রতি এই ধিক্কার আসলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বাণীর প্রতিই ধিক্কার। কারণ রবীন্দ্রনাথই শেষপর্যন্ত জনগণের ওপর বিশ্বাস রাখতে আহ্বান জানিয়ে গেছেন, মাটির কাছাকাছি যে আছে তার জন্য কান পেতে থাকতে শিখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই বাণীকেই প্রগতি সাহিত্য গ্রহণ করে ও তাকে অগ্রসর করে; বলে, সাহিত্য জনগণের, সাহিত্যের আনুগত্য জনগণের প্রতি।

সাম্রাজ্যবাদী বিকৃতি প্রসঙ্গে এই হচ্ছে দুটি বিপরীত চিন্তা। একটি চিন্তা কংগ্রেসী নায়কদের, অন্যটি প্রগতিশীলতার। একটি এই বিকৃতিকেই স্থায়ী করতে চায় অন্যটি তাকে সত্যই প্রতিরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যকে আরো অগ্রসর করতে সক্ষম। একটি পথ পরাজয়ের, অন্যটি সাফল্যের গ্যারাণ্টি।

প্রগতিশীলতার এই পথ বাংলার প্রকৃত ঐতিহ্যকে বিচার করে গ্রহণ করে, কিন্তু সবচেয়ে সফলভাবে তার জন্য দাঁড়ায়, সংগ্রাম করে বাংলার স্বকীয় সাহিত্যের জন্য, জাতীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় সমগ্র জাতিকে।

কংগ্রেসী নায়কেরা চান দেশের পচনশীল অংশগুলিকে আঁকড়ে থাকতে। প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পবিত্র পতাকাও আজ তাঁদের চক্ষুশূল।

কবিতা

শেষ লেখা

পল এলুয়ার

সবই সম্ভব ছিল অথচ পারিনি এতটুকু
সর্বস্ব-উজাড়-করা প্রেম দিয়ে তবু থাকে বাকি

আকাশ সমুদ্র এ পৃথিবী
লুপ্ত করে ফেলেছে আমাকে

মানুষ দিয়েছে জন্ম আমাকে আবার।

এখানে সমাধিতলে তারই স্মৃতি, জীবনে যে ছিল নিঃসংশয়—
ঊষার দাক্ষিণ্য আছে যুগে যুগান্তরে,
মরণের মুখোমুখী ভেবেছে যে জন্মাবে আবার
উদয়শিখরে সূর্য যেমন অম্লান।

এ জীবনে ছিল ক্লান্তি নিজের বা অপরের দায়ে,
তবু তো চেয়েছি আমি নামাতে আপন ভার
লঘুতর করে দিতে সর্বরিক্ত ভাইদের বোঝা—
সেই অকরুণ বোঝা যাকে টানি জন্ম থেকে শ্মশানযাত্রায়

আমারই আশার নামে রেখেছি স্বাক্ষর ঐ অন্ধকার-পটে

দাঁড়াও, বারেক তুমি ভেবে দেখ সেই বনভূমি
ভেবে দেখ জীবন্ত রৌদ্রের স্পর্শে উদ্দীপ্ত প্রান্তর
ভাবো সেই মুক্তিপথ শঙ্কাছায়াহীন গ্লানিহীন

আমার জীবন মোছে তোমার জীবন ঠাঁই নেয়
বসন্তের অনুরাগে চেতনার উজ্জীবনে আমাদের যাত্রা অবারিত
আমরাই সর্বোচ্চ আশা জীবনে ও অগ্নিপরীক্ষায়॥

অনুবাদঃ মণীন্দ্র রায়

সাঁওতালি

[সাঁওতালদের অনেক গান বাংলায় রচিত। ঠিক যেমনটি পাওয়া গেছে, তেমনটি রাখা হয়েছে। কোনোকিছুর অদলবদল আমার কাছে নিষ্প্রয়োজন বোধ হচ্ছে। কানে যেখানে খটকা লাগে (যেমন 'মিলন ক'রো না' বা 'গলাতে ঝমক ঝমক'-এর জায়গায়), সেখানে চোখকে সজাগ রাখতে অনুরোধ করি। ছবির সারি দিয়ে বোনা সাঁওতাল গানের অনেক-খানিই, কানকে খাড়া ক'রে রাখলে, হারাতে হবে ॥]

লাগড়ে

১

মাটি আমার ভাই বোন,
মাটি আমার রানী।
মাটি আমার মা বাবারে,
মাটি কী তা জানি!

২

কোপাই-এর জল কাচের মতো।
কোপাই-এর জল মেয়ের মতো।
মেয়ের মতো চুল রে
কোপাই নদীর বালি ॥

৩

হিরণপুর যেয়ো না,
বাবুর মতো ব'সো না,
কালিকলম ধ'রো না,
মিলন ক'রো না ॥

৪

উড়ুনি বনে, মুন্সি,
সোনার বাঁশি কুড়িয়ে পেলাম।
সেই বাঁশির ভিতরে
চিনি ছিলো,
সেই চিনি খেয়ে রে
মনে রইলো ॥

৫

এক পয়সা বাঁশি।
দু'পয়সা মল।
কাকি রে,
চুড়ির দাম আনা আনা
বাড়ি ফিরে চল ॥

৬

মেলা এলম বেড়াতে
ঘরসংসার এড়াতে।
ঘর এলি পিছু পিছু,
মেঘ ডেকেছে, বাবা!

৭

সাহেবডাঙার শাদা ঘোড়া,
মিতে রে, পা চলে না।
আকাশে কড়াক্কড় মেঘের ঘা,
মিতে রে, বুক করে দুর দুর।
সাহেবডাঙায় এতো ঘোড়া!
মিতে রে, চোখ চলে না ॥

৮

হেলে, হেলে, হেলে,
চারকলগাঁয় এলে।
দেখতে পেলে কী:
চারপো জোড়া চিতলে মাঠে
কাঁদছে ব'সে ঝি।
ঝি, ঝি, ঝি,
সোনার চুলে জট লেগেছে
ছাড়িয়ে দেবো কি!

৯

শহর, শহর!
বহু রে, বুক করে ধরমর!!
শহর, শহর!
আমরা না নাচবো না!!
শহর, শহর!
বেটা ম'লো ধানের কলে
নাচবো না!!
শহর, শহর!!

লাগড়ে: কোনো পরবের গান নয়—যা বারো মাস গাওয়া চলে।
হেলে: কোনো ছেলের নাম। চারকল গাঁ: একটি গ্রামের নাম।

সংগ্রাহক: পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

শীত

চিত্ত দাস

শীতের শাসনে কাঁপে ঘরে আমার বুড়িমা।
কনকনে কশা হানে সর্বাঙ্গে প্রহার
রক্ত শুষে রক্ত টানে তার
জমে জমে রক্ত ক্রমে কী শক্ত জমাট বাঁধে।

কনকনে কশা হানে সর্বাঙ্গে প্রহার
নড়বড়ে দাঁত, তবু
দাঁতে দাঁত লাগে তার
দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়
শব্দ যেন শীতের শাসন-শৃঙ্খল ভাঙার।

বুকের বাছার হাড় গুনে গুনে
কতদিন কতরাত
ক্ষয়েছে দুচোখ
শীত, কী শীত!
তবু এসো, তবু একবার,
ভর করে আমার দুহাতে
ঘর থেকে বেরিয়ে বুড়িমা
দাঁড়িয়ে উঠোনে আকাশের দিকে
ছাইচাপা আগুনের মতো চোখ
মেলে, কেঁপে, কেঁপে, কেঁপে, কেঁপে

একবার ফেটে পড়ো আকাশের প্রান্ত থেকে
প্রান্তজ্বলা বজ্রের মতন
আমার বুড়িমা!

সেই উজ্জ্বল বসন্তের চতুর্দশপদী

পূর্ণেন্দু পত্রী

কনক-নিকষ-কান্তি কে তুমি গো প্রবল পুরুষ
আ মরি আ মরি সারা অঙ্গ জুড়ে গন্ধের আতর
ঝলকে ঝলকে হেসে উতলা করেছো বনতল।
তুমি বুঝি সেই লোক যাকে খুঁজে অরণ্য পাগল
অন্ধকারে গন্ধহারা ফুলেরা কেঁদেছে নিঃসহায়—
যাকে খুঁজে গাছে গাছে তীব্র অগ্নিশিখার মতন
রক্তমাখা মুখ তুলে গোলাপ গেয়েছে যার গান।

ধন্য তুমি ধন্য বীর দিগ্বিজয়ী প্রবল পুরুষ
পথে পথে অত্যাচার লোলজিহ্বা জল্লাদের দাঁত
হেমন্তের ষড়যন্ত্র শীতের কঠিন কারাগার
সে সব মাড়িয়ে এলে কি নির্ভয়ে জয়ের সাহসে।
দুহাতে বাজাও আজ মুরজ মুরলী কত সুরে
বুকের ফাটলে ঢালো অফুরন্ত যৌবনের ঢল।
ধন্য তুমি হে বসন্ত এ' প্রাণ-উতলা বনতলে।

গ্রীষ্ম

দেবব্রত সেনগুপ্ত

একটা গাছের নিচে রোজ ওকে দেখি ভিক্ষে করতে
শিল্পীর অত্যন্ত পুরোনো বিষয়বস্তুর মতো
ঐ গাছ আর ফাটা হাত বাড়ানো ভিক্ষুকের বসার ভঙ্গিটি
কোনো একদিন ঐ ভিক্ষুকের হাততালিতে গাছের ওপরকার কয়েকটা পাখি উড়ে গেল।
শেষ পাতাটি ঝরল।
ও বুঝতে পারল শীত উড়ে গেছে পাখিগুলোর মতো,
হালকা সবুজ রঙের বরফকুচো ছেয়ে গেল গাছের ডালে
কালো পাখি, হলুদ পাখি শিষ দিল
বসন্ত এল ভিক্ষুকের প্রসারিত চৌচির হাতের ওপর।
মাঝে মাঝে ওকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকতে দেখতাম
শুক্লপক্ষের শেষ চাঁদ উঠত আকাশে।
ওখান থেকে, ওর ঠিক মুখোমুখী
ক্যালেণ্ডারের ছবির মতো দুটো জড়াজড়ি করা নারকেল গাছের ফাঁকে
সন্ধ্যার রাঙা চাঁদ
একটা অত্যন্ত পুরোনো সত্যকে উপলব্ধি করার মতো
আনন্দে মহান হয়ে উঠি আমি।

সেদিন দেখলাম ও নেই, ঐ ভিক্ষুকটি
সারারাত ওখানে থাকার দোষে
নিয়ম এসে আইনের বালা পরিয়ে নিয়ে গেছে।
ও কিসের জন্যে ছিল?
ঐ আকাশের রঙচঙে ছবিটা দেখার লোভে
না, সেদিন আর থাকারই জায়গা ছিল না কোথাও
কি করে জানব কেন।
শূন্য জায়গাটায় একটি মেয়ে
ঝাঁকড়া মাথায় ছোট্ট হাত ডুবিয়ে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠল,

অনেকক্ষণ কাঁদল দাঁড়িয়ে
তারপর কারু কাছে কোনো জবাব না-পেয়ে
অন্যহাতের ওপিঠে চোখ মুছতে মুছতে
চলল লম্বা সড়ক ধরে—
যেখানে ট্রাম লাইন, এভিন্যুর গাছগুলো, আকাশ আর চাঁদের আলোর
নিটোল, বিশ্বগ্রাসী, চুম্বক বিন্দুটির দিকে
যতদূর আমাকে ছাড়িয়ে যায়
ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে সেই কান্না
আর শুনব না, আর দেখব না, ঐ বিন্দু ওকে টেনে নিচ্ছে।

তারপর হঠাৎ একদিন দেখলাম
সেই ঝাঁকড়া মাথায় বাচ্চা মেয়েটা ওর বাপের জায়গায় বসে
ভিক্ষে করছে—
যে মুঠো শুধু খেলার জন্যে
যে মুখ শুধু চুমু খাবার জন্যে
যে আধো ভাষায় সৃষ্টির গুঁড়ো গুঁড়ো আনন্দ মাখা
সেই মুঠো খুলেছে প্রয়োজনে
সেই ভাষার নরম অঙ্কুরটি ব্যবস্থার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা
ঠিক ঐখানে ঝাঁকড়া মাথায়, বাচ্চা মেয়েটা ভিক্ষে করতে করতে
বাড়ছে।

রাস্তার ধুলোজমা পেছনের গাছটার ঘন পাতার নিচে
দুর্ঘটনার মতো মেয়েটার উদ্‌লা গায়ে
রুক্ষ গ্রীষ্ম এল।

আহত পাহাড়

রাম বসু

বিষণ্ণ সূর্য, লক্ষমুখ শিখাও নিবু নিবু
শেষ রশ্মি-বল্লম দূরাহত পাখির ডানায়
স্তব্ধ, স্তব্ধতায় রক্তজবা নদী ক্রমশ মলিন
পাথুরে, নৈশব্দ্য পটে ঝিল্লীর ডাক, ঝর্নার কান্না, পশুর পদশব্দ।

ওদিকে, স্বর্ণ-শিকারীর বাণবিদ্ধ খনিজ পাহাড়
দীর্ঘ দিনমান রক্তাক্ত, কৃষ্ণচূড়া দিক্‌সীমায়
ভয়ঙ্কর। অবলুপ্ত অতীতের পুঞ্জীভূত জ্বালায় জ্বলছে, জ্বলছে।

কোথায়, কোথায় সেই দৃপ্তযৌবনা প্রান্তর
অতৃপ্তরতি গরবিনী মানবীর প্রখরতা
সে কি ওই রিক্ত-শ্যাম, বহু ধর্ষিতা, উলঙ্গ ; সে কি ওই?

কাঁচা লোহার রঙ লাগা নিরেট আকাশের নিচে
গা-খোঁড়া রক্তাক্ত খনিজ পাহাড়
যেন শিকল বাঁধা রূপকথার বন্দী
তার কপাল গড়ানো রক্তে এই মাটি লাল
বুকের পাঁজর ভাঙা ঘূর্ণি মারে ঝর্নার ডাক
ঠিকরে আসা চোখের মণির প্রতিবিম্বে সপ্তর্ষির আলো
হাঁটু-গাড়া পিঙ্গল দেহ স্পর্ধিত ; দুই হাতের টানে
সমুদ্র ফিরে যাবে যেন
যেন বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন ছিড়ে পৃথিবী
অন্তহীন শূন্যে পাখির মতো উড়ে যাবে।

আমি সেই মুখের দিকে তাকিয়ে সম্মোহিত
রোমাঞ্চকর যন্ত্রণার জন্মদ্বারে অপরূপ রূপান্তর
বেদনার মেঘময় মুকুট মাথায়
জনপদ গিরি মরু মনে সে আমার স্বপ্নভার ছায়া ইন্দ্রধনু
ঢাকে ময়ূরকণ্ঠি আকাশ থেকে তামস-তপস্বী পাতাল
নিচে মাটি, নদী, শ্রম, ভালোবাসা, ধান, মানুষের মুখ
আশ্চর্য ঐকতানে বিচিত্র মুখর; মুখরিত
রাত্রির হাতে সংজ্ঞাতীত কালের তম্বুরা
বনময় ঝর্নার গান, পাখির ডাক, নক্ষত্রের দৃষ্টি
আমার রূপ,—আমার রূপ স্বপ্নভারাতুর।

হে শহর

[আমার আবাল্যের নৈহাটীকে]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

বার বার তোমার বসন্ত-বর্ষায় তিলে তিলে,
তোমার জটলায় তোমার মিছিলে
রূপ থেকে রূপান্তরে
ঘুরে বেড়িয়েছি ঢেউয়ের মতন কত প্রহরে প্রহরে।

এরই অন্ধগলির বুকে, রাজপথে আলোর খেলায়
বেকার-চপ্পলের শেষ পেরেক ঘষে ঘষে তুলে ফেলায়
হে মোহিনী, তোমারি নিষ্ঠুর রূপ
দেখলাম, ধূসরিম পরিকীর্ণ জঞ্জালের স্তূপ
ফুটো করে মাথা চাড়া দেয় কোন্ এক নাম-না-জানা ফুল,
হে শহর হে প্রেয়সী আমার
ছোট হোক ম্লান হোক আকাশের সম্ভাষণে তবু সে আকুল।

দুই

তোমার গতি-প্রমত্ত বারবিলাসিনী পথের উল্লাসে
হঠাৎ গান গেয়ে আকাশ-সম্ভাষে
সাড়া দিত সেই যে স্বেদাক্ত কিশোর,
আজ তার যৌবন-বিমুগ্ধ ভোর
সেকি মেঘে মেঘে ঢেকে যাবে?
অকাল মল্লারের হাওয়ায় আশাবরী আকাশে মিলাবে?
নাকি সারা রাজপথ
ভরে দেবে শত্রুনিপাতের কঠিন শপথ,
জেগে উঠবে ঝলসানো দিগন্তের মতো সূর্যোদয়ে ঝিলমিল
গেয়ে উঠবে বিস্ময়াবহ বসন্তের প্রথম কোকিল?

তিন

শীতের ঝিরঝিরে দুপুরে এরই পথে হাঁটা
এরই নতমুখী ঝিকিমিকি ঝরোকার কালো চুলের ফ্রেমে আঁটা
একখানি মুখ দেখে প্রথম কবিতা লিখলাম।
জীবনের কাছে নতজানু হয়ে তার নাম
স্তোত্রের মতো বলেছি বারবার
আকাশ বধির করা শহর-কল্লোলে
সেই মেয়েটি বেজেছে একটি ঝঙ্কার,
সেই মেয়েটি শিখিয়ে গেছে সায় দিতে
কখনো ঝড়ের সঙ্গে কখনো সংগীতে
আমার অন্ধকার চোখ দুটি তার হাতে প্রেমিকের দীয়া
কিরণমালার মতো সেই মেয়ে পাথরের প্রাণ-জাগানিয়া।

চার

দোকানে দোকানে রঙ বেরঙের সন্ধ্যা নামে—রাজপথ রঙেই বেঘোর,
থতমত হতভম্ব বরিশালী নদীর কিশোর
অথৈ জলে চোখের পাতা ডুবু ডুবু বারবার।
হায়রে, পাথুরে পথে শোধ' না কি কোনোদিন চোখের জলের ধার।
ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায়-কালোথুতু হঠাৎ একদিন কী করুণ লাল
হৃৎপিণ্ড মনে হয় একতাল দুর্বহ জঞ্জাল।

পদ্মার মাঝির মেয়ে এ ঘূর্ণিতে পায় না কিনারা
লালসুতোয় বেঁধে রাখা এয়োতির ইশারা
আর তো টেকে না বুঝি,
গ্রন্থিল প্রাসাদে কেবলি কি চক্রান্তের পুঁজি
সিন্ধুর গাগরি ভরণ ভেঙে হেনে যায় ক্রূর শব্দভেদী
অন্ধক জনক-জননী দৃষ্টিহীন কান্নার কয়েদি।

পাঁচ

বঙ্কিম চাটুজ্যের ভিটে বাড়ি চেয়ে থাকে পশ্চিমের দিকে
প্রবীণ সিঁদুরে সূর্য প্রতিদিন কী বেদনা যায় লিখে লিখে—
জানায় কি কমলাকান্তের ব্যথাতুর হৃদয় কাহিনী,
কিছু পরে ঝিঁঝিঁর ন'বৎ বাজবে রিনি-রিনি-রিনি
দূরের ন্যাড়াগাছে জোনাকির বসন্তাভিনয়
শুরু হবে, অসংখ্য বেদনায় নয় ছয়
মান্ধাতার শেকলে বাঁধা বন্ধ্যা দুই হাত রেখে সিঁড়ির উপর
কেউ কেউ চেয়ে রবে প্রহরের পর প্রহর,
স্বপ্নে বাজে দুর্গেশনন্দিনীর প্রেমাবিষ্ট স্বর
'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'।

ছয়

একদিকে মড়ক অপরদিকে মরকত মায়ার বাহার
তিনলাখ ভুখা ফৌজের হে তিরিশ হাজারী মন্‌সব্‌দার,
আর কতদিন চলে
তুলে ফেলে দাও গঙ্গার কালের কল্লোলে
তোমার ছিটে বেড়ার খোলা-চালের অক্ষম ছাউনি
ছল ছল গঙ্গার স্রোতধারে শুনি
যুগান্তরের মোহানার গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ
চল সেই চূড়ান্ত অমোঘে হে শহর স্থবির জাহাজ...
একদিন এইখানে ফেব্রুয়ারির উদ্দাম দুপুরে
চটকল দিয়েছিল রক্তাক্ত প্রণাম তার ছুঁড়ে
ওইখানে একদিন ভরা ভর্তি দিনের বেলায়
আরব সাগর থেকে এসেছিল খেপা হাওয়া
ডাক দিতে প্রাণের মেলায়।

সাত

তোমার জ্বরাতুরা দেহোপজীবিনীরা
শেষ রাতে—ক্লান্ত প্রতীক্ষায় ব্যর্থ বিকিকিনির
পসরা নিয়ে নিবু নিবু লম্ফের আলোয় ফেরে ঘরে।

দস্তুর দেওয়ালে চেয়ে এ অন্তিম প্রহরে
শুখ্‌নো চোখে মরুজ্বালা আকুল বেকার
শেষ তারা গুণে যায়,—নিশি দিশি অন্ধকার
কানাগলির মোড়ে, হাওয়া এসে মাথা ঠোকে
ভোর এসে বাধা পায় চিরকাল ধরে।
ক্ষুধার্ত কুকুর-কান্না পথে বাজে আচম্বিতে,
বেনামা ছেলেমেয়ের দল মাঝ রাতের শীতে
জড়িয়ে ধরে পরস্পর।
সোজা বি, টি, রোড ধরে বয়ে যায় উত্তুরে ঝড়।
হে শহর তোমার ভোরের বাঁশি
দুপায়ের বেড়ি খোলা আর এক মুক্তির বাঁশি
কুয়াশা মাখানো এই আমাদের নভেম্বর উড়িয়ে উড়িয়ে
বাজাও বাজাও, আমরা সকলে মিলে এবার বাইরে ছুটে আসি॥



পরিচয়-এর কুড়িবছর

হিরণকুমার সান্যাল

এগারো

আধুনিক কাব্যঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'রবীন্দ্রোত্তর' বাংলা কবিতার আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, এ-ক্ষেত্রে 'আধুনিক' কথাটির অর্থ একেবারেই পারিভাষিক। সত্যেন দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, যতীন বাগ্‌চি বা মোহিতলাল মজুমদার, এঁরা কেউই এই পারিভাষিক অর্থে আধুনিকতার দাবি করেননি, এঁদের প্রশংসায় বা প্রতিবাদে অন্য কোনো সমালোচকও এঁদের প্রসঙ্গে 'আধুনিকতা' কথাটি প্রয়োগ করেননি।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা নিয়ে প্রথম শোরগোল উঠেছিল কল্লোল-সাহিত্যিকদের অর্বাচীন কোলাহলের ফলে। এঁদের মধ্যে যিনি ছিলেন অর্বাচীনতম, একমাত্র সেই বিষ্ণু দে-র কাব্য-রচনাতেই কল্লোলীয় আধুনিকতা ক্রমশ স্বকীয় ভঙ্গিতে কায়েম হয়ে দাঁড়াল। বাদবাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা যে অচিরেই রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি।

বিষ্ণু দে যখন 'পরিচয়'-এর পাতায় নতুন মেজাজের ও নতুন ভঙ্গির কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় তখনও রবীন্দ্রনাথের শুধু মেজাজ নয় আওয়াজও অত্যন্ত স্পষ্ট। 'পরিচয়'-এ তাঁর রচনা ছাপা হয়েছে ক্বচিৎ কদাচিৎ কিন্তু ইতিহাসের খাতিরে উল্লেখ করা উচিত যে এর অল্পদিন পরেই অমিয়বাবু তাঁর কবিতা নতুন ছাঁচে ঢালাই করতে শুরু করেন। কিন্তু ছাঁচ বদলালেও মালমশলা বদলায়নি, মেজাজ তো মোটেই না।

অমিয়বাবু ও সুধীন প্রায় সমবয়স্ক, দুজনেই বিষ্ণুর চেয়ে বয়সে বেশ কয় বছরের বড়। কিন্তু 'তরুণ' কবি বলে বিষ্ণু যখন যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছে—নিজগুণে বা কল্লোলীয় সঙ্গদোষে, সুধীনের বা অমিয়বাবুর কবিতার পরিচয় তখনও বাঙালী পাঠক পায়নি। সুধীনের প্রথম কবিতার বই 'তন্বী' এই সময়ে ছাপা হয়। পাণ্ডুলিপিতে এই বইয়ের কতকগুলি কবিতা দেখে রবীন্দ্রনাথ এগুলির স্বকীয়তার কথা আমাদের বলেছিলেন। তখনো 'পরিচয়' বেরোয়নি। এর পর 'পরিচয়' বেরোলে রবীন্দ্রনাথের হাতে একখণ্ড 'তন্বী' দেওয়া হয় সমালোচনার বরাত দিয়ে। কিন্তু বহু অনুরোধেও সমালোচনাটি আদায় হয়নি। এর কারণ আলস্য বা সময়াভাব নয়। সুধীনের অসাক্ষাতে কবি একদিন আমাকে বলেছিলেন, "দেখ, ভোগ করব পুরোপুরি তারপর বলব কিছু না—এ আমার অসহ্য লাগে।" 'তন্বী'র 'শৃঙ্গার' ও ঐ-জাতীয় কবিতার কথা মনে করেই রবীন্দ্রনাথ ঐরকম কথা বলে থাকবেন। 'তন্বী'র সব কবিতাই অবশ্য এই জাতীয় নয়। এর অনেক কবিতাতেই কি মেজাজে, কি সাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল। সুধীন কাব্য-রচনার হাতেখড়ি করেছিল রবীন্দ্র-

নাথের হরফেই হাত বুলিয়ে, বিষ্ণু দে-র মতন নতুন বর্ণমালা উদ্ভাবনের চেষ্টা না করে। ক্রমশ দেখা দিল সাজবদলের চেষ্টা, সেই সঙ্গে স্পষ্টতর হল শুধু মেজাজের নয়, একেবারে মজ্জাগত স্বকীয়তা।

সুধীনের দ্বিতীয় কবিতার বই 'অর্কেস্ট্রা'। এর কবিতাগুলো সবই লেখা 'পরিচয়'-এর প্রথম যুগে। প্রথম যে কবিতা বা কবিতা-সমষ্টির নামে বইটির নামকরণ তার শেষের দিকে আছে কল্পলোকের প্রেয়সী সম্বন্ধে কবির এই ভাববিলাসঃ

মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে,—
আমার অমবা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।
স্খলিতবসন উরুতে তোমার
অনাদি নিশার শান্তি উদার;
নবদুর্বার চিকণপুলক ও বরদেহে।
বিশ্বের প্রাণ বিকচ আজিকে আমার গেহে।

'অনাদি নিশার শান্তি উদার' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দান, কিন্তু সুপ্ত প্রেয়সীর স্খলিতবসন উরুতে এই শান্তির সন্ধানলাভ সুধীনের স্বকীয় আবিষ্কার। এর পর সুধীনের আধুনিকতা আরও মৌলিক হয়েছে 'অর্কেস্ট্রা'-কাব্যের চরম পরিণতিতেঃ

অকস্মাৎ স্বপ্ন গেল টুটে।—দেখিনু সরমে চাহি
জনশূন্য রঙ্গালয়ে নিবে গেছে সমস্ত দেউটি,
নিস্তব্ধ সকল যন্ত্র, মঞ্চপরে যবনিকা ঢাকা।
অলক্ষ্যে কখন পার্শ্ব হ'তে প্রেমিক প্রেমিকা চলে
গেছে অমৃত সংকেতে। শান্তি-শান্তি-শান্তি চারিধারে।
কেবল অন্তর মোর দীর্ণ হয় ক্ষুব্ধ হাহাকারে॥

তখনকার আধুনিকতার অভিনবত্ব ছিল অন্তরের এই হাহাকার। এলিয়ট-এর মরু-বিলাপ ক্ষান্ত হয়েছে শান্তিবাচনে; ক্যাথলিক চার্চ-এর আশ্রয়ে এলিয়ট এখন প্রায় নিরাময় হয়েছেন। কিন্তু সুধীনের ক্ষেত্রে

কবিত্ব আমার ব্রত, তাই বুঝি কৌমুদী জাগরে
পেচকীর দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা!

কিংবা

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে;
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে;
বস্তুর দুর্দান্ত চিতা অনির্বাণ শূন্যের সৈকতে;
কালের অদৃশ্য গতি ব্যক্ত শুধু বিপ্লববর্ধনে
সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ, সে কেবলি সম্ভব স্বপনে;
বিসংবাদ, বিকর্ষণ, আর্যসত্য জাগ্রত জগতে;
ছুটি মোরা মর্ত্যচর আত্মঘাতী আবর্তের স্রোতে,
ফেনিল সম্মোহে মেতে, লুব্ধকেন্দ্র নাস্তির শোষণে।

ছন্দ ও ভাষার কাঠামো নেওয়া রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে (যদিও রবীন্দ্রনাথ কখনও সনেট লেখেননি); অভিধান ঘেঁটে শব্দ সংগ্রহ করে এই কাঠামোকে

সাজানো হয়েছে নতুন সাজে। 'শনিবারের চিঠি' তাই উপরের উদ্ধৃতিটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে সপ্তম লাইনের 'ছুটি মোরা' শব্দ দুটি অভিধানে খুঁজে না পাওয়ার জন্যে পংক্তিগুলির অর্থ বোধগম্য হয়নি। এই পরিহাস নিরর্থক নয়। কিন্তু এ-কথা মানতে হবে যে সুধীনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্তরের তিক্ততা ফুটে উঠেছে তার কবিতাগুলির পংক্তিতে পংক্তিতে; এই তিক্ততা তার স্বোপার্জিত, তাই তার মৌলিকতা অবশ্যস্বীকার্য। সুখের বিষয় এই মৌলিকতার সমাপ্তি ঐখানেই; উত্তরকালের বাংলা কবিতায় সুধীনের প্রভাব যেটুকু সঞ্চারিত হয়েছে তা শুধু ভাষাগত।

জীবনানন্দ দাশের কবিতাও 'পরিচয়'-এ মাঝেসাঝে বেরিয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ও বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন মিত্র ও অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত কবিদের নাম আগেই করেছি। বাদবাকি কবিদের মধ্যে হুমায়ুন কবির, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, জীবনময় রায়, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বাগচী, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বা দিলীপকুমার রায়—এঁদের কাউকেই 'আধুনিক' বলা চলে না, অন্তত বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী বা সুধীন দত্তের মতন এঁদের প্রভাব কনিষ্ঠ কবিদের মধ্যে দেখা যায় না।

এই তিনজনের মধ্যে বিষ্ণুর প্রভাব অবশ্য সবচেয়ে ব্যাপক। এই প্রভাব যে খুব স্বাস্থ্যকর হয়নি তার কারণ বিষ্ণু দে-র বক্রোক্তি অনুকারকদের হাতে দাঁড়িয়েছে অসহনীয় ভঙ্গিদোষে। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে এই বক্রোক্তির উৎস, তাঁরই নিজের ভাষায়, তাঁর নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও তাঁর তির্যক দৃষ্টি; দুই-ই তাঁর অনুকারকদের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু বিষ্ণু দে বাংলা ছন্দে নতুন দোল এনেছেন—এটুকু আমাদের লাভ।

যে-যুগের কথা বলছিলাম সে-যুগে ফিরে যাওয়া যাক। 'পরিচয়'-সভায় ইতিমধ্যে আর একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলার মাটিতে তাঁর জন্ম হলেও বহুদিন বিদেশে কাটিয়ে ও ইংরেজি ভাষাকে মাতৃভাষার মতন আয়ত্ত করে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন আমরা তাঁকে গ্রহণ করলাম বিদেশী সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে—স্বদেশে প্রত্যাগত বাঙালী হিসাবে নয়।

সাহেদ সুরাওয়ার্দি

এই আগন্তুকটির নাম সাহেদ সুরাওয়ার্দি। কলকাতার সুপরিচিত সুরাওয়ার্দি পরিবারে তাঁর জন্ম। অখণ্ড বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সহিদ সুরাওয়ার্দি এঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সাহেদ সুরাওয়ার্দি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন সাঙ্গ করে অক্সফোর্ডে যান ও সেখানকার পালা শেষ হলে সাহিত্য ও ললিতকলার অনুসরণে, ভাগ্যের অন্বেষণে ও প্রবৃত্তির তাড়নায় বৃত্তি গ্রহণ করেন ইওরোপের দেশ হতে দেশান্তরে যাযাবর জীবনযাপনের। এই অবস্থায় ফরাসি দেশে এঁর প্রায় শিকড় গজায়। অতঃপর রাশিয়া। সেখানে বিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটার-এ নাট্যকলা সম্বন্ধে এঁর শিক্ষানবিশির সুযোগ ঘটে, কিন্তু বলশেভিক বিপ্লবের বিপর্যয় অসহ্য হওয়ায় সাহেদ সুরাওয়ার্দি তিক্ত চিত্তে রাশিয়া থেকে প্রস্থান করে আবার গা ভাসিয়ে দেন ইওরোপীয় জীবনের ঘূর্ণিপাকে। প্রবীণ

বয়সে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে সাহেদ সুরাওয়ার্দি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ললিতকলার বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থাতেই ইংলণ্ডের সাহিত্যিক-চক্রের সঙ্গে সাহেদ সুরাওয়ার্দির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে অক্সফোর্ডবাসী রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস-এর সঙ্গে। এই সময়েই ইংরেজিতে কবিতা রচনায় তাঁর হাত খোলে। এই সব কবিতা পরে 'এসেস্ ইন্ ভার্স' (Essays in Verse) নামে সংগ্রথিত হয়ে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই বইটিরই সমালোচনা-প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে সাহেদ সুরাওয়ার্দির সম্বন্ধে 'নাগরিকোচিত বৈদগ্ধ্য' কথাটি ব্যবহার করেন। এই কথাটি আমি প্রয়োগ করেছি বিষ্ণু দে-র নিজের সম্বন্ধে। বিষ্ণু দে-র সমালোচনার কথা পরে বলছি। আপাতত একটু ব্যক্তিগত কথা বলি।

সাহেদ সুরাওয়ার্দি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের গান, "তোমায় চোখের দেখার আগে, তোমার স্বপ্ন চোখে জাগে"। এ-ক্ষেত্রে আমার মনে স্বপ্নের বীজ বুনেছিল নীরেন রায়। সাহেদ সুরাওয়ার্দি'র কবিতার বই তখনো আমাদের হাতে পৌঁছয়নি কিন্তু এখান-ওখান থেকে তাঁর কয়েকটি কবিতা নীরেন সংগ্রহ করেছিল আর নীরেনের কাছ থেকে এইসব কবিতার সন্ধান পেয়ে আমি বেশ একটু বিহ্বল হয়েছিলাম। বিশেষ করে মনে পড়ছে 'দি লেডি অফ সিম্বল্স্' নামে একটি কবিতা। আমার স্মরণশক্তি দুর্বল, 'এসেস্ ইন্ ভার্স' বইটিও কাছাকাছি নেই। সুতরাং ঐ কবিতাটি সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল মেটানো আমার পক্ষে উপস্থিত অসম্ভব। কিন্তু সাহেদ সুরাওয়ার্দির কবিতার স্বাদ থেকে পাঠকদের একেবারে বঞ্চিত করলে এই প্রসঙ্গের অঙ্গহানি ঘটবে, সুতরাং তাঁর দুটি কবিতা আমি উদ্ধার করছি—একটি মূলে ও একটি অনুবাদে। মূল কবিতাটি বিষ্ণু দে-র উক্ত সমালোচনায় গোটা ছাপা হয়েছিল ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায়। অনুবাদটি নীরেনের করা; এটি বেরিয়েছিল ১৩৩৯-এর বৈশাখ-সংখ্যায়। সুতরাং দুই ক্ষেত্রেই নির্বাচন আমার চাইতে অনেক পাকা হাতের।

নীরেনের অনুবাদঃ

জানি তুমি কবিবে না শোক
আমি যবে হইব বিগত,
তোমার কবরী হতে খসা
অযতন কুসুমের মতো।
তবু কোন ঝড়-ওঠা দিনে,
কোন এক দীপ-জ্বালা সাঁঝে,
ফুটি ফুটি ফুলটির প্রায়
চঞ্চলিব তব মর্ম মাঝে।
ম্লান হেসে মোরে মনে হবে,
হাত হতে বই যবে পড়ে,
দীপ-পানে বহিবে ঝুঁকিয়া,
চেয়ে রবে কোন দিগন্তরে।

এই কবিতাটির মামুলি রোমাণ্টিকতা একেবারে মূলগত, অনুবাদকের কলম শুধু তার অনুলিখন করেছে। কিন্তু বিষ্ণু দে-কর্তৃক উদ্ধৃত 'অ্যাট টেনিস' (At Tennis) কবিতাটি রোমাণ্টিক হলেও, ঠিক মামুলি ধরনে নয়।

Friend, the world smashes in my brain—
Gridon and plinths, limbs and stars!
In the sudden upheaval of unbidden centuries
The lands convulse with cataclysmal speed.
Flaming wide-nostrilled monsters plunge
Across the convex of the skies.
I stretch torn hands to reach your piteous hands;
I seek through tattered space your ample eyes.
But you,
Stranger to apocalyptic needs.
In the narrow orb of your accurate mind
Rotate from hour to hour
Dinner for two;
Tennis at four;
Odol and powder before going to friends;
Cautious caresses;
Honourable amends;
Lips pointed to the crimson of a wound
After sentimental flutters;—
Whatever happens one should go to sleep
Carefully drawing to the shutters..
Oh! Passion, lion-hearted, that ruled calamitous wilds,
Browses on will-laid lawns a weary sheep.

আধুনিকতার সাধনায় সাহেদ সুরাওয়ার্দির চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই বিষ্ণু দে তাঁর সমালোচনায় মন্তব্য করেছিলেনঃ "সাহেদ সুরাওয়ার্দি ইরানী-ইংরেজি শেষ ক্যাভালিঅর্। দ্বিতীয় চার্লস আজ মৃত, সপ্তমের নাতি অষ্টম এডোআর্ড আজ বনবাসে, যাযাবর ইরানীরা আজ অনেকেই ইউ, এস, এস, আরে প্রগতিশীল—তাই সুরাওয়ার্দির At Tennis-এ মনে হয়"—তারপর ঐ উদ্ধৃতি।

পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন কবিতাটির সম্পূর্ণ বিদেশী আবহাওয়া। এই আবহাওয়া বহন করে যে নাগরিক কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন 'পরিচয়'-গোষ্ঠীতে তাঁর প্রবেশ ছিল একদিন না একদিন অনিবার্য। অপূর্ব চন্দ বলতেন, সুধীন শাদা চামড়াকে আকর্ষণ করে চুম্বকের মতন। সাহেদ সুরাওয়ার্দির চামড়া যেমনই হোক, অন্তরে ছিলেন তিনি বিদেশী, ভারতবর্ষকে দেখতেন প্রায় বিদেশীর চোখেই। তখনকার কথা বলছি, এখন কি রকম জানি না। একদিন খুল্লতাত সার আবদুল্লা সুরাওয়ার্দির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সাহেদ সুরাওয়ার্দি আমাকে বলেছিলেন, "ইনি এখন একজন মাতব্বর পলিটিসিয়ান। দেশে ফিরে দেখি মুসলমান সম্প্রদায়ের যত ব্যাটা বদমায়েস সবাই হয়ে উঠেছে পলিটিসিয়ান।" কথাগুলি সাহেদ সুরাওয়ার্দি বলেছিলেন ইংরেজিতে, ঠিক ভাষা মনে নেই কিন্তু 'স্কাউন্ড্রেল' কথাটি যে তিনি ব্যবহার

করেছিলেন তা স্পষ্ট মনে পড়ে। সার আবদুল্লা এই শুনে হাসতে হাসতে আমাকে বাংলাতেই বললেন, "দেখলেন তো মশায়, ভাইপোর কাণ্ড।" সুরাওয়ার্দি পরিবারে বাংলার চলন ছিল অল্প, কিন্তু সাহেদ সুরাওয়ার্দির মুখে দু'একটি শব্দ ছাড়া বাংলা বুলি কখনও শুনিনি।

অক্সফোর্ডে সাহেদ সুরাওয়ার্দি ও অপূর্ব চন্দ ছিলেন সমসাময়িক, বোধ-হয় সাহেদ সুরাওয়ার্দি কিছু আগে সেখানে গিয়ে থাকবেন, কেননা অপূর্ব-বাবুর চেয়ে তিনি বয়সে বছর কয়েকের বড়। যতদূর মনে পড়ে অপূর্ববাবুই সাহেদ সুরাওয়ার্দিকে প্রথম 'পরিচয়'-এর আসরে নিয়ে আসেন। তারপর সুধীনের আকর্ষণে ও আড্ডার প্রলোভনে সাহেদ সুরাওয়ার্দি নিজে জমে গেলেন, আমাদের আড্ডাও জমালেন। অমনধারা আড্ডা-মাতানো গল্পে লোক আর দেখিনি—দু'জন বাদে। একজন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী; 'পরিচয়'-এর আড্ডায় তিনি কখনো আসেননি, 'পরিচয়'-এ তাঁর কোনো লেখাও ছাপা হয়নি। আর একটি আমাদের ঘরের লোক—ধূর্জটি মুখার্জি। অবশ্য ধূর্জটিবাবু একটু অনিশ্চিত, প্রায় শিশুসুলভ, মেজাজের লোক— তাঁর লেখা থেকেই তা যথেষ্ট মালুম হয়। কিন্তু মেজাজে থাকলে যেমন জমে এঁর রচনা, তেমনি এঁর মুখের বচন। নানা ঘাটের জল খেয়ে, নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সাহেদ সুরাওয়ার্দি দেশে ফিরেছিলেন হাড়ে ঘুন ধরিয়ে ও পাকাপোক্ত চরিত্র নিয়ে; এই চরিত্রে মেজাজের আমেজ কিছুই ছিল না। একটু বিচ্ছিন্ন কৌতুকের, প্রায় অবজ্ঞার সঙ্গেই, সাহেদ সুরাওয়ার্দি সবকিছু দেখতেন, অবশ্য আমাদেরও, আর দেখাশোনার বৃত্তান্ত আমাদের শোনাতেন—আবার বিষ্ণুর ভাষা ধার করছি —নাগরিকোচিত বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে।

কালের স্রোতে ভেসে গেছে সাহেদ সুরাওয়ার্দির সে-সব বিদগ্ধ বচন, কিন্তু 'পরিচয়'-এর পাতায় তাঁর তিনটি রচনা এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর প্রশস্ত সংস্কৃতির: একটি প্রবন্ধ ও দুটি সমালোচনা। তিনটিই ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে 'পরিচয়'-এ ছাপা হয়েছিল, কিন্তু অন্য পত্রিকা থেকে নয়; রচনাগুলি লেখা হয়েছিল 'পরিচয়'-সম্পাদকের বরাতে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায় 'আধুনিক নাট্যপ্রসঙ্গ' নামে। এতে পরিচয় পাওয়া যায় নাট্যকলা সম্বন্ধে লেখকের ব্যাপক জ্ঞানের। সমালোচনা দুটিই বেরিয়েছিল ঐ বছরেরই কার্তিক অর্থাৎ পরবর্তী সংখ্যায়। একটি চার্লস মর্গান-এর উপন্যাস 'ফাউনটেন'-এর (বইটি তখন খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে-ছিল), আর একটি হুমায়ুন কবিরের সদ্যপ্রকাশিত 'পোয়েম্‌স'-এর। এই দ্বিতীয় সমালোচনাটির দুটি অংশ উদ্ধার করে সুরাওয়ার্দি-প্রসঙ্গ শেষ করা যাক:

> "কাব্যগ্রন্থে ভূমিকা আমাব কোনদিনই পছন্দ হয় না; আর যে-মুখবন্ধ দিয়া হুমায়ুন কবিব মহাশয় তাঁহাব ক্ষীণকায কবিতা-পুস্তক আরম্ভ কবিযাছেন তাহার মতো বিরক্তিকর ভূমিকা আমি খুব কমই পড়িয়াছি। তাহাতে এই সংবাদটি দেওয়া আছে যে পুস্তকস্থ প্রায সবগুলি কবিতাই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে অনুবন্ধ কবা হইয়াছে। মনে হয এ-তথ্যটি নিতান্ত বাহুল্য। যে-পাঠকের বিন্দুমাত্র রসবোধ আছে তিনি ইহার কয়েকটি কবিতা পড়িয়াই কাঁচা ও চঞ্চল হাতের পবিচয় পাইবেন।"

এর পর—

"কবির মহাশয়ের গ্রন্থ দুটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের অবতারণা করে। ভারতীয়ের পক্ষে ইংরাজিতে কবিতা লেখা উচিত কি? এ প্রশ্নের বিচার করা এখানে অসম্ভব। এটুকু আমরা জানি আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয়ের ইংরাজি কবিতা মাতৃভাষায় লিখিত কবিতার স্থায়িত্ব বা উৎকর্ষ লাভ করে নাই। শুধুই Difference in atmosphere, tradition and background—যাহার উল্লেখ কবির মহাশয় করিয়াছেন—ইহার সম্পূর্ণ কারণ নয়। বোধহয়, আমাদের মেজাজ ইংরাজি ভাষায় ভাবপ্রকাশের অনুপযুক্ত। ইংরাজি ভাষার প্রকৃতিই আমাদের উচ্ছ্বাসপ্রিয়তার বিরোধী।

"অপর প্রশ্নটি এই, অনুবাদে মূলের গুণবৃদ্ধি হয় কিনা। কবির মহাশয়ের ক্ষেত্রে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত কবিতার লক্ষণই এই 'যে তাহা অননুবাদ্য'। ....কাব্যে ভাব ও ভাবচ্ছদ ভাষার সংযোগ এমনই প্রাণময় যে এক হইতে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। কবির মহাশয় এ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিলে ভালো করিবেন। ইহা নিঃসন্দেহ তাঁহার রচনায় সাফল্যের আভাস আছে। আর আছে বাংলা ও ইংরাজি দু'ভাষাতেই দক্ষ পরিচালন-শক্তির পরিচয়। কিন্তু যতদিন না তিনি স্বকীয়তর প্রতীকাবলী রচনারীতি অর্জন করিতে পারেন, ততদিন তাঁহার কিছু না লেখাই ভালো।"



একশো চারজন

সমরেশ বসু

শীতের ভোরবেলা। রাত্রি যাই যাই করেও যেতে চায় না। ঘড়িতে কাঁটা ঘুরল ছ'টার ঘরে, ঘণ্টায় শব্দ উঠল ঢং ঢং, লাস্ট-বাঁশি বেজে উঠল গোঁ গোঁ করে, ভলকে ভলকে কালো ধোঁয়া তার সীমাহীন নিশান উড়িয়ে দিল দক্ষিণে, কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে, ঘরে ঘরে মেশিনগুলো যেন চকিতে জাদুতে জেগে ওঠা ঘাপটি মারা দানবটার মতো হেসে উঠল হা হা রবে, হাজারো ধারালো চোখ ও দাঁতের মতো ঝকমকিয়ে উঠল অস্থির তৈলাক্ত সিলিণ্ডার পিস্টনের মসৃণ গা, উপগ্রহের মতো বন্‌বন্‌ করে ঘুরে উঠল লেদ্‌ ডায়ামেটার। নাকের ডগায় নেমে এল হাজিরাবাবুর চশমা। তবুও রাত্রি যায় না।

এখনো লোক আসছে অন্ধকারের আবছায়ায়, ছুটে ছুটে, পায়ে পায়ে, বস্তি থেকে, লাইন থেকে, পুবের গাঁ থেকে, পশ্চিমে গঙ্গার বুকে খেয়া নৌকোয় চেপে। পথে গলিতে কারখানা-পাঁচিলের ধারে মানুষের ভিড়। যেন আবছায়াতে একদল অস্থির প্রেত। না, প্রেত নয়, মানুষ নয়, এরা স্পিনার, তাঁতী, পিনবয়, মিস্তিরি, নলিসওয়ার। এরা যন্ত্রের যন্ত্র কিংবা যন্ত্র যন্ত্রের।

অন্ধকার কাটছে না, তবু দিন এসে গিয়েছে। গত দিনের আবর্জনায় ভরা রাস্তা ও কারখানা, ঘর ও নর্দমা, কুয়াশা ও অন্ধকারে ঢাকা গঙ্গার জল। তবু শুরু হয়েছে দিনের কাজ।

হাওয়া আসছে উত্তর দিক থেকে। যেন ঢাকা দেওয়া পৃথিবীটার কোন-খানের ফুটো দিয়ে হাওয়া চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে। অদৃশ্যে, নিঃসাড়ে ধেয়ে আসা রাক্ষুসীর মায়া-ছুঁচের মতো সে হাওয়ার মার।

কাজ শুরু হয়েছে, ডিপার্টে ডিপার্টে, মেশিনে মেশিনে। যে যার মেশিনে এসে ঝুঁকে পড়ছে, মেশিনের মতোই তাদেরও হাতগুলো আরম্ভ করেছে চলতে। সারিবদ্ধ মেশিনের লাইন। বিরাটকায় চাকার সঙ্গে যুক্ত চওড়া শ্যাফ্‌ট ঘুরছে দুরন্ত বেগে, উপর থেকে নিচে। অয়লার ঘুরছে মেশিনের ফাঁকে ফাঁকে। ঝাড়ু দিচ্ছে ঝাড়ুদারনিরা যে যার নিজের ভাগে।

চকিতে তাকালে মানুষ চোখে পড়ে না, শুধু যন্ত্র। মানুষের গলার স্বর শোনা যায় না, এক একটা ডিপার্টের এক এক শ্রেণীর মেশিনের নানান শব্দের ঐকতানে সবই শেষ পর্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ ঝমর্‌ ঝম্‌ শব্দে মাথার শেড্‌ থেকে মেঝে পর্যন্ত প্রকম্পিত।

সবাই আসছে আর জোয়ালের সঙ্গে বলদ জোতার মতো জড়িয়ে পড়ছে যন্ত্রের সঙ্গে। কেবল একটা জায়গায় এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ছে সবাই। অভ্যাসবশত ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে উদ্যত হাতে, ঝুঁকে, গোল গোল চোখে, হতভম্বের মতো। যেন কেউ জ্যান্ত মানুষের মুখের ঢাকনা খুলে মৃতের কঙ্কাল দেখে থম্‌কে গিয়েছে ভয়ে বিস্ময়ে। মেশিনে হাত দিতে গিয়ে চমকে উঠছে সবাই। কে কি ভাবতে ভাবতে আসছিল, কী বলছিল কে,

সমস্তটা ছাড়িয়ে একটা দুঃসহ নিঃশব্দ প্রশ্নে সকলে অস্থির হয়ে উঠল, একি একি একি!

যেখানটায় এসে লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ছে, কালকের বিকেল অবধি সেখানটা ডিপার্টের মধ্যে ছিল। আজ যেন এ কারখানার অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে নিঃশব্দ। সব আলো কটাও জ্বলেনি, তাই অন্ধকার। এ যেন তারা কোথায় এসে পড়েছে। অজানা এক অপরিচিত পরিবেশে।

তারা একে একে পরস্পরের দিকে তাকাল। একজন দু'জন করে বিশজন, তারপরে চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশো। একশোটা বুড়ো আর ছোকরা পুরুষ, আর চারটে মেয়েমানুষ পরস্পরের দিকে তাকাল অবাক ভীত চোখে। কিন্তু কোনো চোখে জবাব নেই। একশো চারজন মেয়ে-পুরুষের যেন একটাই মুখ, দুশো আটটা চোখ যেন একজনেরই দুটো চোখ। একই ভাবনা, একই প্রশ্ন। একটা অসহ্য জিজ্ঞাসা, একি একি!

আবার তারা সবাই একসঙ্গে সেই জায়গাটার দিকে ফিরে তাকাল। অমনি তাদের বুকের মধ্যে দম আটকে এল। চোখগুলো তাদের আরও বড়, আরও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় একটা চিৎকার করতে পর্যন্ত তারা ভুলে গেল।

তারা দেখল, ঝড়ের পরদিন যেমন গাছপালা ভাঙা তছনছে বাড়িটাকে চেনা যায় না, তেমনি কয়েকটা লাইন জুড়ে তাদের স্পিনিং মেশিন খোলা ছড়া ছত্রাকার হয়ে আছে। দেখল, যন্ত্রস্তরের মুখে মুখে আঁটা নাট-বল্টুগুলো পড়ে আছে এদিকে সেদিকে। নলিগুলো অদৃশ্য হয়েছে। যেন ভূমিকম্পের ধাক্কায় মেশিনগুলো হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে। কোনোটা আধখানা দাঁড়িয়ে আছে, কোনোটা পড়েছে কাত্ হয়ে। শ্যাফট্ খোলা গোল লম্বা লেদ্ পঙ্গু মেশিনগুলোর উপরে পড়ে আছে যেন পেটমোটা ক্লান্ত ময়াল সাপটার মতো। আর এ ঝড় হয়েছে অঙ্কের মাপজোক কষে, তাদের এক শো চারজনের লাইন ঘিরে। তাদের গতকালের চালু মেশিনগুলো রাতারাতি যেন তার সমস্ত জেল্লা ও জান হারিয়ে পড়ে আছে জঙ্ ধরা ধরা, মড়ার মতো।

আর আলোগুলো সব জ্বলেনি। আধা অন্ধকারে এ জায়গাটা যেন একটা খোলা ছড়া নরক, গায়ে গায়ে জড়ানো মানুষের দলটা যেন নরকাধিপতির ভীত শিকার।

আশেপাশে যেসব মেশিনগুলোতে কাজ চলছে সেখানেও একটা ভয় ও উৎকণ্ঠার ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের হাতের কাজ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে এদিকে তাকাতে গিয়ে। তাদেরও চোখে একটা অসহ্য জিজ্ঞাসা, একি একি।

কে একজন বলে উঠল, 'কাজ নেই।' কথাটা যেন সকলের বোধগম্য হল না। আর একজন বলে উঠল, 'কাজ লুটে নিয়েছে।'

কাজ লুটে নিয়েছে। যেন জান লুটে নিয়েছে। মেশিনগুলো তাই খুলে ছড়িয়ে দিয়েছে। যেন তাদেরই শরীরগুলো টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

কিন্তু কেন? একটা বুড়ো স্পিনার হাতের কড় গুনতে আরম্ভ করেছে। তারও হাতের চেটোয় আর সব স্পিনারের মতো কড়া পড়ে পড়ে একটা কালো মাংসের ড্যালা ফুলে উঠেছে। হাতে আর পায়ের বুড়ো আঙুলের ফাঁকে

এমনি কড়া আর কালো দাগ তাদের স্পিনার জীবনের ছাপ। পলকে হাজার-বার ঘুরন্ত রডে যখন নলিগুলোর খালি পেট সুতোয় ভরে ওঠে, তখন সেই রডের নিচে উপরে পায়ের বুড়ো আঙুলের ফাঁকে আর হাতের চেটোর চাপে পাক থামিয়ে নলিগুলো তাদের খুলে নিতে হয়। বুড়ো কড় গুনে বলে উঠল, 'কাজ কেন নেই?'

এই লোকগুলোকেই সে তার ঝোলা গোঁফে ঝাড়া দিয়ে যেন ধমকে উঠল, 'জানতে চাই আমি। বিশ দুই সাল ভরে কি আমি শালা মেশিনের সঙ্গে রেণ্ডির ঘর করেছি?'

অর্থাৎ বাইশ বছর ধরে তার নোকরি। তার চেয়েও বুড়ি একটা বলে উঠল, 'আরে তুই তো কোন্ ছার। তোর বচপন্ থেকে শুরু আমার কাজ। সে কাজটা কোথা?'

ওইখানে দাঁড়িয়েই গুল্তানি শুরু করল তারা, কার সল্তানি নোকরি, একদম পারমিনেট। কার ষোল বছর, বিশ বছর, দশ বছর বা দু' বছর। কারুর বা বছরের পর বছর শুধু বদলি চলেছে। কিন্তু এরকমভাবে মেশিন খুলে ফেলে রেখে কাজ বন্ধ করে দেওয়া তারা কোনোদিন দেখেনি।

ক্রমে গুল্তানিটা বাড়তে বাড়তে আবার থেমে এল। হতভম্বতা কেটে গিয়ে একটা বোবা অস্থিরতা পেয়ে বসল তাদের। কাজ বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ কি, যেন সেটা এখনো হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেনি।

কে একজন বলে উঠল, 'তবে আমরা কি করব?'

কি করবে তারা? সকলেই আশেপাশে চারদিকে তাকাতে লাগল। ভাবল, কেউ তাদের কিছু বলতে আসবে। শোনাবে একটা কিছু।

কিন্তু কেউ-ই আসছে না। যেন তারা কারখানার কেউ নয়। একদল ফাল্তু লোক এখানে এসে না হক্ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের লাইন ক'টা ছাড়া আর সবখানে মেশিন ঝম্ ঝম্ করে চলছে, সেখানে রোজকার ব্যস্ততা একই রকম। এমনকি, ফাঁকিবাজদের সর্দাররা এসে ঘাড় ধরে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। আর তারা এতগুলো লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, সর্দারের তাড়া, শাসানি কিছুই নেই। কারখানার মনে কারখানা চলেছে আর তারা যেন একদিনে পর হয়ে গিয়েছে। তবে তাদের হাজিরা নিল কেন?

গুঁপো বুড়ো যেন অনেক ভেবে চিন্তে বলল, 'ব্যাপারটা তো আমার ভালো মনে হচ্ছে না।'

অমনি কয়েকজন পরপর বলে উঠল, 'আমারও না।'

'চল তো সর্দারের কাছে।' বলে বুড়ো আগে আগে আর তার পিছে পিছে সব চলল।

একটা নলিখোলা ছোকরা বলল, 'সয়েদ, মিশিনসব সাফাটাফা করবে বলে খুলে ফেলেছে।'

জবাব দিল একজন নলিসওয়ার, 'তার লুটিশটা কে দেবে? আমাকে জরুর বলতে হবে সে কথা।'

অর্থাৎ সবাইকে নয়, তাকেই বলতে হবে কথাটা, কেন মেশিন বন্ধ থাকবে।

ডিপার্টের অন্যান্য লোকগুলো এ দলটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

আর এ দলটার তাতে ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছে। ইচ্ছেটা, তারা নিজেরাই একটা কিছু মনগড়া জবাব এদের দিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুই তাদের মাথায় আসছে না। যেটা চট্ করে মনে হচ্ছে, সেটা একটা ভয়াবহ সর্বনাশের কথা। সেকথাটা তারা মুখ দিয়ে একবারও উচ্চারণ করতে পারছে না।

ডিপার্টের বাবুর টেবিলের কাছে এসে তারা সর্দারের দেখা পেল। সর্দার ভোরবেলা আস্নান করে, কপালে গঙ্গামাটির ফোঁটা দিয়ে একেবারে ফিটফাট হয়ে এসেছে। তার আঁচড়ানো গোঁফ, আর তেল চকচকে শরীর ও কামিজের উপর, হাতকাটা জবাহির কোট, তাকে আজকালকার সর্দারের মতোই মানিয়েছে।

সর্দার ভ্রূ কুঁচকে, অবাক হয়ে বাসি মুখ, পিচুটিভরা চোখ, উসকো খুসকো চেহারার লোকগুলোর দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

সেই গুঁপো বুড়ো স্পিনারই প্রথমে বলল, 'সেলাম হো সর্দার।'

বুড়ো আদবকায়দা জানে, ধর্ম মানে। সেজন্য সে-ই আগে বলল, 'সর্দার, তুমি জানো, আমার বিশ দুই সাল নোকরি কিনা?'

সর্দার বলল, 'জরুর।'

অমনি সেই বুড়ি বলল, 'আমার তার চেয়েও আগে কিনা, তুমিই বাতাও সর্দার।'

শুনলে মনে হয়, এই বচসার ফয়সালার জন্যই তারা এসেছে। এবং প্রায় সকলেই তাদের নোকরির ফিরিস্তি দিতে শুরু করল।

সর্দার বলল, 'মগর হুয়া ক্যায়া?'

দলটার সবাই অবাক হয়ে সর্দারের দিকে তাকাল। তাজ্জব! সর্দারই জানে না ঘটনাটা। বুড়ো স্পিনার বলল, 'আমাদের মিশিনটিশিন সব খুলে ফেলে দিয়েছে। আমরা কাজ করব কোথায়?'

সর্দার তো আরও অবাক। বলল, 'হাঁ? আরে রাম রাম। এ তো আমার মালুম নেই। যাও, জল্দি লাইন সাহাবকে পুছো।'

বোঝো একবার ব্যাপারটা! সর্দারই জানে না। একমুহূর্ত লোকগুলো যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একশোটা পুরুষ আর চারটে মেয়েমানুষ। জোয়ান বুড়ো আর বুড়ি ছুকরি। চলল তারা লাইন সাহাবের কাছে। কেবল জোয়ান গিরিধারী বলল, 'ভগবানও জানে না, কি হয়েছে।'

অন্যান্যদিন এতক্ষণ কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের কত গল্পগুজব ফষ্টিনষ্টি হয়ে থাকে। হাসি ও ঘরোয়া কথা, সুখ দুঃখের ফিরিস্তি। আর আজকে একবারও নলিখোলা ছোকরা অল্পু বুড়িকে ঠাট্টা করে নানী বলে ডাকেনি। বুড়িকে নানী বললে, বুড়ি ভারী চটে যায়। তাকে বলতে হবে ভউজী, নয় তো বহেন। অর্থাৎ বুড়ি দিদিমা হতে তার ঘোরতর আপত্তি। গানে গানে যে কথার জবাব দেয়, সেই স্পিনার মুন্নার এক কলি গানও আজ শোনা যায়নি। বিধবা রামদেইয়া এতক্ষণে কতবার পালিয়ে পালিয়ে বাইরে গিয়ে হয়তো তার বাচ্চাদের মাই খাইয়ে আসত। কোলে তার দুটো যমজ আর তাছাড়া তিনটে বাচ্চা। আর ভগবান জানে, তার বুকে এত দুধ কোত্থেকে

আসে। মিনিটে মিনিটে তার বুক ভার হয়ে টন্‌টন্‌ করে ওঠে, আর ডিপার্টের বাইরে চুরি করে ছুটে ছুটে গিয়ে সে তাদের মাই খাইয়ে আসে। সেইজন্য কেউ কেউ তাকে ঠাট্টা করে বলে, মাগী দ্বাপরযুগের কেষ্টঠাকুরের গাই।

কিন্তু আজ হয়তো এতক্ষণে তার বুকের বুধ আপনি ঝরে কাপড় ভিজছে, মুন্নার গলায় হয়তো সুর আটকে আছে, অল্গুও চলেছে বুড়ি নানীরই পাশে পাশে, তবু সেসব তাদের একবারও মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না, চা খাওয়া ও পিসাব ফেরার ছুটির কথা, খৈনি আর বিড়ির নেশা। কে সাদী করবে, মুল্লুক যাবে, কার বাচ্চা হবে, কার বাড়িয়ালা ঝগড়া করেছে আর কাবুলীর দেনা রয়েছে, সেসব যেন কবেকার কথা। এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে তাদের ঘুম ভেঙেছে।

ইতিমধ্যে রোদ উঠে পড়েছে বাইরে। রাত্রি যেতেও যেমন দেরি, দিন একবার এলে আর তর্‌ সয় না। এর মধ্যেই ডিপার্টের বড় বড় জানালায় আর জাফরিতে রাঙা রোদ এসে পড়েছে যেন দূর আকাশ থেকে ব্যাটারির আলো ফেলেছে। সেই আলোয় ডিপার্টের ধুলো আর পাটের ফেঁসো উড়ছে গুঁড়ো মেটে সিঁদুরের মতো। যেসব মেশিনগুলোর গায়ে এসে পড়েছে, সেখানে একটা লাল্‌চে আভায় ঝকমকিয়ে উঠছে আর যাদের মুখে এসে পড়ছে তাদের মুখগুলো দেখাচ্ছে সুরকির ধুলো মাখা, মাথাগুলো পাঁশুটে তুলোভরা।

আর আজকে ছুটির দিন নয়, পরব নয়, হরতাল নয়, একদল কাজের মানুষ এখনো ঝাড়া হাত পা হয়ে ডিপার্টে ঘুরে মরছে। এ শালা কোথাকার মাম্‌দোবাজী! বুড়ো স্পিনার আপন মনেই খেঁকিয়ে উঠল, 'শালা কোম্পানির কি মাথা খারাব্‌ হয়ে গেল?'

গিরিধারী বলল, 'মাথা খারাব নয় চাচা, আমাদের শালা সঙ্‌ বানিয়েছে।'

'তবে আর কি, নাচতে শুরু করি।' ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল নলি-সওয়ার ভাগন।

কিন্তু শুধু নাচ নয়, হাসলও না কেউ। এমনকি, একটা খিস্তিও নয়। তারা এগিয়ে চলল দুধারের মেশিনের মাঝখান দিয়ে, তেলের দাগভরা, ট্রলির লাইন পাতা মেঝের উপর দিয়ে। গায়ে গায়ে, একগাদা পুতুলের মতো।

এসে দেখল লাইনসাহাব টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে হুস্‌ হুস্‌ করে পাইপ্‌ টানছে। শীত পড়ে লোকটার নাকের ডগাটা হয়েছে লাল টুকটুকে। চেহারাটা যেন চৌকো কাঠের ফ্রেমগুলো স্ক্রু এঁটে দিয়েছে। চোখের পাতা নেই আর মণিদুটো ঘষা ঘষা।

এতগুলো লোককে আসতে দেখেও যেন দেখতে পেল না লাইন সাহেব। ভাবলেশহীন মুখে পাইপ্‌ টানতে লাগল সে। তারপরে হঠাৎ ভারী অবাক হয়ে সকলের দিকে তাকাল। সকলেই একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে ঘিরে। মেশিনের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দের জন্য কিছু শোনা যাবে না ভেবে সাহেব ইশারায় জিজ্ঞেস করল হাত নেড়ে।

বুড়ো স্পিনার ঝুঁকে সেলাম করল। আরও কয়েকজন করল সেলাম। বুড়ো সাহেবের টেবিলের কাছে যেতে সাহেব কানটা বাড়িয়ে দিল।

বুড়ো আবার বলল, 'সেলাম হুজুর! আমার নাম ফাগু, ফাগুয়া স্পিনার।'

সাহেব বলল, 'হাঁ হাঁ, বহুত্ আচ্ছা!'

বুড়ি ফাগুর গুঁপো ঠোঁট নড়া দেখেই বুঝল সে কি বলছে। অমনি সেও এগিয়ে এসে বলল, 'আমার নাম হিম্মতবালা, এক বিশ আট সাল আমার নোকরি, হাঁ।'

এতে ফাগু প্রায় বিগ্ড়ে গেল। সে চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল বুড়িকে, 'চুপ রহো।'

বুড়িও পাল্টা চটে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই গিরিধারী চেঁচিয়ে উঠল, 'লে বাবা, এরা দেখ্ছি আপোসে ঝগড়ায় ফাঁসছে। সাহাবকে আসল বাতটা পুছো না।'

ফাগু অত্যন্ত রুষ্টচোখে একবার গিরিধারীকে দেখে সাহেবকে বলল, '[illegible]জুর, তিনসুতিয়া ইস্পিনিং মিশিন সব খুলে ঢেলে দিয়েছে। আমা-[illegible] কাম বেকার রয়েছে।'

[illegible]ক হল সর্দারের চেয়েও কয়েক কাঠি বেশি। হাত মুখ নেড়ে [illegible]'হাঁ? ড্যামন্ গুড! হম্কো মালোম নহি। ম্যানেজার [illegible]।'

[illegible]টে মানুষ সাহেবের হাত মুখ নাড়া দেখেই কথাটা বুঝল। [illegible]করে[illegible] তারা একেবারে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে। [illegible]বলে কি! [illegible]ইন সাহেবও ব্যাপারটা জানে না।

ছায়ার মতো উৎকণ্ঠাটা এবার যেন সাপের কায়ার মতো তাদের বাঁধতে উদ্যত হল। হঠাৎ একসঙ্গেই তাদের গলা দিয়ে কথা বেরিয়ে এল যেন। বিস্মিত উৎকণ্ঠিত স্বরের কতকগুলো দুর্বোধ্য কথার মতো পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করতে লাগল তারা। যন্ত্রের নিখুঁত তাল ও তানের মধ্যে তাদের মিলিত গলার কথাগুলো যেন দূরাগত একটা স্তিমিত সুরের মতো মনে হয়।

আশ্চর্য! সর্দার আর লাইন সাহেব কি কোম্পানির নোকর নয় যে, এ খবরটা পর্যন্ত এরা রাখে না। না কি কোম্পানির মা বাপ নেই।

অবিশ্বাসী ভাগন আর সহ্য করতে পারল না। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তবে মিশিনগুলো খুলে দিয়েছে কোন্ ভূতের বাচ্চা, বাতাও আমাকে।'

একটা দল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'হাঁ, বাতাও!'

লাইন সাহেবের ঘষা চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য লাল হয়ে উঠল আর শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল দুটো। বলল, 'নেই মালোম। ম্যানেজারকো পুছো।'

বুড়ো ফাগু বিরক্তমুখে তাড়াতাড়ি হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিল। বেশি হাঁক ডাক সে পছন্দ করে না। সে ভাগনকে ধমকে উঠল, 'এরকম হল্লা করবে তো আমি তোমাদের মধ্যে নেই।'

ভাগনও তীব্র গলায় বলে দিল, 'নেই তো কেটে পড়। ওসব ভালমান্ষি আমার নেই।'

এই নিয়ে ওইখানেই তাদের সকলের মধ্যে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গেল। কেবল বুড়ি নানী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। মেশিনগুলো

ভূতে খুলে দেওয়ার কথাটা শুনে সে একটু ভড়কে গিয়েছে। জীবনে সে একবার রাত্রে খালি ডিপার্টের মধ্যে ঢুকেছিল এবং সত্যি নাকি ভূতকে টের পেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, ওই বিরাট কারখানা শেডের মধ্যে নির্বাক অসাড় কিম্ভূতাকৃতি যন্ত্রগুলো ঘাপটিমারা জীববিশেষ। কাছে গেলেই হাত বাড়িয়ে ধরবে। উপরের দিকে তাকাতে তো বুক কেঁপে উঠেছিল তার। আশ্চর্য, তাদের দিনের ডিপার্ট রাত্রের নিঝুমতায় ও স্বল্প আলোয় এত ভীষণ শ্বাসরোধী হয়ে ওঠে তা সে জানত না। কোনোরকমে সেবার সে শুধু ছায়া দেখে আর নিজের গলার প্রতিধ্বনি শুনেই পালিয়েছিল। এখন ভূতের কথাটা শুনে সে অল্গু ছোকরাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'একবার দেখে আয় তো, মিশিনগুলো তেমনি পড়ে আছে কিনা।'

'কেন নানী?'

নানী কথাটা কানে যেতে একটু বিরক্ত হলেও সে কিছু বলল না। অল্গুকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, 'তুই দেখে আয় না গে ছোঁড়া। যদি ভুল দেখে থাকি।'

অল্গু বিস্মিত হল কিন্তু নানীর মনের কথাটা বুঝতে পারল না। সে চলে গেল দেখতে।

ততক্ষণে গিরিধারী আবার সবাইকে থামিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। এবার তাদের গতিটা আরও দ্রুত হয়েছে। কথাবার্তার গোলমালটা আগের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে অনেক। বিশ্বাস, অবিশ্বাস, এন্‌তাম ও সন্দেহে, সর্দার ও লাইন সাহেবের কথার অবিকল পুনরুক্তিতে সবাই সবাইকে কিছু না কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে।

কেবল চুপ করে আছে কিছু জোয়ানের দল। তারা অনেকটা নিঃসন্দেহ, দৃঢ়, চিন্তিত। তাদের মুখগুলো রাগে যেন থম্‌থম্‌ করছে। তারা হঠাৎ দু' একটা কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, আবার চুপ করে যাচ্ছে।

কথা বলছে না রামদেই। কোমরে তার শাড়ি বাঁধা আর খোলা জামাটার ফাঁক দিয়ে তার ফাটা ফাটা দাগ ভরা মস্ত বড় বড় স্তন দুটো ঝুলে পড়েছে। আঁকাবাঁকা শিরগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। এমনিতেই সে একটু আলু-থালু, রাখঢাকহীন। অবাক দুটো চোখ, আর জটবাঁধা চুলের গোছায় একটা বোকা পাগলী যেন। কতদিন বুড়ি হিম্মতবালা বলেছে, 'হারামজাদী ছিনাটা ঢেকে রাখ।' কিন্তু সে কতক্ষণ। অত গোছগাছ তার হয় না।

আর এখন সেসব তো তার মনেই পড়ছে না। এমন কি শীতও করছে না। একটু অনুভব করছে না বুকের টনটনানি। সেই কোন্‌ ভোররাতে ছেলেদুটো মাই খেয়েছে। আর এখন কত বেলা। কিন্তু মিশিনগুলো খোলা কেন? বিধবা রামদেইয়ার পাঁচটা ছেলেমেয়ে, না-বুঝ, বাচ্চা। মিশিন কেন বন্ধ।

মিশিন বন্ধ। কাজ নেই। কাজের হাতগুলো নিস্‌পিস্‌ করছে, কি যেন ঝমর ঝম্‌ করে চল্‌ছে বুকের মধ্যে ওই মেশিনের মতো। মেশিনের চেয়ে দ্রুত, বেতাল, অস্থির।

ফাগু সবাইকে বোঝাচ্ছে, আদবকায়দার মানে কি। বোঝাচ্ছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়। কিন্তু বারবারই গোঁফ মুচড়ে বলছে, 'লেকিন, আমার মনটা তো ভাল গাইছে না।'

তারা সবাই ডিপার্টের বাইরে এসে পড়ল। যন্ত্রের শব্দ তাদের পিছনে অনেকটা চাপা পড়ে গেল।

বাইরে খোলা আকাশ। কাঁচা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে কারখানার উঠোনে, অফিসবাড়ির বারান্দায়। ট্রলির লাইনের উপর দিয়ে কয়লা বোঝাই করে নিয়ে চলেছে কুলিরা। বোঝাই করে নিয়ে চলেছে পাটের গাঁট। গুদামের কুলিরা পিঠে আর মাথায় বোঝাই করে বের করছে পাট, কামিনেরা খুলে খুলে দিচ্ছে গাঁটের বাঁধন। খাতা-পেন্সিল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন বাবুরা। ওদিকে হাসপাতালের কাছে বড় বড় বোতল নিয়ে কিংবা দু' একজন ব্যাণ্ডেজবাঁধা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আর এতগুলো লোক এখন ডিপার্টের বাইরে। বাইরের লোকগুলোও তাদের দিকে কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কোনো গোলমালের কথা তো তারা কিছুই শোনেনি। আজ কি হল্লা হওয়ার কথা ছিল? অর্থাৎ ঘেরাও, মারামারি বা হরতাল। কিন্তু কোম্পানি তো এখনো সেরকম কিছু বলেনি বা করেনি।

কারখানার বাইরের কাজ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল।

অল্গু এসে হিম্মতবালাকে খবর দিল, মিশিনগুলো তেমনি পড়ে আছে, কোথাও একটু নড়চড় হয়নি।

মনোহর কাকে বলল চিৎকার করে, 'তিনসুতিয়া ইম্পিনিং মিশিন সব চৌপাট করে দিয়েছে।'

গিরিধারীই বলে ফেলল, 'শালারা খেলা করছে আমাদের সঙ্গে। কেউ কিছু জানে না।'

বাইরের লোকগুলো অবাক হয়ে মাথা নাড়ল।

একটা চিল গলার চিৎকার ভেসে এল, 'মা! মা!'...

কয়েকজন তাকিয়ে দেখল, প্রস্রাবখানার পাঁচিলের আড়ালে রামদেইয়ার দুটো ন্যাংটো মেয়ে যমজ বাচ্চা দুটোকে কোলে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারখানার ভিতরে স্তনপান করানো আইনত নিষিদ্ধ। সাহেবের চোখে পড়তে পারে, তাই ওইখানে রোজ সে লুকিয়ে খাইয়ে আসে।

রামদেই দেখল, তার কালো কালো বাচ্চা দুটো, গোল গোল চোখে তাকিয়ে মেটে রঙের ঠোঁটগুলো চুষছে। ছটফট করছে কোলের মধ্যে। পাঁচ মাসের বাচ্চা, নিশ্চয়ই অতদূর থেকে মাকে দেখতে পাচ্ছে না। রামদেই আনমনে বুক চুলকোতে লাগল আর সত্যি ভিজে উঠল তার হাতদুটো। কিন্তু মিশিন কেন বন্ধ, সেটাই মানিজারের কাছে জানতে চলেছে সে। পিচুটিভরা চোখদুটো ফিরিয়ে নিল সে।

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল বালবাচ্চাহীন হাসিখুসি টুনটুনিয়ার বুকের মধ্যে। সবাই জানে, সে খুব খারাপ মেয়েমানুষ। কোনো মরদের সঙ্গে তার বনে না। আসলে সে নাকি ছেনাল। বলবেই তো। এমন

মুরোদ একটা মরদের নেই যে, টুনটুনিয়ার পেটে বাচ্চা পয়দা করে। তারও তো সবই আছে ওই রামদেইয়ার মতো। তবে? তাই রামদেইকে সে ঘৃণা করে। সবাই জানে, বালবাচ্চা দেখলে তার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে।

তবু, ওই কালো ফোলা ফোলা গাল, ছুঁচোর মতো কুঁচকানো মেটে মেটে ঠোঁটের কষে লাল, ছোট ছোট মুঠিগুলো দেখে কিরকম একটা যন্ত্রণায় মোচড়াতে লাগল তার বুক। মনে পড়ল, এ সংসারে তার কেউ নেই। নিজের জীবনের আগুনে সে পোড়া পোড়া হয়েছে, আর মিশিন বন্ধের মতলবটা তাকে কোথায় যে শেষ পর্যন্ত ঠেলে দেবে। রামদেইয়ের তবু পাঁচ পাঁচটা বাচ্চা আছে।

অফিসের বারান্দার সামনে এসে দলটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা সবাই আরও অস্থির হয়ে উঠেছে। নিজেদের ভাগ্য ও কোম্পানির অর্থহীন মতলবকে অনেক রকমের সমালোচনা করছে।

শেষটায় গুঁতোগুঁতি করে জোয়ানের দল হুড়মুড় করে বারান্দায় উঠে পড়ল। ব্যাপারটা দেখে ফাগু তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে বলল, 'থাম সব, আমি বলছি।'

কিন্তু কাকে বলবে। মানিজার কোথায়। একজন বাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই।'

'মানিজার সাহাবকে।'

একটু পরেই এলেন মানিজার। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। লাল কোঁকড়ানো চুল, টানাটানা দুটো চোখে ও দাঁড়াবার ভঙ্গিতে লোকটিকে অমায়িক ও দয়ালু মনে হয়।

সবাই একসঙ্গে তাকাল ম্যানেজারের দিকে। ভাবল, সাহেব নিশ্চয়ই কিছু একটা তাদের বলবে। কিন্তু সাহেব চুপচাপ।

ফাগুর সঙ্গে অনেকে সেলাম করল সাহেবকে। তারপরে ফাগু বলল, 'হুজুর, আপনি মানিজার, কারখানার মা বাপ।'

সাহেব ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হাঁ হাঁ!'

হিম্মতবালা ঠিক নজর রেখেছিল ফাগুর গোঁফের দিকে। কিন্তু ফাগু এবার বলল, 'আমরা তিনসুতিয়া ইস্পিনিং-এর মজদুর! আমার নাম ফাগু, এই যে হিম্মতবালা, বহুত্‌ পুরানা নোকরি।'

সাহেব বলল, 'বহুত্‌ খুব।'

সবাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তাজ্জব! মানিজারও ব্যাপারটা জানে না নাকি?

মনোহরের একটু বুদ্ধি কম, আর গোঁয়ার। সে অনেকক্ষণ সহ্য করেছে, আর পারল না। ম্যানেজারের সামনে এসে চিৎকার করে বলল, 'হামারা ডিপার্টকা মিশিন সব খুলা পড়া হুয়া হ্যায়, এ অপ্‌ নহি জানতে?'

কে বলল, 'জরুর জানতে হ্যয়। কেন জানবে না।'

একটা হৈচৈ পড়ে গেল। রাগে চিৎকার ক'রে উঠল ফাগু, 'বেতমেজ কাহাঁকা। চুপ রহো সব।'

একটু চুপ করল সবাই। ফাগু আবার বলল সাহেবকে, 'আমার হাতে কাম নেই হুজুর, মিশিন বিগড়ে দিয়েছে।'

সাহেবের অমায়িক মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ল। এ বিস্ময় লাইনসাহেবের থেকে অন্যরকম ও আরও গম্ভীর। আকাশ থেকে পড়লেন ম্যানেজার। বললেন, 'বিগড় গয়া? বাই জোভ্। এ তো হমারা মালোম নহি। লেবার সাব কো পুছো।'

ফাগুর গোঁফজোড়া যেন ধ্বসে পড়ল। বোকার মতো তাকিয়ে রইল সে সাহেবের জুতোর দিকে।

একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল।...কেউ জানে না। আমাদের সর্দার নেই, লাইন সাহেব নেই, ম্যানেজার নেই, এবার শুনব কোম্পানিও নেই। কেউ জানে না, কে এবং কেন খুলেছে মেশিন।

কে বলল, 'এ ফাগু চাচা, পুছো সাহাবকে, দুস্‌রা ডিপার্টগুলো কার হুকুমে চলছে।'

জবাব এল ভিড়ের ভিতর থেকে, 'বরহম্‌দেওয়ের হুকুমে।' অর্থাৎ ব্রহ্ম-দৈত্যের হুকুমে।

ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, তাদের নিয়ে সিরিফ্ বাঁদর নাচানো হচ্ছে। কে কার মুখ দেখে আজ উঠেছিল, গতকাল রাত্রে কে কি স্বপ্ন দেখেছিল, কবে কার হাত দেখে কোন্ সাধুবাবা তার ভাগ্যের কথা বলেছিল সেকথাও উঠল এ প্রসঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য! এরকম একটা ব্যাপারের কথা তো কেউ বলেনি। তাছাড়া একশো চারজনের ভাগ্য তো একদিনেই গণ্ডগোল করতে পারে না।

নুনিয়া ফকির মনে মনে বিপদ গুনছে। গুণ্‌তুক্ জানা আছে বলে এ অঞ্চলে তার খ্যাতি। বড় বড় গোঁফ দাড়িতে চেহারাটা তার খ্যাপা গুণিনের মতো। এই দলের মধ্যে কম করে বিশজনের সে ভবিষ্যৎ ভাগ্য গণনা করেছে, ফতোয়া দিয়েছে সিদ্ধিলাভেরই বেশি। মনে মনে বলল, আর এখন কিনা সে নিজে শুদ্ধু শালা প্যাঁচকলে পড়ে গেল। এরা চেপে ধরলেই যে গেছি খোদা!

তারা যে যা-ই বলাবলি করুক, নিজেরা মনে মনে তারা যতই আসন্ন বিপদকে বুঝতে পেরে থাকুক, যতই বুক জ্বলে যাক, সংশয়ে ভয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাক, তবু এখনো তাদের আসল কথা শুনতে বাকি আছে। মরবার আগেও তাদের সে কথাটা শুনে যেতে হবে। অবিশ্বাসী মনে তারা তাগদ যোগাড়ের চেষ্টা করছে সে কথাটা শোনবার জন্য। যে মুহূর্তে এসে তারা মেশিন খোলা দেখেছিল, সেই মুহূর্তে যে আতঙ্ক ও অন্ধকার ভেসে উঠেছিল তাদের চোখের সামনে, এখনো তেমনি আছে। সব বোঝার উপরেও ভবিষ্যতের আর একটা বোঝা তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

মানিজার মোলায়েম গলায় মিষ্টি মিষ্টি হেসে তেমনি বলতে লাগল, 'ফাগু, লেবার সাবকো অভি পুছো।'

তারা চেঁচামেচি করতে করতে আবার দলবেঁধে চলল লেবার অফিসের দিকে।

চলল আরও তাড়াতাড়ি। মুখে তাদের রোদ পড়ে মুখগুলো কুঁচকে মুচকে গেল। লম্বা ছায়াটা পড়ল একটা দীর্ঘ এলোমেলো ঘাসবনের ছায়ার মতো।

একদল অসমসাহসী শালিক কারখানার উঠোনে ঝুটোপুটি করছিল। এতগুলো লোককে একসঙ্গে আসতে দেখে তারা পালাল। কারখানায় ক্যান্‌-টিন্‌ হওয়ার পর থেকে দুটো কুকুর প্রায়ই দরোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ে। সে দুটো কি মনে করে, চোখ্‌ পিট্‌পিট্‌ করে এ দলটার পাশে পাশে চলতে লাগল।

নলিখোলা ছোকরা অল্গু সব ভুলে কুকুর দুটোর সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল। রোগা আর কালো কুচকুচে অল্গু, হল্‌দে দুটো চোখ, উল্টে দেওয়া খাড়া খাড়া চুল, হিম্মতবালার দিলজ্বালানে ছোকরা। আবার হিম্মতবালার পেয়ারেরও বটে। তার বাপ নেই, সৎমা'র হোটেলে আছে। সেখানে হপ্তায় হপ্তায় তার কাছ থেকে টাকা গুনে গুনে, পকেট হাত্‌ড়ে নেওয়া হয়। এক দুর্বিষহ পঙ্কিলতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে তার বাস, সেইখানেই তাকে খেতে শুতে হয়। আর এদিকে মিশিন বন্ধ। ধোপার গাধারও দাম আছে, তার তাও থাকবে না। কিন্তু সেকথাটা ভাবতে চাইছে না অল্গু। সে শুধু মেতে থাকতে চাইছে কিছু নিয়ে।

ফাগু বিমর্ষ। হিম্মতবালা কি যেন ফিস্‌ফিস্‌ করছে আপনমনে। জোয়ানেরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছে কোম্পানির খেয়ালের কথা, খিস্তি করছে ভাগন, মনোহর রীতিমতো হাত পা ছুঁড়ছে। সাতজন্মে যার সঙ্গে কথা নেই সেই রামদেইয়ের পাশে যেতে যেতে টুনটুনিয়া বক্‌বক্‌ করছে, 'মানিজারটার মুখ দেখে তো মনে হল, মেম মায়ের পেট থেকে ব্যাটা পড়েছে এক্ষুণি।

'কিছুই জানে না। এটা একটা ফন্দি ছাড়া কিছু নয়।' আর রাম-দেইয়ের অবাধ্য চোখদুটো বারবার প্রস্রাবখানার দিকে ফিরে যেতে চাইছে। শুকনো কচি গলার ওয়াঁ ওয়াঁ শব্দ যেন তাকে আরও দ্রুত ঠেলে দিচ্ছে লেবার অফিসের দিকে।

সূর্যটা যেন লাফ দিয়ে দিয়ে উঠছে উপরে, সব জান্তার মতো যেন খিল-খিল করে হাসছে এই লোকগুলোর দিকে চেয়ে। আর একশো চারটে মানুষের সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে ডিপার্টের যন্ত্রের তালে যেন বাজছে, মিশিন খোলা, কাজ নেই। কেন? তা কেউ জানে না।

দলটা এসে বেনো-জলের মতো উঠে পড়ল লেবার অফিসের বারান্দায়। কিন্তু ফাগু এগিয়ে এল না। মনোহর আর গিরিধারী অফিসের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দারোয়ান জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

'লিবারবাবু।'

'অভি নহি আয়া।'

জবাব শুনে সবাই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। লে বাবা। সাহেবের এখনো টাইমই হয়নি আসার। আর এদিকে ডিপার্টে টিফিনের ছুটি এল ঘনিয়ে। মাল তৈরি হয়ে এল আধা দিনের।

আশ্চর্য। তবু যেন সকলের একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। প্রাণ নেওয়ার আগে যেন একটু মুক্তি পাওয়া গেল। যেন জানা হয়ে গিয়েছে, তবু অজানার অপেক্ষায় একটু দম নেওয়া। অভ্যাসবশত কেউ কেউ কোমর থেকে বার করল খৈনির পাতা আর চুনের ডিবা। কেউ বিড়ি নয়তো গুল্।

সবাই বসে পড়ল বারান্দার নিচে মাটির উপর।

এমন সময় দেখা গেল, গঙ্গাবাবু যাচ্ছেন ক্যাণ্টিনের দিকে, মাথায় সাদা টুপি চড়িয়ে। তিনি আসলে কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের সেকেরটরি। মজদুরেরা এবার যে বাবু সাহেবকে কংগ্রেসের নামে ভোট দিয়ে বাঙাল লাট-কাউন্সিল ঘরে নোমায়ন্দা পাঠিয়েছে, অর্থাৎ এ্যাসেম্ব্লিতে, ইনি তারই সাক্রেদ। এখন অবশ্য গঙ্গাবাবু, মজদুরদের ভালো করে কম পয়সায় খাওয়াবার জন্য কান্টিনের কনাক্টর হয়েছেন। মানে কণ্ট্রাক্টর।

তারা সবাই বাবুকে গিয়ে ধরল, পেশ করল ঘটনাটা।

হায় ভগবান! ইনিও তাজ্জব। বললেন, 'হাঁ, এরকম ব্যাপার। আচ্ছা, আজই আমি ব্যাপারটা লাটকাউন্সিলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা হল্লা করো না, লেবার বাবুর কাছ থেকে জবাবটা নিয়ে বাড়ি চলে যাও। তারপর আমি দেখছি।'

বলে তিনি চলে গেলেন আর এ লোকগুলো বোকার মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। না বোকা নয়, অবাক হয়েছে তারা। না, অবাকও নয়, কথাটার দাম যাচাই করছে তারা।

কে একজন বলল, 'লাট কাউন্সিলে পাঠাবে?'

আরেকজন বলল, 'সেটা কোথায়?'

'দিল্লীতে।'

'ধু-র! কোলকাতায়।'

'ও-ই হল।'

'তারপর?'

ভিড়ের ভিতর থেকে বলল মুন্না, 'ঘর ঘর মে দেওয়ালি।'

সবাই হেসে উঠতে গিয়েও পারল না হাসতে। কয়েকটা আজব ও অকথ্য কথা শোনা গেল। কেবল ভুবন বলল, 'তারপর হর ডিপার্টের সব মিশিন-গুলো পাঠিয়ে দিতে হবে লাট কাউন্সিলে।'

আবার একটা হাসির দমক এল। কিন্তু কয়েকটা কটূক্তিতেই শেষ হয়ে গেল সেটা।

আবার ফিরে আসে সেই নির্বাক অস্থিরতা। বুকের মধ্যে মেশিনের তাল বাজে ঝম্ ঝম্। সূর্যটা আরও উঠতে থাকে, আর লোকগুলোর ছায়া ক্রমাগত ছোট হয়ে আসে।

মিশিন বন্ধ; ডিপার্টের বাইরে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে একশো চারটে মানুষ।

কখন আসবে লেবার বাবু? মালুম নেই।

কি মালুম আছে, কার মালুম আছে এ আজব দুনিয়াতে!

হঠাৎ ফাগু বলে বসল, 'এই মনোহর শালার জন্য মানিজার বিগ্‌ড়ে গেল, নইলে ওইখানেই একটা কথা হয়ে যেত।'

কয়েকজন বলল, 'তাই তো!'

মনোহরও খেঁকিয়ে উঠল, 'তাই তো যদি, তবে শালারা যা না ওখানে। যেন মানিজার তোদের ঘরের জেনানার চেয়েও বোকা।'

অমনি একটা ঝগড়ার লক্ষণ দেখা দিল তাদের মধ্যে। গিরিধারী বলল, 'হ্যাঁ, এবার আপোসে তোরা একটা ঝগড়া বাঁধা।'

তাই না বটে! টুনটুনিয়ার ওই জন্য দুচোখে দেখতে ইচ্ছে করে না মরদ-গুলোকে। ঘাড় বাঁকিয়ে সে রামদেইয়ের দিকে ফিরে বসে। আর রামদেই যেন সন্দেহবশে ঘাড় বাড়িয়ে উঁকি মারে লেবার অফিসের দিকে। অর্থাৎ লেবারবাবু এসেছে কি না। কিন্তু ভুলেও কি আর একবার মনে পড়ে না ছেলে দুটোর কথা।

অল্গুর দু'পাশে কুকুর দুটো ঘাড় নুইয়ে পড়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে না, তারাও এ ব্যাপারটার শরিক হয়ে পড়েছে কিনা।

একটু পরেই গোঁ গোঁ করে বেজে উঠল বাঁশি। সাড়ে দশটা বেজে গেল। ডিপার্টের ভেতর থেকে পিল্‌পিল্‌ করে বেরিয়ে এল লোক। যেন গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে সারি সারি পিঁপড়ে।

বাসি মুখ ধুতে চলেছে সবাই। চলেছে নাওয়া খাওয়া করতে। ইতিমধ্যে সকলেই জানতে পেরেছে তিনসুতিয়া স্পিনিং ডিপার্টের মেশিন খুলে ফেলে রেখেছে। সব বুঝে তারাও না-বুঝ হয়ে আছে এদের মতো। তবু, খেতে যাওয়ার সময়, এই লোকগুলোর দিকে তারা ভালো করে তাকাতে পারছে না। কেউ কেউ তাদের সঙ্গে যদিও বা দু' একটা কথা বলছে, অমনি তার বুকের মধ্যে যেন কেউটে সাপের ছোবল লেগেছে মনে হয়। মনে হয়, এ লোকগুলো যেন একটা রাহুর গ্রাসে পড়েছে, এবার তাদেরও হয়তো টেনে নেবে। নিজে-দেরই তাদের ভীষণ অসহায় বোধ হয়। দিনকালটাই এসেছে যেন একটা ভয়া-বহ মারের মতো পিশাচের উদ্যত হাত নিয়ে।

এ দলটাও অস্থির হয়ে ওঠে। সবাই খেতে চলেছে, আর তারা বসে আছে, এতবড় ব্যতিক্রমটা যেন তাদের গায়ে চাবুক পিটছে। মনে পড়ছে, কার কত বাইরে কাজ ছিল, কিছুই করা হবে না। দোকান বাজার, ডাক্তারখানা, কারুর বা রান্না কিংবা জল তোলা সমস্ত কাজ পড়ে আছে।

এতক্ষণে অল্গু ছাগলবাচ্ছার মতো লাফাতে লাফাতে চলে যায়, রামদেই পড়ি মরি করে ছোটে, হিম্মতবালা ভিড়ের ধাক্কাতেই ঘরে পেঁছিয়। আর আজকে সব ঘাড় মুড়ে লেবার অফিসের সামনে বসে আছে।

কে যেন কান্নার মতো গলায় চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের কি এরা জানো-য়ার ভেবেছে।'

একজন বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

আর একজন লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'চললুম আমি শালা ঘরে, যা হয় হবে।'

কিন্তু ওই পর্যন্তই। আবার বসে পড়ল। সকলেরই একটা কিছু ইচ্ছে

করছে। কিন্তু তাদের হাত পা যেন বাঁধা। হাত পা বাঁধা একদল শিকারকে কে যেন ফেলে রেখেছে এখানে।

ফাগু আবার বকবক করছে, 'এখন তো দিনকাল শালা তবু ভালো। আগে স্পিনারদের সর্দারেরা ধরে ধরে সাধত, আর কাজ করাত।'

হিম্মতবালা না বলে পারল না, 'অওরতের ছিনা খাম্‌চে দিত, একটু উদাস হলে, সর্দারের হাত চলে যেত কাপড়ের তলায়।'

অমনি টুনটুনিয়া খেঁকিয়ে উঠল, 'এখন আসুক না একবার সেই খচ্‌ড়ারা।'

ফাগু বলে উঠল, 'আসবে বৈ কি। মানিজারের সামনে হাঁকডাক করলে, আসবে না?'

আবার ফাগু একটা ঝগড়ার বিচি পুঁতছে। মনোহরও মুখে মুখে জবাব দিল, 'এবার গিয়ে ম্যানেজারের ইয়ে খেয়ে এস'।

ব্যস্। বিচি অমনি গাছ হয়, ছড়িয়ে পড়ল ঝগড়া। আবার হট্টগোল।

এই ফাঁকে এলেন লেবার অফিসার।

এক শো চারটে লোক আগেই কড়া নজর করে দেখল লেবার অফিসারের মুখের ভাবটা। নেহাত একটা বাঙালী ভদ্রলোক, কোট প্যান্ট পরা, চোখে চশমা আঁটা, কামানো গোঁফ আর কালো মুখ।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ ডিপার্টের লোক তোমরা?'

'তিনসুতিয়া স্পিনিং।'

'কি হয়েছে?'

লাও ঠ্যালা, এও জিজ্ঞেস করছে, কি হয়েছে।

এবার প্রায় একসঙ্গে সবাই বলে উঠল, 'মিশিন খুলে নিয়েছে।'

'ওহো!' মনে পড়ে গিয়েছে লেবারবাবুর।

অমনি সমস্ত লোকগুলো শরীর শক্ত করে দাঁড়াল। যেন মারবে এখুনি কেউ। নিঃশব্দ, মনে হয় লোক নেই একটাও। খালি এক শো চারটে মানুষের নিঃশ্বাস পড়ছে এর ওর গায়ে। বুকের ধুকধুকির শব্দটা চাপা পড়ে গিয়েছে হৃদ্‌পিণ্ডের তলায়। এইবার তাদের শোনাবে কেন মিশিন খুলে দিয়েছে। সত্যি শোনবার দরকার আছে কিনা, তারা তা-ও বুঝতে পারছে না।

লেবার অফিসার বললেন, 'আলুগুদাম নোটিস দিয়েছে..'

আলুগুদাম মানে হেড্ অফিস। সবাই আরও এগিয়ে এল লেবার অফিসারের দিকে।

তিনি বললেন, 'জানিয়েছে, তিনসুতিয়া মালের অর্ডার নেই, ডিপার্ট বন্ধ করে দাও। তোমাদের ছুট্টি দিয়েছে।'

এতক্ষণে লোকগুলো সত্যি বোকা হয়ে গিয়েছে। তাদের ছুটি দিয়েছে এমন সাংঘাতিক কথা যেন তারা কোনোদিন শোনেনি। চুপ্‌সে গিয়েছে সমস্ত মুখগুলো। খোঁচা খোঁচা মুখওয়ালা কাঠের পুতুলের মতো দেখাচ্ছে সবাইকে।

হিম্মতবালার হাঁ করা মাড়ির ফাঁক দিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়েছে, ফাগুর মুখটা যেন জ্বরের বিকারগ্রস্ত, মনোহরের চওড়া গলাটা যেন কেউ চেপে ধরেছে, আতঙ্কগ্রস্ত অল্গুর নাল কাটতে আরম্ভ করেছে মুখে আর খোলাবুক রামদেই

শূন্যচোখে যেন উৎকর্ণ হয়ে আছে কি একটা শোনবার জন্য। বুঝি চুপসে গিয়েছে বুকটা। একটা তীক্ষ্ণ ছোরা বিঁধে রয়েছে যেন তার গলায়। স্বর নেই। খালি চোখ ফেটে কি যেন আসছে।

এক শো চারটে মানুষ একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছে। তারা বুঝতে পারছে না তারা কি করবে। চিৎকার করবে, কাঁদবে, গালাগাল দেবে, না, ভালো-ছেলের মতো বাড়ি চলে যাবে। এমনকি জোয়ান গিরিধারী, ভাগন, মনোহর পর্যন্ত কথা বলতে পারছে না।

হঠাৎ কে চিৎকার করে উঠল, 'যাব না'।

সবাই দেখল, লোকটা জন। জিভ্ থেকেও যে চিরদিন প্রায় বোবা, সেই কালো কুটকুটে চেহারা, কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো একমাথা চুল, চুরুট ফোঁকা কুঁচকোনো কালো ঠোঁট, লম্বা একহারা একটা ভূতের মতো লোকটা। একটা মাদ্রাজী খ্রীষ্টান, শান্ত, ভালোমানুষ জন।

সে আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন যাব? নহি যায়েঙ্গে।'

অসহ্য রাগে এর বেশি তার মুখ দিয়ে কিছু বেরুচ্ছে না।

সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। নির্বাক বিস্মিত সংশয়ান্বিত চোখে। কিন্তু তার কথাটা যেন সবগুলো গলায় নিঃশব্দে কল্‌কল্ করে উঠছে। তারা বলতে পারছে না, কিন্তু বলতে চাইছে যেন।

ফাগুর ধ্বসে পড়া গোঁফজোড়া হঠাৎ সিংহের মতো খাড়া হয়ে উঠল। সে আর হিম্মতবালা এরকম লোক বোধহয় দেখেনি যে এমন করে তাদের নিদবুঁদ প্রাণে এরকম একটা খোঁচা দিয়ে জাগাতে পারে। জোয়ানের দল ভাবছিল, এ সেই জন! টুনটুনিয়ার মনে হল, একটা মরদ দেখেছে সে এতদিনে। রামদেইয়ের চোখের কোণে থম্‌কে যাচ্ছে জল।

লেবার অফিসারের চোয়ালটা কি রকম বেঁকে গিয়েছে আর দরোয়ানটা সন্দেহান্বিত চোখে দেখছে প্রত্যেকটা মুখ। টিফিনের ছুটির পর ফিরে আসছে মজুরেরা। কাটা কাটা ভাবে।

জন যেন যুক্তি দেওয়ার মতো কাটা কাটা ভাবে চেঁচিয়ে বলল, 'কোম্পানি হুকুম দিল, যাও। কেন যাব? কোথায় যাব? মরতে? কোম্পানির মর্জিতে? নহি যায়েঙ্গে।'

যাব না। একটা গুল্‌তানি উঠছে চারদিক থেকে, নহি যায়েঙ্গে, নহি যায়েঙ্গে।

জন আবার বলল, 'মানিজারের কাছে আমরা একটা কাজ চাই—হাঁ।'

হাঁ, চাই। কাজ চাই একটা।...একটা বন্ধ জলাশয়ের ছাড়া পাওয়ার মতো সবগুলো গলা থেকে শব্দ বেরিয়ে এল। যেন ডজনখানেক শ্যাফেট্ সুইচ টিপতেই প্রচণ্ড শব্দে ঘুরতে আরম্ভ করল। চাই চাই কলরবের বান ডেকেছে হঠাৎ কারখানার উঠোন-গঙ্গায়।

কারখানার মজুরেরা সবাই তাদের দিকে দেখছে। হঠাৎ যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে সারাটা কারখানা, যেন কাত হয়ে গিয়েছে। চেহারাটা বদলে গিয়েছে।

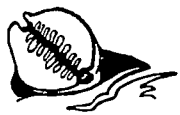
কেবল প্রস্রাবখানায় থাকতে পারল না আর রামদেইয়ের ছেলেমেয়েগুলো।

বাচ্চা ভাই দুটোকে তারা এনে ফেলে দিল মায়ের কোলে। কোলের মধ্যে মা'য়ের গন্ধ পেয়ে বাচ্চা দুটো হঠাৎ শুকনো গলায় চেঁচিয়ে উঠল। দুটো যমজ বাচ্চা। রামদেইয়ের স্তনদুটো একবার কুঁচকে উঠল, তারপরেই দুটোর মুখে সে ভরে দিল দুটো বোঁটা।

বাকি তিনটে আঁচল ধরে বার বার বলতে লাগল, 'কখন ঘর যাবি, কখন পাকাবি, কখন খেতে দিবি মা। ভুখ আর সইতে পারি না।'

'যাব বাবা,' পাকাব, খেতে দেব। মানিজারের কাছে ঘুরে আসি আগে।' মনে মনে আওড়ায় রামদেই।

হ্যাঁ, মা একবার ঘুরে আসবে। একবার।



বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমের সমকাল থেকে আরম্ভ করে সব সমালোচকই বিষবৃক্ষ-কৃষ্ণকান্তের উইল একত্র আলোচনা করেছেন। কারণ এ-দুটিই মাত্র খাঁটি পারিবারিক উপন্যাস—বিবাহিত পুরুষের অন্য নারীতে আসক্তি দুটি উপন্যাসেরই কেন্দ্রগত বিষয়; 'উপলক্ষ্য'-রূপে উভয় গ্রন্থেই বিধবা-বিবাহ সমস্যা আনা হয়েছে। কিন্তু এই দুটি উপন্যাসের কাঠামোয় যেমন আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য, তেমনি দুই গ্রন্থের মর্মগত বিচারে শিল্পীর মনোভাবের আশ্চর্যজনক বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। মনে রাখা দরকার, এই দুই উপন্যাসের রচনাকালের মধ্যে তিন বছরের ব্যবধান। সময়ের বিচারে তিন বছরের ব্যবধান অনুল্লেখ্য হলেও এই অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে তিনি ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, সাম্য, চন্দ্রশেখর, কমলাকান্তের দপ্তর, কৃষ্ণ-চরিত্র, রজনী এবং রাধারাণী—এতগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলেই এ-তিনবছরের ব্যবধানকে বিনা দ্বিধায় দীর্ঘ বলতেই হয়। এই গ্রন্থগুলি রচনাকালে স্বভাবতই সামাজিক প্রশ্নের যথাসম্ভব সমাধানে তিনি পৌঁছেছেন—কমলাকান্তের দপ্তরে ও 'সাম্য'-নিবন্ধচয়ে তার সম্যক পরিচয় রয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এতগুলি গ্রন্থের পরেও কেন আবার সেই পুরনো কথাবস্তুর পুনর্ন্যাস? তাঁর মতো সচেতন শিল্পী শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তির তাগিদেই নিশ্চয় নিজের লেখার রোমন্থন করেননি। সুতরাং এমন অনুমান করা অন্যায় নয় যে তাঁর যে-কথা বিষবৃক্ষে বলা হয়নি, সে-কথা বলার জন্যেই কৃষ্ণকান্তের উইল রচনা করেছেন। সুতরাং দেখা যেতে পারে, বিষবৃক্ষের সেই অকথিত কথাটি কি? কুন্দনন্দিনীর অকৃত সংগ্রাম-প্রচেষ্টা রোহিণী সার্থক করেছে—একথা বলেই বিষবৃক্ষ থেকে কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমের শিল্পী-মানসের অগ্রগামিতাকে প্রতিষ্ঠা করা চলে না। দুই উপন্যাসের তুলনামূলক বিচারে আমি কৃষ্ণকান্তের উইলের বিস্তৃত আলোচনা করব; কেননা রোহিণীর মৃত্যু সম্পর্কিত বহু-আলোচিত অথচ অমীমাংসিত প্রশ্নটিরও এ-প্রসঙ্গে সমাধান করতে হবে। তার পূর্বে অধ্যাপক রায়ের কয়েকটি মন্তব্যের উল্লেখ করতে চাই। তাঁর মতে 'বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল এমন একটি নারী-চরিত্রের যাহার রূপ, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব গোবিন্দলাল-ভ্রমরের **অনাবিল প্রেমে আবর্তের** সৃষ্টি করিতে পারে।' সেই জন্যেই রোহিণী বয়স্থা, বিধবা এবং সুন্দরী। দুটি উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক যুক্তিতর্ক বিন্যাসের পরও ব্যাপারটিকে নেহাতই 'উপলক্ষ্য' বা 'প্রাথমিক ঘটনা-সংস্থানের দাবী' বলে অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাছাড়া, উদ্ধৃত বাক্যটির মধ্যেই এমন ইঙ্গিত রয়ে গেছে যার দ্বারা বোঝা যায়, সমালোচক ধরেই নিয়েছেন—রোহিণীর আবির্ভাবের পূর্বে তাদের যে প্রেম ছিল অনাবিল, রোহিণীর আবিল সংস্পর্শে তাতে আবিল আবর্ত সৃষ্টি হল। যদিও সমালোচক 'আবিল' বিশেষণটি ব্যবহার করেননি

কিন্তু শুধু যদি ভ্রমর-গোবিন্দলালের নিস্তরঙ্গ শান্ত প্রেমে আবর্ত-সৃষ্টি বোঝানোই তাঁর উদ্দেশ্য হত তাহলে পূর্বে ঐ 'অনাবিল' বিশেষণটিও তিনি প্রয়োগ করতেন না। স্পষ্টই বোঝা যায় যে রোহিণীর প্রতি বিদ্বিষ্ট পক্ষপাত এবং বঙ্কিম-মানসের ধারাবাহিক প্রগতিশীলতা সপ্রমাণ করার একটা খসড়া ছ'কে নিয়েই সমালোচনা আরম্ভ করেছিলেন।

আমিও বিশ্বাস করি, 'একথা আশা করা অসঙ্গত যে বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া এই সমস্যাকে সম্যক বুঝিতে পারিবেন'। আমিও বিশ্বাস করি, স্বল্পভাষিণী ভ্রমরের সদর্প উক্তির অন্তর্নিহিত বিপ্লবী তাৎপর্য সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় পতি-পত্নী সম্পর্কের মর্মমূলে তীক্ষ্ণ আঘাত করে'। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, কোনো সচেতন শিল্পীর পক্ষে (যদি তিনি মহৎ শিল্পী হন) এটুকু বুঝলেই যথেষ্ট হয় যে, 'বিধবা-বিবাহে নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার মানিয়া লইলেই সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় না তাহা নরনারীর সম্বন্ধকে জটিলতর করিয়া ভারসাম্যকে বিচলিত করে'। আমি এ-ও বিশ্বাস করিনা যে, 'ধনবাদী সমাজে পারিবারিক বিচলনের চিত্রই তাঁহার এ-উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে'; কেননা তা হয়নি, হলেই যথার্থ হত। বরং বিষবৃক্ষে এই 'পারিবারিক বিচলনের' চিত্র ভালো ফুটেছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে এ-বিষয়ে লেখকের ব্যর্থতার কারণ, রোহিণীকে কুন্দের মতো সাধারণ সৎ নারী হিসেবে তিনি উপস্থিত করতে চাননি।

হরলালের জন্যে রোহিণীর উইল চুরির পেছনে রয়েছে তার কৃতজ্ঞতাবোধ —হরলালই প্রথম তাকে জানিয়েছে পথনির্দেশ—বিধবানারীর জীবন একেবারে ব্যর্থ নয়। সে বলেছে, 'দেখ রোহিণী, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।...দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবে না?' কিন্তু পরমুহূর্তেই সে যখন দূরসম্পর্কের অজুহাতে নিজেই তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব জানিয়েছে, তখনি রোহিণী মাথার কাপড় লম্বা করে টেনে দিয়ে ডালে কাঠি দিয়েছে। উইল চুরির পরেও রোহিণী হরলালকে বলেছে, 'আপনারই জন্য ইহা রহিল। যখন আপনি বিধবাবিবাহ করিবেন আপনার স্ত্রীকে ইহা দিব।' হরলাল অসৎচরিত্র ও হীনমতি নিঃসন্দেহ; কিন্তু সে-ই রোহিণীর জীবনে প্রথম পুরুষ যে তার অন্ধকার শূন্য জীবনে আশার ক্ষীণ আলো দেখিয়েছিল, তাই হাজার দোষ থাকা সত্ত্বেও হরলালের প্রতি রোহিণীর কৃতজ্ঞতাবোধ বরাবর অটুট ছিল। হরলালের অসদাচরণে বিরক্ত হয়ে রোহিণী বলেছে, 'তুমি পুরুষমানুষ, মানে মানে দূর হও।' ফলত শুধু পুরুষমানুষ বলেই সেদিন নিষ্কৃতি পায়নি; হরলাল সেই পুরুষ যার কাছে রোহিণীর নারীত্ব কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ—তাই রোহিণী তার 'মান'-হানি করতে চায়নি। তবে কেন লেখক হঠাৎ মন্তব্য করেন, 'আমরা তো বলিয়াছি রোহিণী লোক ভাল নয়'? কেন সে মন্দ? তার আচরণে কোথাও তো অসতীর লক্ষণ প্রকাশ পায়নি? মন্দ রোহিণী হরলাল-প্রদত্ত টাকা প্রত্যাখ্যান করল কেন? তবে কি বসন্তের প্রাকৃত চাঞ্চল্যের প্রভাবে রোহিণীর মনোচাঞ্চল্য ঘটা লেখকের মতে মন্দনারীর লক্ষণ? তিনি তো নিজেই বলেছেন—রোহিণীর মেজাজ ভারী, সে দল বেঁধে হৈ-হুল্লোড় করে সাধারণ পল্লীমেয়েদের মতো জল তুলতে যায় না, তার চালচলনও ভারী।

'সে হংসীর মত আস্তে আস্তে চরণ ফেলিয়া যায়'—তবে আবার 'হেলিয়া দুলিয়া পালভরা জাহাজের মত ঠমকে ঠমকে চমকে চমকে জল লইয়া' আসার মানে কি? এক রোহিণীর জল আনা দুই হয় কেন? হংসীর মতো যার চলন, সে আবার পালভরা জাহাজের মতো যায় কি করে? পাশাপাশি এই বৈপরীত্যকে লেখনীর স্খলন বলে তুচ্ছ করা যায় না—এর মূলে রয়েছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। রোহিণীর সামাজিক মর্যাদাদানের প্রশ্নে তাঁর মন দ্বিধামুক্ত হতে পারেনি। অবশ্য, উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের আগে সামন্তবাদী চেতনা লেখকমনে কখনোই মুখ্য হয়ে উঠতে পারেনি। তাই রোহিণী গোবিন্দলালকে বলেছে—'যাহা আমি ইহজন্মে পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর পাইব না আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন'।

উইলচুরি ধরা পড়ার পর রোহিণী মরতে দ্বিধাবোধ করেনি—নারীর সৌন্দর্য চুল সে অনায়াসে কেটে ফেলতে চেয়েছে। তার কারণ তখনও তার নারীত্ব প্রকৃত স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু গোবিন্দলালের কাছে রোহিণী স্বীকৃতি পাবার পরমুহূর্তেই সে মৃত্যুকে অস্বীকার করেছে। লেখক বলেছেন, 'রোহিণীর বাঁচিতে সাধ জন্মিল'; এতদিন তার কাছে জীবন ও মৃত্যুতে কোনো পার্থক্য ছিল না, এখন সে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। যে তার অন্ধকার-জীবনে জেবলে দিয়েছে প্রেমের দীপ্ত দীপশিখা, তার চোখের আড়ালে থাকা তো রোহিণীর পক্ষে মৃত্যুরই নামান্তর। তাই কুন্দনন্দিনীর মতো সেও কলকাতা যেতে রাজী হয়নি।

কিন্তু জলমগ্ন রোহিণীর চিকিৎসাকালে বেড়াল মারার লাঠিতে অকারণেই ভ্রমরের কপাল ফাটেনি। অর্থাৎ লেখকের মতানুযায়ী হয়তো 'এতদূরে বিষ-বৃক্ষের বীজবপন হইল।' শুধু মাত্র ভ্রমরের মনে অশান্তি আনার জন্যেই গুজব সমর্থন করে রোহিণী ভ্রমরকে গিল্টি করা গহনা দেখাতে যাবে—এমন মনে করা যায় না। এখানে যেন কুন্দের সঙ্গে হীরা যোগ দিয়েছে। এই গহনাপ্রদর্শন যে রোহিণীর চরিত্রানুগ ব্যাপার নয় তা অনুমান করেই লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন, 'রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব-পরিচয়ে জানা গিয়াছে'। একথা হয়তো সত্যি যে অন্তরের তাগিদে সমাজের যে কোনো শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার এবং যেকোনো তথাকথিত গর্হিত কাজ করার মতো দুঃসাহসও তার আছে; কিন্তু অকারণে (শুধুমাত্র অপরের শান্তি নষ্ট করার জন্যেই) গহনাপ্রদর্শনের মতো হীনশ্রেণীর নারী রোহিণী নয়। উইলচুরি করেছে বলেই যে রোহিণী 'না পারে এমন কাজ নাই'—এযুক্তি নিতান্তই দুর্বল এবং আসলে কুযুক্তি।

গোবিন্দলাল-রোহিণীর বাগানবাড়ির কথোপকথন সম্বন্ধে লেখক বলে-ছেন 'পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না।' রোহিণী-চরিত্র সম্বন্ধে লেখকই যে ধারণা দিয়েছেন তাতে কোথাও সন্দেহ জাগে কি যে, রোহিণী এমন বলতে পারে যার পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তির প্রশ্ন উঠতে পারে?

প্রথমখণ্ডে লেখকের মনে নারীসম্পর্কে ধনবাদী সংস্কৃতির শিক্ষালব্ধ ধারণা এবং যে-পরিবেশে তিনি লালিত, পালিত ও বর্ধিত সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজচেতনার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল তারই নির্দ্বন্দ্ব সমাধান হয়েছে দ্বিতীয়-

খণ্ডে—লেখক সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন সামন্তবাদী সংস্কারের কাছে। দ্বিতীয়খণ্ডের রোহিণী সম্পূর্ণ অন্য মেয়ে, যেকোনো ভ্রষ্ট চরিত্র অঘটন-ঘটনপটিয়সী গণিকার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখা চলে। লেখকের সজ্ঞান সামন্ততান্ত্রিক চেতনা তাঁর শিল্পকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। পটলচেরা চোখে কটাক্ষহানা রোহিণীকে তো আগে দেখিনি। হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করার পর তার এই পরিবর্তন কি লেখকেরই স্বেচ্ছাকৃত নয়? প্রথমখণ্ডে রোহিণী গোবিন্দলালের জন্যেই মরতে চেয়েছে, তার জন্যেই বাঁচতে চেয়েছে, কলকাতা যেতে চায়নি (রূপ ও অর্থই যদি রোহিণীর কাছে সমাদরণীয় হত, তাহলে সে কলকাতা যেতে অবশ্যই রাজী হত)—হরিদ্রাগ্রামের স্বসমাজ, আত্মীয় ইত্যাদি ত্যাগ করেছে, আর সেই রোহিণীই শুধু নিশাকরের রূপ দেখে তার সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা করল? তবে কি সে বৃথাই বলেছিল, 'যাহা আমি ইহ-জন্মে আর পাইব না, আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন'?

'অনবধান মৃগ পাইলে কোন ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে শরবিদ্ধ না করিবে?...নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে **কোন নারী** না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে?' এমনতর ভাবনা মোটেই রোহিণীর চরিত্রানুগ নয়। যে শ্রেণীর নারীর মনে পুরুষ দেখলেই জয় করার কামনা জাগে রোহিণী তো সেই শ্রেণীর প্রগল্‌ভা মেয়ে নয়। হতে পারে রোহিণী কুলত্যাগিনী, পরপুরুষে আসক্তা, কিন্তু তার এই বহু পুরুষসঙ্গলিপ্সা তো স্বাভাবিক নয়, নারীর প্রতি লেখকের সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই এর কারণ। যদিও এ-উপন্যাসেই বঙ্কিম ঘোষণা করেছেনঃ 'রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া'। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নারী-চরিত্রঅঙ্কনে তিনি এ-ঘোষণার বাস্তবরূপ দান করতে পারেননি। সজ্ঞান সামন্তবাদী সংস্কার সব সময়ই তাঁর শিল্পকে (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ ছাড়া) কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রোহিণীর মৃত্যু অবশ্য-ম্ভাবী এ-কথা নিঃসন্দেহ। শুধু গোবিন্দলালই ব্যক্তিগতভাবে এই খুনের জন্য দায়ী নয়, এই সমাজব্যবস্থার কঠোর অনুশাসনের বিচারে রোহিণীর মতো স্বাধীনচেতা নারীর কোনো স্থান নেই, সমাজব্যবস্থার কঠিন নিগড়ে রোহিণী-দের আত্মবলি অনিবার্য—গোটা সমাজেরই রায় প্রকাশ পেয়েছে গোবিন্দলালের গুলির মুখে। কিন্তু এখানেই প্রশ্নের সমাধান নয়। কি প্রয়োজন ছিল গোবিন্দলালের কাছে রোহিণীকে দ্বিচারিণী প্রমাণ করার? কেন অন্যায়ভাবে লেখক রোহিণীর জীবনে নিশাকরঘটিত কলঙ্ক আরোপ করলেন?

মূক কুন্দের যে-প্রশ্নকে রোহিণী মুখর করে তুলেছিল লেখক স্বয়ং অন্যায়-ভাবে সে-মুখ বন্ধ করেছেন। পাঠকসাধারণের সংবেদনশীল চিত্তেও যে তার মৃত্যু অমর হয়ে থাকবে—সে-মুখও তিনি রাখেননি। গ্রন্থ শেষে আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয়খণ্ডের রোহিণীর এই-ই যথার্থ প্রাপ্য ছিল; কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—প্রথমখণ্ডের রোহিণী কি স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয়খণ্ডের রোহিণীতে পরিবর্তিত হতে পারে? এবং এ-প্রশ্নের কোনো সমাধান মেলে না। তাই রোহিণীর সংগ্রামকে লেখক ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছেন—তার প্রতি আমা-

দের কোনো করুণা জাগে না—এখানেই 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা কৃষ্ণকান্তের উইলের 'সাহিত্যিক মূল্যের' ন্যূনতার কারণটি নিহিত।

এই দুই উপন্যাসের অন্তর্বর্তী সময়ে রচিত গ্রন্থগুলি নিয়ে আলোচনা করলেও লেখকের পরিণত হাতের চিহ্ন যেমন সর্বত্র দেখা যায় তেমনি স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর শিল্পবোধ তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনী ও প্রতাপের বাল্যপ্রণয় দেখানো হয়েছে; সামাজিক কারণে তাদের বিবাহ হল না। কিন্তু বিবাহ এবং প্রেম সমার্থক নয়। তাই চন্দ্রশেখরের স্ত্রী হওয়ার পরও শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলতে পারেনি—প্রতাপও রূপসীকে বিবাহ করার পর থেকেই শৈবলিনীকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু ভুলতে পারেননি। বাস্তবজীবনে কাছে পাওয়ার প্রশ্নই প্রেমের ক্ষেত্রে বড় কথা নয়, বড় কথা হল উভয়ের মধ্যে প্রেমের পারস্পরিক স্বীকৃতি। শৈবলিনী-প্রতাপের জীবনে প্রকৃত সার্থকতাই এইখানে যে, উভয়ের প্রণয়ে পারস্পরিক স্বীকৃতি ছিল। শুধু সেজন্যেই 'চন্দ্রশেখর' উল্লেখযোগ্য নয়; এ-উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা অনিবার্যভাবেই শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের জীবনকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু শৈবলিনীর নরকদর্শনের বীভৎস চিত্রে লেখকের শ্রেণীচেতনারই প্রতিবিম্ব পড়েছে। 'মহৎ প্রেম মহৎ দুঃখের ওপর প্রতিষ্ঠিত'—একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন; দুঃখতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে তিনিও আস্থা রেখেছেন, কিন্তু অস্থিকুম্ভীর রক্ত-সমুদ্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে যে প্রায়শ্চিত্ত তার কোনো দার্শনিক ভিত্তিই নেই, নিছক নৈতিকবোধের দ্বারাই তা নিয়ন্ত্রিত।

সামাজিক কর্তব্যের দিক দিয়ে চন্দ্রশেখরের সংসার করাই তাঁর উচিত—আত্মবিশ্লেষণের পর এ ধারণা শৈবলিনীর হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কর্তব্য ও প্রেম কি অভিন্ন? কৃত্রিম উপায়ে যোগবল প্রয়োগ করে শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি প্রেমকে যেভাবে চন্দ্রশেখরের প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত করা হল তা নেহাতই হাস্যকর। বশীকরণ, যোগবল কি সেকালের সমাজবাস্তবের অন্তর্ভুক্ত? যোগবলকে Psychic force-এর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে দেখা আর নব্যহিন্দুবাদীদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো মূলগত প্রভেদ নেই।

চন্দ্রশেখরের একবছর পরে প্রকাশিত হয় রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ'। মাধবীকঙ্কণ ঐতিহাসিক উপন্যাস হলেও ইতিহাসের চেয়ে এর সামাজিক অংশের মূল্যও কম নয়। নরেন্দ্র-হেমলতার প্রেম প্রতাপ-শৈবলিনীর সঙ্গে তুলনীয়। শ্রীশের সঙ্গে চন্দ্রশেখরের তুলনা সহজেই মনে আসে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের শিল্পীমনের পেছনে কোনো নীতিবাগীশের তাড়না ছিল না বলেই হেমলতার নরেন্দ্র-প্রেমকে স্বামিপ্রেমে রূপান্তরিত করার মতো উদ্ভট কল্পনা তাঁর মস্তিষ্কে স্থান পায়নি।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠার খাতিরেই তাঁর (একাডেমিক) আলোচনায় বলেছেন, 'ঐন্দ্রজালিক যে অল্প সময়ের মধ্যে বীজ হইতে বৃক্ষ ও বৃক্ষ হইতে ফল উৎপাদন করে, তাহা নিশ্চয়ই সমধিক বিস্ময়কর; কিন্তু মোটের উপর গাছের ফলই বেশি রসযুক্ত ও মিষ্ট'। অন্যত্র তিনি চন্দ্রশেখরের

বহুবিধ প্রশংসা করেও এ-উপন্যাসের বিশ্লেষণরীতিকে 'যাদুবিদ্যার অনুরূপ' বলতে বাধ্য হয়েছেন।

'রজনী'র মধ্যেও এই 'যাদুবিদ্যার অনুরূপ' নীতি অনুসৃত হয়েছে। রজনী শচীন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা; কিন্তু তার প্রতি শচীন্দ্রের কোনো দুর্বলতাই ছিল না। পিতলের টুক্‌নি সোনা করতে সমর্থ এমন এক অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষের মন্ত্রপূত ক্রিয়াকর্মে শচীন্দ্রের রজনী-অনুরাগ জন্মানো হল। (নীরেনবাবু হয়তো এখানেই 'প্রখর কল্পনা' বা 'কল্পনা সমৃদ্ধির' গৌরবে মুগ্ধ ও হতবাক হয়েছেন!) নারীপ্রেম সম্বন্ধে যে লেখকের ধারণা এত বিকৃত এবং সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বাস দ্বারা নিয়মিত নারীর ব্যক্তি-মুক্তি আন্দোলনে তিনি কখনোই সহায়ক হতে পারেন না। লবঙ্গলতা বৃদ্ধ রামসদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—সতীন এবং সতীনপুত্র বিপত্নীক শচীন্দ্রকে নিয়ে তার সংসার। লেখকের বর্ণনানুযায়ী মনে হয়, লবঙ্গলতা অসুখী নয়; সে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গেই রঙ্গ-রসিকতা করে পরম আনন্দে দিনাতিপাত করে। অথচ এ-ধরনের দিনযাপনের মধ্যে যে গ্লানি সঞ্চিত থাকে তা কোথাও এতটুকুও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অপরিণত বয়সে লবঙ্গলতা অমরনাথের পিঠে 'চোর' লিখে তার চপল স্বভাবের পরিচয় দিয়েছিল, কিন্তু রামসদয়ের সংসারে এসে সে-চাপল্য অন্তর্হিত হল না—বরং নিত্য নতুন ছেলেমানুষীতে উত্তরোত্তর বেড়েই চলল (ধন্য কল্পনা-সমৃদ্ধি!)।

বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের ওপর অকুণ্ঠ আস্থা ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র লবঙ্গলতাকে এমন করে গড়তে পেরেছিলেন। এ-কথা অবশ্য ঠিক যে, পরে লবঙ্গলতার স্বগতোক্তির* মধ্যে এমন ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে যতে অনুমান করা সহজ হয়—বাল্যকালের সেই চাপল্যঘটিত ব্যাপারের পেছনে যে গোপন অনুরাগও সঞ্চিত ছিল এ-সত্য পরে তার কাছে ধরা পড়েছিল।

'রাধারাণী'-ই বঙ্কিম-সাহিত্যে একমাত্র বিষাদলেশহীন মিলনাত্মক কাহিনী। এর আখ্যানভাগে কোনো জটিলতা নেই, কোনো সামাজিক আনুগত্যের সমস্যা নেই—অবাধ অকুণ্ঠ স্বাধীন প্রেমের যথেচ্ছ লীলাবিলাস দেখাবার সবচেয়ে বেশি অবকাশ পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র এখানে; রুক্মিনীকুমার ও রাধারাণীর প্রেম পারস্পরিক—সুতরাং এখানেই শিল্পীর প্রেমকে নির্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ রয়েছে। উপন্যাসে বিবাহে এ-প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখানো হয়েছে, কিন্তু পরিচারিকার শুভ-শঙ্খনাদের পেছনে শিল্পীব প্রীতিপক্ষপাত ছিল না বলেই এ-মিলন কেমন যেন আকস্মিক, প্রাণহীন বর্ণনা বলে মনে হয়। তাই রাধা-রাণীর শিল্পমূল্য সব সমালোচকের বিচারেই অকিঞ্চিৎকর। [ক্রমশ

* দ্রষ্টব্য 'রজনী' (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ) পৃঃ ৬৯।

আমার দেশের শিশু

নাজিম হিকমত

আমার দেশের মেহনতী মানুষের ছেলেমেয়েরা কিভাবে বাস করে সে কথা তোমাদের বলবার ইচ্ছা হচ্ছে।

আমাদের এই তুরস্কদেশে ধনপতি, জমিদার ও মোটা মাইনের অফিসরদের আহ্লাদে, নিষ্কর্মা ছেলেদের সঙ্গে সাধারণ লোকের ছেলেমেয়েদের কোনো রকমেই মেলামেশা নেই। খেলনা, খেলাধুলা, স্কুল, পরিচ্ছন্ন পোশাক, পেট-পুরে খাওয়া, ডাক্তার—এ সমস্তই কেবল ধনীর সন্তানদের জন্য; আর সাধারণ লোকের ছেলেমেয়েরা—যারা তুরস্কের শিশুকুলের বিরাট অংশ—তারা এ সমস্ত হতে বঞ্চিত।

উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক তুরস্কের একজন শ্রমিকের ছেলের কথা। ধরো তার নাম হুসেন। হুসেন বাস করে শহরের গরিবদের বস্তিগুলির মধ্যে একটিতে, যেখানে সারা বছর সূর্যের মুখ দেখা যায় না, যেখানে গ্রীষ্মকালে ধুলোয় দম বন্ধ হয়ে আসে আর শীতকালে চারিদিকে এমন নোংরা যে ঘরের বা'র হওয়া অসম্ভব।

হুসেনের বয়স এগারো। সে একটা কারখানায় দিনে দশঘণ্টা করে খাটে। লোহালক্কড়ের যন্ত্রপাতিগুলি যা নিয়ে কারখানায় কাজ করতে হয়—এত ভারি যে হুসেনের ক্ষীণ বাহুদুটি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে খুব কষ্ট হয়। সে এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যে কাজ করতে করতে তার চোখদুটি আপনিই বুজে আসে, আর তখন বুড়ো সর্দার নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে ছেলেটিকে। হুসেনের কখনো কোনো খেলবার জিনিস ছিল না। তার একখানাও বই নেই। প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়া শেষ হতে না হতেই সে চলে এসেছে কারখানায় কাজ করতে যাতে তার পরিবারের খাওয়াপরার একটু সাহায্য করতে পারে। তার সারাজীবনের মধ্যে দু' তিন কিলোগ্রামের বেশি মাংস খেতে পায়নি। সমস্ত শিশুর মতোই হুসেন চিনি খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু কেবল বড় পালপার্বণের দিনেই একটু খেতে পায়। দশঘণ্টা কাজ করে হুসেন পায় ৪৫ কুর্শ; কিন্তু আধ কিলোগ্রাম রুটিরই দাম ৩০ কুর্শ। সারাদিন খাটুনির পর হুসেন ঘরে আনতে পারে কেবলমাত্র এক কিলোগ্রামের কাছাকাছি রুটি।

এইবার ছোটখাট ঘরোয়া কারবারের একজন শিক্ষার্থী কিরকমভাবে থাকে দেখ। মনে কর, বার বছরের একটি ছেলে জুতোর দোকানে কাজকর্ম শিখছে। মালিক তাকে পয়সাকড়ি কিছু দেয়না। কেবল একটা খোরাকির বদলে সে সারাদিনেরাতে চৌদ্দ পনের ঘণ্টা কাজ করে দেয়। যখন তার বয়স কুড়ি বছর পূর্ণ হবে সে হবে একজন মিস্ত্রি, আর দিনে শতখানেক কুর্শ মাইনে পাবে। আধভাঙা একটা পুরাতন কোঠাবাড়ির অন্ধকার স্যাঁতসেতে একটা খোপের মধ্যে সে তার খুদে মনিবের কাজ করে। ছোকরার যদি ডাক্তার দেখাবার সামর্থ্য থাকত তাহলে ডাক্তার বলত যে তার থাইসিস হয়েছে।

চাষীর ছেলেদের জীবনও ঐ রকম কঠিন আর আনন্দহীন। আহ্‌মেদ —এক গরিব চাষীর ছেলে। আহ্‌মেদের বয়স ন' বছর। তারা অনেকগুলি ভাইবোন ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে আছে মাত্র দুটি—সে আর তার বড় ভাই। আহ্‌মেদের পরনে জামাকাপড় বলে কিছু নেই। জুতো—মানে কাঁচা-চামড়ার একজোড়া চপ্পল তাও নেই। সে সারাবছর খালি পায়েই চলে। ছ বছর বয়স থেকে সে পাহাড়ে পাহাড়ে গরুছাগল চরাচ্ছে—গ্রীষ্মে আগুনের মতো সূর্যের তাপে, শীতে টিপটিপ বৃষ্টি আর তুষারপাতের মধ্যে। পড়া-শোনা কাকে বলে সে তা জানে না—আর জানবেও না। শিগ্‌গির সে মাঠে কাজ করতে আরম্ভ করবে—তার সমবয়সী অন্য ছেলেদের মতো। আহ্‌মেদ জানে মাত্র তিনটি খাদ্যদ্রব্য। ঘোলাটে ঝোল, ভাত আর রুটি। তার জীবনে একবার গ্রামের জোতদারের বিয়েতে সে মাংস খেয়েছে। তিনবার সে চুপি-চুপি মুরগীর ডিম চুরি করে নিয়ে গিয়ে চেখে দেখেছিল। এর জন্য তার বাবা তাকে মেরে আধমরা করে ফেলেছিল। কারণ মুরগী চারটির ডিম ও একটি-মাত্র গরুর দুধ বা মাখন তারা নিজেরা খায়না, নিয়ে যায় বাজারে বিক্রি করতে। বেচে যা পয়সা পায়, তা থেকে কেনা হয় নুন আর কেরোসিন্। দু' বছর বয়স হতেই আহ্‌মেদ ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। তাই ও ওইরকম ক্ষীণজীবী ও হলুদবর্ণ, মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে। কিন্তু ডাক্তার কি, আহ্‌মেদ তা জানে না। তাদের গ্রামে একটা হাতুড়েও নেই।

আমার জন্মভূমি তুরস্ক—এখন পরিণত হয়েছে আমেরিকান সাম্রাজ্যের এক উপনিবেশে। তুরস্কের বড় পুঁজিপতিরা, জমিদাররা আর বড় কর্মচারীরা একে বেচে দিয়েছে আমেরিকানদের হাতে। আমেরিকার ধনপতিরা আর জেনারেলরা তুরস্কে যা খুশি তাই করতে পারে। তারা নিজেদের মালপত্তরে এদেশ একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছে, আর তুরস্কের কলকারখানা, ছোটখাট কারিগরী শিল্প সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দিন দিন বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শ্রমিকদের সন্তানদের রুটির ভাগ ক্রমশ কমে আসছে, বাড়িতে পোড়াবার কয়লা কমে চলেছে। ক্ষুধার্ত শিশুর দল রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। শত সহস্র শিশু সাঁকোর তলায় আর পোড়োবাড়ির মধ্যে রাত কাটাচ্ছে।

মার্শাল প্লান—যা' তুরস্ককে সাহায্যের প্লান নামে এক মহাবিদ্রূপ—তুরস্কের বড় বড় জমিদাররা সেই অভিশপ্ত প্লানের সাহায্যে পেল আমেরিকান ট্রাক্টর। তারা তাড়িয়ে দিল তাদের জমি থেকে হাজার হাজার গরিব চাষীকে যারা এতকাল খেটে খাচ্ছিল এই জমিতে। ভূমিহীন এই চাষীরা এখন বৌ ছেলে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজ খুঁজে খুঁজে। কিন্তু কাজ মেলা প্রায় অসম্ভব। তাই তাদের মুষ্টিভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছু উপায় নেই।

কাতারে কাতারে অনাহারী আর রোগগ্রস্ত চাষীর ছেলে খোলা রাস্তাতেই পড়ে মরছে।

এইরকমভাবে বাস করছে আমার দেশের সাধারণ লোকের ছেলেমেয়েরা ও এইভাবে বাস করছে সমস্ত তুরস্কের মেহনতী জনতা।

কিন্তু এই ভয়াবহ নিঃসম্বল জীবনও তাদের একেবারে নুইয়ে ফেলতে

পারেনি। তুরস্কের লোক লড়ছে শান্তির জন্য, তুরস্কের জাতীয় মুক্তির জন্য, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আর দেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে। শান্তির এই লড়াইয়ে শিশুরাও অংশ গ্রহণ করেছে।

এইরকম এক যোদ্ধার কথা আমি তোমাদের বলতে চাই। এর নাম ইব্রাহিম। পাতলা ছিপছিপে—নীল চোখ একটি ছেলে। তার বয়স ঠিক বছর দশেক। ইব্রাহিমের বাবা বন্দী ছিল আমার সঙ্গে জেলখানার মধ্যে। সে ছিল এক দরজী। ট্যাক্স মেটাতে পারেনি। পাওনাদার যখন তাগাদায় এসেছিল সে দিয়েছিল জখম করে এক কর্মচারীকে। বিচারে তার সাড়ে সাত বছর জেল হয়। আর ইব্রাহিম যেমন করে হোক তার সংসারে কিছু সাহায্য করবার জন্য—তার পীড়িত মা আর ছোট্ট বোনটির জন্য ঢুকেছিল এক কাপড়ের কলে কাজ করতে।

প্রতি সপ্তাহে ইব্রাহিম আসত জেলের মধ্যে তার বাপের সঙ্গে দেখা করতে। আমি ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে ফেলেছিলাম। এক সময় আমি ও ইব্রাহিমের বাবা দুজনেই পীড়িত হয়ে পড়ি। আমাদের রাখা হল জেলের হাসপাতালে। এখানে ইব্রাহিম প্রায়ই আসতে পারত ও অনেকক্ষণ কথাবার্তা কইতে পেত আমাদের সঙ্গে। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সে আমাকে নানারকম কথা জিজ্ঞাসা করত। বিশেষকরে ভালো লাগত তার জানতে কেমনভাবে বাস করে অন্যদেশের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা। আমি তার কাছে গল্প করলাম সোবিয়েত দেশের কথা। কিরকম সুখে বাস করে সোবিয়েতের ছেলেমেয়েরা! বললাম তাকে সেই কথা—কেমন করে শান্তির জন্য লড়ছে মহান্ লোকেরা! একদিন আমি তাকে পড়ে শোনালাম আমার এক কবিতা। সে তখন তখনই সেটা মুখস্থ করে ফেলল।

হাসপাতালে থাকার সময় আমি অনেকগুলি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখি। এগুলি যাতে না নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য নিরাপদে পার করে দেওয়া দরকার। আমাব কবিতাগুলি এ পর্যন্ত বার করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কেমন করে, তা আমি তোমাদের কাছে বলতে পারছি না, কারণ এখনও যে সমস্ত কমরেড্‌রা জেলের মধ্যে আটক রয়েছেন তাঁরা এই উপায় অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু হাসপাতালে সেটা আর সম্ভব হয়নি। ভেবেচিন্তে ইব্রাহিমকে সাহায্যের জন্য ধরা গেল। জেলার ও পুলিস ছোটছেলেদের জেলে ঢোকবার সময় ও বেরুবার সময় তত কড়াকড়ি করে তল্লাস করত না।

আমি ইব্রাহিমকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।

—"ইব্রাহিম"—আমি বললাম,—"কিন্তু যদি তল্লাস করবার সময় এই কবিতাগুলি পায়, তোমাকে গ্রেফতার করবে।"

—"করুক্ গে—"ইব্রাহিম বললে।

—"তোমাকে মারবে আর যন্ত্রণা দেবে।"

—"দিক্ গে!"

—"তোমাকে ছোটছেলেদের জেলখানায় পুরে দেবে; তোমার রোগা মা আর ছোট্ট বোনটিকে উপোস করতে হবে।"

ইব্রাহিম একটু চিন্তা করল। তারপর আমার দিকে বাড়িয়ে দিল কাজ করে করে কড়াপড়া তার ছোট্ট হাতটি।

—"দিয়ে দিন, কাকাবাবু, কবিতাগুলি, ওগুলো অবশ্যই যেমন করে হোক বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার, যাতে ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারে আর যাতে সবাই ওগুলি পড়তে পায়।"

আমি তাকে আমার কবিতাগুলি দিলাম; সেগুলি পৌঁছে গেল যথা-স্থানে। দশ বছরের শিশুকর্মী ইব্রাহিমকে অশেষ ধন্যবাদ; শান্তির সংগ্রামে সে তার যথাকর্তব্য পালন করেছে।

(রুশভাষায় লিখিত শিশুদের মুখপত্র "পাইওনিয়র" জানুয়ারি, ১৯৫২ হইতে।)

অনুবাদকঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ

পুস্তক পরিচয়

বুদ্ধির মুক্তি ও মুক্তির বুদ্ধি

প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খণ্ড)ঃ প্রমথ চৌধুরী॥ বিশ্বভারতী॥ দাম ৬৲॥
শাশ্বত বঙ্গঃ কাজী আবদুল ওদুদ॥ ৮-বি, তারক দত্ত রোড, কলি-১৯॥ দাম ৫৲ ও বাঁধাই ৬৷০॥

'বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে'—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহের' প্রথম খণ্ডের ভূমিকা এই কথা দিয়ে সূচনা করেছেন। বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের জন্ম একটা কম আশ্চর্য ঘটনা নয়। আজকের দিনে অবশ্য এই বিংশ শতকের মধ্যভাগে হঠাৎ 'রম্য-রচনা'র চাহিদা এসেছে, জোগানও বাড়ছে। কিন্তু এ-জাতীয় রচনাবও যে একটা ধারা বাঙলা সাহিত্যে আছে, তা হযতো অনেকের স্মৃতিতে নেই। এ-শ্রেণীর রচনার আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুই বোধহয বলেছিলেন—বাঙলায় 'বেল্ লেতর্স' নেই। ঐ বিদেশী শব্দের অর্থ যা'ই হোক, এ-কথা একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বাঙলায় ইংরেজি 'এসে' ('রচনা')-জাতীয প্রবন্ধ-সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ একজন সমসাময়িক লেখক স্বযং বুদ্ধদেব বসু। আর তিনিও এ-ধারায 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নন, শুভ্র স্নিগ্ধ প্রভাতেরই একটি নতুন ঝলক। বঙ্কিমচন্দ্রেব হাতে আলোচনামূলক প্রবন্ধও সাহিত্য হয়ে উঠেছিল। "কমলাকান্ত" 'রম্য-রচনা' যদি না হয, রম্য ও রচনা। রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত" শুধু 'রম্য-রচনা' বা 'বেল্ লেতর্স' নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেরও অপূর্ব রচনা, এবং সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যেব এক শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এই ধাবাকে যাঁবা নানাদিকে সহজগামী কবে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে আরও কৃতী পুরুষের অভাব নেই। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে একদিকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বর্গীয বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম—যিনি একালের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের গুরু, আব যাঁর প্রবন্ধ হচ্ছে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তেব কথায়—'বাদশাহী হীরা।' ঐতিহাসিক প্রবন্ধকাররা হয়তো স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট ওরূপ দীক্ষাগ্রহণ করতে পারতেন। একালের বম্য-রচনাকাররা অনেকেই এদিকে প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য, একালেব সংবাদ-সাহিত্যিকরাও অনেকেই যেমন তাঁর ছাত্র। তাঁর মন্ত্র কেউ কানে শুনেছেন, কেউ চোখে পড়েছেন, কিন্তু সে মন্ত্র সকলেরই মনে গিয়েছে।

'বিশ্বভারতী' প্রমথ চৌধুবীব এই "প্রবন্ধ সংগ্রহের" প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে ঐ সত্যটি স্মরণ করবাব সুযোগ করে দিয়েছেন অনেককে। আর তা উপলব্ধি কববার অবকাশ দিয়েছেন বাঙালী সকলকে। প্রমথ চৌধুরী শুধু 'বীরবলী ঢঙ্'-এর জন্য নয়, বাঙলাব এক বচনাবীতিব জন্মদাতা হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয। কিন্তু প্রমথ চৌধুবী তা ছাড়াও স্মবণীয় ববীন্দ্রযুগেব বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যের এক জিজ্ঞাসাব প্রবর্তক হিসাবে, লিবারুল চৈতনা ও লিবারুল বৈদগ্ধ্যের পবিচালক হিসাবে। সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত এই "প্রবন্ধ সংগ্রহের" অন্যান্য খণ্ডের জন্য বাঙালী পাঠক তাই সাগ্রহে অপেক্ষা কববে। কাবণ, 'বীরবলের হালখাতা', 'নানাকথা' প্রভৃতি প্রমথ চৌধুবীর

প্রবন্ধ-গ্রন্থসমূহ বহুকাল দুষ্প্রাপ্য। তাঁর অসংখ্য সাময়িক প্রবন্ধ 'বিজলী' প্রভৃতি সম-সাময়িক সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রে ও তার বিশেষ সংখ্যায় এখন বিস্মৃত এবং প্রায় বিলুপ্ত। 'সবুজপত্র' কোনোদিনই সুপ্রচারিত ছিল না, কিন্তু আজ প্রায় তা জনশ্রুতি। এমনকি প্রমথ চৌধুরীর নাম পর্যন্ত তাঁর 'বীরবল' নামের পাঞ্জার জোরেই একালের অনেকের নিকট পরিচিত। অথচ সমস্ত বাঙলা সাহিত্যে 'বঙ্গ দর্শনের' পরে যদি কোনো মাসিকপত্র একটা যুগ-পত্র হবার মতো দাবি রাখে তবে তা 'সবুজপত্র'। অন্যদের সঙ্গে যোগ ছিল হুজুগের, যোগ ছিল না যুগের। তাদের গোষ্ঠী ছিল, কিন্তু ছিল না গায়ত্রী মন্ত্র। তাদের আড্ডা ছিল ('আড্ডা' না থাকলে বাঙলা সাহিত্যের মুখ খোলে না), কিন্তু ছিল না আসর।

'সবুজপত্রে'র মুক্তিমন্ত্র

'সবুজপত্র' বাঙালীর জীবনে উদ্‌গত হয় একটি নতুন ঋক্ নিয়ে—তখন ১৩২১ সাল, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণ, তার মন্ত্র 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য এমন্ত্রকে বেদ থেকে উদ্ধৃত করেন, কিন্তু তিনি এমন্ত্র আহৃত করেছিলেন তাঁর দার্শনিক গুরু বের্গ্‌সঁর থেকে। অবশ্য বুদ্ধি-বিমুখী বের্গ্‌সনীয় প্রাণশক্তিতে তাঁর কতটা বিশ্বাস স্বাভাবিক ছিল এখন মনে হয় তা বিচারসাপেক্ষ। কারণ, তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি ছিল শুধু বুদ্ধিবাদিতার নয়, যুক্তিবাদিতার, এবং মুক্তিবাদিতার। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর সাহিত্যিক দানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এ-গ্রন্থের সরস, উজ্জ্বল ও পরিমিত ভূমিকায় এই কথাটিই নির্দেশ করেছেনঃ '(এই) ঋজু, কঠিন, তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তিনি যা বলেছেন তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তি'। মুক্তির এই বিশেষ প্রস্থানে প্রমথ চৌধুরী যে পথিকৃৎ হয়ে উঠলেন তার কারণ তিনি আবাল্য দেখেছিলেন এই মুক্তিপথদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে—যিনি বুদ্ধিকে একমুহূর্তের জন্যও অস্বী-কার করতে চাননি, অথচ কবি হিসাবে, স্রষ্টা হিসাবে যিনি জন্ম-রোমান্টিক; অর্থাৎ প্রাণলীলার বিমুগ্ধ দ্রষ্টা, জীবনের বিস্ময়-রসের মহারসিক। 'সবুজপত্রে'র আসরে এই জীবনের শঙ্খধ্বনি করে রবীন্দ্রনাথই ডাক দিয়েছিলেন সে-যুগের বাঙালী প্রাণ-স্রোতকে। সে ডাক ছিল মুক্তির ডাক—'মানব অধিকার' বা 'রাইট্‌স অব ম্যান' স্বীকৃতির আহ্বান —ব্যক্তিসত্তার অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা। সৃষ্টির সে কী বিপুল উচ্ছ্বাস সেদিন বাঙলা সাহিত্যে ছাপিয়ে উঠল। 'সবুজপত্রে'র পাতা না উল্‌টিয়ে আজ বাঙালী পাঠক তা ধারণাও করতে পারবেন না। বাঙলা সাহিত্যে মানবাধিকার ঘোষণা—মধ্যযুগের মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের মানসিক-ব্যবহারিক পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—'সবুজ-পত্রে'ই পরিস্ফুট হয়েছে। তার বিশেষ বাণী—ব্যক্তিস্বাধীনতার ও জাতীয়তার, জীবনের গতিবাদিতার ও মানুষের মুক্তিবাদিতার; কিন্তু তার আশ্রয় মধ্যবিত্তের বুদ্ধিবাদ, আর তার আসর বুদ্ধিজীবীর পরিমিত গোষ্ঠী।

মূলের মৃত্তিকা

এই প্রবন্ধ-সংগ্রহের 'সবুজপত্রের মুখপত্র' ও 'সবুজপত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে এখনকার পাঠক দেখতে পারবেন সে-যুগের সেই সৃষ্টি-উৎসবের পিছনকার এই দর্শনঃ 'সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ' (পৃঃ ৩৩)। 'ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে

কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সে আনন্দ হতেই আমাদের নবসাহিত্যের সৃষ্টি' (পৃঃ ৩৫)। 'ইংরেজি শিক্ষার গুণেই আমরা লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধারকল্পে ব্রতী হয়েছি।...যা কালের হিসাবে অতি পুরাতন, তাই আবার বর্তমানে নূতন রূপ ধারণ করে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের আকারগত সাদৃশ্য না থাকলেও অন্তরের মিল আছে' (পৃঃ ৩৫), ইত্যাদি।

"সবুজপত্রে"র বা প্রমথ চৌধুরীর এই জীবন-দর্শনের সমস্ত হিসাব এ কয়টি কথায় পাওয়া যায় না। কারণ, জীবনের তাগিদে ও যুগের তাড়নায় সে চেতনা স্বভাবতই ছিল নানামুখী। তাই "সবুজপত্রে"র পাতায় শুধু মধ্যযুগীয় ভাবধারার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষিত হয়নি, সংগ্রাম ঘোষিত হয়েছিল বাঙলার জমিদারীতন্ত্রের বিরুদ্ধেও—যখন সমস্ত বাঙলা সাহিত্য ছিল ও-বিষয়ে নির্বাক এবং রায়তের প্রতি বিরূপ (প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' এখনো দুর্লভ নয়, কিন্তু 'সবুজপত্রে' হৃষীকেশ সেনের প্রবন্ধাবলী আজ বিস্মৃত)। প্রমথ চৌধুরী একাধারে ছিলেন বের্গ্‌সনীয় গতিবাদী আবার বুদ্ধিবাদী এবং কতকটা বাস্তববাদীও। ঔপনিবেশিক সমাজের এমনি অষ্টাবক্র-দশা যে, তার যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদীরাও মুক্তির সাধনায় ভাববাদের কুয়াশা কাটিয়ে (যেমন বের্গ্‌সনীয় গতিবাদ) বাস্তববাদকে আশ্রয় করেন না; তাই তাঁরা যথার্থ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী বা বুর্জোয়া মতাদর্শের সুস্থির সমর্থকরূপে দাঁড়াতে পারেন না। অন্যদিকে, যতটা তাঁরা জ্ঞানকাণ্ডের সাধক, ততটা কর্মকাণ্ডের সাধক হয়ে উঠতে চান না। যতটা মনের মুক্তি কামনা করেন, ততটা মুক্তির বাস্তব-রূপ বোঝেন না। যতই বিজ্ঞান ও ইতিহাসের চর্চায় মানুষ সম্বন্ধে ও বিশ্ব সম্বন্ধে 'বড়াই বুড়ির কথা'র প্রভুত্ব থেকে নিষ্কৃতিলাভের আশা ঘোষণা করুন ('রামমোহন রায়'), বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ-আয়োজনে, শিল্পে-সংগঠনে ততটা উৎসাহবোধ করেন না এবং ইতিহাসের কাছ থেকে সমাজের আর্থিক-রাষ্ট্রিক উপযোগের মূল্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হন না। 'সিবিল ও রিলিজিয়াস্ লিবার্টির' আশ্রয়েই প্রত্যেক জাতি মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়, এ সত্য তাঁদের কাছে যত স্পষ্ট ('রামমোহন রায়'), কোন্ আর্থিক ভিত্তির উপরে সেই 'মানুষের অধিকার' বা 'রাইট্‌স অব ম্যানকে' দাঁড়াতে হয় তা বিচার করতে ততটা তাঁরা ইচ্ছুক নন। বুদ্ধিই তাঁদের কাছে থাকে মৌলিক সত্য, বাস্তব-জীবনের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বুদ্ধিরও মুক্তি ঘটে তা এই বুদ্ধিজীবীরা অনুধাবন করেন না। সাম্রাজ্যবাদী যুগে ইউরোপের বৈশ্য সমাজকে (বুর্জোয়াদের) তাঁরা শ্রদ্ধা করতে পারেন না—এ খুবই ঠিক; কিন্তু মুশকিল এই যে, ইতিহাসে বৈশ্যের স্বরূপও তাঁরা বুঝতে অক্ষম। 'ম্যাস-মাইণ্ডে'র প্রতি যতটা অনাস্থা ঘোষণায় তাঁরা নিঃসংশয় ('সবুজপত্র'; ভাদ্র, ১৩৩২), 'ম্যাস' বা জনশক্তির সৃষ্টিশক্তি ছেড়ে, তার কর্মশক্তিতেও, তার একাংশ আস্থা তাঁদের নেই। জনশক্তির সঙ্গে সম্পর্কের অভাবেই 'সবুজপত্র' ও তার বুদ্ধিজীবীরা যেন আকাশবাহী শূন্যলতা, তাদের মূলে যেন মৃত্তিকা বেশি নেই।

সেই সীমাবদ্ধ ও বিকারগ্রস্ত জীবনযাত্রার মধ্যেও তথাপি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর যোগ্যতম সহকারী স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী ও বিলুপ্ত 'সবুজপত্র' যে একটি গভীর ও ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন তা শুধু সাহিত্যিক নয়, তা জাতীয় এবং বহুদিকে এখনো সক্রিয়। 'সবুজপত্র' মূলহীন ছিল না, তাই মূল্যহীনও হয়নি। 'সবুজপত্রের' আসরের একটি কানাত তুলে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তার ঘরোয়া ব্যবস্থার একটি শান্ত

স্থির কোণকে বাঙালী পাঠকের দৃষ্টির গোচরীভূত করেছেন (লেখকের অহমিকা বিনয়ী-রূপে বা বিজয়ী-রূপে তাতে আত্মপ্রকাশ না করাতে "চলমান জীবন"-এর সে অংশ উপাদেয় ও আকর্ষণীয় হয়েছে)। বাঙালীর আধুনিক সাংস্কৃতিক জীবনের ও সাহিত্যিক ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় পর্ব 'সবুজপত্রে'র আসর। প্রমথ চৌধুরীর 'ঋজু, তীক্ষ্ণ, কঠিন ভঙ্গি' সেখানে স্নেহে-সৌহার্দে-সহৃদয়তায় সকলকে অভিষিক্ত করত। 'সবুজ-পত্রে'র রূপ, তার স্বাদগন্ধ যখন দুর্লভ হয়ে উঠেছে তখন প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধাবলী থেকেই পাঠক তাঁর দান বুঝতে ও তাঁর স্বরূপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন।

ঠিক এই কারণেই দুটি নিবেদনও আছে প্রকাশকের নিকট। প্রথম কথা, সাহিত্য-রসিকদের জন্যই মুখ্যত প্রমথ চৌধুরীর রচনা, তাতে ভুল নেই। কিন্তু সম্পাদন-কালে যদি এখন কোনো অংশ বর্জন বাঞ্ছনীয় মনে হয় (যেমন 'রামমোহন' প্রবন্ধের একটি অংশ বর্তমান সংগ্রহে বাদ দেওয়া হয়েছে) তাহলে তা পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করে বর্জনের কারণ উল্লেখ করা সমীচীন। (অন্তত, 'সবুজপত্র', আষাঢ়, ১৩২৭-এর ১৫১-৫৩ পৃষ্ঠায় 'জয়দেব' প্রবন্ধটিতে লেখকের যে ভূমিকা ছিল, তা নানা কারণেই ঐ প্রবন্ধের সঙ্গে, তার ভূমিকা বা পাদটীকা রূপে স্থানলাভের যোগ্য। লেখা হিসাবে ও তথ্য হিসাবে ওটি আদরণীয় জিনিস।)। দ্বিতীয় কথা, প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র রচনা প্রকাশেরই আমরা পক্ষপাতী। বৈষয়িক কারণে তা সম্ভব না হলে সযত্নে তাঁর রচনার একটি সাদর্শ সূচী কি বিশ্বভারতী প্রকাশ করতে পারবেন না?

সতীর্থের স্বীকৃতি

প্রমথ চৌধুরীর পাঠকমাত্রই জানেন যে, তাঁর বিদগ্ধ মন ছিল বুদ্ধিবাদিতার গৌরবে ও গর্বে দৃপ্ত। কিন্তু সাহিত্যের নবাগত অনুজকেও তিনি যেরূপ সস্নেহে সংবর্ধনা করতে উৎসাহী ছিলেন, তাতে অনেকেই বিস্মিত হবেন। অনেকেই জানেন, তিনি হিন্দু-মুসলিম সমস্যায় কলহপ্রবণ না হলেও মুসলমান নেতাদের প্রতি বিদ্রূপে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কিন্তু সেদিনের 'সওগাত' থেকে তিনি সানন্দে প্রবন্ধ উপহার দিয়ে নব-প্রকাশিত 'মোস্‌লেম ভারত'কে (মৌঃ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত) সংবর্ধনা জানান। তিনি এ বিষয়ে 'সম্পূর্ণ একমত' যে 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রকৃতপক্ষে সাধিত হবে বঙ্গ-সরস্বতীর ক্ষেত্রে' ('সবুজপত্র'; জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭)। সে উপলক্ষে তিনি তাঁর সগোত্রীয় আর-একজন লেখককেও 'সবুজপত্রে'র পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত করেনঃ 'সাহিত্য বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে, 'মোস্‌লেম ভারতে' একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের 'সাহিত্যিক সাধনা'র মহাগুণ এই যে, উক্ত প্রবন্ধটিতে বিষয়টিকে নানা দিক থেকে দেখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিচার করাও হয়েছে। এহেন সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাঙলা মাসিকপত্রে নিত্য চোখে পড়ে না।..প্রবন্ধ লেখকের বেশির ভাগ মত আমি খাঁটি বলে মেনে নিই।' ('সবুজপত্র', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭)। প্রমথ চৌধুরী তারপরে বিশেষ করে সুখ্যাতি করেন লেখকের তর্জমা-কুশলতার—সোস্যালিজম্‌-এর প্রতিশব্দ 'সমূহবাদ'-এর ও 'সেণ্টিমেণ্টালিজম্‌'-এর প্রতিশব্দ 'ভাব-বিলাস'-এর। যাঁরা পরবর্তীকালে কাজী আবদুল ওদুদের 'কবিগুরু গ্যেটে' গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাঁরা ওদুদ সাহেবের অনুবাদ-কুশলতায় নিশ্চয়ই তৃপ্ত হয়েছেন। আর যাঁরা বর্তমান গ্রন্থ—'শাশ্বত বঙ্গ' নামক ৫০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ প্রবন্ধ-সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করতে পারছেন, তাঁরা ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রমথ চৌধুরী সংবর্ধিত সেই কাজী আবদুল ওদুদের গত পঁচিশ বৎসরের চিন্তা ও মনস্বিতার

শুধু সুস্থির স্বাক্ষরই পাবেন না, সেই সাহিত্যরসিক জিজ্ঞাসু মনের বেদনা-আনন্দমথিত ক্রমপরিণতিরও একটি পরিচয়ও লাভ করবেন। হয়তো কাজী সাহেবের শত আশাবাদিতা সত্ত্বেও মনের অগোচরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও তাঁদের পড়বে—যেমন তা পড়ত নিশ্চয়ই মনের সম্পূর্ণ গোচরে লর্ড কার্জনের প্রতি 'খোলা চিঠি'র লেখক প্রমথ চৌধুরীর। শাশ্বত বঙ্গ আজ দ্বিখণ্ডিত বঙ্গ।

কাজী আবদুল ওদুদ ও লিবারল ঐতিহ্য

অবশ্য কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর আপাতদৃষ্টিতে মিল সামান্য। কারণ, যে বিদগ্ধ রসিকতা, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ প্রমথ চৌধুরীর নামের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছে কাজী সাহেবের রচনার তা বিশেষ ধর্ম নয়। 'বীরবলী ঢঙ' হয়তো কাজী সাহেব গ্রহণও করতেন না, কারণ তাঁর আদর্শ হত আবুল ফজল বা ফৈজী,—বীরবল নয়। রচনা-রীতিতে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি হচ্ছে স্পষ্টতার, প্রাঞ্জলতার, দৃঢ়নিবদ্ধ এবং স্থিরগতি যুক্তির প্রবাহের। কিন্তু দু'জনার এ বিভিন্নতা হচ্ছে মেজাজের ও চালের, মনের ও মতের মিল তাঁদের ততোধিক পরিষ্কার। সেদিক থেকে কাজী আবদুল ওদুদ প্রমথ চৌধুরীরই সগোত্র এবং সতীর্থ। উভয়েই বাঙলা সাহিত্যের ও বাঙালী জাগরণের সেই ঐতিহ্যে মানুষ যে ঐতিহ্যের নাম দেওয়া যায় রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের ধারা; আর দু-জনেই সেই তীর্থের সহযাত্রী যে তীর্থকে পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকের ভাষায় বলা যায় 'লিবারালিজম্'-এর পুণ্যক্ষেত্র। তাঁদের এই লিবারালিজম্-এর বা উদার মহাদর্শের প্রধান নীতি ছিল বুদ্ধিবাদিতা, মানবতায় বিশ্বাস, গতিবাদ ও সৃষ্টিধর্মে অনুরাগ। অবশ্য, সৃষ্টিধর্ম বলতে তাঁরা দু-জনাই প্রধানত বুঝেছেন মানস-সৃষ্টির কথা—বিশেষ করে লিবারল এডুকেশন, সাহিত্য ও শিল্পকলার কথা। ব্রিটিশ লিবারালিজম্‌ও যে আসলে একটা সমাজ-নিরপেক্ষ ভাবধারা নয়, এ-কথাটি তাঁদের নিকট সুস্পষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ। সেই উদার ভাবধারা বাঙলা দেশের শিক্ষিত মানুষকে উনিশ শতকে কতকাংশে চিন্তায় ও ভাবনায় মুক্তিদান করেছিল; অথচ জীবনযাত্রায় সেই শিক্ষিত শ্রেণী ছিল সাম্রাজ্যবাদী 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার' নিগড়ে রুদ্ধগতি—এই দৈবত সত্য আমরা জানি। তার জটিল ফলাফলও বাঙালী জীবনে আজ আমাদের অবিদিত নেই। আরও দুর্দৈব এই যে, এই 'লিবারল' ভাবধারা ঊনবিংশ শতকের মুসলিম বাঙালী সমাজে বিস্তারলাভ করবার সুযোগ পায়নি। কেন পায়নি, কাজী আবদুল ওদুদ গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্বচ্ছ যুক্তির সহায়তায় তা ব্যাখ্যা করেছেন। সম্ভবত, কেউ তাঁর সে বিশ্লেষণে আপত্তি করতে পারবেন না। আপত্তি করবেন তবু একটি মূল তত্ত্বে—সাম্রাজ্যবাদী শাসন যে নানা সূত্রে মধ্যযুগের ধর্মগত বিভেদকে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় বিচ্ছেদেও পরিণত করে, এ সত্যে কাজী সাহেব তত গুরুত্ব দান করেননি। সে যা-ই হোক, বাঙালী মুসলমান সমাজে আমরা সাধারণভাবে লিবারল চেতনার ও যুক্তিবাদের পরিচয় উনিশ শতকে পাই না। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যেও তাঁদের আবির্ভাব তাই ব্যাহত ও বিলম্বিত হয়ে গিয়েছে। চিন্তাশীল ও সাহিত্যিক মন নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে সম্ভবত প্রথম বাঙালী মুসলমান উদিত হন—কাজী আবদুল ওদুদ, সেই লিবারল ঐতিহ্যের আর এক সাহিত্যিক।

'লিবারল' বক্তব্য ও বিচার-ধারা

কাজী আবদুল ওদুদ শুধু সাহিত্যানুরাগী নন, তিনি সাহিত্য-বিচারকও। রবীন্দ্রনাথ,

ইকবাল, নজরুল, শরৎচন্দ্র থেকে মধুসূদন, বঙ্কিম, গ্যেটে, কালিদাস পর্যন্ত তাঁর কাব্যদৃষ্টি সুবিস্তৃত। এবং যত বিরোধী হোক সে কবির মতাদর্শ, কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্য-বোধ ও উদাব দৃষ্টি সে বাধা উত্তীর্ণ হযে তার রস গ্রহণ করতে সক্ষম : সাহিত্য-বিচারে তাঁর উদার মূল্যবোধ অনালোড়িত, সুস্থির, স্বচ্ছন্দ। ইকবাল ও নজরুল, গ্যেটে ও ববীন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখার আলোচনাই তাই সরস ও বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল।

স্বভাবতই বাঙালী পাঠক এই প্রায পঁচাত্তরটি প্রবন্ধের মধ্যেও বিশেষ মূল্যবান মনে করবেন কাজী আবদুল ওদুদের লেখা বাঙলা মুসলিম সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা, সে-বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ; 'বাঙলার মুসলমানের কথা' ও 'মুসলমানেব কথা' এবং সেই প্রসঙ্গে 'বাঙলার জাগরণ' ; 'বাঙলা সাহিত্যে জাতীয়তাব আদর্শ", বাঙলাব হিন্দু-মুসলমান বিরোধেব পটভূমিকার বিশ্লেষণ, বাঙালী জাতীযতার এই ব্যর্থতার প্রতিকাব-চিন্তা। এই সব আলোচনা যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর। তাব প্রত্যেকটি তত্ত্বের সঙ্গে হয়তো সকলে একমত হবেন না, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু ওদুদ সাহেবের প্রধান বক্তব্য ও তাঁর বিচার-ধাবাকে শ্রদ্ধা না করে এবং বহুলাংশে স্বীকার না করে কে পারবে ? এই প্রধান বক্তব্য অবশ্য অতি-সরলীকরণ না করে বলা যেতে পারে—বিকাশধর্মে বা সৃষ্টি-ধর্মে আস্থাঃ 'খুব ঘোরালো না করে সহজভাবে বলা যায়—জ্ঞান ও কর্মেব ক্ষেত্রে মানুষের যে অন্তহীন কৌতূহল সেইটি তাব সৃষ্টিধর্ম' ("ব্যর্থতার প্রতিকার", পৃঃ ১৯৪) ; 'জীবনের সার্থকতা ধর্মবোধে—অর্থাৎ সত্যে অথবা কোনো আদর্শে সমর্পিতচিত্ততায়।.. যদি ধর্মকে চিরস্থির বিধানরূপে গণ্য না কবে আবিষ্কারের বিষয়রূপে ভাবা যায়, তাহলে ধর্মগ্রন্থ মহাপুরুষ হবেন জগতেব চিন্তাশীল ও তাঁদের বাণীর মত মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু —তার পূজা-আরতির বস্তু নয়।' (ঐ, পৃঃ ১৯৫)। 'বিচারবুদ্ধি আর জাতীয়তাবোধ আমাদের অবলম্বন হোক।' ("ভাবতের জাতীয় আদর্শ" ; পৃঃ ১৪৭)। 'নব-বাঙ্গালীত্বের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র—এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই।...কিন্তু সমগ্রভাবে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি মহান বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হবাব সামর্থ্য তাঁব ছিল না। যাকে বলা যেতে পারে সুব্যবস্থিত বীর্যবন্ত জাতীয় জীবন, তাব আয়োজন একালেব বাংলার সাহিত্যে ও জীবনে কম হযেছে, আমরা দেখেছি।' ("বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ", পৃঃ ২৩০-৪২)। এ ছাড়া "হিন্দুজাগরণ", মুসলমান সমাজে মোতেজালা যুক্তিনিষ্ঠা, সুফী প্রভাব ও ওহাবী-আন্দোলন প্রভৃতি সম্বন্ধে যেসব তথ্য ও বিশ্লেষণ তিনি উপস্থিত করেছেন তা'ও যেমন যথার্থ তেমনি যুক্তিপূর্ণ। সে লোককে শুধু একেলে ভাষায় 'লিবার্‌ল' বলাই যথেষ্ট হবে না যিনি মুসলমান-সমাজে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মন-প্রাণ-বুদ্ধি সমস্ত দিয়ে সংগ্রাম করেছেন এই আদর্শেব জন্য এবং শেষ পর্যন্তও পরজায় স্বীকাব করেননি। বাঙালী মুসলমান-সমাজে এই সংগ্রাম অভিনব। এবং বাঙলা সাহিত্যের পরম গৌরবের কথা যে, একজন সাহিত্যিক জাতীয-জীবনের ঘোর সমস্যায় একবাবেব জন্যও বিচলিত হননি—না মুসলমান সাম্প্রদাযিকতায, না হিন্দু-জাতীয়তার বিভ্রান্তিতে। শাশ্বত হোক এই সংগ্রামের ঐতিহ্য—বাঙালীর হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকের জীবনে।

উদারতার অসম্পূর্ণতা

সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রশ্ন জাগে এই নির্ভয উদার আদর্শ কেন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পাবল না বাঙালীর জীবনে ? অসংখ্য কার্যকাবণের সংঘাতেই অবশ্য এই আদর্শের সংগ্রামে কাজী

আবদুল ওদুদেরা এখনকার মতো পরাজিত হয়েছেন—হিন্দুও তাঁদের আদর্শ জীবনে গ্রহণ কবতে পাবেনি, মুসলমানও তা গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। কিন্তু তাই বলে এই আদর্শের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে, তা'ও বিস্মৃত হবার উপায় নেই। কামালের তুর্ক-জাগরণের প্রভাবে বাঙালী মুসলমানের সম্মুখে একটা আশার আলো জ্বলে ওঠে। সেদিন কামালের আদর্শকে সম্মুখে রেখে কাজী সাহেব ও তাঁর মুসলিম বন্ধুরা ঢাকায় স্থাপন কবেছিলেন একটি নতুন সমিতি যার নাম 'বুদ্ধির মুক্তি'। তার আদর্শ অনেকাংশেই ছিল যুক্তির সাহায্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা—ব্যক্তিস্বাধীনতা ঘোষণা। এ সমিতি আলোড়ন তুলেছিল বুদ্ধিজীবীর সমাজেই—বৃহত্তর মুসলমান জন-জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কস্থাপন সম্ভব হয়নি। জনতার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিযেই যে বুদ্ধিবাদীরও মুক্তি,—বুদ্ধিরও পরীক্ষা এবং মুক্তি যে সেই ব্যবহারিক জীবনের ক্রিযা-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই,—এ চেতনা তখনো সেই মুসলিম বুদ্ধিজীবী বিদ্রোহীদের মনে সুদৃঢ় ছিল না। অর্থাৎ তাঁরাও 'সবুজপত্রে'র বা অন্যান্য লিবারুলদের মতো জানতেন —বুদ্ধিই মূল কথা, আদর্শের সংগ্রামে বুদ্ধিই চূড়ান্ত। কিন্তু একথা আজ স্পষ্ট—মুক্তি শুধুমাত্র বুদ্ধির এই প্রয়াসেই আয়ত্ত হয় না, আয়ত্ত হয় সমাজশক্তির স্ফুরণে। সেই সমাজশক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই চেতনাও একটা বড় প্রেরণা এবং প্রধান আশ্রয়; কিন্তু মূল প্রেরণা আরও বাস্তব—জনশক্তির বিকাশ, বিদ্রোহ, বিপ্লব। শুধু বুদ্ধির উপর নির্ভব করে বুদ্ধিবাদী যে তাঁব অভীষ্ট ক্ষেত্রেও উত্তীর্ণ হতে পাবেন না, তার প্রমাণ এ-যুগের ইতিহাসেব পাতায় পাতায়। 'বুদ্ধির মুক্তি'র উপর এরূপ একপেশে ভরসা না রাখলে বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিবাদী বুঝতেন—মুসলমান-জগত যদি বুদ্ধির মুক্তির সাধনা করেন তাহলে কামালের পথে না চলে তাঁদের চলতে হবে মধ্য-এশিয়ার তাজিক-কিরগিজ-উজ্‌বেকদের গণনেতৃত্বের পথে। তাঁরাই মুসলিম জগতে এ-যুগে মুক্তিপথের অগ্রদূত।

যুক্তিবাদের সুস্থ ঐতিহ্য

আসলে বুদ্ধির মুক্তি একটা একান্ত বা অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট সাধনা নয়; দশজনের জীবনের সঙ্গে জীবন মিশিয়েই বুদ্ধিবাদীকেও তা অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির মুক্তি আসলে মুক্তির বুদ্ধিরই সঙ্গে জড়িত এবং জড়িত তাই সামাজিক মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে। প্রমথ চৌধুরী ও কাজী আবদুল ওদুদের মতো যুক্তিবাদীদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল বুদ্ধিজীবী সমধর্মীদের চক্রে; সৃষ্টিধর্মী জনশক্তির দিকে তা প্রসারিত হয়ে যায়নি।

এদিকে, সংকীর্ণ বুদ্ধিবাদের নিষ্ফলতা সংকীর্ণ বুদ্ধিজীবীদের নিকটও একালে সুস্পষ্ট। তাঁরা তাই বুদ্ধির পথ ত্যাগ করে গ্রহণ করেন হয় নির্বোধ কথাব চমকের ও চালাকির পথ; নয় গ্রহণ করেন অলৌকিক ও অতিস্থূল রহস্যবাদেরই আশ্রয়। ইউ-বোপের এ-ধরনের আত্মনাশী বুদ্ধিজীবীদের আশ্রয় আজ ক্যাথলিক ধর্ম; ভারতবর্ষে গুরুবাদ, অবতারবাদ। প্রমথ চৌধুরী ও কাজী আবদুল ওদুদের মতো মনস্বীরা তা দেখেই আরও বেশি করে মনে কবেন—মনের মুক্তিই প্রথম ও পরম সাধনা। কিন্তু যত অসম্পূর্ণ হোক তাঁদের এই বুদ্ধিবাদিতা, তাঁদেব মুক্তিবাদী ও গতিধর্মী চিন্তার এই ঐতিহ্য এ-কালের বুদ্ধিজীবীদেব পক্ষে একটি সুস্থ প্রেরণাব উৎস—যখন অলৌকিকতায় শিক্ষিত মানুষ খোঁজে আত্মার স্বস্তি, অশ্রুপ্লুত গদ্‌গদভাবেই দেখে প্রাণাবেগের বা প্যাশানেব প্রকাশ, সুস্থ কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জনকেই মনে করে ভক্তি।

গোপাল হালদার

আত্ম-পরিচয়

বাঙালীর ইতিহাস (কিশোর সংস্করণ)ঃ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের মূল গ্রন্থ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত। বুক ওয়ার্লড্ লিঃ। ৫, হেস্টিংস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম—চার টাকা।

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব" আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস-সাহিত্যে একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট আর মূল্যবান সংযোজন। বাঙলা দেশের আর বাঙালীর আদি-ইতিহাস সম্বন্ধে এমন তথ্যসমৃদ্ধ আর প্রায় সর্বদিক থেকে এমন সুসম্পূর্ণ বিবরণ বাঙ্লা ভাষায় আমরা ইতিপূর্বে পাইনি বললেই চলে। উত্তরে হিমজঙ্ঘাশ্রয়ী দুর্জয়লিঙ্গ থেকে দক্ষিণে সাগরচুম্বিতা তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল যে বঙ্গদেশ, সেই দেশের আদি-অধিবাসীদের বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচয় থেকে শুরু করে তাদের জাতীয় বিবর্তন, রাষ্ট্রপরিচয়, ধনোৎপাদন, দৈনন্দিন জীবন, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, মানসিক জীবন ও ধ্যানধারণা, জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি—ইত্যাদি সব কিছুর বিস্তৃত আর তথ্যবহুল বর্ণনা দিতে গিয়ে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এই বইটিতে যে বিরাট পরিশ্রমসাপেক্ষ অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়েছেন তা নিজের দেশের অতীত-উদ্ধারের একটা মস্তবড়ো উদাহরণ হিসেবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

স্বভাবতই বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায় আর বহুল তথ্যের সমন্বয়ে মূল বইটি বৃহদাকার এবং দুর্মূল্য। ইতিহাস-জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের জন্য বইটির একটি সহজ সংক্ষিপ্ত আর সুলভ সংস্করণের চাহিদা পাঠকসাধারণের পক্ষ থেকে বরাবরই ছিল; লেখক নিজেও সে প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজটি ক'রে দেশের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকদের এক মস্তবড়ো উপকার করলেন। যদিও তিনি এই সারসংকলনের নাম দিয়েছেন "কিশোর সংস্করণ" কিশোর-বয়সী পাঠকদের কথা আর তাদের গ্রহণক্ষমতার কথা মনে রেখে, তবু ডক্টর রায়ের মূল গ্রন্থের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি পরিণত-বয়সী পাঠকসাধারণেরও যে সমান কাজে লাগবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ডক্টর রায়ের মূল গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বা 'অ্যাড্ভান্সড্' ইতিহাস-পাঠকদের জন্যে লেখা। তাই সেখানে স্বভাবতই একটু বেশিরকম তথ্যের খুঁটিনাটির সমাবেশ, সন-তারিখের বিতর্কে সূক্ষ্ম যুক্তিবিস্তার। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে মূল গ্রন্থটি একটু ভারি বলে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি সে সব দিক থেকে ভারমুক্ত। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বচ্ছ, সহজ, সাবলীল আর কাব্যমাধুর্যস্নিগ্ধ ভাষার গুণে বাঙালীর ইতিহাস গল্পের মতোই সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

'বাঙালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব'-গ্রন্থের বিষয়বস্তু তার নামেই স্বপ্রকাশ। কিন্তু ডক্টর রায়ের এই ইতিহাস গ্রন্থের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা আছে। তিনি যে ইতিহাস লিখেছেন তা এই সুচিরকালের বাঙলাদেশের জনসাধারণের ইতিহাস; তাদের লৌকিক দৈনন্দিনতা, তাদের লোকায়ত ধ্যান-ধারণা-মানস, সাধারণ মানুষের সৃষ্টিশীল শ্রমের লৌকিক আর মানস সম্পদ উৎপাদনের ইতিহাস। চর্যাপদে যে বাঙালী সিদ্ধাচার্য-দের আশ্চর্য কবিত্বের প্রকাশ, মীমাংসাশাস্ত্রে যে বাঙালী দার্শনিকদের প্রতিভার পরিচয়, পাহাড়পুরের সোমপুরী-মহাবিহারের গায়ে পোড়ামাটির শিল্পশ্রীতে আর যুগ যুগ ধরে পটচিত্রে আল্পনায় যাত্রায় লোকসঙ্গীতে যে বাঙালীর আশ্চর্য রূপসৃষ্টিশীলতার পরিচয়

—সেই বাঙালী জনসাধারণই আসলে ডক্টর রায়ের এই গ্রন্থের নায়ক। রাজারাজড়াদের বংশপরিচয় আর তাদের রাজত্বকালের তালিকা এ গ্রন্থে যে নেই তা নয়, কিন্তু তারা যে আসলে ইতিহাসের ধারক ও নায়ক নয় সে কথাটা এই বইয়ে সুস্পষ্ট—যদিও, মূল বইয়ের সীমাবদ্ধতার দিকটাও মনে রাখা দরকার: এমন গভীর পাণ্ডিত্যভরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংগৃহীত তথ্যবহুল ইতিহাস-বর্ণনায় কোনো শ্রেণীগত বিশ্লেষণ বা 'ক্লাস-অ্যাপ্রোচ্' যে একেবারেই নেই, এটা একটা মস্তবড়ো ক্ষোভের কথা। এর অভাবে ডক্টর রায়ের বইটি দৃষ্টিভঙ্গিহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তবু, তাঁর এই চেতনার প্রকাশ বইটিতে আগাগোড়াই আছে যে ইতিহাসের যথার্থ নায়ক সেই বিপুলজনতা যারা চিরকাল দাঁড় টানে, হাল ধরে থাকে, মাঠে মাঠে বীজ বোনে, ধান কাটে, নগরে প্রান্তরে যাদের পেশীবহুল বাহুর শক্তি অবিরাম নতুন নতুন সৃষ্টির দিগন্তকে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনিতে মন্দ্রিত করে তোলে। দেশের সেই সাধারণ মানুষের প্রতি এক নতুন চেতনা আনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ডক্টর রায়ের এই বইটি, যার প্রতিটি ছত্র দেশের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার স্পর্শে উজ্জ্বল।

সংকলক তাঁর ভূমিকায় বলেছেন: "বাংলাদেশের ইতিহাস যে এত হৃদয়গ্রাহী, এত কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে, 'বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব' পড়ার আগে আমার মতো অনেকেরই বোধহয় তা জানা ছিল না। বাংলাদেশকে আরও বেশি ভালবাসতে, আরও গভীরভাবে জানতে এই বই আমাকে প্রেরণা দিয়েছে।" এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি পড়ে কিশোর পাঠকদের মনেও যে সেই প্রেরণা সংক্রামিত হবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রবীন্দ্র মজুমদার

সংস্কৃতি সংবাদ

চিত্রপ্রদর্শনী: গোপাল ঘোষ ও নরেন্দ্র মল্লিক

গোপাল ঘোষের চিত্রপ্রদর্শনী কলকাতার শিল্পরসিক জনসাধারণের কাছে একটি অবশ্য-দ্রষ্টব্য বার্ষিক অনুষ্ঠান। প্রতিবারই তাঁর আঁকা ছবির মেলায় গিয়ে সুন্দর আর নতুন রকমের শিল্পরসাস্বাদনের আনন্দ পাওয়া যায়। বাঙলার—এবং ভারতের—অপেক্ষাকৃত নতুনতর শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা আপন শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, গোপাল ঘোষ নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন।

সদর স্ট্রিটে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এর সালে অনুষ্ঠিত তাঁর এবারকার প্রদর্শনীতে আশিটিরও বেশি ছবি উপস্থিত করা হয়েছিল যার মধ্যে প্রায় সবগুলিই ল্যান্ড্স্কেপ্। কোনোটি জলরঙে আঁকা, কোনোটি টেম্পেরায়। প্যাস্টেল্ও ছিল কয়েকটি। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটিই আশ্চর্য আর বিচিত্র রঙের সমারোহ-সুষমায় কল্পনামণ্ডিত।

মৌলিক আর নিপুণ রঙের প্রয়োগে প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই যেন এক নতুন বর্ণবহুল রূপলোকের পরিচয় উদ্ভাসিত। গোপাল ঘোষের ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার রঙ। দেখতে দেখতে মনে হয়, প্রত্যেকটি রচনার সমস্ত চিত্রপরিকল্পনাটাই যেন প্রধানত রঙ-নির্ভর। রঙের মারফত বিষয়বস্তুতে অনাড়ম্বর অথচ সূক্ষ্ম একটি ব্যঞ্জনা এনে দেওয়া গোপাল ঘোষের এক অপূর্ব কৃতিত্ব। ছবিতে যেটুকু দেখানো হল, তার চাইতেও যেন অনেক বেশি কিছু দেখাব আছে—দর্শকের সেই রোম্যাণ্টিক কল্পনাকে জাগিয়ে তুলতে পারেন বলেই গোপাল ঘোষের ছবিব আবেদন আমাদের মনকে এতটা আচ্ছন্ন করে। চিল্কার হ্রদের তীরে আসন্ন সন্ধ্যার আলো-আঁধারিটুকু নীল-সবুজ-পীত রঙের নানান্ শেড্-এর মেশামেশিতে অপরূপ মায়াময়। গোপালপুরের সমুদ্রের উদ্দাম ঢেউ ভেঙে পড়ছে বুপোলি বর্ণলীলায়। শুক্‌নো বালিয়াড়িব হাল্‌কা-হলুদ বুকে নুলিয়াদের ছোট ছোট নৌকোগুলিব কালো-বাদামি বিন্দু। হিমালয়ের কোলে গোলাপি-সুনীল মেঘলোকের স্বপ্নে উধাও লামাদের গ্রাম। নানান্ রঙের নানা টোন্-এ মেশামেশি দূর আকাশের নিচে চিকণ-স্নিগ্ধ রেখায সুবর্ণরেখার বিস্তার। নীলাম্বুরাশিব অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্র-মুখরা আর গিরিশৃঙ্গমালাব নহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না আমাদের ভারতবর্ষের এই মাঠ-ঘাট-প্রান্তব, নদী-সমুদ্র-পর্বতেব যে এমন আশ্চর্য রূপবৈচিত্র্য, এতো অজস্র যে তার লীলা-সৌন্দর্য—সে কথাটা যেন বারবাব নিবিড়ভাবে আর নতুনভাবে অনুভব করি গোপাল ঘোষেব আঁকা এই দৃশ্যচিত্রগুলিব সামনে দাঁড়িয়ে। গোপাল ঘোষ নিঃসন্দেহে রোম্যাণ্টিক—যে-রোম্যান্সের জন্ম প্রকৃতির মধ্যে নিত্যনতুন রূপাবিষ্কারেব বিস্ময়বোধ থেকে। এবং এ রোম্যাণ্টিকতা মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ। দেশের প্রাকৃতিক রূপসমারোহেব প্রতি ভালোবাসার মুগ্ধতায় ভরা এই সব ছবির ভাবঘন আনন্দময় আবেদন, ছন্দ-রচনায ভারসম মাধুর্য আর রঙের ব্যবহাবে শিল্পীর নিজস্ব অভিনবত্বে দর্শকমাত্রেই আবিষ্ট হয়েছেন।

কযেকটি ছবিতে কিন্তু অতিরিক্ত রকম স্বপ্রধান রঙের উচ্ছ্বাস আছে। মনে হয়েছে, বিষয়বস্তুকে ছন্দোময় রূপদানের চেয়ে শিল্পী সেখানে রঙের মোহেই নিজেকে আটকে যেতে দিযেছেন। আকস্মিকভাবে বড়ো বেশি রকম চড়া রঙের বিরোধ সৃষ্টি করে এবং প্রতিপূবক রঙ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে শিল্পী যেন সেখানে দর্শকের মনে স্নিগ্ধতার আবেশ না এনে একটা বিস্ময়াহত প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেন।—এ রকমটি হবাব একটা কারণ হয়তো গোপাল ঘোষেব অতিবিক্ত রকমের চঞ্চল মন আর অস্থির শিল্পীমানস—যার পরিচয় অন্যান্যবাবেব মতো এবাবকার প্রদর্শনীতেও পাওয়া গেল। কিছু ছবিতে শিল্পীর এই ত্বরান্বিত ভাবটি এক ধরনের শিল্প-আত্মস্থতার অভাব ঘটিয়েছে। শিল্পীর মনোযোগেব বা একাগ্রতার অভাবের কথা বলছি না—রচনায় সম্পূর্ণতা আনার ব্যাপারে ব্যস্ততার কথাই বলছি। সৌভাগ্যের বিষয়, এবারকার প্রদর্শনীতে এ রকম ছবির সংখ্যা ছিল খুব কম। গোপাল ঘোষ যে তাঁর মুদ্রাদোষগুলি খুব দ্রুত বর্জন কবে ক্রমশই সুস্থ, সুন্দর, সহজ পরিণতিতে আসছেন, এটা তাঁর ছবির অনুরাগীদেব পক্ষে মস্তবড়ো আনন্দের কথা।

এই প্রদর্শনীতে প্রতিবারেব মতো এবারেও অনেকগুলি ব্রাশ্-ড্রয়িং ছিল। গোপাল ঘোষের এই বেখাচিত্রগুলিতে পরিমিত তুলিব টানে আর স্বল্পতম রেখাব ব্যবহারে যে সুন্দব একটি সাবলীল শিল্পকৃতিত্ব প্রকাশ পায়, তার সঙ্গে আমরা সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত। অতি দ্রুত টানে আঁকা এই স্কেচ্‌গুলিতে গোপাল ঘোষের সুদক্ষ তুলিচালনা,

পূর্বনির্দিষ্ট চিত্রপরিকল্পনা, দৃঢ় ও সংযত লাইনের টান এবং খাঁটি ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী ক্যালিগ্রাফিক রেখার চারুতা প্রতিবারের মতো এবারেও অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

অনেকদিন আগে—সম্ভবত ১৯৪৩-এ—বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে অনুষ্ঠিত একটা ছোটখাটো চিত্র-প্রদর্শনীতে নরেন্দ্র মল্লিকের আঁকা কয়েকটি ছবি দেখে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ছবিগুলির বিষয়বস্তু ছিল তন্ত্রবর্ণিত দশমহাবিদ্যার বর্ণনা, কিন্তু সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন দক্ষতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেল্-এর মুন্‌শিয়ানায় আর টেম্পেরা-কাজের খাঁটি দেশীয় পদ্ধতির ব্যবহারে ছবিগুলিতে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা ছিল। তার পরে আর কিন্তু শিল্পী নরেন্দ্র মল্লিকের ছবি কলকাতার কোনো প্রদর্শনীতে দেখার সুযোগ পাইনি। বহুকাল পরে অতি সম্প্রতি তাঁর ছবির একটি একক-প্রদর্শনী হয়ে গেল ১নং চৌরঙ্গি টেরেস-এ।

আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে ছাত্র হিসেবে নরেন্দ্র মল্লিকের শিল্পীজীবনের শুরু ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টস্-এর ক্লাসে অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষকতায়। প্রায় সেই সময় থেকে (১৯২৯) এ-পর্যন্ত (১৯৫২) নরেন্দ্র মল্লিকের আঁকা ছবিতে যে আঙ্গিক-পদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছে, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে পরিবর্তন এসেছে, রূপরীতি-দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পী-মানসের অদলবদল হয়েছে—তার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রদর্শনীতে। কিন্তু ছবির সংখ্যা মাত্র ছেচল্লিশটি—এগারোটি স্কেচ্ ধরে। নরেন্দ্র মল্লিকের শিল্পরচনাবলীর সমগ্রতার পরিচয় নিশ্চয়ই এই অতি-অল্পসংখ্যক ছবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন সময়ে বিক্রি হয়ে গেছে। তাই এই প্রদর্শনীতে সেগুলিকে উপস্থিত করা যায়নি বলেই, নরেন্দ্র মল্লিকের শিল্পীপরিচয়ও এই প্রদর্শনীতে খণ্ডিতভাবে উপস্থিত। অন্তত এই প্রদর্শনী দেখে মনে হল, নরেন্দ্র মল্লিকের প্রথম দিককার আঁকা ছবিতে যে রচনাদক্ষতা ছিল, ইদানিং কালের রচনায় সে শিল্পকুশলতার যেন বেশ খানিকটা অভাব ঘটেছে। হয়তো শিল্পীর ইতিমধ্যবর্তী জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা, নিয়মিত শিল্পসৃষ্টি ছেড়ে ভিন্নতর পেশা গ্রহণ, চিত্ররচনায় দীর্ঘকালের বিরতি, যুদ্ধের চাকরি নিয়ে প্রবাস-যাপন—ইত্যাদি কারণ এর পেছনে আছে। কিন্তু আবার এসবের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন সম্বন্ধে এক বিচিত্র, বাস্তব আর বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যা তাঁর শিল্পীমানসে এক সম্পূর্ণ নতুন চেতনা এনেছে। পারিপার্শ্বিক জীবনকে আর সাধারণ মানুষকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন বলেই সরাসরি তাদেরকেই শিল্পের উপাদান করে তোলার চেষ্টা থেকে এক তৃষ্ণার্ত মন নিয়ে আঁকা তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলি। এই সব ছবির বিষয়বস্তু অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, বাস্তবানুগ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, চারপাশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত—এবং সেদিক থেকে এইসব রচনাপ্রয়াস নিশ্চয়ই অভিনন্দনের যোগ্য। নরেন্দ্র মল্লিকের প্রথম দিককার আঁকা ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ-দেবীপ্রসাদ-অনুসারী রচনা-দক্ষতা যতই থাকুক, সেখানে বিষয়বস্তুর দৈন্য ছিল—'নির্বাসিতা রাজকন্যা', 'স্বপ্নপুরী', 'হারেমবাসিনী', ইত্যাদি ছবিগুলির নামেই তাদের জীবনবিচ্ছিন্নতা সুস্পষ্ট। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে নরেন্দ্র মল্লিকের সম্প্রতি-রচিত ছবিগুলির অধিকাংশই সার্থক শিল্পের পর্যায়ে উঠে আসার অপেক্ষা রাখে। এটা যে শুধু নরেন্দ্র মল্লিকেরই একক লক্ষণ, তা নয়। আজকের যুগোপযোগী নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ বহু শিল্পীর কাছেই এটা একটা সমস্যা। এ যুগের শিল্পজিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁরা নতুন বিষয়বস্তু আর নতুন জীবননিষ্ঠাকে উপলব্ধি

করেছেন, কিন্তু সেটাকে সবচেয়ে সার্থকভাবে শিল্পবচনায় রূপায়িত করবার মতো যথোপযুক্ত রূপরীতি আঙ্গিক এখনও তাঁদের অনেকেরই আয়ত্তের বাইরে। এরকম হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যে-কোনো শিল্পসৃষ্টিতেই বিষয়বস্তু বা কণ্টেণ্ট্ এবং রূপরীতি বা ফর্ম্-এর মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ বিরোধ থাকে। যে-সৃষ্টিতে কণ্টেণ্ট্ আর ফর্মের সমন্বয় যত বেশি, শিল্প হিসেবে তার সার্থকতাও তত বেশি। নতুন যুগের সেই নতুন কণ্টেণ্ট্কে সবচেয়ে সুন্দরভাবে, স্পষ্টভাবে আর কার্যকরী করে প্রকাশ করার জন্যে প্রয়োজন নতুন ফর্মের। বলা বাহুল্য, সেই নতুন শিল্পবস্তুর জন্যে নতুন শিল্পরূপটিও রীতিমতো অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। নরেন্দ্র মল্লিকের মতো সমাজসচেতন ও কর্মী-শিল্পীদের প্রয়াস—কখনও ব্যর্থভাবে, কখনও সার্থকভাবে—সেই অনুসন্ধানের পথে নিশ্চয়ই মূল্যবান পদক্ষেপ।

রবীন্দ্র মজুমদার

বাংলা মঞ্চে গোর্কি

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে বেহালার শৌখিন নাট্য সংঘ সাফল্যের সঙ্গে গোর্কির মা অভিনয় করেছেন। আমরা এই প্রচেষ্টাকে সানন্দে অভিনন্দন জানাই।

নানা দিক দিয়ে এই প্রচেষ্টা অভিনব। পেশাদার নাট্যমঞ্চের বাইরে এবং কিছু কিছু ভেতরেও কিছুদিন যাবত দুটি শুভলক্ষণ দেখা গেছে; একটি হল আমাদের জাতীয় নাট্যমঞ্চের ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী কতকগুলি নাটকের পুনরভিনয়। অন্যটি হল ভারতের বাইরের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালী জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করা। শেকস্পীয়র, ইবসেন, শ প্রভৃতির নাটক এইভাবে ইতিমধ্যেই পরিবেশিত হয়েছে এবং তার জন্য লিট্ল্ থিয়েটার, বহুরূপী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু এতদিন পর্যন্তও বিদেশের অতীতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি পড়লেও শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শবহনকারী নতুন ধরনের শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলির দিকে তেমন নজর পড়েনি। এই দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেন গণনাট্য সংঘ, জুলিয়াস ফুচিকের নাট্যরূপ দিয়ে এবং বিশেষরূপে অভিনন্দনযোগ্য হয়েছেন ময়ামঞ্চ গোর্কির 'মা'কে মঞ্চস্থ করে।

গোর্কি এবং তাঁর উপন্যাস 'মা'-এর পরিচয় বাহুল্য মাত্র। বিশ্ব-সাহিত্যে নতুন যুগকে সূচনা যদি কেউ করে থাকে তবে তা সর্বপ্রথমে 'মা'। সোবিয়েত, চীন এবং অন্যান্য দেশে সাহিত্য পদ্ধতির যে অপূর্ব বিকাশ আজ সম্ভব হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য সূত্রপাত সর্বপ্রথমে এই 'মা' উপন্যাসটিতে।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনও এই উপন্যাসটিকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের এবং বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন দীর্ঘদিন 'মা' উপন্যাসটিকে দ্বিতীয় গীতার মতো শ্রদ্ধা করে এসেছে, তার আবেগে উদ্বোধিত হয়ে এসেছে। অনূদিত বিদেশী উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংস্করণ যার হয়েছে, সে বইটি 'মা'।

তবু, এতদিনও এ বইটিকে মঞ্চস্থ করার কথা কারো মনে হয়নি। ময়ামঞ্চ তা মনে করিয়ে দিয়েছেন; এবং অভিনয় করে তার সাফল্যের সম্ভাবনাকেও প্রমাণ করেছেন।

অবশ্য অনেক খুঁত থেকে গেছে। প্রথম খুঁত নাট্যরূপে। 'মা' বইটির আদর্শ নাট্যরূপ সোবিয়েতে চলিত আছে। এদেশে তা সুলভ নয়। তবু একটি ইংরাজি নাট্য-

রূপ এদেশেও এসেছিল। নাট্যকার দ্বারিকাদাস গঙ্গোপাধ্যায় তাকে অবলম্বন করলে সাহায্য হত। কিন্তু দক্ষতর এরূপ নাট্যরূপে নির্ভর না করায়, নাটকটি প্রাঞ্জল হয়নি, তাছাড়া বঙ্কিমী ভাষার ফলে নাটকীয় প্রভাব স্তিমিত হয়েছে। অভিনয়ের দিক থেকে মলিনা দেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, আশা দেবী, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, ভানু রায় ও আরো দু একজন ছাড়া অন্য অভিনয় ত্রুটিপূর্ণ। মূল চরিত্র পাভেলের ভূমিকায় নির্মল রায়ের দুর্বল অভিনয় নাটকটিকে পিছনে টেনেছে, যা মায়ের ভূমিকায় মলিনা দেবী ও নীতীশ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অনবদ্য অভিনয়ে সামলে নিচ্ছিলেন। শেষ দৃশ্যটিতে মায়ের অনুপম সংলাপটিও অত্যন্ত ব্যাহত হয়েছে। ভিড়ের দৃশ্যে সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা ভিড় না হয়ে মব্ হয়ে পড়ছিল। রুশীয় চাষীর যে ছবি আমাদের মনে থাকে, তা নাটকে ও অভিনয়ে ফোটেনি।

তবু, বিশেষ করে মলিনা দেবীর অভিনয়ে যে জীবন্ত মা এবং নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আন্তর্জাতিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের যে বলিষ্ঠ ও সংযত বাণী প্রকাশ পেয়েছে তার শক্তি ও অভিনয় দক্ষতাকে দর্শকেরা ভুলতে পারবেন না। মলিনা দেবীকে এতদিন আমরা বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত স্নেহময়ী উদার অথচ সমাজে উপেক্ষিত মা, জেঠাইমাদের ভূমিকাতেই দেখে এসেছি এবং শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু এই নাটকে শ্রমিক মায়ের যে অপূর্ব মাতৃত্বকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, সে প্রয়াসকে দুই হাত তুলে অভিনন্দন জানাতে হয়।

পেশাদার নাট্যমঞ্চের দুজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী যে এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় নতুন মানবতাকে, শ্রমিক শ্রেণীর মানবতাকে জীবন্ত করে তুলতে এগিয়ে আসবেন, তার জন্য বাংলার শ্রমিক এবং গণতান্ত্রিক জনসাধারণ তাঁদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাবেন। আশা করি এ নাটকটির ত্রুটি সেরে নিয়ে তাকে আরো অভিনয় করা হবে এবং বিশেষ করে অভিনয় করা হবে শ্রমিকদের মধ্যে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

নিরাপত্তা আইন

রায় মন্ত্রিসভা কুখ্যাত নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রবল জনমত এবং বামপন্থী দল ও নেতৃবৃন্দের সমবেত প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই এই কালা-কানুনটিকে ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নিতে হয়েছে। হঠাৎ এ আইনটিকে পাশ করতে হল কেন? বাংলা দেশের এবং তার জনসাধারণের নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে, এখানকার নারীপুরুষ, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের অধিকার ও স্বার্থ কি কেউ আক্রমণ করছে? হাঁ করছে। কিন্তু যারা করছে তাদের রোধ করার জন্য এ আইন নয়, এ আইন আসলে তাদের এবং পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভাটিকে রক্ষা করার আইন।

দেশের শতকরা ৪০ জনের ভোটও কংগ্রেস পায়নি। কংগ্রেসী নায়করা অনেকেই সরাসরি পরাজিত। তবু, পরাজিত মন্ত্রীদের নিয়েই একটি অপদার্থ মন্ত্রিসভা দেশের জনগণের মতের বিরুদ্ধে চাপিয়ে রাখতে হবে বলেই এই কালাকানুন। মার্কিন ব্রিটিশ যুদ্ধবাজ ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাছে ক্রমাগত আরো বেশি করে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে বলেই এই স্বৈরাচারী ক্ষমতা গ্রহণ।

পাঁচবছর ধরে এই আইনের যে প্রয়োগ আমরা দেখেছি তার তালিকার দিকে চাইলেই আর উদ্দেশ্য এতটুকু গোপন থাকে না। প্রধানত শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠন ও আন্দোলনকে দমন করা ছাড়া একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী একজন যুদ্ধপ্রচারককেও দমন করেনি।

এবং বলা বাহুল্য যে এ আইন প্রগতিশীল সংস্কৃতিকেও বাদ দেয়নি। সংবাদপত্রের অধিকার হরণ করা ছাড়াও এই আইনের একটি ধারায় আছে 'হানিকর রিপোর্ট' প্রকাশ করা যাবে না। হানিকর কথাটি সরকার নিজের খুশিমত ব্যবহার করে কি করতে পারেন, তা সংস্কৃতি কর্মীদের কাছে অজানা নয়। হানিকর রিপোর্টের অজুহাতে গণনাট্য আন্দোলনের মুখপত্র 'লোকনাট্য' প্রভৃতি শিল্পসাহিত্য পত্রিকাকে পর্যন্ত এই মন্ত্রিসভা নিষিদ্ধ করে দেন, হানিকর রিপোর্টের তল্লাসে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের কাজকর্ম ব্যাঘাত করে বার বার হয়েছে পুলিস হানা, নিষিদ্ধ হয়েছে বিমল ঘোষের 'নানকিং' নামক কবিতার বই, এবং পরিচয়ের সম্পাদক থেকে শুরু করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পারভেজ শহিদী, সমরেশ বসু, সুলেখা সান্যাল, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রভৃতি ২০।২৫ জন প্রতিষ্ঠিত লেখক ও শিল্পীকে দীর্ঘদিন আটক থাকতে হয়েছে বিনা বিচারে। ১৯৪৯ সালে সংস্কৃতি কর্মীদের মিছিল পর্যন্ত গুলিবর্ষণের নৃশংসতা থেকে রেহাই পায়নি।

এ আইন রক্তমাখা আইন।

এ আইনের বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হোক সাহিত্যের কণ্ঠ—সাহিত্যিকদের কণ্ঠ।

পরিমল চৌধুরী

মানুষের স্বপক্ষে

সমুদ্রের ওপার থেকে একটা বিকার গর্জন করে উঠেছে। এ বিকারের নাম আইসেনহাওয়ার।

অপরাধ যখন বিচারকের আসনে বসে, আতঙ্ক যখন অস্ত্রসজ্জিত হয়, লালসা যখন হাতে পায় রাজদণ্ড, তখন তার যে মূর্তি সেই মূর্তি আজ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের।

এই আসনের দিকে আমরা তাকিয়েছি। ছোটো এবং বড়ো, দুজন এবং অনেকজন, দুটি মানুষ আর সমগ্র মানবতার কথা ভেবে আমরা সভাপতির দিকে চেয়েছিলাম। কারণ দুটি জীবন আজ এই মুহূর্তেই আমেরিকার কারাগারে দিন গুণছে। আমেরিকার কাজ-পাগল সাধারণ মানুষদের মধ্যেকার একটি টেক্‌নিশিয়ান দম্পতি—জুলিয়াস আর এথেল রোজেনবার্গ আজ শান্তভাবে পরস্পরের হাতে হাত রেখে প্রতীক্ষা করছে ঘাতকের পদশব্দের জন্য।

তাই আমরা এবং সারা দুনিয়ার মানুষ তাকিয়েছিলাম প্রেসিডেণ্টের দিকে। দুটি নিরপরাধ প্রাণ, মাত্র দুজন হলেও মানুষের জীবনকে অমূল্য বলে আমরা মনে করেছি। সারা বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার লেখক শিল্পী আইনজীবী থেকে শুরু করে এখানকার শ্রমিক-কৃষক এখানকার মায়েরা হাজারে হাজারে স্বাক্ষর করে আবেদন জানিয়েছেন—সভাপতির করুণা থেকে ওরা দুজন যেন বঞ্চিত না হয়।

প্রতিদানে, ফিরে এসেছে একটা হাত-ওল্টানো কাপুরুষ জবাব। আমরা তাকিয়ে থেকেছি কারণ আরো অনেক মানুষের ভাগ্যের কথা মনুষ্যজাতির সমগ্র সভ্যতার কথা ভেবে আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ পরস্পরের হাতে হাত রেখে এই মুহূর্তেও দুনিয়ার অনেক শিশু আর মা কান পেতে আছে ঘাতকবাহিনীর জন্য, এই মুহূর্তেই এখনো রক্তে ভিজে উঠছে কোরিয়ার মাটি, শস্যক্ষেত্রের ওপর স্তূপাকার হয়ে জমছে বিস্ফোরণের পোড়া ছাই, আজো শান্তির প্রত্যাশিত প্রত্যূষটিকে পূতিগন্ধে কদর্য করে বেজে উঠছে অস্ত্রের বিকট স্পর্ধা।

না, এ নয়! দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষও কোটিতে কোটিতে হাত তুলে জানিয়েছে এ নয়, চাই কোরিয়া যুদ্ধের শান্তি এবং শান্তিচুক্তি।

প্রতিদানে গর্জন করে উঠেছে একটা অমানুষিক বিকার। ব্যর্থ-চেতন মত্ততার সঙ্গে সভাপতি আইসেনহাওয়ার জানিয়ে দিয়েছেন, কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি নয়, তাঁর লক্ষ্য চীনকে আক্রমণ করা, সারা এশিয়ায় ধ্বংসের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া। জানিয়ে দিয়েছেন —নির্বাচনের সময় তিনি শান্তির যে বাগাড়ম্বর করেছিলেন, তা প্রবঞ্চনা মাত্র। যেমন করে পারা যায় যুদ্ধের বিস্তৃতি সাধনই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। তার জন্য মিত্রদের সম্মতির অপেক্ষা করার তর সয়নি।

এ আগুন কাকে জ্বালাবে? কোনো সন্দেহ নেই যে এশিয়ার বুকে এ আগুন ভারতবর্ষকেও ঝলসিয়ে মারবে, ভারতেরও সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে তুলছে এবং আরো তুলবে। লজ্জার কথা, যে এ চক্রান্তের জন্য আইসেনহাওয়ার এখনো সাহস পায় কৈফিয়ত হিসাবে ভারতের নাম করতে, আজো স্পর্ধা রাখে জাতিসঙ্ঘে ভারতের 'কোরিয়া প্রস্তাবের' পেছনে গা ঢাকা দিতে; সুযোগ নেয় ভারত সরকারের দ্বিধাজড়িত কণ্ঠের অস্পষ্টতার আড়ালে স্বচ্ছন্দ বিহারের।

মুষ্টিমেয়ের এই বিকার কি সত্যসত্যই বিশ্বজোড়া সর্বনাশ হয়ে দেখা দেবে? কখনো না। আমাদের বাসভূমি এশিয়ার বুকে আগুন দিতে চায় যে হাত, আমাদের বন্ধু চীনের মাটিতে ধ্বংস ছড়াতে চায় যে চক্রান্ত, জীবনের বুকে পদাঘাত করতে চায় যে নিঃসঙ্গ মত্ততা, সভ্যতাকে লঙ্ঘন করতে চায় যে বিকার তা খর্ব হোক—তাকে খর্ব করার পবিত্র কর্তব্য আজ আমাদের সকলের।

সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের অভিভাষণে ভারতের এই প্রকৃত বিবেক এখনো গর্জন করে না উঠতে না পারলেও সে বিবেক ঋজু আহ্বানে ইতিমধ্যেই ডাক দিয়ে গেছে ভারতীয় শান্তি-সংসদের প্রস্তাবে, গান্ধীবাদী পণ্ডিত সুন্দরলালের নির্ভীক কণ্ঠস্বরে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থহীন আহ্বানের মধ্যে।

রক্তপিপাসুর জবাব চাই। দেশজোড়া এক প্রতিবাদ ভারতের সেই জবাব ধ্বনিত করে তুলুক। দ্বিধা নয়—আমরা চাই অবিলম্বে কোরিয়া যুদ্ধের বিরতি, ভারত সরকার এবং জাতিসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধিরা অবিলম্বে এই প্রস্তাব উত্থাপন করে ভারতবর্ষের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ করুন। আমরা চাই, চীনে হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হোক।

শান্তির এই দাবিতে এক হয়ে উঠে দাঁড়াক ভারতের মানুষ এবং ভারতের সাহিত্য-জগৎ। শান্তিকে রক্ষা করতেই হবে, রক্ষা করতে হবে সমগ্র মানবতাকে।

আর বাঁচাতে হবে দুটি সাধারণ জীবনকে—কারাগারে অপেক্ষমান জুলিয়াস ও এথেল রোজেনবার্গকে। এখনো তার সময় আছে। এখনো তা সম্ভব।



পাঠকগোষ্ঠী

বাস্তববাদ-প্রসঙ্গে

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু,

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা পরিচয়ে শ্রীযুক্ত ননী ভৌমিক মহাশয়ের বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কীয় ভাববাদী বিপজ্জনক প্রবন্ধটি পড়ে আমরা অনেকে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে প্রবন্ধটি মূলতই ভুল হয়ায় সমস্ত লেখাটির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু মৌল ভ্রান্তিটুকু নির্দেশ করা এ পত্রের উদ্দেশ্য।

প্রথম পৃষ্ঠাতেই তিনি লিখেছেনঃ "প্রকৃত বাস্তববাদ হল সাহিত্যে প্রকৃতই বাস্তবকে প্রতিফলিত করা"। এবং ..."বাস্তবের, লেখকের আত্মগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ বাস্তব জগত, তার জীবন ও সমাজের বিষয়বস্তু, অবয়ব ও মূল মর্মকে প্রতিবিম্বিত করাই হল বাস্তববাদের ধর্ম।"

বলাই বাহুল্য, এহেন 'প্রকৃত বাস্তব' সত্য সম্বন্ধে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কেননা 'প্রকৃত বাস্তবকে' প্রতিফলিত না করলে যে বাস্তব হয় না একথা আমরাও জানতুম। কিন্তু পরের লাইনেই তিনি লিখেছেনঃ "স্বভাবতই সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে একটি 'বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি', একটি 'বস্তুবাদী দর্শনই' এই বাস্তববাদের ভিত্তি"—অর্থাৎ? নিশ্চয়ই একথা নয় যে এই 'বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি' বা 'বস্তুবাদী দর্শন' থেকেই বাস্তবের জন্ম। তাহলে, অন্যপক্ষে, একথা মানতে হয় যে ও'র মতে সাহিত্যে বাস্তববাদ এই 'বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি' অথবা 'বস্তুবাদী দর্শন' নির্ভর। এবং যেহেতু তাই, সুতরাং যিনি এই 'বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি' বা 'বস্তুবাদীদর্শনের' অধিকারী নন তিনি সাহিত্যেও বাস্তববাদী হতে, অনিবার্যভাবেই অক্ষম। অথচ সত্যিই কি তাই, সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে কি সে প্রমাণই মেলে? কিংবা এই 'বিশেষ বস্তুবাদী', দর্শনের প্রবর্তক-প্রতিভারাও কি সাহিত্য-শিল্প আলোচনায় তাই বলে গেছেন? আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে তা বলে জাননি এবং জাননি যে সেকথা ননীবাবুও অবশ্যই জানেন, সংস্কৃতির নেতা হিসেবে। নইলে কোথায় দাঁড়ান গ্রীক নাট্যকারেরা, শেক্সপীয়র, চসার, দান্তে, গয়টে বালজাক, হুগো, গোগোল, পুশকিন, চেকভ প্রভৃতি প্রতিভারা? কোথায় থাকেন ডিকেন্স, টলস্টয, জোলা, স্তঁদাল, রোমারঁলা, ড্রাইজার, টমাস ম্যান, সিন্‌ক্লেয়ার লুইস প্রভৃতি দর্শনে ভাববাদী মহৎ শিল্পীরা? এদেশে রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, দীনবন্ধু? এমনকি ননীবাবুর ভাষয়ঃ 'বিশ্ব-সাহিত্যের সেরা বাস্তববাদী লেখক স্বয়ং গর্কি'-র সাহিত্য রচনাই বা কোথায় ভেসে যায়? ননীবাবু কি জানেন না যে গর্কি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টিকালে দার্শনিকভাবে ছিলেন বিভ্রান্ত, ভাববাদী? লেনিনের ভাষায়ঃ

In the matter of proletarian art M. Gorki is a great *asset* notwith-

---

['বাঙলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা' ও 'কার জন্য লিখি' প্রবন্ধ দু'টি আলোচনার্থই "পরিচয়ে" প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা প্রবন্ধ দু'টিব উপর দু'টি 'প্রতিবাদ' পেয়েছি। একটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। সব প্রতিবাদ অবশ্য স্থানাভাব বশত "পরিচয়ে" প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আলোচনা যদি এজাতীয় প্রতিবাদের নীতি ও রীতি অনুসরণ করে, তা হলে তা থেকে পাঠক-সাধারণ বঞ্চিত হলেও ক্ষতি হবে না। ইতি, গোপাল হালদাব, সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে।]

standing his Machist and recallist sympathies. (ইটালিক্স লেনিনের ঃ নোটস্ অফ এ জার্নালিস্ট)

প্রসঙ্গত শুধু দর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতেও গর্কির বারংবার ভ্রান্তি স্মরণীয় ঃ ..The writer (লেনিন) had occasion, on meeting Gorki on the island of Capri, to warn him and reproach him for his political mistakes. Gorki parried these reproaches with him inimitably with a fine smile and frank statement: "I know, I am a poor Marxian. And then all of us artists are somewhat irresponsible." It is hard to argue against this. (লেটার ফ্রম্ য়্যাফার ঃ লেনিন)

তবুও তো লেনিনের ভাষাতেই গর্কি হলেন ঃ And Gorki is unquestionably the greatest representative of proletarian art,.." (নোটস্ অফ এ জার্নালিস্ট)

টলস্টয়ের দার্শনিক প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং অন্যদিকে শিল্পে প্রগতিশীলতার সম্বন্ধেও তাঁর লেখা সুবিদিত। চির নমস্য অগ্রজ এঙ্গেলসেরও বালজাকের জীবন ও শিল্পের আপাত বৈপরীত্য বিষয়ক লেখাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঃ

Well, Balzac was politically a legitimist; his great work is a constant elegy on the irreparable decay of good society; his sympathies are with the class that is doomed to extinction. But for all that, his satire is never keener, his irony never more bitter, than when he sets in motion the very men and women with whom he sympathizes most deeply—the nobles. (মার্গারেট হার্কনেস্‌কে লিখিত চিঠি)

এবং সব থেকে মজার ব্যাপার ননীবাবু নিজেই প্রবন্ধের অন্যত্র অম্লানবদনে লিখেছেন ঃ "পক্ষগ্রহণের একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হলেন টলস্টয়। গভীর অর্থে একটি প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনে বিশ্বাস এবং তাকে প্রচার করা সত্ত্বেও, টলস্টয়ের সৃষ্টিতে বাস্তবের প্রতিফলন এত সত্য.." ইত্যাদি; প্রশ্ন হল কিন্তু কি করে?

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়েও তিনি বলেন ঃ "আসলে এদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলিও কার্যক্ষেত্রে (অবজেক্‌টিভলি) সমাজের বিকাশমান দিকটির পক্ষ নিয়েছে এবং ক্ষয়িষ্ণু দিকটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।" পড়তে পড়তে মনে হয় চিৎকার করি, বলি, থামুন থামুন ননীবাবু, করছেন কি? কেননা, "স্বভাবতই সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে একটি 'বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি', একটি 'বস্তুবাদী দর্শনই' এই বাস্তববাদের ভিত্তি।" এবং অতি দুঃখের বিষয় যে তিনি যে সব সাহিত্যিক পূর্বগামীদের নাম করেছেন তাঁরা কেউ এ 'বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি' ও 'বস্তুবাদী দর্শনে' হাবুডুবু খাননি। ফলে সমস্ত প্রবন্ধটি কয়েকবার ভালো করে পড়েও আমরা কিছুই বুঝিনে, শুধু বুঝি যে ননীবাবুর 'বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি' ও 'বস্তুবাদী দর্শন'—এর 'প্রকৃত বাস্তব' প্রয়োগে প্রথমে যা বলা হয় শেষে তা নাকচ করাই হল 'তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ'-ধারা।

এ ধরণের উন্মাদনার শেষে তিনি যে সব সারগর্ভ বায় দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই। কেবল এটুকু স্মরণ করালেই যথেষ্ট হবে যে যান্ত্রিক মন-গড়া ছকে সাহিত্য বিচারে কখনোই সাহিত্যিক সমস্যা সমাধান হয় না। যেমন হয় না টিপিক্যাল বা প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের বিচার। ননীবাবু একাধারে সমস্ত মৃত লেখককেই বাস্তববাদী বলেছেন ঃ আবার টিপিক্যাল চরিত্রের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন চাঁদ

সদাগর ও ভাঁড়ু দত্তে। কিন্তু কোন্ ইতিহাসের পটে? বাংলার তদানীন্তন কোন্ সামাজিক ঐতিহাসিক বিন্যাসের সূত্রানুসারে? মার্ক্স যখন 'ক্যাপিটেল'-এ বালজাককে প্রশংসা করেন বা এঙ্গেল্‌স্ যখন বলেন যে তিনি টিপিক্যাল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তখন তাঁরা কোনো মনগড়া তত্ত্ব দিয়ে তা প্রমাণ করেন না, করেন ফরাসী সমাজের সম্পূর্ণ স্বরূপের সুগভীর অনুসন্ধানের পটেই। ননীবাবু অথবা ননীবাবুর আগে অন্য কোনো বাস্তুবাদী দার্শনিক কি তা বাংলার ইতিহাসের পটভূমিতে করতে সক্ষম হয়েছেন? না, এদেশেও শুধু য়ুরোপের প্যারালালিসিমের সহজ পথেই কার্যোদ্ধার হবে? মনে কবলেই হবে যে চাঁদ সদাগরের ব্রহ্মণ্য-সহায়তায় চ্যাং-মুড়ি-কানি মনসার সঙ্গের দ্বন্দ্ব য়ুরোপীয় বুর্জোয়ার ধর্মান্ধতাব বিপক্ষে বিজ্ঞানের লড়াই তুল্য? নাকি বাস্তববাদের অফিসার-ইন্‌চার্জের মত ফরমান দিলেই তা অবশ্যগ্রাহ্য? যেমন গ্রাহ্য স্থান-কাল-পাত্র ও প্রসঙ্গ নির্বিশেষে খাব্‌লে-খুব্‌লে লেনিন-মাও-মালেন্‌কভ দর্শন?

Your letter tacitly proceeds from two assumptions: from the assumption that it is permissible to quote the works of one or another author divorcing them from the historical period of which the quotation treats, and secondly, from the formulæ of Marxism, arrived at as a result of the study of one period of historical development, hold true for all periods of development and therefore must remain immutable.

I must say that both these assumptions are utterly erroneous.—J. Stalin.

লেনিন-মাও-মালেনকভ-এর নির্বিচার উদ্ধৃতি সম্বন্ধে এটুকুই আমাদেব বক্তব্য।

নমস্কার
ইতি বিনীত
আশীষ বর্মণ।

লেখকের বক্তব্য

'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা' (বাস্তবতা নয়) শীর্ষক আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রীযুত আশীষ বর্মণের 'মৌল' আপত্তি এই যে, আমার বাস্তববাদ একটি বস্তুবাদী দর্শনকে ভিত্তি করেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এটিতে তাঁর আপত্তি হলেও এইটেই মার্ক্সবাদীদের মূল বৈশিষ্ট্য। লেনিন, মালেনকভ ও মাও-এর উদ্ধৃতি সম্পর্কে আশীষবাবুর বিরাগ সত্ত্বেও, অন্য পাঠকের সুবিধার জন্য 'China's New Democracy' পুস্তিকার নিম্নোক্ত সূত্রপাতটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

"This (materialist philosophy of Marx) is the first scientific explanation in the history of mankind correctly to answer the question of relation between ideology and existence and that became the *fundamental starting point of* Lenins motive, revolutionary theory of reflection which was developed from this Marxist point of view. In our discussion of China's cultural problems *this starting point should never be neglected.* —মাও সে-তুঙ। (বাঁকা হবফ আমার)।

আশীষবাবুর আপত্তির অর্থ তাই দাঁড়ায় যে, তর্কের সুবিধার জন্য এঙ্গেলস্ স্টালিন উদ্ধৃত করা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে তিনি এই মূল মার্ক্সবাদী সূত্রপাতটুকু মানতে রাজী নন। এবং এই না-মানাটাই যে ন্যায্য, তা প্রমাণ করার জন্য তিনি 'বাস্তববাদ' কথাটিকে নিজের খুশিমত অর্থে মানে করেছেন। বাস্তববাদ নামক তত্ত্বটিকে বাস্তবতা বা বাস্তবধর্মী শিল্প ও শিল্পীর সঙ্গে এক করে গুলিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তা গুলিয়ে ফেললে কলহের সুবিধা হলেও বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুবিধা হয় না। যাতে তা কেউ গুলিয়ে না ফেলেন, তার জন্য আমি প্রবন্ধের সূত্রপাতই করেছি এই বলে যে..."মার্ক্সবাদের সাহিত্যতত্ত্ব হল বাস্তববাদ"। অন্যান্য ধারণার সঙ্গে তার তফাত করার জন্য 'প্রকৃত' কথাটি যোগ করে বলেছি 'প্রকৃত বাস্তববাদ হল...' ইত্যাদি। আশীষ বাবু জিনিসটাকে গুলিয়ে না ফেললে হয়ত বুঝবেন যে টলস্টয় প্রভৃতি বাস্তবধর্মী শিল্পী মার্কসবাদী না হলেও বাস্তববাদ নামক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির মার্ক্সবাদী না হয়ে উপায় নেই।

এই 'মৌল' ভুলটি ছাড়াও বানানভুল থেকে শুরু করে আশীষবাবুর অন্যান্য নানাভুলের আলোচনার মত স্থান এখন নেই। তবু আশীষ বাবুর চিঠি থেকে মনে হয়েছে, যে আমার প্রবন্ধে কতকগুলি বিষয় হয়ত আমি আরো স্পষ্ট করে বলতে পারিনি। পরে সুযোগ হলে তা আমি বা যোগ্যতর কোনো ব্যক্তি চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যে অন্তত একটি জিনিস পরিষ্কার করতে চাই। উক্ত প্রবন্ধে বিপ্লবী বাস্তববাদের যে প্রস্তাব আমি রেখেছি, তা প্রধানত মার্ক্সবাদীদের বিবেচনা ও গ্রহণের জন্য। বিপ্লবী বাস্তববাদের অপূর্ণতা সত্ত্বেও প্রগতিশীল সাহিত্য এদেশে হচ্ছে এবং আরো হবে। মার্ক্সবাদী দর্শন এবং আমার মতের সঙ্গে মিল না হলেও সাহিত্যে প্রগতির জন্য আশীষ বাবু এবং শ্রদ্ধেয় বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে আমি এবং আমার মত অনেকে একত্রেই দাঁড়াতে চাই। লক্ষ্যটা প্রগতি হলে এই ঐক্য আমাদের কাম্য মতামত নির্বিশেষেই। কিন্তু অবশ্যই মতামত বিসর্জন দিয়ে নয় বা মতামতের জন্য আক্রোশ নিয়ে নয়; মতামত আমরা গড়তে চাই আলোচনার মধ্য দিয়ে। মার্ক্সবাদের চৌহদ্দির মধ্যে সে আলোচনায় আশীষ বাবু এলে আনন্দেরই কথা। না আসতে পারলেও ধিক্কারের কিছু নেই, কারণ ব্যাপকতর জাতীয় সাহিত্যের স্বার্থের জন্য মতামতনির্বিশেষে সমবেত হওয়ার প্রয়োজন আজ জরুরী।

লেখক, শিল্পী ও সংস্কৃতি-কর্মীদের কাছে সবিনয় নিবেদন,

আমরা বাংলা সাহিত্যের এক সংকটময় মুহূর্তে সহযোগিতার আহ্বান নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি।

আমরা বাংলার মানুষ, আমাদের বিশেষ আশা ও গর্বের সামগ্রী হল আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতি। এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, হাজার বছরের পুরনো এক ভাষা, চণ্ডীদাস-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের নাম আঁকা একটি সাহিত্যের আমরা উত্তরাধিকারী। বিচিত্র ও ঐশ্বর্যময় এই সাহিত্য কতকগুলি গভীর মূল্য-বোধে উদ্দীপ্ত। দেশ ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায়, সত্য ও যুক্তির প্রতি অনুরাগে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রীতি ও শান্তির আদর্শে এ সাহিত্য চিহ্নিত। আমাদের জাতি এই সাহিত্যকে ভালোবেসেছে, পুরুষানুক্রমে আশা করে এসেছে তার দান আরো পরিপূর্ণ তার আবেদন আরো ব্যাপক হয়ে উঠুক।

কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা আজ স্বাধীনতার পাঁচবছর পরেও পূর্ণ হতে পারছে না, বরং তার বিকাশের পথে দেখা দিচ্ছে নতুন সমস্যা।

শিক্ষার অভাব

আমাদের সাহিত্যের বিস্তারসাধনের পথে একটি বড়ো বাধা দেশজোড়া অশিক্ষা। তার ওপর যেটুকু শিক্ষার হার এখানে চলে এসেছে, তাতেও সংকোচন শুরু হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন আমাদের জাতি বঞ্চিত থাকছে তার সাহিত্য থেকে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের শিল্প-সাহিত্যের বিকাশও হচ্ছে খণ্ডিত, শীর্ণ; তার সম্পদের সীমাবদ্ধতা পরিপূর্ণরূপে কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না।

মাতৃভাষা

মাতৃভাষার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার অভাবেও ব্যাহত হচ্ছে আমাদের সাহিত্য। স্বাধীনতার পাঁচবছর পরেও এখনো আমাদের প্রদেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমাদের মাতৃভাষা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা পায়নি। এই প্রদেশের অভ্যন্তরেও গোর্খালী সাঁওতালী প্রভৃতি উপজাতীয় এবং হিন্দী উর্দু প্রভৃতি সংখ্যালঘু ভাষা ও সংস্কৃতি অরক্ষিত। তাদের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব আছে, তা পালিত হচ্ছে না।

আর্থিক দুর্দশা

উপরোক্ত দুই কারণে এবং ক্রমবর্ধমান এক আর্থিক সংকটের ফলে শিল্প-সাহিত্যের স্বল্প পরিবেশনটিও আজ সংকটাপন্ন। ক্রেতার অভাবে এবং বিদেশী প্রতিযোগিতায় প্রকাশনা, ফিল্ম প্রভৃতি শিল্প বিপন্ন। সরকার থেকে

শিল্প-সাহিত্যের জন্য উপযুক্ত অর্থবরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় সংরক্ষণনীতির অভাব রয়ে গেছে। এর ফলে শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছেন এদেশের দরিদ্র শিল্পী-সাহিত্যিকেরা, কারণ তাঁদের নিজস্ব স্বার্থসংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই এখনো গড়ে ওঠেনি।

তাছাড়া আমাদের সংস্কৃতির ওপরেই আজ এসে পড়ছে আঘাত।

বিদেশের বিকৃত সংস্কৃতির কুপ্রভাব

বিদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে এক সময় আমরা নেবার মতো কিছু পেয়েছিলাম এবং এখনো নানা দেশের অগ্রগামী প্রগতিশীল সাহিত্য থেকে আমরা সম্পদ আহরণ করতে চাই। কিন্তু বিদেশাগত সংস্কৃতির একটা বিশেষ অংশে আজ এমন একটা বিকার ও রিক্ততা দেখা দিয়েছে যার প্রভাব আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলির পক্ষে একান্ত মারাত্মক। আমাদের জাতি ও সাহিত্যের প্রাণবস্তু, তার মর্যাদা ও স্বকীয়তা এর ফলে হয়ে পড়েছে বিপন্ন।

মধ্যযুগীয় কুসংস্কার

অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরে যে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বোঝা এতদিন ধরে আমাদের সাহিত্য ও জনগণকে অচলায়তনে বেঁধে রাখতে চেয়েছে, এখনো তার জের মেটানো সম্ভব হয়নি। আমাদের সাহিত্য ও অন্যান্য নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক মাধ্যমের মধ্যে এখনো দেখা দিচ্ছে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ছায়াপাত, ভবিতব্যতা ও কুসংস্কার-পূজা, যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি বিরূপতা এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য ও অসহিষ্ণুতা।

জাতির সমগ্র প্রতিফলন

সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেকেই অনুভব করি যে আমাদের শিল্প-সাহিত্য আমাদের জাতির সমগ্র জনসাধারণের মুখপত্র হয়ে ওঠেনি। জনগণের একাংশের কথাই বিশেষ করে আমাদের সাহিত্যে একদিন প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যে আজো অনেক মানুষের ছবি আসেনি, অধিকাংশ মানুষের গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী তাতে বিকশিত হয়ে উঠছে না, পরিপূর্ণরূপে এ সাহিত্য এখনো হয়ে ওঠেনি জাতির দর্পণ, জাতির বিবেক।

যুদ্ধ ও শান্তি

সর্বোপরি, আমাদের সাহিত্যের সামনে আজ দেখা দিয়েছে এক বিশ্বব্যাপী অভিশাপ। পৃথিবীতে আজ যে আবার একটা মহাযুদ্ধের আয়োজন চলছে, তা গোটা মানবজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে বিপন্ন করছে আমাদের স্বাধীনতা এবং আমাদের সাহিত্যকেও; এ সাহিত্যের সংকটকে, তার উজ্জীবনের পথে উপরোক্ত প্রত্যেকটি সমস্যাকে করে তুলছে আরো জটিল, আরো ভয়ানক। আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যতকে নিশ্চিত করতে হলে তাই পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে একত্রে এই বিশ্বযুদ্ধের প্রতিরোধ এবং বিশেষ করে পাক-ভারত মৈত্রীর প্রশ্ন আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এমন কতকগুলি মুহূর্ত আছে যখন চুপ করে থাকা অপরাধ। পৃথিবীর মানুষের এবং বিশেষ করে সাহিত্যিকদের সামনে আজ তেমনি মুহূর্ত উপস্থিত।

এমনি কতকগুলি প্রশ্ন আজ বাংলা সাহিত্যের সামনে দেখা দিয়েছে, এমনি কতকগুলি সমস্যা আলোড়িত করে তুলছে আমাদের দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকটি শিল্পী ও সাহিত্যিককে।

তাই, আমরা পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের পক্ষ থেকে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছি। প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ আপনাদের কাছে অপরিচিত নয়। ১৯৩৬ সালে আজকের মতোই আর এক বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার সামনে, আজকের মতোই জনগণের এক প্রয়োজনের মুহূর্তে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রেমচাঁদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রেরণা ও সমর্থন নিয়ে সংগঠিত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের জন্ম হয়। এই আন্দোলনের ঐতিহ্য বহন করেই পরে সৃষ্টি হয় ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। দীর্ঘ ১৬।১৭ বছর যাবত এই আন্দোলন ও সঙ্ঘের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা ও কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুতর দুর্বলতা সত্ত্বেও তা একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীকে প্রতিষ্ঠা দেবার কাজে, বাংলা-সাহিত্যকে সজীব ও বেগবান করার প্রেরণায় এই সঙ্ঘের দান গর্বের সঙ্গে স্মরণীয়। সাম্রাজ্যবাদ অথবা ফ্যাসিবাদ, দুর্ভিক্ষ অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—জাতির সম্মুখে যখনই কোনো দুর্দিন ঘনিয়েছে, তখনই সঙ্ঘ তার প্রতিরোধে সাহিত্য ও শিল্পের বাণী নিয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষ ও জনগণের স্বপক্ষে।

এই সঙ্ঘের পক্ষ থেকেই আমরা মতামতনির্বিশেষে প্রত্যেকটি শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীর কাছে আবেদন জানাই—আমাদের পঞ্চম সম্মেলনে যোগ দিন, উপরোক্ত যে প্রশ্নগুলি আজ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে, তার আলোচনা করুন, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নীতি ও সংগঠনকে আরো উপযুক্ত করে তুলে তাকে আপনার করে নিন।

বাংলার সাহিত্য মরতে পারে না, তাকে আমরা মরতে দিতে পারি না। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনারা এক হয়ে দাঁড়ান। সমগ্র জাতি আপনাদের সমবেত ঘোষণার জন্য উন্মুখ।

প্রস্তুতি কমিটি
প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, পঞ্চম সম্মেলন
৬ই ফেব্রুয়ারি '৫৩

[আগামী ৬ই মার্চ দিল্লীতে সারাভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন হতে চলেছে। আশা করি, বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য উদ্যোগ নেবেন।

ফলে ঐদিন কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পীদের যে সম্মেলন হবার কথা ছিল, তা পিছিয়ে গেছে। সম্পাদক]

সূচীপত্র

CAL. CUTTA NATIONAL LIBRARY

দ্বাবিংশ বর্ষ ঃঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃঃ তৃতীয় সংখ্যা

স্তালিনের কবিতা		১৪৯
স্তালিনের চিঠিঃ বিল্-বিয়েলোৎসের্কভস্ককে		১৫১
কবিতা	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১৫৩
	মণীন্দ্র রায়	
	জগন্নাথ চক্রবর্তী	
	মায়া সরকার	
	অজয় সেন	
	নন্দদুলাল সরকার	
	কৃষ্ণ ধর	
	রামেন্দ্র দেশমুখ্য	
	রাম বসু	
	বিমলচন্দ্র ঘোষ	
	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	
স্তালিন ও শান্তি	কল্যাণ দত্ত	১৬৮
সোবিয়েত লোক-সংগীতে স্তালিন		১৭৪
একটি মুখ	সমরেশ বসু	১৭৭
মার্কসবাদী দর্শনে স্তালিনের অবদান	ভবানী সেন	১৮১
মহামানব স্তালিন	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৩
স্তালিনের তিরোধানে	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৯৪
সৃজনী প্রচেষ্টার প্রেরণাদাতা	এফ্, গ্লাদ্‌কভ	১৯৬
শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গে স্তালিন	ননী ভৌমিক	২০১
আমাদের স্তালিন	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২১৭
	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	২২০
মৃন্ময়	রণমিত্র সেন	২২১
সোবিয়েত লোক-সংগীতে স্তালিন		২২৪
স্তালিনের চিঠিঃ গর্কিকে		২২৬
মৃত্যু নেই স্তালিনের		২৩০

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড থেকে মুদ্রিত ও 'পরিচয়' কার্যালয় ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।

Few

STALIN-PRIZE

books

* **ALITET GOES TO THE HILLS**
—Tikhon Syomushkin
(book I & II combined) Rs. 2-4-0

* **EARLY JOYS**
—Konstantin Fedin Rs. 1-14-0

* **NO ORDINARY SUMMER**
—Konstantin Fedin
Book I Rs. 1-14-0
Book II Rs. 2-4-0

* **GUARANTEE OF PEACE**
—Vadim Sobko Rs. 1-11-0

* **A STORY ABOUT A REAL MAN**
—Boris Polevoi Rs. 2-10-0

* **SPRINGTIME IN SAKEN**
— G. Gulia Rs. 0-15-0

CURRENT BOOK DISTRIBUTORS
3/2 Madan Street, Calcutta-13.

দ্বাবিংশ বর্ষ
২য় খণ্ড। ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৫৯

স্তালিনের কবিতা

অন্তহীন মেহনতে কুঁজো হয়ে গেছে যাদের পিঠ
কাল পর্যন্ত যারা ভ্রূকুটির সামনে মাথা নত করেছে
তারা জেগে উঠবে, আমি বলছি—পর্বত সরে যাবে মাথা নিচু করে
আশার ডানা মেলে তারা উঠবে সবার উপরে॥

ইতিহাসের স্রষ্টা

সেদিন পার হয়ে গেছে, যখন শুধু মাত্র নেতাদেরই মনে করা হত ইতিহাসের স্রষ্টা বলে, শ্রমিক এবং কৃষকদের কথা হিসাবের মধ্যে আনা হত না। জাতি এবং রাষ্ট্রসমূহের ভাগ্য বর্তমানে শুধু নেতাদের দিয়েই নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় প্রথমত এবং প্রধানত লক্ষ লক্ষ মেহনতী জনসাধারণ দ্বারা। —স্তালিন

একটি কাল যখন শুরু হয় তখন তাকে এমন কতকগুলি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যা তৈরি অবস্থায় আগে থেকেই উপস্থিত। মহামানবেরা শুধু সেই পরিমাণে মূল্যবান, যে পরিমাণে তাঁরা এই পরিস্থিতিগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে এবং কিভাবে তা পরিবর্তন করা যায় তা বুঝতে সক্ষম হন।

—স্তালিন

এ কথা বোঝার সময় এসেছে যে পৃথিবীতে যতরকম মূল্যবান পুঁজি আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান এবং সবচেয়ে নির্ধারক (decisive) পুঁজি হল জনগণ, কর্মীগণ। —স্তালিন।

স্তালিনের চিঠি ঃ বিল্-বিয়োলোৎসের্কভ্স্কিকে

কমরেড বিল্-বিয়েলোৎসের্কভ্স্কি,

লিখতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তবু একেবারে না লেখার চেয়ে দেরিতেও ভালো।

১। আমার মনে হয় যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে (এবং ঐ একই কারণে নাট্য বিষয়েও) "দক্ষিণে" না "বামে" এই ভাবে প্রশ্ন তোলাই ভুল। "দক্ষিণে" না "বামে" এই ধারণা আমাদের দেশে এখনও পার্টিগত ধারণা, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এই ধারণা পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবন-সংক্রান্ত। "দক্ষিণপন্থী" বা "বামপন্থী" তারাই যারা পার্টির নির্দিষ্ট নীতির এদিকে কিংবা ওদিকে গিয়ে পড়ে। সুতরাং, পার্টির বাইরেকার ক্ষেত্রে, এবং সাহিত্য, নাট্য ইত্যাদি যা কিছু তার চেয়ে অনন্তগুণ বেশি ব্যাপক, সেখানে এই সব ধারণা প্রয়োগ করা অস্বাভাবিক হবে। পার্টির কোনো কোনো (কমিউনিস্টদের নিয়ে গড়া) ইউনিটের প্রতি অবশ্য এই ধারণা প্রয়োগ করা যেতে পারে। একই ইউনিটের মধ্যে "দক্ষিণপন্থী" ও "বামপন্থী" থাকতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে, যখন তাতে সব রকম ধারা, এমন কি সোবিয়েত-বিরোধী ও প্রকাশ্যে বিপ্লববিরোধী ধারা গর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, তখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধারণাগুলি প্রয়োগ করার অর্থ সব কিছু ধারণাকেই একেবারে উল্টে-পাল্টে দেওয়া। শ্রেণীগত ধারণা, বা এমনকি "সোবিয়েত", "সোবিয়েত-বিরোধী", "বিপ্লবী", "বিপ্লব-বিরোধী" ইত্যাদি ধারণা দিয়েই সাহিত্য বিচার করা সবচেয়ে সংগত।

২। উল্লিখিত বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে "গোলোভানভ্বাদকে"* আমি "দক্ষিণ" বা "বাম" এই রকম কোনো বিপদ বলে মনে করি না ঃ কারণ, তা পার্টির অন্তর্গত কোনো ধারা নয়। "গোলোভানভ্বাদ" সোবিয়েত-বিরোধী উপসর্গের পর্যায়ভুক্ত। এই থেকে অবশ্য সিদ্ধান্ত করা চলে না যে গোলোভানভ্ শোধরাতে পারেন না বা নিজের ভুল তিনি নিজেই নিরসন করতে পারেন না, কিংবা ভুল স্বীকার করতে রাজী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অভিযুক্ত করা, তাঁর পিছনে লাগা, বা তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা উচিত।

আরেকটি দৃষ্টান্ত বুল্গাকভের রচনা "পলায়ন"; "দক্ষিণ" বা "বাম" কোনো রকম বিপদ এতেও নেই। সোবিয়েত-বিরোধী দেশত্যাগীদের কোনো কোনো অংশের প্রতি করুণা, হয়তো বা সহানুভূতি জাগানোই "পলায়ন" নাটকের উদ্দেশ্য। অতএব, সমগ্রভাবে বা অংশত "হোয়াইট গার্ডদের" স্বার্থে সাফাই গাওয়াই এর উদ্দেশ্য। এই কারণেই "পলায়ন" নাটকটি সোবিয়েত-বিরোধী উপসর্গের অন্যতম।

তা সত্ত্বেও "পলায়ন" নাটক প্রকাশ্যে অভিনয়ের বিরুদ্ধে বলার আর কিছুই আমার থাকত না যদি বুল্গাকভ তাঁর আটটা দিবাস্বপ্নের সঙ্গে আরও একটি বা দুটি জুড়ে দিয়ে

বিল্-বিয়েলোৎসের্কভ্স্কি নিজে শ্রমিক। সোবিয়েত ইউনিয়নে গৃহযুদ্ধ, নাশকতা-বিরোধী সংগ্রাম ও পঁচসালা পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। তাঁর কাছে লেখা স্তালিনের এই চিঠির তারিখ ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯। ইংরেজি বা বাংলায় অদ্যাবধি এই চিঠির কোনো অনুবাদের কথা আমাদের জানা নেই। —অনুবাদক

* জনসাধারণের বিপ্লবী আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ নিয়ে রচিত নতুন নাটক অভিনয় করা এবং পুরানো নাটকগুলিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজার বিরুদ্ধে ১৯২৬-২৮ সালে মস্কো বল্শয় থিয়েটারের গোলোভানভ্ তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। পরে, পার্টির হস্তক্ষেপের ফলে "গোলোভানভ্বাদে"র অবসান ঘটে, এবং সোবিয়েত নাট্যলোক থেকে বুর্জোয়া কায়দায় থিয়েটার চালাবার পুরাতন পদ্ধতি ও আচার নির্বাসিত হয়।

দেখাতেন সোবিয়েত ইউনিয়নে গৃহযুদ্ধের আভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তিগুলি কী ছিল; দর্শকরা তাহলে বুঝতে পারতেন যে তাঁর ঐ সব দেবদূত আর অধ্যাপক, স্বভাবতই যারা "সৎ", তাদের যে রাশিয়া থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে, তার কারণ বল্‌শেভিক-দের বদ্‌খেয়াল কিছু নয়—কারণ যে এরা ("সৎ" হয়েও) জনগণের ঘাড়ে চেপে খাচ্ছিল; আর, বল্‌শেভিকরা এই সব "সৎ" শোষণপন্থীদের দূর করে দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের ইচ্ছা-পূরণ করেছে; সুতরাং, তারা যা করেছে তা খুবই সংগত।

৩। বুল্‌গাকভের নাটক এত ঘন ঘন অভিনীত হচ্ছে কেন? নিঃসন্দেহে, এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের নিজস্ব এমন কোনো নাটক নেই যা মঞ্চস্থ করা যেতে পারে। এই কানা দেশে "তুর্বিন্‌দের আমলে"* প্রণেতা বুল্‌গাকভও রাজা। অ-প্রলেতারীয় সাহিত্যের "সমালোচনা" করা ও তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দাবি করা খুবই সহজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু যা সহজ তাই যে ভালো এমন মনে করার কারণ নেই। নিষিদ্ধ করা নয়, বরং সত্যই মনো-গ্রাহী, শিল্পসম্মত এবং সোবিয়েত চরিত্রসম্পন্ন নাটক পাল্লা দিয়ে সৃষ্টি করে নতুন ও পুরাতন অ-প্রলেতারীয় আবর্জনাকে মঞ্চ থেকে পদে পদে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই হচ্ছে কাজ। পাল্লা দেওয়ার কাজটা এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ প্রতিযোগিতার আবহাওয়া ছাড়া আমাদের প্রলেতারীয় সাহিত্য কিছুতেই তৈরি হতে ও দানা বাঁধতে পারে না।

"তুর্বিনদের আমলে" নাটকখানি সম্পর্কে বিশেষ কবে বলার কথা এই যে এটা তেমন কিছু খারাপ নয়, কারণ এই নাটক মন্দের চেয়ে ভালোই করে বেশি। ভুলে যাবেন না যে, দর্শকদের মনে মূলত যে ছাপটা পড়ে তা' বল্‌শেভিকদের প্রতি অনুকূলঃ "তুর্বিন্‌দের মতো যারা তারাও যদি আত্মসমর্পণ করে জনতার ইচ্ছাশক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়ে থাকে এই বুঝে যে তারা যা নিয়ে লড়ছে তাতে পরাজয় নিশ্চিত, তাহলে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে বল্‌শেভিকদের সঙ্গে আর পেরে ওঠার উপায় নেই।" "তুর্বিন্‌দের আমলে" নাটকখানি বল্‌শেভিকবাদের অপরাজেয় শক্তিকেই রূপ দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই রূপায়ণে নাট্যকারের "দায়িত্ব" কিছুমাত্র নেই। কিন্তু তাতে আমাদের কি এসে যায়?

৪। কমরেড স্‌ভিদের্‌স্কি প্রায়শই খুব অস্বাভাবিক রকম ভুল ও বিচ্যুতি করে বসেন, একথা ঠিকই। কিন্তু একথাও ঠিক যে পাঠ্য-কমিটির কাজেও কম ভুল হয় না, বরং উল্‌টোটাই বেশি সত্য। স্মরণ করে দেখুন "লোহিত দ্বীপ", "সমানে সমানে চক্রান্ত" এবং এই জাতীয় জঞ্জালের কথাঃ কেন জানিনা, এগুলি অতি সহজেই কার্মেনি থিয়েটারে অভি-নীত হবার অনুজ্ঞপ্তি পেয়েছে। কার্মেনি থিয়েটারও আসলে একটা বুর্জোয়া রঙ্গমঞ্চ।

৫। "উদারনৈতিকতা" সম্পর্কে যে "হট্টগোল" সে বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো,—ও কাজটা মস্কোর বুর্জোয়া নিন্দুকদের উপরই ছেড়ে দিন।

—জে, স্তালিন

["এতুদ্‌ সোবিয়েতিক্‌" নামক ফরাসি মাসিকপত্র (জানুয়ারি, ১৯৫০) থেকে অনুবাদ করা হল। অনুবাদক—রণজিৎ গুহ।]

---

* মিখাইল বুল্‌গাকভ, এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের কুখ্যাত সোবিয়েত-বিরোধী লেখক। "হোয়াইট্‌ গার্ড" নামক তাঁর উপন্যাস "তুর্বিন্‌দের আমলে" এই নামে মঞ্চস্থ হয়। গৃহযুদ্ধের যুগে ইউক্রাইনে তুর্বিন্‌ পরিবারের সোবিয়েত-বিরোধী কার্য-কলাপের প্রশস্তি এই নাটকের উপজীব্য। বুল্‌গাকভ্‌ এছাড়াও আরও কয়েকখানি নাটক ও ছোট গল্প লেখেন।

কবিতা

কমরেড ষ্টালিন

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

দিনে দিনে রূপবতী হবে পৃথিবী
দিনে দিনে
পাখি দেবে একটু ক'রে সুর ওর গলায়
সূর্য দেবে চোখে ওর লাস্য
ফুল দেবে দেহ ঘিরে ভালবাসার মৃদু গন্ধ
দিনে দিনে পৃথিবী হবে পূর্ণ-যুবতী, দিনে দিনে—
শুধু থাকবে না সেই শান্ত স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিটুকু
সেই বিশাল চোখজোড়া স্বপ্ন
শুধু থাকবে না সেই সব-প্রেমিকের-সেরা প্রেমিক।

সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে অবিচল
দিগ্‌ভ্রান্ত রাত্রে এক স্থির নিষ্কম্প ধ্রুবতারা
ক্রেমলিনের সেই তিনটি ঘর, সেই তিনটি ঘরের আলো
নিবে গেল।

দিনে দিনে ভ'রে উঠবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইউক্রেন
দানিয়ুব-ভল্গা-ইয়াংসি-ইয়ালু সাতসুরে-সাধা সুখ
আর যৌথখামারের চাষী, স্টালিন মোটর-কারখানার মজুর,
এশিয়ার মুক্তিফৌজ কোরিয়া ভিয়েৎনাম মালয়
এক জয় থেকে আরেক জয়ে এগিয়ে যাবে
আর মা'র অশ্রু
স্ত্রীর দাঁতে-দাঁত-চাপা ধৈর্য
ছেলেটার নির্বাক চাউনি প্রহর গুনবে
প্রহর গুনবে
প্রহর গুনবে দীন হীন ভারতবর্ষ।

সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে অবিচল
দিগ্‌ভ্রান্ত রাত্রে এক স্থির নিষ্কম্প ধ্রুবতারা
ক্রেমলিনের সেই তিনটি ঘর, সেই তিনটি ঘরের আলো
আর জ্বলবে না।

শুধু ক্রেমলিনের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজবে রাতভর—
একটা...দুটো...তিনটে...
আর যারা হতে চেয়েছিল ফুট্‌ফুটে মেয়ের বাপ, সোহাগী বৌয়ের স্বামী
আর যাদের হতে হয়েছে রাইফেল-কাঁধে একহাঁটু কাদার শিকার
যারা মানুষ হতে চেয়েছিল আর যারা পেয়েছে জন্তুর আদিম জীবন—
ক্ষতমুখ থেকে যন্ত্রণা-নিঙড়নো গলায়, অস্থ্য রক্তঝরা গলায়
ইওরোপ এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকার সেইসব মানুষ, কোটি কোটি মানুষ
যতবার তোমাকে ডাকবে
যতবার ওরা তাকাবে শান্তির দিকে, ততবার
ক্রেমলিনের চূড়োয় একটা উজ্জ্বল লাল তারা দপ্‌দপ্‌ করছে দেখবে।

আর রাত্রির তৃতীয় যামে আশার দিগন্ত সামনে রেখে
এই শ্মশান পায়ে পায়ে মাড়িয়ে আমরাও এগোব—
আর হঠাৎ জন্তুর জোয়াল ঝেড়ে ফেলে মানুষের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়াব আমরা
পাঁজর-ফাটানো একটা হিংস্র চিৎকারে ফেটে পড়ব হঠাৎঃ স্টালিন!

দিনে-দিনে-বাড়ন্ত-গড়ন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে
ভালবাসার গাঢ় স্বরে বলবঃ স্টালিন!

পরস্পরের হাত চেপে ধরব আমরা, চোখে চোখ রাখব, ডাকবঃ স্টালিন,
কমরেড স্টালিন!

কে বলে তুমি নেই

মণীন্দ্র রায়

আকাশে যতোকাল প্রবল গৌরবে
সূর্য সমাসীন, আলোর ডাকে তার
পৃথিবী মেলে দল শ্রমের সৌরভে,
শোণিতে বাজে তারই জ্যোতির ঝংকার।

সন্ধ্যা নামে যেই, আঁধার ফণা তোলে;
তখনই বুঝি, নেই সূর্য নেই আর!
হাজার ঘরে ঘরে প্রদীপ ওঠে জ্বলে;
সূর্য নেই, আছে অগ্নিশিখা তার!

জ্যোতির উৎস হে! পৃথিবীময় সেই
আবেগে জ্বলে আজ উত্তরাধিকার।
কে বলে নেই তুমি? আছ তো এখানেই,
আমারও দুটি চোখে জ্বলে সে দীপাধার॥

দুঃস্বপ্ন-রাত্রির ধ্রুবতারা

জগন্নাথ চক্রবর্তী

তুমি ঘুমাও, কমরেড!
তোমার স্বপ্নেরা এবার মাথা তুলুক একে একে
তোমার স্বপ্নেরা এবার জাগুক।

দুঃস্বপ্ন-রাত্রির ধ্রুবতারা! কমরেড স্তালিন,
তোমার আলোয় নাবিকেরা নোঙর খুলুক এবার,
পথিকেরা পথ দেখুক, সৈন্যেরা শত্রু চিনুক,
আঘাত হানুক বজ্রের মতো, ইস্পাতের মতো, তোমার মতো।

তোমার পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা
দুর্গম দুস্তর প্রান্তর পেরিয়ে
দুর্লঙ্ঘ্য গিরিচূড়া ডিঙিয়ে
স্থির নিষ্ঠায় আমরা তালে তালে পা ফেলে চলেছি।
দুনিয়ার সমস্ত মিছিল এসে মিলেছে একটি মাত্র মিছিলে
যার পুরোভাগে রয়েছো তুমি, কমরেড স্তালিন,
রয়েছে তোমার অম্লান পতাকা।

তোমার বন্ধুত্বে আমরা মহীয়ান্,
তোমার বীরত্বে আমরা বীর;
তোমাকে যদি ভালবেসে থাকে এশিয়া
তবে সেই ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পরিচয় সে দিক
কোরিয়ায়, ফরমোজায়, ইন্দোচীনে;
এশিয়ার মাটিতে গড়ে তুলি আমরা লক্ষ লক্ষ স্তালিনগ্রাদ
তোমার দুর্ভেদ্য নামে।

ক্রেমলিনের গম্বুজ থেকে তুমি একটি পারাবত উড়িয়ে গেছ
সে-পারাবতের জন্য আমরা বাসা বাঁধছি কোটি হাতে।
তুমি ঘুমাও,
তোমার শ্বেত কপোত গঙ্গা, গোদাবরী, হোয়াংহোর তীরে তীরে উড়ুক
নতুন দিনের স্বাদ এনে দিক পৃথিবীতে,
হো-চি-মিনের লক্ষ্য আরও অব্যর্থ হোক তোমার প্রেরণায়,
ত্বরান্বিত হোক মাও সে-তুঙের সৃষ্টিসৌধ—নয়াচীন,
মুক্তির সিংহদ্বারে পৌঁছাক ভারতবর্ষ সাহসী পদক্ষেপে।

তোমার অমর স্বপ্নেরা এবার জাগুক দেশে দেশে,
তুমি ঘুমাও।

মহাপ্রাণ স্তালিন

মায়া সরকার

সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর রক্তজিহ্ব লেলিহান সাপ
তোমার বাঁশির সুরে মন্ত্রমুগ্ধ হল নতফণা;
মেহনতি দুনিয়ার প্রিয়তম তুমি কমরেড,
অযুত সংগ্রাম শেষে অকস্মাৎ নিলে বিশ্রাম।

পূর্বাশায় হাহাকার ক্রন্দনমুখর দিগ্বধূ,
বিধবা পৃথিবী কাঁদে, সূর্যহারা শোকে বিহ্বল,
শোষিতের ব্যথিতের ধ্রুবসখা কোথায় স্তালিন
সংগ্রামী জনতা ম্লান লাল ঝাণ্ডা বেদনাকম্পিত।

বৃথা শোক, কেন শোক, চীন আর রুশিয়ার পথ
বিস্তারিত পৃথিবীর নদী মাটি আকাশের বুকে।
আমাদের ভালোবাসা ঘরে ঘরে রাখী দেবে বেঁধে,
আমরাই হব কাল দিকে দিকে হাজার স্তালিন।

আমাদের হাতে আছে মহামতি স্তালিনের হাত
আমাদের বুকে ঢাকা যুগ-সূর্য স্তালিনের প্রেম
আমাদের চোখে হোক প্রসারিত স্তালিনের পথ
জনতার দৃঢ় বাহু লিখে নেয় রক্তের শপথ।

হাজার বছর পরে

অজয় সেন

অনেক বছর পরে বহুযুগ অতিক্রান্ত হলে,
যখন পৃথিবী লেখে আরেক নূতন ইতিহাস;
সূর্যের তোরণদ্বারে সবুজের অক্লান্ত প্রকাশ;
যখন প্রান্তরে গান, ঢেউয়ের শিশুরা কথা ব'লে,—

সময়-সমুদ্রতীরে দস্যিছেলে সারাদিন খেলে,
হঠাৎ বিস্ময়ে ভাবে,—প্রহরী-মূর্তিটা ছুটি পেলে
অনেক বছর পরে নিষ্পলক তৃপ্তচোখ মেলে
পুরানো বন্ধুর মতো ডাক দেবে গাঢ় সম্ভাষণে!

তখন মায়ের কোলে মুগ্ধশিশু রূপকথা শোনে,—
—হাজার বছর আগে ব্যাকুল রাত্রির আহ্বানে
আকাশে নক্ষত্র জেবলে,
তারপরো অন্তহীন প্রাণে
আশ্চর্য জীবন জেবলে দিয়ে গেছে পৃথিবীর দিন—
মৃত্যুহীন জোসেফ স্তালিন।

আমরা প্রহরী

নন্দদুলাল সরকার

মাথার উপরে দিগন্ত প্রসারিত ভালোবাসার আকাশ
চোখের সামনে অন্নপূর্ণা মাঠ আর কুলকুল চঞ্চলা নদী
বুকের গভীরে অপরাজেয় হৃদয়

প্রশ্ন করলাম, কী দিতে পারো তোমরা
আকাশ বললঃ ভালোবাসা
মাঠ বললঃ প্রাণ
নদী বললঃ গান
হৃদয় বললঃ শান্তি

প্রশ্ন করলাম
হে আকাশ, কে তাড়াল কালো মেঘ
ঃ মহান স্তালিন, যার নাম শান্তি
হে মাঠ, হে নদী বলো
কে দিল তোমার বুকে প্রাণ, কে দিল তোমার মুখে গান
ঃ বন্ধু স্তালিন, যার নাম মৈত্রী
হে প্রিয় হৃদয়, কি করে অজেয় হলে, কে ছিল তোমার আগে
ঃ প্রিয়তম স্তালিন, যার নাম স্বাধীনতা
তাহলে স্তালিন নাম শান্তির প্রতীক!
তাহলে স্তালিন নাম মৈত্রীর সংগীত!
তাহলে স্তালিন নাম মুক্তির পতাকা!

আমরা প্রহরী তবে স্তালিন নামের॥

তুমি আছ

কৃষ্ণ ধর

এ মেঘের জন্মদিনে তৃষ্ণায় চৌচির মাটি
চেয়েছিল শ্রাবণের ঢল। সমুদ্রের নোনাজলে
এসেছিল বহুকাল প্রতীক্ষার বান। দুরন্ত ঝড়ের
পাখায় ভেসে এল জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী গান।
ধানভানা শেষ হলে গ্রামান্তের কুটিরে কুটিরে
কৃষাণী বধূর কণ্ঠে জেগেছিল ফসলের গান।

এ মেঘের জন্মদিনে
ধান সব হয়ে গেল গান॥

পদাহত দিনে এল আকাঙ্ক্ষার কঠিন
প্রত্যয়। মানুষের ইতিহাসে কতকাল,
কতকাল পরে সে বিশ্বাসে সাড়া দিল
দেশঃ প্রার্থনায় প্রসারিত প্রশান্ত হৃদয়ে
ডেকে নিল, তোমাকে যে ডেকে নিল কাছে।

এ বসন্তে তুমি এলে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর ধ্বনি
তুলে, শীতার্ত অরণ্য বৃক্ষে প্রত্যাশার মঞ্জরী
ফোটায়ে। আলোর শায়কে গেঁথে বিষণ্ণ
রাত্রিকে দূরে ঠেলে।

সে তোমার জন্মদিন। প্রতিদিন তারে আজ ভাবি
বেদনার ইতিহাসে এ উৎসব কতদিন, কতযুগে
আসে?—তুমি এলে, তুমি এলে
এ হৃদয়ে সমুদ্র কল্লোল। তুমি এলে নিরুত্তাপ
রক্তে দিয়ে দোল।

নামহীন সেই মেঘ এনে দিল আকাঙ্ক্ষিত দিন
তুমি আজ জোসেফ স্তালিন।

তোমার বিনিদ্র চোখে ঘুম নেই আলোকের
ব্যগ্র আমন্ত্রণে। তোমার হাতেই জ্বালা
সে আলোক ঝড়ে জলে অকম্পিত জ্বলে।
পাথর কঠিন রাতে সে আলো তো নিয়ে আসে
প্রত্যাশার ভোর।

ইতিহাসে তুমি আছ, তুমি আছ নিরন্নের
সকরুণ দিনে, তুমি আছ মিছিলের গানে।
রোদে জলে মাটি মাখা মানুষের সহস্র
হৃদয়ে, হে বন্ধু তোমার সত্তা অনির্বাণ
প্রেরণায় জ্বলে। তোমার অমর নাম
মানুষেরে এনে দেয় বাঁচার আবেগ,
পোড়ামাঠে নিয়ে আসে শস্যের ইঙ্গিত।

দুঃসহ কান্নার দেশে জীবনের তুমিই সঙ্গীত॥

ফিরে আসবে

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

হাজার হাজার ফুল দিয়ে ঘুমকে ঘিরে দিলাম,
তোমার শয্যা দিলাম লেনিনের কাছে,
ক্রেমলিন প্রাকারের নিচে পিতার সমাধির চারদিকে
আমরা নীরবে জমায়েত হলাম।
আমাদের আয়ুর বেহালায় করুণ সুরের সে কী মূর্ছনা,
যেন নিভল তিনদশকের ধ্রুবতারা
যেন পারাপারে হারিয়ে গেল আলোক,
দেখি সোবিয়েতের সকল মায়ের হাসি গেছে মিলিয়ে
দেখি শোকযাত্রায় আমরা এসেছি মস্কোয়।

তোমাকে হারিয়ে এলাম বন্ধু,
আমার কচি মেয়েকে কী করে বোঝাই, কে তুমি,
গঙ্গার কূল থেকে ভল্‌গা—সে অনেক দূর।
কী করে ওর দৃষ্টিকে পৌঁছাই তোমার জনপদে
আদিগন্ত শস্যাকীর্ণ বিপুল দেশের কাছে
সকল বঞ্চিতের আশার প্রথম মোহনা সোবিয়েতে
তুমি যাকে তিল তিল করে গড়েছ
যাকে জেবলে দিয়েছ আকাশ-প্রদীপ করে
পাছে আমরা পথ না-হারাই।
আহা, আমার মেয়েটি এখানে যক্ষ্মার জীবাণু ঘাঁটাঘাঁটি করে,
কৃষ্ণচূড়ার একটি শাখায় ভর করেছে এক ঝাঁক শকুন,
বলো, এই বস্তিতে কী করে চেনাই তাকে তোমার আকাশ,
আমার কচি মেয়ের গলায় আজ যে ডলারের ফাঁস,
এখানে চলছে আধা-জারের আমল এখনো,
দেশের দামোদর চোখের সামনে বিক্রি হয়ে গেল,
থেকে থেকে শুনতে পাই তেপান্তর গমগম করে
মার্কিনী-পুতনা বাজখাই-হাসিতে বিচরণ করে
দুরু দুরু করে আমার কচিমেয়ের দুর্বল বুক,
তখনি শোনাই সমরখন্দের ক্রীতদাসীর মুক্তির ইতিহাস,
চোখে চোখে রাখি মেয়েকে—গল্প বলি স্তালিনের,
শেষে এক মুচির ছেলে কী করে দিগ্বিজয়ে বেরোলেন।

মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে নিয়ে অবাক হই,
কেন যে তোমার কথা কেবল মনে পড়ে,
ভুখ-মিছিল সাজাতে গিয়ে তোমার মুখ দেখি,
মশালের আলোয় তরুণ স্তালিনকে দেখি পাশে,
তোমার মুখ যেন আকাশ-জোড়া এক আয়না
সূর্যরশ্মিকে কয়লার খাদে প্রতিফলিত করে।

উজ্জ্বল পঞ্চমুখী তারা হয়ে ইশারা করে রাতে।
তাই তোমার নামে রবার বনে জাগে আলোর চরণধ্বনি,
স্পন্দন জাগে স্পেন আর মালয়ের ঘাসে ঘাসে,
দুর্বার তরঙ্গ জাগে ইরাবতী আর পদ্মায় নবজীবনের,
ঝড়ের মধ্যে যাত্রা করে কোরিয়ায় লালফৌজ,
মুক্তির শপথ গ্রহণ করে এশিয়ায় রঙ্ বেরঙের মানুষ
বজ্রের গর্জনে বসে প্রার্থনা করে স্থায়ী শান্তির।
চীনের আকাশকে জয়টীকা পরায় এশিয়ার ঊষা।

জানি তুমি ফিরে আসবে,
আসবে ভারতের কয়লার খাদে আলো জেবলে,
আসবে আসামের চা-বাগানের অন্ধকারে,
মালাবারী চাষীর রৌদ্রঝরা ধানী মাঠে,
আসবে রঙ্ কলের উপোসী শ্রমিকের নিচুঘরে
বিপ্লবের রাতে রাঙা আলোর প্রদীপ ধরে।
আসবে আমার নিচুতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরে,
আসবে ভয় ভেঙে দিতে কবির হৃদয়কন্দরে।

কালোত্তর

রাম বসু

মৃত্যু তাঁকে ছুঁতেও পারে না।

যতদিন সূর্যদেব পৃথিবীকে আরতি করবে
ষড় ঋতু বরনের দীপ
মূল রবে মধুবতী
দূরের হাওয়ার গানে রোমাঞ্চিত গাছ
নদী জল ঢালবে সাগরে
শস্যময়ী ধরা যতদিন
রবে তুমি কমরেড জোসেফ স্তালিন।

যতদিন অন্ধকারে ধানে দুধ আসবে গোপনে
শিশুর প্রথম কথা ফোটার উল্লাসে
গভীর মায়ের চোখ
আকাঙ্ক্ষার বীণা ঝিল্লীস্বর
কথার দমকা হাওয়া খুলে দেবে মনের কবাট
মেঘের ফাটল থেকে ওপছানো রোদের মতন

নামহীন সুখে নরনারী
চাক বাঁধা নিমগ্ন মৌমাছি
সুস্থতার ইচ্ছা যতদিন
রবে তুমি কমরেড জোসেফ স্তালিন।

অগ্নি, নদী, পৃথিবী ও তুমি চিরন্তন।

হিংসার সহস্র হলকা ঘিরে ফেলে
মরুভূমি বুকে উঠে আসে
পাপের পিশাচ হাতে অন্যায়ের উলঙ্গ কৃপাণ;
তখন একটা নাম।

আকাশ স্পর্ধার মতো
নিচে দুঃসাহস
রৌদ্রে জ্বলে অভ্রের পাহাড়
স্বপ্নময় চোখ দুই পাখি
দৃষ্টির অতীত থেকে আনে জল অরণ্যের গান।

সে এক নামের মন্ত্রে
মেঘ ডাকে প্রত্যয়ের স্বরে
সহস্র অরণ্য যেন এক সঙ্গে কথা বলে ওঠে
হাঁকে মত্ত রক্তের ডাকাত
সে এক নামের ধ্বনি স্বর যার আদি সাগরের।

সার্থক জনম মাগো
জন্মেছি এক মানুষের যুগে
যেখানে প্রতিটি মুখ দীপ্ত, অর্থময়
দিগন্তের প্রতীক মানুষ
পৃথিবী যৌবন
নদী ভালোবাসা
অহমিকা পুড়ে ছাই
শুচিতার সন্ধ্যাদীপ জ্বলে
কালজয়ী চেতনার চূড়ায় হৃদয়
রক্ত বর্ণ বিরাট পতাকা।
ব্যাপ্ত বোধ, বিস্তীর্ণ পরিধি।

কে তুমি কে তুমি বসে বিষাদের বিবর্ণ বিবরে
কে তুমি কে তুমি কাঁদো কবরের আঁধারের কোলে?
সম্পূর্ণ মানুষ এল
ছন্দ-পাওয়া বল্মিকীর মতো
চেয়ে দেখো স্তালিনের কাল।

কে তুমি কে তুমি কে?
গলিত মাংসের গন্ধ গায়
শিশুর নিষ্পাপ মুখে হানো কপটতা
মৃত্যুর উৎসবে মত্ত। কে?

সাবধান
দাঁড়িয়ে রক্তের কুন্ডে তুলেছি বল্লম
চারদিকে ঘিরেছি আমরা
পিছনে একটা মুখ
কোটি গ্রহ আলো দেয় তাকে।
ভাই বলে ডাক দেই
ভূগোলের বেড়া খসে পড়ে
জোয়ারে সাগর নদী এক
ঢেউ গাঁথে মন
কাল আজ আগামীর গোধূলির ঝড়ে
আকাশ প্রান্তর এক। স্তালিনের কাল।

বড় হতে হবে আমাদের।

মহান ষ্টালিন

বিমলচন্দ্র ঘোষ

"তদৈক্ষত অহম্ বহু স্যাম — তৎ তেজোঽসৃজত—"

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।৩।২

তিনি ইক্ষণ করিলেন আমি বহু হইব—তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।

তুমিও তোমার তেজ দিয়ে গেলে আমাদের বুকে
বিচ্ছেদের অগ্নিবাষ্প তাই এত বিষাদ-গম্ভীর
সান্দ্র সুরে ঘণ্টা বাজে কালের দেউলে
রক্তাভ চিন্তার মর্মমূলে.
গঙ্গা ভল্গা একাকার কল্লোল সঙ্গীতে।
সহস্র যোজন দূরে
শান্ততীর্থ সোভিয়েটে সারিবদ্ধ মৌন যাত্রীদল
দেশ দেশান্তর থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বোঝা
নিঃশব্দে বহন করে
প্রতিটি চোখের তারা রুদ্রতেজে বিষণ্ণ ভাস্বর।

রুশিয়ায় ক্রেমলিনের পুষ্পিত শয্যায়
শায়িত তোমার শব কী নীরব প্রশান্ত কঠিন;
চারিপাশে সুশৃঙ্খল রক্তদীপ জ্বলে।
অশ্রু কুয়াশায় ঢাকা অনির্বাণ শিখা শতদল
তোমার শান্তির মন্ত্রে দৃপ্ত অচঞ্চল
সুমহান সাম্যবাদী অমিতবিক্রম শিষ্যদল।

মহাবিশ্ব প্রগতির পথে
বিপ্লবের বাণীমূর্তি মূর্তিমন্ত কর্মের আধারে
তুমি ছিলে মানুষের মূর্ত ভালবাসা
যুগ যুগ নির্যাতীত জীবনের অন্তরঙ্গ আশা
অন্তরের উদ্দীপনা কল্যাণের সুদৃঢ় প্রত্যয়।
তুমি নেই। বিচ্ছেদের ক্ষণতমসায়
তুমি আজ সমাধিস্থ
অফুরন্ত চেতনার শিখা সঞ্চারণে
চির পরিশ্রান্ত হলে
তাই শোনা যায় ক্ষুব্ধ প্রগতির পথে
মন্থর শোকাবসন্ন বিচ্ছেদের গান
মর্মভেদী ঐক্যতানঃ স্টালিন! স্টালিন!

স্টালিন! স্টালিন!
তুমি আছো প্রাণে প্রাণে তবু তুমি নেই?
সুরক্ষিত সৃষ্টি আছে স্রষ্টা শুধু নেই!
তুমি নেই কমরেড স্টালিন
তুমি শুধু নেই
তুমি আছো সারা বিশ্বে তবু তুমি নেই।
এক ছিলে বহু হলে সাম্য চেতনায়
এক হলে বহুর আত্মায়
প্রবল প্রাণের তেজ রেখে গেলে আমাদের বুকে
রেখে গেলে অঙ্গীকার বস্তুবাদী বিশাল আত্মার
সুরক্ষিত সমানাধিকার।
এক ছিলে বহু হলে এক হলে বহুর আত্মায়
সংখ্যাহীন হতভাগ্যে ভাগ্যবান করে গেলে তুমি
মৃত্যুর সোপান বেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী সাম্য-সাধনায়।

হে বিরাট বিশ্বকর্মা, মহাকারিগর
ঐস্পাতিক আভরণে স্বদেশের বাড়ালে সম্পদ
জলবিদ্যুতের বেগে লাস্যময়ী মহাপ্রকৃতির
জাগালে প্রাণের দীপ্তি;

আদিম পশুর ঘৃণ্য শোষণের কারাদুর্গ ভাঙি
শৃঙ্খলমুক্তির ছন্দে সর্বহারা বিপ্লবের রথে
হে সারথি বিশ্বকর্মা অনন্য অতন্দ্র সাধনায়,
মরুতে ফোটালে ফুল, অঙ্গারে হীরক
পাষাণে শিল্পের মায়া।
অন্নপূর্ণা রুশিয়ার আদিগন্ত সোনার ফসলে
রোমাঞ্চিত প্রাণশস্য। তুন্দ্রাভূমি অহল্যা-তুষার
মহালক্ষ্মী রূপে আজ মূর্তিমতী তোমার পরশে।
স্বর্ণপ্রসূ স্টেপির ট্রাক্টরে
সীতার নূতন জন্ম দিলে
নবযুগ যন্ত্রধর হলধর জনকের বেশে।
এক ছিলে বহু হলে, এক হলে বহুর আত্মায়
তাই আজ পৃথিবীর বুকে
কল্পিত স্বর্গের চেয়ে মহীয়ান সোভিয়েট ভূমি
বিপ্লবের মহাতীর্থ
সে তীর্থের অপ্রমেয় তুমি তীর্থঙ্কর!

এক ছিলে বহু হলে কমরেড স্টালিন!
ঘৃণ্য উপনিবেশের শৃঙ্খলিত কৃতদাস আমি
ভারতীয় কবি আমি মধ্যযুগ অন্ধকারে আজো
যন্ত্রণায় শ্বাসরুদ্ধ;
আমারো সত্তায় তুমি আচ্ছন্ন করেছ দেহ মন
কম্প্রকণ্ঠে তাই বলে উঠি
নির্বোধ প্রাণীর মতো ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেঃ
স্রষ্টা তুমি, পিতা তুমি, হে শঙ্কর হে শঙ্কাহরণ
এক ছিলে বহু হলে মিশে গেলে মেধায় প্রজ্ঞায়
কল্যাণে বিজ্ঞানে শান্তি সাধনার অপূর্ণ জগতে।
অভিশপ্ত-ভারতের শ্বাসরুদ্ধ শৃঙ্খলিত আমি
বোবাকণ্ঠে যেন বলে উঠিঃ
আত্মা তব লোকায়ত তবু যেন লোকোত্তর তুমি
কাল্পনিক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মতো
শাশ্বত বিরাট প্রেমে সর্বশক্তিমান।

জ্বলন্ত শপথ জাগে অনির্বাণ তোমার মশালে
শান্তির মুক্তির রক্ত শিখা
মৃত্যুর সোপান বেয়ে অমৃতত্ব দিয়ে গেলে তুমি
প্রবঞ্চিত মানুষের মুমূর্ষু প্রাণের অন্ধকারে
দিয়ে গেলে রুদ্রতেজ প্রজ্বলন্ত মুক্তির মশাল
লেনিনের মন্ত্রপূত আত্মার আগুনে।

সে আগুনে বহ্নিমান উপেক্ষিত মানবেতিহাস
সে আগুন জ্যোতির্ময় নির্ধূম রক্তাভ বরাভয়
সে আগুনে জ্বলে ওঠে ধনবাদী শয়তানের চিতা।

তুমি নেই, শোকাচ্ছন্ন পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে
আজো যারা শৃঙ্খলিত
আজো যারা শোষিত লাঞ্ছিত
যুদ্ধবাদী পিশাচের চক্রান্তের ক্রূর ফাঁসিকাঠে
আজো যারা বলিদান,
পায়নি মুক্তির স্বাদ যারা
দেখে নাই সোভিয়েট দেখেনি তোমায়
তাদের বুকের মূক-সমুদ্রের তরঙ্গ দোলায়
অতন্দ্র তোমার নাম তরঙ্গিত জাগে রাত্রিদিন
শান্তিশুভ্র অঙ্গীকার মৃত্যুঞ্জয়ী মহান স্টালিন।

[৬ই মার্চ, ১৯৫৩]

বসন্ত

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আজ অনেক ফুল ফোট্‌বার দিন,
আজ অনেক গান গাইবার প্রাণ
জমেছে সারা দেশে, জম্‌ছে এই দিন
তোমার বিশ্রাম! তোমার বিশ্রাম!!
কমরেড্‌ স্টালিন!!

পৃথিবীতে চির-বসন্ত আনবার কাজে ক্লান্ত
হয়ে পড়েছ ঘুমিয়ে।
নীল পাহাড়ের উচ্চ চূড়ার স্বর্ণ ঈগল—
ছিলে প্রহরায়—
তাই গান বেড়ে উঠেছে, ফুল ভরে উঠেছে,
শান্তি গড়ে উঠেছে ঘরে ঘরে।

আজ অনেক ফুল ফোট্‌বার দিন,
আজ অনেক গান গাইবার প্রাণ
জমেছে সারা দেশে, জম্‌ছে এই দিন
তোমার বিশ্রাম! তোমার বিশ্রাম!!
কমরেড্‌ স্টালিন!!

আমার সদ্য-ফোটা শিশুপুত্রকে
রঙীন্ খেলনার আশ্বাস দিয়েছিলে—
কচি গাছকে বেড়ে ওঠবার আশ্বাস দেয় সূর্য—
পৃথিবীর ঘরে ঘরে সে আশ্বাস সহজ নিশ্বাসের মতো
ছড়িয়ে পড়েছিল—
নূতন মাঠ নদী পাহাড়
তার নবজীবনের পাঠ—
একটানা নূপুরের মতো বেজে চলেছে তার মনে।
কমরেড্, আমার মেয়েটিও মুক্তবেণী নদী,
বেড়ে উঠেছে, নাচতে শিখেছে,
হাওয়ার দোলায়, পাখির গানে।
গ্রামের চড়কের মেলায় কেনা
ছ'পয়সার বাঁশি বাজায় সে সারাদিন।
তারা দুজনে আমার গলা ধরে গভীর আবেগে
তোমার কথা সুধিয়েছিল একদিন।
বলেছিলাম তুমি আছ—
হঠাৎ খুশি হয়ে আমাদের ভাঙা ঘরে
একদিন চা খেতেও আসতে পারো।
ছেলেমেয়েদের সেই উচ্ছল হাসির বন্যা
আমার ঘর ছাপিয়ে সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ অনেক ফুল ফোট্বার দিন,
আজ অনেক গান গাইবার প্রাণ
জমেছে সারা দেশে, জম্ছে এই দিন
তোমার বিশ্রাম! তোমার বিশ্রাম!!
কমরেড্ স্টালিন!!

আমাদের অনেক কাজ দিয়ে গেছ, কমরেড।
দৈত্যদের দাপাদাপিতে কান পাতা দায়।
শিশুরা হক্চকিয়ে আতঙ্কে কান পেতে
শোনে সেই দানবীয় হুঙ্কার...
তাদের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে,
তুমিই পথ দেখিয়ে গেছ...।
অনেক বুভুক্ষাকে সরাতে হবে
অনেক দস্যুতার অবসান ঘটাতে হবে।
অনেক জ্বালা, অনেক বিস্ফোরণের পর
তোমার প্রতিশ্রুত গানের আসরটা
জমাবই শপথ করছি...

আজ অনেক ফুল ফোট্‌বার দিন,
আজ অনেক গান গাইবার প্রাণ
জমেছে সারা দেশে, জম্‌ছে এই দিন
তোমার বিশ্রাম! তোমার বিশ্রাম!!
কমরেড্‌ স্টালিন!!



স্তালিন ও শান্তি

কল্যাণ দত্ত

(১)

স্তালিনের শান্তি নীতি আজ স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেছে এমন সব লোকেদের মধ্যেও যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী নন। এটা সোবিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির ন্যায্যতা ও মর্যাদারই পরিচয়। এই পররাষ্ট্রনীতি যে মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। লেনিনের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক স্তালিন। লেনিনবাদকে বর্তমান দুনিয়ার রাজনীতিতে সৃষ্টিশীলভাবে প্রয়োগ করেই স্তালিন তাঁর শান্তিনীতি রচনা করেছেন।

লেনিন বলেছেন, "সমাজতন্ত্রীরা সব সময়েই জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে বর্বর ও নৃশংস বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জোয়া শান্তিবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের থেকে মূলত পৃথক।... আমরা মার্কসবাদীরা শান্তিবাদী ও নৈরাজ্যবাদী দুদলের থেকেই পৃথক, কেননা আমরা মনে করি, প্রত্যেক যুদ্ধকেই আলাদাভাবে বিচার করা দরকার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে (মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দিক থেকে)।"

[ওয়ার অ্যান্ড সোশ্যালিজ্‌ম্‌, পৃঃ ১১-১২]

শান্তিবাদীরা সব যুদ্ধেরই বিরুদ্ধে। মার্কসবাদীরা প্রত্যেকটি যুদ্ধকে বিচার করে দেখেন সেই যুদ্ধ কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে লড়া হচ্ছে, এবং সেই শ্রেণীর ভূমিকা প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়াশীল। প্রগতিশীল শ্রেণীর স্বার্থে যুদ্ধ ঘোষণা হলে মার্কসবাদীরা তাকে সমর্থন করেন কেননা সে যুদ্ধের ফলে প্রগতির শক্তি বাড়বে। প্রতিক্রিয়ার স্বার্থে যুদ্ধ ঘোষণা হলে মার্কসবাদীরা তার বিরোধিতা করবেন।

ফরাসি বিপ্লবের পর ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ইউরোপের বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধ চালিয়েছেন তা প্রগতিশীল। কেননা ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়ারা তখন ছিল প্রগতিশীল আর সামন্ততন্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে লেনিন বলছেন, "ফ্রান্স যে সমস্ত বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল তার মধ্যে পররাজ্য দখল লুটপাট ইত্যাদি করা হয়েছিল সত্য কিন্তু তাতে করে এই সমস্ত যুদ্ধের মূল ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি কেননা এই সব যুদ্ধ পুরানো দাস-প্রথা-জর্জরিত ইউরোপের স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে চুরমার করে দিয়েছিল।"

[লেনিন, ঐঃ পৃঃ ১৩]

পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হল সাম্রাজ্যবাদী যুগে। বুর্জোয়ারা তখন স্বাধীনতার লড়াই, সামন্ততন্ত্র বিরোধী লড়াই ছেড়ে দিয়ে উপনিবেশ দখল করা আর উপনিবেশ ভাগাভাগির লড়াইয়ে মেতে উঠল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তাই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর স্বার্থে এবং শ্রমিক, মেহনতি জনতা ও

উপনিবেশের জনগণের শোষণ তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে। সোবিয়েত ইউনিয়নের জন্মের আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র বিশ্লেষণ করে লেনিন বলেছিলেনঃ

"এই যুদ্ধের প্রথম লক্ষ্য, উপনিবেশগুলিকে আরও 'ভাল' করে ভাগাভাগি করে এবং পরে তাদের উপর সবাই মিলে শোষণ চালিয়ে তাদের দাসত্ববন্ধনকে আরও পাকা করা; দ্বিতীয়ত বৃহৎ শক্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত জাতি আছে তাদের উপর অত্যাচারকে পাকাপোক্তভাবে চালানো, কেননা অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া দুটি দেশের শাসকই তাদের দেশের জাতিগুলির উপর অত্যাচার চালিয়ে এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সে অত্যাচারকে তীব্রতর করে তাদের শাসন কায়েম রাখে। এ যুদ্ধের তৃতীয় লক্ষ্য হল মজুরদের দাসত্বকে জীইয়ে রাখা ও পাকা করা কেননা জাতীয়-বিদ্বেষ বাড়িয়ে এবং প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করে মজুরদের ঐক্যকে ভাঙা হয়, তাদের দমন করা হয় অন্যদিকে পুঁজিপতিরা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মুনাফা লুটতে থাকে।" [লেনিন, ঐ, পৃঃ ১৯]

প্রথম মহাযুদ্ধের এই ছিল চরিত্র। শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই যুদ্ধে নিযুক্ত দুই পক্ষই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তাই কে ভাল কে মন্দ, কে আক্রমণকারী আর কে আক্রান্ত এই প্রশ্ন ছিল অবান্তর। শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ ছিল অন্যায় যুদ্ধ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এমন ছিল যে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা এই অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি জনতার উপর। তাই যুদ্ধ যখন অনিবার্যভাবেই এসে গেল, লেনিন তখন আহ্বান জানালেন—"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর।" এই যুদ্ধের প্রতি মার্কসবাদীদের দৃষ্টি কি হওয়া উচিত ছিল? লেনিন লিখেছেনঃ "এই প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধে যে কোনোও বিপ্লবী শ্রেণী নিজের দেশের সরকারের পরাজয়ই কামনা করে কেননা সামরিক বিপর্যয়ের ফলে সরকারের উচ্ছেদই সহজ হয়ে উঠবে।"

[লেনিন, ঐ পৃঃ ৩৭]

লেনিনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী। অন্যান্য দেশের শ্রমিক দলগুলি লেনিনের পথ গ্রহণ করেনি। ফলে একমাত্র রাশিয়াতেই শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল।

(২)

সোবিয়েত ইউনিয়নের জন্মের পর থেকে দুনিয়ার ইতিহাসে এক নতুন যুগের শুরু হল। এই যুগকে বলা যায় স্তালিন যুগ। কেননা এ সময়ের ইতিহাসকে মৌলিকভাবে প্রভাবিত করেছে সোবিয়েত ইউনিয়ন ও তার কমিউনিস্ট পার্টি এবং স্তালিনই ছিলেন সেই রাষ্ট্র ও পার্টির নায়ক।

এই যুগের যুদ্ধেরও নতুন বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেইজন্য এই সময়ে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নেও মার্কসবাদীদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে।

এই যুগের মূল বৈশিষ্ট্য দুটিঃ প্রথম, সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা; দ্বিতীয়, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট।

সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আবেষ্টনীর মধ্যে। এরকম আবেষ্টনীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও যে একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনের সাফল্য সম্ভব—একথাকে তত্ত্বের দিক থেকে স্তালিন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে। সোবিয়েত ইউনিয়নের গত ৩৫ বছরের ইতিহাস স্তালিনের তত্ত্বকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণ করেছে।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির কোনোও সুনিশ্চিত নিরাপত্তা থাকতে পারে না। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে পারে তখনই যখন পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও সমাজতান্ত্রিক বিলপ্ব সফল হবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তো সোবিয়েত ইউনিয়ন থেকে রপ্তানি করে অন্য দেশে চালান দেওয়া যায় না। প্রতি দেশের বিপ্লব নির্ভর করে সেই দেশের জনগণের চেতনা ও সংগঠনের উপর।

সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্য তাই প্রয়োজন যে যতদিন না পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লব সফল হচ্ছে ততদিন সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখা।

শুধু যে সোবিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার খাতিরেই সোবিয়েত বিরোধী যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা প্রয়োজন তা নয়, দুনিয়ার শ্রমিক ও মেহনতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এটা প্রয়োজন। সোবিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব এবং সেখানে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও ঔপনিবেশিক জনগণের চেতনাকে নতুন স্তরে উন্নীত করছে। সোবিয়েত ইউনিয়ন বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেখাচ্ছে যে শ্রমিকশ্রেণী নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে রাষ্ট্র গঠন করতে ও পরিচালনা করতে পারে। সোবিয়েত ইউনিয়ন দেখাচ্ছে যে এমন ব্যবস্থা গড়া সম্ভব যেখানে বেকারি নেই, সংকট নেই, শোষণ নেই, জাতির উপর জাতির অত্যাচার নেই। স্বভাবতই এই দৃষ্টান্ত যতই পুঁজিবাদী দুনিয়ার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে ততই তাদের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা ও শক্তি তীব্র হবে।

এইজন্য, সোবিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তা ও দুনিয়ার বিপ্লবী শ্রেণীর অগ্রগতির স্বার্থেই আজ প্রয়োজন সোবিয়েতবিরোধী সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা। কমরেড স্তালিন বলেছেনঃ "কি হত যদি সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণী সোবিয়েত রিপাবলিকের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি না দেখাত? সোবিয়েত ইউনিয়নের উপর হস্তক্ষেপ হত এবং তাকে ধ্বংস করা হত।

"কি হত যদি পুঁজিবাদ সোবিয়েত রিপাবলিককে ধ্বংস করতে পারত? প্রত্যেক পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক দেশে নেমে আসত জঘন্যতম প্রতিক্রিয়ার যুগ, শ্রমিক ও শোষিত জনতাকে গলা চেপে মারা হত, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের পরাজয় ঘটত।

"কি হবে যদি সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে সোবিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ও সহানুভূতি বাড়তে থাকে? সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে বিশেষভাবে সুবিধা হবে।

"কি হবে যদি সোবিয়েত ইউনিয়নে সামজতন্ত্র গঠনের সাফল্য বাড়তে

থাকে? পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকার বিশেষ উন্নতি হবে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সংগ্রামকে বিশেষভাবে দুর্বল করবে এবং দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সামনে সুযোগ সুবিধা বেড়ে যাবে।"

[কমিণ্টার্নের কার্যকরী কমিটির সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা]

এ যুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট এ যুগের আগেও ছিল। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হল যে এই সংকট শুধু অর্থনৈতিক নয়, অর্থনীতি রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে এবং সমস্ত পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক দেশ জুড়েই এই সংকট। এই সংকটের বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে স্তালিন বলেছেনঃ

"এর অর্থ হল, প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (প্রথম মহাযুদ্ধ) ও তার জের হিসাবে পুঁজিবাদের ক্ষয় তীব্রতর হয়েছে, পুঁজিবাদের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। আমরা এখন বাস করছি এমন একটা যুগে যেখানে যুদ্ধ আর বিপ্লব লেগেই আছে। পুঁজিবাদ এখন আর দুনিয়ার একটিমাত্র ও সর্বব্যাপক অর্থনীতি নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে, বৃদ্ধি হচ্ছে এবং এর অস্তিত্বের ফলেই পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা নগ্ন হয়ে ধরা পড়ছে, পুঁজিবাদের শিকড় ধরে টান পড়ছে।

" সাধারণ সংকটের আরও অর্থ হল যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সোবিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের জয়ের ফলে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি কেঁপে উঠেছে, এর মধ্যেই ঐ সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব দুর্বলতর হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ আর পুরানো কায়দায় ঐ সমস্ত দেশে মুরুব্বিয়ানা ফলাতে পারে না।

"সাধারণ সংকটের আরও অর্থ হল যে, যুদ্ধের মধ্যে ও তার পরে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশে নবীন দেশীয় পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছে, এই পুঁজিবাদ সাফল্যের সঙ্গেই পুরানো পুঁজিবাদের সঙ্গে বাজারে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে, ফলে বাজার দখলের লড়াই তীব্রতর ও জটিলতর হচ্ছে।

"সর্বশেষে সাধারণ সংকটের অর্থ হল যে, যুদ্ধ বড় বড় পুঁজিবাদী দেশের উপর এক বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছে। কলকারখানাগুলি সব সময়তেই তাদের ক্ষমতা অনুপাতে কম চলছে, লক্ষ লক্ষ বেকারের বাহিনী তৈরি হয়েছে। এই বেকারের দল মজুত বাহিনী থেকে চিরকালের বেকার বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।"

[সোবিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ১৬শ কংগ্রেসের রিপোর্ট, পৃঃ ২০-২১]

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের ফলে তার সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বই বিশেষভাবে তীব্র হয়েছে। শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে উপনিবেশের জনগণের, এক সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে অপর এক সাম্রাজ্যবাদীর, সকল সংঘর্ষগুলিই আগের চেয়ে শতগুণ তীব্রতর হয়েছে। কিন্তু এছাড়াও নতুন এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার।

এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কমরেড স্তালিন বলেছেনঃ

"প্রত্যেক সময়েই যখন পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি তীব্র হয়ে উঠে, তখনই বুর্জোয়ারা লোলুপ দৃষ্টিতে সোবিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকায় আর ভাবে, 'বিপ্লবের দুর্গ সোবিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের ফলেই শ্রমিকশ্রেণী আর উপনিবেশের জনগণ বিপ্লবী হয়ে উঠেছে, সোবিয়েত ইউনিয়নই নতুন যুদ্ধ বাধানোর অন্তরায়, তার জন্যই দুনিয়াকে নতুন করে ভাগ করার পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, তার বিরাট বাজারে পুঁজিপতিদের একচ্ছত্র রাজ কায়েম করতে সে দিচ্ছে না—এইরকম যে সোবিয়েত ইউনিয়ন, তার ঘাড় ভেঙে পুঁজিবাদের একটা অথবা সবকটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করা যায় না?'

এইজন্যই সোবিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। এই প্রবৃত্তি অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই বাড়বে।"

[স্তালিন—ঐ পৃঃ ৩২]

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের ফলে তাই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নতুন নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে, না হয়ে পারে না। যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে দুনিয়াকে নতুন করে ভাগাভাগি করার জন্য, উপনিবেশের উপর শোষণ তীব্রতর করার জন্য, যুদ্ধের সুযোগে শ্রমিকের ঘাড় ভেঙে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়ের জন্য। এই যুদ্ধ দুটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ বা গোষ্ঠীর মধ্যে বাধবে কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধেও যুদ্ধের বিপদ অনিবার্যভাবেই বাড়ছে। এই যুগে যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য তাইঃ

(১) যে কোনোও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরই সোবিয়েতবিরোধী যুদ্ধে পরিণত হওয়ার গভীর আশঙ্কা আছে।

(২) সোবিয়েতবিরোধী যুদ্ধ হল বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, পরাধীন ও ঔপনিবেশিক জাতিগুলির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

স্বভাবতই এই যুদ্ধের চরিত্র প্রথম মহাযুদ্ধের (যখন সোবিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়নি) অনুরূপ নয়। এই যুগে তাই মার্কসবাদীদের দৃষ্টি হল সর্বশক্তি নিয়োগ করে নতুন যুদ্ধের আয়োজনকে ব্যর্থ করা, পুঁজিবাদী দুনিয়াকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে বাধ্য করা। যে কটা দিন পুঁজিবাদ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে শান্তিতে বাস করবে, সেই কটা দিনেই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট গভীরতর হবে এবং অনিবার্যভাবেই পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য লড়াই তাই বিপ্লবের জন্য লড়াই, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই।

প্রথম মহাযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। সে সময়ে দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা ও তাদের সংগঠনের দুর্বলতা (বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বিশ্বাসঘাতকতা) বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু স্তালিনের যুগ এক নতুন যুগ। পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে আরম্ভ করে মহাচীন

ও ভিয়েতনাম পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের জগৎ। একদিকে তাদের অগ্রগতি অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী সংকটের ফলে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি জনতা আজ নতুন চেতনায়, নতুন কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ। তাদের নেতৃত্ব করছে স্তালিনের শিক্ষায় শিক্ষিত কমিউনিস্ট ও অন্যান্য শ্রমিক পার্টিগুলি। এইজন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়াকে নতুন যুদ্ধের তাণ্ডবে টেনে আনার আগেই পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধলিপ্সাকে সমাধিস্থ করতে পারে। কিন্তু সে বিপ্লব এগিয়ে চলবে শান্তিরক্ষা করা ও নতুন যুদ্ধের প্ররোচনা ব্যর্থ করার ভিতর দিয়েই।

স্তালিনের শান্তিনীতি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করেই রচিত। এই শান্তিনীতি বিপ্লবের শক্তিকেই জয়যুক্ত করে।

শান্তি রক্ষা করা সম্ভব

জনগণ যদি শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেন এবং শেষপর্যন্ত শান্তি-সংগ্রামে অবিচলিত থাকেন, তবেই শান্তি রক্ষা ও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। আর যদি যুদ্ধবাজেরা মিথ্যা চাতুরীর জালে জনগণকে জড়িয়ে ফেলে প্রতারিত করে নতুন বিশ্ব-যুদ্ধের ভিতরে টেনে আনতে সক্ষম হয় তবেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে।

তাই বর্তমান যুগে যুদ্ধবাজদের ঘৃণ্য পাপ-চক্রান্তের মুখোশ খুলে দেবার হাতিয়ার হিসাবে শান্তি রক্ষার জন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। —স্তালিন

(১৯৫১ সালে প্রাভ্দার সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে স্তালিন)

সোবিয়েত লোকসংগীতে স্তালিন

॥ ১ ॥ ইউক্রেন্-এর চারণ-কবি গোলুবকোভ্-রচিত বল্শেভিক বিপ্লব-বর্ণনার একাংশ ঃ—

"এবার লড়াই!" ডাকল লেনিন, "জাগো শহর-গ্রাম,
মরছ যারা খেটে, ঝরছে পায়ে মাথার ঘাম!"
"এবার লড়াই!" হাঁকল স্তালিন, "ওঠাও হাতিয়ার
মজুর-চাষী ভা'য়েরা সব! ন্যায্য অধিকার
কায়েম করো!"—জাগ্‌ল সাড়া তামাম দেশটা জুড়েঃ
কাজাক্স্তানের কয়লাখনির আঁধার খুঁড়ে খুঁড়ে
অন্ধ যারা, দাঁড়ায় তারা বুকটা ক'রে টান,
কাঁধে কোদাল ধরে দাঁড়ায়, ঘুচায় ব্যবধান।
ইউক্রেনিয়ার কারখানাতে পৌছাল ডাক আজ—
সারি সারি দাঁড়ায় শ্রমিক বন্ধ ক'রে কাজ।
বন্ধ চাকা, ঠাণ্ডা নেহাই, নিভ্‌ল যে বয়লার,
আকাশ-কাঁপা উঠল আওয়াজ, "আর নয়, নয় আর!"
ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে গেল সেই মহাআহ্বান—
তুর্কমেনিয়ায় কাটছে যারা জমিদারের ধান,
ক্লান্ত শরীর নুয়ে পড়ে, বেঁকেছে শিরদাঁড়া,
বারেক শুনে হাওয়ায় সে ডাক দাঁড়িয়ে ওঠে খাড়া—
শক্ত মুঠোয় কাস্তে ধ'রে কাঁধে মেলায় কাঁধ
বিপ্লব-বন্যাতে ভাঙে অন্যায়ের এই বাঁধ।
লেনিন-স্তালিন ডাক দিয়েছে শৃঙ্খল ভাঙ্‌বার—
দুনিয়া জুড়ে আওয়াজ ওঠেঃ "আর নয়, নয় আর!"

॥ ২ ॥ বিয়েলোরাশিয়ার একটি লোকসংগীত ঃ—

সারা দুনিয়ার 'পরে
কোন্ সে সূর্য জ্বলে
দিনরাত অফুরান্ তেজে?
সুখ দেয়, আলো দেয়,
ভালোবাসা জেবলে দেয়?
—মোদের স্তালিন প্রিয় সে যে॥

॥ ৩ ॥ উজ্‌বেক্‌স্তানের আমু-দরিয়া অঞ্চলের একটি ঘুমপাড়ানি গান ঃ—

স্তালিন দৃষ্টি মেলে আছে সবখানে সব ঠাঁই
তোমার আমার সবার 'পরে। আমরা সবাই তাই
সারাদিনের কাজের শেষে সুখে নিদ্রা যাই।
শান্তি বিছায় ছায়ার ঝালর, রাত্তির নিঃঝুম,
খোকার চোখে স্বপ্ন নামে, মায়ের চোখে ঘুম।
—এক-জোড়া চোখ জেগে থাকে দৃষ্টি খরশান
অতন্দ্র এক প্রহরী—সে স্তালিন মহীয়ান।

কে বাঁধে এই সুখের বাসা, কে দেয় রে গান?
ফুল ফোটাল স্তেপ্‌ভূমিতে, মরুর মাঝে প্রাণ
কে জাগাল? —সে যে মোদের স্তালিন মহীয়ান।

সোনার বরন আঙুরগুচ্ছে সূর্য চুমো খায়,
চাঁদের আলোয় আপেলকুঞ্জে দোয়েল গান গায়
কার ইশারায়?—স্তালিন সে যে। তারই ইশারায়

শান্তি বিছায় ছায়ার ঝালর, রাত্তির নিঃঝুম,
খোকার চোখে স্বপ্ন নামে, মায়ের চোখে ঘুম।
স্তালিন দৃষ্টি মেলে আছে সবখানে সব ঠাঁই
তোমার আমার সবার 'পরে। দুষ্টু খোকা তাই
সারাদিনের খেলার শেষে সুখে নিদ্রা যায়।

সারা দেশটা ঘুমায় যখন শান্তিঘেরা ঘরে
স্তালিন তখন প্রহর জাগে—দৃষ্টি সবার 'পরে।
শান্তি বিছায় ছায়ার ঝালর, রাত্তির নিঃঝুম,
খোকার চোখে স্বপ্ন নামে, মায়ের চোখে ঘুম।
এক-জোড়া চোখ জেগে থাকে—দৃষ্টি খরশান—
অতন্দ্র এক প্রহরী সে স্তালিন মহীয়ান॥

॥ ৪ ॥ মুর্‌মান্‌স্ক-এর পাঁচসালা পুনর্গঠন-পরিকল্পনার একটি সমবেত-সংগীত ঃ—

তূরীভেরী বাজা রে! ধর্‌ জয়গান!
পাথুরে জমিতে পুঁতি রক্ত নিশান।
মোদের দেখায় পথ স্তালিন মহান ঃ
লাখো গলা মিলে গাই সৃষ্টির গান।
দিগন্ত ফুঁড়ে গড়ি যৌথখামার,
বিশ্রাম নেই, নেই সময় থামার।

প্রকৃতির বাধা যতো করি খান্‌খান্‌
মোদের দেখায় পথ স্তালিন মহান।
মাটি খুঁড়ে মাঠ চিরে চলে ট্র্যাক্‌টার,
লক্ষ বাহুতে আনে সৃষ্টি-জোয়ার।
লক্ষ গলায় গান ধরি আয় সাথী—
আয় নবজীবনের গম্বুজ গাঁথি।
বাজা শিঙা বাজা রে! ধর্‌ জয়গান!
মোদের দেখায় পথ স্তালিন মহান।
শান্তি-প্রাসাদ গড়ি তল্লাট জুড়ে—
সোনার চূড়োয় তার সূর্যকে ফুঁড়ে
আয় ধরি দুর্বার শান্তির গান।
মোদের দেখায় পথ স্তালিন মহান॥ *

অনুবাদঃ রবীন্দ্র মজুমদার

* এই চারটি সোবিয়েত লোকসংগীত I. Virchov-এর *Popular Songs of the U. S S. R,* পুস্তিকায় উদ্‌ধৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।—র, ম,



একটি মুখ

সমরেশ বসু

মানুষের জীবনে এমন এক একটা সময় আসে, যখন হৃদয় তার ভরা গঙ্গার মতো টাবুটুবু হয়ে ওঠে। সে নির্বাক, কিন্তু ভরাট। তার কোনো মাতামাতি নেই, অথচ তলার জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে সে ফুলে ফুলে ওঠে। যেন 'খর বেগে' দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায় সে আরও সহস্র পথে।

আমি গল্প লিখতে পারলাম না, স্কেচ্‌ও না, আমার অতি সামান্য জীবনের এটা একটা স্মৃতি মাত্র। এই স্মৃতিটুকু আমি আমার শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে নিবেদন করলাম।

জগদ্দল। ১৯৪২ সাল। গামা নামে একজন চটকল তাঁতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। তার একটা মত, পথ ও বিশ্বাস ছিল। আমার তখন সে-সব কিছুই নেই। এসময়ে জগদ্দলের মজুরনেতা সত্যমাস্টার আমাকে কয়েকটা ছবি আঁকতে বলেছিলেন। এঁকেছিলাম। তার মধ্যে একটা ছবি ছিল কমরেড স্তালিনের। ডান হাত তুলে স্তালিন চোখে মুখে হাসছেন। সেই ছবিটা কি করে গামার ঘরে চলে যায়। গামা জানত না ছবিটা আমারই আঁকা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা গামার ঘরে গিয়েছি। মেঘনা মিলের দোতলার উপরে ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার খুপরি বিশেষ। গামা কি যেন লিখছে খাটিয়ায় বসে বসে। গামা নাম বলে ভাববেন না, সে একটা পালোয়ান বিশেষ। বরং একেবারেই উল্টো। রোগা আর লম্বা গামা। গায়ের রংটা ফ্যাকাশে। উসকো খুসকো চুল। গুল্‌ টেপা ঠোঁট। বিহারের মুসলমান কৃষকের ছেলে। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। আমরা যাকে বুদ্ধিমান বলি, সত্যি, সেরকম বুদ্ধি তার ছিল না। সে সরল, সাহসী এবং আসলে একজন অপরিণত বয়স্ক শিল্পী। ভাবুক শিশু।

তার দেয়ালে স্তালিনের ছবিটার দিকে আমাকে তাকাতে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যায়সা হুয়া?' কিসের 'ক্যায়সা হুয়া' বুঝতে না পেরে খালি বললাম, 'ভালোই।' সে চোখ কুঁচকে হেসে হঠাৎ বলল, 'হম্‌ বানায়া।'

গামা বানিয়েছে? মাথায় বজ্রাঘাত হলেও আমি এতখানি চমকাতাম না। লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম। ভাবলাম, প্রতিবাদ করি গামার কথার।

কিন্তু গামা আমার ভাবান্তর একবার চেয়েও দেখল না। সে আপন মনে তার কথা বলে চলেছে। বলছে, 'ইন্‌কা নাম কম্‌রেড টালিন। হম বনায়া।' স্তালিন নামটাও সে উচ্চারণ করতে পারে না। আমার হতভম্ব ভাবকে সে তার কথার ধাক্কায় ভেঙে দিয়ে বললে, 'ইন্‌কে বারে তুম্‌ কুছ্‌ জানতা?' আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। অনেককে মিথ্যা কথা বলতে দেখেছি। আশ্চর্য! এ মুখে তার একটু ছায়া পর্যন্ত নেই। স্বীকার না করে উপায় ছিল না, স্তালিন সম্পর্কে, তাঁকে একজন রাষ্ট্রনায়ক ছাড়া কিছুই জানতাম না আমি

সেদিন। গামা আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'তুমি এখনো কিমনিস্ট্ হওনি।' অর্থাৎ কমিউনিস্ট। মিথ্যে নয় কথাটা। আমার উপর করুণা হল তার।

অসঙ্কোচে গামা আমাকে স্তালিনের কথা গম্ভীরভাবে শোনাতে আরম্ভ করল। আমি বুঝতে পারলাম না, অতদূর দেশের একটা লোক, যাকে গামা কোনোদিন চোখে দেখেনি, তার সম্পর্কে তার বুকে এত আবেগোচ্ছ্বাস কেমন করে এল। তার মুখে 'কমরৈড্ টালিন' শুনে মনে হল, লোকটার সঙ্গে তার শুধু পরিচয় নয়, যেন অন্তরঙ্গতা আছে। যেমন আছে সত্যমাস্টারের সঙ্গে। সে বললে, 'কমরেড্ টালিন এখন ক্রমলিন মোকামে বসে জংখোর হিট্লারের কবর খুড়ছে। কিন্তু ইনি জন্মেছিলেন এই জগদ্দলেরই মতো একটা শহরে, চামারের ঘরে। এত্না ছোটা বাচ্চা, মগর আসমান থেকেও বড়। তাঁর ওই দিলে আগুন লেগেছিল মুলুকের গরিবি দেখে।'

আগুন জ্বলে উঠল গামার দুই চোখে। চোয়াল শক্ত করে বলল, 'য্যায়সা হমারা দিল জ্বল্তা এ জগ্দল—এ হিন্দুস্থানের গরিবি দেখে। তো টালিননে ক্যায় কিয়া? ভাগ্ গিয়া ঘরসে।...ওহো, রোতে রোতে আন্ধা হো গিয়া মা। বাপ্ বেচারা কেত্না ঢুরা। কাহিঁ নেহি মিলা। কাঁহা গিয়া? না, লিনিন কো পাশ গিয়া। কমরেড লিনিন! এক মহা ক্রান্তিকার, কিমনিস্ট। গুরুদেব। টালিন ইনকো সাকরেদ্ বন্ গিয়া। লিনিন বোলা, 'যাও লাইন বস্তি মে, মজদুরকে পার্টি বানাও, উনিয়ন বানাও, মালিক কো সাথ্ লড়াই কর।' তো টালিন এ্যায়সা এক পার্টি বানায়া, যো কি আম রুশিয়া কো পুরা পার্টি বানা লিয়া। টালিন হমকো শিখ্লায়া, উনকে মোতাবিক হম্ ভি বানায়েগা। তুম সমঝা?' বলে সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যে আমার এই বোঝা না বোঝার উপর তার অনেকখানি দায়িত্ব রয়েছে। আরও খানিকক্ষণ কথা বলার পর, চলে আসার পূর্ব মুহূর্তে আমার একটা দুর্বুদ্ধি জাগল। বললাম, 'গামা, আমাকে একটা স্তালিনের তসবীর বানিয়ে দিতে হবে।'

মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে গামা স্নেহভরে হেসে উঠে বলল, 'তোমার চাই একটা? বহুত্ আচ্ছা। এক হপ্তা বাদ মে লে যাও।'

তারপর, কি রকম চাই, দেয়ালে যেমনটি আছে? ইত্যাদি কথা সে বলতে লাগল যেন সে কতযুগ ধরে স্তালিনের ছবি এঁকেছে আর আমি বিস্ময়ে বিভ্রান্তিতে থুথু ও পানের পিক্ ঢালা সিঁড়িটা পর্যন্ত নামতে গিয়ে বারবার থমকে যেতে লাগলাম। গামার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

এক সপ্তাহ পরে সন্ধ্যার ঝোঁকে আবার গিয়েছি। এসে দেখলাম, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তে গামার গলা শোনা গেল, 'কে?' বললাম, 'আমি।' অমনি ভেতরে অনেক কাগজের মড়মড়ানি শুনতে পেলাম। তারপর সে দরজা খুলে দিল হেসে। দেখলাম গামা ঘামছে। তার গায়ে তখনো কারখানার পাটের ফেঁসো লেগে রয়েছে। জানালাহীন ঘরটা লম্ফর ধোঁয়ায় শ্বাসরোধী হয়ে উঠেছে। কিন্তু খাটিয়ায় একটি কাগজও নেই। বালিশের তলা থেকে আর্ধেক বেরিয়ে আছে পেন্সিল আর রবার। দেয়ালে তেমনি টাঙানো আছে স্তালিনের ছবি।

মনুষ্য চরিত্র তখন ততটা বুঝি না। তবু মনটার মধ্যে কষ্ট হল। কিন্তু গামা কেমন অন্যমনস্ক, তবু হেসে বলল, 'তোমার তসবীরটা আজ হয়নি। দু রোজ বাদে এস, ঠিক মিলবে।' তারপরেই সে স্তালিন সম্পর্কে গল্প শুরু করে দিল।—'ইয়ে টালিন বচপন্ মে আন্ধা তুলা গুদামে কাম করত, মালিক চাবুক মারত। আঃ এত্না ছোটা বাচ্চা!' হাত দিয়ে দেখাল, কত ছোট। 'আজ দেখ, ইনে আম মজদুরকে লিডর। পুলিস ইন্কো কভি নহি পাকাড়নে সাকা। ছিপ্কে রহা চটকল কি লাইন মে, বস্তি মে'...(কিছু না জানলেও আমার মনে একটু সন্দেহ হল, রুশিয়াতে চটকল আছে কিনা)। আমার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে সে বেরিয়ে এল।

কয়েকদিন বাদে আবার গিয়েছি। ' যাওয়ার পথে গামার বড় চাচার ছেলের মুদী-দোকানে গেলাম একবার। মুদী কথায় কথায় বলল, 'গামাটা বেয়াকুব! এমনিতেই ওর রোজ জ্বর হচ্ছে, ডগদর বলেছে ওকে মুলুকে হাওয়া লাগাতে যেতে। আর ও রোজানা পয়সা দিয়ে কাগজ কিনছে, কিসব ছাই পাশ করছে ঘরের মধ্যে। কোথা থেকে পয়সা আসবে?'

লজ্জায় ও বেদনায় মুষড়ে গেলাম আমি। গামার ঘরের কাছে এসে দেখলাম, দরজা তেমনি বন্ধ। ডাকলাম, সাড়া দিল। তেমনি শব্দ এল ঘরের ভেতর থেকে কাগজ মড়মড়ানির। দরজা খুলে দিল। কয়েক ভলক বিষাক্ত ধোঁয়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তেমনি লম্ফ জ্বলছে। খোলা পড়ে আছে এক বাক্স মোমের রং।

গামার চোখে মুখে একটা অস্থিরতা ও যন্ত্রণা চেপে আছে। তার কারখানা ফেরত মুখটা শীর্ণ, চোখের কোল কালো, অন্তরাবদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হাসছে যেন কিসের খেয়ালে। দেখলাম স্তালিনের ছবিটা নেমে এসেছে দেয়াল থেকে। ভাবলাম, বলি তসবীরের দরকার নেই। তার আগেই সে থেমে থেমে দম নিয়ে বললে, 'তসবীরটা আজও হয়নি। আর দু একদিন লাগবে।'

বললাম, 'থাক এখন।'

'কভি নেহি। বলেছি যখন, তখন'...গামার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে এল। তারপর স্তালিনের ছবিটা হাতে নিয়ে হঠাৎ বলল, 'য্যায়সা কি, দিল মে আতা, মু মে নহি আতা, ওইসা, দিল মে আ গিয়া টালিন, হাত সে নহি নিকালতা।'

তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। ফেরবার মুখে গামা হঠাৎ বলল, 'ইয়ে, তসবীর হমকো জোশ্ দেতা। ইনে এক আদমি, দুনিয়া মে যিন কভি ঝুটা নহি বাতায়া।'

কথাটার শেষে মনে হল গামার চোখে জল এসে পড়েছে, আর আমি অপরাধীর মতো লাইনের মজুরের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলাম।

প্রায় দশদিন পরে আবার সন্ধ্যাবেলা এলাম। এসে দেখি, দরজা খোলা। খালি খাটিয়ায় গামা শুয়ে। বিছানাপত্র সব বাঁধাছাঁদা।

গামার চেহারাটা শাদা কাগজের মতো দেখাচ্ছে। মুখের হাসিটি আরও সুন্দর হয়েছে। সে কাজে যায়নি। বলল, 'এস। আমি আজ রাতে মুলুক যাচ্ছি।'

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। বড় চাচার ছেলে এসে বলল, 'চল আর দেরি নয়। ব্যাণ্ডেলে গিয়ে তুলে দিয়ে আসি।'

গামা আমার আঁকা ছবিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'মাস্টার সাব্ বোলা, এ তসবীর তুম বানায়া।'

আমি চমকে থতমত খেয়ে গেলাম। মনে হল বুকে কেউ ঘুষি মেরেছে আমার। গামা আবার বলল, 'সচ্। মগর হমকো মালুম হোতা, এ তসবীর হম্ বনায়া, হম খুদ্। দোস্ত্, গোসা না হো। হম্কো দিল বাতায়া।'

আমি ওকে মুখ তুলে তাড়াতাড়ি কিছু বলতে গিয়ে দেখি, ওর কোলে আর একটি ছবি। দেখে মনে হয়, মোম রং ঘষে ঘষে কেউ স্তালিনের মূর্তিটা আঁকবার চেষ্টা করেছে। এ বিশ্বের সব মানুষ এটা দেখলে তাই বলবে। স্তালিনের উত্তোলিত হাতটা কি রকম এঁকেবেঁকে গিয়েছে।

আমার বুকের মধ্যে অদ্ভুত অনুভূতি। হাত বাড়িয়ে বললাম, 'এই তো তোমার আঁকা স্তালিনের তসবীর। আমাকে দাও।'

গামা তাড়াতাড়ি ছবিটা জামার মধ্যে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা দেব না। তোমাকে আলাক্ একটা বানিয়ে দেব। সচ্। মগর, হমারা এ তসবীরকে টালিন হমকো পাশ রহেগা।'

আমার হাত ধরে সে নেমে এল। আলো পড়েছে তার ফ্যাকাশে মুখে। চোখে তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হঠাৎ বলল, 'যো দিন কমরেড্ টালিনকো আপনা আঁখসে দেখ লেঙ্গে—উস্ দিন'—অদ্ভুত হেসে চুপ করল সে।

তারপরে আর কোনোদিন গামার সঙ্গে দেখা হয়নি। জগদ্দলে বড়চাচার ছেলের মুদীখানা উঠে গিয়েছে অনেকদিন। জানি না গামা কোথায় আছে।

কমরেড স্তালিনের মৃত্যুসংবাদ এসেছে। জানি না গামা সে সংবাদ পেয়েছে কিনা, কিংবা—সেও হয়তো কোনো শোকাচ্ছন্ন মূক মিছিলে হেঁটে চলেছে আমারই মতো। চলেছে ফাল্গুনের ঝোড়ো হাওয়ায়, ধুলো মুখে।

কমরেড্ স্তালিন মারা গিয়েছেন। গামা চলে যাওয়ার পর কতবার তাঁর জীবন-চরিত পড়তে পড়তে আশাভঙ্গ হয়েছে, ঠিক গামার স্তালিনকে না পেয়ে। আজ মনে হচ্ছে, গামার সেই তুলা গুদামের বাচ্চা মজুর, আর এই কমরেড্ স্তালিন একাকার হয়ে গিয়ে অভিন্ন সেই একজনই। আজ স্তালিনের ছবি দেখে মনে হচ্ছে, এ মুখ সেই গামার-ই মোম রং-এর তসবীরখানি।

গামা এই টালিনেরই 'মোতাবিক' পার্টি বানাতে চেয়েছিল হিন্দুস্থানে, আপনা আঁখসে দেখতে চেয়েছিল দুনিয়াকো এই আম মজদুরোঁ কা লিডরকো। ...ভাবি সারা ভারতের এই মনের কথাটা কেমন করে সেদিন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

মার্কসবাদী দর্শনের সমৃদ্ধিতে স্তালিনের অমর অবদান

ভবানী সেন

॥ এক ॥

"মার্কস্-লেনিনবাদের প্রাণশক্তি ও সজীবতার কারণ হইল এই যে মার্কস্-লেনিনবাদ সেই রকম তত্ত্বের উপর নির্ভর করে যাহা সামাজিক জীবনযাত্রাব্যবস্থার প্রগতির দাবিকে সঠিক নির্দেশ দেয়, মার্কস্-লেনিনবাদ তত্ত্বকে তাহার যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশ্বাস করে যে মার্কস্-লেনিনবাদেব কর্তব্য হইল এই চিন্তাধারা ও তত্ত্বের সংগঠন, পরিচালন ও সৃজনশক্তির প্রতিটি বিন্দুকে কাজে লাগানো।"

—জোসেফ স্তালিন, 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', ২৩ পৃষ্ঠা।

মার্কস্-লেনিনবাদের এই "প্রাণশক্তি ও সজীবতার" সমৃদ্ধিশালী বিকাশে কমরেড স্তালিনের অবদান অতুলনীয়। জ্ঞানে, কর্মে এবং সংগঠনে সর্বক্ষেত্রে তাঁর সেই মহামূল্য অবদান মহাসমুদ্রের মতোই অতলস্পর্শী এবং তার খর-জ্যোতি সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। মানবজাতির ইতিহাসে এক নবযুগ সৃষ্টি করেছে সেই দর্শন; বিশাল পৃথিবীর ৮০ কোটি মানুষ নিজ নিজ দেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি গড়ে তুলছে সেই দর্শনের সাহায্যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে গঠিত হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজ, আর তাছাড়া সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত গণমানব তাঁকে অনুসরণ করছে ধ্রুবতারার মতো নিজ নিজ স্বদেশের এবং মেহনতি মানুষের মুক্তি-প্রভাতের প্রতীক্ষায়।

লেনিনের শ্রেষ্ঠ সহচর এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে কমরেড স্তালিন মার্কস্ ও এঙ্গেলস-এর এই বিপ্লবী দর্শনকে সমৃদ্ধিশালী, সহজবোধ্য এবং জনপ্রিয় করে যে রত্নরাশি রেখে গেছেন তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানত তিনখানি অমূল্য পুস্তকে—**'নৈরাজ্যবাদ না সমাজবাদ', 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' এবং 'সোবিয়েত্ ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী'।**

তিনি প্রথম পুস্তকখানি লেখেন ১৯০৯ সালে, ঠিক লেনিন যখন মার্কস্-বাদী পার্টির আদর্শগত হাতিয়ার 'মেটিরিয়ালিজম এন্ড এম্পিরিও ক্রিটি-সিজ্‌ম' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। রুশদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের ভাঁটার টানে ভুয়া সমাজতন্ত্রবাদীরা যখন প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের সাহায্যে শ্রমিক শ্রেণীকে সংশয়ের পঙ্কে ডুবিয়ে দিতে চাইছিল, তখন লেনিন তাঁর 'মেটি-রিয়ালিজম এন্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম' এবং স্তালিন তাঁর 'নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্রবাদ' এই দুইখানি পুস্তকে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত ধারালো হাতিয়ার রচনা করেন।

'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' লিখিত হয় ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে, একদিকে হিটলারী ফাসিস্টদের বিশ্বব্যাপী তাণ্ডব-

নৃত্য, অন্যদিকে সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের, দিগ্বিজয়ী পদক্ষেপের মধ্যে।

দার্শনিক ক্ষেত্রে কমরেড স্তালিনের সর্বশেষ অবদান 'সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী।'

এই তিনখানি পুস্তক ছাড়া আরও অসংখ্য পুস্তকে এবং প্রবন্ধে স্তালিন যা কিছু লিখেছেন তার প্রত্যেকটিই মার্কসবাদী দর্শন বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নির্ভুল শিক্ষা দেয়। বর্তমান যুগের এমন কোনো সমস্যাই নেই যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কমরেড স্তালিন করে যাননি। জে, ভি, স্তালিনের সৃষ্ট সেই রত্নভাণ্ডার চিরকাল মার্কস্‌বাদী দর্শনের উজ্জ্বল দীপালোকে মানবসমাজের জ্ঞানে ও কর্মে দীপালির উৎসব জাগিয়ে রাখবে।

॥ দুই ॥

"মার্কসবাদ শুধু একটা সমাজতন্ত্রবাদের থিওরী নয়, মার্কস্‌বাদ একটা সম্পূর্ণ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এ এমন একটা দর্শনশাস্ত্র যা থেকে অতি যুক্তিযুক্তভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে। এই দর্শনশাস্ত্রের নাম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।"

'নৈরাজ্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ', ১৩ পৃষ্ঠা।

এই দর্শনের নাম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কেন হল? কারণ "এর পদ্ধতিটা হল দ্বন্দ্বমূলক (ডায়ালেকটিকাল) আর তত্ত্বটা হল বস্তুবাদী।"

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি কাকে বলে তা বর্ণনা করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভঙ্গিতে কমরেড স্তালিন লিখেছেন—

"বিজ্ঞানের ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি প্রকৃতই একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। পৃথিবীতে শাশ্বত বলে যে কিছু নেই, সবকিছুরই যে পরিবর্তন আছে, বিকাশ আছে,—মার্কস্‌বাদের এই সিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সমাজবিজ্ঞান অবধি সর্বত্র প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতির সব কিছুকেই গতি এবং বিকাশের ভূমিকায় বিচার করতে হবে।"

—'নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্রবাদ', ১৭ পৃষ্ঠা।

নিত্যপরিবর্তনশীল এই বিশ্বপ্রকৃতির মূল নিয়ম হল **পরস্পর-সংঘাত-শীল বিরোধের ঐক্য।** এই ঐক্য বার বার ভেঙে যায় আবার নতুন করে গড়ে ওঠে। এই নিয়মই পরিবর্তনকে প্রকৃতির তথা জীবনের শাশ্বত ধর্ম করে তুলেছে। এই দার্শনিক তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন বলে মনে হয় কিন্তু কমরেড স্তালিনের প্রধান দান হল মার্কস্‌বাদকে সহজ এবং সরল করে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করা,—জনতার, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী জীবনের হাতিয়ার করে তোলা। তাই স্তালিন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ভঙ্গিতে এই নিয়মের সারমর্ম উদ্ঘাটিত করে বলেছেন—

"...জীবন গতিহীন বা স্থির বলে মনে করা যেতে পারে না। কখনও তা এক স্তরে থেমে থাকে না। তার মধ্যে রয়েছে অবিরাম গতি, নিরন্তর সেখানে নূতনের অভ্যুদয় ঘটছে আর পুরাতনের ঘটছে বিলুপ্তি, তাই সব সময়ই জীবনের মধ্যে পাশাপাশি রয়েছে নূতন আর পুরাতন, বিকাশশীল আর মুমূর্ষু, বিপ্লবী আর প্রতিবিপ্লবী।"

—'নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্রবাদ', ১৩ পৃষ্ঠা।

পুরাতনের গর্ভেই নতুনের উৎপত্তি, পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুনের সংগ্রামে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ। পুরাতনের মৃত্যু যেমন অনিবার্য, তেমনি অনিবার্য নতুনের জয়। সুতরাং যারা বিপ্লবী, যারা প্রগতিশীল তারা ধরবে নতুনকে আর যারা প্রতিবিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়াশীল তারা আশ্রয় করে পুরাতনকে। এই নিয়েই দর্শনে, বিজ্ঞানে, সমাজে ও রাজনীতিতে বিপ্লবীর সঙ্গে চলছে প্রতিবিপ্লবীর সংঘাত।

> "জীবনে যা কিছু জন্মে দিনের পর দিন বাড়তির পথে এগিয়ে যায়, তা অপরাজেয়। তার অগ্রগতি রোধ করা অসাধ্য। উদাহরণ দিয়ে বলি, শ্রেণী হিসাবে যখন শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যখন তা দিনের পর দিন বাড়তির পথে এগিয়ে চলে, তখন সাময়িকভাবে তা যত দুর্বল যত ছোটই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের জয় হবেই। কেন? কারণ তারা বাড়ছে, শক্তি সঞ্চয় করছে—আর এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে যা কিছু মুমূর্ষু, কবরের দিকে যা এগিয়ে চলেছে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—তা আজ সে যতই অমিতশক্তিধর হোক না কেন। উদাহরণ দিয়ে বলি, বুর্জোয়াদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, দিনের পর দিন তাদের অধঃপতন ঘটছে। সুতরাং আজকে তারা যত শক্তিধরই হোক না কেন—শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় হবেই। কেন? কারণ শ্রেণী হিসেবে তারা ভেঙে পড়ছে, ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে, বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, জীবনের পক্ষে এরা হয়ে পড়ছে একটা বোঝা।"
>
> —'নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্রবাদ', ১৪ পৃষ্ঠা।

আজ থেকে ৪৪ বছর আগে স্তালিন এই কথা লিখেছিলেন। গত ৪৪ বছরের ঘটনাবলী ডায়ালেকটিক্সের এই মর্মবাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। রাশিয়ার প্রবলপ্রতাপান্বিত জারের শক্তির পতন যে ছিল অনিবার্য, হিটলারের অমিতশক্তি যে ছিল অন্তঃসারশূন্য, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের দানবীয় আঘাত সত্ত্বেও যে আজ পৃথিবীর ৮০ কোটি মানুষ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংহত হতে পেরেছে—একথা আজ আর কোনো মানুষই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু আজ যা বাস্তব সত্য আগে তা ছিল মাত্র সম্ভাবনা। তাই কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা অসম্ভব তা নিয়ে সেদিন মতভেদের অন্ত ছিল না। মার্কস্, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিনের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই **সম্ভাবনার** মধ্যে **সত্যকে** আবিষ্কার করতে শেখায় আর মানুষকে সক্ষম করে সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করতে। সম্ভব ও অসম্ভবের জগাখিচুড়ির ভিতর থেকে বাস্তব সত্যতে খুঁজে বার করা আর সেই সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করা—এই হল ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতির সার কথা।

ডায়ালেকটিক পদ্ধতির এই সার কথাটি বুঝতে হলে বুঝতে হবে মানুষের সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মের সম্বন্ধটা কি? অদৃষ্টবাদ অনুসারে মানুষ এমনভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন যে যা ঘটবার তা ঘটবেই, মানুষের করার কিছুই নেই। আবার 'পুরুষকার'বাদীদের মতে প্রাকৃতিক নিয়মও মানুষের অধীন, মানুষ নিজ শক্তিবলে যা ঘটাবে তাই ঘটবে। এই দুই মতবাদই সমাজে মেহনতি জনতার দাসত্ব জীইয়ে রাখবার উপকরণ, পুরানো

ফলের আচারের তেলমশলার মতো। ডায়ালেকটিক পদ্ধতি এই দুই মত-বাদেরই পরম শত্রু।

সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী' শীর্ষক পুস্তকে স্তালিন বলেছেনঃ—

> "মার্কস্‌বাদ অনুসারে বিজ্ঞানের নিয়ম—তা সে পদার্থবিজ্ঞানই হোক আর অর্থনীতিই হোক—মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার বহির্ভূত বাস্তব প্রক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি। মানুষ এই নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে, জানতে পারে, অনুশীলন করতে পারে, নিজ নিজ কাজে তার অনুধাবন করতে পারে, আর পারে সমাজের স্বার্থে তা ব্যবহার করতে, কিন্তু তার পরিবর্তন বা উচ্ছেদ সাধন করতে পারে না। আর বিজ্ঞানের নতুন নিয়ম সৃষ্টি করতে তো সে পারেই না।"
>
> —'একনমিক প্রবলেম্‌স অব সোশালিজম ইন ইউ, এস, এস, আর', ৬ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ বিজ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা প্রকৃতির বন্য-শক্তিকে মানুষ পোষ মানাতে পারে।

কমরেড স্তালিন উদাহরণ দিয়ে এ-কথার মানে খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন জলের গতিশক্তির যে প্রাকৃতিক নিয়ম আছে তাতে বন্যা হয়, মানুষের ঘরদুয়োর ভেঙে ফেলে, জনপদগুলি করে বিধ্বস্ত। আবার জলের গতিশক্তির প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করে এবং তারই উপর নির্ভর করে মানুষ জলের সেই ধ্বংসকরী শক্তিকে সমাজের কাজে লাগিয়েছে —দাড়া বা ড্যাম এবং জলবিদ্যুৎ এবং হাইড্রোইলেকট্রিসিটি। যে-নদীর জলে যে-নিয়মে ধ্বংসকরী বন্যা হয়, সেই নদীর জলই সেই নিয়ম অনুসারে মানুষের হাতে পড়ে শান্তভাবে জমিতে জলসেচন করে আর কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

সুতরাং মানুষ সর্বস্রষ্টাও নয় আবার নিষ্ক্রিয়ও নয়। জলের প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষ সৃষ্টি করেনি—তাকে কাজে লাগিয়েছে।

অর্থনীতির নিয়ম এই যে উৎপাদনের পদ্ধতির সঙ্গে উৎপাদনের শক্তির সামঞ্জস্য চাই, এই দুয়ের মধ্যে যখনই গরমিল দেখা দেয় তখনই আসে সমাজ-ব্যবস্থার সংকট। ধনতন্ত্রের মধ্যে উৎপাদনের শক্তি হল সামাজিক অথচ সম্পত্তির মালিকানা হল ব্যক্তিগত। এই দুয়ের মধ্যে যে সংঘাত তাই সৃষ্টি করেছে ধনতন্ত্রের সংকট। মানুষ এই নিয়ম জেনে এবং তাকে কাজে লাগিয়ে সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করেছে—সম্পত্তির উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা দূর করে, সামাজিক সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু উৎপাদনশক্তির সামাজিক সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে বিরোধ তা অর্থনৈতিক বাস্তব নিয়ম; মানুষের সৃষ্ট নয়; তা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অতীত।

গান্ধী-বাদীরা বলেন, এই পণ্যোৎপাদন এবং যন্ত্রশিল্পের যুগেই, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারাই তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে উৎপাদনশক্তির সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবেন। তাঁরা কি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা ধনতান্ত্রিক সংকট বন্ধ করতে পারেন? ধরুন এক একটা বড় কারখানার যেখানে ১০০০০ মজুর নিযুক্ত হয় তা ভেঙে তাঁরা ১০ হাজার ছোট ছোট কারখানা বানালেন। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির গোড়ার দিকে বৃহৎ

যন্ত্র-শিল্প ছিল না—ছিল ছোট ছোট কারখানা—বাষ্পযন্ত্র বা তড়িৎযন্ত্রের বদলে অসংখ্য তাঁত-চরকা। কিন্তু পণ্যোৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়ম লাভের জন্য প্রতিযোগিতা আর লাভের জন্য প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক পরিণতি বৃহৎ যন্ত্রশিল্প। এমনি করেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে বেধেছে সামাজিক উৎপাদনশক্তির সংঘাত। সুতরাং গান্ধীবাদীদের সর্বোদয় সমাজের দার্শনিক ভিত্তি হল এই অর্থনীতির কোনো বাস্তব নিয়ম নেই—গান্ধীবাদীরা যেন ইচ্ছে করলেই নতুন অর্থনৈতিক নিয়ম সৃষ্টি করতে পারেন অথবা অর্থনৈতিক নিয়ম বদলে দিতে পারেন। এই দর্শন হল বিজ্ঞানের বিরোধী—সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল।

যেমন দুরন্ত মহামারীর সময় ডাক্তার বলে টিকে নিতে আর ওঝা বলে টিকে না নিয়ে তাগাতাবিজ বাঁধতে। তাগা-তাবিজ দিয়ে মহামারী ঠেকানো যায় না কিন্তু টিকে দিয়ে যায়, কেননা টিকে হল শরীরবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাকেই কাজে লাগানো। তাগাতাবিজ বিজ্ঞানবিরোধী।

অবশ্য অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে অর্থনৈতিক নিয়মের কিছু পার্থক্যও আছে—কিন্তু মূল কথা হল এই যে বাস্তব জগতের কোনো নিয়মই মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন নয় কিন্তু বিজ্ঞান এবং কুসংস্কার এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যই হল এই যে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান মানুষের চেষ্টাকে বাস্তব নিয়মের ব্যবহার শেখায় আর অজ্ঞান এবং কুসংস্কার মানুষের চেষ্টাকে বাস্তব নিয়মের প্রতিকূল করে দেয় আর মানুষের যন্ত্রণা বাড়ায়।

॥ তিন ॥

স্তালিন বলেছেন, "ডায়ালেকটিকস্ মূলত পরমার্থতত্ত্ব বা অধ্যাত্মবাদের ঠিক বিপরীত।" ডায়ালেকটিকসের মূল চরিত্র এবং অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে তার প্রধান প্রধান পার্থক্য এমন সহজভাবে তিনি তুলে ধরেছেন যে, একটা থেকে আর একটাকে বেছে নিতে কষ্ট হয় না। সেই প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি এইরূপঃ—

> "(ক) অধ্যাত্মদর্শনের বিপরীতভাবে, ডায়ালেকটিকস বস্তুজগৎকে পরস্পর সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘটনাপুঞ্জের আকস্মিক সমাবেশ বলিয়া মনে করে না, বরং ডায়ালেকটিকস্ বলে যে বস্তুজগৎ অবিচ্ছিন্ন ও সমগ্রভাবে সুসংহত, এবং ইহার প্রতিটি বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে অন্যের প্রকৃতিগত সংযোগ আছে, তাহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"
>
> —'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ৩ পৃষ্ঠা।

> "(খ) অধ্যাত্মবাদের ঠিক বিপরীতভাবে ডায়ালেকটিক্স পদ্ধতি বিশ্বাস করে যে বিশ্বপ্রকৃতি স্থানু ও অনড় নয়, অচঞ্চল ও সনাতন, বরং বিশ্বপ্রকৃতি অবিরাম গতিশীল—সেখানে প্রতিনিয়তই আবর্তন ও বিবর্তনের ক্রিয়া চলিতেছে, প্রতিক্ষণেই কোনো না কোনো নূতন বস্তুর আবির্ভাব ও বিকাশ হইতেছে, আবার কোনো না কোনো বস্তু ভাঙিতেছে ও লয় পাইতেছে।"
>
> —'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ৪ পৃষ্ঠা।

"(গ) অধ্যাত্মবাদের বিপরীতভাবে, ডায়ালেকটিকস্ ক্রমবিকাশের ধারাকে সহজ অগ্রগতিব ছন্দ বলিয়া স্বীকার করে না, ডায়ালেকটিকর্স্ স্বীকার কবে না যে পরিমাণের পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয় না। উপরন্তু ডায়ালেকটিকস্ মতবাদ দেখাইয়া দেয় ক্রমবিকাশের ধারার পরিমাণের অতি নগণ্য ও অস্পষ্ট পরিবর্তন সুব্যক্ত মৌলিক পরিবর্তনে, গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তব পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন ধীরে ধীবে ক্রমশ ঘটে না—ঘটে অত্যন্ত দ্রুত এবং সহসা—এই পরিবর্তন এক পর্যায় হইতে অন্য পর্যায়ে উৎক্রান্তি বা লম্ফ দিবার ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয। এই রূপান্তর আকস্মিক কিছু নয়—সামান্য সামান্য এবং অস্পষ্ট পরিমাণগত পরিবর্তন সঞ্চিত হইতে হইতে এই মৌলিক গুণগত পবিবর্তন স্বাভাবিক রূপেই দেখা দেয়।"

"(ঘ) অধ্যাত্মবাদের বিপরীতভাবে ডায়ালেকটিকস্ বিশ্বাস করে যে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিবস্তু ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিহিত আছে অসঙ্গতি—কারণ প্রত্যেক বস্তুরই দুইটি রূপ আছে—একটি হাঁ-ধর্মী অপরটি না-ধর্মী ; একটি অতীত, অপরটি ভাবী সম্ভাবনা ; তাহার কোনো অংশ ক্ষয়ের দিকে আর কোনো অংশ বিকাশের মুখে। দুইটি বিপরীত গুণের লড়াই, পুরাতন আর নূতনেব সংঘর্ষ ; গুণেব লয় ও দ্বন্দ্ব, বা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার সঙ্গে বিকাশোন্মুখ গুণের এই বিরোধই হইল ক্রমবিকাশের ধারার সার অংশ ; পরিমাণের মৌলিক রূপান্তরের মূলকথা।"

—'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ৮ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত কথাটির তাৎপর্য আরও সহজভাবে ব্যাখ্যা করে স্তালিন বলেন—

"জারের আমলে যখন বুর্জোয়া সমাজেব অস্তিত্ব ছিল, তখন—যেমন ১৯০৫ সালের রুশিয়া—বুর্জোযা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাব দাবি ছিল সহজবোধ্য, ন্যায়-সঙ্গত বিপ্লবী দাবি, কাবণ তখন বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিপ্লবকে এক ধাপ আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিত ; কিন্তু বর্তমান সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এখন সেই দাবি হইল অর্থহীন, বিপ্লব-বিরোধী দাবি, কারণ সোবিয়েত রাষ্ট্রেব তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইবে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদপসরণ।"

—'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ৯ পৃষ্ঠা।

প্রতি বস্তু বা প্রতি সত্তার মধ্যে বিপরীতের সংঘর্ষ ও সমন্বয়—মার্কস্-বাদী দর্শনের অন্যতম মূলকথা। সমাজের ক্ষেত্রে এই শক্তিই যুগে যুগে পরিবর্তন, প্রগতি ও বিপ্লবের ধারা সৃষ্টি করে চলেছে। সামন্ত যুগে মেহনতি মানুষই উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিক আবার মেহনতি মানুষ হল জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই ধরনের মালিকানার মধ্যে সমাজের উৎপাদন কিছুদূর বাড়ার পর উৎপাদনের শক্তির সঙ্গে উল্লিখিত সম্পত্তি প্রথা বা সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে ফুটে ওঠে অসঙ্গতি, বেধে যায় সংঘর্ষ। তাব ফলে দেখা দেয় নতুন সম্পত্তি প্রথা বা নতুন সামাজিক সম্বন্ধ। এক শ্রেণী তখন উৎপাদনের উপকরণের মালিক। আর এক শ্রেণী "স্বাধীন" মজুর বা শুধুমাত্র মেহনতি শক্তির মালিক। উৎপাদনের শক্তি এই নতুন সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে অনেকদূর এগিয়ে যায়, বিপুল আকারে উৎপাদন দেখা দেয়, উৎপাদনের ধরনটা হয় সামাজিক।

'উৎপাদনের ধরনটা সামাজিক'—একথার মানে কি? এ সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা ধারণা দূর করে দিয়ে স্তালিন বলেন—

"...যখন শত শত হাজার হাজার মজুর এক ছাদের তলায় এক কারখানায় সমবেতভাবে শ্রম করে। এখানে নেই সেই পুরাতন পদ্ধতি—যখন প্রত্যেক শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ ধারায় আত্মসর্বস্বভাবে কাজ করত। এখানে ঐ কারখানার প্রত্যেক 'শপ' (প্রত্যেক অংশ)-এর শ্রমিকের কাজ অন্যান্য শপের সাথীদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কারখানার একটা শপে যদি কাজ বন্ধ হয় তবে সমগ্র কারখানাটাই অচল হয়ে যায়।...এরকমটা ঘটে কেবল এক কারখানায় নয়, শিল্পের এক একটা সমগ্র বিভাগের মধ্যে আবার বিভিন্ন শিল্পের মধ্যেও। রেলওয়ে শ্রমিকরা যদি হরতাল করে তবে সমস্ত শিল্পেই অসুবিধা দেখা দেয়, তেল এবং কয়লার খনিতে যদি কাজ বন্ধ হয় তবে কিছুদিনের জন্যে সমস্ত শিল্পই অচল হয়ে যায়। পরিষ্কারভাবে উৎপাদনের পদ্ধতি এখানে সামাজিক বা সংহত রূপ নিয়েছে।"

—'নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্রবাদ', ৬৩ পৃষ্ঠা।

ধনতন্ত্রের মধ্যে এই সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার বেড়ে ওঠে সংঘাত এবং সেই সংঘাতের অবসান হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, সম্পত্তির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায়।

মার্কস্‌বাদীদের মধ্যে এই সেদিনও কেউ কেউ মনে করতেন যে সমাজতন্ত্রের আগেকার সমস্ত ব্যবস্থাতে সব সময়ই সামাজিক সম্বন্ধের সঙ্গে উৎপাদনী শক্তির অসঙ্গতি আছে, এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অসঙ্গতি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। এই ভুল ধারণা দূর ক'রে দিয়ে স্তালিন তাঁর সৃষ্টি-সম্পদে মার্কস্‌বাদী দর্শনের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

"বুর্জোয়া বিপ্লবের পরবর্তী যুগে, বুর্জোয়ারা যখন উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে ফিউডাল সম্বন্ধ নষ্ট করে বুর্জোয়া সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে, তখন কিছুদিনের জন্য সামাজিক সম্বন্ধের সঙ্গে উৎপাদনী শক্তির সঙ্গতি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নতুবা বুর্জোয়া বিপ্লবের পর ধনতন্ত্রের যে দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল তা কিছুতেই সম্ভব হত না।"

—'সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী', ৫৭ পৃষ্ঠা।

এবং

"উৎপাদনের শক্তি হল অত্যন্ত সচল এবং বিপ্লবী। সমাজতন্ত্রের ভিতরও নিশ্চয়ই তারা উৎপাদনী সম্বন্ধের আগে আগে চলে। কিছু সময়ের ব্যবধানে এই দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপিত হয়।"

—'সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী', ৫৭ পৃষ্ঠা।

তবে কি সামাজিক সম্বন্ধের সঙ্গে উৎপাদনী শক্তির অসঙ্গতি যেমন ধনতন্ত্রের সংকট সৃষ্টি করে, তেমনি সমাজতন্ত্রেরও সংকট সৃষ্টি করবে? আদৌ তা নয়। স্তালিন লিখেছেন—

"...সমাজতন্ত্রের ভিতর ঘটনাস্রোত উৎপাদনী-শক্তির সঙ্গে উৎপাদনী সম্বন্ধের সংঘর্ষ সৃষ্টি পর্যন্ত গড়ায় না। সমাজ এখানে সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে উৎপাদনী-শক্তির সঙ্গে উৎপাদনী-সম্বন্ধের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে।"

—'সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী', ৫৭ পৃষ্ঠা।

কেন তা সম্ভব তার কারণ দেখিয়ে স্তালিন বুঝিয়ে দিয়েছেন ঐতি-

হাসিক বস্তুবাদের একটি সার কথা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে এমন কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী নেই যে তার শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে উৎপাদনী সম্বন্ধের অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিক শ্রেণী উৎপাদনী সম্বন্ধের পরিবর্তনের প্রতিরোধ করে বলেই সমগ্র বিপ্লব ছাড়া ঐ সমাজের ভেতরকার উৎপাদনীশক্তির সঙ্গে উৎপাদনী সম্বন্ধের অসঙ্গতি কোনোক্রমেই দূর করা সম্ভব নয়।

মার্কসীয় দর্শনের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্তালিনের অন্যতম অসাধারণ অবদান তাঁর এই নব আবিষ্কার যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির পরিবর্তন কিভাবে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 'সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী' শীর্ষক পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন যে কৃষিক্ষেত্রে যৌথ সম্পত্তির মূলকথা হচ্ছে জমির মালিক সোবিয়েত রাষ্ট্র কিন্তু ফসলের সমবেত মালিক যৌথ খামারের অংশীদারগণ। এই সামাজিক সম্বন্ধের ভেতর যৌথ উৎপাদনের বিপুল অগ্রগতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু এমন একটা অবস্থা আসছে যখন পৃথক পৃথক যৌথ খামারের পৃথক পৃথক মালিকানার সঙ্গে উৎপাদনী শক্তির অসঙ্গতি অনিবার্য। সুতরাং ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে যৌথখামারের সম্পদ ও সমৃদ্ধি বাড়াতে হবে এই অসঙ্গতি দূর করে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে যৌথ সম্পত্তিকে সমগ্র সমাজের সাধারণ সম্পত্তিতে উন্নীত করে।

স্তালিনের এই নবতম আবিষ্কার সমাজতন্ত্র থেকে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মপদ্ধতির ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। অর্থনীতি ক্ষেত্রেও স্তালিনের যুগান্তকারী নবতম আবিষ্কার "সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু তা নয়। একথা অনস্বীকার্য যে কমরেড স্তালিনের উল্লিখিত পুস্তক-খানি দর্শনের ইতিহাসেও একটি অমূল্য অবদান। মার্কসীয় বস্তুবাদের আবিষ্কারে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সঙ্গে তাঁদের বিশ্বস্ত অনুসরণ-কারী স্তালিনের নাম অপরিহার্য। পৃথিবীর এই চারজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বৈজ্ঞানিক দর্শন, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সমগ্র মানবসমাজের হাতে তুলে দিয়েছেন এক সমৃদ্ধ যুগান্তকারী বিজ্ঞান।

॥ চার ॥

মার্কসীয় বস্তুবাদের প্রধান লক্ষণগুলির বিবরণ দিয়ে কমরেড স্তালিন লিখেছেন—

> (১) বিশ্ব-প্রকৃতি কোন 'স্বয়ংসিদ্ধ' আইডিয়া; 'অক্ষয় আত্মা' বা 'অজ্ঞেয় ব্রহ্মের' প্রকাশ নয়। 'প্রকৃতির প্রকাশবৈচিত্র্য গতিশীল বস্তুর বিভিন্ন রূপ ছাড়া কিছু নয়। পারস্পরিক সম্বন্ধ ও পরস্পর নির্ভরশীলতা, যাহা ডায়ালেক্‌টিকস পদ্ধতির অন্যতম সিদ্ধান্ত, তাহা গতিশীল বস্তুর বিকাশেরই নিয়ম।"
>
> —'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ১২ পৃষ্ঠা।
>
> (২) "মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শন দাবি করে যে বস্তুপ্রকৃতির নিজস্ব স্বাধীন সত্তা আছে, আমাদেব মানবজগতের বাহিরে তাহার স্বাধীন অস্তিত্ব। মার্কসীয়

বস্তুবাদ আরও বিশ্বাস করে যে চিন্তাশক্তি বস্তুর উন্নত অবস্থার ফল—বস্তু-বিকাশের ধারায় মস্তিষ্ক-কোষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং সেই মস্তিষ্ক-কোষ চিন্তা-শক্তির উৎস; কাজেই চিন্তাশক্তিকে বস্তু হইতে আলাদা করা যায় না—করিলেই মারাত্মক ভুল করা হয়।"

—'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ১২ পৃষ্ঠা।

(৩) "মার্কসীয় বস্তুবাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির কিছুই অজ্ঞেয় নয় এবং পৃথিবীতে আমাদের অজানা অনেক কিছু আছে—যাহা ভবিষ্যতে আমরা বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আয়ত্ত করিতে পারিব।"

—'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ১৫ পৃষ্ঠা।

এই কয়েকটি কথার মধ্যে মার্কসীয় বস্তুবাদের সারমর্ম উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু স্তালিন শুধু মার্কসবাদের তত্ত্ব হাজির করেই ছাড়েন নি—তাঁর অন্যতম বিশেষ অবদান হল এই তত্ত্বের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির কার্যপদ্ধতির কি সম্বন্ধ তা ধরিয়ে দেওয়া। এ সম্বন্ধে তাঁর সারগর্ভ উপদেশ হল—

"কাজেই কর্মপদ্ধতির ভুল এড়াইবার জন্য, অলস স্বপ্নবিলাসীর অবস্থায় না পড়িতে হইলে শ্রমিক পার্টির উচিত সমাজ-জীবনের বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া কর্মপন্থা স্থির করা,—কোনো বাস্তবসম্পর্কহীন তথাকথিত বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করা উচিত নয়; মহাপুরুষদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া সমাজ-জীবনের বিবর্তনের অনুকূল সত্যকার প্রয়োজনের দাবির উপর নির্ভর করা উচিত।"

স্তালিনের এই মহামূল্য সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুতি যে শ্রমিকের পার্টির পক্ষে কতখানি মারাত্মক হতে পারে তার প্রমাণ ভারতে ১৯৪৯-৫০ সালে আমি নিজে এবং পার্টি নেতৃত্ব সমবেতভাবে যে অতিবামপন্থী ভুল করেছিলাম। সে ভুলের ফল শুধু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকেই নয়, ভারতের জনসাধারণকেও বিষমভাবে ভুগতে হয়েছিল। সে ক্ষতির সম্পূর্ণ পূরণ নির্ভর করে মহান্ স্তালিনের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার উপর। মহান্ স্তালিনের অমর স্মৃতি আজ আমাদের এই বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হবার শক্তি ও যোগ্যতা দিক।

"চিন্তাশক্তি বস্তুর উন্নত অবস্থার ফল।" কিন্তু তার মানে এই নয় যে চিন্তাশক্তি নিষ্ক্রিয় অথবা জালিবোটের মতো বস্তুর টানে টানে চলা ছাড়া তার কোনো গতিশক্তি নেই।

"নূতন সামাজিক চিন্তাধারা ও মতবাদ তখনই দেখা দেয় যখন জীবনযাত্রা ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে সমাজে নূতন সমস্যা ও কর্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু একবার দেখা দিবার পর এই সব নূতন চিন্তাধারা ও মতবাদ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহাদের এই শক্তি সেই সব নূতন সামাজিক কর্তব্যসিদ্ধিকে সাহায্য করে,সমাজ-প্রগতিকে সাহায্য করে। ঠিক এইখানেই নূতন ধারণা, নূতন মতবাদ; নূতন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যে বিরাট সংগঠক, সংহতিকারক ও রূপান্তরকারী অবদান আছে, তাহা সুস্পষ্ট হয়। সমাজের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়াই নূতন সামাজিক ধারণা ও মতবাদের আবির্ভাব ঘটে, তাহাদের সংগঠক, সংহতিকারক ও রূপান্তরকারী শক্তি ব্যতীত সমাজের বাস্তবজীবন বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন অসম্ভব বলিয়াই তাহাদের আবির্ভাব ঘটে, সমাজের বাস্তব জীবন-বিকাশ সম্পর্কে কাজের তাগিদে দেখা দিয়া নূতন সামাজিক ধারণা ও মতবাদ

বাধাবিপত্তি দূর করিয়া অগ্রসর হয়, জনগণের সম্পদে পরিণত হয়, সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে এবং যে-সব শক্তি সমাজের বাস্তব প্রগতির পথে বাধা, সেই সব শক্তিকে পরাভূত করার কাজকে সহজ করে।"

—'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ২১ পৃষ্ঠা।

আদর্শের কি শক্তি এবং আদর্শগত সংগ্রামের কি বিপুল তাৎপর্য তা স্তালিনের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ আমাদের দেশে আদর্শের সঙ্গে আদর্শের যে সংঘাত তার অর্থও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত থেকে। আজ ভারতীয় সমাজের নতুন সমস্যা ও নতুন কর্তব্য মার্কসবাদী আদর্শের ক্ষেত্র তৈরি করেছে, যে বুর্জোয়া আদর্শ অতীতে এক সময় প্রভাবশালী ছিল আর তার অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়েছে। কিন্তু আপনা-আপনি তার অবসান ঘটবেনা, এর আসান ঘটাবার জন্য "সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে সংগঠিত" করার কাজে মার্কসবাদী আদর্শকে হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ সমাজের স্বার্থে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে।

মার্কস-লেনিনবাদী দর্শনের সার কথা এই যে সমস্ত সত্তার মধ্যে আদি সত্তা হল বস্তু, যার অস্তিত্ব তোমার আমার মনের বাইরে, তোমার আমার মন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে। আমার সামনে আমি যে টেবিলটা দেখছি তার অস্তিত্ব প্রকৃতই আছে, অর্থাৎ তুমি এ টেবিলের অস্তিত্ব জাননা বলেই যে তার অস্তিত্ব নেই অথবা আমি এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকলেই যে এর অস্তিত্ব থাকত না, সে কথা সত্য নয়। ভাববাদীদের মতে এ-টেবিলের কোনো স্বতন্ত্র-সত্তা নেই, এর অস্তিত্ব তোমার আমার জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং সমাজের আদিশক্তি ও ভাববাদ অনুসারে মতাদর্শ, অর্থাৎ এক একটা মতাদর্শ এক একটা সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করে; কিন্তু মার্কসবাদ বলে সমাজের আদি শক্তি হল উৎপাদনী-শক্তি, এই উৎপাদনী-শক্তির বিকাশই এক এক রকম মতাদর্শ সৃষ্টি করে।

উৎপাদনী-শক্তি কাকে বলে? এ সম্বন্ধে সমস্ত ভাসা ভাসা ধারণা দূর করে কমরেড স্তালিন তাঁর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন—

"যে-**উৎপাদন যন্ত্র** লইয়া বাস্তব-জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস বানানো যায়, যে **জনগণ** একপ্রকার **উৎপাদন অভিজ্ঞতা** এবং **শ্রমকৌশলের** বলে উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করে এবং বাস্তব জীবনে প্রযোজনীয় জিনিস উৎপাদন করিয়া চলে—এই সকল মিলিয়া সমাজের উৎপাদকশক্তি গঠিত হয়।"

—'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ২৬ পৃষ্ঠা।

ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হিসেবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিকে মূল কারণরূপে দাবি করা বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লিখেছেন—

"জনসংখ্যাই যদি সমাজ বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করিত তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত জনাকীর্ণ দেশগুলিতে তদনুযায়ী উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থা দেখা যাইত। আসলে ইহা সত্য নয়।...বেলজিয়ামে আমেরিকা অপেক্ষা উনিশ গুণ ও সোবিয়েত রাশিয়া

অপেক্ষা ছাব্বিশ গুণ ঘনবসতি, কিন্তু আমেরিকায় বেলজিয়াম অপেক্ষা উচ্চতর সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। আর সোবিয়েতের কথা ধরিলে বেল্‌জিয়াম একটা গোটা ঐতিহাসিক যুগের পিছনে পড়িয়া আছে, কারণ বেল্‌জিয়ামে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান, আর সোবিয়েত ইউনিয়ন ধনতন্ত্রকে বাতিল করিয়া সোশালিস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।"

—'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'—জোসেফ স্তালিন, ২৫ পৃষ্ঠা।

সুতরাং উৎপাদনের শক্তিই হল সমাজের মূলশক্তি আর শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যুগে যুগে উৎপাদনের শক্তির বিকাশ ঘটেছে এক একটা শ্রেণীর প্রভুত্ব সৃষ্টি করে। পুরাতন সমাজের গর্ভে যখনই নতুন সমাজ জন্মলাভ করেছে তখনই শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তা হয়েছে প্রকাশমান। তাই ধর্ম, রীতিনীতি, ন্যায়-অন্যায়, আদর্শ প্রভৃতির এক একটা শ্রেণীরূপ আছে এবং যুগে যুগে তার রূপান্তর ঘটছে। মার্কসবাদের এই সারমর্ম স্তালিন নানাভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

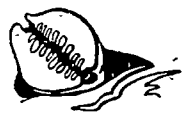
একাজে তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মার্কসবাদ কতকগুলি মন্ত্রসমষ্টি নয়, মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মতোই তার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন আছে। কোনো কোনো মার্কসবাদী যখন ভাষার পিছনেও শ্রেণীগত ভিত্তি ব্যাখ্যা করছিলেন তখন স্তালিন এগিয়ে এলেন এই বিজ্ঞানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে, তিনি লিখলেন ভাষা সমস্যা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী। তিনি দেখালেন যে ভাষা বাস্তবিক পক্ষে শ্রেণীগত ভিত্তির উপর প্রভাবিত নয়, ভাষার ভিত্তি জাতিগত। ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করে তিনি দেখালেন যে ভাষার সঙ্গে ধর্ম, রাষ্ট্র, দর্শন প্রভৃতি সামাজিক মঞ্চের কোনো মিল নেই, ভাষা তাই শ্রেণীনিরপেক্ষ, একটা জাতির সাধারণ সম্পদ।

স্তালিনের এই ভাষাতত্ত্ব মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে, তা ছাড়া তা আরও শেখাচ্ছে কেমন করে মার্কসবাদকে বিজ্ঞানরূপে ব্যবহার করতে হয়। মার্কসবাদ যে শুধু মন্ত্র-উচ্চারণের জন্য নয়, মার্কসবাদ যে দিচ্ছে সত্য নির্ধারণের বিজ্ঞান, এই পরমসত্য স্তালিন সারাজীবন ধরে শিখিয়ে গেছেন।

মার্কস এবং এঙ্গেলস দর্শনশাস্ত্রকে শাস্ত্র থেকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করেছেন। লেনিন এবং স্তালিন সেই বিজ্ঞানকেই ব্যবহার করে বিজ্ঞানেরও করেছেন উৎকর্ষ সাধন। ওদিকে বিজ্ঞানের অবনতি ঘটিয়ে তাকে শাস্ত্রের স্তরে অবগত করেছেন বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক জীনস্ এবং এডিংটন যখন পদার্থ-জগতে ইলেক্‌ট্রনের জটিল গতিধারা লক্ষ্য করলেন তখনই বুর্জোয়া ভাবাদর্শ দর্শন শাস্ত্রের দৃষ্টি নিয়ে ঘোষণা করলেন—পদার্থের মৌলিক উপাদানটি আসলে বস্তু নয় ও ব্রহ্মশক্তির মতোই একটা অজ্ঞেয় শক্তি, কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত। আর এদিকে স্তালিনের নেতৃত্বে সোবিয়েত বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করলেন ঠিক তার বিপরীত জিনিস। সোবিয়েত জীবতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করলেন যে জীব-জগতে মেণ্ডেল যাকে বলেছেন জন্মগত গুণ তা আসলে জীবের জন্মকোষের কোনো অজ্ঞেয় শক্তি নয়, তা আসলে বস্তুজগতের তথা পারিপার্শ্বিকের সম্মিলিত ফল। মিচুরিন-লাইসেন্‌কোর এই আবিষ্কার সোবিয়েতে ফুল ফল ফসল তরীতরকারীর উৎপাদনে নতুন

সৃষ্টির প্রতিভা দেখাতে সমর্থ হয়েছে; তাঁরা দেখিয়েছেন যে বীজের "স্বাভাবিক গুণের পরিবর্তন যখন সম্ভব এবং তা সম্ভব যোগসাধনা কিংবা ধ্যানধারণা ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে নয়, বাস্তববিজ্ঞানের সাহায্যে। মিচুরিন-লাইসেন্‌কোর এই আবিষ্কার কি জীনস্‌-এডিংটনকেই লজ্জা দিচ্ছে না?

এইখানেই হল বুর্জোয়া দর্শনের সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের পার্থক্য। স্তালিন এই মার্কসীয় দর্শনের অগ্রগতির ধারা এগিয়ে নিয়ে গেছেন যুগান্ত-কারী সাফল্যের পথে। মরণের পরেও তিনি যে সব মৃত্যুহীন দান রেখে গেলেন তার মধ্যে এই মার্কসীয় দর্শনের সমৃদ্ধি অন্যতম তাই স্তালিন অমর।



গণতান্ত্রিক অধিকার ও জাতীয় স্বাধীনতার পতাকা

জনগণ ও জাতিসমূহের সমানাধিকারের নীতি আজ পদদলিত। তার স্থান দখল করেছে শোষক সংখ্যালঘুর পরিপূর্ণ অধিকারের নীতি এবং শোষিত সংখ্যাগুরুর কোন অধিকার না থাকার নীতি। বুর্জোআ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি, যদি অধিকাংশ জনসাধারণকে আপনাদের চতুর্দিকে জমায়েত করার সঙ্কল্প আপনাদের থাকে তাহলে আপনাদেরই—কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রী পার্টিগুলির প্রতিনিধিগণকেই ঐ পতাকা তুলে নিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঐ পতাকা তুলে ধরবার আর কেউই নেই। পূর্বে বুর্জোআদের জাতির মাথা বলে মনে করা হতো। জাতির অধিকার ও স্বাধীনতার সমর্থক ছিল বুর্জোআ শ্রেণী। তাদের কাছে 'আর সব বিষয়ের' উপরে ছিল ঐ স্বাধীকার ও স্বাধীনতা। আজ "জাতীয় নীতির" এতটুকু চিহ্নও আর অবশিষ্ট নেই। আজ ডলারের বিনিময়ে বুর্জোআরা জাতির অধিকার ও স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের পতাকা এখন ধূলায় লুটায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি আপনাদের দেশভক্ত হতে হয়, যদি জাতির নায়ক ও পরিচালক হবার আগ্রহ আপনাদের থাকে, তা'হলে আপনাদেরই—কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রী পার্টিগুলির প্রতিনিধিগণকেই ঐ পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বর্তমানে এই হচ্ছে পরিস্থিতি।

—জে, ভি, স্তালিন

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫২

মহামানব স্তালিন

কমরেড স্তালিনের মৃত্যু আমাদের হৃদয়মনের পক্ষে বিশেষ ও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের অভিজ্ঞতা। মানুষ প্রতিদিন মরে—মৃতব্যক্তিকে যাঁরা ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন তাঁরা কি অনুভব করেন ও কি ভাবেন আমাদের অজানা নয়। কিন্তু স্তালিনের মৃত্যু এমন এক বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা যে আগে থেকে আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না এই মৃত্যু আমাদের হৃদয়-মনকে কিভাবে নাড়া দেবে। কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে একজনের জন্য শোক অনুভব করা, তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত নানা কথা চিন্তা করা, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা—এ রকম মৃত্যুর পরেই কেবল জানা সম্ভব ঠিক কিভাবে এসব ঘটবে। স্তালিনের মতো মহামানবের মৃত্যুর প্রভাব পর্যন্ত জীবিতের উপর হয় অভিনব। তাই, তাঁর জন্য শোক অনুভব করার মধ্যে পর্যন্ত আমরা মহত্তর প্রেরণা পাই, কর্তব্য করে যাওয়ার সঙ্কল্প দৃঢ়তর করার শক্তি পাই।

স্তালিন মৃত কিন্তু কোটি কোটি কণ্ঠে আওয়াজ উঠছেঃ স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন!

এটা কি নিছক ভাবাবেগের স্লোগান? মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন? মানুষকে এগিয়ে দেবার জন্যে যে সব মহাপুরুষ জীবনপাত করেন মৃত্যুর পরেও তাঁরা যে সত্যই বেঁচে থাকেন এটা ইতিহাসের প্রমাণিত সত্য, এর মধ্যে এতটুকু ফাঁকি নেই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাও করা যায় কেন ও কিভাবে এরকম হয়—মরে গিয়েও একটা মানুষ কিভাবে জীবন্ত শক্তিতে পরিণত হয়ে বেঁচে থাকেন।

স্তালিন মৃত বলেই কোটি কোটি মানুষ আরও বেশি শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাঁর নেতৃত্বে মানুষের যে অগ্রগতি তাকে অব্যাহত রাখার সঙ্কল্প আরও কঠোর করে তুলবে। মৃত স্তালিন দীর্ঘজীবী হবেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্তালিনের তিরোধানে

আমাদের দেশে "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ"র মতো সোবিয়েত দেশে লেনিন স্তালিনের ছবি ঘরে ঘরে পথে ঘাটে দেখে এসেছি। জর্জিয়ার ছোট্ট একটি শহরে স্তালিনের বিরাট মর্মর মূর্তি স্থানীয় অধিবাসীদের আগ্রহে ও ব্যয়ে স্থাপিত হয়েছে। এরূপ নাকি ও দেশের সর্বত্র দূরদূরান্ত প্রান্ত পর্যন্ত। অন্যান্য দেশেও এঁদের প্রতিকৃতি খুবই আদৃত। কিন্তু তবুও একটু পার্থক্য অনুভব করে এসেছি। যে প্রলয় নাচনের মধ্যে এ দুজনের রুদ্র আবির্ভাব, অন্যান্য দেশ যেন তা ভুলতে পারেনি, কিম্বা ভুলে না যাবার প্রয়োজন বোধ করে। ঝঞ্ঝা উদ্বেল সোবিয়েত দেশ যতই শান্ত হচ্ছে ততই দুই পুরুষোত্তমের প্রতি এদের ভাব হচ্ছে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রসাপ্লুত। ভয়ঙ্করের প্রয়োজন যেন সেখানে দূরীভূত হয়েছে। অথবা প্রয়োজন মতো ভয়ঙ্কর হতে পেরেছিল বলেই যেন আজ এঁরা বেশি আপন, বেশি অন্তরঙ্গ। এই অন্তরঙ্গতার উদাহরণস্বরূপ ছোট্ট একটি গল্প বলার লোভ এখানে সম্বরণ করতে পারছি না। গল্পটি এখানে বলে গিয়েছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সোবিয়েত লেখক টিকনফ্।

রুশিয়ার উত্তর পার্বত্যাঞ্চলে একটি রেলওয়ে লাইন এক জায়গায় একটা পথ কেটে যায়। সেই চৌমাথায় দাঁড়িয়ে একজন লোককে সবুজ নিশান দেখিয়ে গাড়ি চলাচল নিরাপদ করতে হয়। লোকটির বাসস্থান কুটির চৌমাথার সন্নিকটে নির্জন স্থানে। তার একটি ছোট্ট মেয়ে ইস্কুলে পড়ে। ইস্কুল কয়েক মাইল দূরে নিকটবর্তী স্টেশনের এলাকায়। মেয়েটিকে রোজ এই কয় মাইল পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়। সেদিনের দিন বড়ই ক্লান্তি বোধ করে। অবশেষে সে স্তালিনকে একখানা চিঠি দেয় যে এমন দুটো গাড়ি এই চৌমাথা দিয়ে যাতায়াত করে যে এই চৌমাথায় দু-এক মিনিট দাঁড়ালেই সে গাড়ি চড়ে ইস্কুলে যেতে পারে আর ইস্কুল থেকে ফিরতে পারে। স্তালিন যেন সে ব্যবস্থা করে দেন। মেয়েটি সত্যিই স্তালিনের কাছ থেকে জবাব পায় যে সে যেন ভালো করে পড়াশুনা করে, গাড়ি থামবে। তারপর সত্যি সেখানে একটি ছোট্ট সুন্দর স্টেশন স্থাপিত হয়। মেয়েটির নাম "টামারা", সেই স্টেশনেরও নামকরণ হয় টামারা।

এ ধরনের আন্তরিকতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়া কিছু নেই একেবারে বাস্তব, ঘরোয়া। জর্জিয়ার এক গণ্ডগ্রামে একজন স্কুল মাস্টারকে বলতে শুনেছি "রাশিয়া আমাদের অনেক দিয়েছে সত্যি কিন্তু আমরা তাদের দিয়েছি একজন—আমাদের স্তালিন"। গর্বে তাঁর বুকখানা ফুলে উঠেছিল। স্তালিনকে নিয়ে সমস্ত জাতির কত গর্ব কত আনন্দ কত ভালোবাসা।

এসব অনুভব করে তখনি আমার মনে হয়েছে স্তালিনের তো বয়স হয়েছে, চিরদিন তো আর তিনি থাকবেন না। স্তালিনের তিরোধান ব্যথা এদের প্রাণে কি ভীষণ লাগবে। তখন এরা কি করবে এ ভয় কিন্তু হয়নি। কারণ স্তালিন কিছু ধোঁয়াটে করে রেখে যাননি, সমস্ত জাতিকে পথের নির্দেশ স্পষ্টভাবেই

দিয়ে গেছেন, এবং মনে হল সমস্ত জাতি তা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতেও পেরেছে।

একান্ন সালের সাতই নবেম্বর রুশবিপ্লবের চৌত্রিশ বার্ষিক উৎসবে আমরা মস্কোতে ছিলাম। আশা করেছিলাম স্তালিনকে দেখতে পাব। কিন্তু খবর পেলাম যে তাঁর শরীর তখন প্টু ছিল না, তিনি দক্ষিণে কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আরও খবর পেলাম যে তাঁর সহকর্মী অনুকর্মীরা এখন আর স্তালিনকে খাটতে দিতে চান না। সুদীর্ঘ অক্লান্ত কর্মময় জীবনের শেষে তাঁকে বিশ্রাম দিতেই সকলে আগ্রহান্বিত। তাঁকে দেখতে সুযোগ না পাওয়ায় দুঃখু হল বটে, কিন্তু এ ভেবেও আনন্দ হল যে তাঁর অনুগামীদের এতখানি আত্মবিশ্বাস জন্মেছে যে তাঁকে বাদ দিয়েও সোবিয়েতের বিরাট কর্মচক্রের আবর্তন-বেগ মন্দীভূত হবার কোনোও আশঙ্কা নেই।

এই বেগসঞ্চার করাই ছিল স্তালিনের কাজ। তিনি তা ক'রে গেছেন। এখন তিনি সরে গেলেও চক্র আপনার বেগে আপনিই চলবে এবং উত্তরোত্তর তার বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হবে।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মতো আর্ত নরনারায়ণের সেবা লেনিন স্তালিনেরও লক্ষ্য ছিল। কিন্তু নরনারায়ণ আর্ত হলে তাঁকে সেবাদ্বারা ত্রাণ করা এক জিনিস, আর নরনারায়ণ আর্ত কেন হন এইমূল প্রশ্ন অনুসন্ধান করে মূল কারণ উচ্ছেদ করার প্রয়াস অন্য জিনিস। মার্কস্ এঙ্গেল্স্ তত্ত্বত এই মূল প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন কর্মক্ষেত্রে তারই প্রয়োগ করে লেনিন স্তালিন দেখিয়ে গেলেন যে নরনারায়ণের চোখের সামনেই এই আর্ততা নিবারণের অস্ত্র পড়ে রয়েছে এবং লেনিন স্তালিন এই অস্ত্রই নরনারায়ণের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। এখন আর ধর্মের পুরোপুরি গ্লানি ঘটা পর্যন্ত অবতারের প্রতীক্ষায় বসে থাকার প্রয়োজন নেই। ধর্মের গ্লানি ঘটার মূল কারণে ঘা দিয়ে অবতারকে নেমে আসার কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে।

সোবিয়েত এতদিন ধরে অনেক হিতৈষীকেই হতাশ করে এসেছে। হিটলার সোবিয়েতভূমি আক্রমণ করলে অনেকেরই আশঙ্কা হয়েছিল কয়েক সপ্তাহেই সোবিয়েত নিঃশেষ হয়ে যাবে। স্তালিনের তিরোধানে তেমনি অনেকেই আশঙ্কা কচ্ছেন এবার সোবিয়েত গড়ন ভেঙে পড়বে। এবারেও সোবিয়েত তাদের তেমনি হতাশই করবে। নাগিনীরা প্রবেশ পথ পাচ্ছে না বলে সাঁতালি পর্বতের লৌহ দুর্গ আর চাঁদ সদাগরকে এতদিন দোষারোপ করে এসেছে। আজ চাঁদ সরে যাওয়ায় নাগিনীদের আশা এবারে ছিদ্রপথ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু তারা যেন ভুলে না যায় যে এবারের বেহুলা লখিন্দরেরা ভেতরে ঘুমিয়ে নেই। তাঁরা সম্পূর্ণ সজাগ, নাগিনী ভেতরে ঢুকলেই এবারে ধামাচাপা।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

সৃজনী প্রচেষ্টার প্রেরণাদাতা

এফ্, গ্লাদ্‌কভ

—এক—

মনে পড়ে প্রথম স্তালিন পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সেই অভূতপূর্ব কর্মোন্মাদনাভরা দিনগুলোর কথা। তখন বসন্তকাল। নীপারের বুকে শুরু হয়েছে বরফ চলা; বিপুল ভাঙন—ভাসমান ভাঙা বরফের বিরাট বিরাট চাপ বিপন্ন করে তুলেছে কাটা গাছের গুঁড়ির নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীগুলোর অস্তিত্ব,—খরতিত্‌সা-গামী রেলপথের পুল নির্মাণের জন্য যেগুলোর ভিতরে জমিয়ে তোলা হচ্ছিল কংক্রিটের স্তম্ভ। অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে জলোচ্ছ্বাস; ভাসমান বরফের চাপ ইতিমধ্যেই আঘাতের পর আঘাত হানতে শুরু করেছে স্তম্ভ নির্মাণের ঐ বেষ্টনীগুলোর মাথায়। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যেখানে ভিত কাটা হচ্ছিল, সেখানকার অবস্থাও সংকটজনক। বন্যার জল ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মাটির বাঁধ।

বেতারে ঘোষণা করা হল বিপদবার্তা; বিপদ-জ্ঞাপক বাঁশির শব্দে হাজার হাজার কর্মী এসে জড়ো হল দিনিয়েপ্‌রস্ত্রয়ের নির্মাণ স্থানে। কমিউনিস্ট পার্টি ও তরুণ কমিউনিস্ট লীগের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষের ঐ বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়াল এই জরুরী অবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিতে—প্রতিরোধ করতে বন্যার আক্রমণ। তরুণ কমিউনিস্ট লীগের দলটি শ্রমবিভাগের কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এসেছে পোক্ত হয়ে। স্তালিনের একখানা ছবি হাতে নিয়ে একযোগে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ প্রাকৃতিক বিভীষিকার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সংগ্রামে। সবটুকু শক্তি, সবটুকু প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে হাজার হাজার লোক ভিতকাটা স্থানটিকে রক্ষা করার জন্য বিরাট এলাকা জুড়ে উঁচু বাঁধ তৈরির কাজে লেগে গেল। শত শত লরি-বোঝাই মাটি ও ভাঙা পাথরের টুকরো এনে ফেলছে বাঁধের উপরে। অন্যদিকে, নদীর তীরে, ক্রমবর্ধমান জলোচ্ছ্বাসের মাথার উপরে বরফের চাপ সগর্জনে অবিরাম গতিতে ধেয়ে আসছে। বাঁধের কাছ অবধি এসেছে এগিয়ে; ফেনিল জলের ছিটায় ভিজে উঠেছে মাটির বাঁধ।

ধ্বসে পড়ল মাটি; সগর্জনে ফাটলের মুখে ঢুকে পড়ল ক্ষিপ্ত জলস্রোত। মনে হল বুঝিবা বন্যার এ হিংস্র আক্রমণ প্রতিহত করা সাধ্যাতীত।

বেল্‌চার হাতল দৃঢ় মুষ্ঠিতে চেপে ধরে জলপ্রপাতের মতো অবিরাম ধারায় বাঁধের উপরে মাটি ফেলে চলেছে কর্মরত জনতা। সন্ধানী আলোর উজ্জ্বল কিরণে দেখা যাচ্ছে ভাসমান বরফের বিরাট চাপ, মূর্তিমান অভিশাপের মতো তীব্র বেগে ছুটে আসছে মাটির বাধাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে। বুঝিবা এক্ষুণি ভেঙে পড়বে জনতার মনোবল। কিন্তু বাঁধের উপরে সবার দৃষ্টির সামনে দাঁড় করানো রয়েছে স্তালিনের একখানা বিরাট ছবি, আলোয় উদ্ভাসিতঃ দুটি চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে স্তালিন যেন তাকিয়ে রয়েছেন কর্মরত ঐ

মানুষগুলোর দিকে। বেল্‌চাখানা উঁচিয়ে ধরে একটি তরুণ কমিউনিস্ট একটা লরির উপরে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করলঃ "কমরেড স্তালিন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে; আমরা যেন নীপারের বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানার স্থপতিদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হতে না দিই! আপনারা শোনেননি কি-সেই অমোঘ বাণীঃ এমন কোনোও দুর্গ নেই যা বলশেভিকদের কাছে অপরাজেয়! কমরেডস, স্তালিন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, তিনিই করছেন আমাদের পরিচালিত!

তারপর জনতার সেই বিরাট বাহিনী তরুণ কমিউনিস্টটির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ তুলল, কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন! স্তালিন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে!

রাতভোর চলল তীব্র সংগ্রাম। বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা নির্মাণের জন্য কাটা ভিতের গহ্বরে পারল না ঢুকতে নদীর জল বাঁধ ভেঙে দিয়ে। রক্ষা পেল ভিতের গহ্বর আর যাবতীয় সরঞ্জাম।

পুলের কাছেও ঠিক তেমনিকরে ঘন হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শ্রমিক বাহিনী আর উৎসাহী তরুণ কমিউনিস্ট লীগের সভ্যেরা সেই কাঠের বেষ্টনীর উপরে আঘাতকারী বিরাট বিরাট বরফের চাপের বিরুদ্ধে চলেছে লড়াই করে। লম্বা লম্বা লাঠি আর নৌকার আঁকশির হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে সৈনিকের মতোই তারা বেষ্টনীর উপরে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসা বরফের চাপগুলোকে সবলে ঠেলে পাশের দিকে সরিয়ে দিতে লাগল। মনে হয়েছিল ঐ অতিকায় বরফের চাপগুলো বুঝিবা কাঠের বেষ্টনী চূর্ণ করে স্তম্ভের ভিত্তি গহ্বরে আছড়ে পড়বে। যদি তাই হত, পণ্ড হয়ে যেত বহু মাসের পরিশ্রম। সেখানেও সেই বেষ্টনীর উপরে ছিলেন স্তালিন, হাসিমুখের উৎসাহভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলেন সংগ্রামে অবিচলিত অক্লান্ত-কর্মী ঐ জনতার দিকে। দুর্জয় সাহস, ইচ্ছাশক্তি আর বিরাট চেতনার মূর্ত প্রতীক স্তালিনের ছবি সামনে রেখে, তাঁরই নাম নিয়ে জনসাধারণ সুসম্পন্ন করল ঐ অসাধারণ বীরত্বের কাজ।

—দুই—

মনে পড়ে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত মাতৃভূমিরক্ষার মহাযুদ্ধের সেই প্রথম বছরের শীতকালের কথা—কঠোরতম অগ্নি পরীক্ষা আর অভূতপূর্ব বীরত্বের সেই অতুলনীয় শীতকাল।

ঘটনাটা ঘটেছিল উরালে। সরিয়ে আনা কারখানাগুলোকে সঙ্গে সঙ্গেই বসিয়ে চালু করার মতো তৈরি জায়গা প্রায়ই পাওয়া যেত না। অনেক সময়েই অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি পড়ে থাকত বাইরে, খোলা আকাশের নিচে, খুব তাড়াতাড়ি করে গড়ে তোলা হল বাক্সের আকারে ইটের ছোট ছোট পাকা ঘর। দারুণ তুষারপাতের ভিতরে শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, কিশোর ও নারীরা মিলে সেই-সব ভারী ভারী যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে যেতে লাগল ভিতরে; ছিঁড়ে গেছে পোশাক, হাত কেটে ঝরছে রক্ত, কিন্তু কারুর মুখেই দেখিনি সেই অসহনীয় ক্লেশের কালো ছায়া, কারুর মুখেই দেখিনি এতটুকুও অসন্তোষের ছাপ। অপরিসীম উদ্দীপনায় ঝলমল করছে প্রত্যেকটি মানুষের মুখ; দুর্জয় সাহস

ও সুগভীর বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত প্রত্যেকটি মানুষের অন্তর। অবিলম্বে চালু করতে হবে কারখানা—মাত্র অল্প কয়েকটি দিনের ভিতরে। একদিক যেমন ঘরের ভিতরে জোড়া দেওয়া হতে লাগল যন্ত্রপাতি, বাইরেও তেমনি অবিলম্বে চালু করতে হবে কাজ। চল্লিশ ডিগ্রি তুষার পাতের ভিতরেই কাজ চালু হল। অসাধারণ শক্তি ও উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারেরা।

যুদ্ধের সেই চূড়ান্ত সংকটময় দিনে স্তালিন সমগ্র সোবিয়েত নাগরিকদের কাছে ঘোষণা করলেনঃ "আমাদের যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ, তাই জয় আমাদের সুনিশ্চিত।" বেতার আমাদের মহান নেতা, পিতা ও বন্ধুর সে বাণী পৌঁছে দিল দেশের প্রতিটি কোণে কোণে, প্রতিটি কারখানার প্রতিটি বিভাগে, পৌঁছে দিল প্রত্যেকটি শ্রমিক নিবাসে। শ্রমজীবী জনসাধারণের শিক্ষক, তাদের মহান নেতার প্রতি সুগভীর বিশ্বাসে, ভালোবাসায় প্রত্যেকটি মানুষের সিক্ত চোখ ছাপিয়ে নেমে এল আনন্দের অশ্রুজল। উৎপাদন পরিকল্পনাকে কত দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যায়, কত দ্রুত পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে আরও ঊর্ধ্বে তোলা যায় উৎপাদনের হার তারই জন্য শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা; প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল শ্রমের নতুন পন্থা, নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য, উৎপাদনের হার উচ্চতম মানে পৌঁছে দেবার জন্য। সেদিন ছিল নতুন নতুন তথ্য অন্বেষণের দিন, নতুন আবিষ্কারের দিন। কি কারখানায়, কি খোলা জায়গায় স্থাপিত যন্ত্রপাতির পাশে—যেগুলোর জন্য তখন পর্যন্তও কারখানার ভিতরে স্থান করে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি—সর্বক্ষেত্রেই জনসাধারণ দেখাল অভূতপূর্ব শ্রম-নৈপুণ্যের অতুলনীয় নিদর্শন। আর সর্বত্রই দেখেছি আমি স্তালিনের ছবি। প্রত্যেকটি জায়গার জনসাধারণ অসাধারণ সামরিক প্রতিভা সম্পন্ন তাদের প্রিয়তম নেতার কাছে শপথ করল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বীর সৈনিকেরা নির্দিষ্ট সময়ে, এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই পাবে অস্ত্রশস্ত্র, পাবে প্রয়োজনীয় সমরসম্ভার। বহু কারখানার বহু বড় বড় সভায় আমি উপস্থিত থেকেছি। জরুরী সভা, কিন্তু সংক্ষিপ্ত। গম্ভীর পরিবেশের ভিতরে শ্রমিকেরা শপথ নিল কমরেড স্তালিনের কাছে। "আমরা শপথ করছি" —সহস্র সহস্র কণ্ঠ থেকে উত্থিত সে শপথ বাণী অসীম আবেগে অপূর্ব তেজের সঙ্গে হত প্রতিধ্বনিত। আর শ্রমিকেরাও করেছিল অসাধ্যসাধন।

হাঁ সেদিনের স্তালিনের শ্রম সম্পর্কিত সেই বাণী—শ্রম হচ্ছে সম্মানের বস্তু, গৌরবের বস্তু, শৌর্য ও বীরত্বের বস্তু—এ বাণী যেন শ্রমের সংগ্রামের ভিতরে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ট্রেন বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদ, ট্যাঙ্ক, বিমান, অবিরাম প্রবাহে পৌঁছাতে লাগল যুদ্ধক্ষেত্রে। সর্বোৎকৃষ্ট শ্রমিকদলগুলি পেল কমরেড স্তালিনের কাছ থেকে অভিনন্দনসহ তাররার্তা। কমরেড স্তালিনের প্রত্যেকটি তার-বার্তা শ্রমিকদের ভিতরে জাগিয়ে তুলল অভূতপূর্ব উৎসাহ আর উদ্দীপনা। প্রত্যুত্তরে তারাও জানাল উৎপাদনের হার আরও বৃদ্ধি করার শপথভরা প্রতিশ্রুতি। প্রত্যেকটি মানুষ বিশ্বাস করল, অনুভব করল, জয় সুনিশ্চিত,—মাতৃভূমির সীমানার বাইরে অচিরেই বিতাড়িত হবে শত্রুর দল।

সর্বত্র, সব সময় সব কাজে স্তালিন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে—সহজ আড়ম্বর-হীন, জ্ঞানী, মহান স্তালিন; রয়েছেন তিনি কোটি কোটি মানুষের চিন্তার সঙ্গে অনুভূতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে; আর ঐ কোটি কোটি জনতার প্রত্যেকটি মানুষের অন্তর উদ্ভাসিত করে তুলেছেন অপরাজেয় সত্যের অনির্বাণ আলোকে। সাম্যবাদ গড়ে তোলার আমাদের এই গৌরবোজ্জ্বল যুগের মতো সম্ভবত কোনোদিনও আর জনগণ জয় লাভের জন্য, সুখ সমৃদ্ধিভরা উজ্জ্বল ভবিষ্যত সৃষ্টি করার জন্য, এমন সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়নি। উন্নততর সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে চলেছে শ্রম ও সহযোগিতার এক নতুন রূপ—সৃষ্টি করে চলেছে এক নতুন ধরনের সোবিয়েত শ্রমজীবী মানুষ; উন্নততর কৃষ্টি উন্নততর চেতনায় সমৃদ্ধ সেই মানুষ প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে। ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই শ্রমিক-বুদ্ধিজীবীরা সৃষ্টি করে চলেছে নতুন শিল্প-বিজ্ঞান। স্তালিনপন্থীরা প্রমাণ করে চলেছে যে তারা সুদক্ষ শিল্পী, সৃজন-প্রতিভা-সম্পন্ন শ্রমিক, সমাজতান্ত্রিক দেশের সুসভ্য নাগরিক। এক নতুন ধরনের যাঁতা-কল উদ্ভাবন করেছে এমন একটি খ্যাতিসম্পন্ন যাঁতাকল পরিচালক তরুণ শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কে তাকে শিখিয়েছে এই নৈপুণ্য কে তাকে দিয়েছে এই নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। প্রত্যুত্তরে সে গর্বের সঙ্গে বলেছিলঃ "আমাকে শিখিয়েছেন স্তালিন, স্তালিনের শিক্ষায়ই আমি শিক্ষিত।"

হাঁ, আমাদের দেশের সমস্ত ক্ষেত্রের বিখ্যাত শিল্পী যাঁরা, নতুন শ্রমপদ্ধতির যাঁরা স্রষ্টা ক্লান্তিহীন যাঁদের অনুসন্ধিৎসা আর অসীম যাঁদের সৃজন সম্ভাবনা, স্তালিনই তাদের শিক্ষক, স্তালিনের শিক্ষায়ই তাঁরা শিক্ষিত।

—তিন—

১৯৪৬ সাল, একদল কমরেডের সঙ্গে গিয়েছিলাম বুলগেরিয়ায়। বহু গ্রাম ও শহরে আমরা ভ্রমণ করেছি। কথা বলেছি, আলোচনা করেছি বহু কৃষাণ ও শ্রমিকদের সঙ্গে। যখন যেখানেই গেছি টাটকা তাজা ফুলের মালায় সুসজ্জিত কমরেড স্তালিনের ছবি হাতে নিয়ে জনতা হাসিমুখে আমাদের জানিয়েছে সাদর সম্ভাষণ আর তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে "স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন!" "দীর্ঘজীবী হোক সোবিয়েতের মানুষ!" মহিমান্বিত হোক মহান স্তালিন! স্তালিন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সুখ সমৃদ্ধিভরা ভবিষ্যত!

বুলগেরিয়ার একটি ছোট শহর। একটি বীর তরুণীর গৌরবময় মৃত্যুতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে এই শহরটির নাম। সেই তরুণীর ছোট বোন—সেও লড়েছে গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে—আবেগভরা কণ্ঠে এসে বললঃ আমার দিদি মরেছে যুদ্ধ করতে করতে। তিন দিন ধরে ঠেকিয়ে রেখে ছিল একটা গোটা বাহিনীতে, তারপর হল তার মৃত্যু। কিন্তু তার মৃতদেহের বুকে পেয়েছিলাম আমি একটুকরো কাগজ আর তাতে রক্ত দিয়ে লেখা ছিল কয়েকটি কথাঃ "স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্তালিন আর দিমিত্রভ

রয়েছেন আমার সঙ্গে। সেই মহান স্নেহময় পিতা স্তালিনের সুখী কন্যা হয়ে আমি আজ বরণ করছি সুখের মৃত্যু। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমি আজ মৃত্যুকে বরণ করছি যে, মুক্ত হবে সুখী হবে বুলগেরিয়ার মানুষ, কারণ স্তালিন্ আর দিমিত্রভ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে.....”

একটা পাহাড়ী গাঁয়ের কাছাকাছি এসে পেঁছাতেই এক বিরাট কৃষাণ-জনতার সঙ্গে হল আমাদের সাক্ষাৎ। ওরা নিয়ে এসেছে মেঠো ফুলের বড় একটা সুন্দর মালা, আর লাল পতাকার উপরে সুঁচের কাজে লেখা কমরেড স্তালিনের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন বাণী। একটি ছোট্ট মেয়ে তার সুন্দর চুলভরা মাথাটির উপরে উঁচু করে তুলে ধরে রয়েছে স্তালিনের একখানা ছবি।

একটি বৃদ্ধা একটা ফুলের মালা আমাদের হাতে দিয়ে বললেনঃ “এ মালা রুশবাসীর জন্য, সোবিয়েতের মানুষের জন্য। আমাদের দেশে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি।” তারপর স্তালিনের ছবির দিকে দেখিয়ে চোখের জল আর মুখের হাসির ভিতর দিয়ে বললেনঃ “এখন স্তালিন এসেছেন আমাদের সঙ্গে বাস করতে, এখন আমরা মুক্ত আমরা সুখী। রুশিয়ার জনসাধারণের সঙ্গে চির-দিন আমাদের রয়েছে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন। তারা আমাদের জ্যেষ্ঠ—স্নেহশীল ভাই। এখন কেউ আর পারবেনা আমাদের ভিতরে বিচ্ছেদ ঘটাতে। স্তালিন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে.....”

যুদ্ধোত্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে সোবিয়েতের জনগণ পূর্ণো-দ্দমে কাজ করে চলেছে কল-কারখানায়, কাজ করে চলেছে যৌথ খামারে। স্তালিনের যুগে কাজ করা, স্তালিনের যুগে বাসকরা, স্তালিনের সমসাময়িক হওয়া পরম সুখের। সাম্যবাদ সংগঠনের এই মহান গৌরবোজ্জ্বল যুগে জন-গণের সৃজনীশক্তির হয়েছে এমন অভূতপূর্ব বিকাশ যেমন আর হয়নি কোনো-দিনও। তারা পার্টির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, কমরেড স্তালিনের শিক্ষায় শিক্ষিত। সৃষ্টি হয়েছে এক অভিনব বলশেভিক বংশ—অফুরন্ত উদ্যম আর দুর্জয় সাহসে ভরপুর।

বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে আমাদের জনগণ ভবিষ্যতের দিকে। এক হয়ে গেছে জনগণ আর স্তালিন। স্তালিনের কথা বলার মানে সোবিয়েত জন-গণের অফুরন্ত সৃজনীশক্তি ও শ্রমের অবদানের কথা বলা, তাদের সুদূর পরি-কল্পনার আর জ্ঞানের কথা বলা। স্তালিনের কথা বলার অর্থ ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, সমগ্র দুনিয়ার জনগণের শান্তি ও মুক্তির জন্য সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের কথা বলা। স্তালিন—দুনিয়ার সুখ, দুনিয়ার আলো।

অনুবাদ—সত্য গুপ্ত

“একথা সাধারণভাবেই স্বীকৃত যে মতের সংঘর্ষ ছাড়া, সমালোচনার স্বাধীনতা ছাড়া কোনো বিজ্ঞান পরিণত ও বিকশিত হতে পারে না।”

—স্তালিন

শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গে স্তালিন

ননী ভৌমিক

(১)

আমি চাই আমার কলম
পাল্লা দেবে বন্দুককে
থাকবে তা এক তালিকায়
কারখানার
লোহার সঙ্গে

তা হোক পলিটব্যুরো বৈঠকের
এক নম্বর বিষয়
হোক স্তালিনের রিপোর্ট—
"কবিতার উৎপাদন"...

সোবিয়েত আমলের সেরা কবি মায়াকভ্স্কি একদা এই উচ্চাভিলাষ ঘোষণা করেছিলেন। বাইরের চোখে এর অনেকটাই অদ্ভুত মনে হয়েছে। কারণ, বর্তমান বাইরের জগতে প্রকৃত কবিতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কটা সাধারণত বিরোধের। রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদনশীল সৎ কবিরা তাই আমাদের দেশে কবিতার "যথাস্থান" খুঁজতে গিয়ে বিদ্যেরত্ন পাড়া ও ভাগ্যবন্তদের প্রাসাদ পরিত্যাগ করে অন্যত্র, "সরল হাসি সজল চোখের কাছে"-ই যাওয়ার কথা ভেবেছেন।

তাই মায়াকভ্স্কি যখন সদর্পেই কবিতাকে মেলাতে চান বলশেভিক পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে, এবং যথাস্থান খুঁজতে চান স্তালিনের মতো একজন রাষ্ট্রনেতার রিপোর্টের মধ্যে, তখন সব জিনিসটা খুব আকস্মিক ঠেকে সন্দেহ নাই। প্রশ্ন জাগে দুদিক থেকে—কবিতার কি সত্য সত্যই কোনো পার্টির আদর্শে এমন গর্বিত বোধ করা উচিত? এবং কোনো রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতা কি সত্যই কবিতা সম্পর্কে উপযুক্ত মনোযোগ ও নির্দেশ দেবার উপযুক্ত?

হাঁ উপযুক্ত। আমাদের দেশে, এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের অন্তর্ভুক্ত আরো নানা দেশের পক্ষে একথা কল্পনা করা কঠিন হলেও নতুনতর সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্প ও রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য একটা সম্পর্কই সত্য। মায়াকভ্স্কির কবিতা এই পৃথক বাস্তবের নতুনতর সত্যকেই ঘোষিত করেছে।

এবং এই সত্য শুধু একটা শুভ আদর্শমাত্র নয়। সোবিয়েতের জীবনে তা একান্ত প্রত্যক্ষ। এই দেশের পার্টি, তার কেন্দ্রীয় কমিটি, এবং স্তালিন শুধু বিপ্লবকেই সফল করেননি, পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম যুদ্ধতেই শুধু জয়লাভ করেননি, কবিতার জন্য, শিল্প-সাহিত্যের জন্য অবাধ বিকাশের

পথকেও ক্রমাগত পরিষ্কার করে দিয়েছেন এবং সর্বোপরি সাহিত্যকে দিয়ে গেছেন অগ্রসর হবার উপযুক্ত তত্ত্ব, চিন্তা, জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ পথপ্রদর্শনের নিশানা।

পথপ্রদর্শনের এই ইতিহাস অর্থনীতি রাজনীতি এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের স্তালিন-নেতৃত্বের মতোই সমান গভীর, সমান অভিনব; মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান মার্কসবাদী চিন্তার অপূর্ব আলোয় ভাস্বর।

মার্কসবাদের গুরু মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের মতোই স্তালিনও হলেন এমন এক নতুন ধরনের মনীষী যাঁর কাছে মানুষের জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের কোনো ক্ষেত্রই নিষিদ্ধ নয়। পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগের অতিকায় বিকাশের ফলে আমাদের মধ্যে বুদ্ধিবার বিশেষজ্ঞ বৃত্তির একটা অভিশাপ বর্তমান। মানুষ আর গোটা মানুষ নয়। এক আমূল বিচ্ছিন্নতায় কর্মের বাহু ও চিন্তার মস্তিষ্ক পরস্পর অপরিচিত। চিন্তার ক্ষেত্রেও এক একটি বিষয় চারিপাশে আত্মসর্বস্ব গণ্ডি টানতেই ব্যস্ত। একালে যিনি অঙ্ক কষেন তিনি অবশ্যই ফেল করেন কাব্যে, যিনি যন্ত্র বানান তিনি অবশ্যই দর্শনে মূঢ়; যাঁরাই বুদ্ধির অনুশীলন করেন, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই কর্মের। পুঁজিবাদ গোটা মানুষের শত্রু।

শুধু শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার জন্য সংগ্রামের গর্ভে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ধরনের গোটা মানুষ যার উত্থান দেখা দিয়েছিল রেনেসাঁসের যুগে, যাঁদের সম্পর্কে এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, "চিন্তা আবেগ ও চরিত্রের শক্তিতে, জ্ঞান ও সর্বগামিতায় মহাকায়।" আবার আমরা দেখছি এমন এক মানুষ, যিনি নাৎসী অভিযানের দারুণ দিনগুলির সমস্যায় ব্যাপৃত থেকেও মধ্যরাত্রিতে টেলিফোনে আলাপ করেছেন নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে, সমাজতন্ত্র গঠনের দুরূহ কর্তব্য পরিচালনা করতে করতেও যিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন শিল্পের, যিনি একহাতে যুদ্ধ এবং অন্যহাতে মরুভূমির অভিশাপকে জয় করার অকুতোভয় দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্র সম্পর্কেই বলতে পারেন, "অবশ্য ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদের কথা উঠলে, তা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে মার্কসবাদের মতো সঠিকভাবেই আমার বিচারক্ষেত্রের বিষয়।" (ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ-প্রসঙ্গে)

এই সর্বগামী প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য কি?

পুরনো ধরনের মনীষীদের থেকে এই প্রতিভার তফাত হল এই যে তা পৃথিবীকে শুধু ব্যাখ্যা করা নয়, তাকে পরিবর্তন করার ব্যবহারিক প্রচেষ্টাতেই স্ফুরিত। রেনেসাঁস মানবদের সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছিলেন, "তাঁদের যা একান্ত বৈশিষ্ট্য তা এই যে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই জীবন যাপন ও কাজ করেছেন সমসাময়িক আন্দোলনগুলির মাঝখানে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তাঁরা পক্ষ নিয়েছেন, লড়াইয়ে যোগ দিয়েছেন, কেউ বক্তৃতা দিয়ে এবং লিখে, কেউ তরবারি নিয়ে, অনেকে দুভাবেই। এই জন্যেই তাঁদের চরিত্রে এসেছে এমন একটা পূর্ণতা ও শক্তি যা তাঁদের পরিণত করেছে গোটা মানুষে।"

স্তালিনের প্রতিকৃতি রেনেসাঁস যুগের এই মহাকায়দেরও গুণগত-ভাবে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ তাঁর যে সংগ্রাম তা গুণগতভাবে আরো উন্নত—

সমগ্র প্রাকইতিহাসকে পিছনে ফেলে এই সর্বপ্রথম মানুষের প্রকৃত ইতিহাস পত্তন করার সংগ্রাম।

(২)

নতুন ধরনের এই মনীষা শিল্প-সাহিত্যকেও পথনির্দেশ করেছে।

অবশ্য এদেশে বসে তার সম্যক পাঠ এখনো পুরোপুরি সম্ভব নয়। কারণ স্তালিনের অধিকাংশ লেখা এখনো বাংলা ভাষাতে এমনকি ইংরেজি ভাষাতেও সুলভ নয়। বিশেষ করে শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গে তাঁর লেখাগুলি, দেমিয়ান বেদ্‌নি, ফেলিক্স্ কন, গোর্কি প্রভৃতিকে লেখা তাঁর চিঠিগুলির অধিকাংশ সম্পর্কেই আমরা শুধু অন্যের বিবরণ মারফত উল্লেখ দেখেছি। শিল্পসাহিত্য-সম্পর্কে স্তালিন-চিন্তার সম্যক পরিচয়ের জন্য হয়তো এখনো কিছুদিন তাঁর সংগৃহীত রচনাবলীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এ অপেক্ষা যত কম হয়, ততই মঙ্গল।

তবু, ইতিমধ্যে, আমাদের আয়ত্তাধীন সম্পদও কম নয়। বিশেষ করে, বলশেভিক পার্টির বিভিন্ন কংগ্রেসে প্রদত্ত স্তালিনের রিপোর্ট, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত সংজ্ঞা, জাতীয় সমস্যা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর পথনির্দেশ, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে তাঁর অমূল্য রচনা, এবং ভাষাতত্ত্ব প্রসঙ্গে তার গভীর মতামত প্রত্যক্ষভাবেই শিল্প-সাহিত্যকে সাহায্য করার মতো সম্পদে পূর্ণ। তাছাড়া, তাঁর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রচনা-গুলি, বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে তাঁর লেখা শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছেও এক অমূল্য অস্ত্র, কারণ যে জীবন ও সমাজ শিল্পী সাহিত্যিকদের বিষয়, তাকে গভীরভাবে চেনা সহজ এই তত্ত্বগুলির আলোতেই।

শিল্পসাহিত্য তথা অন্যান্য ক্ষেত্রে স্তালিন-চিন্তার চরিত্রটি কি?

এ চিন্তার বৈশিষ্ট্যই এই যে তা মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিনের চিন্তারই অগ্রগতি, তাঁদেরই তত্ত্ব ও সূত্রের আরো বিকাশ। যেমন সর্বক্ষেত্রে, তেমনি শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও মার্কস-এঙ্গেল্‌স্-লেনিন ও স্তালিনের উৎগুলিকে বুঝতে হলে তা বুঝতে হবে তিনটি বিশেষ যুগের বৈশিষ্ট্য মনে রেখে।

মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ হলেন মার্কসবাদী চিন্তার আদিগুরু। তাঁরা প্রায় সর্ব-ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী চিন্তার পথ কেটে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে গুছিয়ে যেতে না পারলেও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁরা অমূল্য চিন্তা রেখে গেছেন। তাঁদের এই যুগটা ছিল প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের যুগ, শ্রমিক বিপ্লবের আগের যুগ।

পরবর্তী যুগের প্রতিনিধি লেনিন। স্তালিনের সংজ্ঞা অনুসারে "লেনিন-বাদ হল সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রমিক বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ।" মার্কস-এঙ্গেলস্-এর উপযুক্ত শিষ্য হিসেবে লেনিনকে কাজ করতে ও সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে এমন একটা যুগে যখন পুঁজিবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে বিকশিত সাম্রাজ্য-বাদের রূপে, যখন শ্রমিক বিপ্লব শুরু হয়েছে, যখন একটি দেশে এ বিপ্লব জয়ী

হয়েছে। এই যুগের বিশেষ বৈচিত্র্য ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন মেনে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কেও মার্কস-এঙ্গেলস্-এর চিন্তাকে নতুন বিকাশ, নতুন নির্দিষ্টতায় সমৃদ্ধ করে যেতে হয়েছে লেনিনকে।

স্তালিনের যুগ শ্রেণীসংগ্রামের নতুনতর পরিস্থিতির যুগ। লেনিনের সহযোদ্ধা ও শিষ্য হিসাবে স্তালিনকে কাজ করতে হয়েছে আরো পরবর্তী যুগ পর্যন্ত। স্তালিনের নামাঙ্কিত এই যুগটাকে বলা যেতে পারে বিজয়ী সমাজতন্ত্র ও একাধিক দেশে শ্রমিক এক-নায়কত্বের যুগ, ঔপনিবেশিক বিপ্লবের অভূতপূর্ব তরঙ্গের যুগ, সোবিয়েত দেশে সাম্যবাদে উৎক্রান্তির যুগ, সমাজব্যবস্থায় সোবিয়েতের যুগ।

এই যুগের প্রয়োজনের উপযোগী করে স্তালিন আরো অগ্রসর করেছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, মার্কসবাদের ভাণ্ডারে যোগ করেছেন আরো তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের ঐশ্বর্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁকে একই কাজ করতে হয়েছে, নতুনতর গভীরতা, বিকাশ ও নির্দিষ্টতায় দিয়ে যেতে হয়েছে নানা সিদ্ধান্ত।

নতুনতর ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং প্রয়োগের ভিত্তিতে জ্ঞানকে আরো সম্পূর্ণ করার এই ধারাটিই হল মার্কসবাদের আন্তরিক সার্থকতার প্রমাণ। স্তালিনের কথায়—"মার্কসবাদ বিজ্ঞান বলে তা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না: তা বিকশিত হয় ও উন্নত হয়। এই বিকাশের পথে মার্কসবাদ নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ না হয়ে পারে না—সুতরাং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর বিভিন্ন সূত্র ও সিদ্ধান্তও না পালটিয়ে পারে না; নতুন ঐতিহাসিক কর্তব্যের উপযোগী নতুন সূত্র ও নতুন সিদ্ধান্ত দিয়ে পরিবর্তিত না হয়ে পারে না। সমস্ত কাল ও সমস্ত যুগের পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য অনড় সিদ্ধান্ত ও সূত্র মার্কসবাদ স্বীকার করে না। মার্কসবাদ হল সমস্ত গোঁড়ামির শত্রু।"

সাম্রাজ্যবাদ ও বিপ্লবের যুগে লেনিন, এবং স্তালিন-যুগে স্তালিন এই সৃষ্টিমূলক মার্কস্বাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে একথাটি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, মার্কস-বাদের কতকগুলি নীতির মূলমর্মকে, মূলধারাকে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশটিকেও না বোঝার ফলে অবৈজ্ঞানিক অভ্যাস দেখা দিতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, একটি সাধারণ সূত্রের মর্ম না বুঝে তার অক্ষরকে বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের সাহিত্যেও বিরল নয়। অন্যদিকে, আর একটি ত্রুটি আমাদের সাহিত্য সমালোচনায় হামেশাই দেখা যায়। এটি হল মার্কসবাদী শিল্প-দৃষ্টির সন্ধানে শুধুমাত্র মার্কস-এঙ্গেলস্-এর কয়েকটি উদ্ধৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকা, এবং নতুনতর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও কর্তব্যের সামনে লেনিন-স্তালিনের হাতে তার যে বিশেষ বিকাশটুকু ঘটেছে, তাকে উপেক্ষা করা বা বর্জন করা।

এই বর্জনও আসলে মার্কসবাদ-বিরোধী বর্জন—মার্কসবাদকে বুলিতে পরিণত করাই তার কাজ। বস্তুত সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ না করলে বিজ্ঞানের মতোই সাহিত্যে-মার্কসবাদও অকার্যকরী হবে।

(৩)

শিল্পসাহিত্যের পক্ষে গভীর তাৎপর্যময় একটি প্রসঙ্গ হল উপরিতল ও বনিয়াদের মধ্যেকার সম্পর্ক। বস্তু এবং মন, চৈতন্য এবং সত্তার মধ্যে কোন্‌টা আদি, কোন্‌টা প্রাথমিক, তার জবাবে মার্কসবাদ বস্তুবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে একত্রে উত্তর দিয়েছে যে বস্তুটাই আগে, বাস্তব জগতটাই আগে।

সমাজের ক্ষেত্রে এই উত্তরকে প্রয়োগ করে মার্কস লিখেছিলেন "মানুষের চৈতন্য দিয়ে তাদের সত্তা নির্ধারিত হয় না, উল্টে সামাজিক সত্তা দিয়েই নির্ধারিত হয় তাদের চৈতন্য" (ক্রিটিক অব পোলিটিকাল একনমি)। সমাজের ক্ষেত্রে সত্তা ও চৈতন্যের সাধারণ চেহারাটা হল, মার্কসের কথায়—"মানুষ যে সামাজিক উৎপাদন চালিয়ে যায়, তাতে তাদের প্রবেশ করতে হয় এমন কতকগুলি অপরিহার্য নির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে, যা তাদের ইচ্ছাধীন নয়, এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদনের বাস্তব শক্তির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট অবস্থার উপযোগী। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলির মোট যোগফলে তৈরি হয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো —প্রকৃত বনিয়াদ, যার ওপর খাড়া হয় একটি আইনগত ও রাজনৈতিক উপরিতল; সামাজিক চৈতন্যের বিশেষ ধারণাগুলি তারই উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে।" (ঐ)

এই উপরিতলের মধ্যে মার্কস অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, "আইনগত রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিল্পতত্ত্বগত, অথবা দার্শনিক—সংক্ষেপে মতাদর্শগতরূপ যার মধ্যদিয়ে মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে এই সংঘাত (উৎপাদন শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের) সম্পর্কে এবং লড়াই করে তাকে শেষ করে।"

শিল্পসাহিত্যের প্রশ্নটি এই উপরিতলের অন্তর্ভুক্ত।

মার্কস্‌ এবং এঙ্গেলস্‌ বনিয়াদ ও উপরিতলের সম্পর্ক নিয়ে আরো আলোচনা করেন ও দেখান যে উপরিতল নিষ্ক্রিয় নয়, তা বনিয়াদ কর্তৃক যান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত হয় না, এবং উপরিতলের বিভিন্ন অংশ (যথা দর্শন) বনিয়াদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, এবং তাদের ব্যাখ্যা একমাত্র অর্থনীতি দিয়ে করা সম্ভব নয়, পূর্ববর্তী যুগের সঞ্চিত চিন্তা-বস্তু থেকে আলাদা করে তা হঠাৎ সৃষ্টি হয় না, তাকেই আশ্রয় করে পরিবর্তিত হয়, তবে পরিবর্তনটাকে শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতেই হবে বনিয়াদের পরিবর্তন দিয়ে।

মার্কস্‌-এঙ্গেলস্‌ বনিয়াদ ও উপরিতলের সাধারণ নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করলেও পরবর্তী যুগে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতর বিকাশ এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর সংঘাতের এক যুগে সমগ্র বিষয়টিকে আরো গভীর ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো আরো নির্দিষ্ট করে বিবৃত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পূর্ববর্তী ও এই যুগের সমগ্র অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সূত্র টেনে (generalise) স্তালিন তাঁর 'দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' এবং "ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ-প্রসঙ্গে" নামক রচনায় সমগ্র বিষয়টিকেই নতুন গভীরতা ও নির্দিষ্টতায় বিবৃত করেন।

উপরিতলের মধ্যে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত এই প্রশ্নটিকে তিনি আরো গভীরভাবে বিচার করেন এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকেও উপরিতলের অন্তর্ভুক্ত করে বলেন যে "উপরিতল হল সমাজের রাজনৈতিক, আইনগত, ধর্মীয়, শিল্পগত

এবং দার্শনিক মতামত এবং তাদের অনুসারী রাজনৈতিক, আইনগত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ।"

সরলীকরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে তিনি দেখান এমন কতকগুলি জিনিস আছে যা উপরিতলের অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন ভাষা।

যন্ত্রবিজ্ঞানকে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে সাধারণভাবে উপরিতলের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কিন্তু অন্যদিকে সামাজিক বিজ্ঞান, সামাজিক ধারণাগুলি উপরিতলের অন্তর্ভুক্ত। স্তালিনের চিন্তার আলোয় এই প্রসঙ্গে আরো আলোচনা চলছে।

কিন্তু স্তালিনের শিক্ষা অনুসারেই শিল্পসাহিত্য বা সংস্কৃতি অবশ্যই উপরিতলের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। তার ফলে শিল্পসাহিত্যের কতকগুলি মূল ধর্মও অবশ্যস্বীকার্য হয়ে পড়ে। এমনি একটি ধর্ম শিল্পসাহিত্যের শ্রেণী চরিত্র। এমনি একটি ধর্ম শিল্পসাহিত্যের মধ্যে বনিয়াদকে প্রতিফলনের ধর্ম। এমনি একটি ধর্ম শিল্পসাহিত্যের সক্রিয় প্রকৃতি, এবং বনিয়াদকে সংহত করার জন্য শিল্পসাহিত্যের সংগ্রামের ভূমিকা।

বনিয়াদ এবং উপরিতলের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করে স্তালিন বলেন—"বনিয়াদ থেকেই উপরিতলের সৃষ্টি। কিন্তু তার মানে এই নয় বনিয়াদ উপরিতলকে শুধু প্রতিফলিত করে মাত্র, এই নয় যে তা সমাজব্যবস্থার চরিত্র সম্পর্কে, শ্রেণীগুলির ভাগ্য সম্পর্কে, বনিয়াদের ভাগ্য সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ বা উদাসীন। উল্টো; একবার সৃষ্টি হবার পর এ পরিণত হয় এক বিপুল সক্রিয় শক্তিতে, সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে যাতে বনিয়াদ রূপ নিতে পারে, নিজেকে সংহত করতে পারে; যেমন করে পারে সাহায্য করে যাতে নতুন ব্যবস্থা পুরনো বনিয়াদ এবং পুরনো শ্রেণীগুলিকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতে পারে।

"এ না হয়ে পারে না। বনিয়াদ উপরিতলকে সৃষ্টি করে ঠিক এই জন্যই যেন তা বনিয়াদের সেবা করে...যেন তা এমন সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে যাতে বনিয়াদ গঠিত এবং সংহত হতে পারে, যেন তা সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে যাতে পুরনো মুমূর্ষু বনিয়াদ তার পুরনো উপরিতলসহ নিশ্চিহ্ন হয়।" ('ভাষাতত্ত্বে মার্কস্‌বাদ প্রসঙ্গে')।

অল্প পরিসরে এই বক্তব্যের মধ্যে উপরিতলের সমস্ত-ধর্মটুকুই বিবৃত হয়েছে। এই থেকে দেখা যায় যে উপরিতলের ধর্মই হল বনিয়াদকে প্রতিফলিত করা, তা সে যতদূরেই অবস্থিত হোক না কেন, তার ফর্ম বা রূপ যেমনই হোক না কেন। দ্বিতীয়ত নতুন উপরিতলের ধর্মই হল নতুন শ্রেণীগুলির স্বার্থকে, নতুন বনিয়াদকে সংহত ও রক্ষা করা এবং পুরনো ভিত ও পুরনো শ্রেণী ও পুরনো উপরিতলকে নিশ্চিহ্ন করা। এছাড়া তার অন্য কোনো ভূমিকা হতে পারে না।

উপরিতল সম্পর্কে এই শিক্ষা গ্রহণ করলে অবিলম্বে এই প্রসঙ্গে যে অবৈজ্ঞানিক মতগুলি প্রগতিসাহিত্যের বাইরে ও ভিতরে চলে আসছে তাদের ভ্রান্তিটুকু চোখে না পড়ে পারে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আনন্দ, রস বা চিত্তবিনোদন ছাড়া শিল্পের অন্য কোনো লক্ষ্য বর্জন করার জন্য একটি মতবাদ প্রায়ই প্রচারিত হয়ে থাকে। স্তালিনের শিক্ষায় দেখা যাবে এ প্রচার শিল্পের মূলধর্মকে বর্জন করারই প্রচার। কারণ শিল্পের একটা মূলধর্মই হল তার জনক বনিয়াদটিকে সংহত করা রক্ষা করা এবং পুরনো বনিয়াদকে নিশ্চিহ্ন করা।

আমাদের দেশেও নতুন সংস্কৃতির একটা ধর্মই হবে, আমাদের সমাজে যে নতুন ভিত উঠছে, সেই জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বিজয়ী করে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং সামন্ততন্ত্রী ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করা। এই ভূমিকা সম্পর্কে যত সচেতন হওয়া যাবে, ততই এই নিয়মটিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

প্রগতিশীল সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও যান্ত্রিক চিন্তার প্রকাশ দেখা দেয় উপরিতলের সক্রিয় ভূমিকাকে বাতিল করে বা তুচ্ছ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "যা ঘটেছে মাত্র তাই লিখব তার এতটুকু বেশি নয়" "শিল্প শুধু বর্ণনা করবে, কোনো প্রশ্ন সম্পর্কে রায় দেবে না" প্রভৃতি ধরনের অব্জেকটিভিস্ট ও স্বাভাবিকতাবাদী ধারণা আমাদের মধ্যে বেশ চালু।

স্তালিনের এই শিক্ষা আরো দেখাচ্ছে, যে শুধু ধারণাগুলি নয়, প্রতিষ্ঠানগুলিও উপরিতলের অন্তর্ভুক্ত, এবং তাদের বিপুল সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। এই শিক্ষা আমাদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় কারণ "দল বেধে সাহিত্য করার" সম্পর্কে আমাদের অনেকের মধ্যে এখনো একটা প্রবল বিতৃষ্ণা আছে; প্রগতি সাহিত্যের জন্যও যে প্রতিষ্ঠান কত জরুরী তা এখান থেকে আমরা শিখতে পারি।

উপরিতল, বনিয়াদ এবং ভাষা-প্রসঙ্গে স্তালিনের উক্তিগুলিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা ভুল অর্থে ব্যবহারের যে প্রবণতা দেখা দিতে পারে এই প্রসঙ্গে তার কিছুটা আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যেমন প্রশ্ন ওঠে, ভাষা যেমন কোনো শ্রেণীর সম্পত্তি নয়, তেমনি কি আমাদের এখানে কোনো কোনো সংস্কৃতিও কি শ্রেণীবহির্ভূত হতে পারে না?

না পারে না। ভাষা এবং সংস্কৃতি দুটি পৃথক জিনিস। স্তালিন বলেন, "এই কমরেডদের ভুল হল এই যে তাঁরা সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষাকে এক করে দেখেন ও গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু সংস্কৃতি ও ভাষা দুটি ভিন্ন জিনিস। সংস্কৃতি হতে পারে বুর্জোয়া কিংবা শ্রমিক; কিন্তু ভাষা...বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক উভয় সংস্কৃতির জন্যই কাজ করতে পারে" এবং "পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে লেনিন দুই সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন—বুর্জোয়া ও শ্রমিক এবং বলেছিলেন যে পুঁজিবাদের আমলে জাতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি একটি জাতীয়তাবাদী ধ্বনি। এসব সত্যি এবং লেনিন এক্ষেত্রে দারুণ খাঁটি কথা বলেছিলেন।" (ভাষাতত্ত্বে মার্কস্‌বাদ-প্রসঙ্গে)।

বস্তুত ভাষা বুর্জোয়া বা শ্রমিক উভয় সংস্কৃতির সেবা করে। কিন্তু এই ভাষা যখন সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন এই সমগ্র সাহিত্য শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-চরিত্র বহির্ভূত বিষয় হতে পারে না। যেমন পাথর সকল শ্রেণীকেই সমান কাজ দিতে পারে, কিন্তু সেই পাঁথরে যখন মূর্তি গড়া হল, তখন তা হল শিল্প এবং

অবিলম্বে উপরিতলের সঙ্গে সংযুক্ত। তা তখন আর শ্রেণী-নিরপেক্ষ হতে পারে না।

প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্যের মধ্যে আরো দুই একটি উপাদান আছে কিনা যা ভাষার মতোই মাত্র একটি যুগের বা কোনো শ্রেণীবিশেষের সম্পত্তি নয়? এরূপ উপাদান অবশ্যই আছে কিন্তু এক্ষেত্রেও তা সাহিত্য বা শিল্পে প্রবেশ করে যে-রূপ নেয় তা শিল্পের রূপ। এবং শিল্প শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়; শ্রেণীর স্বার্থ হাসিল করাই তার ধর্ম।

স্তালিনের 'ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ-প্রসঙ্গে' প্রকাশিত হবার পর পোলাণ্ডে সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে যে আলোচনা হয় এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণার বিবরণ দিয়ে স্তেফান জোলকিয়েভ্স্কি লেখেন, যে এই আলোচনা-গুলিতে "একটি সাহিত্য রচনার মধ্যে প্রকাশিত জাতীয়-ভাষার অশ্রেণীক চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থায় সাহিত্যের শ্রেণীচরিত্র এবং সাহিত্য রচনার শ্রেণীর ব্যাখ্যার প্রশ্নের দিকে মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এই সমস্ত লেখায় জোর দেওয়া হয় এই দিকে যে কোনো সাহিত্যিক এবং কবিতার বিশেষ গোষ্ঠী-গুলির উভয়েরই উৎস রয়েছে সামাজিক জীবনে এবং শ্রেণীসংগ্রামের আগুনে পুড়েই তা রূপ নেয় ও এই সংগ্রামের জন্যই কাজ করে।" (ফর এ লাস্টিং পীস এণ্ড পীপল্স্ ডেমোক্রাসি, ২০শে জুন, ১৯৫২)

প্রশ্ন ওঠে, নতুন সংস্কৃতি কি পুরনো সংস্কৃতি থেকে কিছু নিতে পারে না? অবশ্যই পারে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন যে উপরিতলের এক একটি ক্ষেত্র অন্যান্য ক্ষেত্রের (যথা রাজনীতি) প্রভাব এবং সেই ক্ষেত্রের পূর্ব সঞ্চিত চিন্তাবস্তুগুলিকে আশ্রয় করেই পরিবর্তিত হতে পারে। স্বয়ং মার্কসবাদই মানবসভ্যতার পুরাতন চিন্তা-সম্পদকে গ্রহণ করেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রোলেটকাল্ট ও রাপ্-এর পর ভাষাতত্ত্বেও এন্ ওয়াই, মার অতীত সম্পর্কে যে মনোভাব নেন, তার সমালোচনা করে স্তালিন লেখেন—"এন, ওয়াই, মার এবং বিশেষ করে তাঁর শিষ্যদের কথা শুনে মনে হবে যেন এন্, ওয়াই, মারের আগে ভাষাতত্ত্ব বলে কিছু ছিল না, যেন ভাষাতত্ত্ব সৃষ্টিই হল এন, ওয়াই, মারের 'নতুন নীতির' সঙ্গে। মার্কস এবং এঙ্গেলসের মধ্যে অনেক বেশি বিনয় ছিল। তাঁরা বলতেন যে তাঁদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দর্শন সমেত পূর্ববর্তী যুগের বিজ্ঞানগুলির বিকাশের একটি ফল।"

সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে এই গ্রহণ মানে অবিচ্ছিন্ন ধারা নয়, পৃথকতর সৃষ্টি। পুরনো যুগ থেকে নতুন সংস্কৃতি যা গ্রহণ করে তাকে সে কাজে লাগায় গুণগতভাবে পৃথক একটা সংস্কৃতি গড়ার জন্য। পুরানো যুগ থেকে নেওয়া নাটক ও আইনের রূপ সম্পর্কে মার্কস এই জন্যই বলেছিলেন যে তা misunderstood form—এবং এই 'ভুল অর্থে' গ্রহণটাই প্রকৃত গ্রহণ। স্তালিন স্পষ্ট করেই দেখান যে পুরনো বনিয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো উপরিতলও নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য।

একদিকে অতীত সম্পর্কে কালাপাহাড়ী মনোভাব এবং অন্যদিকে অবিচ্ছিন্ন চিরন্তনী আদর্শের স্বপ্ন—এই দুই ভ্রান্তিরই অবৈজ্ঞানিকতাটুকু স্তালিন ধরিয়ে দিয়েছেন। এ থেকে সুস্পষ্টভাবেই বেরিয়ে আসে মার্কস-

বাদীদের নীতি—"বিচার করে গ্রহণ" (critical assimilation) এবং নতুন বনিয়াদকে সেবা করার মতো সৃষ্টি।

(৪)

বনিয়াদ ও উপরিতলের নিয়মগুলির মধ্যে যার গভীর সূত্র রয়েছে, এমনি একটি নীতি হল শিল্পের পক্ষগ্রহণের নীতি (principle of partisanship)। বস্তুত সোবিয়েত শিল্প-সাহিত্য এবং শিল্প-প্রসঙ্গে স্তালিনের অন্যান্য চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এই পক্ষগ্রহণের লেনিনবাদী নীতিটি। সোবিয়েত লেখকের মতে "শিল্প এবং শিল্পীর কর্তব্য সম্পর্কে স্তালিনের সমস্ত ধারণাগুলি হল শিল্প সম্পর্কে লেনিনের মতামতগুলির, এবং প্রধানত সমাজতান্ত্রিক শিল্পতত্ত্বের মূলনীতি—শ্রেণীভেদে বলশেভিক পার্টি-প্রেরণার নীতিটির সৃষ্টিমূলক বিকাশ।"

পক্ষগ্রহণের এই লেনিনবাদী নীতিটিরও সূত্রপাত স্বভাবতই মার্কস্-এঙ্গেলসের মধ্যেও ছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রায়ই লেনিন ও স্তালিনের বক্তব্যগুলির উল্লেখ না করে এবং এঙ্গেলস্-এর একটি উদ্ধৃতিকে বিচ্ছিন্নভাবে পেশ করে বলার চেষ্টা হয় যেন মার্কস্-এঙ্গেলস্ শিল্পের পক্ষগ্রহণের ও প্রচারমূলক ভূমিকার বিরোধী ছিলেন। আসলে কথাটি ঠিক নয়।

সত্য, মিনা কাউট্স্কিকে লেখা একটি পত্রে এঙ্গেলস্ মিনা কাউট্স্কির প্রচারমূলক উপন্যাসের তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু এঙ্গেলস্-এর আপত্তি ছিল মূলত প্রচারের বিশেষ একটা ধরনে। বাস্তববাদের পদ্ধতি অনুসরণ না করে জোর করে "মতামত জুড়ে" দেওয়ার পদ্ধতিতে। তাঁদের দাবি ছিল প্রচারটি হোক উপযুক্ত চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে। তাই বলে তাঁরা শিল্পের প্রচার-প্রবণতার আদৌ বিরোধী ছিলেন না। ঐ পত্রেই এঙ্গেলস্ বলেন—"প্রচারমূলক (tendentious) কাব্যের আমি বিরোধী নই। ট্রাজিডির জনক ইস্কাইলাস এবং কমেডির জনক অ্যারিস্টোফেনিস উভয়েই সুনিশ্চিতভাবে ছিলেন প্রচারধর্মী কবি যেমন ছিলেন দান্তে এবং সারভেন্তিস। আর শীলারের "ক্রাফ্ট্ এন্ড লাভ'এর প্রধান গুণ হল এই যে এটি জার্মানির প্রথম রাজনৈতিক-প্রচারমূলক নাটক। রাশিয়া ও নরওয়ের আধুনিক যে সব লেখক চমৎকার উপন্যাস লিখছেন তাঁরা সকলেই প্রচার-মূলক।"

মার্কস স্বয়ং ১৮৪৮ সালে জার্মান বিপ্লবের সময় জার্মানির বিপ্লবী কবি Wehrt ও Freiligrath-কে নিজ-সম্পাদিত পত্রিকা New Rheinische Gazette-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন ও কমিউনিস্ট কবি হিসাবে তাদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করেন।

শিল্পের পক্ষগ্রহণ সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর মধ্যে এই যে চিন্তা ছিল, তাকে বিকশিত করেন লেনিন। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে যুগ শুরু হয়, তার বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা, এবং তার প্রতিফলন হিসাবে মতাদর্শের ক্ষেত্রে নানা ধরনের শিল্প মতবাদ ও গোষ্ঠীর উদ্ভব। এই সময়েই রাজনৈতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করতে করতেই লেনিনকে সাহিত্যিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়। এই নতুনতর অবস্থায়, ১৯০৫ সালে লেনিন বিবৃত করেন পক্ষগ্রহণের বিখ্যাত নীতিটিকে।

তিনি লেখেন "সাহিত্যকে হতে হবে পার্টি-সাহিত্য। বুর্জোয়া ব্যবসাদারী ও ভাড়াটে সংবাদপত্রের পাল্টা, বুর্জোয়া সাহিত্যের নাম-কেনার ঝোঁক এবং ব্যক্তিবাদী "নবাবী যথেচ্ছাচার" ও মুনাফা শিকারের পাল্টা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্য উপস্থিত করতে হবে পার্টি-সাহিত্যের নীতি, এই নীতিকে বিকশিত করতে হবে এবং সমগ্রভাবে ও পরিপূর্ণরূপে তাকে কাজে পরিণত করতে হবে। ...সাহিত্যকে হতে হবে সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ আদর্শের একটি অংশ; গোটা শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র সচেতন অগ্রগামী অংশ যে সমগ্র সামাজিক যন্ত্রটিকে চালু করে, তার একটি অংশ। সংগঠিত পরিকল্পিত, সংযুক্ত সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টি-কাজের একটি অঙ্গাঙ্গি অংশ হতে হবে সাহিত্যকে। ...এই সমগ্র কাজেরই দায়িত্ব নিতে হবে সংগঠিত সোশ্যালিস্ট শ্রমিকশ্রেণীকে; তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, জীবন্ত প্রলেতারীয় আদর্শের প্রেরণা দিয়ে এই সমস্ত কাজকে নির্বিশেষে সঞ্জীবিত করতে হবে।"

এই নীতিটিকেই বলশেভিক পার্টি আগাগোড়া অনুসরণ করে গেছেন, এই নীতিটিই প্রতিফলিত হয়েছে গোর্কির উপন্যাসে, মায়াকভ্স্কির কবিতায় (প্রথমোক্ত কবিতাটি যার বড়ো দৃষ্টান্ত) সোবিয়েত যুগের সমগ্র সাহিত্যে।

পার্টি-সাহিত্যের নীতিকে "বিকশিত এবং পরিপূর্ণরূপে ও সমগ্রভাবে কাজে পরিণত করার" যে কথা লেনিন বলেছিলেন, সোবিয়েত যুগে সেই কাজটি করেন স্তালিন। রাশিয়ার বিপ্লবী সাহিত্য এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আমলে তরুণ সোবিয়েত সাহিত্য ইতিমধ্যে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, সোবিয়েত জনগণের সামনে সমাজতন্ত্রের নতুন কর্তব্য এসেছে, জনগণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার করে সংস্কৃতিবিকাশের নতুন বনিয়াদ তৈরি হয়েছে। এই নতুন অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের ফলে সৃষ্টি হয়ে উঠছিল বাস্তববাদের পদ্ধতির পূর্ণতর রূপ—যা বাস্তববাদ সম্পর্কে এঙ্গেলস্-এর ব্যাখ্যা ও লেনিনের প্রতিফলনের নীতিরই পূর্ণতর রূপ। এবং এই সমগ্র অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে স্তালিন সংজ্ঞা দিলেন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির। এই প্রসঙ্গে একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং অন্যদিকে রাপ্ ও প্রোলেট্কাল্ট বিচ্যুতির জের অবসান করে স্তালিন ১৯৩০ সালে ১৬শ কংগ্রেসে বললেন—যে সোবিয়েতের সংস্কৃতি হবে "মূলবস্তুতে সমাজতান্ত্রিক এবং রূপে জাতীয়, তার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতার প্রেরণায় জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা।"

সোবিয়েত সমাজ-গঠনে বুদ্ধিজীবীদের এবং লেখকদের ভূমিকাকে অভূতপূর্ব মূল্য দিয়ে তিনি আরো জানালেন যে লেখকদের কাজ বিশেষ করে প্রয়োজনীয় কারণ তাঁরা হলেন "মানব মনের ইঞ্জিনিয়ার"।

স্তালিনের এই ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য কি?

এই দুটি সংজ্ঞাতেই স্তালিন সাহিত্যের পার্টিজান নীতিকে আরো বিকশিত করে প্রয়োগ করলেন নতুন যুগের উপযোগী করে, সর্বপ্রকার 'স্বাধীন'

'নিরপেক্ষ' 'উদ্দেশ্যহীন' এবং 'কালাপাহাড়ী' ধারণার অবসান করে নির্দিষ্ট করলেন একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য—লেখকদের কর্তব্য হল সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতার প্রেরণায় জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। লেখকদের কাজকে অপূর্ব মর্যাদায় ভূষিত করে তিনি তাদের ওপর দায়িত্ব দিলেন মানব মনের।

এইভাবে সোবিয়েতে যে সাহিত্য-পদ্ধতি গড়ে উঠল, তার বৈশিষ্ট্যই হল যে "তা জীবনকে দেখে ও প্রতিফলিত করে কমিউনিস্ট মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, তা আজকের বাস্তবকে মেলায় আগামীকালের আদর্শের" সঙ্গে। —পিপ্‌লস চায়না, ২নং; ১৯৫৩ চৌ ইয়াঙ্‌-এর প্রবন্ধ।)

১৯৩৪ সালে সোবিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে কমরেড জ্‌দানভ সাহিত্যে স্তালিননীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—"কমরেড স্তালিন আমাদের লেখকদের অভিহিত করেছেন মানব মনের ইঞ্জিনিয়ার বলে। এর অর্থ কি? এর ফলে আপনাদের ওপর কি কর্তব্য এসে বর্তায়? সর্বপ্রথমে এর মানে এই যে আপনাদের জানতে হবে জীবনকে, তাকে সত্য করে এবং শিল্পময় রচনায় বর্ণনা করতে হবে, তাকে দেখতে হবে পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে নয়, শুধু একটা বিষয়গত বস্তু (objective) হিসাবে নয়, তাকে দেখতে হবে তার বিপ্লবী বিকাশের প্রবাহে (process)।

"তাছাড়া, একটি শিল্পময় অঙ্কনের সত্যতা ও ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতার সঙ্গে মেশাতে হবে মেহনতি জনসাধারণের মতাদর্শ গড়ে তোলা এবং সমাজতন্ত্রের প্রেরণায় তাদের শিক্ষিত করে তোলার কর্তব্যকে। রম্য রচনা এবং সাহিত্যিক সমালোচনায় এই পদ্ধতিকে আমরা বলি সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পদ্ধতি।

"পাছে কেউ প্রচারমূলক বলে, তার জন্য আমাদের সোবিয়েত সাহিত্য ভীত নয়; কারণ শ্রেণী সংগ্রামের যুগে শ্রেণীহীন, প্রচার-হীন এবং অ-রাজনৈতিক সাহিত্য নেই এবং থাকতে পারে না।"

এ হ'ল সাহিত্যের পার্টিনীতিরই বিকাশ ও নবতর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পরবর্তী যুগে, ১৯৪৭ সালে যখন সোবিয়েত সাহিত্যের কোনো কোনো স্থানে মতাদর্শগত হীনতার স্পর্শ লেগেছে, তখনো সাহিত্যের উচ্চ মতাদর্শগত পবিত্রতা রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার পেছনেও ছিল এই নীতিটি এবং ছিলেন কমরেড স্তালিন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্যের এই পার্টিজান নীতি এবং পার্টি-প্রেরণায় জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার ভূমিকা কি আমাদের দেশেও প্রযোজ্য?

সত্য যে আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে যে কর্তব্য তা এখনি সমাজতন্ত্রের কর্তব্য নয়, তা প্রধানত জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতি পত্তনের কর্তব্য। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশেও শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের বিপ্লবী আন্দোলন বর্তমান, যেহেতু গণতান্ত্রিক সমস্যা ও কর্তব্যের সমাধানে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন, তাই পার্টি-সাহিত্যের এই লেনিনবাদী নীতিটি এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কতকগুলি পদ্ধতি আমাদের দেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বস্তুত, মতাদর্শের ক্ষেত্রে লেনিনের শিক্ষাই এই যে গণতান্ত্রিক কর্তব্য

সম্পাদন করতে হলেও শ্রমিকশ্রেণী তা সম্পাদন করে শ্রমিক মতাদর্শ, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ দিয়ে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

লেনিন-স্তালিনের সেরা শিষ্য মাও-সে-তুং এই বিষয়টিকেই ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর অপূর্ব সরল ভাষায়—"যেহেতু নয়াগণতান্ত্রিক রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন, তাই তাদের সকলের মধ্যেই একটা সমাজতান্ত্রিক উপাদান বর্তমান ; তাছাড়া এটি একটি সাধারণ উপাদান নয়, এমন একটি উপাদান যা দিয়ে ফলাফল নির্ধারিত হয় (decisive)... আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতির মধ্যে যদি একটি সমাজতান্ত্রিক উপাদান থাকে, তবে তার প্রতিফলন হিসেবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতেও একটি সমাজতান্ত্রিক উপাদান থাকবে।" ('চীনের নয়া গণতন্ত্র')

আমাদের দেশেও তাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে এই সমাজতান্ত্রিক উপাদান থাকবে, থাকবে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের নেতৃত্ব। এ প্রকাশিত হবে আমাদের দেশের জীবন্ত বাস্তবের বিপ্লবী বিকাশকে রূপায়িত করার মধ্যে, তাকে মেলাবে আমাদের দেশের জনগণকে শ্রমিক মতাদর্শ এবং গণতান্ত্রিক কর্তব্যের প্রেরণায় শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ করে তোলার কর্তব্যের সঙ্গে। আমাদের দেশেও শিল্পীদের যে দায়িত্ব তা মানব মনের দায়িত্ব।

(৫)

সংস্কৃতির পক্ষে স্তালিন-শিক্ষার আর একটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার জাতীয় সমস্যা ও সংস্কৃতির দিক।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে বিশ্ববিপ্লবের কেন্দ্র সরে এসেছিল রাশিয়ায়। রাশিয়ার বিপ্লবের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে লেনিন ও স্তালিনকে সমাধান করতে হয়েছে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ সমস্যাকে। জাতীয় সমস্যা এমনি একটি সমস্যা।

রাশিয়া ছিল লেনিনের ভাষায় "জাতিসমূহের কারাগার।" আয়র্লণ্ড, চীন, ভারতবর্ষ ও মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলির সমস্যায় মার্কস-এঙ্গেলস্ যে প্রাথমিক সূত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, লেনিন তাকেই বিকশিত করেন এবং নানাপ্রকার সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে বিবৃত করেন বলশেভিক পার্টির জাতীয় নীতি। লেনিনের সহকর্মী হিসাবে বলশেভিক পার্টির এই জাতীয় নীতিকে ক্রমবিকশিত করায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা যিনি গ্রহণ করেন, তিনি স্তালিন।

জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে স্তালিনের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে তা জাতিসমস্যাকে দেখে সাম্রাজ্যবাদী যুগে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক বিপ্লবের সাধারণ সমস্যা হিসাবে, তাকে যুক্ত করে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার প্রশ্নের সঙ্গে এবং তাকে অন্তর্ভুক্ত করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের অঙ্গীভূত কর্মসূচীর সঙ্গে।

জাতি সম্পর্কে সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে বলশেভিকরা পেশ করেন সাম্রাজ্যবাদের শেকল থেকে পূর্ণ মুক্তির প্রশ্ন।

ভারতবর্ষের পক্ষে এই নীতিটির গুরুত্ব প্রচণ্ড। এ দেখায় যে ভারতবর্ষের

বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশও সম্ভব নয়, যদিনা তাকে যুক্ত করা হয় সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে পূর্ণ মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে।

স্তালিন শিক্ষার আর একটি দিক হল তার আন্তর্জাতিকতা। বলশেভিক পার্টি এবং স্তালিন দেখান যে এই মুক্তি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পথে, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের পথে, বিভিন্ন জাতির মেহনতি মানুষের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষবৃদ্ধির পথে সাধিত হবে না; সাধিত হবে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার পথে।

অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্তালিন দেখান "আমাদের দেশে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক বিপ্লবগুলি শ্রমিক নেতৃত্বে হয়েছিল বলেই, আন্তর্জাতিকতার পতাকা নিয়ে হয়েছিল বলেই, পতিত জাতিগুলি, দাসজাতিগুলি, মানব-ইতিহাসে সর্বপ্রথম এমন জাতির পর্যায়ে উন্নীত হল যা প্রকৃতই মুক্ত এবং প্রকৃতই সমান। এর ফলে সারা দুনিয়ায় নিপীড়িত জাতিগুলির সম্মুখে স্থাপিত হয়েছে এক সাহসী দৃষ্টান্ত।

"এর মানে এই যে অক্টোবর বিপ্লব প্রবর্তন করেছে এমন একটি নতুন যুগের, যে যুগে **দুনিয়ার নিপীড়িত** দেশগুলিতে **ঔপনিবেশিক** বিপ্লব পরিচালিত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর **সহযোগে** শ্রমিকশ্রেণীর **নেতৃত্বে**।"

ভারতবর্ষের পক্ষেও এইকথা প্রযোজ্য। তার অর্থ, ভারতবর্ষের জাতীয় সমস্যা ও জাতীয় সংস্কৃতির সমস্যা, জাতিগত বিদ্বেষ বা জাতিগত নিঃসঙ্গতার (তৃতীয় শিবির) পথে সমাধান হবে না, হবে শ্রমিক মতাদর্শ ও আন্তর্জাতিকতার পতাকায়।

জাতীয় মুক্তির এই সাধারণ সমস্যা ছাড়াও স্তালিন বিশেষ করে বিকশিত করেন জাতীয় সংস্কৃতির প্রশ্নটিকে। আন্তর্জাতিকতাবাদী লেনিন-স্তালিন নীতি কখনো জাতীয় গোঁড়ামি সহ্য করেনি। বুন্দিস্টদের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে প্রত্যেকটি জাতির অভ্যন্তরে আছে দুটি জাতি এবং প্রত্যেকটি জাতীয় সংস্কৃতির অভ্যন্তরে আছে দুটি সংস্কৃতি।

তাহলে সংস্কৃতির শ্রেণী-চরিত্র এবং জাতীয়-চরিত্রের স্বরূপটি কিভাবে বুঝতে হবে? রাশিয়াতে এ সম্পর্কে একদা নানা ভুল ধারণা দেখা দিয়েছিল। বিপ্লবের পরে প্রোলেটকাল্ট ও রাপ্ অতীত সম্পর্কে ও জাতি সম্পর্কে এক অবৈজ্ঞানিক ধারণা নিয়ে শ্রমিক সংস্কৃতি গড়ার কথা ভেবেছিলেন। গ্রেট রাশিয়ান উগ্রতার ফলে পরে রাশিয়ার ছোট ছোট জাতির জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কেও গ্রাস-করার মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছিল। এই সময়েই অপূর্ব প্রতিভার সঙ্গে স্তালিন সংস্কৃতির শ্রেণীচরিত্রের সঙ্গে তার জাতীয় রূপের নীতিটিকে বিবৃত করেন। ১৬শ কংগ্রেসে স্তালিন দেখান—

"**বুর্জোয়াদের শাসনাধীন অবস্থায়** জাতীয়-সংস্কৃতির ধ্বনিকে লেনিন অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু এ সংস্কৃতির পক্ষে কি প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিল?

"জাতীয় বুর্জোয়াদের শাসনাধীন অবস্থায় জাতীয় সংস্কৃতিটি কি? তা এমন সংস্কৃতি যার সারবস্তু (content) বুর্জোয়া এবং রূপ জাতীয়।

বুর্জোয়া শাসনকে শক্তিশালী করার জন্য জনগণের মনকে জাতীয়তাবাদের বিষ দিয়ে আচ্ছন্ন করাই তার লক্ষ্য।

"শ্রমিক একনায়কত্বের অধীনে জাতীয় সংস্কৃতিটা কি? তা এমন সংস্কৃতি যার সারবস্তু সমাজতান্ত্রিক এবং রূপ জাতীয়; সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতার প্রেরণায় জনগণকে শিক্ষিত করে তোলাই তার লক্ষ্য।

"মার্কসবাদকে পরিহার না করলে কেমন করে এই দুইটি মূলগতভাবে পৃথক জিনিসকে গুলিয়ে ফেলা সম্ভব?"

স্তালিনের এই শিক্ষা আমাদের শেখায় যে সংস্কৃতির শ্রেণীচরিত্রের জন্য, শ্রমিক মতাদর্শের জন্য সংগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে তার জাতীয় রূপের জন্য। বর্তমানে এই শিক্ষাটি আমাদের কাছে খুবই জরুরী। কারণ আমাদের দেশে সম্প্রতি যে মার্কিন সাংস্কৃতিক অভিযান শুরু হয়েছে তার একটি আক্রমণই হল এই জাতীয় রূপের বিরুদ্ধে, 'কসমোপলিটানিজ্‌ম'-এর বিষাক্ত মতবাদ এবং মার্কিন জীবনযাত্রার প্রচার করে তা আমাদের সংস্কৃতির প্রাণবস্তু ও রূপ উভয়কেই বিকৃত করে সৃষ্টি করতে চায় এক বোম্বাই-হলিউডী কিম্ভূতকিমাকার সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির জাতীয় রূপ সম্পর্কে স্তালিন আরো গভীর তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন তাঁর 'ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ-প্রসঙ্গে' নামক গ্রন্থে।

ইতর-মার্কসবাদীদের তীব্র সমালোচনা করে স্তালিন দেখান যে সংস্কৃতির শ্রেণীচরিত্র বর্তমান থাকলেও ভাষার শ্রেণীচরিত্র নেই তা সমাজের সমস্ত লোকের পক্ষে আদান প্রদানের বাহন। (ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের প্রবন্ধগুলি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য)। স্তালিন বলেনঃ "এই কমরেডরা কি জানেন না যে **জাতীয় ভাষা জাতীয় সংস্কৃতিরই একটি রূপ,** তাঁরা কি জানেন না যে একটি জাতীয় ভাষা বুর্জোয়া এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় সংস্কৃতিকেই সেবা করতে পারে? এই কমরেডরা কি মার্কসবাদীদের সুবিদিত সূত্রটি জানেন না যে বর্তমান রাশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, বিয়েলোরাশিয়ান এবং অন্যান্য সংস্কৃতিগুলি সারবস্তুতে সমাজতান্ত্রিক এবং রূপে, **অর্থাৎ ভাষায়** জাতীয়?" (মোটা হরফ আমার)

এই কথায় ভাষার চরিত্র সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান করার সঙ্গে-সঙ্গে স্তালিন জাতীয় রূপ সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে জাতীয় রূপ বলতে স্তালিন রহস্যময় কিছু বোঝাতে চাননি। জাতীয় রূপের একটি প্রধান দিক হল তার জাতীয় ভাষা। তাই আমাদের দেশে জাতীয় রূপের জন্য সংগ্রামের একটি প্রধান ক্ষেত্র হল জাতীয় ভাষার জন্য সংগ্রাম, সাহিত্যের ভাষাকে মাত্র এক একটি গোষ্ঠীর কাছে বোধগম্য বুলিতে পরিণত করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাহিত্যের ভাষাকে জনগণের সাধারণ জীবন্ত ভাষা থেকে দূরে সরিয়ে নেবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বাংলা ভাষার বিকাশের পথে ইংরেজি এবং অন্য ভাষাকে জোর করে চাপানোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এই কথাগুলি মনে রাখার বিশেষ প্রয়োজন কারণ বাংলাভাষার সামনে এই সবকটি আক্রমণই এসে হাজির হয়েছে। বাংলার ওপর চাপানো রয়েছে ইংরেজি। তদুপরি, পূর্ববঙ্গে উর্দু এবং পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ও হিন্দীর

চাপ ভাষার জীবন্ত গতিকে আটকাবার চেষ্টা করছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে জনগণের সাধারণ ভাষা থেকে সরে গিয়ে একদিকে বন্ধগোষ্ঠীর কাছে বোধগম্য বুলিতে কাব্য প্রভৃতি রচনার প্রচেষ্টা, এবং অন্যদিকে এক একটি আঞ্চলিক ভাষার অপ্রচলিত শব্দ ও ধ্বনি দিয়ে প্রকৃতিবাদী, কসমোপলিটান ও ফর্মালিস্ট উপন্যাসাদি রচনার ঝোঁক। স্তালিনের শিক্ষা দেখায় যে এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলি অবৈজ্ঞানিক এবং পরাজিত হতে বাধ্য।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, জাতীয় রূপের মধ্যে ভাষা ছাড়া আর কোনো উপাদান আছে কিনা? অবশ্যই থাকা সম্ভব। আমাদের দেশে স্তালিনের তত্ত্বগুলির আলোকে কোনো গবেষণা শুরু না হলেও অন্যান্য দেশে এই সব প্রশ্ন নিয়ে নানা গবেষণা চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'লাস্টিং পীস'-এর উল্লিখিত সংখ্যায় দেখানো হয়েছে যে পোলাণ্ডের জাতীয় কাব্যরূপের কতকগুলি ঐতিহ্য বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র পোলিশ কাব্যের পক্ষে প্রযোজ্য। এইগুলি বিশ্লেষণ করে পোলিশ কাব্যের মূল নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে গবেষণার উল্লেখ করা হয় ঐ প্রবন্ধে।

আমাদের দেশেও পয়ার, ছড়া প্রভৃতি কাব্য-পদ্ধতির দীর্ঘ প্রাণশক্তির মাঝে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান, এবং নতুনতর সৃষ্টিতেও সেই বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশক্তিকে ধারণ করার প্রয়োজন নিয়ে গবেষণা যথেষ্ট ফলপ্রদ হতে পারে।

সর্বোপরি, ১৯শ কংগ্রেসের ভাষণে স্তালিন জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রতি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা এই প্রসঙ্গে সমূহ মূল্যবান। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এবং এখানেও ভূতপূর্ব জাতীয় নেতারা আজ জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের পতাকাটিকেও ফেলে দিচ্ছেন। শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি ছাড়া তা তুলে নেবার মতো কেউ নেই।

সংস্কৃতির পক্ষে একথার তাৎপর্য গভীর। প্রকৃত জাতীয় সংস্কৃতির পতাকাকে আমাদের দেশেও তুলে নিতে হবে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সাহিত্যিকদের।

এই পতাকা তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুলে ধরতে হবে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার পথে আমাদের বিশেষ পথচিহ্নগুলি। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আজ আমরাই। স্তালিন শিখিয়েছেন "কোনো জাতি বড়ই হোক বা ছোটই হোক, কিছু এসে যায় না—প্রত্যেকটি জাতিরই আছে কতকগুলি নিজস্ব বিশিষ্ট গুণ যা শুধু তার পক্ষেই খাটে, এমন কতকগুলি দিক যা অন্য জাতির মধ্যে নেই। বিশ্বসংস্কৃতির সাধারণ ভাণ্ডারে প্রত্যেকটি জাতি এনে দেয় এই বিশেষ গুণগুলিকে এবং এই ভাণ্ডারকে বর্ধিত ও সমৃদ্ধ করে তোলে। এই দিক দিয়ে ছোট বড় সমস্ত জাতিরই স্থান সমপর্যায়ে, এবং প্রত্যেকটি জাতিই অন্যান্য প্রত্যেকটি জাতির সমতুল্য।"

মেকলেদের দর্পিত উক্তির তুলনায় কি ন্যায্য এবং কি বৈজ্ঞানিক উক্তি! আমাদের দেশে রেনেসাঁস হয়নি বলে অথবা মিল্টন, শেকস্‌পীয়র, শেলি নেই বলে আমাদের সংস্কৃতিকে হীন ভাবার বিরুদ্ধে এ উক্তি আমাদের কাছে এক অমূল্য হাতিয়ার। এ উক্তি আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক আমাদের নিজস্ব ঐতি-

হাসিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করতে, আমাদের চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথদের মূল্য দিতে, কারণ বিশ্বের ভাণ্ডারে সেইটেই আমাদের বিশেষ দান।

(৬)

শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গে স্তালিনের শিক্ষার অফুরন্ত সম্পদের দুই একটি দিক নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করা হল মাত্র। স্বভাবতই এই আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

শিক্ষার্থী হিসাবে শুধু আশা করব যে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে এই শিক্ষার উপযুক্ত বিতরণ শুরু হোক, আশা করব, শিল্পী সাহিত্যিক ও জিজ্ঞাসুদের মধ্যে স্তালিনের শিক্ষাগুলি নিয়ে অধ্যয়ন, পাঠ-গ্রহণ ও কর্মের আগ্রহ জাগুক।

আশা করব, আমাদের প্রগতি সাহিত্যও সঞ্জীবিত হবে স্তালিনের চিন্তায় এবং এই চিন্তা ও সোবিয়েত বাস্তবতার সোনার ফসল সোবিয়েত সাহিত্যের নেতৃত্বমূলক ভূমিকায়।

আশা করব স্তালিনের চিন্তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সাহিত্যও নিযুক্ত হবে আমাদের জনগণের স্বার্থে, তার মূল প্রোথিত থাকবে জনগণের গভীরে, তার প্রতিষ্ঠা হবে জনগণের ভালোবাসায় এবং জনগণকে উন্নত করার প্রেরণায়।

উপরিতলের আর একটি অংশ রাজনীতির মতো আমাদের সাহিত্যও অমর হোক তার জননী জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে, যেমন অমর ছিলেন মাটির ছেলে বীর আণ্টিয়াস।

"আমাদের পার্টির স্বার্থের সঙ্গে শান্তিকামী জাতিগুলির স্বার্থের বিরোধ নেই, বরং উল্টো; শান্তিকামী জাতিগুলির স্বার্থের সঙ্গে আমাদের পার্টির স্বার্থ মিশে গেছে। আর সোবিয়েত ইউনিয়ন—তার স্বার্থ বিশ্বব্যাপী শান্তির আদর্শ থেকে একেবারে অবিচ্ছিন্ন।"

—স্তালিন

আমাদের স্তালিন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্তালিন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। শ্রান্তিহীন বিপ্লবীর অক্লান্ত পথযাত্রায় এইবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। গুরু লেনিনের পাশেই চিরবিশ্রামের আসন পাতলেন তাঁর একনিষ্ঠ উত্তরসাধক—তাঁর স্বপ্নের রূপকার।

কলকাতায় বসে বসে দেখছি চারদিকের নিবিড় শোকোচ্ছ্বাস। সভা-সমিতি, শোকযাত্রা, আলোচনা, প্রস্তাব। স্তালিনকে আমরা চোখে দেখিনি, তাঁকে কাছে পাওয়ার কথা কল্পনাও করিনি। অথচ তাঁর মৃত্যু প্রিয়তম আত্মজনকে হারানোর গভীর বেদনায় বিকীর্ণ।

এইখানেই স্তালিন স্বতন্ত্র। রাজনীতিকের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে এইখানেই তিনি জীবনের মধ্যে উত্তীর্ণ। আর জীবনের মধ্যে যখনই তাঁকে দেখতে পাই, যখন জানি, আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির ভেতরে তাঁর অনিবার্য উপস্থিতি এবং অঙ্গীকার—তখনই বুঝতে পারি কত বড় তাঁর নেতৃত্ব। রাজনীতি বস্তুটা জীবনকাব্যের ভাষ্য, সাহিত্য তার ব্যঞ্জনা। ভাষ্যকে পেরিয়ে সেই ব্যঞ্জনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্তালিন।

কখনো কখনো মনে হয়েছে এই জীবন হয়তো সত্যিই পোড়ো জমি—সত্যিই ক্যাক্টাস্ ল্যান্ড। এখানকার মাটি থেকে ফুল আর শস্যের সম্ভাবনা চিরদিনের মতো মুছে গেছে, শুধু তীক্ষ্ণধার কাঁটায় রক্তাক্ত হয়ে পথ চলতে চলতে ভারবাহী জন্তুর মতো একদিন এই মাটিতেই লুটিয়ে পড়ব। মন্বন্তরের স্তূপাকার কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে তার ভেতরে দেখেছি নিজেরই প্রেতমূর্তি—নিজের ওপরে অসহ্য ঘৃণায় প্রতিটি মুহূর্ত বিস্বাদ হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত বিকলনের অন্ধকার চোরাগলির গোলোকধাঁধাঁয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে—মাথা ঠুকে মরেছি দু' ধারের নোনা-লাগা দেওয়ালে, উইপিং ফিলসফারের মতো চিৎকার করে উঠেছিঃ কী দরকার ছিল জন্মানোর—কী প্রয়োজন এই বেঁচে থাকার! কী অর্থ থাকতে পারে বোকার মতো এই জীবন-চর্যায় আর পোকার মতো এই অপঘাতে!

শুধু আমরা ভাবিনি, আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ভেবেছে ইয়োরোপ। দিনের পর দিন 'রিভার অব্ সুইসাইড্স্'-এর তীরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার-মন্দিরের ভেতর থেকে সে মারণ-মন্ত্রের দৈববাণী শুনেছে। কয়লার ধোঁয়ায়-ঢাকা বিষণ্ণ ছায়াভরা সকালে নিজের সন্তাকে সে দেখেছে একটা রোঁয়াওঠা বীভৎস বেড়ালের মধ্যে—একটা ড্রেনের মধ্যে গা এলিয়ে যে একরাশ পচা মাখন খচ্ছে! গলিত শবদেহকে ব্যবচ্ছেদ করে তার পাকস্থলীতে সে পেয়েছে একরাশ আর্সেনিক। তারপর নিরুপায় হয়ে সে বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে গিয়ে শিবত্ব লাভ করতে চেয়েছে, নয়তো উদার স্বরে আবৃত্তি করেছেঃ ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি।

শ্মশানের শান্তি—কবরের শান্তি। কশাইখানার ছিন্নমুণ্ড পশুর বেরিয়ে-পড়া জিভ আর পর্দাটানা মৃত চোখের গভীর শান্তি। "This is the way the world ends!"

স্তালিনের মধ্যেও আমরা শান্তিকেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

রাজনীতির তত্ত্ব বোঝবার দরকার হয়নি—তর্ক-বিতর্কের জটিলতার ভেতরে পা না বাড়ালেও কী আসে যায়। আমরা সাধারণ মানুষ। মূলের খবরে বটানিস্টের যত কৌতূহলই থাক, ফুল পেলেই আমরা খুশি। কবিতার বইয়ের শুরুতে পঞ্চাশ পাতা ভূমিকা পেরুবার বুদ্ধি যদি সব সময় আমাদের না-ও থাকে, কাব্য আস্বাদ করবার মতো হৃদয়বত্তার দাবি আমরা রাখি। বস্তুবাদের সূত্রকে নাও যদি চিনতে পারি—মণিহারের মাণিকগুলিকে চিনতে আমাদের ভুল হয়না।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, রুশ বিপ্লব, সাম্যবাদ—এসব না হয় নেপথ্যেই থাকুক। স্তালিন আমাদের ফুল এনে দিয়েছেন; তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি জীবনের মহত্তম কাব্যকে; প্রেম-প্রাচুর্য-প্রাণের মণিহারের তিনি মণিকার।

রাজনৈতিক নেতা? সে তো পার্টির বৃত্তের ভেতরে। ডিক্টেটার? সে তো দেশের সীমানায়। কিন্তু স্তালিন তো সেখানেই থেমে যাননি। সর্ব-দেশে. সর্বকালে কবি, শিল্পী, মানব প্রেমিক আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষ একটিমাত্র স্বপ্নই দেখে এসেছে। আজকের ধূসর বিবর্ণ আকাশ আবার উজ্জ্বল নীলিমায় প্রসন্ন হয়ে উঠুক; আজকের মর্মছেঁড়া ক্ষুধার যন্ত্রণা অজস্র খাদ্যের সমারোহে নিশ্চিহ্ন হোক, আজকের লাঞ্ছিত লুণ্ঠিত মনুষ্যত্ব হোক পাহাড়ের চূড়োয় দেবদারুর মতো সমুন্নতশীর্ষ; পোকাধরা কুঁড়ির মতো আজকের শীর্ণ মুমূর্ষু শিশু সূর্যস্নাত পদ্মের মতো হেসে উঠুক; আজকের সঙ্গিনীর যক্ষ্মাপাণ্ডুর মুখ স্বাস্থ্যের উল্লাসে পাকা আপেলের মতো নিটোল-সুন্দর হয়ে উঠুক।

তবু আমরা শুনে এসেছি— স্বপ্ন চিরকালই স্বপ্ন থাকে। ইহলোকের চরম ক্ষয়-ক্ষতিকে আমরা ভরতে চেয়েছি পারত্রিক আশায় আশ্বাসে। আমরা জেনে এসেছি 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' সূত্রকে—অযোগ্যতার লজ্জায় নিজেদের সমস্ত গ্লানিকে মেনে নিয়েছি প্রাপ্য বলে। দার্শনিকেরা অবশ্য কখনো কখনো 'সর্বং পেয়েছির দেশের' কথা শুনিয়েছেন, কিন্তু পুঁথির কথাকে বিশ্বাস করে ঠকবার বয়েস আমাদের পেরিয়ে গেছে। কখনো কখনো কোথাও দেখেছি এক আধটা বিক্ষোভের ফুলকি—এক এক ঝলক বিদ্রোহের আগুন—তারপরেই হাওয়ায় হাওয়ায় ছাই উড়ে গেছে। তারপরে দেখেছি একটা দেশে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ হল। তাতেই বা কী আসে যায় আমাদের? ফ্রান্সেও একদিন রাজ-বংশের ওপর গিলোটিন নেমেছিল, কিন্তু কিছু সাহিত্য ছাড়া তা থেকে কী আমরা পেয়েছি—কতটুকু পেয়েছি আমরা সাধারণ মানুষ? আমাদের দুঃখ, আমাদের দুর্ভিক্ষ, আমাদের বিকৃত বিকলাঙ্গ সমাজ, আমাদের শিশু মৃত্যু. আমাদের মেরুদণ্ডে ক্রমক্ষয়ী যক্ষ্মা, রাজনীতির নামে আমাদের আত্মপর-বঞ্চনাঃ কোনো দার্শনিক তত্ত্ব সে দেউলিয়াপনাকে রোধ করতে পারে না; কোনো সুদূর দেশের রাষ্ট্রবিপ্লব সেখানে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা দেয় না আমাদের।

কিন্তু কী আশ্চর্য, লেনিন বললেন, এ বিপ্লব শুধু একটা বিশেষ দেশের নয়—এ সারা পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের প্রাণযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ! লেনিন

বললেন, পৃথিবীর মানুষ যাকে স্বপ্ন বলে ভেবে এসেছে, সত্যের মধ্যে তাকে প্রয়োগ করা চলে। কারণ, স্বপ্ন সত্যের বাইরে নয়।

আমরা চমকে উঠেছি—বিশ্বাস করিনি সম্পূর্ণভাবে। এও কি হয়—এও কি হতে পারে! চারদিকের ক্রুদ্ধ পৃথিবী চিৎকার করেছে, অপবাদ রটিয়েছে—মনের কালি মিশিয়ে কোটি কোটি অক্ষরে অপভাষ ছড়িয়েছে দিনের পরে দিন। মিথ্যার বেসাতি বয়ে বেড়িয়েছে দলছাড়া বিশ্বাসঘাতকেরা। আমরা ভুল বুঝেছি—কখনো কখনো বা বিভীষিকা দেখেছি লাল জুজুর নামে।

লেনিন, তারপরে স্তালিন। অব্যাহত চলতে লাগল পঞ্চ-বার্ষিকীর অগ্রাভিযান। শিক্ষায়, স্বাধীনতায়, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সমৃদ্ধিতে আর মনুষ্যত্বে পূর্ণ হয়ে উঠল দেশ। এ কেমন করে হয় যে দেশে একটিও বেকার থাকবে না? এ কী করে সম্ভব যে গণিকাবৃত্তি আর ভিক্ষা হয়ে দাঁড়ায় সুদূর ইতিহাসের বিষয়বস্তু? অজন্মা আর দুর্ভিক্ষ মুখ ঢেকে পালিয়ে যায় কোন্ পথ দিয়ে? অতি জনাকীর্ণ পৃথিবীতে যখন জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বাণী শোনাচ্ছেন মনীষীরা—তখন কে বলতে পারেঃ আরো মানুষ চাই—আরো কর্মী চাই? প্রতিটি মানুষ কেমন করে হয়ে দাঁড়ায় দেশ আর জাতির অপরিহার্য প্রয়োজন? কোন্ আশ্বাসে প্রত্যেকটি নরনারী ভাবতে পারেঃ দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি তারই, প্রতিটি ফসলের কণায় তার অধিকার? কী করে লুপ্ত হয় ধর্ম আর সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরন্তন হিংস্র বিদ্বেষ, ইস্‌লাম আর ক্রিশ্চিয়ানিটির শতাব্দীসঞ্চিত বিরোধ? কোন্ মন্ত্রে বশীভূত হয় তাতার আর কাল্‌মুকের বন্য বিভীষিকা?

কিন্তু এ সব কিছু সত্য করে তুলেছেন স্তালিন। লেনিন যার ভিত্তি করে গিয়েছিলেন, স্তালিন তার ওপরে গড়ে দিয়েছেন প্রগতি আর স্বাধীনতার অজেয় দুর্গ। সেই দুর্গের দেওয়ালে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেছে ফ্যাসিস্ট্ শক্তির মদমত্ততাঃ গণশক্তির বজ্রমুষ্টিতে চূর্ণ হয়ে গেছে স্বস্তিকের আস্ফালন্।

আমরা সাধারণ মানুষ—সেইখানেই আমরা জেনেছি স্তালিনকে। সাহিত্যে আমরা যে আশ্বাস খুঁজি—জীবনে যে পূর্ণতার জন্যে হাজার হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করেছি—সেই মূর্তিমান আশ্বাস স্তালিন, সেই পূর্ণতার প্রতিনিধি স্তালিন। আমাদের অন্ধকার চোরাগলির প্রাচীর ভেঙে প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর সূর্যোদয়কে—আমরা দেখেছি, এই পৃথিবী ক্যাক্‌টাস্ ল্যান্ড নয়—সে ফুল আর ঐশ্বর্যের জন্মভূমি। আমরা উপলব্ধি করেছি, আমাদের প্রেম কুটৈষণার সর্পিল পথ দিয়ে চলে নাঃ আমাদের জীবনে সে দীপ্ত আবির্ভাব—বলিষ্ঠ, সার্থক উত্তরকালের মঙ্গলাচরণ। স্তালিনের কাছ থেকে এই ঘোষণা আমরা পেয়েছি যে আবার আমরা ছন্দের কবিতা লিখতে পারব, আবার আমাদের প্রেমের কাহিনী মুক্তি পাবে নির্ধারিত ধারায়।

স্তালিন আজ নেই—তবুও স্তালিন চিরন্তন। কোনো যুদ্ধ—কোনো চক্রান্ত—কোনো মিথ্যার বিভ্রান্তি আজ আর আমাদের আচ্ছন্ন করতে পারবে না। স্তালিন আমাদের ফুল এনে দিয়েছেন—এনে দিয়েছেন কবিতা।

শ্মশানের সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে সেই ফুল ফুটে থাকবে সূর্য-মুখীর মতো—সেই কবিতাকেই আমরা করে তুলব আগামী দিনের মহাকাব্য॥

স্তালিন নেই, এই শোকসংবাদে আমি গভীরভাবে বিচলিত। তিরিশ বছর ধরে তিনি সারা বিশ্বে পরিচিত ; মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাঁর মহান কীর্তি তাঁর গৌরবের এক চিরন্তন স্তম্ভ হিসেবে বর্তমান।

ছাত্র ও শিক্ষকদের সভায় আমি আমার গভীর দুঃখের বাণী পাঠাই। স্তালিনের অভাবকে সহ্য করার মত ধৈর্য ও সাহস রুশ জনসাধারণ পাবেন, এই আশা করি।

—সত্যেন বসু
৬-৩-৫৩



৩

"সমাজতন্ত্রের কি কোনো বনিয়াদী অর্থনৈতিক নিয়ম আছে? হাঁ আছে। এই নিয়মের মূলগত দিক ও চাহিদাগুলি কি? সমাজতন্ত্রের বনিয়াদী নিয়মটির মূলগত দিক ও চাহিদাগুলি মোটামুটি নির্দিষ্ট করা যায় এইভাবে : উচ্চতর যন্ত্রবিজ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের অব্যাহত বিস্তার ও পূর্ণতা সাধনের মারফত সমগ্র সমাজের ক্রম-বর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সর্বোচ্চ পরিপূরণ।"

—স্তালিন

মৃন্ময়

রণমিত্র সেন

জীবনে এমন হয়েছে একাধিকবার।

অপরিচিত গ্রামাঞ্চল দিয়ে হেঁটে এসেছি। দুপাশে খেত, আল। কাদা-জলের মধ্যে মাছ খুঁজছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে। তারপর দুপাশে গ্রাম। কারো চালে নতুন খড়, কারো পুরনো। কারো বা টিনের সমৃদ্ধি। দুঃখের দৃশ্য চোখে পড়েছে, তবে সে দুঃখের মধ্যেও একটা মায়া অনুভব না করে পারিনি।

তারপর হয়তো উঠেছি কোনো চাষীর ঘরের দাওয়ায়। পুরনো কাপড়ের কাঁথা, শাড়ির পাড় দিয়ে তৈরি নক্‌শা, মাটির দেওয়ালের গায়ে সিঁদুরের দাগ আর বহুদিন আগে আঁকা কোনো আল্পনার বিবর্ণ অবশেষ।

অবাক হয়ে চেয়ে থেকেছি। মুগ্ধ হয়েছি। আমাকে এমন মুগ্ধ হতে দেখে বুড়ো চাষী গেরস্ত আধা-গর্ব আধা-সারল্যে হেসে বলেছে—উ কি দেখবেন গো! আমাদের চাষীদের মেয়েগুলোর কাজ বটে, উ কি দেখবেন আমনারা?'

সেবারও এমনি হেঁটে আসতে হয়েছিল এক দীর্ঘ পথ ধরে। শুধু দুপাশের দৃশ্য কি পৃথক, কি অসহ্য।

১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাস। উঁচু ভেড়ী বাঁধের ওপর হাঁটতে হাঁটতে দেখা যায় দুপাশের নিচু বাদা জুড়ে পাকা ধানের সম্পদ একই রকম। কাঁটা গাছের পাতার ওপর একই ভাবে আছাড় খেয়ে পড়ে লোনা হাওয়া। কিন্তু গ্রাম! গ্রাম কই?

গাঁয়ের দিকে চাইতে গিয়ে জ্বালা করে উঠেছে চোখ। কে যেন সারা গ্রামটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে গেছে। কোনো বাড়ির চাল নেই, দেয়াল নেই কোনো বাড়িতে, কোথাও শুধু ভিটেটাই জেগে আছে এখনো। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে আগুনে পোড়া কালো কালো কয়েকটা দেয়াল। এই লণ্ডভণ্ড গ্রামটির মাঝখানে শুধু একটি ইমারত সগর্বে মাথা উঁচু করে আছে।

সে ইমারতটি হল মিলিটারি ক্যাম্প।

জায়গাটা কাকদ্বীপ। সুন্দরবন অঞ্চলের এই অখ্যাত জায়গাটা একদিন সংবাদপত্রের শিরোনামায় উঠে এসেছিল। সে কাহিনী হয়তো অনেকে জানেন। সারা '৫০ সাল জুড়ে এখানে নির্মম পুলিসী অত্যাচার হয়েছে। নির্বাচনের সময়েও, ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসেও পুলিস এখানে রাজা, পুলিস এখানকার সরকার, পুলিস এখানকার ভগবান।

গ্রামটির নাম বুধাখালি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। স্তব্ধ মন নিয়ে আশ্রয়ের জন্য যে ঘরে উঠলাম সেটি একজন খেতমজুরের ডেরা। কালিমাখা এক লম্ফের ঘোলাটে আলো পড়েছে মাটির দেয়ালে।

উঠে, ঘরখানার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আর চোখ ফেরাতে পারিনি। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারিনি।

গৃহস্বামী অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিল "কি দেখছেন কুমরেড?"

মনে আছে অস্ফুটস্বরে উত্তর দিয়েছিলাম "কমরেড স্তালিন।"

হাঁ স্তালিনেরই ছবি। সিঁদুরের দাগ, লম্ফের কালি আর কুলুঙ্গির সঙ্গে ভাঙা বিধ্বস্ত ঘরবাড়িগুলোর এই অদ্ভুত পটভূমিকার মাঝখানে বাংলার এক খেতমজুরের ঘরে হঠাৎ এমন একটা ছবি দেখব তা ভাবতেও পারিনি।

জিনিসটা এমন কিছু মূল্যবান নয়, খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া, দেয়ালের মাটির ওপর আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। নিচে লাল আলতা দিয়ে ট্যারা বাঁকা করে লেখা "কমরেড ষ্ট্যালীন"। তবু খবরের কাগজের ঐ বিবর্ণ মূর্তিটা থেকেই স্তালিন চেয়ে আছেন। সামনে কাকদ্বীপের পাকা ধানের খেত অন্ধকারে মিশে রয়েছে। হঠাৎ মনে হয় স্তালিন যেন ঐ-খেতের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

"কিন্তু এতে অবাক লাগছে কুমরেড? ই তো সবার ঘরেই আছে।"

পরে বুঝেছি সত্যিই অবাক হবার কিছু নেই। কাকদ্বীপের মধ্যে স্তালিন জেগে আছেন। বুধাখালি আর রাধানগরের খেতমজুরের ঘরে স্তালিন, ভাগচাষীর বাড়িতে স্তালিন, পাঠশালার মাস্টার মশায়ের বাড়িতে স্তালিন। নানা ধরনের ছবি, কোনোটা খবরের কাগজ থেকে কাটা, কোনোটা বই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। তবু স্তালিন। মিলিটারি ক্যাম্পের ত্রাস তুচ্ছ করেই সেই দারুণ দিনগুলিতেও স্তালিন জেগে আছেন ধানখেতের শিয়রে।

ঘণ্টেশ্বরের পায়ে গুলির দাগ। তিনবার ওকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। অকথ্য অত্যাচার করেছে। তবু তার ঘরে আছে স্তালিন। বিহারীদার ঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবু সেখানেও আছে স্তালিনের ছবি। বুধুসর্দারের ছেলেটা না খেতে পেয়ে মারা গেছে। ছেলের ছবি তোলার সামর্থ্য ছিল না বুধু সর্দারের কিন্তু ঘরের দেয়ালে ছবি আছে স্তালিনের।

ওদের কাছ থেকেই শুনেছি, ভয়ংকর অত্যাচারের মধ্যেও ওরা কেমন করে মাথা উঁচু রেখেছে. কেমন করে জ্বালিয়ে রেখেছে অনির্বাণ বিশ্বাস। ধানের লড়াই, লালঝাণ্ডা আর স্তালিন কেমন করে এক হয়ে গেছে ওদের অস্তিত্ব আর স্বপ্নের সঙ্গে।

কৃষক নওজোয়ানেরা বলছিল, পুলিস হামলা করেছে, গুলি চালিয়েছে, কিন্তু সংগ্রামের বিশ্বাসকে ওরা কেউ খোয়ায়নি। ধানের স্বপ্ন ওরা ছাড়েনি। আগে প্রত্যেক ঘরে ঘরে চাষীরা ওড়াত লালঝাণ্ডা। পুলিস তার পর যার ঘরেই লাল ঝাণ্ডা দেখত, তার ঘরেই হামলা করত ধরে নিয়ে যেত।

তবু লাল ঝাণ্ডা উড়েছে, ঘরে-ঘরে আর নয় এবার গাছে গাছে। কাকদ্বীপ লাল ঝাণ্ডা না উড়িয়ে কেমন করে থাকবে কমরেড?

আর স্তালিন? জিগ্যেস করেছিলাম; "স্তালিনের ছবি দেখলে ওরা ক্ষেপে যেত না?"

যেত না আবার। স্তালিনের ছবি দেখলেই পুলিস এসে পড়ত হুমড়ি খেয়ে, কত শখ করে বাঁধানো ছবি ভেঙে ফেলত আছড়িয়ে, গৃহস্বামীকে টেনে নিয়ে যেত ক্যাম্পে।

কিন্তু স্তালিনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে কখনো?

তা যে পারে না তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম ফটিক সর্দারের বাড়ি গিয়ে। দীর্ঘদিন জেলখেটে ফিরেছে ফটিক সর্দার। ঘর সংসার তার তছনছ হয়ে গেছে। তবু স্তালিনের একটি ছবি সে বাঁচিয়ে রেখেছে এখনো।

সুন্দর ছবি, দামী আর্ট পেপারে ছাপা। কিন্তু বাঁধানো নয়, অন্যান্য ঘরের মতো দেয়ালের ওপর আঠা দিয়ে আঁটাও নয়, একেবারে দেয়ালের মাটির মধ্যে পোঁতা, মাটি দিয়ে লেপটে দেওয়া। অমন সুন্দর ছবিটা এঁটেল মাটির আস্তরে ময়লা মাটিমাখা হয়ে আছে একেবারে।

ফটিক বলছিল "কুমরেড অনেক ছবি বাঁধিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিস সার্চ করার সময় কেবলই নিয়ে নিয়ে যায় নয়ত ভেঙে ফেলে। তাই ইবার বাঁধাই না। মাটির মধ্যে গেড়ে দিইছি। এ আর ছিড়তে পারবেনি।"

সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ, চাষী তাকে লুকিয়ে রাখে মাটির মধ্যে। স্তালিনকেও তারা রেখেছে কাকদ্বীপের মাটির মধ্যে মৃণ্ময় করে। পুলিস সে ছবিকে ছিঁড়তে পারেনি, মৃত্যুও পারবে না।

স্তালিন নেই। ৬ই মার্চ আমি কাকদ্বীপে ছিলাম না। এই দারুণ দুঃসংবাদ শুনে সেখানে কি হয়েছিল জানিনা। কিন্তু কি হতে পারে তা কল্পনা করতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই মানুষগুলোকে। দেখতে পাচ্ছি স্তালিনের খবর শুনে তাঁরা কাঁদছেন, জমি আর আপনজনের জন্য বাংলাদেশের চাষীরা যেভাবে হাহাকার করে কাঁদে, সেইভাবে। তারপর চোখ মুছে এই অসহ্য দুঃখকে তাঁরা পরিণত করছেন এক কঠিন শপথে। আরো অনেকবার তাঁরা যেমন শপথ নিয়েছেন।

শুধু এমন মহান, এমন দুঃসহ শপথ কাকদ্বীপের চাষীরাও এর আগে কোনোদিন নিতে পারেনি।

স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন!

"সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য হল মুনাফা কামানো। উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা যায় যে, এতে মুনাফা লোটা যে-পরিমাণে সুনিশ্চিত করে, পুঁজিবাদের কাছে ঠিক ততটুকুই এর প্রয়োজন। এর বাইরে পুঁজিবাদের কাছে তার আর দাম নেই। মানুষ আর তার প্রয়োজন পুঁজিবাদের দৃষ্টিপথ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য কি? সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন্ মূল উদ্দেশ্য নিয়ে সামাজিক উৎপাদন পরিচালিত হবে?

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা নয়; লক্ষ্য হল, মানুষ আর তার চাহিদা অর্থাৎ বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পরিপূরণ করা।"

—স্তালিন

সোবিয়েত লোকসংগীতে স্তালিন

'লাক'দের গান

তেরনদী খোঁজে সাতসমুদ্র,
চুম্বক খোঁজে লোহার টান,
তৃণলতা খোঁজে প্রভাতরৌদ্র
পাখি খোঁজে কোথা দখিনা গান।

মানুষ তেমনি খোঁজে আনন্দ,
খোঁজে সত্যের আকর্ষণ,
দোস্তিতে বাঁধে প্রণয়বন্ধ,
তোমাতে বাঁধে সে হৃদয়মন॥

দাঘেস্তান-এর গান

ঢেউয়ের রেখা চলে যেমন সপ্তডিঙা পিছে,
চষা মাটির রেখা ফালের মুখে,
তেমনি চলে লাখো লাখো মানুষ তোমার সঙ্গে
সর্বদেশে এই পৃথিবীর বুকে;

যে-পথ বেছে নিয়েছি আজ আমরা সকলে
ছাড়ব না সেই গতির ভবিষ্যৎ,
সবার শেষে আছে তো সেই একটি নিশানা,
চোখের মণি একটি তো সেই পথ॥

অনুবাদঃ মণীন্দ্র রায়

স্তালিন-স্তুতি

[এই সমবেত-সংগীতটি সোবিয়েত ইউনিয়নে সাতিশয় জনপ্রিয়। মস্কো রেডিও হইতে ইহা প্রায়ই প্রচারিত হয়। এই গানটির রচয়িতা এম্, ইনিউশ্‌কিন্ এবং সুরকার এ, আলেক্‌জান্দ্রভ্।]

প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে, পর্বত শিখরে,
ঈগল স্বচ্ছন্দে যেথা করে বিচরণ,
আমাদেরই প্রিয় জ্ঞানী স্তালিনের তরে
পরম সুন্দর গান রচে জনগণ।

সে গানের গতিবেগ পাখীরে ছাড়ায়,
পৃথিবীর শোষকেরা কেঁপে ওঠে রাগে,
তাহারে রোধিতে নারে শান্ত্রী পাহারায়,
তাহারে রোধিতে নারে সীমান্ত-বিভাগে।

এ গান ডরায় নাকো চাবুকে, গুলিতে,
আগুনের ব্যারিকেডে এ গান ধ্বনিত,
এ গান যে গীত হয় রিকসাতে কুলিতে,
চীনের সৈনিক কণ্ঠে হয় ইহা গীত।

প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে, পর্বত শিখরে,
বায়ুপোত করে যেথা শব্দ সঞ্চরণ,
আমাদেরই প্রিয় জ্ঞানী স্তালিনের তরে
পরমসুন্দর গান গাহে জনগণ।

মূল রুশ থেকে অনুবাদঃ **নীরেন্দ্রনাথ রায়।**

স্তালিনের চিঠি ঃ গর্কিকে

প্রিয় আলেক্‌সিস্‌ মাক্‌সিমোভিচ্‌,

মাফ করবেন, আপনার চিঠির জবাব দিতে দেরি (ভীষণ দেরি!) হয়ে গেল, অপরাধ নেবেন না। সাংঘাতিক বেশি কাজের চাপ পড়েছে। তার উপর, খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য তাতে আমার দোষ কিছু কাটে না। তবু হয়তো খানিকটা কৈফিয়ত দেওয়া হয়, এই যা।

১। আত্ম-সমালোচনা ছাড়া আমাদের চলতে পারে না। কোন মতেই না, আলেক্‌সিস্‌ মাক্‌সিমোভিচ্‌। আত্মসমালোচনার অভাবে অনিবার্য পরিণতি হবে অচল অবস্থা, শাসনযন্ত্রে দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক প্রকোপ বৃদ্ধি এবং শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টিশীল উদ্যমের শ্বাসরোধ। একথা ঠিকই যে, আত্মসমালোচনা শত্রুপক্ষের হাতে কিছু তথ্য জোগায়। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে সে তথ্য (এবং প্রেরণা) সহায় হয় আমাদের অগ্রগামী আন্দোলনে, শ্রমিকদের গঠনমূলক উৎসাহের মুক্তিতে, প্রতিযোগিতা আন্দোলনের বিস্তারে, শক ব্রিগেডের কাজে, ইত্যাদি। লোকসানের দিকটা পুরিয়ে যায় লাভের দিক দিয়ে, বরং লাভের দিকটাই বড় হয়ে ওঠে। হয়তো আমাদের সংবাদপত্রে আমাদের দোষত্রুটি একটু বেশি করে তুলে ধরা হয়, এবং কখনো কখনো (অনিচ্ছাকৃত ভাবে) তা নিয়ে এমন কি ঢাক বাজানোও হয়। এ রকম হওয়া সম্ভব, এমন কি হয়তো হয়ে থাকে। এ নিশ্চয়ই খারাপ। আপনার মতে তাই আমাদের দোষ ও আমাদের সাফল্য বর্ণনার মধ্যে ভারসাম্য রাখা উচিত (এমন কি, আমি বলি যে সাফল্যের কথা যেন দোষের দিকটাকে ছাপিয়ে যায়)। আপনার একথা খুবই সংগত সন্দেহ নাই। এই অভাব আমরা অবিলম্বে নির্মূল কাটিয়ে উঠব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

২। আমাদের যুবকেরা বিভিন্ন প্রকৃতির। কিছু আছে যারা প্যান্‌পেনে, ঝিমিয়ে পড়া, হতাশ (জেনিনের ধরনের)। আর কিছু আছে যারা প্রাণবন্ত, বাঁচার আনন্দে ভরপুর, জয়লাভের জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অনমনীয় দৃঢ়তা দিয়ে তৈরি। আজ যখন আমরা পুরাতনের প্রাণসূত্রগুলি ছিঁড়ে ফেলে তার স্থানে নতুন সৃষ্টি করছি, সনাতন পথ ও আলিগলি সব যখন নষ্ট হয়ে গেছে আর তার জায়গায় আমরা বানাচ্ছি নতুন ও অচেনা রাস্তা, জনতার কোন কোন অংশ, এতদিন যারা আরামে ছিল, তারা যখন আজ কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েছে ও তার জায়গায় এগিয়ে আসছে কোটি কোটি মানুষ যারা এতকাল অত্যাচার ও রক্তচক্ষুর শাসানি সহ্য করে এসেছে—এই অবস্থায় যে যুবসম্প্রদায় আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সামাজিক স্তরের দিক থেকে অভিন্ন ও পার্থক্যহীন এক অখণ্ড

জনসমষ্টিতে পরিণত হবে, তা কখনো সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, যুবকদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা ধনীপরিবারের সন্তান। দ্বিতীয়তঃ, যদি স্নেইসব যুবকযুবতীর কথাও ধরি যারা (তাদেব সামাজিক অবস্থার দিক দিয়ে) আমাদের স্বপক্ষে, তাদেরও সকলের এতখানি বুকের পাটা, ক্ষমতা, চরিত্র ও ধারণাশক্তি নাই, যাতে তারা বুঝতে পারে যে পুরাতনের এই মহতী বিনষ্টি ও দ্রুতলয়ে নতুনকে গড়ে তোলার এই দৃশ্যের আবির্ভাব অনিবার্য সুতরাং কাম্য, কারণ, "সর্বসাধারণের লক্ষ্মীলাভের" যে কল্পরাজ্যে "হাতপা ছড়িয়ে বসার", "সুখে লীলা করার" সম্ভাবনা ছিল, তার চেয়ে এই দৃশ্য অনেক তফাত। একথা বোঝা যায় যে এই "সব-ভাঙার তাড়াহুড়ার" মধ্যে এদেশী কিছু নিস্তেজ, আত্মপীড়িত, হত-বল, আশাহীন, উদাসীন এবং শেষ পর্যন্ত শত্রু শিবিরে শরণার্থী কিছু দলত্যাগী লোক না থেকে পারে না। এই হ'ল বিপ্লবের অনিবার্য "মাশুল"।

তবে সারকথা হচ্ছে যে, বর্তমানে আমাদের যুবসম্প্রদায় এই প্যান্‌পেনেদের আদর্শে গড়ে উঠছে না, গড়ে উঠছে আমাদের কম্‌সোমল* কর্মীদের আদর্শে—যারা ধনতন্ত্রের সংহারক, সমাজতন্ত্রের নির্মাতা, সমস্ত নির্যাতিত ও পদানত মানুষের মুক্তিদাতা বল্‌শেভিকদের এক নতুন ও বহুল পরিবারের বীজস্বরূপ। আমাদের শক্তির উৎস এখানেই। আমাদের জয়েব ধ্রুব প্রতিশ্রুতি এতেই।

৩। তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে আদর্শগত (এবং তারই সঙ্গে) সংগঠিত সংগ্রামের দ্বারা এইসব প্যান্‌পেনে, ছিচ্‌কাঁদুনে, দোমনাদের সংখ্যা কমানোর দিকে চেষ্টা আমাদের থাকবে না। বরং উল্‌টো, আমাদের পার্টি, আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন, আমাদের সংবাদপত্র, আমাদের সোবিয়েতগুলির অন্যতম অবশ্য কর্তব্যই হ'ল এই সংগ্রাম সংগঠিতভাবে চালানো এবং তাতে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা। অতএব আমরা (আমাদের বন্ধুরা) আপনার প্রস্তাবগুলি সর্বাংশে স্বীকার করি ঃ

(ক) "জা রুবিয়েঅম্‌" ("বিদেশে") সাময়িকপত্রটি সংগঠন করা ;

(খ) এ, টল্‌স্টয় ও অন্যান্য লেখনীশিল্পীদের সহযোগিতায় "গৃহযুদ্ধ" সম্পর্কে সর্বসাধারণেব যোগ্য বচনা সংকলনের সিরিজ সম্পাদনার ব্যবস্থা করা।

এর সঙ্গে শুধু-এইটুকু যোগ দিয়ে বলা দরকার যে এর কোন কাজটাই আমরা রাদেক বা তাঁর কোন বন্ধুর পরিচালনায় ন্যস্ত করতে পারি না। রাদেকের সদিচ্ছা বা

---

* কম্‌সোমল ঃ সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট নওজোয়ানদের সংগঠন।

* বাদেক ঃ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দলাদলি বরদাস্ত করা হয় না, এই কারণে ট্রট্‌স্কি ও জিনভিয়েভের নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টি-বিরোধী উপদলের সক্রিয় সভ্য সাংবাদিক রাদেককে ১৯২৭ সালে সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক) ১৫শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহিষ্কার কব হয়। পরে,

তাঁর সততার কথা এখানে ওঠে না। এ হচ্ছে উপদলীয় সংগ্রামের যুক্তিযুক্ত পরিণামের কথা ; রাদেক বা তাঁর বন্ধুরা কেহই এই সংগ্রাম একবোরে ছেড়ে দেননি (যে-কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতভেদ এখনো রয়ে গেছে তাই এই সংগ্রামের পথে আবার তাঁদের ঠেলে দেবে)। আমাদের পার্টির ইতিহাস (এবং শুধু আমাদেরই পার্টির ইতিহাস নয়) এই শিক্ষা দেয় যে বাস্তবের যুক্তিযুক্ত পরিণামের ধারা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সবচেয়ে নিশ্চিত সমাধানের উপায় হ'ল এইসব কাজ পরিচালনার দায়িত্ব এমন সব কমরেডের হাতে দেওয়া যাঁদের রাজনৈতিক দৃঢ়তা আছে এবং রাদেক ও তাঁর বন্ধুদের অনুরোধ করা এইসব কাগজে লিখতে। সমাধানের এইটাই আরো ভালো উপায়।

৪। "ও ভঈনিএ" (যুদ্ধ-প্রসঙ্গে") নামে একটি বিশেষ ধরনের সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রশ্ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এরকম কোন পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন এখন নাই। যেসব রাজনৈতিক সাময়িকপত্র বর্তমান আছে, আমাদের মতে, যুদ্ধ-সংক্রান্ত (আমি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কথাই বলছি) সমস্যাগুলির আলোচনা তাতেই হওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত। এর কারণ আরও এই যে যুদ্ধের সমস্যা থেকে রাজনৈতিক সমস্যাগুলি পৃথক করে দেখা অসম্ভব, কারণ রাজনীতিরই একরকমের প্রকাশ যুদ্ধে।

যুদ্ধের গল্প সম্পর্কে বক্তব্য এই যে এগুলি প্রকাশ করার আগে বেশ ভালো করে ভেবে দেখা দরকার। বইয়ের বাজারে এমন একগাদা গল্প-সাহিত্য চলছে যাতে যুদ্ধের "বীভৎস কাণ্ডের" বর্ণনা করা হয় এবং তাতে সমস্ত যুদ্ধ সম্পর্কেই ঘৃণা জাগে (শুধু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে নয়, অন্যান্য সব যুদ্ধ সম্পর্কেও)। এগুলি বুর্জোয়া শান্তিবাদী **(pacifiste)** গল্প, এর তেমন কিছু মূল্য নাই। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে শুরু করে যে গল্প পাঠকদের টেনে আনে সেই পর্যন্ত যাতে এই সব যুদ্ধের সংগঠক সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির শেষ দেখে নেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ জাগে—সেই রকম গল্পই আমাদের চাই। তাছাড়া, আমরা সব রকম যুদ্ধের বিরুদ্ধে নই। আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কারণ তা বিপ্লব-বিরোধী যুদ্ধ। কিন্তু আমরা মুক্তিধর্মী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বিপ্লবী যুদ্ধের স্বপক্ষে, যদিও সকলেই জানে যে এই যুদ্ধ "ভয়াবহ রক্তক্ষয়" ছাড়া হয় না, বরং তার প্রাচুর্যই দেখা যায়।

সে নিজের ভুল সত্যই স্বীকার করেছে এই বিশ্বাসে পার্টি তাকে পুনরায় সভ্য পদে ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া গেল যে ট্রট্স্কি-জিনভিয়েভ্ উপদলের অন্যান্য অনেকের মতো রাদেকও সোবিয়েত-বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত। রাষ্ট্রের শত্রুতা করার অপরাধে রাদেকের দীর্ঘ মেয়াদী সাজা হয়।

আমার মনে হয় যে ভরন্স্কি যে যুদ্ধের "ভয়াবহতার" বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বুর্জোয়া শান্তিবাদীদের তফাত সামান্যই।

৫। আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমাদের দেশে, আমাদের সংবাদপত্রে ধর্মবিরোধী প্রচারের মধ্যে প্রচুর অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে। অনেক সময় এমন সব অসাধারণ উদ্ভট কথাও বরদাস্ত করা হচ্ছে যে তা শত্রুপক্ষের হাতেই রসদ জোগায়। এই বিষয়ে বিস্তর কাজ এখনো বাকি আছে। কিন্তু ধর্মবিরোধী প্রচারকার্যের ভার নিয়ে যে কমরেডরা আছেন তাঁদের সঙ্গে বসে আপনার প্রস্তাবগুলি আলোচনার সুযোগ আমার এখনো হয়নি। এ-সম্পর্কে আমি আগামীবারে আপনাকে জানাব।

৬। কামেনেভের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। আমার সময় নেই। তাছাড়া, আমিও যদি সমালোচক সাজি তাহলেই চিত্তির!

আজ এই পর্যন্ত।

আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানবেন। আপনার আরোগ্য কামনা করি। আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ।

—জে. স্তালিন

শুনলাম রাশিয়া থেকে আপনার একজন চিকিৎসক দরকার। কথাটা কি ঠিক? ঠিক কাকে আপনার চাই? লিখলেই তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দেব।

—জে. স্তা.

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩০।

অনুবাদঃ রণজিৎ গুহ

'এতুদ সোভিয়েতিক' নামক ফরাসি মাসিকপত্র (এপ্রিল, ১৯৫০) থেকে, অনুবাদ। আমরা যতদূর জানি এই চিঠিটিরও কোন ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

—অনুবাদক



সম্পাদকীয়

মৃত্যু নেই স্তালিনের

স্তালিন চির-বিশ্রাম লাভ করেছেন। আজ পৃথিবীর মানুষ উপলব্ধি করছে—এ যুগ স্তালিনের যুগ; স্তালিন যুগ-পুরুষ।

অবশ্য এ যুগ লেনিনেব যুগ বলেই স্তালিনের যুগ। লেনিন ও স্তালিন আজ শুধু শেষনিদ্রায় পাশাপাশি শয়ান নয়, ইতিহাসের মহাঙ্গনে লেনিন ও স্তালিন আজ মানুষের অভিন্ন মহানায়ক। সাম্রাজ্যবাদের সংকট-কালে শ্রমিক-বিপ্লবের মহান্ উদ্বোধক লেনিন, শ্রমিক-বিপ্লবের যুগসন্ধি ও সাম্যবাদের যুগ-ভিত্তির স্রষ্টা স্তালিনঃ অভিন্নাত্মা তাঁরা যুগ থেকে এই যুগান্তরের সাধনায়।

এই যুগ-সত্য তবু এখনো সর্বস্বীকৃত নয়। কারণ, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সর্ব-স্বীকৃত হতে পারে না কোনো মূল সত্য। দেশে দেশে মজুর-কিসান সমস্ত প্রাণ দিয়ে জানে স্তালিন তার পরিস্ফুট চেতনা। দেশে দেশে শোষণবাদীরা সভয়ে দেখে—স্তালিন মানব-মুক্তির বিজয়-ধ্বজা। স্তালিনের মহানিদ্রাতেই তাই আই-সেনহাওয়ার-ডালেস্‌রা খোঁজে স্বার্থসিদ্ধির পথ; স্তালিনের দেহাবসানে উৎফুল্ল হয় সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচরেরা। অথচ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণও জানেন—স্তালিন শান্তির অতন্দ্র সাধক; পণ্ডিত জওহরলালও মানেন—স্তালিন এযুগেব মহান্ প্রণেতা। কেউ তাঁরা শ্রমিক-বিপ্লবের সমর্থক নন। কিন্তু বিশ্বচেতনায় স্তালিনের নাম আজ মহামানবতার প্রতিশ্রুতি; তা-ও স্পষ্ট। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজেও তাই উজ্জ্বল আজ স্তালিনের স্বাক্ষর। সে স্বাক্ষর সংগ্রামের ও শান্তির, মানবতার ও সৃষ্টির। তথাপি যতক্ষণ পৃথিবীতে শোষণবাদী চার্চিল-আইসেনহাওয়ার আছে, ততক্ষণ মানববাদী লেনিন-স্তালিনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভাব নেই। যতক্ষণ তাই মানুষের জয় সর্বাঙ্গীণ নয়, ততক্ষণ নেই শান্তির সংগ্রামেব অবকাশ—স্তালিনেব নেই বিশ্রাম, লেনিনের চোখে নেই নিদ্রা।

মানুষের এই সর্বাঙ্গীণ জয়ের বৈজ্ঞানিক বিধান রচনা করেছেন মার্কস্-এঙ্গেলস্। মার্কস্‌বাদ আধুনিককালের মানবতাবাদ—সৃষ্টিধর্মী মানবতার প্রথম আত্ম-পরিচয়লাভ।

ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানুষের এই সৃষ্টিশক্তিব ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিচয় খণ্ডিত মানবতার থেকে পবিপূর্ণ মানবতার মধ্যে জাগরণ, শ্রেণী থেকে সমাজের শ্রেণীহীনতায়ও যাত্রা।

সামন্ত রাজা ও পুরোহিতের নিশ্চল জীবন-যাত্রাকে ভেঙে ফেলে মানুষের সৃষ্টিশক্তির বাহন হিসাবে উত্থিত হয়েছিল উদ্যোগী বুর্জোয়া। পুরুষকার ছিল তাদের মন্ত্র; পুঁজি ছিল তাদের আশ্রয়। বুর্জোয়া শ্রেণী মানুষকে এনে দাঁড় কবিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসের এক নতুন মোড়ে—রিনাইসেন্সেব মহালগ্ন তখন। মানুষের সৃষ্টিচেতনা তারপর রূপায়িত হয়ে উঠল নতুন উদ্যোগে, বৈজ্ঞানিক

উদ্ভাবনায়, আর শেষে 'মানুষের অধিকার' স্বীকৃতির সংগ্রামে। ব্যক্তিস্বরূপের সেদিন প্রথম আবিষ্কার, মানুষ হিসাবেই সেদিন আক্ষুদ্র প্রতিটি মানুষের মর্যাদা ঘোষিত। মানবতার ইতিহাসে এ সত্যের তুলনা নেই। কিন্তু মানবতার এই মহৎ চেতনা কি করে বাস্তবে সম্পূর্ণতা লাভ করবে সেই বুর্জোয়া সমাজ-আয়তনে? বাস্তবে অজস্র মানুষের শোষণের উপরেই যে স্থাপিত বুর্জোয়া মানবতার সেই সোনার সিঁড়ি। সহস্র মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিনাশ করেই পল্লবিত সেই শতকরা পাঁচটি মালিকের ব্যক্তি-স্বরূপ। বহু মানুষের অফুরন্ত সৃষ্টিশক্তির অপচয়েই স্পর্ধিত তাই সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার 'মহতী বিনষ্টি'—মুনাফার মৃগয়া পরিণত মানুষের মৃগয়ায়।

অভ্যুদয়-বন্ধুর পথটি আলোকিত করে মার্কস্-এঙ্গেলস্ ঘোষণা করলেন: অভীঃ। ইতিহাসে অভ্যুদয় ঘটেছে সেই শ্রমিক-শ্রেণীর; সৃষ্টিশক্তিতে যাদের জন্মগত অধিকার; মানবতাকে যারা দিতে পারে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি।

মার্কস্বাদের এই প্রাণ-সত্য ছিল লেনিন-স্তালিনের মন্ত্র। তাঁরা তাই বুঝেছিলেন—সৃষ্টি কখনো পুনরাবৃত্তি নয়। তা নবায়মান প্রকাশ, আর সুপরিকল্পিত প্রয়াস। সত্য নবায়মান বাস্তবের মধ্যে পলে পলে নবায়িত হয় বলেই সে সত্য। তাই মার্কস্বাদের অক্ষর-গোনা ছন্দে বিপ্লবের মহাকাব্য রচনার প্রয়াস পাননি লেনিন বা স্তালিন। তাঁরা রচনা করেছেন মার্কসবাদের বাস্তব ইতিহাস, মানবতার মহাকাব্য। ইতিহাসে মার্কসবাদের যে ক্ষয় নেই তার কারণ—মার্কসবাদ শাস্ত্রবচন নয়, তা সৃষ্টির বাস্তব সাধনা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ তাই আশ্চর্য হয়ে শোনেন স্তালিনের কথা: আমি গোঁড়ামিগ্রস্ত মার্কস্বাদী নই, আমি সৃষ্টিপন্থী মার্কস্বাদী।

সৃষ্টির পন্থাই মার্কসবাদের পন্থা, আর স্তালিন সেই মানবতার সৃষ্টিসারথি। যে-মানুষ দেবতার ভয়ে-বিভ্রান্তিতে ছিল সন্ত্রস্ত, সে আর নেই—মানবতা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। যে-মানুষ রাজা ও পুরোহিতের শাসনে ছিল ব্যক্তিসত্তার বলি-দানে অভ্যস্ত, সে মানুষও আর নেই। মানবতা সেই অনড় সামন্ত-সমাজকে ভেঙে এগিয়ে এসেছে। যে মানুষের ব্যক্তি-অভিমান স্বার্থ-সাধনাকেই জানত আত্ম-সাধনা বলে, ১৯১৭-র পরে সেই মুনাফাবাদী মানুষেরও দিন শেষ হয়ে আসছে। মানুষ আজ স্তালিনের নেতৃত্বে জেনেছে—সে পরিকল্পনা করতে পারে তার সমাজ, সে পরিকল্পনা করতে পারে তার ভবিষ্যৎ; মানুষ পরিবর্তিত করে তার পরিবেশ, আর পরিবর্তিত করে সে আপনাকেও।

স্তালিনের সাধনায় আজ সুস্পষ্ট মানবতার এই ঐতিহাসিক ভূমিকা: সৃষ্টিতেই মানবতার পরিচয়; সমাজতন্ত্রী মানবতাই সৃষ্টিধর্মী মানবতা, পরিপূর্ণ মানবতার প্রতিশ্রুতি। মার্কস্বাদ এ-যুগের মানবতাবাদ; স্তালিনবাদ ইতিহাসের এই সৃষ্টিপন্থী মানবতাবাদ। আর পরিপূর্ণ সেই মানবতার পূর্বাভাস লেনিন-স্তালিন।

এই সৃজনধর্মী নতুন মানুষকে যিনি গড়েছেন, কোথায় তাঁর মরণ? প্রত্যেকটি মানুষের মানবতা-বোধে তাই লেনিন আজ জীবিত; প্রত্যেকটি মানুষের সৃষ্টি-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাই স্তালিন আজ অমর। প্রত্যেকটি মানুষ তাদের সৃষ্টি-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠছে নতুন মানুষ। ইতিহাসে এই নতুন মানবতার নাম হবে লেনিন, আর স্তালিনের নাম হবে সৃষ্টি।

দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রত্যেকটি আমাদের উদ্যোগ ও রচনার মধ্য দিয়ে —সাহিত্যে, জীবনে—আমরা ঘোষণা করবঃ সৃষ্টির শেষ নেই, মৃত্যু নেই স্তালিনের!

গোপাল হালদার

'পরিচয়'-এর **স্তালিন-সংখ্যার** জন্যে কবি ও সাহিত্যিকদের কাছ থেকে আশাতীত রকম সাড়া পাওয়া গেছে। পৃষ্ঠাসংখ্যার সীমাবদ্ধতার জন্যে প্রাপ্ত লেখাগুলির সকলের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হল না বলে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের প্রবন্ধ "স্তালিন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি" দেরিতে পাওয়ায় বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। পরবর্তী কোনো সংখ্যায় এই মূল্যবান প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হবে। স্তালিনের উদ্দেশ্যে লেখা প্রবীণ ও নবীন কবিদের কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতাও আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু স্থানাভাবের জন্যে এই সংখ্যায় ছাপা গেল না। এগুলিও নিকট-ভবিষ্যতের 'পরিচয়'-এ প্রকাশ করা হবে।

—সম্পাদক

সূচীপত্র

দ্বাবিংশ বর্ষ ঃঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃঃ চতুর্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৬০

মে-দিনের গান	ভি, মায়াকভ্স্কি	২৩৩
প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ (কবিলিপি—অপ্রকাশিত)		২৩৪
মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজবাস্তবতা	নীরেন্দ্রনাথ রায়	২৩৭
কবিতা	সাঁওতালি	২৫৯
	জগন্নাথ চক্রবর্তী	
	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	
	মণীন্দ্র রায়	
	কৃষ্ণ ধর	
	পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী	
	সিদ্ধেশ্বর সেন	
	অশোক ভট্টাচার্য	
পরিচয়-এর কুড়িবছর	হিরণকুমার সান্যাল	২৬৭
রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈপরীত্য	ঋষি দাস	২৭৪
রবীন্দ্রনাথ	অরুণা হালদার	২৮২
গল্প		
বড়রাস্তার বাঁকে	অধীর ভট্টাচার্য	২৯০
পরিণয়	মা ফেঙ্	২৯৮
জুয়া	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩০৫
বীরপূজা	মনোজ বসু	৩১২
স্তালিনঃ স্মৃতিচিত্র	জাঁ-রিশার ব্লখ্	৩১৬
বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা	রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩২২
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৩২৯
সংস্কৃতি-সংবাদ	ননী ভৌমিক	৩৩৯
	রবীন্দ্র মজুমদার	

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড থেকে মুদ্রিত ও 'পরিচয়' কার্যালয় ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।

ইস্পাত

কাঁচা লোহার উপাদান থেকে তৈরি হয় কঠিন ইস্পাত। প্রক্রিয়া তার জটিল। কিন্তু আরো অনেক বেশি জটিল প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ, দুর্বল মানুষ হয়ে ওঠে ইস্পাতের মতো অনমনীয় কঠিন রূঢ় বাস্তবের প্রতিকূলতার মধ্যেও। ব্যক্তির ভূমিকা এ-ক্ষেত্রে কতোখানি?

অস্ত্রোভ্স্কি জন্মেছিলেন রুশ-বিপ্লবের পূর্বে একান্ত দরিদ্রের ঘরে। নানান ঝড়-ঝঞ্ঝা, কৃচ্ছ্রতা ও অপূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে কেটেছে তাঁর বাল্য ও কৈশোর যেমন কেটেছিল গোর্কির। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে তিনি দেখলেন মানুষের মুক্তি। তাই সত্যিকারের সৈনিকের মতো যোগ দিলেন বিপ্লবে। কষ্ট সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি হলেন পঙ্গু, দৃষ্টিহীন। বিপ্লব সফল হল, কিন্তু তাঁর কাছে জীবনের মূল্য তখন কতটুকু?

হার মানলেন না অস্ত্রোভ্স্কি। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে রচিত HOW THE STEEL WAS TEMPERED উপহার দিলেন দুনিয়ার মানুষকে। সে এক নতুন মানুষের জন্মকাহিনী। জীবনাবসানেও অস্ত্রোভ্স্কির সান্ত্বনা রইল—"আমি যখন থাকব না, তখনো আমার সৃষ্টি মানুষের সেবা করে যাবে—এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে।"

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ২৷৷৵০

CURRENT BOOK DISTRIBUTORS
3/2, Madan Street
CALCUTTA-13.



দ্বাবিংশ বর্ষ
২য় খণ্ড। ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৬০

মে-দিনের গান

ভি, মায়াকভ্স্কি

পাতারা সবুজ হল—
শীতেরা উধাও।
কদম বাড়াই আমরা
নির্মল প্রান্তরে

আছি আমি,
আছো তুমি,
আছি আমরা।

বসন্ত ওড়ায় তার
ধৌত উত্তরীয়।
কদম বাড়াই আমরা যৌবনে ফূর্তিতে
কদম বাড়াই
কদম বাড়াই
কদম বাড়াই!

ছিটের কাপড় আর টুকরো কাগজ—
আগুনে আগুনময়।
এ লাল-ঝাণ্ডার' আমরা
নিশান-বরদার!
নিশান-বরদার!
নিশান-বরদার!

রুশ থেকে—সুপ্রিয় মুখার্জী

1. What characteristic do you admire most in a man? Love of truth
2. What characteristic do you admire most in a woman? Love of creature
3. What, do you consider, is your best quality? Inconsistency
4. What, do you consider, is your greatest failing? The same
5. What is your favourite pastime? Doing nothing
6. What gives you most annoyance? Spiritual arrogance
7. What foreign land would you like best to visit? All parts of the world
8. Whom do you consider has the greater brain power—man or woman? I decline to answer
9. Do you think women should take part in public life? Certainly — but their part is distinct
10. Do you consider dress influences character? Does when we are conscious of it.
11. Describe the "girl of the period." She is like the girl of the other period when truly known
12. Describe the "young man of the day." He has lost his youth.
13. What is your favourite motto? Can't stick to one favourite, so I have no motto.
14. Which is your favourite flower, and what is its meaning? Have too many favourites to specify one and I love them because they have no meaning.

15. Whom do you consider is the best Sovereign in Europe? The people

16. Whom do you consider is the greatest living Politician of Great Britain? His name is not known

17. Whom do you consider is the greatest Artist of the present age?

18. Whom do you consider is the greatest Musician of the present age? Nature hates speculations. We can be sure of the greatest but not of the greatest.

19. Whom do you consider is the greatest Orator of the present age?

20. Whom do you consider is the greatest Author of the present age?

21. Whom do you consider is the greatest Poet of the present age?

22. Name two poems that have given you much pleasure.....

23. Name the two books of fiction that have given you most profit. I don't read books of fiction for profit.

24. Name your hero or heroine in life... Ram mohan Roy

25. Name your hero or heroine in fiction.

26. Name the composer whose music you most enjoy..

Your Autograph Rabindranath Tagore

১। পুরুষের কোন্ গুণটিকে আপনি সবচেয়ে শ্রদ্ধা করেন—সত্যনিষ্ঠা
২। নারীর কোন্ গুণটিকে আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেন—জীবে প্রীতি
৩। আপনার মতে আপনার সেরা গুণ কি?—অসংগতি
৪। আপনার মতে আপনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি কি?— ঐ
৫। অবসর সময়ে কি করতে আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেন—কিছু না করা
৬। কিসে আপনার সবচেয়ে বেশি বিরক্তি—আধ্যাত্মিক অহমিকা
৭। বাইরের কোন্ দেশে যেতে আপনার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা—বিশ্বের সবখানে
৮। মস্তিষ্কের শক্তি কার বেশি বলে আপনার ধারণা, পুরুষ না নারীর—জবাব দিতে রাজী নই
৯। আপনি কি মনে করেন যে মেয়েদের সামাজিক কাজে অংশ নেওয়া উচিত—নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের ভূমিকা স্বতন্ত্র।
১০। আপনি কি মনে করেন চরিত্রের উপর পোশাকের প্রভাব পড়ে?—পড়ে, যদি আমরা সে-সম্পর্কে সচেতন হই।
১১। 'যুগকন্যা' বলতে কি বোঝেন?—ঠিকমতো জানা থাকলে, সেঠিক অন্য যুগেরই মতো মেয়ে।
১২। 'আধুনিক তরুণ' বলতে কি বোঝেন?—সে তার তারুণ্য খুইয়েছে।
১৩। আপনার প্রিয় মন্ত্র কি?—প্রিয় বলে কোনো একটি মন্ত্রে আটকে থাকতে পারি না, তাই কোনো মন্ত্র নেই।
১৪। আপনাব প্রিয় ফুল কি এবং তার মানে কি?—প্রিয় ফুলের সংখ্যা এত বেশি যে বলা মুশকিল; আর ফুল ভালোবাসি কারণ তাদের কোনো মানে নেই।
১৫। আপনাব মতে ইউরোপের সেরা সম্রাট কে?—জনগণ
১৬। আপনার মতে গ্রেটব্রিটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত রাজনীতিজ্ঞ কে?—তার নাম জানা যায়নি।
১৭। আপনার মতে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী কে?—
১৮। আপনার মতে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী কে?—
১৯। আপনার মতে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা কে?—
২০। আপনার মতে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক কে?—
২১। আপনার মতে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে?—
'তম' প্রত্যয়ে প্রকৃতির ঘৃণা। মহৎদের সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, কিন্তু মহত্তমদের সম্পর্কে নয়।
২২। আপনাকে খুব আনন্দ দিয়েছে এমন দুটি কবিতার নাম করুন—
২৩। এমন দুটি উপন্যাসের নাম করুন যা পড়ে আপনি বেশি লাভবান হয়েছেন—আমার উপন্যাস পড়া লাভের জন্য নয়।
২৪। জীবনে আপনার নায়ক বা নায়িকা কে?—রামমোহন রায়।
২৫। উপন্যাসে আপনার নায়ক বা নায়িকা কে?—
২৬। আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় সুরকারের নাম করুন—

আপনার স্বাক্ষর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজ-বাস্তবতা

নীরেন্দ্রনাথ রায়

CALCU

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে 'মেঘনাদবধ' রচয়িতার জীবনযুদ্ধের অবসান হইল। যে-প্রতিভার আকস্মিক স্ফুরণে ভারতের কাব্যাকাশে ঘটিয়াছিল নব অরুণোদয়, সেদিন নিবিয়া গেল তাহার দিব্যদীপ্তি। বঙ্গের গৌরব রবি গেলা অস্তাচলে।

মধুসূদনের সাংসারিক জীবনের শোচনীয় পরিণতি স্বভাবতই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর অন্তরে শোকের আলোড়ন তুলিয়া থাকে, তার সামাজিক দায়িত্ববোধে আঘাত করে। মনে হয় এমনটি হওয়া উচিত ছিল না; তখনকার সমাজের উচিত ছিল এই যুগপ্রবর্তক কবিকে সকল অভাবের ঊর্ধ্বে রাখা, দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত করা। মেঘনাদবধের প্রথম টীকাকার হেমচন্দ্র প্রসঙ্গান্তরে অভিযোগ করিয়াছিলেন,

> হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর এই ত অখ্যাতি ভবে,
> যেজন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে।

কিন্তু হেমচন্দ্রের এই অভিযোগে যোগ দিবার অধিকার মধুসূদনের ছিল না। তিনি দরিদ্রের ঘরে জন্মান নাই, চিরদিন দারিদ্র্য-পীড়িত ছিলেন না। তাঁহার দারিদ্র্য স্বোপার্জিত। প্রতিভার অনাদরকে তাহার কারণ বলা যাইতে পারে না। মধুসূদনের মতো ক্রান্তিকারী কবি তাঁহার সমসাময়িকগণের নিকট যে সমাদর ও স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। ইহা বাঙালী পাঠকসমাজের কাব্যগুণ বিবেচনার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

মৃত্যুকালে মধুসূদনের বয়স ছিল পঞ্চাশ। কিন্তু তাঁহার দৈহিক জীবনের সমাপ্তির পূর্বেই তাঁহার কবিজীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তাঁহার শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। নিজের কবিত্বশক্তিসম্বন্ধে মধুসূদনের আত্মবোধ ছিল চিরদিন দৃপ্ত। তবু এই কবিতাগুচ্ছের অনেক সনেটে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে বিষণ্ণ অবসাদের সুর, আপন শক্তিহ্রাসের আত্মসচেতন অনুভূতির প্রকাশ। কিন্তু এই অবসাদের পর্বেও কবি নিজেকে লইয়াই একান্তভাবে বিব্রত ও ব্যাপৃত ছিলেন না। এই কবিতা-গুলি বিদেশে বসিয়া রচিত, আর কে না জানে আমাদের দেশে বিদেশিয়ানার প্রধান অগ্রদূত ছিলেন মধুসূদন। অথচ এই পুস্তকের ১০২টি সনেটের মধ্যে মাত্র পাঁচটির বিষয়বস্তু বিদেশীয়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে শেষ-বয়সে মধুসূদনের বিদেশীয় সংস্কৃতিতে বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল। তাহা যে আসে নাই —হেক্টর বধ-এর কথা ছাড়িয়া দিলেও—বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তনই তাহার প্রমাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট মহৎ কবিগণের আত্মপ্রকাশের সুপ্রতিষ্ঠিত মাধ্যম। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই নাকি শেকস্‌পীয়র আপন অন্তরদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। সুতরাং মধুসূদনের তদানীন্তন

হৃদয়াবস্থা সনেট-রূপে প্রকাশ পাইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো মহৎ কবি মনোজগতেও একক হইতে পারেন না আপন স্বদেশীয় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে একান্তভাবে উপেক্ষা করিয়া। তাঁহার সুদূর প্রবাসে মধুসূদনের স্বদেশ তাঁহাকে কিভাবে টানিত তাহার অজস্র নিদর্শন আছে এই সনেটগুচ্ছে। পরাধীনদেশে স্বদেশনিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে পরাধীনতার গ্লানি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, পারা সম্ভব নয়। কবি মধুসূদনকে সাধারণ বিচারে রাজনীতি-নিরপেক্ষ মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি তিনিও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে, "আমরা" নামক সনেটটি উদ্ধৃত করা যায়ঃ

আকাশ-পরশী গিরি দামি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভাবতে;
তাদের সন্তান কি হে আমবা সকলে?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবন্ধ শৃঙ্খলে?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মবকতে,
ফুটিল ধুতুবা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে?
বামন দানব কুলে, সিংহেব ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোবা কে কবে আমারে?
রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই? অমৃত-আসাবে-
চেতাইবি মৃতকল্পে? পুনঃ কি হবষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?

সহজেই চোখে পড়ে মধুসূদনের স্বদেশনিষ্ঠা কর্মবৃত্তি নহে, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকে পূজা করার হুস্বদৃষ্টিপ্রবণতা ইহাতে নাই। মধু-সূদনের স্বদেশপ্রেম মানবিকতার মূল্যবোধে মহীয়ান।

॥ দুই ॥

'মানবিকতাবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহারে আসে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় সেইসব লেখক ও পণ্ডিতগণের মনোবৃত্তিকে নির্দিষ্ট করার জন্য যাঁহারা নবজন্মের বা রেনেসাঁস-এর প্রভাবে প্রভাবিত হন। এই নূতন জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে বিধায়করূপে বিরাজমান মানবসমাজ; তাই ইহা মানবিকতা-বাদ বলিয়া খ্যাত। রেনেসাঁস ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়, কিন্তু ইহার যুগসীমা সুনির্ধারিত নহে। কবে যে ইহার সঠিক আরম্ভ ও কোথায় ইহার শেষ, তাহা লইয়া মতভেদের অন্ত নাই। কিন্তু সামাজিক অগ্র-গতির বিচারে ইহার কয়েকটি মূল অবদান, মনে হয়, তর্কাতীত। মধুসূদনের প্রায় সমকালীন মানবিকতাবাদী মার্কিন বক্তা রবার্ট ইংগারসল্ যে 'বিশ্বাস'

—ক্রীড়—প্রচার করিতেন, মনে হয় না তাহা মানিয়া লইতে মধুসূদনের কোথাও বাধিতে পারিত। তিনি বলিতেনঃ

ন্যায় আমাব একমাত্র উপাস্য,
প্রেম একমাত্র পুরোহিত,
অজ্ঞান একমাত্র দাসত্ব,
সুখ একমাত্র মঙ্গল।
সুখী হইবার সময—বর্তমান,
আর তাহার দেশ—এই পৃথিবী,
উপায়, সুখী করা অন্যকে;
জ্ঞান হইতেছে সুখী হওয়ার বিজ্ঞান।

কিন্তু ইহা তো গেল শুষ্ক মতামতের কথা। ইউরোপীয় রেনেসাঁস নিছক মতামতের ব্যাপার নহে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে ইহা অনিয়াছিল এক যুগান্তকারী উন্মাদনা। এ-উন্মাদনার প্রসার কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ও বিশাল ভূখণ্ড ব্যাপিয়া। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সাহিত্যে, গণিতে, বস্তু-বিজ্ঞানে, ইহার বিরাটত্ব চিরাঙ্কিত হইয়া আছে। এই উন্মাদনার প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে সিস্‌টিন চ্যাপেল-এ অঙ্কিত মিকায়েল অ্যাঞ্জেলোর বিরাট চিত্রকে —'আদমের নবজন্ম'। গ্রীকযুগের পর মানবদেহকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হইতেছে নবতর জ্যোতিতে; সে-দেহ অনাবৃত ও অলজ্জিত; তাহার সবল বাহু, উপবাস-অক্লিষ্ট, জীবনের ও আলোকের দিকে প্রচণ্ড আগ্রহে প্রসারিত। ঐহিক জীবনকে উপভোগ করার উদগ্র কামনা, রেনেসাঁস-এর সহজাত প্রেরণা। এই প্রেরণাই জমাট হইয়া আছে রাব্‌লে-এর তিনটি বিখ্যাত চরণেঃ

কান্নাব চেয়ে হাসিব কথা লেখাই ভালো,
কাবণ, হাসিই হচ্ছে মানুষের নিজস্ব অধিকার;
বাঁচো ফূর্তিতে।

মনে রাখিতে হইবে মিকায়েল অ্যাঞ্জেলো-র চিত্রে বা রাবলে-এর সাহিত্যে জীবন উপভোগের যে-চিত্র প্রতিফলিত, তাহা ক্লীবের নহে, বীরের। এই বীরোচিত সাহস লইয়া তখনকার মানুষ তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল অতিপ্রাকৃতের মায়াপাশকে, ভাঙিয়া ফেলিতে চার্চ-এর অত্যাচারকে, ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে মধ্যযুগের শৃঙ্খল হইতে, ও স্বাধীনভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে যুক্তি প্রয়োগের ভিত্তিতে। এই রেনেসাঁস-এর আদ্যাপীঠ ইতালী, ও তাহার পরিণত প্রকাশ ইংলণ্ডে; পঞ্চদশ শতকের ইতালীতে জন্মিয়াছিলেন লেওনার্দো, আর ষোড়শ শতকের ইংলণ্ডে শেকস্‌পীয়র।

ইউরোপের রেনেসাঁস পর্বে চেতনার ক্ষেত্রে নবসৃষ্টির যে বিপুল প্রেরণা ও সাফল্য লক্ষ্য করা যায় তাহা ছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিরাট বিলোড়নের প্রতিফলন। মানুষের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে বলা যায় উপরিতলের ব্যাপার, যাহার প্রকৃতি নিরূপিত হয় প্রধানত সামাজিক জীবনের প্রকৃতি দিয়া। আর সামাজিক জীবনের প্রকৃতি নির্ভর করে সমাজের অভ্যন্তরস্থ অর্থনৈতিক শ্রেণী

সম্পর্কের গুণাগুণের উপর। উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের ফলে শ্রেণী-সম্পর্কে কখনো থাকে এক শ্রেণীর আধিপত্য। কখনো ঘটে অন্য শ্রেণীর—এই শ্রেণীগত আধিপত্য পরিবর্তনের ফলে আসে নূতন সমাজব্যবস্থা, নূতন রাষ্ট্রসংগঠন, নূতন সমূহ-চেতনা, নূতন শিল্পসৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। রেনেসাঁস-পর্বে ইতালীতে ও ইংলণ্ডে যে অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীলতা দেখা যায় তাহার মূলে ছিল সুদৃঢ়-প্রোথিত ফিউডালী সমাজ-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করিয়া নূতন বুর্জোয়া-সমাজ প্রবর্তনের বিপ্লবী উন্মাদনা। সমাজ-ব্যবস্থায় এত বড়ো বিপ্লব ইহার পূর্বে আর ঘটে নাই, তাই ইহার সম্ভাব্যতারও তুলনা ছিল না। বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে নূতন সমাজগঠনের প্রচেষ্টা ইতালীতে আংশিক-ভাবে সফল হইলেও অর্ধপথে অবরুদ্ধ হইল। নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে ইংলণ্ডে শ্রেণীসংঘর্ষ প্রচণ্ডতর হওয়ায় ওদেশেই ধনবাদী সমাজের প্রথম স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয়। বৃহৎ শ্রম-শিল্পের প্রসার, জীবিকার্জনে ব্যক্তির বন্ধন-মুক্তি, সুতীব্র জাতীয়তাবোধ ও জনগণের প্রতিনিধিসমন্বিত গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা—মানবীয় অগ্রগতির এই প্রকাণ্ড অবদানগুলি ইংলণ্ডেই প্রথম সুস্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করে। ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব হইয়া ওঠে ভবিষ্যতে ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে ফিউডালী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। ইংলণ্ডের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান, —শেকস্‌পীয়র, বেকন ও নিউটন—আলোকবর্তিকার মতো সকল দেশের সংস্কৃতিসাধককে তাহাদের জাতীয় সংস্কৃতি-গঠনের পথ দেখাইয়া দেয়। বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কারণ ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর প্রকৃষ্টতম সাহিত্য-রূপ ইংরেজী সাহিত্যে। ফ্রান্সে হুগো ও বালজাক, জার্মানীতে গ্যেটে ও শীলার, রুশিয়ার পুশকিন ও লেরমনটভ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ইবসেন ও বিয়র্ন-সন—সকলেই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছেন ইংরেজী সাহিত্যের নিকট তাঁহা-দের ঋণ। কিন্তু কেবল সাহিত্যে নহে, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্বে ইংলণ্ডের ইতিহাস সমৃদ্ধ। ইংলণ্ডের জীবনযাত্রার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়ার ফলে মার্কস ও এঙ্গেলস্‌-এর জীবনদর্শন ও লেনিনের বিপ্লবী সাধনা পূর্ণতালাভ করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, মানব সমাজের অভীপ্সিত পূর্ণমুক্তির পথে বুর্জোয়া-বিপ্লব প্রাগ্রসর পদক্ষেপ হইলেও অসমাপ্ত স্তর। ইহাতে শ্রেণীসংঘর্ষের অবসান হয় না, শ্রেণী-আধিপত্যের হস্তান্তর হয় মাত্র। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণের নেতৃত্বের ভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া কঠোরতর শোষণের পরিচালকে পরিণত হয়। তাহার ভয়াবহ কুৎসিতরূপ প্রকটতর হয় ধনবাদ যখন প্রবৃত্ত হয় পরদেশবিজয়ে ও অনুন্নত দেশগুলিকে অবাধ লুণ্ঠনে। ইহাই ধনবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ। প্রথমত লুণ্ঠনকারীর ভূমিকা লইয়া ইংলণ্ডের ধনবাদ ভারতের ভূমিতে আসিয়া পদার্পণ করিল ও ক্রমে অখণ্ডভারতের অপ্রতিহত অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইল। ভারত হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুকুটে উজ্জ্বলতম রত্ন। ইংরেজের স্বার্থে ভারতে ধনবাদের প্রবেশ ধনবাদের বিশ্বব্যাপী প্রসারের একটি অধ্যায় ও বিশেষ জটিলতাপূর্ণ

অধ্যায়। এবং ফিউডালী ভারতের সহিত ধনবাদী ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক সংযোগের প্রত্যক্ষ ফল—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

॥ তিন ॥

ইংরেজ বণিকরূপে ভারতের নানা প্রদেশে সুপরিচিত হইলেও তাহার রাজ-রূপের প্রথম প্রকাশ বাংলাদেশে, পলাশী বিজয়ে। এ-যুগের ইতিহাসে তাই বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মার্কস যাহাকে বলিয়াছেন "একমাত্র সামাজিক বিপ্লব যাহার কথা এশিয়াতে শোনা গিয়াছে", তাহার সূত্রপাত হয় বাংলাদেশে ও পরে ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই সামাজিক বিপ্লবের প্রধান লক্ষণ, সনাতন গ্রামীণ অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য যান্ত্রিক শ্রম-শিল্পের ভিত্তিতে নূতন ধনবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন। পুরাতন ভারতের সহিত নূতন ভারতের ইহাতেই ঘটিল মূলগত ছেদ। কারণ, ভারতের ইতিহাসে অতীত যুগে যতই বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়া থাকুক না কেন, তাহার অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ধারা মোটামুটি অব্যাহত ছিল ঊনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত, ইহাই মার্কসের অভিমত। অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। তাই বলা যাইতে পারে পলাশীবিজয়ের তারিখ—১৭৫৭, আমাদের জাতীয় জীবনে যে গুণগত রূপান্তর সূচিত করে, কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের তারিখ—১৮১৭, তাহার অবধারিত ফল। এই কলেজ স্থাপনে ভারতে ইংরেজ শাসকের সদভিপ্রায় সূচিত হয় না। ইহাতে শুধুই প্রমাণ হয়, কোনো শাসক-শ্রেণী ইতিহাসের অগ্রগতিকে অর্গলিত করিতে পারে না। নিজেদের অজ্ঞাত-সারেও তাহাদিগকে ইতিহাসের উদ্দেশ্যসাধনে সহায়ক হইতে হয়। হিন্দু-কলেজ স্থাপনের ফলে, ইংরেজের অনিচ্ছা ও কৃপণতা সত্ত্বেও মার্কসের মতে ভারতে একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয় যাহারা দেশ-শাসনের উপযুক্ত ক্ষমতায় ভূষিত, ও যাহারা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত। মার্কসীয় পরিভাষায় "শ্রেণী" শব্দটির বিশেষ দ্যোতনা আছে, যাহা সাধারণ ভাষায় প্রযুক্ত 'শ্রেণী' শব্দটির সমার্থক নহে। ধনী-দরিদ্র শ্রেণী বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণী প্রভৃতি পদাংশে 'শ্রেণী শব্দটি ব্যবহৃত হয়, শিথিল অবৈজ্ঞানিকভাবে। মার্কসীয় বিজ্ঞানে 'শ্রেণী' বলিতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে লেনিন লিখিতেছেনঃ

> শ্রেণীগুলি হইতেছে জনগণের বৃহৎ বৃহৎ গ্রুপ যাহারা পরস্পর হইতে পৃথক হয় সামাজিক উৎপাদনের ইতিহাস-নির্দিষ্ট-সিস্টেমে তাহাদের অধিকৃত স্থান দ্বারা, উৎপাদনের উপায়গুলির সহিত তাহাদের সম্বন্ধের দ্বারা (যে সম্বন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ও নিয়মবদ্ধ হয় আইনসমূহে), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাহাদের ভূমিকা দ্বারা, এবং ফলত সামাজিক ঋদ্ধির যে-অংশ তাহারা পায়, তাহার পরিমাণ ও প্রণালী দ্বারা। শ্রেণী বলিতে বোঝায় জনগণের গ্রুপগুলিকে যাহাদের একটি অন্যের শ্রম গ্রাস করিতে পারে, সামাজিক অর্থনীতির নির্দিষ্ট সিস্টেমে তাহাদের বিভিন্ন স্থান অধিকারের ফলে। [লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২—৩৩]

এই সংজ্ঞা অনুসারে দেখা যায় নূতন শ্রেণীর উদ্ভব যে-কোনো দেশে যে-কোনো সময়ে হইতে পারে না। তাহার জন্য প্রয়োজন, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে এমন পরিবর্তন যাহাতে প্রচলিত শ্রেণীগুলির ভূমিকায় ভারসাম্য বজায় থাকে না, নূতন সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ভারতে ব্রিটিশ ধনবাদের অনুপ্রবেশে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়াই এদেশে নূতন শ্রেণী-সৃষ্টিও সম্ভব হইল। ভারতে প্রচলিত ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে হয়তো কোনোদিন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব হইতে পারিত। তাহাই হইত প্রকৃত ভারতীয় ধনবাদ। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাচক্রের গতিতে ভারতে ধনবাদের প্রবর্তন হইল বিদেশী শাসনের ছত্র-ছায়ায়। এই ধনবাদ কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। আর স্বাধীন দেশের ধনিকশ্রেণীও যখন জনগণের স্বার্থকে শেষ পর্যন্ত মানিয়া চলে না তখন ঔপনিবেশিক ধনিক শ্রেণীর নিকটে তাহা আশা করা, ইতিহাসের নির্দেশকে অবজ্ঞা করার নামান্তর। যে সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার উচ্ছেদ ধনবাদের অবশ্য কর্তব্য, ভারতে ব্রিটিশ ধনবাদ ও তাহার অনুচর ভারতীয় ধনবাদ কেহই তাহা সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিল না। যে নূতনশ্রেণীর উদ্ভব হইল তাহা রহিয়া গেল আধা-ফিউডাল; পুরাতন জীবনাদর্শের মোহ তাহাদিগকে অনেকাংশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুরানো অবস্থাও টিঁকিয়া থাকিতে পারিল না। সমাজের জীবনে আসিল গতিশীলতা, আসিল জাগরণ, আসিল স্বাধীনতার স্বপ্ন, আসিল পরাধীনতার গ্লানি, আসিল জ্ঞান-স্পৃহা, আসিল উন্মাদনা। এই নূতন চেতনার প্রধান পুরোহিত রামমোহন ও ডিরোজিও; এবং এই চেতনার প্রধান রূপকার—মধুসূদন।

॥ চার ॥

মধুসূদনের জীবনচরিত পড়িতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁহার পক্ষে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস অপ্রত্যাশিত আপতিক ব্যাপার। হিন্দু-কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার মত ছিল "বাংলাভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভালো", 'শিব' শব্দের বানানে লাগে 'শ' কি 'ষ', তাহাও তিনি সঠিকভাবে জানিতেন না। বাঙালী-বর্জিত মাদ্রাজ প্রদেশে বাস করিয়া, ইংরেজ মহিলার সহিত সংসার করিয়া, ইংরেজী ভাষায় কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা যশস্বী হইয়া তিনি যখন পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন সাগরদাঁড়ীতে শেখা মাতৃভাষার ভাণ্ডার তাঁহার অন্তর হইতে প্রায় অবলুপ্ত বলিলেই হয়। কিন্তু যে-সমাজে বুর্জোয়া অর্থনীতি প্রবেশ করে তাহার অন্যতম প্রধান দাবি হইয়া ওঠে মাতৃ-ভাষার বিকাশ। এই ঐতিহাসিক নিয়মের ব্যতিক্রম বাংলাদেশেও হয় নাই। রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রযত্নে বাংলা গদ্যের প্রকাশক্ষমতা জন্মের পর হইতেই ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িতে থাকে। ইহাতে সূচিত হয়, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর মনে, বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই, জাতীয়তা-বোধের সঞ্চার হইতেছিল। উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডেভিড হেয়ার-এর তৃতীয় সাংবৎসরিক স্মৃতি-সভায় অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যেন

এক নূতন যুগের সূত্রপাত করিলেন। জাতীয়তাবোধ একবার সঞ্চারিত হইলে তাহা আর শুধু গদ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। জাতীয় সংস্কৃতি-সম্পদ রচনার আগ্রহ অদম্য কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে। যে-বৎসর শুরু হয় মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাস, সেই বৎসরেই—১৮৪৮—মধুসূদনের সহধ্যায়ী সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এক সভায় ঘোষণা করেন যে স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিসাধন স্বদেশবৎসল ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য, এবং বিদেশীয় মহাকবি-গণের রচনা অমৃততুল্য হইলেও তাহা হৃদয়ের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাঃ

> "যথার্থ বলিতে কি হোমর প্লেটো ও সফোক্লিস রচিত চারুতম, নিরুপম কাব্য-রস পানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক শেকস্‌পীয়রের অমৃত-ধর্ম প্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হই, কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনাশক্তিসম্পন্ন গেটে ও সিলারের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই, তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে, সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য, বিশাল-খ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃ-সৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা। সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃত-ধারা পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে, সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে?" (উদ্ধৃতি যোগীন্দ্রনাথ বসুর "জীবন-চরিত" হইতে গৃহীত)।

ইহা হইতে কি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না যে বাংলা ভাষায় কলম ধরিবার কথা মধুসূদনের স্বপ্নেও গোচর হইবার পূর্বেই তাঁহার ভবিষ্যৎ শিল্পসৃষ্টি উপভোগ করিবার উপযুক্ত পাঠক বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল? মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসার পর যে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি মধুসূদনকে বাংলা রচনায় প্রবুদ্ধ করে তাহাদের অন্তরেই কি নিহিত ছিল না ইতিহাসের ইঙ্গিত? ধনবাদী অর্থনীতির প্রভাবে ইউরোপীয় মানবিকতার যে-আদর্শ তখনকার সমাজ-চেতনায় বাঙ্ময় হইয়া উঠিতেছিল মধুসূদনের বাংলা রচনার প্রয়াস তাহারই অনিবার্য কাব্যরূপ। বাংলায় ভালো নাটক নাই, আচ্ছা, আমিই রচনা করিব, অথবা বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজন আছে কিন্তু সম্ভাবনা নাই, আচ্ছা, আমিই তাহা সম্ভব করিব—এই ধরনের সত্য উক্তিগুলিকে মধুসূদনের অহংকৃত উচ্চাশার, অথবা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভার পরিচায়ক বলিলে ইহাদের প্রকৃত মূল্য দেওয়া হয় না। একথা নিশ্চিত মধুসূদনের যশঃ কামনা ছিল দুর্বার, আর তাঁহার প্রতিভাও ছিল দুর্লভ। সেই সঙ্গে এ-কথাও মানিতে হয় যে কেবল কামনা ও প্রতিভা দিয়াই বৃহৎ কবির সার্থকতা অর্জন করা যায় না। তাহার জন্য প্রয়োজন একদিকে অনুকূল পরিবেশ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি। তাঁহার প্রতিভাবিকাশের অনুকূল পরিবেশ মধুসূদন পাইয়াছিলেন কপোতাক্ষতীরে জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতে নয়, অথবা মাতৃভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মাদ্রাজ প্রবাসের বিজাতীয় সমাজেও নয়। সে অনুকূল পরিবেশ তিনি পাইয়াছিলেন কলিকাতায়,—ছাত্রাবস্থায় হিন্দু কলেজে ও বিশপ্‌স্ কলেজে; এবং

লেখকজীবনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজে। ফিউডাল সমাজ হইতে বুর্জোয়া সমাজের অভিবর্তনের সঙ্গে সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্রও স্থানান্তরিত হয় গ্রাম হইতে শহরে। বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রধানত নাগরিক সংস্কৃতি। কলিকাতার নাগরিকেরা তখন বাঙালী সমাজের উন্নততর অংশ, এবং বাংলা ভাষার রঙ্গমঞ্চে মধুসূদনের প্রবেশ ইহাদের আনন্দ বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশক হিসাবে। কলিকাতার সমাজই গড়িয়া তুলিয়াছিল মানবিকতার প্রথম বাঙালী মহাকবি মধুসূদনকে, যেমন করিয়া, বেন জনসন-এর মতে, সে-যুগের লণ্ডন গড়িয়া তুলিয়াছিল মানবিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকস্‌পীয়রকে।

প্রতিভার স্ফুরণে অপর প্রয়োজন, প্রস্তুতি। এ-ক্ষেত্রেও শেকস্‌পীয়র সম্বন্ধে বেন জনসন-এর মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। যতদূর জানা যায়, ইংরেজ সমালোচকগণের মধ্যে বেন জনসনই প্রথম শেকস্‌পীয়রের অলৌকিক প্রতিভা ও বিশাল নাটকাবলীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহাতীত বিশ্বাসবান ছিলেন। শেকস্‌পীয়রের মৃত্যুর সাত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত প্রথম ফোলিও-র ভূমিকায় তিনি যে-কবিতা লেখেন তাহাতেই ঘোষণা করেন যে এই কবি এক যুগের নহেন, চিরকালের। ইহা সত্ত্বেও বেন জনসন শেকস্‌পীয়রের রচনায় বহু ত্রুটি লক্ষ্য করিতেন, ও অতিরঞ্জনের সুরে একবার রায় দিয়াছিলেন যে তাঁহার রচনায় অন্তত হাজার লাইন সম্মার্জনীর অপেক্ষা রাখে। সুশিক্ষিত কবি বেন জনসন শেকস্‌পীয়রের প্রতিভাকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার অশিক্ষিত স্খলনকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ছাত্রাবস্থা হইতে কবিযশঃপ্রার্থী মধুসূদন নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে বেন জনসন-এর মানদণ্ডে পরীক্ষাও তিনি সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। রিচার্ডসনের অতুলনীয় শিক্ষার অনুপ্রাণনায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমৃদ্ধতম কাব্যের সহিত তাঁহার যোগ হয় প্রাণময়। ইহার পর বিশপ্‌স্‌ কলেজে শিক্ষার সুযোগে তিনি আয়ত্ত করেন লাতিন, গ্রীক ও হিব্রুভাষা। রেনেসাঁস-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ইউরোপে যে-জ্ঞানোন্মাদনা—বিদ্যার পুনরুজ্জীবন—দেখা দিয়াছিল স্বীয় প্রতিভাবলে মধুসূদন এ-দেশে বসিয়া তাহার অনুকম্পন অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। রেনেসাঁস-এর ফলে ইতালীয় ও ফরাসী ভাষায় যে-কাব্যসম্পদ সৃষ্টি হইল, প্রত্যক্ষ সংযোগে তাহাকেও আত্মসাৎ করিতেও তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁহার মতে, এক-একটি ইউরোপীয় ভাষায় অধিকারলাভ করা আর এক-একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করা সমান। তাঁহার ধারণা ছিল কোনও ভাষায় কবিতা রচনার ক্ষমতা না জন্মিলে তাহাতে প্রকৃত অধিকার জন্মিয়াছে, এ-কথা বলা যায় না। মাদ্রাজে থাকিতে তিনি সংস্কৃত ও তামিল ভাষা শিক্ষায়ও মনোযোগ দিয়াছিলেন। এ হেন প্রস্তুতি লইয়া আর কোন কবি বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন? তাঁহার জীবনের সমস্ত অমিতাচার তাঁহার কাব্যচর্চার উচ্চাদর্শকে কোনোদিন ব্যাহত করিতে পারে নাই। পারে নাই যে, তাহার কারণ, তাহাদের উভয়ে একই বৃক্ষের ফল—ইউরোপীয় রেনেসাঁস। জ্ঞান ও কল্পনার প্রাচুর্য, শক্তি ও উপভোগের ঐশ্বর্য—সমুদ্রগামী নাবিকের সম্মুখে চির-অপসৃয়মান দিগন্তরেখার মতো, রেনেসাঁস—চিত্তকে নিরন্তর আকর্ষণ

করিত। কোনো বাধাই অলঙ্ঘ্য, কোনো লক্ষ্যই অভেদ্য বলিয়া স্বীকার করা তখন ছিল চিন্তার অযোগ্য। তাঁহার মানসিক গঠনে এই রেনেসাঁস-বিভাবের সঞ্চারের ফলেই প্রায়-অবাঙালী মধুসূদন বাংলা ভাষায় অভূতপূর্ব কীর্তি-সাধনের দায় অঙ্গীকার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

প্রায়-অবাঙালী কিন্তু সম্পূর্ণ বিজাতীয় মধুসূদন ছিলেন না। কারণ, কোনো ভাষায় উচ্চশ্রেণীর কাব্য রচনা করিতে গেলে অপরিহার্য প্রয়োজন সেই ভাষার প্রাণশক্তির সহিত সহজাত পরিচয়। বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া সাময়িক খ্যাতি ও পাঠকের বিস্ময় অর্জন করা যায়, স্থায়ী আসন অধিকার করা যায় এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগে বৃহৎ-মাত্রায় আন্তর্জাতিক সংমিশ্রণের আনুকূল্যে হয়তো বিদেশী ভাষায় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ বা ঘটনাপূর্ণ উপন্যাস লিখিয়া সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের যুগে বাংলাদেশে সে-সম্ভাবনা ছিল অভাবিত। সে-যুগে একমাত্র বাংলাভাষাই মধুসূদনের প্রতিভার উপযুক্ত বাহক হইতে পারিত। তাহার জন্য অবশ্য এ-ভাষাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। কারণ যে-ভাবাবেগের আধার হইতে হইবে এ-ভাষাকে, তাহা যে পূর্বতন আধেয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মধুসূদন জানিতেন যে তিনি একজন "সাহিত্যিক বিপ্লবী"। বিপ্লবের সাফল্যের জন্য বিপ্লবীকে গড়িয়া লইতে হয় নিজস্ব হাতিয়ার—অতীতের ঐতিহ্য তাহাকে ইহা উপহার দেয় না। আবার, প্রকৃত বিপ্লবী অতীতের ঐতিহ্যকে অবজ্ঞাভরে পদদলিত করে না, তাহাকে গ্রহণ করিয়া অতিক্রম করে। ইতিহাসের অনেক পর্বে এ-অতিক্রমণ হয় মৃদুগতি, কিন্তু এমন পর্বও আসে যখন তাহাতে আসে গুণগত পরিবর্তন, ক্রান্তিকারী উল্লম্ফন; যখন আধেয়ের প্রভাবে আধার হয় সাবলীল। আবেগের উপযুক্ত বাহন হইবার নির্দেশে ভাষা যেন নবকলেবর পরিগ্রহ করে, দেখা দেয় প্রায়-অচেনা মূর্তিতে, উৎপাদন করে নব নব বিস্ময়। রেনেসাঁস-যুগে এহেন রূপান্তর ঘটিয়াছিল ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায়। মধুসূদনের প্রতিভা ভারতে নবাগত নূতন বুর্জোয়া চেতনার শংখধ্বনি হইয়া বাংলা ভাষার মজা খাতে বহাইয়া দিল নূতন প্রাণকল্লোল, সৃষ্টি হইল 'মেঘনাদ বধ'-এর বহুধ্বনিত আরাব, মধুসূদনের অপূর্ব কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

॥ পাঁচ ॥

লক্ষ্য করিতে হইবে, মধুসূদনের ছন্দ-বিপ্লব বাংলা ভাষার গতিবেগকে খরতর ও অগভীরতাকে গভীরতর করিয়া ধারণ ক্ষমতাকে প্রগাঢ়তর করিল, কিন্তু তাহার দুই কূল প্লাবিয়া বহিয়া গিয়া অনাচারের তাণ্ডব ঘটিতে দিল না। পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের কাঠামোকে দৃঢ়মুষ্টিতে আঁটিয়া ধরিয়া তিনি তাহাতে ঢালিয়া দিলেন যতিস্থাপনের নানা কৌশল, ভাবস্পন্দনের অবাধ মুক্তি। বাংলা পয়ার তাহার চিরাচরিত একতাল ছাড়িয়া নানা তালে নাচিয়া উঠিল; পদ্যছন্দ তাহার মাত্রাজ্ঞান সম্পূর্ণ নিখুঁত রাখিয়া গদ্যছন্দের মতো কথ্যভাষার নিকটবর্তী

হইয়া আসিল। এগুণ অর্জন করিতে না পারা পর্যন্ত অমিত্রছন্দ বৃহৎ কাব্য-রচনার, নাটক বা এপিক রচনার উপযুক্ত মাধ্যম হইতে পারে না। এই ছন্দ বিপ্লবে ইংরেজীর ব্ল্যাঙ্ক ভার্স-ই ছিল মধুসূদনের মডেল। প্রতি লাইনে পাঁচ পর্বের কঠিন নিগড় পায়ে বাঁধিয়া তবে সে-ছন্দ অন্ত্যযমকের মোহ ভাঙিতে পারিয়াছিল। আর মেরুদণ্ড যে-পরিমাণে শক্তিশালী থাকে সেই পরিমাণে যেমন জিমনাস্ট চমকপ্রদ শারীরিক কসরত দেখাইতে পারে, সেইরূপ শেকস্‌পীয়রের শেষ পর্বের নাটকগুলিতে এই পঞ্চপার্বিকতা ভাঙি' ভাঙি' করিয়াও একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই। দ্রুত সংলাপশীল নাটক না লেখায়; বাংলা অমিত্রছন্দের এ-সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া মধুসূদন পাশ কাটাইতে পারিয়াছেন। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে কি করিয়া শেকস্‌পীরীয় নাটকের ভাষার উপযোগী করা যায়—বাংলার কোনো কবি আজও এ-কর্তব্যে মন দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। নাটকীয় ভাষাকে কথ্য-রীতির অনুগামী করিতে হইলে, আমাদের সামাজিক সম্পর্কে সম্বোধনের যে তিনটি রূপ প্রচলিত আছে—আপনি, তুমি ও তুই—ইহাদের তিনটিকেই ব্যবহার করিতে হইবে, কোনো একটি বাদ দিলে ভাষা পঙ্গু অথবা ভাব প্রকাশ অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। অথচ, বাংলা নাটকে বা কাব্যে, ছন্দে তুমি-র প্রচলনই সর্বাধিক সামাজিক সম্পর্ক নির্বিশেষে; তুই-র ব্যবহার নিষিদ্ধ না হইলেও যথাসাধ্য এড়াইয়া চলা হয়; আর আপনি-র প্রয়োগ একেবারে নাই বলিলেই চলে। মধুসূদন যে এই সমস্যায় একেবারে অনবহিত ছিলেন না, তাহার অন্তত একটি উদাহরণ আমার স্মরণে আসিতেছেঃ পঞ্চবটীবনে যোগী-বেশ রাবণকে সীতা বলিতেছেন,

> অজিনাসনে বসি,
> বিশ্রাম লভুন প্রভু তরুমূলে;

কিন্তু তাহার পরের ছত্রেই আছে;

> ত্বরায় আসিবে ফিরে রাঘবেন্দ্র যিনি,
> সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।

এই উদাহরণ হইতে বোঝা যায়, বাংলা ভাষার প্রকৃতি লইয়া কত সন্তর্পণে মধুসূদন তাঁহার পরীক্ষা চালাইতে ছিলেন। ছন্দ-বিপ্লবের নামে ভাষা লইয়া ছিনিমিনি খেলার দুরন্ত নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসে নাই—যেমন বসিয়াছিল ধনবাদী সমাজের ভাঙন দশায় ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে সাম্প্রতিকতার নামে সুর্‌রেয়ালিস্ত্‌দের। ভাষার বোধ্যতা নির্ভর করে প্রধানত দুইটি জিনিসেঃ তাহার মৌলিক শব্দভাণ্ডার, ও তাহার বাক্যের অন্বয়-শৃঙ্খলা, ইহাই স্তালিনের শিক্ষা। তিনি আরো শিখাইয়াছেন, ভাষায়-রচিত সাহিত্যে ঘটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে; কিন্তু ভাষার ঘটে কালগত বিবর্তন, যেহেতু ভাষা শ্রেণী-সংগ্রামের নিয়মাধীন নহে, যেমন নহে, বিজ্ঞানের ফরমুলা বা উৎপাদনের যন্ত্রাবলী। বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা অবশ্য ইহাদিগকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিতে পারে। মধুসূদনও প্রচলিত বাংলাভাষাকে ব্যবহার করিলেন তাঁহার বিপ্লবী কাব্যপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে; তাহার শব্দসম্পদ যথাসাধ্য বাড়াইলেন কাব্যরসের প্রয়োজনে; অন্বয়ের শৃঙ্খলাকে যথাসাধ্য বিচলিত না করিয়া নূতনত্ব আনিলেন

গৌণভাবে। এই জন্যই মধুসূদনের বাংলাভাষা পুরাতন হইয়াও নূতন; তাহা স্থানে স্থানে কঠিন হইলেও অবোধ্য নহে। অভিধান বা পুরাণের সাহায্যে তাহার অর্থবোধে বাধে না। সুর-রেয়ালিস্ত্‌দের ভাষার মতো, তাহা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ইংগিতে ও অনুষঙ্গে বিভ্রান্তিকর নয়; তাহা পাণ্ডিত্যের সাজে সজ্জিত হইয়াও জনসাধারণের বোধ্য ভাষা হইবার দাবি করিতে পারে। ভাষার এই প্রসাদ গুণেই মধুসূদন গোষ্ঠীবিশেষের কবি নহেন, বাঙালী পাঠক-সমাজের কবি। তবুও যে মধুসূদনের ভাষায় সেকালের বাঙালী এত নূতনত্বের আস্বাদ পাইয়াছিল, তাহার কারণ, ইহা ছিল এক নূতন সংস্কৃতির ভাষা, নূতন চেতনার প্রকাশ। এই চেতনার বসন হইয়া মধুসূদনের ভাষা-প্রয়োগ বঙ্গভারতীকে গ্রাম্য সাহিত্য হইতে নাগরিক সাহিত্যে, ও তথা হইতে বিশ্ব-সাহিত্যে আসনগ্রহণের গৌরবের পথে শুভযাত্রা করাইয়া দিল।

॥ ছয় ॥

বিশ্বসাহিত্য বলিতে ইদানীংকাল পর্যন্ত যাহা বোঝাইত তাহা হইতেছে বিশ্ব-ব্যাপী ধনবাদের সাংস্কৃতিক রূপ। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'সাম্যবাদীর ঘোষণায়' লিখিত আছেঃ

> পুরাতন অভাবের স্থলে, দেশের উৎপাদন দিয়া যাহা পূরিত হইত, আমরা এখন দেখি নূতন নূতন অভাব, যাহার পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় দূর দেশে ও ভূখণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের। পুরাতন আঞ্চলিক ও জাতীয় নির্ভূতির ও স্বয়ং-পূর্তির স্থলে আমাদের সংযোগ হয় সর্বদিকে, অমরা পাই জাতিগুলির বিশ্বব্যাপী অন্যোন্য-নির্ভরতা। আর, পণ্য উৎপাদনে যে অবস্থা, মানস উৎপাদনেও তাহাই। জাতি বিশেষের মানস-সৃষ্টি সাধারণ সম্পদ হইয়া ওঠে। জাতীয় একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণতা উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং বহুসংখ্যক জাতীয় ও আঞ্চলিক সাহিত্য হইতে উদ্ভুত হয় এক বিশ্বসাহিত্য।
>
> উৎপাদনের যন্ত্রগুলির দ্রুত উন্নতি দিয়া, সংযোগের উপায়গুলিকে অতিমাত্রায় সহজ করিয়া, বুর্জোয়া শ্রেণী সকল জাতিকে, এমন কি বর্বরতমকেও, টানিয়া আনে সভ্যতার ক্ষেত্রে। পণ্যদ্রব্যের শস্তা দরকে ইহা ব্যবহার করে ভারি কামানের মতো সমস্ত চৈনিক প্রাচীরকে চূর্ণ করিতে, বিদেশীর নিকট পদানত হইতে অনুন্নত জাতির যে প্রগাঢ় দৃঢ়তাপূর্ণ ঘৃণা তাহাকে জোর করিয়া নোয়াইতে। ইহা সকল জাতিকে বাধ্য করে—অন্যথায় ধ্বংস—উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইহা তাহাদিগকে বাধ্য করে, বুর্জোয়া মতে যাহা সভ্যতা তাহাকে নিজেদের মধ্যে প্রবর্তন করিতে, অর্থাৎ নিজেরা বুর্জোয়া হইয়া উঠিতে। এককথায়, ইহা সৃষ্টি করে এক নূতন জগৎ, আপন মূর্তি অনুসারে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া বাংলা রচনায় প্রথম হাতেখড়ি দিবার সময় হইতেই কেন মধুসূদন বিদেশী আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন। এ কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত প্রবণতার

চরিতার্থতা নয়, ভারতে নবাগত বুর্জোয়া অর্থনীতির ইহাই ছিল আন্তরিক দাবি। বাংলা রচনায় তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা নাটকে ও পূর্ণ পরিণতি এপিকে, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। নাটকে ও এপিকে জন্মগত যোগসূত্র আছে। একই সমাজব্যবস্থা উভয় প্রকারের সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল। ব্যাপক ও গভীর সামাজিক বিলোড়ন ব্যতিরেকে নাটকে বা এপিকে প্রাণসঞ্চার হয় না; ইহাদের মহত্ত্ব রচয়িতার কলাকৌশলের উপর একান্ত নির্ভরশীল নয়। 'আর প্রকরণ হিসাবে নাটক ও এপিকে সমগোত্রীয়তা গ্রীক আমল হইতে স্বীকার করা হইয়াছে।' ট্র্যাজেডির সহিত এপিকের সম্বন্ধ-বিচার-প্রসঙ্গে আরিস্টোটল লিখিয়াছেনঃ

> হোমরই একমাত্র কবি যিনি এপিক কাহিনীর যথার্থ অনুপাত জানেন; কখন বর্ণনা করিতে হইবে, আর কখন চরিত্রগুলিকে নিজের কথা নিজে বলিতে দিতে হইবে। অন্য কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরা গল্প বলিয়া যান সোজাসুজি, নাটকীয় অংশ থাকে খুব কম ও দূরে দূরে ছড়ানো। হোমর, প্রায় ভূমিকা না করিয়াই, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে মঞ্চ ছাড়িয়া দেন—নর ও নারী, যাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে।

হোমর ছিলেন ইউরোপের লিখন-পূর্ব শ্রুত যুগের কাহিনীকার এপিক কবি। শ্রুত-এপিকের প্রধান উপজীব্য বীররস; ব্যক্তিগত বীরের সাহস ও খ্যাতি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে-জগতে আর কিছুই ছিল না। বীরের ছিল না কোনো সামাজিক কর্তব্য, কোনো নীতিবোধেরও তাহার প্রয়োজন নাই। একমাত্র বীর্যই তাহার কাম্য। ইতিহাসের বিচারে এ-আদর্শ সেই সমাজেই সম্ভব যাহা আদিম কৌম জীবনের অনড় আচার-অনুষ্ঠান ভাঙিয়া বাহির হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না কেন হোমেরীয় এপিক মধুসূদনের কবি-জীবনে এত গভীর রেখাপাত করিতে পারিয়াছিল। বাংলাদেশের যে-যুগের তিনি বাণী-মূর্তি, তাহাও যে ছিল প্রচলিত সনাতন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিঘাতের যুগ। তবুও হোমেরীয় জীবনাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। হোমরের পর ইতিহাসের ধারা বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সহিত বীরত্বের আদর্শেও ঘটিয়াছে পরিবর্তন। বীরত্বকে আর সামাজিক কর্তব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। বীর তিনিই যাঁহার শৌর্যবীর্য বৃহৎ রাষ্ট্রীয় গৌরব গঠনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। বীরত্বের এই নূতন আদর্শ ভার্জিলের মহাকাব্যে প্রতিফলিত, রচনা হিসাবে যে-মহাকাব্য আবার লিখিত এপিকের আদর্শস্থল। লিখিত এপিকে ঘটনার গ্রন্থন দৃঢ়তর ও ভাষার কারুকার্য অনেক বেশি আত্ম-সচেতন। বিশেষণের পুনরুক্তি প্রমুখ হোমেরীয় কাব্যলক্ষণ যাহা লিখিত এপিকে বজায় রাখা হইয়াছে তাহার মূল কারণ প্রয়োজনীয়তা নয়, আদি কবির প্রতি শিষ্যোচিত প্রণতি। ভার্জিলের শব্দচয়নে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বহুল-প্রযত্ন কারুশিল্প মধুসূদন অনুসরণ করিয়াছেন, ও সেইসঙ্গে ভার্জিলের দৃষ্টান্তে মধুসূদনও হোমরকে অর্ঘ্য দিতে কার্পণ্য করেন নাই।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর ফলে নানাদেশে জাতীয় ভাষাগুলির বিকাশ শুরু হইল। ইতালীয় ফরাসী পর্তুগিজ ইংরেজী প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষা গ্রীক ও লাতিনের কৌলীন্যকে সম্মান করিয়াও, স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে লাগিল জাতীয় চেতনার বাহন হিসাবে। নূতন ভাষার কবিদের উপর ভার্জিলের প্রভাব ছিল অমেয়। হোমরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইলেও, তাঁহার প্রভাব অনুভূত হইত ভার্জিলেরও পূর্বগামী হিসাবে। বীরত্বের যে সামাজিক আদর্শ ভার্জিল গৌরবিত করিয়াছিলেন তাহা ছিল রেনেসাঁস-সমাজের ভবিষ্যৎ-বিকাশের সহায়ক। কিন্তু ভার্জিলের কাল হইতে রেনেসাঁস যুগের মধ্যেও কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে ভূকম্পনকারী পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর হইয়াছে প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণী হইতে বুর্জোয়া শ্রেণীতে। ভার্জিলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই অনুকরণে নবীন যুগের মহাকবিরা নূতন যুগচেতনাকে কাব্যরূপ দিতে প্রস্তুত হইলেন। ঈনিয়াস-এর পুরাকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ভার্জিল গাহিয়া গিয়াছেন তাঁহার সমকালীন রোমক সম্রাট অগস্টাস-এর প্রশস্তি। তাস্‌সো ও মিল্টন ভার্জিলেরই মতো আপন আপন দেশের ও যুগের বীরত্ব কাহিনীকে মহাকাব্যকারে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাস্‌সো-র এপিক, জেরুসালেমের মুক্তি-র প্রকৃত উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয়দের সহিত অ-খ্রীষ্টীয়দের সংঘর্ষে খ্রীষ্টীয়দের বীরোচিত শিভালরি বর্ণনা করা। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ফেরারা-র দ্বিতীয় আলফন্সোই তাঁহার মনোনীত নায়ক। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিনিকটে বর্তমান। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে নায়ক করিলে কল্পনার পক্ষকে ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্ঠার গুরুভারে ভারাক্রান্ত করা হয়। তাই তাস্‌সো বিষয় হিসাবে নির্বাচন করিলেন প্রথম ক্রুসেডের স্বল্প-পরিচিত ইতিহাস, যাহার বর্ণনায় কবির কল্পনা পাইবে অবাধ স্বাধীনতা, অথচ যাহাতে আলফন্সোর পূর্বপুরুষকে দেখানো যাইবে বর্তমানের অভীপ্সিত গুণাবলীর মূর্তিমান বিগ্রহের মতো।

ভার্জিলের অন্যতম শিষ্য মিল্টনও ছিলেন তরুণ বয়সে ক্রমওয়েল-এর উৎসাহী ভক্ত ও ইংলন্ডে পিউরিটান কমনওয়েল্‌থ প্রতিষ্ঠাপনের অতন্দ্রিত যোদ্ধা। ক্রমওয়েলীয় কমনওয়েল্‌থ তাঁহার অন্তরে যে আশা ও উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল, ও তাহার ব্যর্থতায় রাজবংশের পুনরাগমনে জাগিয়াছিল যে ক্ষোভ ও হতাশা —প্যারাডাইস লস্ট রচনায় ইহারাই ছিল কবির অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপাদান। এবং মিল্টন ইহাদেরই প্রক্ষেপণ করিয়াছেন স্বর্গমর্ত্যনরকের পরিবেশে। মানবজাতির আদি-পিতার নৈতিক পতনের সহিত যুক্ত করিয়া তাঁহার মনোভাবকে দিয়াছেন বিশ্বব্যাপী সর্বজনীনতা। ঈনিয়াস যেমন রোম সাম্রাজ্যর, গফ্রেদো খ্রীষ্টীয় শিভালরি-র, অ্যাডাম সেইরূপ সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধি বলিয়া কল্পিত। হোমেরীয় এপিকে কাহিনীকার গল্প বলিয়াই পরিতৃপ্ত, তাঁহার সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে কাহিনীর নাটকীয়ত্ব ও সৃষ্ট চরিত্রের অসামান্যতার উপর। কিন্তু নূতন এপিকের দায়িত্ব হইল ইহার সহিত কালোপযোগী শিক্ষার যোজনা করা। সে যোজনা স্পষ্ট হইয়া পড়িলে কবিত্বের হানি হয়। তাই লিখিত এপিকে প্রয়োজন হয় এমন অলংকরণের যাহাতে এই নীতিপ্রচার অরুচিকর না হয়। এইরূপ গোপনতায় কবিদের লজ্জার কিছুই নাই। তাস্‌সো লিখিতেছেনঃ

যদি দেখি ছোট শিশু অসুখে পীড়িত,
ঔষধের পাত্র মুখে লাগাই মিষ্টতা
যাহাতে লাঘব হয় স্বাদের তিক্ততা,
বঞ্চনায় পানে, থাকে বঞ্চনে জীবিত।

এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় প্রকারের এপিকের ভিতর ছিল একটি গভীর মিল—এপিক-কাব্যে মনুষ্যচরিত্রের ক্ষুদ্রতার কোনো স্থান নাই, জীবনের বীরোচিত উন্নততর হর্ষ ও শোক জয় ও পরাজয় প্রদর্শন করাই এপিক কবির মূল প্রেরণা। মধুসূদনের জীবনীপাঠে জানা যায় তাস্‌সো ও মিল্টনকে তিনি কি গভীর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। উচ্চাশী কবি তিনি, তাঁহার ধারণা ছিল কবিত্বে তাস্‌সো-র সহিত প্রতিযোগিতা যদি বা সম্ভব হয়, মিল্টনের কবিতা স্বর্গীয়, নরলোকে তুলনা-রহিত। বনভূমির নিস্তব্ধ নির্জনতায় সিংহের গভীর গর্জনের সহিতই তুলনীয় ছিল, মধুসূদনের মতে, মিল্টনের কবিকণ্ঠ।

॥ সাত ॥

মিল্টনেরও কয়েক শতাব্দী পরে মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলাদেশের কাব্যক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে ইতিহাস ধাবিত হইয়াছে দ্রুততর বেগে, ধনবাদ আপন বিস্তারের তাগিদে হইয়া উঠিয়াছে, গার্‌গান্‌তুয়া-র মতো, স্ফীতকায় ও উদরপরায়ণ; উৎপাদক-দেশের সীমানায় আর তাহাকে আঁটিয়া রাখা যায় না। চাই তাহার অবাধ বাণিজ্য ও অন্তহীন উদ্বৃত্ত-মূল্য, ও তাহারই সংরক্ষণে চাই পরদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা। একদিন যাহার কণ্ঠে ছিল মুক্তির উদাত্ত আহ্বান, হস্তে ছিল ন্যায়ের শানিত খড়্গ, এখন তাহার বাণী হইল শাসনবিধি, হস্তে উঠিল রাজ-দণ্ড। ক্রমওয়েল-এর পর হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধির ইতিহাস। পলাশীর বিজয়ই তাহাকে সুযোগ দিল সূর্যাস্তহীন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইবার। ভারতের ভূমিতে ব্রিটিশ ধনিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় উদ্ভব হইল এক জটিল পরিস্থিতির। একদিকে তাহা জাগাইয়া তুলিল দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার অচলায়তন হইতে মুক্তি পাইয়া উন্মত্ত আকাশের তলে বিচরণ করিবাব কামনা, ফরাসী বিপ্লবের ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণীও এদেশের তটে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল; অন্যদিকে চাপিয়া বসিল বিদেশী শাসন ও শোষণ, ভারতের অন্তরাত্মা যেন দেশ ছাড়িয়া বিদেশে বন্দী। এই পরিস্থিতিকে যে কবি কাব্যরূপ দিবে তাহার পক্ষে একটি সুস্থ সবল অখণ্ডিত মনোভাবকে আত্মস্থ করা অসম্ভব। বাস্তব পরিবেশের খণ্ডিত অবস্থা তাহার সংবেদনশীল চিত্তকেও খণ্ডিত না করিয়া পারে না। মধুসূদনের সমসাময়িক সমাজে তাই একদিকে ছিল উল্লাস —জাতিভেদ, বর্ণভেদ, নরনারীর অধিকারের বিভেদ প্রভৃতি চিরাচরিত অনাচারের শাসন হইতে মুক্তির উৎফুল্ল প্রত্যাশা; অন্যদিকে বিদেশীশাসকের ঔদ্ধত্য, নির্মম হৃদয়হীনতা, নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতিতে জাতীয় আত্ম-সম্মানে প্রচণ্ড পদাঘাত। যে ইংরেজ কলেজে পড়ায় বাইরন ও মিল্টন, সেই

ইংরেজ সামাজিক জীবনে বাঁচাইয়া চলে 'বাবু'-দের ছোঁয়াচ। দেশের শাসন-যন্ত্রে শাসিতের নাই বিন্দুমাত্র অধিকার, জীবনের উন্নতি পথে প্রতিভার নাই কোনো স্বীকৃতি। সে যুগের শিক্ষিত বাঙালী বুর্জোয়া সংস্কৃতির আস্বাদনে মনোজগতে পায় বিস্তার আর বস্তুজগতে বন্ধনরজ্জু। তাই এ-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ঘোষণা করেন।

গাইব, মা, বীরবসে ভাসি, মহাগীত;

যদিও তিনি অন্তরের অন্তরে জানেন যে ইহা প্রকৃতপক্ষে বীররসাত্মক হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার বন্ধুকে পত্রযোগে জানাইতে কুণ্ঠিত নহেন, "ভয় পেয়ো না, বন্ধু, আমার পাঠককে আমি বীররস দিয়ে বিরক্ত করবো না।" এ হেন যুগাবস্থায় ইউরোপীয় মহাকাব্যের সম্পূর্ণতা অর্জন করা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, এ-বোধ মধুসূদনের ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদ বধ-কে এপিক না বলিয়া বলিতেন "ক্ষুদে এপিক"; এবং ইহার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও স্থির করিয়াছিলেন তিনি আর কখনো এপিক লেখার চেষ্টাও করিবেন না। অনেক দরদী পাঠক, অনেক কৃতী সমালোচক 'মেঘনাদ-বধ' পড়িয়া যে অতৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন ঘটনাগ্রন্থনে ও চরিত্রচিত্রণে কবির দ্বিধাগ্রস্তভাব দেখিয়া, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কবিচিত্তের অস্থিরতায় বা কল্পনাশক্তির দারিদ্র্যে নয়; তাহা পাওয়া যায় বিদেশী শাসকের অনুকম্পায় ফিউডাল ভারতের ঘনঘোর অন্ধকারে বুর্জোয়া চেতনার স্তিমিত দীপশিখার প্রথম প্রজ্বলনের অনিশ্চিত শিহরণে। ভারতে নবাগত বুর্জোয়া-চেতনার অবস্থা তখন নবজাত শিশুর মতো, 'মেঘনাদবধ' তাহার প্রথম সবল চিৎকার-ধ্বনি। তাহার অসহায় পরনির্ভরতার মধ্যেও তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে ইউরো-পীয় নবজন্মের অদম্য আকুতি।

॥ আট ॥

'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 'সাহিত্যের কেবল ভালোমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেই সঙ্গে তাহার একটা বিকাশের প্রণালী, তাহার একটা বৃহৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ দেখিবার আগ্রহ জন্মে।' তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন 'আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খামখেয়ালি ব্যাপার নহে। ইহা বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন।' বলা বাহুল্য, এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথেরও অর্জন করিতে হইয়াছিল বহু সাধনায়। তরুণ বয়সে 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে তিনি যে উগ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার উগ্রতা সত্ত্বেও তাহাতে তীক্ষ্ণ সাহিত্যরুচির অবিসংবাদিত সাক্ষ্য ছিল। কিন্তু ছিল না তাহাতে এই পরিণত বিচারবুদ্ধি। কেবল রুচির উপর নির্ভর করিয়াই যে প্রকৃষ্ট সমালোচনা লেখা যায় না, উল্লিখিত উগ্র প্রবন্ধটি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। বিচারবুদ্ধি বাড়িবার ফলে তিনি ইহাকে অকুণ্ঠভাবে প্রত্যা-হার করেন—সাহিত্যিক সততার এই উদাহরণও আমাদের পক্ষে অবিস্মরণীয়।

'মেঘনাদ বধে'র বৃহৎ ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া যাইবে উক্ত 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধেই।

> "মেঘনাদ বধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্ম-বিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে-ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য, ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পবান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র-আত্মীয় স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনো মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্র-তীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধা-ভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

কাব্য হিসাবে 'মেঘনাদ বধে'র মর্মকথা ইহা অপেক্ষা সুন্দর করিয়া বলা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। মেঘনাদ বধের মূল দ্বন্দ্ব যে ধর্মভীরুতার সহিত ধর্ম-বিরোধিতার, রবীন্দ্রনাথ তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। রাবণ ধর্ম-দ্রোহী বলিয়াই মধুসূদনের মতে চমৎকার লোক, গ্র্যান্ড ফেলো; রাম ও তাহার চেলা চামুণ্ডাদের তিনি ঘৃণা করিতেন, অন্য কোনো দোষে নহে, কেবল তাহারা দেবতাদের মুখাপেক্ষী ছিল বলিয়া। দেবতারাই যে ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থার কল্পনাপুষ্ট প্রতিনিধি। বস্তুবাদী সমালোচকের দৃষ্টিতে এই বিরোধ ইতিহাসের আমোঘ নিয়মেরই ফল। ফিউডালবাদের সহিত বুর্জোয়াবাদের সংঘাত বাধিলেই শুরু হয় এই বিরোধিতা। মার্কসবাদের মতে, ধর্মের সমা-লোচনাই সকল সমালোচনার আদি উৎস। আবার, মধুসূদনের পক্ষে রাম-বিদ্বেষী হওয়ার অর্থ ব্যক্তিগত হিন্দু ধর্মবিদ্বেষ বোঝায় না। হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তবে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডে যাইবার প্রলোভনের কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, খ্রীষ্টধর্মকে তিনি ভাবিতেন সভ্যতার বাহক—সিভিলাইজিং এজেন্সি। এই নূতন সভ্যতার আলোকে তিনি

হিন্দু পুরাণের দেবদেবীদের একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া দেখিলেন নূতন চোখে—রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় চিত্রকরেরা ও ভাস্করেরা যেমন দেখিতেন খ্রীষ্টান ধর্মের কাহিনীগুলিকে। ধর্মের আচ্ছাদনে ঐহিকতার প্রকাশে তাঁহারা ছিলেন অগ্রণী। হিন্দু পুরাণের প্রধান চরিত্রেরা তাই মধুসূদনের দৃষ্টিতে তখনকার সামাজিক জীবনের নানাশক্তির আধার বলিয়া প্রতীত হইল। রাবণের রাজধানী সৌধকিরীটিনী লঙ্কা ছিল তাঁহার কল্পনায় বুর্জোয়া সভ্যতার কেন্দ্র, রাম-পরিচালিত ফিউডালশক্তি যাহাকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে চাহিতেছে। পরাধীন দেশের কবি হিসাবে এই আক্রান্ত দেশের প্রতিটি চরিত্রের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত মমতা। অপরদিকে রামের পক্ষের কাহারো প্রতি তিনি সুবিচার করিতে পারেন নাই। লক্ষণের প্রতি তাঁহার যে টান ছিল না তাহা নহে, কিন্তু কেবল রামের অনুজ বলিয়াই সংকট মুহূর্তে তাহাকে হীনচিত্ত করিয়া আঁকিতে তাঁহার বাধে নাই। বিভীষণ তো দস্তুরমতো বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের কালে দেশাত্মবোধ বাংলা দেশের চেতনায় ছিল না; ছিল কেবল ধর্মে অনুরক্তি ও পারিবারিক বাধ্যবাধকতা। দেশাত্মবোধ একান্তভাবে বুর্জোয়া চেতনার ফল, যাহা মধুসূদনের যুগে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম উন্মেষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ যে কবির প্রিয় চরিত্র ও তাঁহার কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাহার কারণ, একমাত্র তাহার চরিত্রই বিশুদ্ধ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। রাবণ পিতা হইলেও রাষ্ট্রাধিপতি, সুতরাং পাপপুণ্য ইন্দ্রজিতের বিচার্য নহে। এই সম্বন্ধ পিতাকে পরমং তপঃ বলিয়া ভাবা নয়। দেশ যখন শত্রুবেষ্টিত, তখন রাষ্ট্রনায়কের নির্দেশ তর্কাতীত, এই নূতন মূল্যবোধ তাহার চরিত্রে সমুজ্জ্বল। প্রমীলার সহিত তাহার সম্বন্ধও ফিউডাল যুগের স্বামী-স্ত্রীর মতো নহে, রামসীতার মতো নহে। সীতা পতিপরায়ণতার আদর্শ নারী, পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গিতে। সীতা রামের সহধর্মিণী কিন্তু সহকর্মিণী নহেন। মেঘনাদ ও প্রমীলা, উভয়ের যোগ বিবাহের যোগের চেয়ে অনেক গভীর। এ-যোগের মূলে আছে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ পরস্পরের উপযোগিতায়; বীরের পত্নী বীর নারী। নারী হইয়া স্বাধীনা, মুক্তগতি, শৌর্যশালিনী, এ চিত্র বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম রূপায়িত হইল। এই জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন বিচক্ষণ পাঠকের মতে 'মেঘনাদ বধে'র তৃতীয় সর্গই তাহার শ্রেষ্ঠ অংশ, কবির কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মেঘনাদের সহকর্মিণী ভাবিয়া কল্পনা করিয়াও মধুসূদন প্রমীলাকে পূর্ণরূপে পারিবারিক বন্ধনমুক্ত করিয়া আঁকিতে সাহস পান নাই, তাহাকে স্বামীর সহগামিনী করিয়া রণক্ষেত্রে আনিতে পারেন নাই। ফিউডাল যুগের টান তাঁহাকে অতদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। প্রমীলা-চরিত্রকে জীবন্ত ও যথার্থ কবিবার মতো নারীর অস্তিত্বও তখনকার বাঙালী সমাজে সম্ভব ছিল না। তবুও বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী যুগে স্বাধীনা নারী চরিত্রের সৃষ্টিতে প্রমীলাই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শিকা। মেঘনাদ পুরুষ বলিয়া তাহার চিত্রণে মধুসূদনকে এ বাধা বোধ করিতে হয় নাই। আগামী কালে দেশের মুক্তিযুদ্ধে নিবেদিতপ্রাণ বাঙালী যুবকের আত্মাহুতির প্রথম সার্থকচিত্র এই মেঘনাদে। মেঘনাদের মৃত্যুতে, যাহাকে অপমৃত্যুও বলা চলে, তাই মধুসূদনের

হইয়াছিল সহনাতীত শোক; এই প্রসঙ্গ রচনার সময় তিনি প্রকৃতপক্ষে শারীরিকভাবেও অসুস্থ হইয়া পড়েন। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের শোক অপেক্ষা তাঁহার শোক ছিল মহত্তর। রাবণের শোক, বীর পুত্রের অকালমৃত্যুতে পিতার শোক; মধুসূদনের শোক, অতীতের ঐতিহ্যের নিকট ভবিষ্যতের আদর্শের হত্যা। আর একটি পার্শ্বচরিত্রে মধুসূদন বাল্মীকির বর্ণনা হইতে সরিয়া আসিয়া অতি অল্পকথায় নূতন চেতনাকে রূপায়িত করিয়াছেন। জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ রামায়ণের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কিন্তু বাল্মীকিতে দেখা যায়, অপহৃতা সীতা রাবণের রথ হইতে দূরে জটায়ুকে দেখিয়া শ্বশুরকুলের বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারেন ও চিৎকার করিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন। এক্ষেত্রে জটায়ুর বীরত্বে সেই পুরাতন পারিবারিক সম্বন্ধের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 'মেঘনাদ বধে' দেখি সীতা সরমাকে বলিতেছেনঃ

কতক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজি। স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে!
দেখিনু মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ। 'চিনি তোরে' কহিলা গম্ভীরে
বীরবর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?

জটায়ুর এই হ্রস্ব উক্তিটিতে নির্যাসের মতো ঘনীভূত হইয়া আছে ইউরোপীয় শিভাল্‌রি-র নিঃস্বার্থ বীরত্বের উচ্চ আদর্শ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণপাত করা, কোনোরূপ দৈবী আদেশ বা পারিবারিক মর্যাদাবোধ হইতে নহে। সমস্ত মেঘনাদ বধ কাব্যে এই একটিবার রাবণ চিত্রিত হইয়াছে এ ব্রহ্মমণ্ডলে অদ্বিতীয় নির্লজ্জ পামর রূপে। সীতা-হরণে রাবণের দায়িত্বের উল্লেখ মধুসূদন সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা এ প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কেবল তাঁহার পুত্রশোকে রাবণের প্রবোধ দিবার অবাস্তব প্রচেষ্টাকে তীক্ষ্ণ প্রতিঘাত করিবার প্ররোচনায়।

কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

কিন্তু বীরবাহুর জননী এই বলিয়া আর কিছু না করিয়া "কাঁদি, সঙ্গে সখী

দলে লয়ে, প্রবেশিলা অন্তঃপুরে।" এবং কবির পক্ষে ও রাবণের পক্ষে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এইখানে চাপা পড়িয়া গেল।

॥ নয় ॥

বস্তুত, রাবণের চরিত্রই মেঘনাদ বধ কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্বলতা। স্বয়ং কবি ইহার সম্বন্ধে মন ঠিক করিতে পারেন নাই বলিয়া এই কাব্যে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একটি স্বতঃবিরোধিতা থাকিয়া গিয়াছে যাহা পাঠান্তে রসোপ-ভোগে বাধা দেয়, একটি অখণ্ড অনুভূতিকে সমগ্রভাবে স্থায়ী হইতে দেয় না।

সীতাহরণ রামায়ণ কাহিনীর চরিত্রনিরূপক ঘটনা—ইহার সংশ্লেষেই নির্ধারিত হয় রাম বা রাবণের দোষগুণ। বাল্মীকি হইতে কৃত্তিবাস পর্যন্ত এই সংশ্লেষ নানাভাবে বিবর্তিত হইয়াছে। মহাপণ্ডিত য়াকোবি-র মতে রামায়ণ কাহিনীর আদিরূপ পাওয়া যায় "দশরথ-জাতকে"। এইক্ষেত্রে তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই। কারণ তাহাতে না আছে সীতাহরণ, না আছে হনুমান, না আছে রাবণ। সেখানে রাম ও সীতা বিবাহিত সহোদর-সহোদরা—ইজিপ্টের প্টলেমি বংশীয়দের মতো। এইরূপ বিবাহ যখন লোকচক্ষে হেয় হইয়া ওঠে, তখনই সীতার জন্মবৃত্তান্তে আরোপ করা হয় অলৌকিকতা। রাজা জনকের লাঙলের ফলায় মাটি হইতে সীতাদেবীর আবির্ভাবের ইহাই নাকি, য়াকোবি-র মতে, ঐতিহাসিক রহস্য। বাল্মীকির রাম, রবীন্দ্রনাথের মতে, গার্হস্থ্য-প্রধান হিন্দু সমাজের যত কিছু ধর্ম আছে তাহারই অবতার। রাম যে রাবণকে মারিয়াছিলেন সে কেবল ধর্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য—অবশেষে সেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেও কেবল প্রজারঞ্জনের অনুরোধে। আর, কৃত্তিবাসের রাম, রবীন্দ্রনাথের মতে, ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল।

'মেঘনাদ বধে' রাম-রাবণের সম্বন্ধ অনেক বেশি জটিল, নূতন সমাজ-চেতনার প্রভাবে। ফিউডালবাদের প্রতিনিধি রাম কবির চক্ষে হেয়, আর বুর্জোয়াবাদের প্রতিনিধি রাক্ষস রাবণ তাঁহার প্রেয়। কবির অভিপ্রায় অনু-সারে কাহিনী রচিত হইলে রাবণের হইত জয় ও রামের পরাজয়। এই ধরনের কাহিনী তিনি খুঁজিয়া পাইলে খুশি হইতেন ও তাঁহার কবিত্বের আবেগকে বিনা দ্বিধায় বীররসে আপ্লুত করিতে পারিতেন। তাঁহার দুঃখ এই যে এমন বিষয় তিনি না পাওয়ায়, যাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সেই রাক্ষসদের গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাঁহার কল্পনার উদ্দীপক হিসাবে। মেঘনাদ বধ রচনার অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় মহরম-এর কোলাহলের পর তিনি বন্ধু রাজ-নারায়ণকে পত্রযোগে জানাইতেছেনঃ

> "ভাবতেব মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন বৃহৎ কবিব উদ্ভব হইত, হাসান ও তাহাব ভ্রাতার মৃত্যুকে অবলম্বন কবিযা ভি বিরাট এপিক লেখাই না তাহাব পক্ষে

সম্ভব ছিল। সমস্ত জাতির অনুভূতিকে সে নিজের পক্ষে টানিতে পারিত। আমাদের এমন কোন বিষয় নাই।"

মধুসূদনের বিপদই ছিল এইখানে। তিনি জানিতেন তাঁহার প্রিয় রাবণের স্বপক্ষে সমস্ত জাতি নাই। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের ঐতিহ্য তাঁহার বিপক্ষে। কৃত্তিবাসের মনোভাব ছিল সহজ; রাম অবতার, আর রাবণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই পাপী, সীতাহরণ একটা নিমিত্ত মাত্র। ইহার জন্য সীতার উপর রাবণের অত্যাচার করার প্রয়োজন হয় না, কেবল হরণ করাই যথেষ্ট। সীতা-উদ্ধারের প্রয়োজনে রাম আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া মুক্তি দিবেন। বাল্মীকির বাস্তবতা বোধ কৃত্তিবাসের চেয়ে অনেক প্রখরতর। রাবণ দুরাচার ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত না হইলে রামের হস্তে রাবণের নিধনে রামের বীরত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা হয় না। তাই রাবণকে দিয়া রামের বিরুদ্ধে এমন পাপাচরণ করানো প্রয়োজন যাহাতে সমস্ত জগৎ বুঝিতে পারে রাবণের বিনাশেই সৃষ্টির কল্যাণ, এবং এই দুরূহ কল্যাণের সাধনকর্তা একমাত্র রামচন্দ্র। বাল্মীকিতে তাই দেখি জটায়ুর পরাভব ও মৃত্যুর পর রাবণ সীতাকে ধর্ষণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ নহে। অরণ্যকাণ্ডের দ্বি-পঞ্চাশৎ সর্গে আছেঃ

> পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ সেই অনাথার ন্যায় বিলাপকারিণী বিদেহ-রাজনন্দিনী মর্দিত-মাল্যাভরণা সীতার প্রতি ধাবিত হইল। তখন বনমধ্যে বান্ধবিহীনা সীতা "রাম, রাম," বলিয়া বিলাপ করতঃ বেষ্টনকারিণী লতার ন্যায়, বৃহৎ বৃহৎ তরুসকল আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন এবং কৃতান্ততুল্য রাক্ষসাধিপতি রাবণও তাঁহাকে "ছাড়, ছাড়" বলিতে বলিতে তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। তখন বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা, রাবণ কর্তৃক ধর্ষিতা হইলে, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণসহ সমগ্র জগৎ মর্যাদাবিহীন ও ভীষণ অন্ধকারে সমাবৃত হইল,—তথায় বায়ু আর বহিল না এবং দিবাকর নিষ্প্রভ হইলেন। শ্রীমান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে সীতাকে ধর্ষিতা দেখিয়া "কার্য সিদ্ধ হইল" ইহা বলিলেন। দণ্ডকাননবাসী মহর্ষিরা সীতাকে দশানন কেশে ধরিয়াছে দেখিয়া ব্যথিত ও দৈবযোগে রাবণের মৃত্যু উপস্থিত হইল, বুঝিয়া প্রীত হইলেন।

ইহার পরও রাবণকে হনন করিয়া সীতাকে পুনরায় স্বমর্যাদায় গ্রহণ করিতে বাল্মীকির রামচন্দ্রের বাধে নাই। যে উত্তরাকাণ্ডে সীতাবর্জনের কথা আছে তাহা আদৌ বাল্মীকির রচনা কি না এ বিষয়ে বহু পণ্ডিতের আছে নিরতিশয় সন্দেহ। তাই বলা যায়, বাল্মীকির রামায়ণে রাম-রাবণ সম্পর্কে একটি ব্যাপক সুসঙ্গতি আছে যাহা তাঁহার মহাকাব্যের পক্ষে ছিল পরম প্রয়োজন।

রাবণ সম্বন্ধে রচনার পূর্ব হইতেই মধুসূদনের যে মনোভাব ছিল তাহাতে বাল্মীকি প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, যতই তিনি নিজেকে 'তব অনুগামী দাস' বলিয়া প্রচার করুন না কেন। সীতার দুঃখে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয় কিন্তু তাহার জন্য লঙ্কাধিপতি রাবণকে সরাসরি দায়ী করিলে মেঘনাদ বধ রচনায় যে নিগূঢ় সামাজিক উদ্দেশ্য তাঁহার কল্পনাকে পরিচালিত করিতেছিল তাহার কার্যকারিতা ব্যর্থ হয়। অথচ রামায়ণের গল্পকে অবলম্বন

করিয়া তাহার মূল প্রতিপাদ্য একেবারে অবহেলা করা চলে না, রাবণকে তাহার কৃত পাপের ফলভোগী হইতেই হয়। এই উভয় সংকটে পড়িয়া কবি তাঁহার কল্পিত রাবণের বিরাট সম্ভাবনাকে খর্ব করিয়া নিয়তির ক্রীড়নকে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যাহা তাঁহার বুর্জোয়া-চেতনার সহিত একান্ত অসংগত। প্রাক্-বুর্জোয়া যুগের মহাকবি হোমরের প্রভাব এই প্রসঙ্গেই বেশি ফুটিয়াছে। অথচ হোমরের যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ—আকিল্লেস, ওদিসেয়ুস, দিওমেদ প্রভৃতির মতো শক্তিমান চরিত্রও তাঁহার প্রিয় রাক্ষসদের মধ্যেও তিনি আঁকিতে পারেন নাই। বেশির ভাগ স্থানেই রাবণকে দেখানো হইয়াছে পুত্রশোকাতুর পিতার ভূমিকায়। হেক্টর-এর মৃত্যুতে প্রিয়াম-এর শোকের সহিত ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণের শোকের তুলনাও সংগত নহে। দুই কবির উদ্দেশ্য বিভিন্ন। ট্রয়বাসী বীরগণের শোকের গভীরতা দিয়া হোমর দেখাইতে চাহিয়াছেন গ্রীক-বীরগণের শৌর্যের পরাকাষ্ঠা। মধুসূদনের উদ্দেশ্য ঠিক তাহার বিপরীত; রাবণের শোকের মহত্ত্বে রামের বিজয়গর্বকে খর্ব করা। অথচ কোন হিসাবে —এক দেবভক্তি বাদে—রাবণ রামের চেয়ে বেশি সমাদরেব পাত্র তাহা এই কাব্যে কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলা নাই। রাবণের পুত্রস্নেহের চেয়ে রামের ভ্রাতৃস্নেহ কোনো অংশে কম নহে। যাহার জন্য ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এত আয়োজন সেই সীতাকেও মধুসূদনের রাম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত—নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। বুর্জোয়াবাদের সহিত ফিউডালবাদের সংঘর্ষের কাহিনীতে বুর্জোয়াবাদের বিজয়ে যাহা হইতে পারিত বিশ্বসাহিত্যের উপযোগী এক বিরাট এপিক, তাহা হইয়া দাঁড়াইল দুইটি ফিউডালবাদী পরিবারের অকারণ কলহের চিত্র, যাহাকে মধুসূদন বলিয়াছেন এপিকলিং। যাহা হইতে পারিত ঘটনাবহুল তাহা হইয়া রহিল বর্ণনাবহুল। বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যে তীক্ষ্ণ তরবারি উত্থিত হইয়াছিল ইউরোপীয় স্বাধীনদেশগুলির সামাজিক সমুদ্র-মন্থনে, মেঘনাদ বধ কাব্যে তাহার দ্যুতি আচ্ছাদিত গরিমায় প্রকাশ পাইয়া নিমজ্জিত হইল এক স্নেহপ্রবণ দুর্বৃত্তের শোকাশ্রু-সাগরে। পরাধীন দেশের প্রতিকূল পরিবেশে মধুসূদনের বিপ্লবী কবিপ্রতিভা অস্তমিত হইল এই করুণ পরিণতিতে।

॥ দশ ॥

তবুও তিনি চিরকাল পূজিত হইবেন নবচেতনার কবি বলিয়া। ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার সৃষ্টিতে নূতন বাঙালীকে তিনিই দিয়াছেন নূতন রসের অমৃত-স্বাদ। জাতীয় জীবনে উন্মাদনার যুগ শেষ হওয়ায় তাঁহার কবিতার প্রভাব পরিমিত হইয়া আসিলেও চিরদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন 'কবির কবি' রূপে। তাঁহার প্রভাবকে বাদ দিয়া বাংলা ভাষায় উচ্চসাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার ঐতিহাসিক স্থান ইংরেজী-সাহিত্যে মার্লোর অনুরূপ। সুইন্বার্ন-এর বিচারে, মার্লোই প্রথম ইংরেজী কবিতাকে আকাশগামী করিতে পারিলেন, তিনি প্রথম আনিয়া দিলেন সেই নূতন বিশালতা, যাহাকে বলা যায় সাব্লিমিটি। সমস্ত ইংরেজ কবিগণের মধ্যে তিনিই প্রথম পূর্ণবয়স্ক পুরুষ।

তাই দেখি, চরিত্রচিত্রণে ও সমাজচেতনায় বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের অনুগামী: তাঁহাদের প্রকৃতিতে অবশ্য ছিল পার্থক্য. যেমন মার্লোর ছিল তাঁহার অনুগামী শেকস্‌পীয়রের সহিত। মার্লোর প্রবর্তিত ব্ল্যাংক ভার্স—বেন জনসন যাহাকে আখ্যা দিয়াছিলেন 'মাইটি লাইন'—তাহাই যে শেকস্‌পীয়র, মিল্টন, এমন কি টেনিসনেরও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের মূলসূত্র, ইহা সমালোচকমহলে স্বীকৃত। আধুনিক বাংলা পয়ারছন্দের যে বিচিত্র ইন্দ্রজাল, বলা চলে না কি যে মধুসূদনের অমিত্রছন্দই তাহার মূল প্রস্রবণ? মার্লো একাধারে পণ্ডিত ও কবি। তাঁহার কবিত্বের আবেগ ও পাণ্ডিত্যের স্পৃহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে তাহার পাণ্ডিত্যের সবচেয়ে বেশি প্রকাশ, তাঁহার কবিত্বের সব চেয়ে বেশি প্রকাশও সেইখানেই। মধুসূদনও ছিলেন, তাঁহার যুগে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় কবি। কাব্যরচনায় তাঁহার অকুতোভয় উচ্চাদর্শ ও অনলস প্রস্তুতি, অনাগত যুগের কবিকুলের নিকট হইয়া থাকিবে অসীম বিস্ময়ের আধার। যে ফিউডালবাদের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে মধুসূদন হানিয়াছিলেন প্রথম সবল আঘাত, আজিও তাহাকে শেষ আঘাত হানা হয় নাই। যে বুর্জোয়া-বিপ্লবের তিনি ছিলেন প্রথম কবি আজিও তাহা অসমাপ্ত। সে বিপ্লবের একান্ত পরিসমাপ্তি সমাজবাদের সংস্থাপনে। এই অবশ্যকর্তব্য বিপ্লবের পথে অগ্রগমনে আগামীকালের কবিরা তাঁহার জ্যোতির্ময় প্রতিভায় পাইবে অবিনশ্বর অনুপ্রেরণা।

২৪-১-৫৩

কবিতা

সাঁওতালি

চড়কপুজোর গান

বাজার বাজার বেড়াইলম
গোটা বাজার বেড়াইলম
মনের মতোন মালা পেলম না।
সরু সুতো বেলমালা
গেঁথাতে যা মুশকিল
গলাতে ঝমক ঝমক॥

সংগ্রাহকঃ পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

দঙ্

[নিম্নলিখিত সাঁওতালি লোক-সংগীতগুলি ১৯৩৫-৩৬ সালে দিনাজপুর জেলার বানগড়ের কাছে যে সাঁওতাল বস্তি আছে সেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সাঁওতালি গানের মোটামুটি তিনটি ভাগ লাগ্‌ড়ে, দঙ্ ও শিকারের। শিকারের গানগুলিতে অশ্লীল অর্থযুক্ত ভাষাই বেশি ব্যবহার হয়। দঙ্ বিবাহ বা সামাজিক উৎসব, লাগ্‌ড়ে ধর্মীয় এবং প্রেম। এখানে দঙ্ ও শিকারের গোটাকতক গান সংকলন করা হল—সংগ্রাহক।]

—১—

ওকা এনাম বাবু ঝট্‌বেটা
ভরত বরস্‌রে—জুমি-ভরিকো নিলাম মিদা
মিনেঙিয়া আয়ও তোয়োদারে
শীতম্ কাগ্‌জীঙ্ ন্যাঞ্জভম্ কানেন
ধরণী বুড়ুড় কাছাহারি॥

মা বলছেন—আমার বড়ছেলে কোথায় গেছে। ভারতবর্ষের জমি তো নিলাম হয়ে গেল। ছেলে তার উত্তরে বলল—আমার রয়েছে তো দুধের গাছ (মা), এখন আমি খুঁজছি পুরানো পুঁথি, যার পাহাড়ে যেখানে রয়েছে ধরণী বুড়ির কাছারি।

ঝট্‌বেটা—বড়ছেলে; ওকা এনাম বাবু—কোথায় গেছে; জুমিভরি—সমস্ত জমি; মিনেঙিয়া—আছে; তোয়োদারে—দুধের গাছ; আয়ও—মা; বুড়ুড়—পাহাড়ে; শীতম্—খোঁজা; কাগজীঙ ন্যাঞ্জভম্ কানেন—কাগজ পুঁথি।

—২—

বুড়ু-চিতাম চিতাম ডোম দো
হাড়া লাতাড় লাতাড় বড়িয়াত্ কো
বুড়ু কোণে গুড় দেঠ লাডাম দেঠ লাডাম দো
বয়বার গুঢুর ঢোল ঢাঁঙে।

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় মাদল বাজছে। তলায় তলায় চলেছে বরযাত্রী। পাহাড়ের কোণ থেকে মাদল পড়ে গিয়ে আটকে গেল ঘটকের গোঁফে।

চিতাম চিতাম—পর পর; হাড়া লাতাড় লাতাড—পাহাড়ের তলায় তলায়।

সংগ্রাহকঃ নরেন্দ্রনাথ মল্লিক

কণ্ঠস্বর

জগন্নাথ চক্রবর্তী

শীতের রাত্রি ঘন কুয়াশায় অন্ধকারকে ঢাকে
দিগ্‌ভ্রান্তির শেষ সীমানায় তোমার কণ্ঠ ডাকে।
আমি ফিরে চাই, তারার আলোয় সম্বিৎ পাই ফিরে;
আমি ফিরে যাই, তুমি জেগে থাকো আমার স্বপ্ন ঘিরে।

মুক্তির শোভাযাত্রার পথ শৃঙ্খলে পড়ে বাঁধা
কচি মেয়েটির ফোলা ফোলা চোখে থামে না ক্ষুব্ধ কাঁদা,
মনে জমে ওঠে বঞ্চনা ভয় শঙ্কায় দিন কাটে
তোমার গোপন বসন্ত তবু ছড়ায় আমার মাঠে।

আশানিরাশার মাঝখানে তুমি বারবার সুর বাঁধো
হাজার কান্না মুছে দিতে গিয়ে সহস্রবার কাঁদো,
সমুদ্রজলে পাহাড়ে এখনও আরো কতো গান বাকি
তাই বারে বারে স্তব্ধ প্রহরে একলা তোমারে ডাকি।

উদাসীন চোখে চেয়ে থাকে দিন উদাস সন্ধ্যাবেলা,
নদী ভোলে তার আকুল জোয়ার শিশু ভোলে তার খেলা,
রক্ত-রঙিন ধানখেতে ছোট একজোড়া চোখ বোজে—
আমার দু'চোখ চিৎকার করে তোমার দু'চোখ খোঁজে।

নিষ্ঠুরতম পীড়নে যখন সঙ্গীত যায় থেমে,
পাখি নির্বাক, পথেপ্রান্তরে সন্ত্রাস আসে নেমে,
শূন্য আসর, স্তব্ধ আকাশ, মৃত্যুর দিন গুনি—
হঠাৎ তখন দিগন্ত জুড়ে তোমার কণ্ঠ শুনি।

শিরীষ গাছের নিচে

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পেটে-পিঠে-এক-হ'য়ে মেয়েটা ফুটপাথে ম'রে আছে
কেবল তাকিয়ে ওর জ্যান্ত চোখদুটো।
হাত-পা কাঠি-কাঠি
চামড়া ফুঁড়ে উঠতে চাইছে পাঁজরাগুলো
ভন্‌ভনিয়ে মাছি উড়ছে হাঁ-করা মুখটায়
চোখদুটো কেবল ওর তাকিয়ে—যেদিকে
শিরীষ গাছের নিচে নিবনো উনুনে মুখ থুবড়ে আছে
ভাতের হাঁড়িটা

পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেউ দেখছে, দেখছেও না কেউ

কাক-ডাকা সকালে রোজ কর্পোরেশনের কলে জল আসবে
পাড়ার ছোকরারা ধরবে লারেলাপ্পা-গান—
হয়নি কিছুই
শুধু মাঝে মাঝে লাঠিচার্জে ছত্রভঙ্গ হবে ভুখ-মিছিল
ত্রস্ত পথচারী ছুটবে এদিক-ওদিক, শুধু
হাওড়ার ব্রিজের পাশে সন্ধ্যের আকাশটাকে ফিন্‌কি-দেয়া রক্ত মনে হবে
অন্ধকারে শোনা যাবে গঙ্গার গোঙানি

মাঝে মাঝে ভিড় জমবে রাস্তাঘাটে রেস্তোরাঁয় পানের দোকানে
একজন বলবে আর গোল হয়ে শুনবে দশজনে

শুধু একদিন হঠাৎ উঠবে ঝড়
মকরমুখো গঙ্গা মারবে ল্যাজের ঝাপট্‌
মাথা কুটে মরবে খালি বাতাসের পায়ে হাওড়া ব্রিজ
ফুটপাথে ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুলবে
তাড়িয়ে তাড়িয়ে আনবে
ঝঞ্ঝা—ঝড়—মানুষের ঝড়—
হবে না কিছুই
শুধু পেটের আগুনে জ্বলে পুড়ে
হঠাৎ একদিন মাথা বিগ্‌ড়ে যাবে এই কলকাতার

শুধু একদিন আকাশ ছেয়ে চেয়ে থাকবে
শিরীষ গাছের নিচে মরা মেয়েটার চোখদুটো।

মাঝি

মণীন্দ্র রায়

নদীর স্বভাব জানে মাঝি।
স্রোতের কুটিল গতি, ঢেউয়ের ছোবল, আর হাওয়ার দস্যুতা
সবই তার জানা।
জ্যোৎস্নায় বজরার ছাদে নারীকণ্ঠ-সঙ্গীতে কেমন
বেপরোয়া ফূর্তি জমে, অথবা পাড়ের
নিরাপদ দূরে শৌখিন বাড়ির বারান্দায়
নদীর কী অমর্ত্য চেহারা, জানে না তা মাঝি।
জানে সে আজন্ম এক পাড়ভাঙা হিংস্র নদী
স্রোতে যার একরোখা দন্তুর আঘাত
ঢেউয়ে যার বুকের আক্রোশ
তুফানে উন্মাদ আর বর্ষায় লেলিহ জলধারা,
আর জানে খেয়াপার লগিতে-বৈঠায়।

যখনই পথের মুখে আসে এই নদীর বিস্তার,
হোক সে মাঘের সন্ধ্যা শ্রাবণের রাত্রি কিংবা চৈত্রের দুপুর
ঝিলমিলে বটের ছায়া পেরিয়ে ঢালুতে নেমে দেখ
আশ্রয়ের পাটাতন বুকে টেনে নৌকো আছে ঘাটে ;
নৌকোর গলুইয়ে দুহাতে হালের মুঠি চেপে
মাঝি আছে স্থির ;
হাটের পসরা কিংবা মাঠের ধানের আঁটি নিয়ে
খেয়া যাবে ওপারের নীলরেখা গ্রামে।

(২)

এমনি আরেক নদী আছে
সমাজে সংসারে আমাদের বুকের ভিতরে দৈনন্দিন কাজে ও চিন্তায়।
ফেনায়িত জলস্রোত তার ঢলনামা আষাঢ়ের বেগে
কেবলি দুপাড়ে বাধা হানে ; কেবলি গর্জায়
ঘূর্ণির রাক্ষসী ক্ষুধা ; হাওয়ার ঝাপটায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে
তটরেখা এঁকে-বেঁকে শহরে-পল্লীতে মাঠে-কলে
কেবলি ফারাক আনে ; বয়ে যায় ক্রুদ্ধ জলধারা
তোমার আমার মধ্যে প্রাসাদে-বস্তিতে দিনেরাতে
রুচির বিচিত্র পথে রুজির হামলায় বেকারিতে
কখনো ঘরোয়া একা কখনো-বা শ্রেণীর আওতায়
অন্নের জটিল দ্বন্দ্বে, আদর্শের সংঘাতে কখনো,
দেখ এই নদীর বিস্তার
কেবলি ফারাক আনে, ছিঁড়ে দেয় পারে-পারে একস্বপ্ন মাটির একতা।

কত ডিঙি পালছেঁড়া এ নদীর বুকে
ডুবেছে বৈশাখী ঝড়ে।
হালভাঙা তলিখসা আর্তের চিৎকার
দুপারে এনেছে ত্রাস।
তবু স্বপ্ন ভোলেনি মানুষ—
মৃত্যুর পাতাল হতে টেনে তোলে জীবনের সুধা,
রক্তাক্ত গ্লানির মূল্যে ফিরে পায় জয়ের কৌশল।
দেখ তাই ঘাটে আজ মাঝি
খেয়ানৌকো নিয়ে আছে স্থির।
আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ স্বপ্নের সংগ্রামে বলীয়ান
আমাদের কামনার জীবন্ত প্রতীক
মনের ভিতরে বাইরে আনন্দে ও শ্রমে প্রতিদিন
গড়ে এক সেতুবন্ধ। জানে সে রহস্য এ নদীর!
আর জানে, আজ কিংবা কাল তারই খেয়া
উজ্জ্বল প্রাণের শস্য নিয়ে যাবে প্রতীক্ষার ডিবেজ্বলা ঘরে॥

হাওয়া দাও

কৃষ্ণ ধর

সব কিছু ঝরে যায়, খসে যায় বিবর্ণ প্রাচীর
মনের দেয়ালে কারা চুপি চুপি ছায়া ফেলে আসে
এ যেন বিগতনিদ্র পদধ্বনি ভোরের যাত্রীর
সুদূর দুর্গম পথে যাত্রা শুরু এ রাত্রির শেষে।

তুমি আজ হাওয়া দাও, হাওয়া দাও নিরুদ্ধ এ প্রাণে
এ হাওয়ার ঘ্রাণে ঘ্রাণে কী প্রচণ্ড বাঁচার আস্বাদ
তোমার হাওয়ার মুখে শান্তি এল আশাবরী গানে
মানুষেরে দাও তুমি, এক মুঠো হাওয়ার প্রসাদ।

আমাদের জন্মদিন কবে ছিল, সে প্রসঙ্গ নেই ইতিহাসে
এ অরণ্যে বহুদিন বসন্তের রঙ পলাতক
রৌদ্রখরা দিন যায়, শীত আসে রাত্রির আশ্লেষে
দুর্জয় আশায় জাগে বিবর্জিত নিঃসঙ্গ জাতক।

হে বসন্ত তুমি এসো, হে আকাশ ময়ূরের ডানা
মেলে দিয়ে হাওয়া দাও, হাওয়া দাও হে বসন্ত-সেনা।

মৃগালা

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

তিনটে কুকুরে পাহারা দেয় ভাগচাষীদের ধান
ষাট সত্তোর চাষী মিলে ধান ঝাড়ে।

ধান ওড়ে—হাওয়া—
ধান জ্বলে—ঠাঠা রোদে
ষাট সত্তোর চাষী ধান ঝাড়ে
মৃত্যুর প্রতিরোধে।

তিনটে কুকুরে পাহারা দেয় ভাগচাষীদের ধান
অনাহারী চাষী একসাথে ধান ঝাড়ে।

ধানের গাদায় চাষীদের ছায়া পড়ে
হাজার ইঞ্চি ছাতিওলা ছায়া নড়ে
মস্ত মস্ত গাছ দোলে যেন
মহাপ্রমত্ত ঝড়ে।

তিনটে কুকুরে পাহারা দেয় ভাগচাষীদের ধান
ষাট সত্তোর ভাগচাষী ধান ঝাড়ে।

চাষীর ন্যাংটো ছেলেরা ঝাণ্ডা ওড়ায়
পুলিশ ভ্যানের পিছু পিছু করে তাড়া
'এই ফসলের তেভাগা চাই
জান দুবো—ধান দুবোনি—ভাই'
আওয়াজে কাঁপায় পাড়া।

তিনটে কুকুরে পাহারা দেয় ভাগচাষীদের ধান
সংগ্রামী ষাট সত্তোর চাষী একসাথে ধান ঝাড়ে।

---

* মৃগালা হুগলী জেলার একটি গ্রাম। এই বছর কৃষকরা সেখানে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জোরে তেভাগার দাবি আদায় করেছেন।

অনাদিপ্রেমিক

সিদ্ধেশ্বর সেন

তোমার পৃথিবী তুমি জয় করেছ
তোমার বিশাল হৃদয়ে ধারণ করে আছ তাকে, অনাদিপ্রেমিক

জীবনের সিংহদ্বার খুলে তোমার সন্ততিরা এল
মৃত্যুর পূর্ণতায় তুমি ধ্যানে বসলে, অমরতা

তোমার প্রেমে ব্যাপ্ত প্রেমে বিধৃত বিশ্ব তোমার

তুমি তাকে সাজাও তোমার আনন্দে
মরুতে মরু লুকায়, স্নিগ্ধশ্যাম বনানী তোলে মুখ,
সাগরে সাগর সহোদরা,
প্রাণে প্রাণ শতদল, সৃষ্টিমুগ্ধ, গভীরে আহ্বান,
দেশ দেশ নন্দিত স্বদেশ

তোমার প্রেমে মুক্ত বাহুবন্ধনে অধরা প্রকৃতি

তোমার প্রেমে ব্যাপ্ত প্রেমে বিধৃত বিশ্ব তোমার

...

তোমার গতিতে গতি পাবে অণু থেকে অনন্ত
তুমি কেন্দ্র
তোমার গতি থেকে গতি পাবে আজ ও আগামী
তুমি কেন্দ্র
তোমাকে ঘিরে সৌরলোক, দ্বন্দ্বময় প্রস্থান তোমার, প্রেমিকসূর্য

...

তোমার নামের আড়ালে পর্বত, সমুদ্র, তুষার
তোমার নামের আড়ালে পল্লব, বিহঙ্গ, ঐকতান
তোমার নামের আড়ালে মানুষের শ্রম, মানুষীর ভালোবাসা,
শিশুর জাগরণ, বিস্ময়
তোমার নামের আড়ালে শস্যের মঞ্জরী,
শস্যের আড়ালে বীজ,
বীজের আড়ালে তুমি, স্তালিন॥

স্তালিন

অশোক ভট্টাচার্য

যে-তোমার বিশাল বুকে
ছোবল মেরে
আপন ফণা চূর্ণ করেছে হিটলার,
ভেবেছিলাম, সেই তোমার
মূর্তি গড়ব
কঠিন ইস্পাতে, কমরেড!
যে-তুমি রক্তের সমুদ্র মন্থন করে
রক্ত-গোলাপে প্রাঙ্গণ সাজালে,
ভেবেছিলাম, সেই তোমার
ছবি আঁকব
আগুনের শিখায় শিখায়।

তাই আমি ছুটে গিয়েছি
পাহাড়ের চূড়ায়, হাত পেতেছি
সূর্যের কাছে, কমরেড!
তবু কোথাও এমন পাথর পাইনি
যা তোমার দৃঢ়তার সমকক্ষ,
এমন রঙ পাইনি
যা তোমার মতোই উজ্জ্বল।

তাই ভাবি
এমন কথা কোথায় পাব
কমরেড, যা হবে তোমার
'সৃষ্টির' মতো সুন্দর
প্রতিজ্ঞার মতো স্থির
মন্ত্রের মতো মন্দ্র॥



পরিচয়-এর কুড়িবছর

হিরণকুমার সান্যাল

বারো

সাহেদ সুরাওয়ার্দি ও নাট্যপ্রসঙ্গ

ফাল্গুন সংখ্যায় সাহেদ সুরাওয়ার্দি-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলাম পরিচয়-এ প্রকাশিত তাঁর তিনটি রচনার কথা। দুটি সমালোচনা ও একটি প্রবন্ধ। সমালোচনা দুটির মধ্যে একটির বিষয় ছিল হুমায়ুন কবিরের ইংরেজি বই 'পোয়েমস'। এরই শেষ অংশ থেকে খানিকটা তুলে দিয়ে গতবারের কিস্তি শেষ করেছিলাম। বর্তমান কিস্তি লিখতে গিয়ে মনে হল নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বাংলা দেশে, বিশেষ করে প্রগতিপন্থীদের মহলে, এখন যে আগ্রহ দেখা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে সুরাওয়ার্দির 'আধুনিক নাট্য-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি (পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯) বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সমালোচনা দুটির মতন সুরাওয়ার্দির ঐ প্রবন্ধটি মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে পরিচয়-এ ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধটির অনুবাদে সুধীন দত্তের হাতের ছাপ অতি স্পষ্ট। দু'একটি নমুনা তুলে দিচ্ছি, তা থেকে প্রমাণ হবে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে লেখকের দরদী ও বিচারশীল মনের ও অনুবাদকের অসাধারণ নৈপুণ্যের। প্রবন্ধটির গোড়ার কথাঃ

> "য়ুরোপের আধুনিক নাট্য-সমালোচনার সঙ্গে যিনিই সুপরিচিত, তিনিই প্রায় শোনেন যে রঙ্গালয়ের এখন শনির দশা। আসলে য়ুরোপীয় নাটকের ইতিহাসে, সেনেকার দিন থেকে আজ পর্যন্ত, কখনো এমন যুগ ছিল না যখন এই সংকট দেখা যায়নি। অবশ্য দুর্দশার অবস্থাভেদ আছে। কয়েক বছর আগে... সকলে ভয় পেয়েছিলেন যে নির্বাক ছবির আক্রমণে বুঝিবা তার চিহ্নমাত্র থাকবে না। ..অবশেষে যখন মনে হোলো, এই প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা তার সাধ্যে আর কুলোবে না, ঠিক সেই মুহূর্তে সবাক ছবির প্রাদুর্ভাব তাকে পুনর্জীবিত ক'রে তুললে।"

এর পর লেখক করেছেন নাট্যকলার সংজ্ঞানির্দেশ পাঠ্য সাহিত্যের ও দৃশ্য নাটকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেঃ

> "সাহিত্য বিচারে সাধারণ পাঠকের যতটা মূল্য, নাট্যানুষ্ঠানের সার্থকতার পরিমাপে সাধারণ দর্শকও তদনুরূপ হতে পারে, তবু কোনো-না-কোনোখানে নাটকও যথার্থ নাট্যামোদীদের মধ্যে একটা রহস্যময় যোগসূত্র আছেই আছে। ফলে নাট্যামোদীদের রুচি যেমন নাট্যশালার প্রভাবে গড়ে ওঠে, তেমনি নাট্যশালাও নাট্যামোদীর বশবর্তী হয়ে পড়ে। আসলে নাটকের সঙ্গে সাহিত্যের প্রভেদটা অন্য গোত্রের। সাহিত্য রচিত হয় বাসগৃহের নীরব নির্জনতায়, যে-নামহীন, জনতাকে সে ডাক দেয়, তার অস্তিত্ব হয়তো নাও থাকতে পারে। কিন্তু নাটক ও দর্শকের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, এমনকি ব্যক্তিগত; মানুষ আপনার অজ্ঞাতসারে

শিল্পসৃজনে সমর্থ কিনা তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলে এই নাটক দর্শকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়।"

লেখক এই প্রসঙ্গে ফিরে গিয়েছেন প্রবন্ধটির উপসংহারে ঃ

"সাহিত্যের সঙ্গে নাট্যকলার আত্মীয়তা সত্যই ঔৎসুক্যময়। সাহিত্যের গুণাগুণ যেমন প্রযোজনশিল্পের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি অভিনয় শিল্পের সংস্পর্শ এসে পৌঁছয় সাহিত্যে। এই জন্যেই গোড়াকার চক্ষুচমৎকারী নাটকগুলো বাদে, মস্কো আর্ট থিয়েটারের দৃশ্য-পরিকল্পনা, উচ্চারণপ্রণালী, আবেগ-ব্যঞ্জনার কড়িকোমল ইত্যাদি সমগ্র অভিনয়পদ্ধতি চেকোফের রচনার গুণে বদলে গিয়েছিলো ; এবং আজ পর্যন্ত সেই পরিবর্তিত অবস্থাতেই আছে। এমন কি মনে হয় যেন এই মৃদুস্বভাব বেখাশিল্পীদের প্রায় সকলেই অন্তরের আবেগকে বীরোচিত ব্যক্তিস্বরূপে মূর্ত করে তুলতে প্রায় অপারগ হয়ে পড়েছে।

"নানা ধরণের নাটকে নানা রকমের নাট্যশিল্পের প্রয়োজন হয়, কাজেই সম্প্রতি-বিদ নাট্যশালাগুলোকে বাঁচতে হলে উপযোগী নাটকের আবশ্যক। এক মতসর্বস্ব লেখক ছাড়া নাট্যকার মাত্রেই নানাশ্রেণীর নাটক লিখে থাকেন, তার মধ্যে কোনোটা হয়তো আষাঢ়ে, কোনোটা রীতিপ্রধান, কোনোটার প্রসঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক, কোনোটার বা ঐতিহাসিক, আবার একটা হয়তো বাস্তবপন্থী। ফলে আজকালকার অতি আধুনিক রঙ্গালয়ে সাহিত্যের আমদানি অত্যন্ত অল্প। কিন্তু উপযুক্ত উপাদান পেলে মায়ারহোল্‌ট-এর বিপ্লব প্রবাহিনী নাট্যশালাসমৃদ্ধ কী রকম অপরূপ শিল্প-সৃজনে সমর্থ হয় তার প্রমাণ মিলে 'হার্লে ও চায়না' নামক চৈনিক শ্রমিকসংঘর্ষের নাটকখানির অভিনয়ে। তবে এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট কারখানাও বেশি নাটক তৈরি করতে পারছে না। সুতরাং স্বয়ং মায়ারহোল্‌টও এখন ধ্রুপদী রুষ নাটকগুলোর বৈহাসিক অনুকরণে আত্মনিয়োগ করেছেন। এর ফলে নাট্য সম্বন্ধে কতকগুলো চমৎকার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়ে থাকলেও, তাঁর অবস্থা এখন মামুলি প্রযোজকদের মতোই বৈচিত্র্যবিহীন। অতএব দেখা যাবে প্রস্তাবনায় যে-সংকটের উল্লেখ করেছিলাম তার সমাধান এখনো সুদূরপরাহত। শুধু সেইদিন সেই দুর্দশার অবসান হবে যবে উপযোগী সাহিত্যের বন্যা রঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ করবে। এ যুগের কারুকৌশলের আবিষ্কারগুলি নাট্যকলার ভবিষ্যৎকে কী পরিমাণে প্রশস্ত ও সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলেছে, তা বোঝা যাবে শুধু সেই শুভদিনে।"

যদিও 'আধুনিক নাট্য-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি কুড়ি বছর আগে লেখা ও যদিও অনেক বিষয়ে সুরাওয়ার্দির মতের সঙ্গে এখনকার প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের মতের একেবারেই মিল নেই—তবু ঐ প্রবন্ধটি এখনকার দিনেও রঙ্গমঞ্চ ও নাটক-সংক্রান্ত আলোচনার উৎকৃষ্ট ভূমিকা হিসাবে গ্রাহ্য হবার দাবি রাখে। সুরাওয়ার্দির উল্লিখিত 'উপযোগী সাহিত্যের বন্যা' বাংলা রঙ্গালয়ে 'পুনঃ-প্রবেশ' দূরের কথা কোনোদিন প্রবেশই করেনি। মনে পড়ছে, একবার কথা-প্রসঙ্গে এডওআর্ড টম্‌সন্‌ বলেছিলেন বাংলা সাহিত্যে নাটক ও সমালোচনা এ দুয়ের একটিও পরিণতি লাভ করেনি। বোধ হয় আগের এক সংখ্যায় টম্‌সন্‌-এর এই মত উল্লেখ করেছি। 'নীলদর্পণ' নাটক রঙ্গমঞ্চের আদি-যুগের পর শুধু কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল। তারপর গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর কল্যাণে অবশ্য

বাংলা রঙ্গালয়ে নাটকের বন্যা বয়েছিল কিন্তু তা 'উপযোগী সাহিত্য' কিনা সন্দেহ। আর রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি উঁচুদরের সাহিত্য হলেও, প্রথমত, সেগুলির বেশির ভাগই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নয়; দ্বিতীয়ত, ঐ কয়টি নাটকে তো আর বন্যা সৃষ্টি করতে পারে না।

বাঙালী হয়ে জন্মেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সাহেদ সুরাওয়ার্দির কোনদিনই তেমন পরিচয় ঘটেনি। ঘটলেও এ-কথা তিনি উপলব্ধি করতেন কিনা জানি না যে, বাস্তবতাবোধের অভাবই বাংলা নাট্য সাহিত্যের অনুপযোগিতার প্রথম কারণ।

নাটকের প্রাণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত। এর মধ্যে বাস্তবতার অভাব ঘটলে নাটক জমবে না, কেননা, সুরাওয়ার্দিরই ভাষায় 'নাটক ও দর্শকের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, এমন কি ব্যক্তিগত', তাই শুধু ভাবাবেগ বা বর্ণনার ঐশ্বর্য দিয়ে বাস্তবতার অভাবমোচন রঙ্গালয়ে অসম্ভব। আষাঢ়ে বা পৌরাণিক নাটক দিয়ে রঙ্গালয়ের পুরো খোরাক যোগানো কখনো সম্ভব নয়।

বাস্তবতা ও সাহিত্য

সুরাওয়ার্দি রঙ্গালয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানাশ্রেণীর নাটকের মধ্যে 'বাস্তব-পন্থী' নাটকের উল্লেখ করলেও তার ওপর মোটেই জোর দেননি। কিন্তু বাস্তবতাবোধ সম্বন্ধে তখন বাংলা দেশের একাধিক লেখক যে সজাগ হয়েছিলেন তার প্রমাণ পরিচয়-এর পাতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। কল্লোল-এর যুগের নয়—সত্যিকারের বাস্তবতাবোধ। সেই সময়ের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি নিচে দিলাম—প্রবন্ধটি হুমায়ুন কবিরের 'সাহিত্যে বাস্তবতা-বোধ' (পরিচয়; কার্তিক, ১৩৩৯)।

কবির এই প্রবন্ধে লিখেছিলেনঃ

> "সকল সাহিত্যই যে প্রপ্যাগান্ডা বা কেবলমাত্র মতামত প্রকাশমূলক হবে এমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু কোনো কথা বলতে গেলেই তাতে কোনো-না-কোনো মতামত প্রকাশ পায়, এবং সেভাবে সাহিত্যে যদি মতামত প্রকাশ না থাকে তবে সে সাহিত্যের জীবনেব সঙ্গে যোগ শিথিল হয়ে আসে।"

প্রবন্ধটির শেষের দিকে লেখক অভিযোগ করেছেনঃ

> "বাংলা সাহিত্যে অবাস্তবতা যে কত বেশি তাব কেবল আর একটিমাত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এ প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।
>
> "এ দেশে আজ প্রায সাতশো বছর হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি ঘর করছে। দুঃখে সুখে শান্তি অশান্তিতে, কলহকোন্দলে, বন্ধুত্বমিলনে তাদের সম্বন্ধ কি কখনো বাঁওয়ে ওঠে নাই? বন্ধুতা শত্রুতা জাতিধর্ম মেনে চলে না। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে কাউকে আমবা ভালবাসি, কাউকে হিংসা করি, ক উকে ঘৃণা করি। কাবু সঙ্গে শৈশবেব পরিচয় যৌবনের বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। কাবু সঙ্গে জাতি-ধর্মভেদের পার্থক্যেব সঙ্গে স্বার্থ-বৈভিন্ন্য মিলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি কবে। কিন্তু সন্ধির পথেই হোক আব দ্বন্দ্বেব পথেই হোক, জীবনে কেবলমাত্র হিন্দু বা কেবল-মাত্র মুসলমানের ছায়া পড়েছে এমন লোক বাংলা দেশে বেশি নাই। যেখানে

> বাতাস এক, আবহাওয়া এক, নদনদী খালবিল এক, একই মাঠে পাশাপাশি কাজ করতে হয়, একই গাঁয়ে ঘর বেঁধে থাকতে হয়, সেখানে হিন্দুমুসলমান গায়েব বাতাস বাঁচিয়ে চলবে কী করে? কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কোথাও কি তার ছায়াটুকু পড়েছে? সমস্ত বাংলা সাহিত্য পড়েও কি কেউ ভাবতে পারে যে সাতশো বছর এত বড় দুটো জাতি এমনি করে পাশাপাশি জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে?... বাংলার সাহিত্য বাংলার জাতীয় জীবনের এ বৈচিত্র্যকে রূপ দিতে পারে নাই, তাই জীবনের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যে বাংলা সাহিত্য আজো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নাই।"

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান

বাস্তবতাবোধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে কবির নিজের বাস্তাবতাবোধের অভাব প্রমাণ করেছেন এই উক্তিতে।

অবশ্য কথাগুলি লেখা মনের দুঃখে। এই দুঃখ অকারণ নয়। বাংলা দেশের মুসলমানের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অতি সামান্য, এই কারণে হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় মুসলমানের সংখ্যাও নগণ্য। ফলে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে-স্তরে কবির পৌঁছেছিলেন সেখানে দু'একটি বাদে, মুসলমানদের সাহচর্য পাওয়ার কোনোই উপায় তাঁর ছিল না। তাই স্বভাবতই হিন্দু ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যালরা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল—এই টানেই তিনি ভিড়েছিলেন পরিচয়-এর আড্ডায়। সাহেদ সুরাওয়ার্দি বা কবিরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরিচয়-এর লেখকগোষ্ঠীর উজ্জ্বল রত্ন, আইয়ুব—এই দুজনেরও অবস্থা ছিল কবিরের মতন। কবিরের দরদী মনকে স্বভাবতই ব্যথা দিয়েছিল এই জাতীয় আড্ডায় বা ব্যাপকভাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিজের সম্প্রদায় ও সমাজ সম্বন্ধে দরদের ও জ্ঞানের অভাব।

কিন্তু এই নিয়ে কবির যে অভিযোগ করেছেন তাতে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টির থেকে সেণ্টিমেণ্টই বেশি প্রবল। কবির লিখেছেন, বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে একই আবহাওয়ায়, একই খাল-বিল-নদ-নদীর পরিবেশে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সমাজ কবে এক হয়েছে? সমাজের যে-স্তর থেকে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব সেই স্তরে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক যোগাযোগ কোনোদিনই হয়নি। এর জন্যে সমাজ ও ধর্মের অন্ধ সংস্কার অনেকটা দায়ী। এই গোঁড়ামি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, একে ঘা দেওয়া সাহিত্যিকের অবশ্যকর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তা করেছেন—শুধু হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে নয়, সাধারণভাবে। অপরপক্ষে, সংকীর্ণ হিন্দু সংস্কারের ও হিন্দু ঔদ্ধত্যের বীজ ছড়িয়ে আমাদের মনকে বিষাক্ত করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যাঁরা সাহিত্যে বাস্তবতার সমর্থক তাঁদের কর্তব্য এই দারুণ বিষ থেকে বাঙালীর মনোবৃত্তিকে, বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করা। শুধু হিন্দু-মুসলমানের অবাস্তব কল্পিত মিলন দেখিয়ে তা সম্ভব নয়। কেননা, হিন্দু-মুসলমানের মিলন পুরোপুরি কোনোদিন হয়নি। শুধু ধার্মিক ও সামাজিক গোঁড়ামির জন্যে নয়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে। এই রাজনীতির প্রবর্তক ব্রিটিশ-রাজ। তারই প্রত্যক্ষ ফল আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, পরোক্ষ ফল আমাদের

সমাজ ও সাহিত্য। হিন্দু জমিদার সরকারের গোলাম, গোলামের গোলাম মুসলমান ও হিন্দু প্রজা। বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে প্রধানত মধ্যবিত্ত লেখকদের হাতে। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর সুখদুঃখ তাঁদের রচনায় আর কতটা ফুটতে পারে?

মূল সমস্যা সাম্প্রদায়িক নয়, শ্রেণীগত বিরোধ। কবির এ-বিষয়ে মোটেই সচেতন নন। "জীবনে কেবলমাত্র হিন্দু বা মুসলমানের ছায়া পড়েছে এমন লোক বাংলা দেশে বেশি নাই।" কবিরের এই কথা নিতান্তই ভাসাভাসা। সামাজিক আদানপ্রদান সামান্য হলেও সুখেদুঃখে বিজড়িত হিন্দু চাষী মুসলমান চাষী এবং অবশ্য হিন্দু-মুসলমান মজুর। কিন্তু যে-মাটিতে মজুরদের চাষীদের বাস সে-মাটিতে এখনও সাহিত্য পৌঁছয়নি, পৌঁছতে আরম্ভ করেছে সবে। এই মাটিতে সাহিত্য ফলাতে যে-সাধনার ও যে-সংগ্রামের প্রয়োজন কবিরের প্রবন্ধে তার আভাসমাত্র নেই।

'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা'

হুমায়ুন কবিরের চাইতে অনেক বেশি পরিণত দৃষ্টিতে, অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাহিত্য সমস্যার আলোচনা করেছিলেন, ঐ একই যুগে, ধূর্জটিবাবু তাঁর 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে। এটি ছাপা হয়েছিল ঠিক কুড়ি বছর আগে।

বাংলা সাহিত্যের চরম দুর্বলতা মুসলমানী ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা, এই অভিযোগ জানিয়ে কবির ক্ষান্ত হয়েছিলেন। আর ধূর্জটিবাবু লিখেছিলেনঃ

> "এদেশে আমরা সকলে সমাজসত্তাকে পাশ কাটিয়ে আসছি, তাই আমাদের সাহিত্য, আমাদের সমশ্রেণীর প্রাণেই কেবল সাড়া দেয়, জনসাধারণের কাছে তার কোনও আবেদন ও মূল্য নাই। সমাজ গেল ভেঙে, মানুষের ব্যবহার গেল বদলে, অথচ সাহিত্যিক খরগোশের মতন ভাবছেন চোখ বুজলেই বিপদ কেটে যাবে। তা হয় না, তা হয় না, তা হয় না। এখন চোখ খুলে দাঁড়াতে হবে, সমাজ ভাঙার ও গড়ার শক্তিকে, তাকে বিজ্ঞানই বলুন বা শ্রেণী-বিবোধই বলুন—কি দুইই বলুন, আমাব তাতে আপত্তি নাই, ব্যবহার কবতে হবে।"

কবির চেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যকে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডির থেকে মুক্ত করতে, আর ধূর্জটিবাবু চাইলেন, তার অল্পদিন পরেই, বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী-বিরোধ আমদানি করতে।

কবিরের ঐ প্রবন্ধের তুলনায় ধূর্জটিবাবুর প্রবন্ধে প্রগতিশীল চিন্তার ছাপ যে অনেক বেশি স্পষ্ট ফুটেছিল তার আর একটি নমুনা প্রোপাগ্যাণ্ডা সম্বন্ধে ধূর্জটিবাবুর এই উক্তিঃ

> "সাহিত্য অন্তত, নবযুগের সাহিত্য, প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হতে বাধ্য। বামায়ণে, মহাভারতে আর্যধর্ম, ক্ষাত্রধর্মের তরফদারি আছে; রবীন্দ্রনাথেও আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার, পুবাতন সমাজেব বিপক্ষে এবং এখনকাব নতুন সমাজের তরফে কিছু বলতে গিয়ে ব্যাস-বাল্মীকি-রবীন্দ্রনাথকেও প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হতে হয়েছে। জন কয়েক যখন সর্বসাধারণেব সঙ্গে মিশে যায, কিংবা জনসাধারণে কোন কারণে,

বুঝে না বুঝে, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার দরুন একটি শ্রেণীকে স্বীকার করে নেয়, তখন সাহিত্যের প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হয়ে ওঠেন প্রফেট্। প্রোপাগ্যাণ্ডা হ'ল জীবনস্রোতের এই ঘাটার ঢেউ।"

'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা'র মূলকথাঃ

"ইতিহাসের পটভূমিকায় নটের অভিনয়-অংশ সম্বন্ধে সচেতন না হলে কি করে চলবে? সাহিত্যে যে সমাজসত্তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক চেতনার প্রয়োজন। যে সেই সমাজ গড়বে, সেই বড় সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করবে।"

পরিচয় ও মার্কসবাদ

মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যায় ঐ প্রবন্ধটি ঠাসা। তখনকার দিনে ও-সব কথা নতুন ছিল। ভাবগঙ্গার ঘোলাটে জলে ফুটল লালের আভা।

ঐ সময়ে একটির পর একটি প্রবন্ধে সুশোভন সরকার বর্ণনা করছিলেন তখনকার ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা। অত্যন্ত সরল ভাষায় সমসাময়িক ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য। পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে অনেকেরই তখন চোখ ফুটেছিল ঐ লেখাগুলি পড়ে। শুধু 'তরুণ' ইন্‌টেলেকচুয়্যালদের কথা বলছি না, তখনকার পরিচয়-এর একাধিক প্রবীণ পাঠকের মুখে ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি সুশোভনের ঐ প্রবন্ধগুলির। অবশ্য ঐ জাতীয় রচনা পড়ে যে তাঁরা নতুন সমাজ গড়ার তাগিদ বিশেষ করে অনুভব করেছিলেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এর কিছুকাল পরে সদ্য বিলেত-ফেরত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসে যোগ দিলেন পরিচয়-এর আড্ডায় ও লেখকগোষ্ঠীতে। পরিচয়-এর পাতায় লালের আভা আর একটু গাঢ় হল। কিন্তু এই রং প্রথম ফুটিয়েছিলেন ধূর্জটিবাবু তা ভুললে অন্যায় হবে।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাদে এদেশে রীতিমত মার্কসবাদ অধ্যয়ন ও আলোচনা ধূর্জটিবাবুর আগে আর কে করেছিলেন জানি না। ভূপেনবাবুও বাংলা দেশের সাহিত্যিক আসরে মার্কসবাদের বার্তা প্রচার করেননি। যেটুকু করতেন তা অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে গল্পে ও আলোচনায় বা এমন রচনায় যা সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে। ধূর্জটিবাবুরই মুখে শোনা একটি গল্প মনে পড়ছে। ভূপেনবাবু বেড়াতে গিয়েছিলেন দার্জিলিঙ্-এ ও ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে ছিলেন একই বাসায়। হঠাৎ একদিন ভূপেনবাবু নাকি গাইতে শুরু করলেন

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো এমন তরণী বাওয়া।

সংগীত-রসিক ধূর্জটিবাবুকে গান গেয়ে মুগ্ধ করার মতন গানের গলা যে তাঁর ছিল না ভূপেনবাবু তা বিলক্ষণ জানতেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের ঐ বিখ্যাত গানটির বিশুদ্ধ মার্কসীয় ব্যাখ্যা শোনানো। বিশেষ একটি কবিতার বিচারে মার্কসীয় পদ্ধতির প্রয়োগ বাংলা দেশে বোধহয় এই

প্রথম। আশা করি ধূর্জটিবাবু একদিন ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাটির বৃত্তান্ত লিখবেন যাতে এ-যুগের পরিচয়-এর পাঠকেরা ভূপেনবাবুর ঐ ব্যাখ্যার সঙ্গে নীরেনের 'উর্বশী' ও 'সোনার তরী' কবিতার বস্তুবাদী বিশ্লেষণ মিলিয়ে উভয়ের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার করার সুযোগ পান। মনে রাখা দরকার, ভূপেনবাবুর ঐ ব্যাখ্যা প্রাক্-কড্ওয়েল যুগের।

ঐ সময়ে বা কিছুকাল পরে বাংলা দেশে দু'একটি বামপন্থী কাগজের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঐ রকম একটি কাগজে কোনো লেখক নাকি লিখেছিলেনঃ

> রবীন্দ্রনাথ=ফিউড্যালিজম্=ক্ষয়িষ্ণুতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতা বা ঐ রকম কিছু অতি জঘন্য ব্যাপার।

এই কথাও শোনা ধূর্জটিবাবুর মুখে। খুঁটিনাটি সব মনে নেই। তখন বামপন্থী সাহিত্য-বিচারে মার্কসীয় পদ্ধতির থেকে বেশি ফুটছিল বিনয়-সরকারী উগ্রতা। নইলে, অমন নিটোল ইকুয়েশান কোত্থেকে আসে? ধূর্জটিবাবু ঐ অপূর্ব সিদ্ধান্তের উল্লেখ করলেই খেপে উঠে বলতেন, "এই তোমাদের মার্কসবাদ"। ধূর্জটিবাবু স্বভাবতই খ্যাপা লোক, সুতরাং তাঁর গালিগালাজ গায়ে মাখার দরকার নেই। আর ঐ যুগের 'আপনি মোড়ল' জাতীয় মূর্তিমান মার্কসবাদীদের মন্তব্যও ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, তাঁদের অনেকেই এখন মুখোশ খসিয়ে স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে মার্কসবাদ প্রয়োগ এ-যুগেও কি যথেষ্ট সুস্থ হতে পেরেছে?

[ক্রমশ]



রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈপরীত্য

ঋষি দাস

প্রগতিশীলদের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছেন। এক দল তাঁকে অবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে চান, আবার এক দল তাঁকে সম্পূর্ণ প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করতে চান নির্বিচারে। যাঁরা তাঁকে অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী বলে বর্জন করতে চান, তাঁরা তাঁর আধ্যাত্মিকতা, প্রাচীনপ্রবণতা, ইংরেজপ্রীতি, হিন্দুয়ানা, পলায়নপরতা অতি-ব্যক্তিকতা ও অস্পষ্টতার উপরেই জোর দেন বেশি। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই অবিলপ্বী বা প্রতিবিপ্লবী দিকগুলিকে একেবারে অস্বীকার করাও যায় না। আবার যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ প্রগতিশীল, বিপ্লবী চিন্তাধারার বাহন বলে গ্রহণ করতে চান, তাঁরা তাঁর মানবতা, স্বাদেশিকতা, প্রকৃতিপ্রেম, যুদ্ধবিরোধিতা, লোকসংস্কৃতির প্রতি সুগভীর অনুরাগ এবং বাঙালীর জাতীয় ভাষাকে এক অপূর্ব শক্তি ও অপরূপ সুষমা দানের গৌরবময় দিকগুলির উপরেই জোর দেন বেশি। আনন্দের বিষয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই দিকগুলি এমনই স্বপ্রকাশ যে, সেগুলি প্রমাণ-প্রয়োগের বা যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। ফলে, প্রগতিশীল শিবিরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু রকম বিরুদ্ধ মতামত পাশাপাশি সমান্তরালভাবেই চলেছে এবং সমান্তরাল রেখাগুলি মিলে না, এই সাধারণ জ্যামিতিক নিয়ম অনুসারে তাঁদেরও মতের মিল হচ্ছে না। অবশ্য, তাঁদের মতের এই গরমিলের সবচেয়ে বড়ো কারণ এই যে, তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করেননি, তাঁরা প্রচলিত মধ্যবর্জিত যুক্তিরীতিরই আশ্রয় নিয়েছেন।

সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে কমরেড দাঙ্গে বলেছেনঃ

"Why such two widely opposed views of one and the same writer? Because our critics have been intent on classifying him *exclusively* in one or the other category and for that purpose have used only that writings of his which suited their purpose most." (*Indian Literature*, II, 1952)

একথা সত্য। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে দু-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা সুপ্রতিপন্ন হবে, আশা করি।

রবীন্দ্রনাথ 'হাতেকলমে' প্রবন্ধে লিখেছিলেনঃ

"যতবার মফঃস্বলে একজন ইংরেজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার এই দেশীয়দের পরাজয় হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই সে আমাদের দাসত্বের গহ্বরে এক পা করিয়া আরো নামিতে থাকে।...ইংরেজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে

কতকটা তাহাদেব সমকক্ষ জ্ঞান কবিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে, দাসত্বের থব থর ভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব। ...সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের লোকেরা ইংরেজেব প্রতিকূলে দাঁড়াইযা কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা কবিতে শিখিবে। সে শুভদিন কখন আসিবে?..."

উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ বিদ্রোহী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতকে মাথা তুলে দাঁড়াতে, অত্যাচারের প্রতিরোধ করতেই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু তিনি "রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি" প্রবন্ধে যা বলেন, তাকে ঠিক এর বিপরীত বলা চলে। তা প্রকারান্তরে অত্যাচার ও ভীরুতাকেই প্রশ্রয় দেওয়াঃ

". পোলিটিক্যাল প্রয়োজনের যে বিধান, তাহা ন্যায়েব বিধান, সত্যের বিধানের সঙ্গে ঠিক মেলে না।...আমরা প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইযাছি। আমবা বুঝিতেছি, পোলিটিক্যাল উদ্দেশ্য সাধনে ধর্ম-বুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা অনাবশ্যক।"

তিনি এ-কথাও বলেনঃ

"শারীরিক কষ্ট, ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে,—ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তিব হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিযা পাছে গুণ্ডা হইযা উঠি।"

চৌরিচৌরার ঘটনার পরে ঘোষিত গান্ধীবাদী রাজনীতির মর্মকথার সঙ্গে এর পার্থক্য কী? এখানে ন্যায় ও সত্যের নামে অন্যায় ও অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়ার ও মেনে নেওয়ার কথাই বলা হয়েছে। ভারতের জনসাধারণ যখনই স্বাধীনতার সংগ্রামকে নিজেদের হাতে নিতে চেয়েছে, ভারতের ভীত বুর্জোয়া নেতৃত্ব তখনই ধর্মের কথা আওড়েছে এবং রামনাম জপ করেছে। কেননা, সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে জনসাধারণকেই তার ভয় বেশি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ধর্মনীতির এই প্রচারণাকে প্রগতিশীলরা যে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতারণা বলেই গ্রহণ করবেন, তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই।

'কালান্তরে' রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে যে-সব বিভ্রান্তিকর মতামত প্রকাশ করেছেন, প্রগতিশীলরা নিশ্চয়ই তাকে সানন্দে নিতে পারেন না। অথচ সেগুলিই যে রবীন্দ্রনাথের স্থির ও স্থায়ী মতামত তা ভাববারও কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। তিনি "ইংরেজের আতঙ্ক" প্রবন্ধে বলেছিলেনঃ

"কিন্তু এতোদিনে ইংরেজ একথাটা বুঝিযা থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিকস্ তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান কবিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিক্যাল ঐক্যেব কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে, মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিকস্‌ও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে। মুসলমান যদি দূরে দূরে থাকে, তবে কংগ্রেস হইতে (ইংরেজের) আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।"

এই কথাগুলি নিশ্চয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিন্দা নয়। কেবল তাই নয়, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে-মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল, তার পশ্চাতে যে

ইংরেজের অদৃশ্য হস্ত বর্তমান, সে-বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ বেশ সচেতন ছিলেন। 'সুবিচারের অধিকার' প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ

"উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরো অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনো কালেই বিরোধ ঘটে নাই, সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশংকার অবতারণা করিয়া এক পক্ষের বিচারগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।"

সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময়েই অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু যিনি 'মুকুট' ও 'কাবুলিওয়ালা'র মতো গল্প লেখেন, যিনি 'সতী'র মতো নাটক লেখেন, তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিযুক্ত করতে সত্যই বাধে। রবীন্দ্রনাথের মনের উদারতা ও হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা যে কোন্ স্তরে গিয়ে মাঝে মাঝে পৌঁছতে পারত তা 'সতী' নাটকে অমাবাঈ-এর কাহিনী পড়লে বোঝা যায়। মারাঠী হিন্দু রমণী অমাবাঈ একজন মুসলমান বীরকে বিবাহ করেছেন। ফলে অমাবাঈ-এর ক্রুদ্ধ পিতা তাঁর 'ম্লেচ্ছ' জামাতাকে করেছেন হত্যা। এই প্রসঙ্গে অমাবাঈ পিতাকে বলেছেনঃ

"তব ধর্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম মর্ম আছে
* * *
...পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।
হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীর পদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।"

'মুকুট' গল্পের সেনাপতি ইসা খাঁর বলিষ্ঠ চরিত্র এবং কাবুলিওয়ালার স্নেহময় সকরুণ রূপটিও কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লেখকের লেখনীতে আসা সম্ভব বলে সহজে মনে হয় না।

সুতরাং উপরের আলোচনা ও উদ্ধৃতিগুলি থেকে এই সহজ সিদ্ধান্তে আসা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের সমাজনীতিক বা রাজনীতিক মতবাদের মধ্যে বৈপরীত্য বা স্ববিরোধ আছে এবং তাঁর সৃজনী রচনার সঙ্গেও তাঁর সামাজিক ও রাজনীতিক মতবাদের সামঞ্জস্য সকল সময়ে নেই।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধে কমরেড দাঙ্গে বলেছেনঃ

"Tagore, when he wrote as a poet and a dramatist, i.e., when he was on the job of creation in the realm of art, revealed himself fully and trully..when he wrote as a 'social reformer' or as a politician or essayist, his emotions and sentiments, his imagination and thoughts became circumscribed and inhibited".. আবার অন্যত্র ঃ "..a real artist thinks more truly through his art than through an essayist's logic."

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী। তিনি যখন শিল্পের জগতে কাজ করেছেন, তখন নিজেকে পূর্ণতর ও সত্যতর রূপে প্রকাশ করেছেন, এ-কথাও সত্য। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথের সৃজনশিল্পের মধ্যে বৈপরীত্য ও স্ববিরোধ নেই, তার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বর্তমান আছে এবং সেগুলিকে বিরুদ্ধমতাবলম্বী সমালোচকরা তাঁদের স্ব স্ব মতের প্রমাণের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারেন না। একটি উদাহরণ দিইঃ

'রাজর্ষি' উপন্যাসে বিল্বন বলছেঃ "বনে কি মানুষ গড়া যায়? বনে কেবল একটা উদ্‌ভিদ পালন করা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্যসমাজেই গঠিত হইতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের সেই সুবিখ্যাত কাব্যোক্তি—"দাও সে অরণ্য, লও এ নগর"-এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য কই?

প্রকৃত শিল্পী তাঁর সৃজনলোকে নিজেকে পূর্ণতর ও সত্যতর রূপে প্রকাশ করেন সত্য; এবং সেই কারণেই এ-ও সত্য যে, শিল্পীর নিজের মধ্যে যে বৈপরীত্য বা স্ববিরোধ থাকে, তাও পূর্ণতর ও স্পষ্টতর রূপে তাঁর শিল্পে প্রকাশ পায়। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর মতোই তাঁর সৃজনমূলক রচনার মধ্যেও স্ববিরোধ ও অসামঞ্জস্যকে পদে পদে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। তাই ১৮৯১-এর ২৯শে জানুয়ারি তারিখে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত একটি পত্রে তিনি বলেনঃ

"এখন একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে।..একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সব শুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।"

পরবর্তী কালে (৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯) অজিত চক্রবর্তীকে লিখিত একটি পত্রে তিনি বলেনঃ

"এমনতর আত্মবিরোধ জগতে খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়।"

এই স্ববিরোধিতা, যে-সম্বন্ধে শিল্পী নিজেই সচেতন ছিলেন, অথচ যাকে তিনি কোনোক্রমেই অতিক্রম করতে পারেননি—তার উৎস কোথায়? সে-উৎসের সার্থক সন্ধানের জন্যে আমাদের দুটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে—এক, শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন; দুই, শিল্পীর সমাজগত, এবং শ্রেণীসমাজে শ্রেণীগত, জীবন। ব্যক্তিগত জীবনেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্ববিরোধ লক্ষ্য করা যায়ঃ একদিকে তিনি ধনীর পুত্র, জমিদার, ব্যবসায়ী, ঠাকুর কোম্পানির মালিক, ব্যবসায়ে অকৃতকার্যতার ফলে ঋণজালে আবদ্ধ, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, প্রচারক ও স্তোত্রকার, আবাল্য ভগবানে গভীর বিশ্বাসী, বারে বারে মৃত্যুর আকস্মিক আক্রমণে মর্মান্তিকভাবে আহত এবং সে-আঘাতকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় ভগবানের কাছে আরো অসহায়ভাবে তাঁর আত্মসমর্পণ ও বৈরাগ্য। অন্যদিকে তিনি অতুলনীয় অনুভব ও কল্পনাশক্তির অধিকারী, জীবন উপভোগের জন্য অকুণ্ঠ অতৃপ্ত তাঁর পিপাসা, দুঃখী ও দরিদ্রের জন্য সুতীব্র তাঁর বেদনা, সুবর্ণ-সভ্যতার প্রতি ঘৃণা, বিদেশী ও স্বদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভূরিভোজের মধ্যে তিনি আজন্ম লালিত ও পরিপুষ্ট। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে

স্ববিরোধ থাকাই ছিল স্বাভাবিক এবং এই স্ববিরোধকে তিনি কখনো সম্পূর্ণ-রূপে অতিক্রম করতেও পারেননি।

রবীন্দ্রনাথ যে-শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন, সে-শ্রেণীর ভূমিকাও ছিল এমনি দ্বিধাবিভক্ত, এমন স্ববিরুদ্ধ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একদিকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের যেমন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ, অন্যদিকে তেমনি ছিল সম্প্রীতি এবং ভারতীয় জনসাধারণকে শোষণের কাজে সহযোগিতা ও শরিকানা। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধে যেমন ভারতীয় জনসাধারণই ছিল ভারতীয় বুর্জোয়াদের একমাত্র ভরসা, তেমনি ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ছিল (আছে) অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। তাই ভারতীয় বুর্জোয়ারা আপনার স্বার্থে কখনো আশ্রয় করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের করুণা-কণাকে, আবার কখনো নির্ভর করেছে জনসাধারণের বলিষ্ঠ বাহুকে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় বুর্জোয়াদের এই দ্বিমুখী রূপটা প্রকাশ পেয়েছে গান্ধীবাদের মধ্যে। কখনো তারা প্রয়োজনমতো কৃষক ও শ্রমিকের সাহায্য নিয়েছে, আবার কখনো প্রয়োজনমতো ছুটে গিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, ভারতীয় বুর্জোয়াদের রাজনীতির এই রূপটা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে। তাঁর ধনঞ্জয় বৈরাগীই যেন একদিন গান্ধীর রূপ নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লেখেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতীয় রাজনীতিতে 'অহিংস খাজনা বন্ধের' আন্দোলনটা এসেছিল এর অনেক পরে। খাজনা বন্ধের বিপ্লবী দিকটাকে অহিংসার প্রতিক্রিয়াশীল দিকটা যে একেবারে নাকচ ক'রে দিয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও দেখি ধনঞ্জয় বৈরাগীর খাজনা বন্ধ আন্দোলনকে তার মার-খাওয়ার নীতি ও রাজার সঙ্গে হৃদ্যতা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল।

আর একটি জিনিস লক্ষণীয়। বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী হবার চেষ্টা এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মৈত্রী একই সঙ্গে চলেছিল। ভারতীয় বুর্জোয়াদের এই স্ববিরোধী নীতি কিন্তু একটা জায়গায় এসে আপাত-সামঞ্জস্য লাভ করেছিল—পুরাতনের প্রতি প্রীতির মধ্যে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করেছিল ভারতের প্রাচীন অনুন্নত সমাজ-ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখতে, তাই তারা সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রশংসায় হয়ে উঠেছিল পঞ্চমুখ। তাই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম স্থাপয়িতা ওয়ারেন হেস্টিংস ভগবদ্গীতার ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় বলেছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেদিন থাকবে না, সেদিনও গীতার বাণী অমর হয়ে থাকবে। এতে হয়তো অনেকে গীতার মাহাত্ম্য লক্ষ্য করবেন; বলবেন, ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো পাষণ্ডকে-ও গীতা অভিভূত করেছিল। কিন্তু আমরা বলব অন্য কথা। গীতা নিস্পৃহ হয়ে কর্ম করার যে-বাণী বহন করেছে, তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের কাছে ভালো লাগারই কথা। পারিশ্রমিকের প্রতি লক্ষ্য না রেখে পরিশ্রম করার —নিষ্কাম কর্মের—এমন বাণী আর কোথায় আছে? যাই হোক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে একটি পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখার চেষ্টায় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকেও জীইয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শ্রেণী-

সমাজের স্ববিরুদ্ধতার অনিবার্য নীতি অনুসারে এই প্রাচীন সংস্কৃতিই ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে জাতীয়তাবাদের অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠল। তাই গীতার "বাসাংসি জীর্ণানি" আউড়ে কত দেশভক্ত বীরই না প্রাণ দিল! অর্থাৎ ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদের মিলনভূমি ও মল্লভূমি হ'য়ে উঠল। এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় বুর্জোয়া চিন্তাধারার একটি প্রধান অংশে পরিণত হল। রবীন্দ্র-সাহিত্য অঙ্গে অঙ্গে তার প্রমাণ বহন করছে।

এইভাবে আমরা দেখি, কি ব্যক্তিগতভাবে, কি শ্রেণীগতভাবে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা থাকাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দুটি দিক অত্যন্ত পাশাপাশি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে। সেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই দুটি দিক সম্পর্কে প্রগতিশীলদের সর্বদা সচেতন থাকা প্রয়োজন।

এ-দিক থেকে দেখতে গেলে, কমরেড দাঙ্গে অচলায়তন সম্পর্কে যে-আলোচনা করেছেন, তা অসম্পূর্ণ। বহু শতাব্দীর পুরাতন অর্থহীন শ্বাস-রোধী যে-কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান ভারতীয় সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে, তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অচলায়তন' নাটকের মধ্যে। কিন্তু তাঁর সে-বিদ্রোহ তিনি নিজেই প্রশমিত করেছেনঃ তিনি অচলায়তন ভেঙে যে নতুন মন্দির সেখানে গ'ড়ে তুলতে চাই-লেন, তাও অচলায়তনেরই আরেক সংস্করণ। তাই মহাপঞ্চক সেখানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত। নাটকের শেষাংশে ছাড়া অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ মহাপঞ্চককে ঘৃণার সঙ্গে পরিহাসের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু নাটকের শেষাংশে রবীন্দ্র-নাথ তাকে অকস্মাৎ নিতান্ত অভাবনীয়ভাবে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিলেন, তা লক্ষণীয়। যেন নিজের সৃষ্টি দেখে তিনি নিজেই ভীত হ'য়ে উঠেছেন এবং মুহূর্তে মহাপঞ্চককে তার হৃত সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে তাঁর বিদ্রোহের খেলা শেষ করেছেন। তাই 'অচলায়তন' নাটকখানি একটি 'নতজানু বিদ্রোহে' পরি-ণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যাকে এত বিদ্রূপ ও ঘৃণা করলেন, আবার অসুবিধা বুঝে যাকে তার সিংহাসনে এনে বসালেন, সেই মহাপঞ্চক কে? মহাপঞ্চক হল সেই ব্যক্তি, যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে থাকে। তাই শোণপাংশুরা যখন অচলায়তনের প্রাচীন প্রাচীর বিধ্বস্ত করে দিল, তখন মহাপঞ্চক বললঃ

"পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পাব, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ ক'রে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি, তবু তোমাদের হাওয়া, তোমাদের আলো লেশ-মাত্র আমাকে স্পর্শ করবে না।"

এর উত্তরে একজন শোণপাংশু বললোঃ

"ঠাকুর, লোকটাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাই—আমাদেব দেশের লোকের ভারী মজা লাগবে।"

শোণপাংশুর উত্তরে দাদাঠাকুর বললেনঃ

"ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কি বন্ধন তোমাদের হাতে আছে?"

দাদাঠাকুরের এই কথায় অন্য একজন শোণপাংশু বললোঃ

"ওকে কি কোনো শাস্তি দেব না?"

দাদাঠকুর বললেনঃ

"শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পাববে না। ও আজ যেখানে বসেছে, সেখানে তোমাদের তলোযাব পেঁছিয় না।"

পরে মহাপঞ্চক সম্পর্কে দাদাঠাকুর আবার বলছেনঃ

"ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোভ-ভয় জীবন-মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ ক'রে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন অনুসারে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোভ-ভয় ও জীবন-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটি নিশ্চয়ই প্রগতিশীল জীবনদর্শন নয়! সৌভাগ্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথও এই দর্শনকে নিজে সকল সময়ে স্বীকার করে নেননি। কেমন ক'রে আমরা ভুলব তাঁর সেই মহান বলিষ্ঠ ঘোষণাঃ

পঞ্চক ॥ শোণপাংশুদের—

দাদাঠকুর ॥ হ্যাঁ, ওদেরও ডেকে বসাতে হবে, ওরা একটু বসতে শিখুক।

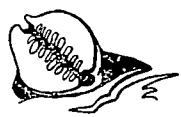
পঞ্চক ॥ ওদেব বসিয়ে বাখা! সর্বনাশ! তাব চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশী ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছটফট কবাকেই মুক্তি মনে করে।

দাদাঠাকুব ॥ ছোট ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুশী হযে মনে করে, এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায। ওবাও সেই রকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি মজার জিনিস বলে জানে—কিন্তু জানে না, স্থির হয়ে বসে তার ভেতর থেকে সাব পদার্থটা বের ক'বে নিতে হয়। কিছু দিনের জন্য তোমার মহাপঞ্চক দাদার হাতে ওদেব ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে ওর নিজের ভিতরেব দিকটাতে পাক ধবাবাব সময় পাবে।

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত দাওয়াই কি পশ্চিমী সভ্যতার পক্ষে, কি কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়, এ-কথা সব মার্কসবাদীই নিশ্চয় স্বীকার করবেন। অথচ এই পরামর্শ দিয়েই অচলায়তন নাটকের উপসংহার (সংহার?) হয়েছে! তবে অচলায়তনকে বিপ্লবী চিন্তার বাহন ব'লেই মেনে নেব কেমন ক'রে?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈপরীত্য ও স্ববিরোধ আছে প্রচুর এবং এই বৈপরীত্য ও স্ববিরোধ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক না হলে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে পদস্খলন বা প্রতি-ক্রিয়ার পঙ্কে নিমজ্জন অনিবার্য। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে প্রগতিশীল-দের সুকঠিন কর্তব্য রয়েছে। সে-কর্তব্য হল রবীন্দ্র-সাহিত্যকে তার উপযুক্ত

পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা ও প্রচার করা। প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের সমালোচকরা (ভক্তরা?) রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক ও "গুরুদেব" বানিয়ে ফেলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কারণ, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা তাঁদের হাতে একটি প্রবল অস্ত্র। তাই তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দুর্বোধ্য কবিতা ও নাটকগুলির উপরই জোর দিচ্ছেন বেশি। প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহের' গোড়ায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাবের বাহন হিসাবে গান ও কবিতার পরেই নাটকের স্থান। অথচ রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের পরিমাণ ও সংখ্যা নাটকের চেয়ে মোটেই কম নয়। প্রকৃতপক্ষে, গল্প-উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার অনেক কাছে এসে পৌঁছেছিলেন, যে-বাস্তবতাকে প্রতিক্রিয়াশীল পাঠক ও সমালোচকরা ভয় করে। 'গুপ্তধন'-এর কাহিনী যতই রোমাণ্টিক হোক, তাতে সুবর্ণের কারাগারে মানবাত্মার যে-রুদ্ধশ্বাস মৃত্যুর আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে, তার ক্ষীণ বিবর্ণ অনুকরণও কি আমরা তাঁর নাট্য-সাহিত্যে পাই? কমরেড দাঙ্গেও দেখছি, কেবল কাব্য ও নাটকের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রতিভা যে কেবল কাব্যে ও নাটকে নিঃশেষিত হয়নি, তা ভুলব কেমন করে? অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসেও যে স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য নেই তা নয়। এখানে আমি প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের কয়েকটি ঝোঁকের কথা বলছি। এই ঝোঁকগুলি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।



রবীন্দ্রনাথ

অরুণা হালদার

অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং কথাটা আমরা ছোটবেলায় প্রায় অনেকেই মুখস্থ করেছিলাম, সেকথা কিন্তু উপলব্ধি হত না রবীন্দ্র-রচনাবলী সমগ্রভাবে না দেখলে। তিনি যে কি ছিলেন আর কি ছিলেন না এ নিয়ে বহু কথাই আলোচিত; এক একটি যুগের বহু প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এক একটি মহামানব আবির্ভূত হন, একটি মহামানসের সৃষ্টি হয়, একথা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই আমরা বলতে পারি। ষোড়শ শতকে বিশ্ব পেয়েছিল শেক্সপীয়রকে—যা হয়নি আর হবে না। গুপ্তযুগে ভারত পেয়েছে কালিদাসকে, ১৯ শতকে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথকে; একথা বলতে বাধা নেই যে এই এক একটি মহামানসের দানে বিশ্বের এক একটি বিকাশের স্তর খুলে যায়—উঁচু হয়ে ওঠে; তার আগেও তেমনটি ছিল না, পরেও আর হবে না। তাই ইংলণ্ডে আর শেক্সপীয়র হয়নি, ভারতে তথা বিশ্বে রবীন্দ্রনাথও আর হবে না। তাঁর কাব্য, তাঁর সংগীত, তাঁর চিত্রকলা, তাঁর নন্দনতত্ত্বপদ্ধতি, সাহিত্যের স্বরূপ, মানবতা, দর্শন প্রভৃতি প্রতিটি দিকেই তাঁর অপূর্ব দান যা একমাত্র পথিকৃৎই দাবি করতে পারেন: পূর্বোক্ত প্রতিটি পথের সম্বন্ধেই এবং আরও নানাদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মননেব, সংবেদনার, সৃষ্টিস্ফুরণের অজস্র দ্বার খুলে দিয়েছেন।

আমাদের প্রত্যেকের কাছেই রবীন্দ্রনাথ এক প্রকাণ্ড বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় রাজনীতিপ্রবণতা আছে একথাও হয়তো বিস্ময়াবহ। যদিও আমার দিক থেকে দেখলে আমি মনে করি এদেশের পক্ষে তাঁর প্রতিভা আর প্রয়াস এ-দুটোই বেশি বিস্ময়ের; তাঁর রচনার মধ্যে রাজনীতিমূলক চিন্তার সহজ আত্মপ্রকাশ তত বিস্ময়ের নয়। আর একথা বলার জন্য যে যুক্তি তা ঠিক সাহিত্যের দিক থেকে দিতে পারব না; সে যুক্তিটা কিছুটা মেলে মনোবিজ্ঞানে আর কিছুটা মেলে সমাজবিজ্ঞানে। সাহিত্যের মাপকাঠি আর উপরিউক্ত শাস্ত্র দুটির বিচারের মাপকাঠি একও নয়। সাহিত্যের কাজ হল গড়ে তোলা, তা সৃষ্টিধর্মী; আর বিজ্ঞানের কাজ হল ভেঙে বা চিরে দেখার, তা বিশ্লেষণ-পরীক্ষাধর্মী। সাহিত্য পড়ার আনন্দ আছে, তার গতি, তার উদ্দেশ্য, তার জন্ম-ইতিহাস অনুধাবন করার আনন্দও কম নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগই আমাকে সে সাহিত্যের গতিপথ অনুসরণ করতে প্রবৃত্তি দিয়েছে। কবির কবিত্ব লাভও কবির কবিত্বের প্রেরণা যোগাবে, এ বস্তুদুটি পরস্পরসাপেক্ষ! এই বস্তুকে কবি কখনও অর্জন করেন নিজের প্রয়াসে, কখনও বা লাভ করেন উত্তরাধিকারসূত্রে। রবীন্দ্রনাথও সেইভাবে, একই পথে চলেছেন স্বকীয় অতুলনীয় শক্তির লাগাম ধরে। বহু ভাবের মতো রাজনীতিও তাঁর রচনায় কখনও সচেতন, কখনও অর্ধচেতনভাবেই স্পষ্ট হয়েছে। তিনি যা বলেছেন

আমি সেটার ওপর টীকাটিপ্পনী করব না, শুধু স্বচ্ছন্দভাবে অনুসরণ করে দেখাব কেমন করে সে-ধারা সমস্ত রচনার মধ্য দিয়েই বয়ে গিয়েছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে ব্যক্তিমানস তথা কবিমানস প্রথম থেকেই তৈরি রূপ নিয়ে জন্মায় না। বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই তার উৎকর্ষ। আবার কবিমানসই হোক বা ব্যক্তিমানসই হোক তা সচল। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ না সে শেষ ভেঙে পড়ে কিংবা বাস্তব পরিবেশকে আর নিজের অনুকূলে আনতে পারে ততক্ষণ তা নদীপ্রবাহের মতো বয়ে চলতে থাকে। যখন তার বয়ে চলা সম্ভব হয় না তখনই ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্ব কিংবা প্রতিভা দুইয়েরই ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। পূর্বোক্ত পরিবেশ কথাটিও অবশ্য এমনি সচল অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। কারণ, দেখছি মানুষও বদলায়, পরিবেশও বদলায়; এই দুইটির মধ্যে খানিকটা সম্পর্কও থাকে। অর্থাৎ পরিবেশকে বদল করে। শিল্পীর জীবনে একথা বিশেষভাবে সত্য হয়। দেশকালপাত্রের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে তিনি তাঁর প্রতিভালোকে বিরাজ করেন, এ ধারণাটা অর্ধ-সত্য। তিনি বিকাশলাভ করেন সর্বাপেক্ষা গভীর সংবেদনশীল মন নিয়ে, তাঁকে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের মালমশলা নিয়েই রচনা করতে হয় আপন কাব্য; সেই মালমশলার মিশ্রিত রসায়নে যে সৃষ্টি তিনি করেন তাতে থাকে সত্যের নিগূঢ় আভাস। তা থেকে পথনির্দেশ পায় তাই পাঠকসমাজ; কবি হন আদরণীয়। যে শিল্পী যত বড় ক্ষমতাশালী তাঁর রচনায় তত বিশেষভাবে আমরা তিনটি জিনিস লক্ষ্য করি। প্রথম ব্যাপকতা, তাতেই বহু মানুষের কাছে শিল্পীরও সমাদর। বহু জীবনের থেকে মাল-মশলা পেয়েছেন তিনি, তাই তা ব্যাপকভাবে পাঠকের কাছে আদৃত; এর স্রষ্টা ব্যক্তিবিশেষ ততটা নয়, যতটা সমস্ত সমাজ, ইতিহাস। এ-জাতীয় শিল্প মহা-কাব্যজাতীয়। বহুযুগব্যাপী মানব-সমাজ সে শিল্পকে চেনে; সে-রীতির বাহক আমাদের 'রামায়ণ', 'মহাভারত' থেকে শুরু করে পাঁচালি, ছড়া আর লোকগীতি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, অবশ্য কাব্যগুণে তারতম্য আছে। দ্বিতীয় জাতের রচনার মাপকাঠি হল গভীরতা; অনেক যুগের অনেকখানি প্রয়াসের ফলে এ-জাতীয় শিল্পের অভ্যুদয়। কালিদাস, শেক্‌সপীয়র, গ্যেটে, রবীন্দ্র-নাথের শিল্পরীতি এই জাতের। এক-একটি বিশেষ সংবেদনশীল প্রতিভা সমাজের ও ইতিহাসের সত্যকে নিজের মনে আহরণ করে নিয়ে তাকে আপনার রসদৃষ্টিতে জারিয়ে পরিবেশন করেন। তবু এই দুই প্রকার রচনায় একটি মিল আছে। তা হল এই—যে-জাতীয় রচনাই হোক না কেন তাতে একটি যুগের ওঠাপড়ার ছাপ থাকবেই; আর যিনি যতবেশি প্রতিভাসম্পন্ন সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী হবেন তাঁকে ততবেশি এই বিভিন্ন ভাবধারাকে গ্রহণ করে যেতে হবে। তৃতীয় জিনিসটি কি? কবিগুণ বা প্রকাশশক্তি বা নিজস্বতা (Originality)—সকলেরই কবিগুণ থাকা চাই, অরিজিনালিটিও থাকা চাই, কিন্তু প্রধান কবি জানেন, কবিত্ব বিষয়ানুরূপ হয় এবং অরিজিনালিটি "মূল"নুবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর ওপর সাহিত্য-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর

ছিলেন। সেই যুগে ইতিহাসের ও পৃথিবীর বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধেও মানুষ সচেতন হয়েছে; আবার শুধু একটি নয়, বহু রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক আবহাওয়ার রঙবদলও সমসাময়িক কালে হয়েছে। বিচিত্রের কবি রবীন্দ্রনাথ সে-পরিবর্তন দেখেছেন আর আপনার শিল্পজগতে বারবার অনুভব করেছেন। সেই আলোড়নের একটি দিকই আমি এখানে উপস্থিত করছি।

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন,—যে-যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন ব্রিটিশ ডিমোক্র্যাসি, ব্রিটিশ জাস্টিস প্রভৃতির প্রতি ছিল তাঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। অথচ একটা নালিশও ছিল; সেটা হল এই যে যে-ইংরেজ স্বদেশে ও পৃথিবীতে স্বাধীনতার পথিকৃৎ সেই তারাই ভারতস্বাধীনতার শত্রু। এই ভাবের কথা তাঁর ১৯১৬-১৭ সময়কার রচনায়ও পাওয়া যায়। 'ছোটবড়', 'মন্ত্রী নির্বাচন' তাঁর এ-জাতীয় প্রসিদ্ধ রচনা। সেগুলিতে ইংরেজের ভারতে অনুসৃত নিয়মকে তিনি শক্ত ভাষাতেই নিন্দা করেছেন। বিনা বিচারে বন্দী আটক রাখা যে ইংরেজ ঔপনিবেশিক রাজত্বের গুণ তাও তিনি বলতে বাকি রাখেন নি। অবশ্য এ-জাতীয় শাসনপদ্ধতি যে কেবলমাত্র ইংরেজেরই গুণ নয়, তা যে সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতারই সাধারণ গুণ—এ-কথাটা তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ কেন, কারুর কাছেই স্পষ্ট হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে তা স্বীকৃত হল ১৯২৯-৩০ সালের পূর্বে নয়। ১৯২৮-৩০ সাল ও তার পরের বছরগুলিতে সারা দেশ জুড়ে সন্ত্রাসবাদমূলক স্বাধীনতার লড়াই ও তার বিপক্ষে ব্রিটিশ দমননীতি—এই দুই প্রকার ক্রিয়াকলাপই তাঁর কবিচিত্তকে ব্যথিত করেছিল। মানবতাবাদের অমর স্বাক্ষ্যস্বরূপ তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতাটি তখনকার দিনেই লিখিত হয়—হিজলীর বন্দীশালার হত্যাকাণ্ডের ওটি কাব্য-রূপ কিনা জানি না। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের নির্মমতা, অসহায়ের প্রতি সবলের দুর্বিনীত অত্যাচার-কলঙ্কিত জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১৯১৯), হিজলী জেলের বন্দীদের প্রতি গুলি চালনার (১৯৩২) মধ্যে যে অমানুষিক বর্বরতা ছিল সে বীভৎস অন্যায়কে তিনি স্বীকার করেননি। অথচ পূর্বেই ব্রিটিশ ডিমোক্র্যাসির প্রতি তাঁর তথা তাঁদের পরিবারগত আস্থা কম ছিল না। সেই ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সালের ভারতের রাজনীতির উত্থানপতন রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে স্তরে স্তরে ফুটে উঠেছে। রাজনীতি মানব-জীবন-বহির্ভূত বস্তু নয়—আর রবীন্দ্রনাথের মানবতা অবাস্তব নয়—সেই কারণেই তাঁর কাব্যের ঘোষণা দুটি—অর্থাৎ মানবতা ও রাজনীতি—স্বতন্ত্র বিষয় হলেও এত স্পষ্ট। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে রবীন্দ্র-সাহিত্যে রাজনীতি-চেতনা দ্বন্দ্বমুক্ত নয় সত্যই; কিন্তু তাঁর রচনায় এই দ্বন্দ্বকে স্বীকার করে সচেতনভাবে তাকে কাটিয়ে ওঠার একটা ক্রমিক ইতিহাস বলে দেখলে আমাদের ভুল হবে না। এ সত্যের মূল প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের জীবননিষ্ঠা। তিনি জানতেন এবং মানতেন যে জীবন সচল আর তা সৃষ্টিশীল। তিনি আরও জানতেন যে রাজনীতির জন্ম হওয়া চাই জীবনের ভেতর থেকেই। আর এ-দুটো তথ্যের থেকে যা পাওয়া যায় সে সত্যও তিনি জানতেন যে, রাজনীতিও সৃষ্টিধর্মী, পরিবর্তনশীল। সেজন্য একথা বলতে পারা যায় যে, সৃষ্টিকুশলী রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চেতনাও

ক্রমপরিবর্তনে বিবর্তনশীল এবং সৃষ্টিশীল রাজনীতি ছাড়া অন্য রাজনীতির প্রতি তা বিমুখ। অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেই অনেকের রাজনীতি হল ক্ষমতার লড়াই, কখনও বা দৈনন্দিন চালবাজী। একথা মনে রেখে দেখলে দেখব—এই সৃষ্টি-ধর্মী রাজনীতি কিরূপে ক্রমশ রূপায়িত হয়ে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে কবির নানাবয়সের নানাযুগের রচনায়।

ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের জন্ম-পরিবেশ থেকেই। পারিবারিক তথা সংহত-ভাবে ঠাকুরগোষ্ঠীর মধ্যে অনুভূত সাংস্কৃতিক তথা মননশীল মতবাদ (যাকে ইংরেজি ভাষায় সহজ করে বলা যায় cultural rationalisation), সে বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় সাহিত্যচর্চা, সে বাড়ির অধ্যাত্মলোকের সঙ্গে মেলানো জাতীয় মর্যাদাবোধ, নতুন কিছু গড়ে তোলার প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে সেখানে নাটকে, পোশাকে, গানে, কবিতায়, নারী-জাগরণে, স্বদেশীমেলায় এবং হয়তো বা স্বদেশী জাহাজ কোম্পানির অতলে তলিয়ে যাওয়ার মধ্যেও। রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে শুরু করে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির বিরাট পরিবারের আবহাওয়ায় আমরা দেখি নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ, নবলব্ধ 'বুর্জোয়া ভ্যালু' প্রকট হল সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে, সুরশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে। তখনকার দিনে জ্ঞানেন্দ্রনন্দিনী নারীদের মধ্যে করলেন পর্দাপ্রথার অবলোপ; স্বামীর সঙ্গিনী হয়ে তিনিই ঘোড়ায় চড়ে প্রকাশ্য রাজপথে বের হলেন আর কালাপানিও পার হন। হিন্দু মেলা হয় ১৮৭২ সালে; সেই সময় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা পড়া হয়—এ-কবিতা দেশপ্রেম বিষয়ক কবিতা। এ-প্রসঙ্গে একথা বললে ভুল হবে যে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি করতেন; কিন্তু মানুষ রাজনীতির চেতনাকে অস্বীকার করতে পারে না; হয় সে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করে নয় পরোক্ষে স্বীকার করে, একটা কোনোও ভূমিকায় সক্রিয় অংশ তাকে গ্রহণ করতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের সমষ্টিগত বিশ্বাস পরোক্ষ রাজনীতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন, অন্তত এই পর্যায়ে, তা মানতে হবে। সে স্বীকৃতি অনেকাংশে তৎকালীন সমাজকে ভেঙে গড়ে পথ দেখি-য়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ক্ষুদ্র পরিসরকে রবীন্দ্রনাথই তাঁর চিন্তাধারার সাহায্যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিশালতায় উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। তখনও সাধারণের মধ্যে এ সংস্কৃতি প্রচারিত হয়নি। এই স্তরে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের অজস্র রাজনৈতিক প্রবন্ধমালা, যেমন, 'স্বদেশ' ও 'রাজাপ্রজা' লেখা, এরও আগে ১২৯৭ সালে লেখা 'মন্ত্রীঅভিষেক'। ১৯০৫ পর্যন্ত এ-যুগ চলেছে। তাঁর বক্তব্যকে পরিষ্কার করে বুঝতে গেলে কয়েকটি সূত্রে ভাগ করে আমরা নিতে পারি—(ক) ভারতবর্ষে রাষ্ট্র ছিল না, 'সমাজ' ছিল। এই সমাজ কথাটা মস্তবড় কথা। ভারতীয় সভ্যতার বাস্তব রূপ ছিল রাষ্ট্র নয় পল্লিসভ্যতা—'আত্মনির্ভর পল্লী-সমাজ' (Village Community)—একেই তিনি সমাজ বলেছেন।

এটি ঠিক ধরলেও সঙ্গে সঙ্গে আর একটি তথ্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় ধরা পড়েনি। কারণ, সেদিকটা তাঁর কাছেও স্পষ্ট হয়নি। সেই পল্লিসভ্যতার

রূপ তখন ভেঙে আসছে—রঙ্ বিবর্ণ। সে-সমাজ টিকছে না; যে-অবস্থায় তিনি তাকে দেখেছেন তা হল ভেঙে যাওয়ার পথে। ঐতিহাসিক সত্য এটা; গ্রামীণ সভ্যতা ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির অবসন্নতা অনিবার্য। এর সঙ্গে আসন্ন সত্য হল নতুন সমাজব্যবস্থা, এই নতুন সমাজের সঙ্গে খাপ খাবে নতুনতর রাজনৈতিক-চেতনা। (খ) এখন, অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের জীবনের যে পর্যায়ের কথা বলছি সে পর্যায়ে শিক্ষিতদের রাজনৈতিক চেতনা অনেকাংশেই ছিল পুঁথিপড়া আর ধারকরা; পশ্চিমী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তখন এদেশে এসেছে লিবারালিজম আর বেন্থাম-মিলের হিতবাদ। এ জিনিস নতুন এবং সমাজের সঙ্গে যোগহীন। এ রাজনীতি রবীন্দ্রনাথের মতে মূলহীন আর তাঁর মতে অপমানজনক। তিনি বারে বারে বলেছেন, একথা দেশের সাধারণ মানুষ বোঝে না, শিক্ষিতদের এসব সভা-সমিতির থেকে তারা বেশি চেনে সামাজিক কাজ। অতএব যথার্থ পলিটিক্স হচ্ছে এই সমাজ গড়া, নিজের দেশকে নিজে গড়া। একথা লক্ষ্য করার মতো যে, রবীন্দ্রনাথের অন্যসব ভাবনার মতোই এ ভাবনাও সৃষ্টিধর্মী, গড়ে তোলার পক্ষপাতী। তাঁর সে গড়ে তোলা রূপ নেয় পরে শ্রীনিকেতনের সংগঠনে। রবীন্দ্রনাথ বললেন—ইংরেজ তার শাসনযন্ত্র নিয়ে থাকুক; আমাদের উচিত হবে গ্রামগুলিকে নবজীবন দান করা, এদেশের মানুষকে তার স্বকীয় চেতনায় উদ্‌বোধিত করা। তাই তাঁর উক্তি—'এইসব ম্লান মূঢ় মূক মুখে দিতে হবে ভাষা'। বারবার তিনি বলেছেন 'আত্মশক্তি' চাই, 'স্বদেশী সমাজ' গঠন করা চাই, সকলের সমবায়ে চাই 'ভাণ্ডার'-রচনা। একথা বললে অন্যায় হবে না, রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্নসূত্রই অনেকাংশে শেষ পর্যন্ত ১৯২১ সালে গান্ধীজীরও গ্রাহ্য হয়। গান্ধীজীর পরিকল্পনা রূপ নিল চরকায়, 'গৃহশিল্পে ও আত্মশুদ্ধিতে। একদিক থেকে গান্ধীজীর পরিকল্পনা সহজবোধ্য ও কার্যকরী; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা বিজ্ঞানের পরিপন্থী। অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানপন্থী; তবুও সমাজের গতিধর্ম অনুযায়ী আধুনিক রূপ যে যন্ত্রশিল্প ও সমাজবিজ্ঞানের সহায়তাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এ-কথা রবীন্দ্রনাথও সে-যুগে ধরতে পারেননি। তাই তাঁর রচনার এ-পর্যায়ে আমরা গ্রামীণ সভ্যতা ও স্বদেশী সমাজ গঠনেরই ইঙ্গিতমাত্র পাই।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বিতীয় স্তরে এসে আমরা দেখি প্রথম স্তরের চিন্তাভাবনা এ-স্তরে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে কাজের মধ্যে। 'স্বদেশী সমাজ' এ-সময়কারই রচনা। 'বঙ্গদর্শন', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার'—এ-সময়কার অজস্র প্রবন্ধে ভরা। তাঁর এ-সময়কার দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ—(১) তাঁর কাব্যে ও সংগীতে; (২) রাখীবন্ধন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রভৃতির মারফত তাঁর প্রয়াসে; (৩) এ-সময়ে জাতীয় প্রেরণার বশে তিনি প্রায় হিন্দু ন্যাশন্যালিজমের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিধর্ম ও আবাল্যপ্রাপ্ত লিবারালিজম তাঁকে সে-পথে যেতে দেয়নি। (৪) ১৯০৮-৯ সালে লেখা তাঁর 'গোরা'র মধ্যে এই সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের একটি পুরো ইতিহাস; সেখানে পরেশ ও আনন্দময়ী

চরিত্রে এই সমন্বয় সুস্পষ্ট; (৫) পরবর্তী কালে তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতেও একই ভাব।

এর পরে তৃতীয় স্তরে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন; তাঁর কবিমানস তখন সৃষ্টি করে চলেছে তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলি। তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে-সত্য তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা হল—পুরনো যুগ গেছে, সে বেঁচে আছে শুধু আঘাত খেয়ে ভেঙে পড়ার জন্য। এ-জাতীয় রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হবে তাঁর 'অচলায়তন'।

ইতিমধ্যে এসেছে ১৯১৪-১৮ সাল, বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের চাকা। রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তাঁর 'বলাকা', তার মধ্যে দুটি সত্য লক্ষ্য করার মতো—গতি আর পরিবর্তনের অনিবার্যতা। এ ছাড়া তাঁর এ-সময়কার 'ন্যাশনালিজমের' ইংরেজি বক্তৃতাবলী বিশেষ মূল্যবান। তিনি বুঝেছেন জাতীয়তাবাদ কিংবা ভারতবর্ষ কথাটার অর্থ সংশোধন প্রয়োজন: তা না হলে জাপান, জার্মানি, ইংলণ্ড—এ-সব নাম যে-জাতীয় শাসনেরই ইংগিত দিক, আসলে তা সাম্রাজ্যবাদেরই এক-একটা স্তম্ভমাত্র। ভারতবর্ষ বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম নাম দিলেই তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব থেকে তাকে মুক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় পলিটিকসের একটা মূল কথা রবীন্দ্রনাথ তখনই বুঝেছেন: শুধুমাত্র ন্যাশনালিজম নাম দিলে তার যা দুর্বলতা হয় তা তিনি ধরতে পেরেছেন। তাঁর চিন্তার নিজস্ব ধারার এই গ্রন্থিচ্ছেদ হচ্ছে বললে ভুল হবে না।

চতুর্থ স্তরে রবীন্দ্রনাথ এ-সমস্যার সমাধান যে-যে পথে করতে চেয়েছেন তা হল (১) বিরাট সমন্বয়মূলক সর্বমানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা "হার্মনি"বাদ: (২) সংঘর্ষকে একটি শান্তিময় আপোসের মধ্য দিয়ে ঘটনার বিন্যাসে সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা: (৩) ভারতীয় উগ্র স্বাজাত্যবোধ ও সংকীর্ণতা (যাকে Indian Chauvinism বলা হয়)—এ দুটির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীর অমোঘ যুক্তি। প্রথমটিকে আমরা চিনতে পারি 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি রচনায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারা অনুসরণ করা চলে 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' এবং 'বাঁশরী'র মধ্যে। সন্ত্রাসবাদের যুগে বাঙলাদেশ যে ভ্রমপ্রমাদমুক্ত ছিল তা কখনো বলব না। তবুও বলব কবিগুরুর 'চার অধ্যায়' জাতীয় রচনায় দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়বাদের ভেতরেও তীক্ষ্ণ অসামঞ্জস্য রয়ে গিয়েছে। অনেক সময়ই সমন্বয় দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ না হলে দ্বন্দ্বকে পাশ কাটিয়ে যাবার রূপ নেয় চার অধ্যায়ে তার চিহ্ন আছে। রবীন্দ্রনাথের হার্মনি-বাদ একেবারে ভ্রান্তি-শূন্যও নয়।

পঞ্চম স্তরে তিনি দেখলেন নতুন জগৎ। 'রাশিয়ার চিঠি' এ-সময়কার রচনা। তাঁর বক্তব্যঃ যা তিনি শান্তিনিকেতনে করতে চেয়েছেন এরা তা রাশিয়া জুড়ে করতে চাইছে। তাঁর কথায় রাশিয়া না দেখলে এ-যুগের

তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত। সেখানে তিনি দেখলেন বিংশ শতকের 'স্বদেশী সমাজ'—নতুন মানবসমাজ। নতুন রাজনৈতিক চেতনার কার্যকরী সৃষ্টিময়ী পরিকল্পনা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন; প্রত্যক্ষ করলেন ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের অবলোপকে। স্বভাবতই এ-সত্য দর্শনে, এ-সত্য স্বীকারে বহু ভুলভ্রান্তি ছিল; কারণ এ তো শুধু তাঁর কবিধর্ম নয়। তবুও তার জীবননিষ্ঠা ও সৃষ্টিধর্মী মনই তাঁকে এ-সত্য উপলব্ধির অনুভূতি দিয়েছে—রাশিয়া যা করেছে তা সত্য, তা মানবতার বাস্তব বিকাশ।

এই স্তরের চেতনাই তাঁর ক্রমশ স্পষ্টতর হয়েছে, তাঁর দ্বিধা ক্রমশ কেটে এসেছে। তারই প্রকাশ তাঁর এদিককারের কবিতায়,—যেমন 'আফ্রিকা', এবং 'প্রান্তিকের' বিশেষ করে শেষ দুটি কবিতায়। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের মুখোশটাকে তিনি আর মুখ বলে ধরেননি। ১৯২৯-৩৫ পর্যন্ত চলেছে বিশ্বব্যাপী দুর্দিন। যাকে তিনি জানতেন মানুষের অধিকার বলে, সেই মানুষের অধিকারকে বারবার আঘাত হানল তাঁর চোখের সামনে সাম্রাজ্য-বুভুক্ষু ফ্যাসিবাদ। মানবনিয়তির ইতিহাসের এ-পরিচয় যে তাঁকে কতখানি নাড়া দিয়েছিল তা প্রত্যক্ষ হয় 'সভ্যতার সংকট' লেখায়। নোগুচির কাছে লেখা চিঠিতেও সেই ভাবের পুনরুক্তি। আবার এই সময়টিতেই তিনি প্রতিবাদ করলেন মিস র‍্যাথবোনের চিঠির। সে-সময়ে তিনি পূর্ণ সুস্থও নন, তবুও ভারতের তখনকার দিনে যেদিন আর কেউ প্রতিবাদ করেননি মিস র‍্যাথবোনের অপমানকর অভিযোগের। সর্বভারতের সর্বদলীয় নেতার শীর্ষদেশেই তাঁর স্থান, যিনি সহজ মর্যাদায় তাঁর জাতীয় জীবনের মর্যাদাকে নিজের সঙ্গে যুক্ত না ভেবে পারেননি। এ সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি অবলীলাক্রমে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদে নিজে দুষ্কৃতকারীর দেওয়া সম্মানকে পরি-ত্যাগ করেছিলেন; এ সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি অক্টারলোনি মনুমেন্টের নিচে জনসভায় সভাপতিত্বকালে অসহায় বন্দী মানুষের প্রতি গুলিচালনাকে বজ্র-কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তার ন্যায়-অন্যায় বোধ সর্ব অসম্মানের ঊর্ধ্বে। যা মানবনিয়তির পক্ষে কল্যাণকর তাকে তিনি স্বীকার না করে পারেননি।

।

সর্বশেষ স্তরে তাঁকে দেখি তাঁর চেতনার প্রায় সব কটি গ্রন্থিই কেটে গিয়েছে—একটি বাদে। জগতের সঙ্গে তাঁর অনুভূতি যুক্ত; সর্বদেশের সর্বকালের চেতনাকে তিনি নিজের চেতনায় প্রকাশ হতে দেখেছেন। হতাশার মধ্যে একটিমাত্র আশাই তিনি পেয়েছেন—ঐ মহামানব আসে; অর্থাৎ কোনো মহামানবের আগমন কোনো প্রতিভাবান মানবধর্মী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কল্পনাই তিনি মানবনিয়তির জন্য করতে পেরেছেন। তাঁর এগিয়ে-আসা রচনা 'শিশু-তীর্থ', 'ওরা কাজ করে', 'ঐকতান' প্রভৃতি কবিতায় মাঝে মাঝে গণমানবের তথা গণজনের কথা উল্লেখ করলেও জনশক্তিকে তিনি কোথাও যেন অনিবার্য ভাবতে পারেননি। আগামী দিনের এই মহামানব না দেখলেও মহামানবতার আদর্শে

তিনি স্থাপনা করে গিয়েছেন এ ক্ষেত্রেও। এই ভারতবর্ষের অতিবামনতার পটভূমিকায় তিনিই প্রকাণ্ড বনস্পতি—বহুজনের বহুদিনের আশ্রয়। তিনি নিজে জানতেন, বিচিত্র এ-ধরণীর সব দিকে তাঁর গতিপথ মুক্ত হয়নি। মানবচেতনার চলিষ্ণু ধারাটিকে তিনি সক্রিয়ভাবে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন এ তিনি জানতেন, কিন্তু বুঝতেন হয় নাই তা সর্বত্রগামী। আবার একথাও তিনি সত্য বলেছেন ঐকতান কবিতায়—

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
সাহিত্যের ঐকতান সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায—
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি—
তুমি থাক তাহাদেব জ্ঞাতি,
তোমাব খ্যাতিতে তারা পায যেন আপনার খ্যাতি।

আবাল্য তিনি ডিমোক্র্যাসির কথা শুনে এসেছেন। সেই ডিমোক্র্যাসি যে সত্যই গণমানবের জাগরণে এবং মহামানবের আগমনে নয় এই কথাটির আভাস-মাত্রই তাঁর কবিতায় আমরা পাই, পূর্ণ ঘোষণা পাই না।*

* পাটনা রবীন্দ্র-পরিষদে পঠিত।

বড়রাস্তার বাঁকে

অধীর ভট্টাচার্য

ঘটনাটা ঘটল হঠাৎ—। মেঘশূন্য আকাশ থেকে বাজ পড়ার মতো।

পুলিসের গাড়িখানা থামল রাস্তার ধারে। দারোগা সাহেব একদঙ্গল পুলিস নিয়ে নামলেন হুড়মুড় করে। দাঁড়ালেন এসে লোকগুলোর সামনে, হুকুম করলেন—'ভাগ্ শালে লোগ্, ভাগ্ হিঁয়াসে ..।'

লোকগুলো হাবার মতো চেয়ে থাকে দারোগা সাহেব আর তার পঙ্গপাল বাহিনীর দিকে। তারা কি কসুর করল, যার জন্যে এমন হুকুম হঠাৎ তাদের মাথার ওপর লাঠি নিয়ে হাজির? চুরি-চামারী কিছু করেনি, খুন-রাহাজানি করে বেড়ায় না, করে শুধু ভিক্ষে। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়।

এই মাঠে ওরা অনেকদিন ধরেই আছে। বছরখানেক হল এই ফাঁকা মাঠে। ঘরও বাঁধেনি যে জমি বে-দখল হবে। দিনের বেলা মাঠ ফাঁকাই থাকে, শুধু রাত্রিবেলা ফিরে এসে পড়ে থাকে একসারি মরামানুষের মতো। শূন্য মাঠে এই সংসারের সম্বল যার যার পরনের ছেঁড়া কাথা-কানি আর খানকয়েক বোরা। গরমের দিনে এই বোরা পেতে শোয়, শীতের দিনে এই বোরার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় দেহ। শীতগ্রীষ্মের মূলধন ঐ বোরা। খানা পাকানোর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। সারাদিন ভিক্ষে করে যা পায় তার বদলে রাস্তার পাশের হালুইকরের দোকান থেকে চেয়ে নেয় কিছু কচৌড়ি কি রোটি। ব্যস্, জীবনধারণের সব চাইতে সহজ পন্থা।

সংখ্যায় কম নেই। মেয়েপুরুষে মিলিয়ে জনাতিরিশের এক মেঠো সংসার। জুটেছে নানান জিলা থেকে। একদিনে জোটেনি—আজ একবছর ধরে জুটেছে। যে এসেছে, নতুন অতিথি হিসাবে সেদিনই সে নির্বিঘ্নে স্থান করে নিয়েছে। কেউ এসেছে ছাপ্‌রা থেকে, কেউ বা মুঙ্গের, আবার দু-একঘর সাঁওতালীও আছে। নানান জেলার নানান জাতের এক আদিম-যাযাবর সমাজ। পেশা সবার এক। দিনের বেলা যার যার বোরা কাঁধে, টিনের মগ হাতে করে বেরিয়ে যায়, রাত্রিবেলা ফিরে আসে। কেউ কেউ এই এক বছরের ভেতরই ল্যাঙড়া হয়ে গেছে, কেউ বা চোখ হারিয়েছে, কারও কারও চুলদাড়ি বড় হয়ে কিম্ভূতকিমাকার বনমানুষের মতো হয়ে গেছে। আকাশের নিচে মুক্ত-স্বাধীন নাগরিকদের একটি নির্ঝঞ্ঝাটের সংসার।

লোকগুলোর এমন সুখের সংসারে হঠাৎ ভেঙে দিতে এলেন দারোগা সাহেব! বোকার মতো প্রশ্নময় দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকে সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে। হাতের কাছের বোরাগুলো বগলদাবা করে নেয়—যদি একান্তই ধাওয়া খায়!

কারণটা ওদের কাছে ব্যাখা করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে দারোগা সাহেব মনে করেন না। কারণও খুব সহজ নয়! কোন্ এক পেল্লয় নেতা আসছেন পিতৃভূমি দর্শন করতে। গাড়ি থেকে নেমে যে রাস্তায় তিনি

সরকারী ভবনে যাবেন বড় সড়কের এক মোড়ে এই ফাঁকা জায়গায় আড্ডা গেড়েছে এই বনমানুষগুলো। স্টেশন থেকে একটু এগিয়ে যেখানটায় গাড়ি মোড় ফিরবে ঠিক সেই মারাত্মক জায়গাটায়।

দুদিন ধরে এই রাস্তাটা সাফ করা হচ্ছে। ঝাড়ু চলেছে দিনে বারচারেক করে। ফল হয়েছে, মানুষ এ তল্লাট দিয়ে হাঁটতে গিয়ে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে মণখানেক করে ধুলো। ফুলের টব সাজানো হচ্ছে রাস্তার দুপাশে, একদম সরকারী ভবন পর্যন্ত। একেবারে জমজমাট ব্যাপার। এলাহি কারবার।

অথচ রাস্তার পাশে, ঠিক যেখানটায় মোটরগাড়ি একবার দাঁড়িয়ে মোড় ফিরবে, তারই মুখে অর্থাৎ কিনা নেতামশায়ের নাকের ডগার ওপর এই সমস্ত ঘাটের মড়া—অসভ্য বনমানুষগুলো থাকবে। কি জানি, হয়তো হ্যাংলার মতো এগিয়েই গেল দর্শন লাভের আশায়—না, হয়তো, মোটরগাড়ির ভিড় দেখে ভিক্ষেই চেয়ে বসল।

'সুতরাং জঞ্জাল সাফ্ করে ফেলে দাও।' হুকুম নিয়ে এসেছেন দারোগা সাহেব। 'ঝেটিয়ে বিদেয় করো যত সব অলক্ষুণে মরামানুষের আবর্জনা।'

কিন্তু যাবে কোথায়? লোকগুলো উট্‌কো হয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল। ড্যাবা-ড্যাবা চোখে চেয়ে বসে থাকে হুজুরের ভয়ংকর মূর্তির দিকে। ভাষাহীন এক নির্বোধ প্রশ্ন।

'ভাগ, ভাগ্ শালেলোগ্, উল্লু কাহেকা—'হম্বিতম্বি করে দু'পা এগিয়ে যান দারোগা সাহেব। পেছনে বাহিনী তৈরি।

ভাঙা কোমরে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় লোকগুলো। দু'পা সরে দাঁড়ায়। যে-সব মেয়েদের কোলে সন্তান আছে, তারা বুকে জাপ্‌টে ধরে বাচ্চাগুলোকে। একহাতে ছেলে, আর হাতে তুলে নেয় ছেঁড়া কাথা-কানিগুলো। দু'পা সরে আবার দাঁড়ায়। ওরা যাবে কোথায়? কোথায় গেলে ফের তাড়া খাবে না?

দারোগা সাহেব এবার লেলিয়ে দিলেন পুলিসগুলোকে। হুজুরের হুকুম তামিলে সিদ্ধহস্ত পঙ্গপালেরা ধাওয়া করল ওদের। লাঠি বাগিয়ে এমন তাড়া করল যে ওরা অন্য উপায় না দেখে আস্তে আস্তে পেছন-সরে এসে দাঁড়াল রেললাইনের পারে। ফের সেখান থেকে তাড়া। অগত্যা রেল-লাইনের ওপারে আমবাগানের ভেতর গিয়ে ঢুকল সবাই। ততক্ষণে সন্ধ্যে নেমে এসেছে গভীর হয়ে আমবাগানের ভেতর। লোকগুলো হোঁচোট খেয়ে, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। অন্ধকারের কালো গর্তে ঢুকে পড়ল ওরা—মিশে গেল অন্ধকারের সঙ্গে।

মাঠ এখন সাফ্ হয়ে গেল। বিরাট এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দারোগা সাহেব হাঁক ছাড়লেন—'পাঁড়ে, পাঁড়ে কাঁহা ..'

লাঠি হস্তে লখন পাঁড়ে এসে দাঁড়াল সেলাম জানিয়ে—দুপায়ের জুতোর গোড়ালিতে ঠকাঠক্ আওয়াজ করে—'জী হুজুর!'

সাহেব হুকুম করলেন—'আজ রাত বারোটা পর্যন্ত তোমার পাহারা। কড়া নজর রাখ। শুয়োরগুলো যেন ফের না আসে...।'

আবার জুতোর গোড়ালিতে ঠকাঠক্ আওয়াজ করে পাঁড়ে সেলাম জানাল —'জী হুজুর'।

শান্ত জনশূন্য মাঠে পাঁড়ে রইল পাহারাদার হয়ে।

জায়গাটা হল বসতিশূন্য। সামনের রাস্তার দুধারে তিনশো গজের ভেতর কোনো বসতি নেই। ওদিকে একশ' গজ দূরে একটা পান-বিড়ির দোকান আছে খালি। এ-পাশে একটানা রেললাইন।

সন্ধ্যে থেকে পাহারা দিয়ে রাত দশটা বাজল। শীতের রাত। রাস্তার লোক চলাচল, রিক্সা চলাচল বন্ধ হয়ে আসছে। নিঃসঙ্গ অন্ধকার ঘন হয়ে আসে ওপারে ঐ আমবাগানের ভেতর। তার ছায়া এসে পড়ছে এই মাঠে। মাঠের ভেতর পায়চারি করে পাঁড়ে। লোকগুলোর দু-একখানা ছেঁড়াকানি গড়াগড়ি খাচ্ছিল মাটিতে। পাঁড়ে সেগুলো পায়ে ঠেলে কয়েকবার ঘুরল।

অমাবস্যার রাত হবে বোধকরি। মাঠের অন্ধকার ঘন হতে থাকে প্রতিক্ষণে পাঁড়ের যদিও ভূত-জিনে ডর নেই, তবু যেন কেমন শরীরটা একবার ছম্‌ছম্ করে উঠল। লোকগুলোও তো ভূতেরই আর এক সংস্করণ। পাঁড়ে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। নিজের মনে কয়েকবার গুন্ গুন্ করে গান ভাঁজবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাও ঐ 'রামাহো' ছাড়া গাইতে ইচ্ছে করে না। একা একা গান জমেও না ভালও লাগে না।

ওদিককার ঐ পানবিড়ির দোকানটার দিকে চলল পাঁড়ে। দোকান তখনও বন্ধ হয়নি। —'দো একখিলি পান' বলে শ্রীমান দাঁড়াতেই দোকানদার বুঝল বিনেপয়সার খদ্দের এসেছেন। এ-দস্তুরি না দিলেও রক্ষে নেই। কখন আবার এক নম্বর ঠুকে দেবে আদালতে তার কি ঠিক আছে।

পান খেয়ে পাঁড়ের দ্বিতীয় দাবি পেশ করল—'দাও তো একঠো বার্কিলি...।'

পান-সিগারেটে মেজাজ শরীফ করে পাঁড়ে এসে দাঁড়াল তার মাঠের পাশে।

কন্‌কনে শীত। হাড়ের ভেতর পর্যন্ত এ-শীত ঢুকে কাঁপুনি লাগিয়ে দেয়। পাঁড়ে আলখেল্লা পরেছে বিরাট একটা, তবু অস্থির হয়ে ওঠে শীতের ধাক্কায়। অপেক্ষা করে শুধু কখন বারটা বাজবে, তা হলেই নিশ্চিন্দি। খাটিয়ায় গিয়ে পড়তে পারলে বাঁচোয়া।

শীত ঠেকানোর জন্যে পাঁড়ে পায়চারি করে। কখনও আস্তে, কখনও ধীরে। ওর নাগরাই জুতোর ঘায়ে অন্ধকার প্রতিধ্বনি করে ঠকাস্—ঠকাস্। রাস্তা দিয়ে একটা রিক্সা ফিরছে খাটালে। পাঁড়ে হাঁক ছাড়ল—'এই, ইধার ইধার...।'

রিক্সাওয়ালা না এসে পারে না। না এলে এক্ষুনি হয়তো রিক্সাশুদ্ধু ঢুকিয়ে দেবে ফাঁড়িতে। ওর অবিশ্যি ভয় নেই—বাতি, লাইসেন্স দুই-ই আছে। কিন্তু তবু বিশ্বাস নেই এই যমদূতদের। লাইসেন্স কি বাতি কেড়ে নিয়ে হয়তো বলল—'নেই তোর কিচ্ছু, চল্ ফাঁড়িতে।'

রিক্সাওয়ালা আসতেই পাঁড়ে জিগ্যেস করল—'লাইসেন্স-বাতি ঠিক...?'

'জী হুজুর।'

'এখন কোথায় যাচ্ছিস?'

'খাটালে।'

'ওঃ' পাঁড়ে যেন কি ভাবে। জিগ্যেস করে আবার—'কত কামালি আজ?'

রিক্সাওয়ালা বুঝল, হয়েছে এইবার। এখনই ট্যাঁক সুদ্ধ টান মারবে শালা। বলল—'মাত্তর হুজুর পাঁচ সিকে...।'

'তবে আর কি কামালি। ওতো মালিকের পেটেই যাবে।' পাঁড়ে কেমন নিরুৎসাহ। কি যেন ভাবছে।

রিক্সাওয়ালা গতিক ভাল দেখে বলল—'এখন তাহলে যাই হুজুর...।' পাঁড়ের অনুমতি পেয়ে রিক্সাওয়ালা ছুট লাগাল।

নাঃ। পাঁড়ে যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে। একটা লোকও নেই কথা বলবার। আবার আপনমনে পায়চারি শুরু করে। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ পাঁড়ের মনে পড়ে যায় বুকপকেটের চিঠিখানার কথা। চিঠিখানা বের করল পাঁড়ে একবার। আবার সযত্নে ভাঁজ করে রাখল পকেটে। অন্ধকারে চিঠির চেহারা পর্যন্ত দেখা গেল না।

চিঠি দিয়েছে লখিয়া। পাঁড়ের বউ। নিজে লিখতে সে জানে না। বোধ-হয় গ্রামের মথুরার বউকে দিয়ে লিখিয়েছে। গোটা গোটা অক্ষরে কেমন সুন্দর লিখেছে। এ চিঠিতে আছে নতুন সম্ভাবনার এক রোমাঞ্চকর সংবাদ। আর কিছুদিন পরেই হয়তো লখিয়ার সন্তান হবে।

ভাবতে ভাবতে মনটা পাঁড়ের কেমন মিঠে মিঠে লাগল। লখিয়া পাঁড়েকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বাজী ধরার কথা—লিখেছে, 'ছেলে হলে কিন্তু ছেলের জন্যে একজোড়া চাঁদির মল বানিয়ে নিয়ে আসবে। বাজী না রাখলে ছেলের মুখ দেখতে দেব না।'

সেই প্রায় মাস দশেক আগে একবার ছুটি পেয়ে গেছিল পাঁড়ে গাঁয়ে। তারপর, কিছুদিন পরেই সংবাদ পায় এই নতুন সম্ভাবনার। কত আকুপাকু করেছে একবার লখিয়াকে দেখবার। কিছুতেই ছুটি পায় না। শেষকালে শোনপুরে পুজো দেবে বলে মিথ্যে কথা বলে দু'দিনের ছুটি ভিক্ষে করে নেয় দারোগাবাবুর কাছ থেকে। দু'দিনের জন্যে গিয়ে দেখে এসেছে। তাও প্রায় পাঁচমাস হল।

পাঁড়ে লখিয়াকে সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিল—'তুর লেড়কী হবে...।'

লখিয়া পাঁড়ের পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বলেছিল—'তুর মুখে ছাই দেব তাইলে।'

পাঁড়ে তাতে বাজী ধরে। পাঁড়ে বলে, 'মেয়ে হলে তোর নাকের নথ আমাকে দিবি?'

লখিয়া বলে—'ছেলে হলে, ছেলের পায়ের দুগাছি মল বানিয়ে দিবি?'

দু'জনেই স্বীকার করেছে। এবার যখন দিন ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় লখিয়া বাজীর কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যাক্, তাতে পাঁড়ে ভয় খাবে না। সিপাইর চাকরীর পয়সায় যদি না হয় ধার করবে বিশপঁচিশ টাকা। সে যেদিন ছুটি নিয়ে যাবে সেদিন চিন্তে করলেই হবে।

ছুটির কথা ভাবতে গিয়ে পাঁড়ের মনটা কেমন বিস্বাদে কটু লাগে। বিরক্তিতে শরীর ঘিন্‌ঘিন্ করে ওঠে। শালা. এই চাকরি করে কি কারও ঘর-সংসার করবার জো আছে? সেবার ছুটি নিতে গিয়ে কি হয়রানি না হতে

হল। ছুটি চাইলেই বেটারা ভয় দেখাবে—বদলি করে দেবে একদম দূরের দেহাতে। সেই ভয়ে ছুটি কিছুতেই চাইতে পারে না। তবু এদিক কাছে পিঠে আছে, দেশোয়ালীদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে খবর রাখতে পারে। তাছাড়া যদি কেউ অসুখের নাম করল, অমনি তাকে পাঠিয়ে দিল সরকারী ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার একটু দেখেই পাঠিয়ে দেবে পুলিস হাসপাতালে। তেতো ওষুধ খাইয়ে রোগ ছাড়িয়ে ছেড়ে দেবে 'ফিট্' বলে।

সেই প্রায় দশমাস আগের স্মৃতি মন্থন করে পাঁড়ে। বছর ঘুরে এল। আর দু'দিন পরেই হয়তো ছেলে কি মেয়ে হবে। অথচ ছুটি—

'ওকি!' আপন মনে বিড়বিড় করে বলে ওঠে পাঁড়ে। কি যেন একটা হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরছে মাঠের মাঝখানটায়। অন্ধকারের আড়াল ভেঙে যতটুকু পরিষ্কার দেখা যায়, তাতে যে শুয়োরের মতো মনে হয়। দু'পা সরে পাঁড়ে দাঁড়ায় বেলগাছটার আবডালে। আপনমনে বিড়বিড় করে বলে—'শালা, জিন্-টিন্ হবে নাকি?' হতেও পারে। জিনেরা নাকি নানারকম বেশ ধরে চলাফেরা করে। বিড়েল, শুয়োর, কুকুর যা খুশি হতে পারে।

হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরলেও পাঁড়ের শরীরটা ঝাঁকি দেয় প্রচণ্ড এক শিহরণ।

'ওই তো, ওটা যে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পাঁড়ে যদিও জিনের ভয় করে না, তবু তৈরি রইল হাতের লাঠি বাগিয়ে।

দেখল, ওটা এগুতে এগুতে পাঁড়ের কাছেই এসে পড়েছে। তবু এই ঘন অন্ধকারে টের পাওয়া যায় না। খুব কড়া নজর রেখে পাঁড়ে তৈরি হয়ে রইল। হাঁ, হাঁ ঠিক কাছেই এসেছে। লাঠি মারবার আগে হঠাৎ পাঁড়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'কোন্ হ্যায়, রোখ্ যাও।'

ওটা হাউ হাউ করে উঠল ভয়ের চোটে। বসে পড়ল পাঁড়ের সামনে।

'ওমা, একি!' পাঁড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল। একটা বোরা মুড়ি দিয়ে একটা ভিখিরি। নিশ্চয়ই ওদের দলের কেউ হবে। অথচ পাঁড়ের গলা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বুকের ভেতর যেন ঢেউ শুরু হয়ে গেছে তোলপাড় করে।

পাঁড়ে জোরসে ধমক লাগাল—'বেটা শুয়োর, কি করতে এ'ছিস্ এখানে?'

হাউ হাউ করে লোকটা বলল—'খুঁজে পাচ্ছি না, হুজুর...।'

'খুঁজে পাচ্ছি না? কি হারাল?'

হাউ হাউ করে লোকটা আবার বলল—'খুঁজছি বাবু সন্ধ্যে থেকে...পাচ্ছি না..।'

পাঁড়ে ধাওয়া করল ওকে। 'ভাগ্ শালা...ভাগ্...'

তাড়াখেয়ে লোকটা হাটুতে হেটে চলল ঐ আমবাগানের দিকে। ওর হাটুতে হাটার রকম দেখে পাঁড়ে বলে উঠল—'বেটা হাটুতে হাটছিস্, পায়ে হাটতে পারিস না?'

লোকটা জবাব না দিয়ে চার হাতপায়ে চলতে লাগল। পশুর মতো চলতে চলতে মিশে গেল আমবাগানের অন্ধকারে।

পাঁড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এসে দাঁড়াল রাস্তার ওপর। যেমন বিরক্ত

বোধ করল চাকরির ওপর তেমন বিরক্ত হল ঐ লোকগুলোর ওপর। লোকগুলোর জন্যে আজকে যে প্রাণটাই যেতে বসেছিল।

আর আধঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলে যেন বাঁচে পাঁড়ে। অনেকক্ষণ হল এগারোটা বেজে গেছে। একটা উঁচু মাটির ঢিবির ওপর বসল। মনটাকে আবার ঘুরিয়ে নিয়ে গেল শোনপুরের সেই দোহাতে। লখিয়ার কথাটা আজ যেন পেয়ে বসেছে। ঘুরেফিরে মনে পড়ছে—কবে সেই সুসংবাদটা আসবে।

গোঁ—গোঁ—গোঁ—

মাত্র পাঁচটা মিনিট সময় যেতে-না-যেতেই আওয়াজটা কানে এসে ঢুকল। অনেকক্ষণ ধরে পাঁড়ে আওয়াজটা লক্ষ্য করল। আধখানা সিগারেট যেটা টানছিল, তা টানা বন্ধ করে ভালো করে শুনল। আবার উঠছে আওয়াজটা। নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুক জুড়ে যেন আওয়াজটা ছড়িয়ে পড়ছে। একটানা গোঙানির আওয়াজ। ভীষণ ব্যথিত, করুণ এর সুর।

ভূতের কান্না? হতেও পারে। পাঁড়ে শুনেছে ভূতে কাঁদে ঠিক মানুষের মতো। কিন্তু এ-কান্নাটা যেন কেমন মানুষের গলার।

গোঁ—গোঁ—গোঁ—আবার আসছে বাতাসে ভর করে গোঙানির আওয়াজটা। ভয়ের চেয়ে বিরক্তি হল পাঁড়ের বেশি। বিরক্ত হল নিজের ওপরে বিরক্ত হল চাকরির ওপরও। যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড-কারবার করে এ-চাকরি চালাতে হবে।

দুপুর রাত। স্তব্ধ রাত্রির বুক ব্যেপে বিরাট দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার। এখন অন্ধকারের একচ্ছত্র রাজত্ব। মানুষ এখন হত্যা হলেও অন্ধকার তাকে গুম করে দেবে অনায়াসে। কাকপক্ষী পর্যন্ত টের পাবে না। যত অনাচার ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা এই অন্ধকার। কালো মিশ্‌মিশে অন্ধকার।

ভাবতে ভাবতে পাঁড়ের ভয় এল। একা একা এই গোঙানির আওয়াজ কানে বয়ে বসে থাকা অসম্ভব। আর আধঘণ্টা কাটাতে পারলে একদম ছুটি পাবে সত্যি, কিন্তু এই আধঘণ্টা যে কিছুতেই কাটতে চাইছে না।

গোঁ—গোঁ—গোঁ—। আওয়াজ আসছে বাতাসে ভর করে।

পাঁড়ে হাতের লাঠিগোছাটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। ঠিক করল আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ও ছাড়ছে না। ভূত-জিন-মানুষ-ডাকাত যা হয় একবার মোকাবিলা করবেই। একা, একাই সই। নইলে এমনভাবে ভয়ের ওপর বসে কাটানো যায় না। আওয়াজটাকে বার দুই লক্ষ্য করে পাঁড়ে এগিয়ে চলল মাঠের ওদিকে ঐ ঝোপগুলোর দিকে।

ঝোপের কাছে আসতেই আওয়াজ পরিষ্কার শোনা গেল। বড় কাতর গোঙানি যে! পাঁড়ে এগিয়ে গেল—আরও কাছে, একেবারে ঝোপের কাছে।

অন্ধকার ভয়ঙ্কর ভাবে ঘন হয়ে গেছে। সামনের বস্তুকে পর্যন্ত দেখা যায় না। শরীরটা একবার কেঁপে উঠল পাঁড়ের। পায়ের নিচের মাটি যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। তবু পাঁড়ে বেপরোয়া, নিজের মনে মনে বলে উঠল —'যা থাকে নসীবে...' পকেট থেকে দেশলাই নিয়ে কাঠি জ্বাললে তড়াক করে।

যা দেখল পাঁড়ে, তাতে সে নিজেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। 'হায়রে কপাল, এ দেখি একটা মাগী।' নিজে নিজে কথা বলল ও। মাটিতে উবু

হয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। একবার ভাবল, এ আবার মেয়ে-জিন্ নয় তো। আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। এবার সে পরিষ্কার। শরীরের ছেঁড়া কাথা-কানির আবরণ সরে গিয়ে পড়ে রয়েছে এক অর্ধনগ্ন নারী।

পাঁড়ে বলে উঠল—'হেই, তুই এখানে পড়ে আছিস কেন?' খুব জোরে কথাটা বলল নিজের ভয় কাটানোর জন্যে।

জবাব দেয় না মেয়েটা একটানা গোঙায়। মুখ থুবড়ে পড়ে গোঙায়—গোঁ—গোঁ—গোঁ।

হঠাৎ যেন পাঁড়ের বুকে কেমন একটা উন্মাদনা এল। বুকের ভেতরকার আদিমমানুষটা একবরা নড়েচড়ে বসল। এমন অন্ধকার নির্জন জাগায় নারী-পুরুষের দেখা হলে যা হয়। অন্ধকারই এখানকার একমাত্র সহযোগী এবং সহায়। পাঁড়ের কানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল আগুনে হাওয়া। প্রচণ্ড এক আদিম উন্মাদনায় মাথাটা ঘুরে গেল পাক খেয়ে।

এবার অত্যন্ত কাছে এল পাঁড়ে। জ্বালাল আবার দেশলাই। ক্ষুধিত মনকে সে আর বাগ মানাতে পারছে না। আলো জ্বালিয়ে দেখল, মেয়েটা এবার চিত হয়ে শুয়েছে। শরীরের আবরণ বলতে যা ছিল তা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। এক নগ্ন নারীর বীভৎস উন্মুক্ত চেহারা।

হঠাৎ পাঁড়ের দৃষ্টি পড়ল ওর পেটের দিকে। ওমা, এ কি! —পাঁড়ের মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। দুরন্ত প্রলোভন এক মুহূর্তে মিইয়ে গেল—এযে আসন্ন-প্রসবা!

মাত্র এক পলকের চিন্তা। ধক্ করে উঠল পাঁড়ের বুকটা। তার ভেতরকার ক্ষুধিত আদিমমানুষটা মিশে গেল রক্তের সঙ্গে। এ যে আসন্ন-প্রসবা—বোধহয় এখনই সন্তান হবে। এই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের বুক ভেদ করে পাঁড়ের দৃষ্টি চলে গেল গঙ্গার ওপারে গোনপুরের এক দেহাতে।

লখিয়া। হ্যাঁ, ওর লখিয়াও তো এমনি হয়েছে এতদিনে। সেও যে আর দুদিনের ভেতরই মা হবে। সে-ও কি এমনতর কষ্ট পাচ্ছে? এমনি করে ব্যথায় গোঙাবে? ছট্‌ফট্ করবে এমনি মাটিতে মুখ থুবড়ে? ধিক্কারে পাঁড়ে এক পা সরে দাঁড়াল। কী সর্বনাশা কাজে সে এগিয়ে গেছিল।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল পাঁড়ে। এগিয়ে গেল। বসে দেখল মুখখানা, মরেনি তো! আলোতে দেখল, মেয়েটার চোখ বেয়ে অবিশ্রান্ত জল ঝরছে। কিন্তু মুখখানা যে বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে। আসন্ন মাতৃত্বের তৃপ্তিতে জ্বল্-জ্বল্ করছে মুখখানা।

মেয়েটি ড্যাবা-ড্যাবা চোখে তাকাল পাঁড়ের দিকে। সে-চোখে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই, বিন্দু মাত্র ভয় নেই, কি যেন অস্পষ্টভাবে বলল, শুধু বুঝা গেল একটা কথা—'ভাইয়া!'

পাঁড়ে এগিয়ে ওর মুখের কাছে, জিগ্যেস করে—'কি বললি?'

মেয়েটি এলিয়ে পড়ল ব্যথায়। জবাব দিতে পারল না।

পাঁড়ের নিজের সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝল—আর দেরি নেই। হয়তো শীঘ্রই প্রসব হবে। কিন্তু শীতে যে মা-শিশু দু'টোই মারা পড়বে। এর লোক গেল কোথায়? এ-ই বা এখানে এল কি করে।

পাঁড়ে জিগ্যেস করল চেঁচিয়ে—'হেই, তোর মরদ কোথায়?'

মেয়েটি হাত ইশারায় দেখাল ঐ আমবাগানটার দিকে। বলল, 'হুই হোথায়?'

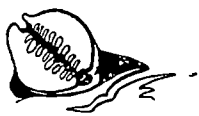
এতক্ষণে পাঁড়ে আন্দাজ করে নিল সমস্ত ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই ঐ কাঙালী-গুলোর কেউ হবে। হয় তো তাড়া খেয়ে যেতে পারেনি। ওরাও বোধকরি অন্ধকারে মানুষ ঠিক করে উঠতে পারেনি। আর ঐ লোকটা? তাহলে কি ল্যাঙড়াটা একেই খুঁজতে এসেছিল তখন?

সময় আর হাতে নেই। এখনি বারোটা বাজবে। এসে যাবে দ্বিতীয় পাহারাওয়ালা। তা হলে আর কোনো কাজই হবে না হয়তো। কিন্তু কী উপায় করা যায়? ভূতগুলো আমবাগানের কোন্ অন্ধকারে পড়ে আছে?

আর একবার মেয়েটির অবস্থা দেখল। বলল—'তুই রোস্, আমি আসছি...।'

পাঁড়ে ছুটল। হন্‌হন্ করে ছুটল ঐ আমবাগানের অন্ধকারের দিকে। ওদের দু'চারজনকে খবর দিয়ে আনতে পারলে ওরা হয়তো একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। অন্ধকারের ঢেউয়ে ভেসে এল পাঁড়ের একটা কথা—'একটুক্ষণ সবুর কর বহিন্, আমি ওদের ডেকে আনছি রে...।'

ততক্ষণে লাইনের ওপারে আমবাগানের অন্ধকারে মিশে গেল পাঁড়ে।



পরিণয়

মা ফেঙ্

চিঙ্ সুই গ্রামের যুবসংঘের শাখা-সচিব তিয়েন চুন্-সেঙ্। সকালে তাকে জেলা অফিসে গিয়ে বিয়ের সাক্ষ্যপত্র করিয়ে আনতে হবে ; এই আগ্রহে রাত্রে চার বার সে জেগে উঠল। তারপর ভোর হতে না হতেই উঠে খাওয়াদাওয়া সেরে, শাদা সুতীর একটা কুর্তা গায়ে চড়িয়ে হন্ হন্ করে রওনা হয়ে গেল। গ্রামখানা যখন সে পার হয়ে গেছে সূর্য তখন সবেমাত্র পাহাড়ের পেছন থেকে উঁকি মারতে শুরু করেছে।

লিউ লিন্ গ্রামের শ্রমবীর ইয়াঙ্ ওয়ান-ইউ'র মেয়ে ইয়াঙ্ সিয়াও-চিঙ্ তার প্রেয়সী। চুন-সেঙ্-এর চেয়ে সে তিন বছরের ছোটো—তার মানে, এবারে বিশ বছরে পা দিয়েছে। লিউ লিন গ্রাম চিঙ্ সুই থেকে তিন মাইলেরও বেশি দূরে। গতবছর বসন্তকালে জেলার সমস্ত গ্রামের মধ্যে যখন একটা নাট্য প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তখন প্রথম দেখা হয় ওদের। প্রথম দর্শনেই তারা প্রেমে পড়ে, শুরু হয় পত্রবিনিময় এবং শিগ্‌গিরই একটা বোঝা-পড়া করে নেয়।

দুপক্ষের বাপমায়েরা এতে খুশিই হলেন। চুন-সেঙ্-এর বাবা এবং বুড়ো ইয়াঙ্ ওয়ান-ইউ পরস্পরকে চিনতেন। সাত আট বছর আগে তাঁরা দুজনেই খাজনা দিতে পারেননি। দুই জমিদার দুজনকেই গ্রেপ্তার করিয়ে পাঠিয়ে দেয় জেলের এক অন্ধকার কুঠরিতে ; সেখানে তাঁদের এক পক্ষ-কালেরও বেশি একসঙ্গে কাটাতে হয়। নতুন সমাজে যে তাঁরা শেষ পর্যন্ত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন, একথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি। শুভকাজটা যাতে শিগ্‌গির ঘটে যায় তার জন্য দুপক্ষই তাঁদের ছেলেমেয়েদের চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু একবছর ধরে এ-সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চললেও শুভদিনটি বারবারই পেছিয়ে গেছে।

প্রথমে তারা ঠিক করেছিল, গত বছর বসন্তকালে ফসল কাটার পরেই তারা বিয়ে করবে। চুন-সেঙ্-এর বাড়ির সবাই মিলে তার বিয়ের উদ্যোগ করতে শুরু করে দিয়েছিল—বাড়ি মেরামত, বিছানাপত্র তৈরি ইত্যাদি। শেষ কাজ-গুলিও হয়ে গেছে, বিয়ের দিন স্থির, এমন সময় সিয়াও-চিঙ্-এর কাছ থেকে চিঠি এল যে বিয়ের দিন পেছোতে হবে। চুন-সেঙ্ ছুটে গেল লিউ লিন গ্রামে, সিয়াও-চিঙ্কে এর কারণ জিগ্যেস করতে। সিয়াও-চিঙ্ বলল, "প্রাদেশিক শহরে মাতৃ-শিশু-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র একটা খোলা হয়েছে। গ্রাম আর জেলার কর্তৃপক্ষ আমাকে যেতে দিতে রাজী হয়েছেন। তোমার কি মনে হয়?"

তাকে মানা করার বদলে চুন-সেঙ্ হেসে বলল, "তোমার একটা কাজ শেখা হবে, তা দিয়ে দেশের লোকের সেবা করতে পারবে তুমি। আমি তোমার বাধা হয়ে দাঁড়াব না। আমার মত আছে।"

বিয়ে তো গেল পিছিয়ে। বুড়োবুড়ির আশা ফলল না। সিয়াও-চিঙ্ যখন তার পড়া শেষ করে ফিরল, শীত তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। বুড়ো-বুড়ি আবার তাদের ছেলেকে ধরল, সময় করে বিয়েটা সেরে নিতে। এ-বিষয়ে আলোচনা করতে চুন-সেঙ্ গেল সিয়াও-চিঙ্-এর কাছে। সিয়াও-চিঙ্ বলল, "কি অধৈর্য পুরুষ রে বাবা। সবেমাত্র তো পড়া শেষ করে ফিরেছি ; এখন অবধি কাজ ঠিকমতো শুরু হয়নি। আমরা যদি নিজেদের ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকি তবে লোকে কি ভাববে? আমি চান্দ্র-পঞ্জিকার নববর্ষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই।"

চুন-সেঙ্ তার কথা শেষ না হতেই হেসে বললে, "সত্যি, আমি বড় আত্ম-কেন্দ্রিক। তুমি যা চাও, তা-ই হবে।"

নববর্ষ হয়ে যাবার পরই, রবিশস্যের জন্য চাষের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। এ-বছর 'অধিক ফসল ফলাও'-এর আন্দোলনটা ছিল খুব জোর। যুব সংঘের প্রধান কাজ ছিল অধিক উৎপাদনের জন্য যুবদলের নেতৃত্ব করা। চুন-সেঙ্ একই সঙ্গে যুবসংঘের শাখা-সচিব ও পারস্পরিক সাহায্য দলের নেতা; বীজ বাছাই করতে কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে, কুয়ো কাটতে, গাছ পুঁততে সবাইকে উৎসাহ দিয়ে বেড়াবার দায়িত্বটা তাকেই নিতে হল। সকাল থেকে রাত অবধি কাজের মধ্যে তাকে এমন ডুবে থাকতে হচ্ছিল যে বিয়ের কথা তার মনে করারই সময় ছিল না। থেকে থেকে তার মা কেবল বলতেন, "আর কত দেরি করবি রে? হায় ভগবান!" এখন রবিশস্যের চাষ হয়ে গিয়েছে, ফসল কাটতে এখনো এক মাস কুড়ি দিন বাকি, তাই বুড়োবুড়ি তাঁদের ছেলেকে আবার পেড়াপিড়ি করতে আরম্ভ করলেন। এর আগের দিনই চুন-সেঙ্ লিউ লিন গ্রামে গিয়েছিল, সিয়াও-চিঙ্-এর সঙ্গে তার তখন অনেক কথাবার্তা হয়েছে। সিয়াও-চিঙ্ প্রথমে বলেছিল, "আরো মাসখানেক অপেক্ষা করো না কেন, তাহলে ফসল কাটা হয়ে যায়! তাড়াহুড়ো করতে আমার মোটে ভালো লাগে না।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুন-সেঙ্-এর বারংবার অনুরোধ এড়াতে না পেরে হেসে বলল, "সত্যি বাবা, তুমি সাংঘাতিক মানুষ! আচ্ছা, তুমি যা চাও, তা-ই হবে।" এই করেই শেষ পর্যন্ত বিয়েটা ঠিক হল। ঝড়ই হোক আর জলই হোক, আজ তারা দুজনেই জেলার সরকারী দপ্তরে দেখা করবেই এবং একজনের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত অন্যজন জায়গাটা ছাড়বে না।

গ্রাম ছেড়ে চুন-সেঙ্ চলল বড়রাস্তা ধরে। রাস্তার দুই-ধারে চারাগাছের সারি। পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ-উৎসবের সময় এই চারাগুলি লাগিয়েছে গাঁয়ের যুবকেরা, সে-ই ছিল তাদের নেতা। চুন-সেঙ্ ভাবছিল, 'আরো দশবছরে এই গাছগুলো দিব্যি বড় হয়ে উঠবে'।

সামনেই রাস্তার বাঁকে, গোটা দশ বারো উইলো গাছ, তাদের একটা কিরকম বাঁকা মতো, পড়ো পড়ো অবস্থা, মনে হয় কোনো গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে। বড় বড় কয়েক ধাপে সেখানে পৌঁছে চুন-সেঙ্ গাছটাকে ঠিক করে দাঁড় করাল, তার গোড়ার চারপাশে পা দিয়ে চেপে চেপে মাটি ঠেসে দিল। কচি উইলো গাছগুলো দেখে তার মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। লিউ

লিন গ্রাম থেকে সে নিজেই এই কচি উইলোর কলমগুলি বয়ে এনেছিল। সেদিন সিয়াও-চিঙ্ হেসে তাকে বলেছিল, "এ গাছগুলো বাঁচিয়ে রাখবে, কথা দিয়ে যাও।" চুন-সেঙ্ও হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল, "তোমার বাড়ির গাছের কলম এগুলো, আমাদের গ্রামে গিয়ে বেঁচে থাকতে এদের ভালোই লাগবে।" তা শুনে সিয়াও-চিঙ্ হাসতে শুরু করে।

ভারি মিষ্টি সিয়াও-চিঙ্-এর হাসি। সে-হাসিতে ঘণ্টাধ্বনির মতো ঋজুতা আর অনুরণন। চুন-সেঙ্ কখনো তাকে রাগতে দেখেনি, তাকে দেখে মনে হত যেন সংসারে তার কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। সুডৌল, ঈষৎ রক্তিমাভ মুখের উপর তার জ্বলজ্বলে চোখদুটো দেখে চুন-সেঙ্-এর মনে হত যেন রাত্রির ঘোর তমসা ভেদ করে মোটরগাড়ির আলো চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে সব অন্ধকার দূর করে হৃদয় উদ্ভাসিত করছে।

হাঁটতে হাঁটতে চুন-সেঙ্ ভাবছিলঃ 'সিয়াও-চিঙ্ বোধহয় এতক্ষণে জেলার সরকারী দপ্তরের দিকে রওনা হয়েছে; দুপুর হওয়ার আগেই তার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তখন আমরা দুজনে বিয়ের ঝলমলে লাল সাক্ষ্য-পত্রটা সই করব।' নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে সে লুকিয়ে লুকিয়ে না হেসে পারল না। হঠাৎ শোনা গেল—"হেই-হেই-ওঠ্।" তাড়াতাড়ি চোখ তুলে দেখে সামনে রবারের টায়ারওয়ালা প্রকাণ্ড এক দু-চাকার গাড়ি পাঁকের মধ্যে পড়েছে। গাড়িবোঝাই মালপত্র—এক স্তূপ কাঠের বাক্সো আর বস্তা। গাড়োয়ান চাবুক চালাচ্ছে আর প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। জানোয়ারটার গা বেয়ে ঘাম ঝরছে, হাঁপাচ্ছে যেন ঠিক একটা হাপর, খুরের ঘায়ে রাস্তাটা পাঁকে পরিণত হয়েছে, তবু কিন্তু গাড়িটা এক ইঞ্চিও নড়েনি। চুন-সেঙ্ ছুটে গেল সাহায্য করতে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। গাড়োয়ান তখন গাল দিচ্ছে আর সমানে চাবুক চালাচ্ছে জানোয়ারটার উপর; খচ্চরটার সামনের পা গেল দুমড়ে, কাদায় বসে পড়াই তার হল পছন্দ। বিরক্ত হয়ে গাড়োয়ান চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাস্তার ধারে বসল উবু হয়ে। হাতের কাদা মুছে চুন-সেঙ্ জিগ্যেস করল, "মালপত্র কোথা থেকে আসছে?"

"জেলা থেকে এ উপহারগুলো যাচ্ছে সৈনিকদের জন্য। স্টেশনে পৌঁছতে হবে।" আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ব্যস্তভাবে গাড়োয়ান বলতে লাগল, "আজকেই সব জেলার দিয়ে দেবার কথা। কোরিয়ার ট্রেনে বিকেলে মাল বোঝাই করা হবে; বিশ মাইল পথ এখনো বাকি। হায় ভগবান!"

চুন-সেঙ্ যখন শুনল যে এ জিনিসগুলো চীনা স্বেচ্ছাবাহিনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চীনা সাধারণলোকের উপহার তখন সে বুঝল যে এগুলোকে দেরি করানো চলে না। তার বাড়ির লোকেও তো উপহার পাঠিয়েছে, আর তার সঙ্গে আছে তার নিজহাতে লেখা চিঠিও। সিয়াও-চিঙ্ও দুটো থলে উপহার দিয়েছে, তার উপর এমব্রয়ডারি। চুন-সেঙ্ কাছে গিয়ে গাড়িটাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে গাড়োয়ানকে বলল, "পরশুদিন এখানে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। দেখেছো, তোমার গাড়ির চাকাগুলো কাদায় কিরকম আটকে গেছে, তাছাড়া গাড়িটাও বেশ ভারি। আমার মতে, কেবলমাত্র একটি উপায়

আছে, জিনিসপত্র নামিয়ে, খালি গাড়িটাকে টেনে তুলে, তারপর আবার ওগুলো চাপানো। এসো, আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

গাড়োয়ান চুন-সেঙ্-এর দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে বলল, "তা মন্দ বলোনি। তবে দুজন লোকের পক্ষে এ-কাজ করতে অনেক সময় লাগবে। তোমার কোনো জরুরি কাজ নেই তো?"

চুন-সেঙ্ একবার ভাবল সিয়াও-চিঙ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথাটা, কিন্তু বলল, "সে ঠিক আছে। সেটা এত তাড়াতাড়ির ব্যাপার নয়। শিগ্-গির করে ঐ দড়িগুলো খুলে ফেলো।" গাড়িতে উঠে পড়ল সে জিনিস নামাবার জন্য, আর মনে মনে ভাবতে লাগল যে বিয়ের সাক্ষ্য-পত্রের চেয়ে এই গাড়িবোঝাই উপহারসামগ্রীর বিষয়টা অনেক জরুরি।

রাস্তা দিয়ে দুজন অল্পবয়স্কা মেয়ে যাচ্ছিল। চুন-সেঙ্ তাদের ডেকে বলল, "ওগো, একটু সাহায্য কর না। এই জিনিসগুলো আমাদের গণ-স্বেচ্ছাবাহিনীর জন্য।" শুনে তারাও তাড়াতাড়ি এল সাহায্য করতে। কারণ, তারা জানত যে তাদেরই উপহার ঐ গাড়ির মধ্যেই আছে। ক্রমে অন্যান্য আরো পথচারী, যারা ঐ রাস্তা ধরে যাচ্ছিল, তাদেরও সবাইকে চুন-সেঙ্ ডেকে আনল। সোৎসাহে সবাই মিলে গাড়ি থেকে জিনিসগুলো নামিয়ে অনেক কসরত করে গাড়িটাকে পাঁক থেকে তুলল। একসঙ্গে উপহারগুলো গাড়িতে উঠিয়ে মজবুত করে যখন বাঁধল তখন প্রায় দুপুর। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে হেসে গাড়োয়ান বলল, "যাক্, এক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল। তোমাদের সবার সাহায্য ছাড়া এ জরুরি কাজটা যে আটকে থাকত, তাতে সন্দেহ নেই।" তারপর চুন-সেঙ্-এর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, "কোন্ গাঁ থেকে আসছো ভাই? তোমায় ধন্যবাদ দিতেই হবে।"

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে চুন-সেঙ্ জবাব দিল, "তার চেয়ে এই যে সময় নষ্ট হয়েছে তা পুষিয়ে নেবার একটা বন্দোবস্ত করো দেখি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

চুন-সেঙ্ যখন দেখল গাড়োয়ান চাবুক চালাচ্ছে, গাড়িও রওনা হয়েছে উত্তরমুখো, তখন সে আবার জেলার সরকারী দপ্তরের পথে চলা শুরু করল। জেলার সরকারী কেন্দ্র পাই-হো-চেন্ তখনো পাঁচ মাইল দূরে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালিয়ে চলল সে; তবু তার মনে হতে লাগল সূর্যের গতি বুঝি আজ বেশি দ্রুত। সে' ভাবছিল, 'সিয়াও-চিঙ্ নিশ্চয় এতক্ষণে সরকারী দপ্তরে পৌঁছে গেছে, আমার জন্য অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, হয়তো আমার দেরি দেখে আমার ওপর চটেছে।' আধা দৌড়ে, আধা হেঁটে এগোতে এগোতে তার মনে হচ্ছিল, একজোড়া পাখা থাকল না কেন। তাহলে সে পাই-হো-চেন্-এ উড়ে যেত। সূর্য একটা আগুনের গোলা হয়ে উঠছে। তারপর সামনে দেখা গেল লি মিন নদী। এটি আসলে একটা খাল, গত বছরে সদ্য কাটা হয়েছে। পাটকিলে বাঁধটা দেখাচ্ছিল যেন একটা নিচু মাটির দেয়াল। চুন-সেঙ্ হিসাব করল আরো তিন মাইল পথ পেছনে রেখে এসেছে। এবার সেতুতে দাঁড়ালে পাই-হো-চেন্ দেখতে পাওয়া যাবে। সিয়াও-চিঙ্-এর কথা ভাবতে গিয়ে তার গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। সে ভাবল,

'আর দেরি নেই। সিয়াও-চিঙ্-এর সঙ্গে এবার দেখা হবে। বিয়ের জ্বল্-জ্বলে লাল সাক্ষ্য-পত্রটা এবার আমার হাতে এসে পড়বে।'

বাঁধ বেয়ে উঠে সবেমাত্র সেতুতে সে পা দিয়েছে, এমন সময় দেখল উল্টো দিক থেকে একটা লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে তার দিকে ছুটে আসছে, তাকে তাড়া করে আরো অনেকে আসছে তার পিছন পিছন চেঁচাতে চেঁচাতে—"আটকাও, প্রতিবিপ্লবী দালাল! প্রতিবিপ্লবী দালাল!"

চমকে উঠেই চুন-সেঙ্ হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল। লোকটা ইতিমধ্যে সেতুর অন্যধারে এসে পড়েছিল। কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করে একজন দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে বাঁধের দক্ষিণ দিক ধরে দৌড়তে লাগল। চুন-সেঙ্ও ছুটল তার পিছু পিছু। দুপুর হয়ে গিয়েছে, চাষীরাও যে যার বাড়ি চলে গেছে, কাজেই লোকটা সাহস সঞ্চার করে প্রাণের দায়ে ছুটতে লাগল। চুন-সেঙ্ও চেষ্টা করছিল তার সব শক্তি দিয়ে ওকে ধরতে। এমন সময় লোকটা ফিরে কি যেন ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "হাতবোমা"। ভ্রূক্ষেপ না করেই, মুহূর্তমাত্র না দাঁড়িয়ে তাড়া করে চলল চুন-সেঙ্। ঘাম ঝরে ঝরে চোখ জ্বলছিল চুন-সেঙ্-এর, জামার আস্তিন দিয়ে যখন সে ঘাম মুছল, তখন প্রায় আরো দু মাইল পথ সে চলে গেছে। এমনই তার কপাল যে সে যখন লোকটিকে প্রায় ধরে ফেলেছে তার পা গেল পেছলে আর বাঁ পায়ের জুতোটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। জুতোটা না পরে উঠে দাঁড়াল চুন-সেঙ্, খালি পায়েই তাড়া করে চলল, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে যেতে লাগল—"প্রতিবিপ্লবী দালাল! প্রতিবিপ্লবী দালাল! আটকাও, আটকাও ওকে!"

কিছুদূরে মাঠের মধ্যে কয়েকজন লোক তখনো কাজ করছিল। কোদাল নিয়ে তারাও তাড়া করতে আরম্ভ করল। সামনে থেকে একজন মেষপালকও ঐ শব্দ শুনে কুড়ুল নিয়ে ছুটে এল। ভাগ্য খারাপ দেখে লোকটি আড়ভাবে বাঁধ বেয়ে উঠতে লাগল। চুন-সেঙ্ তাকে বাঁধ ধরে অনুসরণ করে যখন এসে পৌঁছল লোকটা ততক্ষণে খালে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। কোমর অবধি জল কেটে যেতে যেতে লোকটা ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি...আমার ওপর তোমার রাগ থাকার কথা নয়. একটু উপকার কর না..."

চুন-সেঙ্ তাকিয়ে দেখল অন্যেরা তখনো এসে পৌঁছয়নি, ওদিকে লোকটিও মাঝ-জলে পৌঁছে গেছে। দ্বিধা না করে সে-ও জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, জোর হাত চালিয়ে পৌঁছে গেল ওর কাছে, তারপর আরম্ভ হল ধ্বস্তাধ্বস্তি। লোকটি চুন-সেঙ্-এর কান কামড়ে দিল, পরে চেপে ধরল জলের নিচে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে গিয়ে দু ঢোক্ জল ঢুকে গেল তার মুখের ভেতর, জলের বিশ্রী উগ্র গন্ধে তার নাক জ্বলতে শুরু করল, মাথা ঘুরতে লাগল। প্রাণের দায়ে চুন-সেঙ্ তবু শক্ত করে তার হাত ধরে রইল, কিছুতেই ছাড়বে না। এমন সময় পেছনে যারা ছিল, মেষপালকসমেত সবাই এসে পড়ল। জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সকলে মিলে শেষ পর্যন্ত দালালটিকে ধরে ফেলল।

চুন-সেঙ্কে যখন তারা পাড়ে তুলল, তার জামা ভিজে সপ্সপ্ করছে, মাটিতে বসে পড়ে সে দম নিতে লাগল। কান থেকে রক্ত পড়ে তার বিয়ের

শাদা কুর্তায় দাগ ধরিয়ে দিল। বাঁ-পাটাও তার কেটে গিয়েছিল, তার উপর জল লেগে তার মনে হচ্ছিল যেন ছুঁচ ফুটছে। ঐ লোকটিকে শক্ত করে বেঁধে ফেলে, অন্যরা এসে চুন-সেঙ্‌কে জিগ্যেস করল সে কেমন আছে। চুন-সেঙ্‌ মাথা নেড়ে বলল, "এ কিছু না।" তারপর সে জিগ্যেস করল তারা কোন্‌ গাঁ থেকে আসছে, কেমন করেই বা ঐ দালালটা পালাতে পারল। যে-দুজনে প্রথমে তাকে তাড়া করতে শুরু করেছিল তারা বলল যে চিঙ্‌-সুই শহর থেকে তারা আসছে। খেতে জল ছেঁচে তারা বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছে এমন সময় ঐ লোকটিকে তারা টেলিগ্রাফের তার কাটতে দেখে তাড়া করে।

তারা আলোচনা করতে লাগল লোকটিকে জেলার সরকারী দপ্তরে পাঠানো সম্বন্ধে। চুন-সেঙ্‌-এর এবার মনে হল নিজের কথা, খেয়াল হল যে সরকারী দপ্তরে সিয়াও-চিঙ্‌ তার জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ উঠে সে বিড়বিড় করে বলল, "বেশ, ঐ বদমাইসটাকে বেঁধে তোমরা নিয়ে যাও, আমার দরকারী কাজ আছে!" বলেই সে সবাইকে অবাক করে দিয়ে চলে গেল।

ফিরতি পথে জুতোর অন্য যে পাটিটা পড়ে গিয়েছিল সেটা তুলে নিয়ে সে সোজা চলল পাই-হো-চেন্‌-এর দিকে। এতক্ষণে তার পোশাক শুকিয়ে গেছে, কান থেকে রক্ত পড়াও বন্ধ হয়েছে। জেলার সরকারী দপ্তরে ঢুকে প্রথমেই সে জিগ্যেস করল, "আচ্ছা, লিউ লিন গ্রাম থেকে ইয়াঙ্‌ সিয়াও-চিঙ্‌ নামে কি কোনো মেয়ে এসেছে?"

আপিসের লোকেরা অবাক হয়ে বলল, "ইয়াঙ্‌ সিয়াও-চিঙ্‌? না! কিন্তু তোমার এমন দশা হল কেমন করে?"

খবর শুনে চুন-সেঙ্‌-এর এত রাগ হল যে সে আর একটি কথা না বলে বেরিয়ে গেল। তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে সিয়াও-চিঙ্‌ পৌঁছে গেছে, অধৈর্য হয়ে নিশ্চয়ই তার জন্য অপেক্ষা করছে, আসলে কিন্তু সে তখনো পৌঁছয়নি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি যাতে সিয়াও-চিঙ্‌ তাকে বিয়ে করতে পারবে না? আপিসের দরজা দিয়ে সে সবে বাইরে বেরিয়েছে এমন সময় সিয়াও-চিঙ্‌ ঘামতে ঘামতে এসে হাজির। সে হেসে বলল, "তুমি নিশ্চয় অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আমি কিন্তু ভোর হতে না হতেই উঠে পড়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রওনা হচ্ছি এমন সময় খবর এল একটি মেয়ের প্রসব-বেদনা আরম্ভ হয়েছে, আর আমাকে যেতে হল দাই-এর কাজ করতে। তাতে অনেক সময় লেগে গেল। ভয় হল, পাছে তুমি অধৈর্য হয়ে পড়ো, তাই তো সোজা ছুটতে ছুটতে এলাম। তোমার কাপড় এতো ময়লা কেন বলো তো? একি! রক্ত!"

চুন-সেঙ্‌ যখন শুনল যে সামাজিক কর্তব্যের জন্যই সিয়াও-চিঙ্‌-এরও দেরি হয়েছে, তখন স্বভাবতই তার রাগ গেল পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে হেসে বলল, "আমিও এইমাত্র এসেছি।" তারপর পূর্বাপর সমস্ত ঘটনাই তাকে বলতে শুরু করল। সরকারী দপ্তরের কর্মচারীরাও বেরিয়ে এসে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে সব শুনতে লাগল। ও যখন কথা বলছে তখন প্রতিবিপ্লবী দালালটিকে নিয়ে অন্যেরা এসে হাজির। একটি মেয়ের পাশে চুন-সেঙ্‌কে অমন ভালোবাসার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা বুঝল

কেন অমন খাপছাড়াভাবে সে চলে এসেছিল। সিয়াও-চিঙ্-ও আর তার ভালোবাসা চেপে রাখতে না পেরে এগিয়ে এসে আবেগভরে চুন-সেঙ্-এর হাত ধরল। অনেকক্ষণ ধরে সে কোনো কথা বলতে পারল না, শুধু তার চোখ দুটি, যেন বলছিলঃ "ভালোবাসি।"

চাইনিজ্ লিটারেচারঃ ২নং, ১৯৫২ থেকে অনুবাদঃ **লতিকা রায়**



জুয়া

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কথা বলতে বলতে থেমে গেল হিরণ্য, ভ্রূ কুঁচকে তাকাল একবার। আবার সেই বিশ্রী চিৎকার উঠেছে। ঝন্ ঝন্ করে কী একটা গুঁড়ো হয়ে গেল—চায়ের পেয়ালা খুব সম্ভব।

হিরণ্য বললে, আঃ—পাব্লিক নুইসেন্স্!

বললাম, তুলে দেবার ব্যবস্থা করোনা কেন?

অসহায় ক্ষোভে হাতের পিঠটা উল্টে ধরলে হিরণ্যঃ কে তুলবে? গুণ্ডার আখড়া ওটা। ছোরা রাখে, বোমা পিস্তল নিয়ে কারবার করে। ঘাঁটাতে গেলে হয়তো বাড়ি রেইড্ করে বসবে!—হিরণ্য গজ্ গজ্ করতে লাগলঃ একটু খোলা আলো হাওয়ায় থাকব ভেবে এদিকটাতে বাড়ি করলাম। এখন দেখছি বেশি আলো হাওয়াতেও বিপদ আছে। ডাক-চিৎকার করলেও শুনতে পায়না পাশের বাড়ির লোক। কাজেই ওদের কিছু না বলাটাই নিরাপদ।

—হুঁ, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কৌলীন্য করারও দায় আছে দেখছি!—আমি হাসলাম। হিরণ্য সে হাসিতে যোগ দিলে না। তাকিয়ে রইল জানলা দিয়ে। বাইরে হু হু হাওয়া। সেই হাওয়ায় মস্ত একটা ছাতিম গাছের মাথার ওপরে দোল খাচ্ছে গোটা কয়েক কাকের বাসা। ওই কাকের বাসাগুলো দেখতে দেখতে নিজের বাড়ি সম্পর্কে তার মনে কোনো দার্শনিক জিজ্ঞাসা উদিত হচ্ছিল কিনা কে জানে!

—পুলিসে খবর দাওনা কেন?—আমি ওকে পরামর্শ দেবার প্রয়াস পেলামঃ বেআইনি জুয়ার আড্ডা তুলে দেওয়া তো ওদেরই কাজ।

—পুলিস!—এমন বিশ্রীভাবে প্রতিধ্বনি করলে হিরণ্য যে মনে হল মুখ ভ্যাংচাচ্ছে আমাকে। আর তখনি আমি দেখতে পেলাম ওর বাঁ দিকের দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। একেবারে সাক্ষাৎ হিরণ্যদন্ত! সোনালি খিঁচুনির সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্য বলে চললঃ ওসব ভাই-বেরাদারের ব্যাপার—কিচ্ছু হবে না ওতে। অথচ তুমি অনেস্ট্ বিজ্নেসম্যান—তোমার পানের থেকে চুনটি খসেছে কি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে।

বুঝলাম হাত দিয়ে ফেলেছি ব্যথার জায়গায়। কিছুদিন আগে কাগজে পড়া একটা ছোট্ট খবর চম্কে উঠল স্মৃতির ভেতরে। সিমেণ্টের বস্তায় সাজি-মাটি চালান দেওয়ার ব্যাপারে কোন্ এক হিরণ্য দত্ত যেন ফ্যাসাদে পড়েছিল। তা হলে সে আমাদেরই হিরণ্য। অবশ্য তারপরে আর কোনো খবর পাইনি ঘটনাটার—যেমন হয়, তেমনি নিঃশব্দে ফেঁসে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ওকেও বেশ কিছু শক্ত রকমের ঘা দিয়ে গেছে—সেটা আন্দাজ করা গেল।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দায় আমার নয়। আমি এসেছি কিছু টাকার প্রয়োজনে। আমাদের যে নতুন কাগজটা বেরুচ্ছে, তার জন্যে কিছু

অর্থসাহায্য চাই হিরণ্যের কাছে। এবং, এ-ও জানি ও আমায় বিমুখ করবে না। এবং, এইখানেই হিরণ্যের বৈশিষ্ট্য।

আজ না হয় ওর আর আমার মাঝখানে আশমান-জমিন ফারাক। ও না হয় নিজের মোটরে চড়ে, আমি না হয় সুবিধেমতো পরের মান্থলি দিয়ে কাজ চালাই। ও না হয় এক বিঘের ওপর নতুন বাড়ি করেছে আর আমি নয় কোনো এক বাই লেনের পঁয়ত্রিশ টাকার ভাড়াটে। কিন্তু একদিন ছিল—

যেদিন একটা সিগারেটকে দু ভাগ করে খেতাম দুজনে। এক সঙ্গে আলোচনা চলত রাজনীতির। একই মিছিলে শামিল হয়ে ঘুষি পাকিয়ে শ্লোগ্যান দিয়েছি। তারপর—

তারপর একটু অপ্রতিভভাবেই হিরণ্য বলেছিল, ব্যবসা মানেই তো থ্রোট কাটিং নয়। পাইকারী দরে কেনা আর খুচরো বিক্রি করার ভেতরে যে অনেস্ট্ কমিশন—শুধু সেইটুকুই আমার। একটুখানি জীবিকার বন্দোবস্ত—তার বেশি আর কিছু নয়। আমি চিরকাল তোদের সঙ্গেই আছি।

কপাল ভালো হিরণ্যের। যুদ্ধটা চলছিল তখন আর সেই সঙ্গে চলছিল মন্বন্তর। অতএব একটু একটু করে ফেঁপে উঠতে লাগল অনেস্ট্ কমিশনটা। —তারপর দামোদরের বানের মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলল চারদিক। সে স্রোতের টানে হিরণ্য যে ভেসে গেল কোথায়—বহুদিন তার কোনো নিশানাই করতে পারিনি আমি। অনেক দ্বিধা আর অনেক জ্বালা নিয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন হাজির হলাম ওর বাড়িতে। ইচ্ছে ছিল, প্রাণ খুলে গালমন্দ করে যাব ওকে।

কিন্তু দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিরণ্য আমাকে জল করে দিলে।

—এই যে সুকেশ, এমন করেও ভুলে যেতে হয় ভাই! কতদিন ভেবেছি আমার চাঁদাটা পাঠিয়ে দিই—কিন্তু কারো সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারিনি। অফিস তো ওরা সীজ করে রেখেছে—অথচ, এই সময়টাতেই টাকার সব চেয়ে বেশি দরকার—

শুনে আমি স্তব্ধ এবং হতবাক হয়ে গেলাম। সবটা মিলিয়ে ওর কথা-বার্তাগুলো এমন গোলমেলে ঠেকল যে জবাবে কী যে বলা যেতে পারে ভেবেই পেলাম না কিছুক্ষণ।

হিরণ্য বললে, আমি চিরদিন তোমাদেরই আছি—তোমাদেরই থাকব। অবশ্য নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি—সক্রিয় সহযোগিতা কিছু সম্ভব নয়। তবু যদি টাকার দরকার হয়, এসো আমার কাছে। দিতে চেষ্টা করব সাধ্যমতো।

একটা কূট সন্দেহ মনের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠল হঠাৎ।

—ব্যাপার কী হে? ইলেক্‌শনে দাঁড়াচ্ছ নাকি?

—ইলেক্‌শন?—হিরণ্য বিস্মিত হলঃ কই না তো। ও সবের ভেতরে আমি নেই সুকেশ। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে আলাদা যোগ্যতা চাই। সে যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনে করি না।

আরো ধাঁধাঁয় পড়ে গেলাম। তারপর থেকে নানারকমভাবে হিরণ্যের মনস্তত্ত্বটা বুঝতে চেষ্টা করেছি। মধ্যবিত্ত চেতনার স্ববিরোধ বলা যায় একে? কন্‌ট্রাডিক্‌শন? সত্যি সত্যিই কি জ্ঞানপাপী নয় হিরণ্য? অথবা এটা ওর

ভবিষ্যতের জন্যে বিলিব্যবস্থা করা—সকলকে হাতে রাখবার চেষ্টা? ব্যবসায়ীত্মিকা বুদ্ধির একটা নিশ্চিত যোগফলঃ ইন্‌ভেস্ট্‌মেণ্ট্‌?

প্রথম দিনকতক অবশ্য আন্দোলিত হয়েছি দ্বিধাতে। ওর কাছ থেকে কিছু নেওয়া উচিত কিনা, এ নিয়ে মনে মনে নৈয়ায়িক বিচার করেও দেখেছি। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো গেল তারপরে। পাপের টাকা কিছুটা না হয় প্রায়শ্চিত্তেই যাক। ওর উদ্দেশ্য যাই থাক—টাকাটা আমাদের দরকার এবং সৎকাজে ব্যয় করার জন্যেই দরকার। এবং, টাকা দিয়ে হিরণ্য কোনোদিন আমাদের কিনতে পারবে—এটাকেও নিঃসন্দেহে দুরাশাই বলা যেতে পারে।

এইজন্যেই আজও আমি এসেছি। আমাদের নতুন সাপ্তাহিকটার জন্যে সহযোগিতা চাই হিরণ্যের। সেই আলোচনাই চলছিল। এমন সময় জুয়ার আড্ডার আকস্মিক চিৎকারটা আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ফেলে-আসা কথাগুলোর সূত্র আবার কুড়িয়ে নিলে হিরণ্যঃ কিন্তু এই দুর্দিনে নতুন কাগজ চালানো কি সহজ হবে? বিজ্ঞাপনের বাজার এমনিতেই মন্দা, তার ওপর তোমাদের যা আউটলুক, তাতে—

বললাম, সেজন্যে আটকাবে না, আমাদের অর্গ্যানাইজেশন আছে।

—কিন্তু শুধু সেলের ওপর—

আবার ছেদ পড়ল। এবার চিৎকারটা আর বাইরে থেকে এল না, এল দরজার গোড়া থেকে। রুনির তীক্ষ্ণকণ্ঠ তীরের মতো এসে আমাদের আঘাত করলঃ দাদা!

একসঙ্গেই ফিরে তাকালাম দুজনে। ফাঁপানো উগ্র চুলের পটভূমিকায় রুনির ফর্শা মুখ যেন ফেটে পড়ছে ক্রোধ আর উত্তেজনার রক্তরাগে। রঙ্‌করা ঠোঁটদুটো থর থর করে কাঁপছে—দু চোখে একটা হিংস্র দৃষ্টি।

অগ্নিগর্ভ গলায় রুনি বললে, দিনে-দুপুরেও এ-পাড়া দিয়ে কি কোনো ভদ্রমহিলা চলাফেরা করতে পারবে না দাদা?

—কী হয়েছে? ক্ষেপলি কেন এত?—শঙ্কিত জিজ্ঞাসা হিরণ্যের।

ধপ্‌ করে একটা সোফায় এসে বসে পড়ল রুনি, জ্বালাভরা চোখে জল চিকচিকিয়ে উঠলঃ ওই আড্ডাটা। যেতে আসতে প্রায়ই শ্রীমতী রিমার্ক করে—কান দিই না কোনোদিন। আজ একটা ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে!—অপমানিত কান্নায় ভিজে উঠল রুনির স্বরঃ এর যদি কোনো একটা বিহিত না করো—

—কী বিহিত করব?—রুনির চাইতেও অসহায় দেখালো হিরণ্যকেঃ একেবারে ফার্স্টক্লাস গুণ্ডা সব। দিনের আলোয় পাব্‌লিক্‌লি জুয়ো খেলছে। কে কী বলবে ওদের?—প্রাজ্ঞতায় আত্মস্থ হল হিরণ্যঃ ত তোরও দোষ আছে। জানিস যখন সব, তখন না হাঁটলেই হয় ওদিকের ফুটপাথ দিয়ে।

—চুপ করো!—রুনি গর্জে উঠলঃ কাওয়ার্ড সব! ঘরে বসে বসে বড় বড় কথা আওড়াতে পারো, অথচ নিজের বোনের প্রেস্টিজ্‌ রাখবার মুরোদ নেই!

আঘাতটা এবার আমারও গায়ে লাগল। উঠে দাঁড়ালাম।

—চলো তো একবার। কে কী বলেছে, একবার দেখে আসা যাক তাকে।

তটস্থ হয়ে হিরণ্য জামার আস্তিন টেনে ধরল আমারঃ কী পাগলামি

হচ্ছে সুকেশ! ছোরা—বোমা—রিভলবার সব আছে ওদের। স্ট্রেট খুন করে দেবে। এ প্যাক অব্ ব্লাড হাউণ্ড্স্ —ওদের কাছে শিভালরি দেখানোর কোনো মানেই হয় না।

রুনি বললে, তোমাদের কাউকেই কিছু করতে হবে না। আমি নিজে ফোন করছি টালিগঞ্জ থানায়—

হিরণ্য তেমনি বিব্রতভাবে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা এখন। যা করবার আমি করব।

—সবই তো করছ আজ ছ' মাস থেকে!—আহত সাপের মতো ফণা তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রুনি।

সমস্ত জিনিসটা এমন বিশ্রী আলোড়ন তুলে দিয়ে গেল ঘরের মধ্যে যে কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না আমরা। চৈত্রের রোদ বাইরে ক্রমশ উগ্রতর হয়ে উঠতে লাগল, গরম হয়ে আসা বাতাসের হুহুশ্বাসে দুলতে লাগল ছাতিম গাছের মাথাটা—মনে হতে লাগল কাকের বাসাগুলো এখনি ঝরে পড়ে যাবে। রাস্তা দিয়ে আর্তনাদের মতো আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল একটা ভারী ট্রাক।

হিরণ্যের উৎকণ্ঠিত নির্বোধপ্রায় মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন সহানুভূতি বোধ হল আমার। মনে হল, বড় বেশি ম্লান হয়ে গেছে ও—আবিল হয়ে আছে একটা স্যাঁৎসেঁতে অবসাদে। ওকে একটু উত্তেজিত করে তোলা দরকার। সুতরাং কাজের কথাগুলো আবার শুরু করার আগে ওর স্বাধিষ্ঠান-ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অনুপ্রাণিত করা যাক ওকে।

—তারপর, কাজকর্ম কী রকম চলছে তোমার?

—কাজকর্ম?—হিরণ্য যেন চমকে উঠল।

—তোমার ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—ওঃ!—একটু চুপ করে থেকে মৃদু একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল হিরণ্যঃ ইউ সী—এভ্রিথিং ইজ্ সো ডাল! দিনকালের অবস্থা তো জানোই। আর বলতে গেলে—হিরণ্য কেমন থতমত খেলঃ ব্যবসাও তো একটা জুয়ো ছাড়া কিছুই নয়। হারজিতের পালা দুই-ই আছে ওতে—কখন কোন্‌টা যে এসে পড়ে জোর করে বলা শক্ত।

জুয়ো। কথাটা আমার কানে বিঁধল। ঠিক এই সময়—রাস্তার জুয়োর আড্ডাটাকে কেন্দ্র করে এতখানি অপ্রীতি আর অস্বস্তির ঢেউ ওঠবার পরে—হিরণ্যের মুখে একথাটা শোনবার জন্যে মন যেন প্রস্তুত ছিল না। যদিও জানি ওটা একটা কথার কথা ছাড়া কিছুই নয়, এবং রাস্তার ধারের ওই জুয়াড়ী গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে হিরণ্যের মতো মার্জিত, পরিচ্ছন্ন, প্রায়-অভিজাত ভদ্রলোকের কোনো সম্পর্কই কল্পনা করা চলে না—তা হলেও এই মুহূর্তে শব্দটাকে হজম করতে বেশ খানিকটা কষ্টই হল আমার।

তাছাড়া বেশ বুঝলাম, আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। যে-প্রসঙ্গ দিয়ে হিরণ্যকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা উল্‌টো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে ওর মধ্যে। আরো মিইয়ে গেছে ও—আরো ম্লান হয়ে গেছে। জুয়ো

খেলায় হার জিত আছে তা ঠিক ; এবং এমন সন্দেহ করাও অস্বাভাবিক নয় যে সে খেলায় এখন হারের পাশাই পড়ছে হিরণ্যের।

উঠে পড়া উচিত কিনা চিন্তা করছি, এমন সময় রুনির পুনঃপ্রবেশ।

—মলয় এসেছিল দাদা?

—মলয়?—হিরণ্যের ক্লান্ত চোখ দুটো হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলঃ না।

রুনির গলায় একটা চাপা উৎকণ্ঠার আমেজ পাওয়া গেলঃ কোনো ফোন করেছিল?

—না।

রুনি আবার সরে গেল।

—মলয়! নুইসেন্স্!—একটা চাপা তর্জন করলে হিরণ্য। রুনির গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মারাতেও যে শান্ত স্তিমিত মানুষটা এতটুকু সজাগ হয়ে ওঠেনি —হঠাৎ তার চোখে মুখে ফুটে উঠল পৌরুষের উত্তাপ।

মলয় কে—সে কথা জিজ্ঞাসা করা অবৈধ কৌতূহল হবে কিনা ভাবছি, তার আগে উত্তর দিলে হিরণ্য নিজেই। বোধ হয় নিজেকে সংযত করতে পারছিল না বলেই কথাটা বেরিয়ে এল সজোর স্বগতোক্তি হয়ে।

—একটা দেড়শো টাকা মাইনের প্রফেসার—রুনির সঙ্গে ইণ্টিমেট্ হতে চেষ্টা করছে।—বিন্দু বিন্দু ঘৃণা ক্ষরিত হয়ে পড়ল হিরণ্যের স্বরেঃ স্ক্যাণ্ডালাস্! আর রুনিরই বা ওকে প্রশ্রয় দেবার কী মানে হয়?

ব্যাপারটা অনুধাবন করতে কষ্ট হল না। আর সেই মুহূর্তে আট বছর আগেকার কিশোরী রুনিকে আমার মনে পড়ল। সাধারণ একটি শাড়ি, পিঠে নিবিড় কালো একটি প্রলম্বিত বেণী, পায়ে চটি, বুকের কছে একরাশ বই খাতা নিয়ে চলেছে স্কুলে। শিশির জড়ানো ভোরের একটি কুঁড়ির মতো অমলিন আধফোটা লাবণ্য। আজকের রুনি যদি কোনো টাইম মেশিনে চড়ে সেদিনের রুনির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তা হলে—

বলে ফেললাম, অনেক বড় হয়ে গেছে, এবার বিয়ে দাওনা রুনির।

—হুঁ, দেব।—অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলে হিরণ্য।

রাস্তায় আবার চিৎকার। এবার আরো বিকট, আরো গগনভেদী। ঠিক হিরণ্যের বাড়িটার সামনেই। মনে হল যেন খনোখুনি শুরু হয়েছে ওখানে। এবার আর বসে থাকা গেল না—কৌতূহলভরে দুজনেই বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সামনের ব্যাল্‌কনিতে।

একজন রোগা ফর্শা চেহারার ছোকরাকে দুহাত ধরে টানাটানি করছে দুজন লোক। একজনের গায়ে কলারওলা গেঞ্জী আর পরনে পা-জামা—মাথা ঘিরে জড়ানো একটা নীল রুমাল ; আর একজনের মালকোঁচা মেরে কাপড়-পরা, গায়ে খাকী হাফশার্ট। দেখলেই বোঝা যায়, এদের সম্বন্ধে হিরণ্যের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি নেই কোথাও।

—আঃ, ছেড়ে দাও না বলছি—ছোকরা আর্তনাদ করে উঠল।

—ছেড়ে দেব মানে?—রুমাল জড়ানো লোকটা মোলায়েম স্বরে বলল, তখন মনে ছিল না?

—সব তো দিয়েছি। আর কিছু নেই আমার। কথা দিচ্ছি, কাল এসে সমস্ত শোধ করে দেব।

—বাকির কারবার নেই ব্রাদার, সব নগদ নগদ!—খাকী শার্ট একটা হ্যাঁচকা টান মারলঃ পালালে চলবে না। জামায় সোনার বোতাম আছে, হাতে আংটি আছে—

অসহায় আর্তচোখে ছোকরা আকাশের দিকে তাকাল—ওর দৃষ্টি এসে থামল আমাদের ব্যাল্‌কনির ওপরেঃ দেখুন স্যার দেখুন! রাস্তায় পেয়ে কেমন গুণ্ডামি করছে—

খাকী শার্ট হেসে উঠলঃ বাবুমশাইরা পাড়ার লোক—আমাদের জানেন। অন্যায় হাম্‌লা আমরা কারো ওপর করিনে। এসো এসো, হিসেব মিটিয়ে দিয়ে যাও—

—স্যার!—ছোকরা প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল।

মুখ ঘুরিয়ে নিলে হিরণ্য। ছটফট করে বললে, জুয়াড়ীদের কাণ্ড, কী আর দেখবে ওসব। চলো চলো, ভেতরে চলো।

ভেতরেই চলে এলাম। রাস্তার চিৎকার রাস্তাতেই চলুক। পাশের জানলা দিয়ে হু হু করা হাওয়ায় ছাতিম গাছে সমানে দুলছে কাকের বাসাগুলো।

আমি ভাবলাম, হিরণ্য হয়তো ভাবলঃ আজ আর আলোচনা করার কিছু নেই। যা বলা হয়ে গেছে, তার বেশি কিছু আর বলা চলবে না, সব কিছুর সুর কেটে গেছে। তাই ড্রয়ার খুলে একটা চেক বই টেনে বের করলে হিরণ্য।

—এখন অবশ্য বেশি কিছু দিতে পারছি না, তা হলেও—

পাশের টেলিফোনটা ঝন্‌ ঝন্‌ করে বেজে উঠল। চেক লেখা বন্ধ করে রিসিভার তুলল হিরণ্য।

—হ্যালো—কে? ওঃ—মিস্টার আয়ার? ইয়েস্‌—ইয়েস্‌—আই অ্যাম্‌ রিয়্যালি সো গ্ল্যাড্‌! এম্‌ব্যাসি? সিক্স থার্টি? অফ্‌ কোর্স—অফ কোর্স! শি মাস্ট গো—আই উইল সেণ্ড্‌ হার অল্‌ রাইট্‌। ও কে। থ্যাঙ্ক ইউ—

রিসিভার নামিয়ে উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে তাকাল হিরণ্য। অনেকক্ষণের একরাশ মেঘ কেটে গিয়ে যেন সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে এতক্ষণে।

—ওঃ, বেঁচেছি! আজ রাতে আমার ঘুম হবে!—হিরণ্য আবার স্বগতোক্তি করলে সজোরেঃ দু দুটো বড় টেণ্ডার আয়ারের হাতে। প্রায় ডুবেছিলাম আর কি!—হিরণ্য চেঁচিয়ে উঠলঃ রুনি—রুনি?

রুনি ছুটে এল।

—কে টেলিফোন করছিল দাদা? মলয়?

—না, মলয় নয়!—প্রসন্নতার মধ্যেও একবার ভ্রুকুটি ফুটেই মিলিয়ে গেল হিরণ্যেরঃ আয়ার। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় তোকে পার্টিতে ডেকেছে এম্‌ব্যাসিতে।

মুহূর্তে নিবে গেল রুনি। রঙ্‌করা মুখের ওপর ফুটে উঠল একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা। কশাইখানার বধ্যপশুর আর্তির সঙ্গেই, হয়তো একমাত্র সে মুখের তুলনা চলে!

রুনি একটা অদ্ভুত জান্তব গলায় বললে, দাদা।

হিরণ্যের সর্বাঙ্গে কেমন মাংসাশী নির্দয়তা যেন রেখায় রেখায় প্রকটিত হয়ে উঠল। আশ্চর্য ধীর কণ্ঠে বললে, এম্‌ব্যাসি। সিক্স থার্টি। শার্প। আয়ার অপেক্ষা করবে।

রুনি পর্দা সরিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন মিলিয়ে গেল প্রেত-লোকের ছায়ার আড়ালে। হিরণ্য তেমনি দীপ্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল আবার —মুখের ওপর দেখা দিল আবার সেই উদ্ভাসিত আনন্দঃ এসো—এবার চেকটা লিখে দিই তোমার।

কিন্তু আর কি বসতে পারি আমি—আর কি হাত পেতে নিতে পারি সে চেক? কন্যাপণে, মাতৃপণে—মনুষ্যত্বের পণে জুয়োর ছিটেফোঁটা?

একবার মনে হল, হিরণ্যকে আমি খুন করতে পারি—গলা টিপে হত্যা করতে পারি এই মুহূর্তেই। কিন্তু রাস্তার জুয়াড়ীদের বোমা-পিস্তল-ছোরার চাইতেও বড় অস্ত্র আছে ওর হাতে। সে অস্ত্র ওর আইন—সে অস্ত্র ওর মর্যাদা।

অগত্যা দাঁতে দাঁত চেপে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আজ থাক।



বারপূজা

মনোজ বসু

লাউড-স্পীকারে বারংবার ক্ষমা চাইছে। ট্রেনের কামরায় লাউড-স্পীকার। ভাষা একবর্ণ বুঝিনে—দোভাষি মেয়েটা মানে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সামনের ঐ স্টেশনে গাড়ি দশ মিনিট থেমে থাকবে। পাহাড়ে উঠবে এর পর, নতুন ইঞ্জিন জোড়া হবে। স্টেশনে নেমে বিশ্রাম করবেন, জলটল খাবেন। সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

এক গাড়ি ঠাসা মানুষ। ছোট্ট পৃথিবীর সকল অন্ধিসন্ধি থেকে এসেছেন দু-দশ জন করে। গাড়ি থামতে না থামতে নেমে পড়লেন সকলে। রকমারি পোশাক-আশাক—ভাষাই বা কত রকমের! ভাব করবার জন্য মুকিয়ে আছেন সকলে, হাত বাড়িয়ে ছুটে আসেন।

আমি অমুক দেশ থেকে এসেছি। নাম আমার—

ঠিক দুপুরে সূর্য মাথার উপর। ছায়া নেই—কিন্তু দোভাষি ছেলে-মেয়েগুলো ছায়ার মতোই গায়ে গায়ে লেপটে আছে। অতএব আলাপ-পরিচয়ের অসুবিধে নেই। আর ওরা না থাকলেই বা কি! মনের দরজা খোলা থাকলে ভাষায় কি আটকাতে পারে?

তৃষ্ণা পেয়েছিল। ঢুকে পড়লাম ওয়েটিং-রুমে—কিংবা বলি, বড়মানুষের এক সাজানো বৈঠকখানায়। জলের ব্যবস্থা আছে বলেছিল—তা বলে নদী-তড়াগের শাদামাঠা জল নয়। লেমনেড ইত্যাদি, অথবা সুপক্ক কমলানেবুর রস। প্রবীণ এক ব্যক্তি ধমকে ওঠেন, কি জল-জল করছ! দেশে ফিরে দেদার জল খেও। খাতির করে যা দিচ্ছে, ঢকঢক করে গিলে নাও এখন।

আর তা-ও বলি, বড় দুর্ভাগা এরা, তেষ্টার জলটুকু নির্ভয়ে মুখে নেবার জো নেই। বীজাণু-বোমা ফেলেছিল—গোটা কয়েক তার পাওয়া গেছে। অজানা আরও কত আছে, কে বলবে! ভাল করে না ফুটিয়ে জল খাওয়া মানা। নিজেরা খায় না, অতিথ-জনকে তা দেবে কেমন করে? নানান রকম তাই অনুকল্প ব্যবস্থা।

লম্বা টানা টেবিলের এধার-ওধার বসেছি। কোণের লোকটিকে দেখে শিউরে উঠলাম। মুখের খানিকটা পুড়ে গিয়ে চামড়া দলা হয়ে আছে। তবু কিন্তু সাহেব। নীলাভ মণিদুটো ভ্রূহীন কোটরের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। সে-ও তাকাচ্ছে আমার দিকে। সেটা কিছু বিচিত্র নয়। ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা কৃষ্ণমূর্তি—হংসো মধ্যে বক আর কি হিসাবে বলি—বায়স একটি। অস্বস্তি লাগে। লোকটার গা ঘেঁসে কুঞ্চিতকেশা এক তরুণী। ফিসফিস-গুজগুজ করছে দুটিতে। আমার সম্বন্ধে বলাবলি হচ্ছে, এমত সন্দেহ। জোড়ে এসেছে নাকি—স্বামী ও স্ত্রী? মহাপ্রাচীর দেখতে যাচ্ছি—কিন্তু ঐ বীভৎস পুরুষটার গা ঘেঁসাঘেঁসি করে পরমাসুন্দরী মেয়েটা—মহাপ্রাচীর এর চেয়ে কি বেশি আশ্চর্য ব্যাপার?

একটা জায়গায় বসে নেই কেউ। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক'টা দিনই বা থাকা হবে একসঙ্গে—তারই মধ্যে যতটা সম্ভব পরস্পরকে চিনে বুঝে নেওয়া। আমার পাশের চেয়ার খালি হতেই মুখপোড়া সাহেব সেইখানে এসে বসল।

ইণ্ডিয়া থেকে আসছ তুমি? আমি নিউজিল্যাণ্ডের।

ফড়ফড় করে একগাদা কথা বলে গেল।

লড়াইয়ের ধাক্কায় ঘরবাড়ি গেল, একটা ভাই আর ভাইপো মারা পড়ল। দেশে আর থাকতে পারলাম না, ভিন দেশে নতুন বসতি। একটা ডেয়ারি-ফার্ম করেছি, তাইতে দিন চলে যায়...

এমনি সময় খবর দিল, চলে আসুন—উঠে পড়ুন গাড়িতে। এবারে ছাড়বে।

কিন্তু কমলি ছাড়ছে না। চলল পিছনে পিছনে। তার পিছনে সুন্দরী মেয়েটা।

এই কামরা? আমরাও উঠছি। গল্প করা যাবে তোমার সঙ্গে।

সামনাসামনি বেঞ্চে জুত করে বসে প্রথম কথা—

শরিফপুরা জানো?

সবিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকাই। সাহেব একটু যেন গরম সুরে বলে, জানো না? এই যে বললে ভারতের মানুষ—

ভারতের মানুষ হয়ে শরিফপুরা না জানা যেন বিষম অপরাধ। এমন অপরাধের মার্জনা হয় না, সাহেবের মুখচোখের ভঙ্গি এইপ্রকার।

আমতা-আমতা করে বলি, ভারত কি একটুখানি জায়গা? শরিফপুরার মতো লাখ লাখ গ্রাম। দ্বীপের মানুষ তোমরা—সে সব আন্দাজে আসবে না।

সাহেব অধীর কণ্ঠে বলে, কিন্তু বরকত সিং সন্ত সিঙের বাড়ি যে সেই গ্রামে—

ব্যাপার আরও ঘোরালো হয়ে উঠছে। একে শরিফপুরা, তার উপর কোথাকার কোন বরকত সিং ও সন্ত সিং। ত্রিবিধ বস্তুর কোনটারই নাম ইহজন্মে কানে শুনিনি। এক কালের ফৌজি সাহেব তো—সাবেকি মেজাজ কিয়ৎ পরিমাণে আছে এখনো। জেরায় পড়লে রক্ষে থাকবে না। ভয়ে ভয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করি।

ভারতে চলো না একবার। কতটুকু পথ! পৃথিবীতে দূর বলে কিছু তো আজকাল নেই—

যাবো। ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে সাহেব বলে, যাবো নিশ্চয়ই। সন্ত সিং আছে এখনো বেঁচে। প্রায়ই ভাবি ওদের দু-ভায়ের কথা। অমন বীর মানুষ হয় না।

ফোলিও-ব্যাগ রেখেছিল টেবিলে। (আজ্ঞে হ্যাঁ, গাড়ির কামরায় প্রতি বেঞ্চের সঙ্গে টেবিল।) তুলে নিয়ে হাতড়াচ্ছে। বের করল বিজীর্ণ এক পকেট-বই।

এই যে—দেখ, ঠিকানা লিখে দিয়েছিল সন্ত সিং—তার নিজের হাতে লেখা। ফি বছর ভাবি, যাবো—গিয়ে দেখেশুনে আসবো। তা আর হয়ে ওঠে না। আসছে শীতকালে নিশ্চয় যাবো, এই বলে রাখলাম—

তারপর সমস্ত পথ ধরে চলল বরকত আর সন্ত সিং দু'ভায়ের কথা।

গল্প বলতে জানে বটে সাহেব! ওরা এক রেজিমেণ্টে থাকত, পাশাপাশি লড়েছে। কুমীর-হাঙরে ভরা খরস্রোত নদী সাঁতরে পার হয়েছে কতবার, অরণ্যে সাপের মতো বুকে হেঁটে চলেছে। এক নিশিরাত্রে হুকুম এলো, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে। শত্রু ওপারে। তারাও আসছে, তাদের আগে উঠে পড়তে হবে। উন্মাদ হয়ে ছুটেছে—শেলের আগুনে অন্ধকার বিভাসিত হচ্ছে বারংবার। বরকত আর সন্ত সিং সকলের আগে...উঠে পড়েছে তারা ...বৃষ্টির মতো গুলির ধারা মেশিনগান থেকে। বিপুল বিজয়োল্লাস। দু-ভাই এবং আরও কতজনে মুখ থুবড়ে পড়ল হঠাৎ গুলি বিঁধে। তবু জয় আমাদের। তারার আলোয় স্ট্রেচারে করে নিঃশব্দে তাদের হাসপাতালে নিয়ে চলল। সন্ত সিং-এর পা দুটো গেল, বরকত প্রাণে মরল। কম্যাণ্ডারের চোখে জল। সামরিক সম্মানে কবর দেওয়া হল বরকতকে। ঘরবাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অজানা দেশে সে ঘুমিয়ে আছে।

নিঃশ্বাস ফেলে সাহেব চুপ করল। চলন্ত গাড়ির জানলায় ক্ষণকাল বাইরের পানে তাকিয়ে থাকে। মুখ ফিরিয়ে আবার বলে, আমার এই দশা দেখছ, এ চেহারা ছিল না আমার—

মেয়েটার দিকে এক নজর চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করো, ন্যান্সীও আমার কাছে দাঁড়াতে পারত না। বড়লোকের মেয়ে—রূপ আর স্বাস্থ্য দেখেই আমায় বিয়ে করেছিল। সে আমলের ছবি আছে ওর লকেটে—

ডেকে বলে, ন্যান্সী, লকেটটা দেখাতে পারো আমাদের বন্ধুকে?

এই মাসখানেক আগে একটা কাজে অমৃতসর যেতে হয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে জালিয়ানওয়ালাবাগ গেলাম এক সন্ধ্যায়, চুপচাপ এক গাছের তলায় গিয়ে বসলাম। ঊনিশ শ' ঊনিশের বুলেটের দাগ গাছের গুঁড়িতে, অদূরের দেয়ালটার নানা জায়গায়। সমস্ত চিহ্নিত করে রেখেছে, নষ্ট হতে দেয়নি। একটি মাত্র সুঁড়িপথ ছিল যাতায়াতের, ডায়ার সেই মুখে কামান বসিয়েছিল। রক্তে রাঙা হয়ে গেল মাঠ—বখরার ব্যাপার নেই, রক্তের তাই জাতবিচার ছিল না সেদিন।

দেখছি চেয়ে চেয়ে। পাঁচিল ভেঙে এখন একটা দিক একেবারে ফাঁকা—জুত হয়েছে চলাচলের। সাবেকি সুঁড়িপথে কেউ বড় যায় না। আবার যদি ডায়ার এসে কামান বসায়, পালাবার অসুবিধা হবে না।

যাঁদের বাড়ি এসে উঠেছি, তাঁরা মস্ত বড়লোক। তিন তিনটে শালের ফ্যাক্টরি তাঁদের। মেজ ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে খেজমত করছে। বলে, এই টানা বস্তি ছিল দেয়ালের ধার দিয়ে। দেয়াল ভেঙে বস্তি পুড়িয়ে দিয়েছে দাঙ্গার সময়। আজাদির সেই সমারোহের সময়টা।

তাই বটে! এত বছর কেটেছে, জায়গাটা ভাল মতো সাফসাফাই করে নি। পোড়ার চিহ্ন যত্রতত্র। কেন জানি না—মনে পড়ে গেল, মুখপোড়া সাহেবের

গল্প। সন্ত সিঙের লেখা ঠিকানা দেখিয়েছিল—সে গ্রাম তো অমৃতসর জেলায়।

শরিফপুরা জানো?

হ্যাঁ, জানে সে। এক কথায় চিনতে পারল। দূরও নয় বেশি। অনেক কারিগরের বাড়ি সেখানে। ফ্যাক্টরি থেকে কাপড় নিয়ে যায়, বাড়ির মেয়ে-পুরুষে মিলে নক্সা তোলে। হপ্তায় হপ্তায় এরা সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। কালই তো যাচ্ছে ঐ দিকে মোটর নিয়ে।

পরের দিন আমিও তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসি। পথের মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ত সিং বরকত সিঙের বাড়ি তো ওখানে?

হাঁ করে চেয়ে থাকে। সেই সব বীরত্বের কাহিনী বললাম। তখন মনে পড়ল—ঠিক, স্তম্ভ গেঁথে নাম লিখে দিয়েছে। নাম বরকতই বটে! বরকত সিং—

দুটো নহর পাশাপাশি। রাভির জল দিগ্‌ব্যাপ্ত শস্যক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে নহরের পথে। পুল পার হয়েই সারি সারি দোকান রাস্তার ধারে। শরিফ-পুরা বাজার। ঐখানে নেমে পড়লাম।

পুলের উপর পা ছড়িয়ে আয়েশ করে তেল মাখছে অনেক লোক, তেল মেখে ঝুপ ঝুপ করে জলে পড়ছে। গরু-মহিষ ধোয়াচ্ছে। শুকনার সময় —তবু কাদা-কাদা হয়ে গেছে জায়গাটা। পুলের একেবারে লাগোয়া বরকত সিঙের স্মৃতিস্তম্ভ। গুরুমুখী পড়তে পারি নে, তবু আন্দাজ করা যায়, বীরত্বের বহু ব্যাখ্যান পাথরের গায়ে লিখিয়ে দিয়েছে গুণগ্রাহী ইংরেজ সরকার। সিমেণ্টে বাঁধানো চাতাল—কিন্তু বিষম নোংরা করে রেখেছে। ছেঁড়া ময়লা ঝুলি-কাঁথা নিয়ে একদল ভিখারি। ভাল করে জায়গাটা দেখব—কিন্তু ভিখারিগুলো এমন করছে যে অধিক এগুনো যায় না।

সে যাকগে, বরকত সিং তো হয়ে গেল—সনাথী একজনকে জিজ্ঞাসা করি, সন্ত সিং বলে এ গাঁয়ে কে আছেন?

চেঁচিয়ে উঠল এক ভিখারি। হাত নেড়ে ডাকছে, লোভে চকচক করছে দু-চোখ।

আমি—এই যে, আমি। কিছু দিয়ে যাও বাঙালি বাবু, ভাল হবে তোমার—

পা দুটো কাটা। লক্ষণ মিলে গেল। তা গুণগ্রাহী বটে সরকার বাহাদুর! সিমেণ্টে বাঁধানো পাকা চাতাল বানিয়ে দিয়েছে বরকত সিঙের স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে। নইলে নিচের ঐ কাদার মধ্যে বসে ভিক্ষে করতে হত।



স্তালিন: স্মৃতিচিত্র

জাঁ-রিশার ব্লখ

(মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ)

[লেখাটি মূল ফরাসীর বাঙলা অনুবাদ।

এ লেখাটি স্তালিনের জীবনী নয়, বলা চলে চরিত্র-চিত্র। পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কনের অবশ্য অবকাশ ছিল না; ১৯৪৬-এ 'ফ্রান্স-সোবিয়েত সমিতিব' উদ্যোগে বক্তৃতাকারে এই লেখাটি লেখক উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পরে গ্রন্থাকারে তা সম্পূর্ণ চরিত্র-চিত্র রূপে প্রকাশিত করবেন। কিন্তু লেখকের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হযনি। ১৯৪৯-এ তাই তাঁব নোট থেকে লেখাটি প্রকাশ করেন পারি'র 'এদিসিঅঁ সোসিয়াল'; নাম দেন 'সাম্যবাদী মানুব।' উপলক্ষ ছিল স্তালিনেব সপ্ততি বৎসর পূর্তি, তাঁর জয়ন্তী।

জাঁ-রিশার ব্লখ্-এব নাম আমাদের একেবারে অপরিচিত নয়। ফরাসী সাহিত্যে তাঁব উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা প্রভৃতি সুপরিচিত। ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিযেও আমবা তাঁর 'এন্ড কোং' এবং কুর্দিস্তানের রাত্রি' প্রভৃতি উপন্যাসেব বসাস্বাদন করতে পারি। তিনি ছিলেন রলাঁ, বারবুস্, পল ভাইঞা-কুতুরিযে'র বন্ধু। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি তিনবার আহত হন। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে স্বভাবতই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসি-আমলে তাঁকে আত্ম-গোপন করে কিছুদিন কাজ করতে হয। পরে তিনি উপস্থিত হন মস্কোতে; সেখানে তখন মস্কো রেডিওর ফরাসী বিভাগেব তিনি ভার গ্রহণ করেন। ফ্রান্সেব উদ্ধারেব পবে ব্লখ্ আবার স্বদেশে ফেরেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মহাপ্রাণ রলাঁ ব্লখের শক্তিতে ও ব্যক্তিত্বে ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাবান্। '—এন্ড কোং'র ভূমিকায ১৯২৬ সালে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলেন: পনের বৎসর আমাদের পরিচয়, ভাই-এর মতো আমি তাঁকে ভালোবেসেছি। ঝটিকা-তাড়িত এই পনের বৎসর যেন আত্মার ও আত্মীয়তার কষ্টিপাথর; তাতে আমাদের পরস্পবের প্রতি আস্থা আরো নিবিড়তব হয়ে উঠেছে। এই বলিষ্ঠপ্রাণ শিল্পী—আপনার লেখা ও ভাবনাকে যিনি একসূত্রে গেঁথেছেন, একসূত্রে গেঁথেছেন তাঁর কর্ম ও ভাবনাকেও,—এমন এক মানব-চরিত্র যা তাঁব শিল্পেবই সমতুল্য।

—গোপাল হালদার]

মার্শাল স্তালিন—বলা উচিত, মার্শাল হবার আগে ও পরে স্তালিন সম্পর্কে—আমি কিছু বলতে চাই শুনে সকলেই যেন আমার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কেন?

সোবিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে, বল্‌শেভিকবাদ ও বল্‌শেভিকদের সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা বেশ অস্পষ্ট। সোবিয়েত ইউনিয়নের বিষয়ে কিছু বললেই একটা রহস্যময় মহাদেশের কথা অনেকের মনে আসে। আমেরিকান্ বা অন্য যে-কোন বাজে সাংবাদিকেরও ধারণা যে ঐদেশের ঘটনা নিয়ে হাবিজাবি যা

কিছু লেখারই অধিকার তাদের আছে ; সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোনও অঞ্চলের নাম করে বললেই যেন তাদের নেহাত আজগুবি গল্প-গুলিও পাঠকরা হজম করে নেবে—এই তাদের বিশ্বাস।

এর অন্যতম কারণ এই যে, ঐতিহাসিক ঘটনায় বাধ্য হয়ে সোবিয়েত ইউনিয়নকে সতর্ক হতে হয়েছে। ফলে, (বিদেশীদের পক্ষে) সেদেশে চলাচলের সুযোগসুবিধাও একটু সংকোচ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তা নইলে ভয় থাকে যে শত্রুপক্ষের স্বার্থে নাশকতামূলক কাজ ও গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যেই এই সুযোগ যে কোন মুহূর্তে ব্যবহার করা হতে পারে।

উদাহরণ? অনেকই আছে। যে-দৃষ্টান্তটি দিচ্ছি তা থেকেই বোঝা যাবে, সোবিয়েত ইউনিয়নের এই সতর্কতা কেন। সতর্ক হয়েছিল বলেই গত যুদ্ধে আমাদের জয়ের সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ ছিল।

আমাদের সরকার—বরং বলা যাক, যে-সরকার ১৯৪০ সালে এদেশে ছিল—যখন খুব বুদ্ধি করে ফিন্‌ল্যাণ্ডের ব্যাপার নিয়ে সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবার মতলব আঁটতে থাকে, তখন একবার ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সেনাপতি-পরিষদ থেকে জানতে চাওয়া হয় যে কী ভাবে বাকু ও বাতুমের পেট্রলখনিতে বোমাবর্ষণ করে ভবিষ্যৎ শত্রু সোবিয়েত ইউনিয়নকে ঘায়েল করা যায়। জবাবে, ফরাসী বিমানবাহিনীর হেড্‌-কোয়ার্টার স্বীকার করেন যে এই সব অঞ্চলের যে-ফোটো তাঁরা তুলেছেন তা এতই ত্রুটিপূর্ণ যে ঠিক মতো বোমাবর্ষণ অসম্ভব।

যাই হোক্‌, মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

স্তালিনের কথা বলতে গেলেই তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উত্থাপন করতে হয়, নয় কি? তাঁর সম্পর্কে আলোচনা কে না করেছে? প্রাচ্যের স্বৈরশাসক, স্বেচ্ছাচারী জার, গোপন নির্জনতার প্রাচীরে ঘেরা ব্যক্তিবিশেষ ইত্যাদি কত রকমই তো তাঁর সম্পর্কে শোনা যায়।

বারবুস্‌ (১) একবার স্তালিনকে বলেন ঃ

> "জানেন কি যে ফ্রান্সে আপনাকে অনেকে খুব একগুঁয়ে, অত্যাচারী বলে মনে করে? উপরন্তু, তাদের ধারণা যে আপনি এক ভীষণ রক্তপিপাসু শাসক!"
>
> শুনে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, আর তাঁর চোখে-মুখে ভরে উঠল সেই সুন্দর, শ্রমিকসুলভ প্রাণখোলা হাসি।

এই বারবুস্‌ই আরেক জায়গায় লিখেছেন, ঠিকই লিখেছেন ঃ

> "এই ধরনের ব্যক্তিদের বুঝতে সময় লাগে; কিন্তু তার কারণ তাঁদের জটিলতা নয়, তাঁদের সরলতা।"

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে যে এই কথা ক'টি কত যথার্থ।

স্তালিন সম্পর্কে আমার বলার যে এক্তেয়ার আছে তা শুধু বইপড়ার

---

(১) অঁরি বারবুস্‌। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে ফ্রান্সের বিখ্যাত গণতান্ত্রিক লেখক। জোসেফ্‌ স্তালিনকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন। স্তালিন সম্পর্কে তিনি যে স্মৃতিচিত্রটি রচনা করেন, উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি তা থেকেই নেওয়া।

ভিত্তিতে নয়। শুধু এও নয় যে লাখ লাখ লোকের মতো আমিও নানা সার্বজনীন অনুষ্ঠানের সময় তাঁকে মস্কোতে দেখেছি। কারণ এই যে, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর কাছাকাছি আসার সুযোগ আমার হয়েছিল।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে আমি গোপন অবস্থায় পারী থেকে চলে যাই। তখন থেকে চুয়াল্লিশ মাস সোবিয়েত ইউনিয়নে কাটাই; তার মধ্যে বিয়াল্লিশ মাসই যুদ্ধ। এই সাংঘাতিক যুদ্ধে সোবিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি পড়ে।

সেদেশের সেরা সোবিয়েত লেখকদের অনেকের সঙ্গে এবং বহু ফরাসী ও বিদেশী কূটনৈতিক কর্মচারীর সঙ্গে আমি অনেকদিন একই জায়গায় বাস করতাম। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব বিচক্ষণ রাষ্ট্রদূত মশিয়ে রোজে গারো এঁদের অন্যতম।

সোবিয়েত রাষ্ট্রজীবনের জনকয়েক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও কর্মচারী এবং লালফৌজের কয়েকজন সেনাপতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ১৯৪১ সালের ১৬ই অক্টোবর মস্কো থেকে হঠাৎ লোকাপসারণের মধ্যে আমিও শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়িঃ খুব বেদনাদায়ক হলেও সেই অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিসীম।

আরও হাজার হাজার লোকের মতো আমিও যেন এই সময় থেকেই সোবিয়েত জনতার অন্তরে প্রবেশের পথটি খুঁজে পেলাম। তাদের ভয়ভাবনার ভাগী হলাম আমিও; ট্রেনে ট্রেনে শহরছাড়া যাত্রীর ভিড়ে মিশে গেলাম; তাদেরই কয়েকজনের সঙ্গে সস্ত্রীক গিয়ে উঠলাম পুরানো শহর কাজানের এক চাষী গৃহস্থের বাড়ি; কয়েক সপ্তাহ এক তাতার পরিবারের সঙ্গেও থেকেছি, এবং পরে বেশ কয়েক মাস কেটেছে উরালের নানা শহরে।

অসুস্থ হয়ে পড়ি; তখন আবার সোবিয়েত দেশের হাসপাতালগুলির চমৎকার ব্যবস্থা, জীবনযাত্রা ও সেখানকার সৌভ্রাত্রপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ১৯৪৩-এ মস্কো ফিরে এসে আবার আমি—এদেশে যাঁদের বলে "সম্ভ্রান্ত"—তাঁদের সংস্পর্শে এলাম। রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের নেতৃস্থানীয় অনেকের সঙ্গে আলাপ হতে তাঁরা বললেন তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে। এখানে একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি। যুদ্ধ শুরু হতেই আমাকে সোবিয়েত বেতারকেন্দ্রের ফরাসী বিভাগে কাজ করতে অনুরোধ জানানো হয়; এই কাজ চলে বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে। অল্পকাল পরেই সংবাদ-দপ্তরের ফরাসী বিভাগে কাজের ডাক পড়লঃ এই দপ্তর চলে পররাষ্ট্র-বিভাগের নির্দেশে। তাছাড়া, রাজধানী ও নানা প্রদেশের সব ক'টি প্রধান সংবাদপত্রের নিরন্তর তাগিদে অনেক প্রবন্ধাদি লিখতে হয়।

এই সব কাজের মূলনীতি হিসাবে আমাকে কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? সব বিষয়ে, সর্বত্র সে নীতি হ'ল এইঃ

> ফরাসীদের উদ্দেশে কবে, এমন ভাবে বলুন যেন তারা সাহস পায় আপনার কথায়; আর সোবিয়েতবাসী ও বিদেশীদের উদ্দেশে—বিদেশেও আপনার প্রবন্ধ আমরা পাঠাচ্ছি—শুধু তেমন কথাই বলবেন যা ফ্রান্সের হিতার্থে।

এই মাত্র!

তারপর যখন ফ্রান্সের প্রতিরোধের সাক্ষ্য প্রকাশ্যেই পাওয়া যেতে লাগল, তখন থেকেই বারবার অনুরোধ আসে ফরাসী জনসাধারণের গৌরব, তার প্রতিরোধ, সংগ্রাম, আত্মদান ও বীরত্বের কাহিনী নিয়ে রচনা চাই—চাই চীনা সংবাদপত্র, ভারতীয় সংবাদপত্র, নিকটপ্রাচ্য, মিশর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংবাদ-পত্রের জন্য; এবং রুমানিয়া, বুলগারিয়া প্রভৃতি দেশ যেমন একটার পর একটা মুক্ত হতে থাকে, সেখানকার পত্রিকা থেকেও ঐ একই চাহিদা। সোবিয়েত বেতার ও সংবাদ-দপ্তর উভয়েরই পরিচালনার ভার যে সর্বোচ্চ কেন্দ্রে, সেখান থেকেই আমার কাছে এই অনুরোধ আসে।

বুলগারিয়া মুক্ত হওয়ার তিন দিনের মধ্যেই জর্জ দিমিত্রভ প্রামাণিক প্রবন্ধ চেয়ে পাঠালেন। জার্মান আধিপত্যের যুগে অজ্ঞতায় মগ্ন বুলগার জনসাধারণকে জানাতে হবে ফরাসী প্রতিরোধের কাহিনী।

এসব কথা কেন বলছি?

বলছি প্রথমতঃ, এই কথা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে যে তখনকার দিনের সেই পরিবেশ ছিল সৌহার্দ্য ও বিশ্বাসে ভরা। এই বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসই সোবিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি। চিরদিনই যেন এমনি থাকে।

বলার উদ্দেশ্য আরও এই যে আমি একটা সাধারণ ধারণা দিতে চাই কী অবস্থার মধ্যে স্তালিন সম্পর্কে আমার তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

তাঁকে নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে।

এসব রচনা আমি মন দিয়ে পড়েছি। এর অনেকগুলিতেই কিছু কিছু তথ্য ও চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সব তথ্য ও ঘটনাবলীকে তাঁর জীবনপ্রবাহ ও অভিজ্ঞতার প্রাণময় বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া উচিত। আমি এই চেষ্টাই করেছি। স্তালিনের জীবনী, কর্মকাণ্ড ও রচনাবলী সম্পর্কে নিয়মিত অধ্যয়ন করে যে স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা ও খাজুগুণের সন্ধান পেয়েছি তা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। তিনি জাতিতে ফরাসী হলে আমাদের দেশের সাংবাদিক চুনোপুঁটিরা তাঁর ক্ষেত্রে "কার্তেশীয় যুক্তি" (২) এই কথাটি হামেশাই ব্যবহার করতেন। স্তালিনের চেয়ে বেশি "কার্তেশীয়" কেউ নয়!

কিন্তু তিনি সোবিয়েত দেশের লোক, তার উপর জর্জীয় হওয়াতে তাঁর মুশ্‌কিল আরও বেশি। তাই, এড্‌ভেঞ্চারের গল্প পড়ে এবং এশিয়া সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসের বশে অনেকে শুধু রং-ফলানো রোমাঞ্চই খুঁজে বেড়ায় তাঁর মধ্যে।

কাজটা খুবই রোমাঞ্চকর। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা মিথ্যা ছাড়া এতে আর কিছুই নেই। সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সব কিছু —তা' রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিচারের বিখ্যাত কাহিনীই হোক্ কিংবা পাঁচসালা পরি-কল্পনাই হোক্—সব কিছুই মোটা মোটা বই আর স্টেনোগ্রাফে লিপিবদ্ধ

(২) "কার্তেশীয়"=দেকার্ত-এর মতো। ফ্রান্সের বিখ্যাত যুক্তিবাদী দার্শনিক।

বিবরণীর আকারে খোলাখুলি সেদেশে প্রকাশিত হচ্ছে, অনুদিত হচ্ছে সমস্ত ভাষায়, সর্বত্র তা বিক্রি হচ্ছে এবং সকলেই তা কিনতে পারে।

বল্‌শেভিক পার্টির কংগ্রেস ও সম্মেলনগুলি সম্পর্কে, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নানা কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে ঐ একই কথা খাটে।

সোবিয়েত ইউনিয়নের শক্তি কতখানি তা যখন বোঝা গেল, তখন অনেকে লালফৌজ ও পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে বলতে শুরু করলঃ

"তাই তো, এতটা কে জানত! ওরা যে সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিল!"

শুধু হিটলারই একথা বলেছে তা নয়; আমাদের স্বদেশে, আমাদের মিত্রশক্তিদের দেশেও এ রকম কথা শোনা গিয়েছে।

আবার বলতে বাধা নেইঃ একথা ঠিকই যে স্তালিন, মলোতভ্, কাগানোভিচ্, মিকোইয়ান্ প্রমুখ সকলেরই বক্তৃতায় সংখ্যার হিসাব, কারখানা সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি সব কিছু দিয়ে পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির সমগ্র চেহারাটি বিশদভাবে খুলে ধরা হয়েছে। তখন তো এই তথ্য ও হিসাবকে অসত্য, জালিয়াতি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল অনেকে! কিন্তু বাস্তবেই এখন এই সব বিবরণীর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে আবার ক্রেমলিনের ঘোর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা গলা কাঁপিয়ে বলতে আসেন। সে বিষয়েও, দুঃখ এই যে, ক্রেমলিনের রাজনীতি চিরকালই খোলাখুলি পড়ে আছে, এবং এ সম্পর্কে দরকারী সব তথ্য সামান্য একটু খাটলেই জোগাড় করা যেত।

আসলে, সংবাদদাতাদের বেশির ভাগ, এবং দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে—কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা অধিকাংশই এত আলস্যপ্রিয় যে তাদের পক্ষে এরকম খেটে কাজ করা সম্ভব নয়। জানবার ইচ্ছা এদের অধিকাংশেরই এত কম যে কাজের এই পদ্ধতি তাদের পক্ষে অচল। তাছাড়া, বল্‌শেভিক বিপ্লবের দেশ সম্পর্কে যে আজন্ম অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ সযত্নে পোষণ করা হয়, তা থাকলে এই পদ্ধতিতে কাজ করা চলে না।

অতএব, যাঁরা "রোমাঞ্চক" কিছু আশা করেন, আমার লেখায় তাঁদের হতাশ হতে হবে।

ঠিক ঠিক বলতে গেলে স্তালিনের **মনস্তাত্ত্বিক জীবনী** বলতেও কিছু নেইঃ অন্ততঃ তা নিয়ে যে খানিকক্ষণ ফলাও করে আত্মপ্রসন্ন অবসরে সময় কাটবে, তাও হবার জো নেই।

ছিচ্‌কে অতিচালাকের দল আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে ক্রেমলিনের অন্ধকারেই স্তালিনের বাসা। একথাও ঠিক নয়। স্তালিন প্রকাশ্যেই বাস করেন। তাঁর কোন কাজ, কোন আচরণই সোবিয়েত জনসাধারণের নিকট গোপন থাকে না।

তবে, আমেরিকান্ বন্ধুরা যাকে বলেন "হল্‌দে সংবাদপত্র", অর্থাৎ নামজাদা লোকেদের অন্তরঙ্গ জীবনকাহিনীর ব্যক্তিগত ও মুখরোচক টুকিটাকি যে-সাংবাদিকতার একমাত্র উপজীব্য তা সোবিয়েত ইউনিয়নে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের কাছে স্তালিনের একমাত্র পরিচয় এই যে তিনি বল্‌শেভিক বিপ্লবী, সমাজবাদী রাষ্ট্র এবং সোবিয়েত জনসাধারণের সেবক।

কালিনিন—অল্প কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, স্তালিনকে তিনি ভালো করেই জানতেন—খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা কথা একবার লিখেছিলেনঃ আমাদের চোখে সোবিয়েত জীবনের একেবারে নতুন একটা দিকের দরজা যেন খুলে যায় এই একটি কথায়।

কালিনিন লিখেছিলেনঃ "স্তালিনের জীবনী যেন রুশদেশের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনেরই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।"

এই কথাটির অর্থ কি? অর্থ এই যে, স্তালিন কখনও চান না যে তাঁর নিজের জীবনকাহিনী সোবিয়েত জীবনযাত্রার ঘটনাবলী থেকে আলাদা করে দেখা হোক্। কোন্ রান্না স্তালিনের ভালো লাগে, কোন্ পোশাক তাঁর পছন্দসই, অবসর বিনোদনের জন্য তিনি কী করেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে—এসব সম্পর্কে কোনও প্রবন্ধই সোবিয়েত সংবাদ-পত্রে খুঁজে পাবেন না। আলোকচিত্রে তাঁর আবাসকক্ষের বা তাঁর অফিসঘরের বিস্তারিত বিবরণ...তাও পাবেন না। কারণ এ নয় যে স্তালিন লোকচক্ষুর আড়ালে সারাদিন দরজায় খিল তুলে বসে থাকেন। মোটেই তা নয়—একথা বারবার বলছি! শান্তির সময়ে তিনি প্রত্যহ সোবিয়েত ইউনিয়নের চারদিক থেকে আসা বহু প্রতিনিধি দলের সঙ্গেই দেখা করেনঃ পুরুষ, নারী, শিশু, বিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ, শ্রমিক, কৃষক—সব রকম লোকই আসে।

বরং একথাই বলতে পারা যায় যে, সোবিয়েত দেশে জনসাধারণ রাষ্ট্রনেতা-দের যত কাছাকাছি আসতে পারে, এমন আর কোন দেশেই সম্ভব নয়। কিন্তু স্তালিন মনে করেন যে, রাজনৈতিক জীবনের বাইরে তাঁর যে ব্যক্তিগত জীবন তা এমনই একটা সামান্য ব্যাপার যে তাতে কারুরই কিছু এসে যায় না।

রাজনৈতিক ও প্রকাশ্য জীবনের কাজ বাদ দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রূপকথার কাহিনী রচনার চেষ্টা সোবিয়েত জনসাধারণ ও তাঁর নিজের দিক থেকেও অশোভনঃ এও তাঁর মত।

অন্যান্য দেশে জননেতারা অনেকে নিজেদের সম্পর্কে যে অলস গুজব-বিলাস, সময়ে-অসময়ে যে নির্বিচার ঔৎসুক্যের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তার থেকে এই মনোভাব কত আলাদা!

যৌবনে ককেশাস্ অঞ্চলে তাঁর সংগ্রামের সাথী একজন বলেছেনঃ "কমরেড কোবা—তখনকার গোপন কাজে স্তালিন এই নামে পরিচিত ছিলেন—তাঁর স্ত্রী নেই, তাঁর ঘরবাড়ি নেই; তাঁর জীবনে, তাঁর চিন্তায় বিপ্লব ছাড়া আর কিছুরই যেন কোন স্থান নেই।"

দশ বছর পরে পেত্রোগ্রাদে ঐ একই অবস্থা, একই কথা আমরা শুনিঃ "বহুদিন যাবত স্তালিনের আর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই।"

স্তালিন সম্পর্কে কোন চলচ্চিত্র আমি দেখিনি। বহুবিধ গ্রন্থের লেখক জার্মান এমিল্ লুড্‌ভিগ্ বলেছেন যে স্তালিন নাকি চলচ্চিত্রে নিজেকে রূপায়িত করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু এই রূপায়ণ কদাচিৎ করা চলবে এবং ভূমিকাটি এমন হওয়া চাই যে তাতে অশিষ্টতা বা বাড়াবাড়ি কিছু না থাকে।

(ক্রমশ)

অনুবাদঃ　রণজিৎ গুহ

বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

'কমলাকান্তের দপ্তর'-কে নেহাতই 'অবিনশ্বর' উপন্যাসগুলির অনুষঙ্গী এবং 'রস-রচনা, রূপ সৃষ্টি নহে' বলে তুচ্ছ করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনা এর আগে ছিল না, হুতোমের নক্‌শায় বা অন্যত্রে যার আভাসমাত্র পাওয়া গিয়েছিল, দপ্তরে তার পূর্ণ ও প্রথম রসসম্মত প্রকাশ। তাছাড়া, রম্য-রচনা বা রস-রচনা যে রূপসৃষ্টি নয় এ-কথাই বা স্বীকার করি কি করে? রূপ ও রস তো সর্বদাই আধার-আধেয় সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ, এক ব্যতীত অন্যের অবস্থান অসম্ভব। উনিশ শতকের বাংলাদেশে যখন ব্যক্তির মুক্তি, চিন্তার মুক্তি, শিক্ষার মুক্তি নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে তখন মুক্তবন্ধ রূপের আধারে রস-পরিবেষণাও স্বাভাবিক। দপ্তরের অন্তর্গত রচনাগুলি লঘু চালে লঘু কথা নয়, 'গুণপনাযুক্ত ছিব্‌লেমি'-ও নয়, এতে বঙ্কিমচন্দ্র সহজ সুরে গভীর কথাই বলেছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি গভীর সুরেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সহজ ও গভীরের সম্মিলন রেখাটি এতই সূক্ষ্ম যে প্রথম পাঠে ধরাই পড়ে না। বঙ্কিমের শিল্প-কুশলতা দপ্তরেই উচ্চতম চূড়ায় আরূঢ় হয়েছে। উপরন্তু এখানেই তাঁর শ্রেণীচেতনার স্বাক্ষর অধিকতর পরিস্ফুট। 'বড়বাজারে' সাহিত্য, আইনব্যবসায়, বিকৃত বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধে কমলাকান্তের ব্যঙ্গোক্তিগুলি সুন্দর হয়েছে। প্রসঙ্গত নব-অভ্যুত্থিত বাবু-শ্রেণীর হাকিম-ডেপুটিদেরও তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু 'আমার দুর্গোৎসবে' কমলাকান্ত ছকোটি ভারতবাসীর (মুসলিমবর্জিত) জন্যে মাত্র কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিল। 'একটি গীতে' তিনি বাঙালীর মনুষ্যত্বহীনতার জন্যে আক্ষেপ করেছেন, 'মনুষ্যত্ব কৈ?' কিন্তু পরবর্তী অংশেই এই মনুষ্যত্বের, একজাতীয়ত্বের (যবনহীন একজাতীয়তা অর্থাৎ হিন্দুজাতীয়তা) স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। ১২০৩ সাল থেকেই তিনি দিন গুণছেন ; 'যেদিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে সেইদিন হইতে দিন গণি।'

এই তো গেল লেখকের জাতীয় গৌরবলুপ্তি সম্বন্ধে আক্ষেপ! জাতীয় সমৃদ্ধি কালেরও উল্লেখ আছে—'সুখের স্মৃতি' ভেসে উঠেছে তাঁর মনেঃ 'লক্ষ্মণ সেনের সে গৌড় কৈ? সে যে কেবল যবনলালিত ভগ্নাবশেষ! আর্য রাজধানীর চিহ্ন কৈ? আর্যের ইতিহাস কৈ? জীবনচরিত কৈ? কীর্তি কৈ? কীর্তিস্তম্ভ কৈ? সমরক্ষেত্র কৈ? সুখ গিয়াছে, সুখচিহ্ন গিয়াছে, বন্ধু গিয়াছে, বৃন্দাবন গিয়াছে—চাহিব কোনদিকে?' এখানেই প্রমাণ রয়েছে তাঁর যে দুঃখ তাও হিন্দু সামন্ততন্ত্রের পতনের জন্যে, তাঁর যে সুখ তাও হিন্দু সামন্ততন্ত্রের সমৃদ্ধির জন্যে (সেন-আমল সে হিন্দু সামন্ততন্ত্রের সমৃদ্ধির যুগ, সে-কথা বলাই বাহুল্য)। এ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রকে সামন্তবাদী চেতনার পুরোধা বললে অন্যায় হয় কি? সামন্ততান্ত্রিক বনিয়াদ ভেঙে চুরমার হয়ে যখন সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নবদ্বীপ-ভাটপাড়া-মিথিলা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে কলকাতা বা অন্যান্য শহরে তখনও তিনি 'চাহিব কোন দিকে' বলে চেয়েছেন সেই

নবদ্বীপের দিকে। 'পলিটিক্‌সে' লেখক বলেছেনঃ 'দুই রকমের পলিটিক্‌স দেখিলাম, এক কুক্কুর জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিষমার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন; আর উলসী হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর (মুচিরাম গুড় নয়) পর্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যন'। রামমোহনের রাজনীতির মধ্যে (বলা বাহুল্য, রাজা শব্দে এখানে রামমোহন-প্রমুখকেই লক্ষ্য করা হয়েছে) আবেদন-নিবেদনমূলক যে অংশটুকু ছিল তা যতই নিন্দার্হ (নিন্দার্হ কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে) হোক না, যুগ-প্রেক্ষিতের বিচারে তাঁর মতো কর্মে-চিন্তায়-অনুশীলনে প্রগতিশীল আর কেউ ছিলেন কি? সুতরাং রামমোহন-আন্দোলনকে কুক্কুর আন্দোলন আখ্যা দেওয়া উগ্র বিদ্বেষবুদ্ধিরই পরিচায়ক। বঙ্কিম-মানসে কোন্ চেতনা মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল, কোন্ চেতনা তাঁর আক্রমণের বিষয়বস্তু, তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে 'আমার মন' শীর্ষক রচনায়।

ইংরেজী শাসন, ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেটেরিয়েল প্রস্পেরিটির উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।' তারপর বঙ্কিম আক্ষেপ করেছেন, রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ-সংবাদ পত্র, স্পীচ-ডিবেট প্রভৃতি তাঁর পুরনো মনকে কেড়ে নিয়েছে। বলতে ইচ্ছে করে, হায় বঙ্কিমচন্দ্র! সত্যিই তোমার হারানো মন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেননা সে লক্ষ্মণ সেনের যুগ যে তুমি পেরিয়ে এসেছো—নতুন সভ্যতার বনিয়াদ এখন নতুন সংস্কৃতি গড়বে, তার মর্মকথা তুমি বুঝবে না। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-বেলওয়ে ইত্যাদির দ্বারা যে যানবাহন-আদানপ্রদান-সংযোগের সুবিধা হবে—এই অতি সাধারণ কথাটুকুও তিনি বুঝতে চাননি।

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার জন্যে বঙ্কিমের কি আপ্রাণ প্রয়াসঃ 'তোমাদের বাহ্যসম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্মিক ধার্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে?' সমগ্র উনিশ শতকী নব্য চেতনার বিরুদ্ধে এই অন্ধ আক্রমণ তাঁর উগ্র সামন্তবাদী মানস-স্বরূপকেই উদ্‌ঘাটিত করে।

আনন্দমঠ নিয়ে সব সমালোচকই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন; কিন্তু সকলকেই একথা মানতে হয়েছে যে ঔপন্যাসিক গুণে এ-গ্রন্থ ততটা সমাদরনীয় নয়, যতটা অন্য কারণে। সে 'অন্য কারণ'-টা অবশ্য যে কোনো গ্রন্থের পক্ষেই ভাগ্যের কথা। ভারতের স্বাধীনতাকামী ছোটবড় সব প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের সঙ্গেই আনন্দমঠের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, সকলেই প্রেরণার উৎস ছিল সন্তানরা। 'বন্দে মাতরম্' আজও 'জন গণ মন অধিনায়কের' চেয়ে সমধিক পরিচিত। কিন্তু এই পর্যন্ত বললেই 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে সবটুকু বলা হল না। যে কোনো ঘটনারই ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক উভয় দিকগুলিকে তুলে ধরাই হল প্রকৃত মার্কসবাদী সমালোচনা; কিন্তু শ্রদ্ধেয় সমালোচক প্রায় সর্বত্রই সুবিধা মতো হয় অভাবাত্মক দিকগুলির উল্লেখই করেননি, নতুবা তার গুরুত্বকে স্বেচ্ছায় হ্রস্ব করে দেখিয়েছেন।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বহু দুর্বলতার উৎসও মিলবে আনন্দমঠে —একথা আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট। মনে রাখা দরকার, আনন্দ-

মঠের সন্তানরা feudal institution-কেই আশ্রয় করেছিল; তাদের মুসলিম-দ্বেষ ধর্মীয় গোঁড়ামি মাত্র, ত্রিশকোটি ভারতবাসীর কথা 'বন্দে মাতরম্' গানে থাকলেও সে-মঠে বিরাট মুসলিম অধিবাসীর কোনো স্থান ছিল না (কেননা, মুসলিম যবনদের তিনি ভারতবাসী বলে কখনোই স্বীকার করতে পারেননি)। তাই দুর্গত স্বদেশ অর্থে দেবীর ছিন্নমস্তা রূপ, আর দেশের সমৃদ্ধি অর্থে মায়ের দশভুজা প্রতিমা। আনন্দমঠের এই ধর্মকেন্দ্রিক হিন্দু জাতীয়তাবোধ সমগ্র দেশে সংক্রামিত হয়েছিল বলেই ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলন মুসলিম প্রতিবেশীদের বাদ দিয়ে অগ্রসর হতে চেয়েছিল। ইংরেজ-শাসনে হিন্দু-মুসলিম অধিবাসীর ভাগ্য একসূত্রেই গাঁথা হয়েছিল—সে-সূত্র শোষণের; কিন্তু আনন্দমঠীয় জাতীয়তাবুদ্ধির জন্যেই যে মুসলিম জনসাধারণ নানা কারণে স্বভাবতই ইংরেজদের ওপর ক্রুদ্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন ছিল, তারা হিন্দুদের কাছ থেকেও সরে দাঁড়াল।

এসব সত্ত্বেও আনন্দমঠের কালজয়িতার কারণ হল, দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলা-দেশের মর্মান্তিক বর্ণনা প্রথম এ-উপন্যাসেই আঁকা হয়েছে। বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের সামনে সত্যিকারের বাস্তব চিত্রাঙ্কনের আদর্শ স্থাপনা করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র; এমনকি সমাজবাদী সমাজেও আনন্দমঠের মূল্য এ-কারণেই অটুট থাকবে। শ্রীযুক্ত রায়ের কাছে শুধুমাত্র ভাবোচ্ছাসপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনের চর্বিতচর্বণ আমরা আশা করিনি এইসব অনুল্লেখিত দিকের প্রতি আলোক-পাত করাও তাঁর উচিত ছিল।

'সীতারাম' সম্বন্ধে নীরেনবাবুর সিদ্ধান্ত আমিও স্বীকার করি। কিন্তু এখানেও সাম্প্রদায়িক প্রশ্নকে তিনি 'সযত্নে' এড়িয়ে গেছেন। আয়েষার 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'-এর মতো শ্রীর 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে'-ও তৎকালীন 'সীতারাম'-পাঠকের কাছে স্লোগান হিসেবে সমাদর লাভ করেছিল। এবং সাম্প্রদায়িক কারণেই প্রথম সংস্করণে চাঁদ শাহ ফকিরের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, পরে বঙ্কিম তা সংকুচিত করেছেন। অবশ্য তা সত্ত্বেও 'সীতা-রাম'-কে উৎকৃষ্ট শিল্পই বলতে হয়। জয়ন্তী-শ্রীর অসঙ্গতি ও অতিপ্রাকৃত সত্ত্বেও সীতারাম-চরিত্রের দিক থেকে বিচার করলে এ-উপন্যাসে স্বাভাবিকতা সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে।

'রাজসিংহ' পড়তে গিয়ে অধ্যাপক রায়ের টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'-কে মনে পড়েছে। ব্যক্তিগত মনে-পড়া সম্বন্ধে কারুর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরও মিল-বেন্থাম পড়তে গিয়ে গীতা মনে পড়েছিল। কিন্তু শ্রদ্ধেয় সমালোচক সামগ্রিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে টলস্টয়ের তুলনা করতে চেয়েছেন বলেই এর বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। তাঁর মতে, স্থানকাল-পাত্রের ইতরবিশেষটুকু বাদ দিলে রাশিয়ার জনসাধারণের কাছে টলস্টয়-সাহিত্যের যে ভূমিকা, বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষের কাছেও বঙ্কিমসাহিত্যের ভূমিকা অনুরূপ। এ তুলনা নিতান্তই অযৌক্তিক এবং অসত্য। টলস্টয় সম্বন্ধে স্বয়ং লেনিন বলেছেনঃ 'He expresses the ideas and sentiments which were engendered in the millions of Russian peasants..'. যদিও বিদ্রোহী সিপাহীদের অধিকাংশই ছিল ভূমিচ্যুত কৃষাণ, তথাপি তখনো

'millions of peasants'-এর কোনো অভ্যুত্থানই ঘটেনি, সেজন্যে বঙ্কিমের মধ্যে তেমন কোনো ঐন্দ্রজালিক দূরদর্শিতা আমরা আশাও করতে পারি না। কিন্তু 'বঙ্কিমের আমলে' শিক্ষিত জনসাধারণের বিপ্লবী সমাজ-চেতনা যতটুকু পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিল, ততটুকুরও কি ideas and sentiments -এর কোনো প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে? একদিকে পরিণত বয়সে টলস্টয় লিখছেন, 'I look up from the midst of a hundred million', অন্যদিকে পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার রহিত করছেন। টলস্টয় ক্রমশ তাঁর সামন্তবাদী সংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত হয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমশ নতুন উদ্দীপনা নিয়ে সামন্তবাদী রীতি-প্রথাগুলিকে আঁকড়ে ধরেছেন—কায়স্থ বন্ধুর সমকক্ষতা অস্বীকার করে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রণাম-আশীর্বাদের সম্পর্ক পাতাতে চেয়েছেন*।

টলস্টয় সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ 'Tolstoy spoke with the voice of the Russian peasant' (A. Kettle)। আমরাও বলতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র নব্য হিন্দুবাদী প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন।

রাজসিংহ উপন্যাসের অন্তর্নিহিত গতিশীলতা রবীন্দ্রনাথেরও চোখে পড়েছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না, তাই সেই গতিশীলতাকে অনাগত শ্রমিক অভ্যুত্থানের অগ্রগতির অগ্রিম অভিজ্ঞান বলে ব্যাখ্যা দেওয়াও দরকার বোধ করেননি। পূর্বেই বলেছি, বঙ্কিম হিন্দুসামন্ততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু তার গৌরবজনক অধ্যায়ের আদর্শানুরূপ ছবি তাঁর চোখে পড়েনি, লক্ষ্মণ সেনের নামে বারবার আক্ষেপ করলেও সে-যুগেরও পরিপূর্ণ প্রশস্তি গাইতে তাঁর মনে দ্বিধা জন্মেছে। তাই বহু অনুসন্ধানের পর ইতিহাস থেকে রাজসিংহের এই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। রাজসিংহের গতিশীলতা একান্তভাবেই মুসলিম সম্রাট ও সামন্ত হিন্দুরাজার আত্মক্ষয়ী যুদ্ধজনিত, এ-উপন্যাসের অসংখ্য সৈন্যের কোলাহল ও যুদ্ধযাত্রা 'যূথবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর গতিশীলতা' মোটেই নয়। সামন্তবাদের আওতায় সকল যুদ্ধকেই ধর্মযুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়—এ-কথার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাশ্চাত্য ইতিহাসে মিলবে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে ন্যায়যুদ্ধ ও সত্যিকারের মুক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে বঙ্কিম সে-'স্বপ্ন' কখনো দেখেননি, দেখা সম্ভবও ছিল না; (অতিশ্রদ্ধেয় সমালোচক এখানে লেখকের কাছ থেকে ঐন্দ্রজালিক দূরদর্শিতা আশা করেছেন) বরং এ-ঘোষণা বঙ্কিমের কাছে হয়তো দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাই জাগিয়ে তুলত।

একথা ঠিক যে বঙ্কিম রাজসিংহের উপসংহারে স্পষ্ট বলেছেন, 'অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক সে নিকৃষ্ট'। এ-কথাও ঠিক যে তিনি মুসলিম বা রাজপুত জাতির পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসে বিশ্বাস না করে সংস্কারমুক্ত মনেরই পরিচয় দিয়েছেন। ঔরঙজেব-জেবউন্নিসার চরিত্র চিত্রণে লেখকের উদার মানবিক সহানুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু লেখকের আসল কথা ভুললে চলবে না—'রাজসিংহে হিন্দুদিগের বাহুবলই

---

* দ্রষ্টব্য বঙ্কিম-কাহিনী (বঙ্কিম জীবনী) ৩১ পৃঃ।

মুখপত্র 'মহাপাপ বাল্যবিবাহে' নারীর ব্যক্তিত্বের মুক্তি-বিষয়ক প্রবন্ধাদি ছাপা হত। বিধবা বিমাতার বিবাহ দেওয়ার দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য।

মানুষ হিসেবে মানুষের মুক্তির আন্দোলন শুধু ভদ্রশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; 'শ্রমজীবী বিদ্যালয়', দ্বারকানাথের আসামে চা-বাগান সফর, সঞ্জীবনীর আন্দোলন এবং সংশোধিত কুলি আইন ইত্যাদিতে তার সম্যক পরিচয় রয়েছে।

নানা সামাজিক আন্দোলন এবং রামমোহন প্রবর্তিত যুক্তিবাদের ফলে সাম্প্রদায়িক ধর্ম তখন সমাজে এতই গৌণ হয়ে পড়েছিল যে বঙ্কিমের সাহিত্য-গুরু স্বল্পশিক্ষিত ঈশ্বর গুপ্তও ধর্মবিষয়ক আলোচনাকে প্রাধান্য দিতে চাননি। স্মরণ রাখা দরকার, ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'-য় ধর্মবিষয়ক আলোচনা নিয়ম করে নিষিদ্ধ করা হয়। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন এই সভার অন্যতম প্রধান সংগঠক এবং সভাপতি।

বঙ্কিমের রচনায় এসবের প্রতিফলন নেই। অধ্যাপক রায় কুন্দের পরিণাম সম্বন্ধে বলেছেন, 'যখন বহুবিবাহ নিন্দিত এবং বিবাহবিচ্ছেদ কল্পনাতীত তখন বিষবৃক্ষের অন্য কোন পরিণাম হইত বাস্তবতা-বর্জিত'। যখন 'বহুবিবাহ নিন্দিত' তখনই তো তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা বহুবিবাহে আস্থা দেখিয়েছে। বঙ্কিমেরই প্রেরণায় লেখনী ধরেছিলেন যে রমেশচন্দ্র, তাঁর 'সংসার' নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের যুগেই শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজের' জমি প্রস্তুত করে দিয়েছে। কালীতারার জীবনে দেখানো হয়েছে, 'কুলমর্যাদা দেখিয়া কালীর বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু উৎকৃষ্ট কুল হইলেই সর্বদা সুখ হয় না'। অনুরূপ অবকাশে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, অনূঢ়া কালের চপলা লবঙ্গলতা বৃদ্ধ স্বামীর সংসারে শুধুমাত্র কুলের জোরে অধিকতর চাপল্যময়ী হয়ে উঠতে পারে। নৈয়ায়িক পণ্ডিত গুরুদেব হৃদয়বান মানুষের মতো বলেছেন, 'যিনি করুণাময়, তিনি বালবিধবাকে চিরবৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুভব হয় না।' বন্ধু হরদেব ঘোষাল নীতিবিদ পণ্ডিতের মতো নগেন্দ্রকে উপদেশ দিয়েছে। উভয়ের মধ্যে কোন্ চরিত্রে যুগসত্য প্রতিফলিত হয়েছে?

সোবিয়েত সমালোচক ব্লাগোই বলেছেন, 'Works of art are a vivid reflection of national peculiarities and it is one of the cardinal tasks of the critics to discern these specific features in them.' কোনো শিল্পীর রচনায় এই national peculiarities-এর ন্যূনতা ঘটলে শিল্পী হিসেবে তাঁর সংকীর্ণতাই প্রমাণিত হবে। 'But what is national character if not a reflection of conditions of life, a coagulation of impressions derived from environment?' (Stalin) এবং ওপরের আলোচনায় দেখা গেছে যে বঙ্কিমের সাহিত্যে সমকালীন জীবন-চেতনার সম্যক প্রতিফলন পড়েনি।

শ্রীযুক্ত রায় ঠিকই বলেছেন, 'প্রাচীন (অর্থাৎ প্রাক্‌সমাজবাদী) সংস্কৃতির মহৎ প্রতিনিধিগণের চেতনায় বিপ্লবী ও বিপ্লববিরোধী প্রবণতার বিজড়িত অবস্থান ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গৃহীত।' কিন্তু এই উভয় বিপরীতমুখী

আমার প্রতিপাদ্য'। এঙ্গেলস্ কথিত 'Discrepancy between intention and performance' নীতি স্মরণে রেখেই এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্য নীরেন বাবুর হয়তো এসব 'ভাবিতে আনন্দ লাগে' না, কিন্তু সত্যের খাতিরে তাঁকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতেই হবে'।

॥ ৪ ॥

'ঔপন্যাসিক তাঁহার কল্পিত কাহিনীর ভিতর দিয়া দেখাইয়া দেন তৎকালীন সমাজের গতি কোন্ মুখে, তাহার কোন্ শক্তিগুলি ক্ষয়িষ্ণু ও কোন্‌গুলি বর্ধিষ্ণু'। অধ্যাপক রায়ের এই উক্তি মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচনার দিগ্‌-দর্শনী। কিন্তু বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টিতে কি ক্ষয়িষ্ণু শক্তিগুলিই জিইয়ে রাখার চেষ্টা হয়নি? তখন দেশের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী বাঙালী অন্তর্জলি, নরবলি, সতীদাহ, দাসপ্রথা, বেগার খাটা, বহু বিবাহ, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভাব কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছিল। Psychic force ও যোগবল সমার্থক কিনা এ-প্রশ্ন তখন হাস্যকর; Telegraph-এর তারের সঙ্গে নলচালনার সাদৃশ্য-কল্পনা তখন বাতুলতা মাত্র, মন্ত্রপূত ত্রিশূল আর magnetized লোহার মধ্যে কোনো সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টাও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান-পড়ুয়া শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সমাদরনীয় ছিল না।

অবশ্য, যেহেতু ঐতিহাসিক কারণে এদেশে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক এবং সঠিক প্রসার ঘটেনি, তাই এই নব্য বিজ্ঞানমুখী চেতনাও দেশের সমগ্র জনসাধারণের সমর্থনলাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরী রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কারও রচনায় ও চিন্তায় তখন অনুষ্ঠানসর্বস্ব ও অন্ধবিশ্বাসমূলক ধর্ম-পরলোক-অলৌকিক শক্তির বাহুল্য দেখা যায়নি। সুতরাং বঙ্কিমের পশ্চাদ্গামিতাকে তৎকালীন সমাজবাস্তবের প্রতিনিধিমূলক বলা চলে না। তাঁর বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-'সধবার একাদশী' ইত্যাদিতে সমাজ-বাস্তবের যে বলিষ্ঠ প্রতিফলন পড়েছে, মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে যার সবচেয়ে সংহত অথচ সুষ্ঠু প্রকাশ, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিতে তার চিত্রণ কোথায়? হুতোমের নক্‌শার স্বল্প পরিসরে সেকালের সমাজবাস্তবের যে গভীর সত্য ধরা পড়েছে—বঙ্কিম দীর্ঘদিনের সাহিত্যসাধনায়ও সে-সত্যের সন্ধান পাননি।

শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমের কৃতিত্বে খুব বেশি অভিভূত বলেই তাঁর সাহিত্যে যা নেই সমাজের মধ্যেই তার অভাব অনুমান করেছেন। এ-কথা ভুললে চলবে না যে, উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারের প্রধানতম অঙ্গ ছিল নারীমুক্তি আন্দোলন। তখনকার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অবলা বান্ধব আন্দোলন' সারা বাংলা দেশে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি সে-যুগের নব্যপন্থী শিক্ষিত বাঙালীর 'হিরো' ছিলেন। এই সময়েই নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপন করেন—যার মাসিক

চেতনার দ্বন্দ্বে যদি বিপ্লববিরোধী প্রবণতাই বিজয়ী হয় এবং লেখকের চিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে, তাহলেই বিপ্লবীচেতনার ঘটে মৃত্যু, যুগসত্য অবিকৃত থাকে না। বঙ্কিমসাহিত্যে এই বিপ্লববিরোধী চেতনাই প্রাধান্যলাভ করেছে।

ভাষাবিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধে স্তালিন স্পষ্টই বলেছেন যে সাংস্কৃতিক সৃষ্টি অর্থনৈতিক বনিয়াদেরই অবদান; কিন্তু তার মানে এই নয় যে সৃষ্টি কেবলমাত্র বনিয়াদেরই প্রতিফলন হবে—বনিয়াদ, বিভিন্ন শ্রেণী এবং সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ, উদাসীন থাকবে। বরং সৃষ্টির চরম সার্থকতা নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক বনিয়াদ-প্রতিষ্ঠায় তার সক্রিয় সহযোগিতার মধ্যে—প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির ও সমাজবনিয়াদের পূর্ণ উচ্ছেদের পক্ষে সক্রিয় সংগ্রামের মধ্যে। বঙ্কিমের কোনো কোনো গ্রন্থে 'নতুন বাস্তবতার' প্রতিফলন যদি বা পড়েছে—ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরুদ্ধতার এই দিকটি সম্পূর্ণ উহ্য রয়ে গেছে। বরং বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ মৃত সামন্তবাদী সমাজেরই রক্ষক হিসেবে তিনি নব্য সভ্যতার ওপর জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। নব্যহিন্দুবাদীদের সঙ্গে তাঁর যে পার্থক্য তা আনুপাতিক মাত্র, গুণগত নয়। সুতরাং রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেল মধুসূদন-দীনবন্ধু-হুতোম ইত্যাদির ধারাকে যদি বৈপ্লবিক আখ্যা দিতে দ্বিধা না থাকে, তবে বঙ্কিমচন্দ্রকেও সত্যের খাতিরে বিনা দ্বিধায় প্রতিবিপ্লবী বলা উচিত। অবশ্য রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেবের মতো তিনি কোনোদিনই অন্ধভাবে সামন্তবাদী কুসংস্কারের পক্ষে দল পাকাননি। কার্ল মার্কস প্রতিবিপ্লব সম্পর্কে বলেছেন, '. . . It represented . . a stratum of the old state that had not cropped out but been upheaved to the surface of the new state by an Earthquake.' তাঁর মতে প্রতিবিপ্লবীরা '. . *Revolutionary in relation to Conservative, Conservative in relation to revolutionists* . .'. প্রতিবিপ্লবীদের এই সব লক্ষণ বঙ্কিমের ওপর যথাযথভাবেই প্রয়োগ করা চলে।

(সমাপ্ত)

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কথাটা উঠেছিল অধ্যাপক-বন্ধু-মহলের একদিনকার আলোচনা থেকে। বিশেষভাবে, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ"-এর আলোচনার সূত্র ধরে। এক বন্ধু বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনভাষ্য রচনা করেছেন রম্যাঁ রলাঁ, ম্যাকস্ মূলার, ধনগোপাল মুখার্জি, শ্রীম। কিন্তু অচিন্ত্য-বাবুর সাফল্য অসাধারণ। "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে বাঙালী পাঠকমহলে। "শ্রীরামকৃষ্ণ" বই-এর দোকান থেকে, মনোহারী দোকান থেকে, এমনকি মশলাপাতির দোকান থেকে বিক্রি হচ্ছে। অল্পদিনেই সাতাশ হাজার বই বিক্রি হয়েছে। "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" তো শুধু সাহিত্য নয়—সাধনা।"

সংবাদটা ভেবে দেখবার মতো। সাহিত্যের বাজার আজ মন্দা। ক্রেতার অভাবে সাহিত্যিকের সৃষ্টি অবিক্রীত থাকছে দোকানে। অন্যান্য সাহিত্যিকদের কথা বাদ দেওয়াই গেল; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা কোনো বই এক বছরে সাতাশ হাজার বিক্রি হয়েছে, এ-সংবাদ কারুর জানা নেই। অথচ "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' অল্পসময়ে সাতাশ হাজার বিক্রি হল এর কারণটা কি?

অচিন্ত্যবাবু খ্যাতিমান সাহিত্যিক। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' শুধু কাহিনীর মালা নয়—'অচিন্ত্যবাবুর সাহিত্যপ্রতিভারই উজ্জ্বলতম কীর্তি', এবং সে-হিসাবেই পাঠকদের কাছ থেকে পেয়েছেন তিনি আশ্চর্য অভিনন্দন, এটুকু বললেই অচিন্ত্যবাবুর সাফল্যের রহস্য সবটুকু বলা হয় না। 'ধর্মে নয়, সাহিত্যাস্বাদে যাঁদের অভিরুচি তাঁদের কাছেও অমূল্য মনে হবে এ রচনা', এ-মন্তব্যটা মেনে নিলেও প্রশ্ন থাকে, রবীন্দ্রনাথ যে-সাফল্য লাভ করেননি কোনোদিন, রম্যাঁ রলাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনভাষ্য' যে-উত্তেজনার সামান্যতম অংশও সৃষ্টি করল না, অচিন্ত্যবাবু কেমন করে সেই আশ্চর্য উত্তেজনা সৃষ্টি করলেন?

অচিন্ত্যবাবু নিজেই এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অচিন্ত্যবাবু লিখেছেন, "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে মর্তধামে লীলা করতে এসে-ছিলেন। ভগবানের সেই নরলীলা বর্ণনা করতে পারি আমার সে ক্ষমতা নেই। আমার তত্ত্ব নেই, শাস্ত্র নেই, তন্ত্রমন্ত্র কিছু নেই, আছে কিঞ্চিৎ সাহিত্য। এই সাহিত্যের উপচারেই অর্চনা করতে চেয়েছি ভগবানকে।"

অথচ রম্যাঁ রলাঁ লিখেছিলেন, "আমি সকলের ধর্মবিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা করি এবং প্রায়ই ভালওবাসি। তবে আমি কখনও এ-সব বিশ্বাসের সবকিছু মেনে নিই না। রামকৃষ্ণ আমার অন্তরের অন্তরঙ্গ; কারণ আমি তাঁকে দেখেছি নররূপে,—তাঁর শিষ্যদের কাছে তিনি যেমন নররূপী ভগবান—সেভাবে নয়।"

অর্থাৎ অচিন্ত্যবাবু জীবনভাষ্য লিখেছেন 'ভগবান' শ্রীরামকৃষ্ণের; রম্যাঁ রলাঁ 'মানুষ' রামকৃষ্ণের। অচিন্ত্যবাবুর উপকরণ হল ভক্তি; রম্যাঁ রলাঁর যুক্তি-মিশ্রিত ভক্তি। অচিন্ত্যবাবুর শ্রীরামকৃষ্ণ নররূপী ভগবান; রম্যাঁ রলাঁর রাম-

কৃষ্ণ মর্ত্যলোকেরই জীব। এবং ভগবানের লীলাখেলা নিয়ে ভক্তিরসাপ্লুত, অলৌকিক কাহিনীর মালা গেঁথেছেন বলেই অচিন্ত্যবাবুর আশ্চর্য সাফল্য!

অচিন্ত্যবাবু বিষয়বস্তু নির্বাচনেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। কারণ উনিশ শতক থেকে 'যুগাবতার' হিসাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সাহিত্যের মঞ্চে এনেছেন। উনিশ শতক অবশ্য রামমোহন, বিদ্যাসাগরের যুগ।

জ্ঞানবিজ্ঞানে ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উনিশ শতকে নতুন ও পুরাতন সংঘাত দানা বাঁধছে। অচলায়তন সমাজের ধ্যানধারণা, প্রথা, শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন প্রগতিশীল চিন্তাধারার হচ্ছে সূত্রপাত। নতুন ভারত গঠনের মতাদর্শগত যে-দিক আজও পরিচ্ছন্ন নয়, সে-দিকটি উনিশ শতকেই প্রথম রূপ পেল তৎকালীন বাঙালী প্রতিভাবান পুরুষদের চিত্তে। নতুন ভারতের রূপ-রেখার যে-চিত্র তৎকালীন বাঙালী জননায়কদের চিত্তে ফুটে উঠল, সে-চিত্র যে সমগ্রভাবে সুসংহত তা নয়। বিভ্রান্তির অবকাশও যে ছিল না তখনকার জীবনবেদে, এমনও নয়। তবুও বাংলার নবজাগণের সূত্রপাত উনিশ শতকে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনকার প্রগতির নায়কেরা চিত্তমুক্তির সাধনা করে-ছেন, দাবি করেছেন ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশ। পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের পথেই যে ভারতের চিত্তমুক্তি, এ-সত্য ঘোষণা করেছেন সজোরে। নারীপুরুষের সমানাধিকার, শিক্ষাবিস্তার, বিবিধ সংস্কার আন্দোলন,—এ-সবই উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের সাক্ষ্য।

আর, শ্রীরামকৃষ্ণ এই উনিশ শতকেরই ধর্মসাধক। হুগলি জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। আর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব। অর্থনীতির দিক থেকে ভারতবর্ষের তখন সর্বনাশের যুগ। ১৮১৪ থেকে ১৮৫০—এ কবছরের মধ্যে ভারতের তাঁতশিল্প, কুটিরশিল্প, ঢাকার মসলিন—সবকিছুই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে, লক্ষ লক্ষ শিল্পী জীবিকাহীন হয়ে পথে দাঁড়িয়েছে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কৃষি উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংরেজদের ভারতবর্ষে জমির মালিকানার অনুমতি মিলেছে। নীলচাষের হয়েছে সূত্রপাত। ১৮২৫ থেকে ১৮৭৫—এ পঞ্চাশ বছরে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে চুয়ান্ন লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। সব মিলিয়ে অর্থনীতির দিক থেকে তখন ভারতবর্ষ ভাঙনের মুখে। এমনি এক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়বাদের দৌলতে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের অগ্রগতি কতখানি প্রসারিত হয়েছে, আজকের দিনে উনিশ শতকের ঐতিহ্য বিচারে, এ-প্রশ্নটি আলোচ্য। উনিশ শতকের যুগাবতার হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান কতখানি, ভারতীয় মানবতার সর্ববিধ উন্নতির দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার তাৎপর্য কী, এ-সব প্রশ্নও ঐতিহাসিক বুদ্ধিসহযোগে বিচার্য। এ-ধরনের বিচার অবশ্যই স্থির বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে, এবং যান্ত্রিকতা ও রোমাণ্টিক ভাবালুতা বর্জন করে চলে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ও সর্বধর্মসমন্বয়বাদের মূল্যায়নও বৈজ্ঞানিক বিচারের অপেক্ষা রাখে। কারণ ভারতের অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিতেরা ভাববাদী প্রভা-মণ্ডল কাটিয়ে উঠে বৈজ্ঞানিক, যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধারায় এখনও অভ্যস্ত হননি।

তাই তাঁদের অনেকেরই মতে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু সর্বধর্মসমন্বয়ের পথপ্রদর্শকই নন—জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক,—যুগাবতার। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও যে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান তুলনাহীন, মানবদেহে তিনি যে স্বয়ং ভগবান —শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথেই যে ভারতের তথা বিশ্বমানবতার মুক্তি, এ-ধরনের অনৈতিহাসিক মন্তব্য তাই অনেক শ্রদ্ধেয় মনীষীই করেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশে ধর্মসাধকদের নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অরবিন্দের দিব্যজীবনবাদ, মহর্ষি রমনের সাধনা, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে, তাই, আজকাল বিভিন্ন মহলে গভীর আলোচনা এবং ধর্ম সম্পর্কে নতুন করে মোহসৃষ্টির প্রচেষ্টা চলেছে। পণ্ডিতেরা তাই উনিশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণকে আবিষ্কার করেছেন 'যুগাবতার' হিসাবে (রামমোহন, বিদ্যাসাগর তো কাব্যের উপেক্ষিত) আর 'কল্লোল' যুগের অচিন্ত্যকুমার সাহিত্যের উপচারে অর্চনা করেছেন 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ'কে।

একদিন অচিন্ত্যকুমারের লেখনী স্নিগ্ধতার স্বাদ জেনেছিল প্রেমে, গভীরতার স্পর্শ পেয়েছিল জীবনবৈচিত্র্যে। আজ অচিন্ত্যকুমার ভক্ত, জীবনের সব বিচিত্রতাকে অতিক্রম করে ভক্তির স্নিগ্ধতায় আত্ম-নিবেদিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-ভাষ্য অচিন্ত্যকুমারের এই ভক্তির ফসল, নব-উপলব্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার শেষ গল্প।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনভাষ্য নিয়ে যে-সাড়া পড়ে গেছে তার রহস্য এইখানে। সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার ভক্তির উপচারে অলৌকিক কাহিনীর মালা গাঁথলেন, জীবন-বৈচিত্র্যের নিবিড় রস বর্জন করে পৌঁছলেন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির রহস্যবাদে। মানুষের জীবন-আলেখ্য না লিখে, লিখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ। আর বাঙালী পাঠক, (সমস্যাসংকুল অভিশপ্ত জীবনের গ্লানি বয়ে যে চলেছে) অলৌকিক জীবনের আস্বাদ পেয়ে ধন্য হল, খণ্ড-জীবনের শীর্ণতা থেকে মুক্তি পেল কল্পনার দিব্যলোকে।

কেননা, স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরেও আমাদের জীবন আজ স্তিমিত, নিরানন্দে, তামসিকতায় ঘেরা। কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজজীবনে, এ পাঁচ বছরে ভাঙনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। সমন্বিত, শোভন সমাজের যে-স্বপ্ন দেখেছেন অগণিত দেশপ্রেমিক, সে-স্বপ্ন বিলীন হল দিগন্তে। আমাদের সমাজের দ্বৈতসত্তার রিক্ততা স্পষ্টতর হল জনচিত্তে। সমাজের একাংশে বিত্তবানেরা, অন্যদিকে অগণিত বিত্তহীন। একাংশ মানবীয়, কিন্তু বৃহত্তম অংশ 'অমানবীয়', ভারবাহী পশুরই সগোত্র। শিক্ষাসংস্কৃতির ভেজে, সাহিত্য-সংগীতের আনন্দোচ্ছল জীবনধারা থেকে সাধারণ ভারতবাসী আজও তাই নির্বাসিত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—সব রকমের দুঃখই আজো ভারতীয় জনতার চিরসহচর।

অথচ সমাজের দ্বৈতসত্তা যে সনাতন নয়, সৃষ্টিশীল সামাজিক কর্মযোগে অভিনব মানবীয় সমাজনির্মাণ যে সম্ভব, ইতিহাসই তার সাক্ষী। ভারতবর্ষেও এই নতুন ইতিহাস নির্মাণের শক্তি সংহত হচ্ছে,—ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এগিয়ে আসছে বঞ্চিত মানুষ। ভারতবর্ষেও রক্ষণশীল শক্তি ও প্রগতিশক্তির সংঘাত মূর্ত হচ্ছে ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে। একদিকে অচলায়তন কৃষি-নির্ভর সমাজের

অদৃষ্টবাদ, ভাগ্যবাদ, ধর্মমোহ, অন্যদিকে আগামী দিনের সংগীতমুখর ভারতের দূরাগত পদধ্বনি। এ সংঘাতে সাহিত্যিক, শিল্পী, পণ্ডিত—সবাই কোনো-না-কোনোভাবে অংশ নিচ্ছেন। ব্যাপক তমসার অবসান ঘটিয়ে আলোর ঝরনা-ধারায় ভারতকে প্লাবিত করবার চেষ্টা করছেন অনেকে। আবার অন্য অনেকে, তামসিকতাকে দীর্ঘস্থায়ী করবার চেষ্টা করছেন নানাভাবে। অধুনা ধর্মরহস্য নিয়ে, দিব্যজীবন নিয়ে, ধর্ম-সাধকদের লীলাপ্রসঙ্গ নিয়ে যে অহেতুক বাড়া-বাড়ি দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের মানুষের চিত্তজয়ের সংগ্রামেরই সেগুলি বিশিষ্ট দিক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী সকলেরই সুপরিচিত। প্রথম যৌবনে দক্ষিণেশ্বরের ভাগীরথী-তীরে আট বছর দুশ্চর তপস্যা করে তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন। অভ্যাস করেন অনাসক্তি যোগ। ঈশ্বরপ্রীতি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এক-মাত্র উপলব্ধি। স্ত্রী সারদাদেবীকে জীবনে কখনও তিনি শারীরিকভাবে গ্রহণ করেননি। মাতৃশক্তির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে স্ত্রীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধেই শুধু আবদ্ধ ছিলেন। ভগবানের নাম করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। এর নামই ভাব-সমাধি। এ-রকম ভাবাবেশ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বহুবার ঘটেছে।

ভক্তিভাবের পাঁচটি স্তর ভক্তিশাস্ত্রে স্বীকৃত—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচটি স্তরেরই সাধনা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দাস্য হল শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভাব; সখ্য হল বাসুদেবের প্রতি অর্জুনের; বাৎসল্য হল গোপালের প্রতি যশোদার ভাব; মধুর হল কৃষ্ণের প্রতি রাধা ও গোপিনীদের ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ নানা ধরনের সাধনায়ই সিদ্ধিলাভ করেন। তাছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম সাধন করেও সিদ্ধিলাভ করলেন। বললেন তিনি, "এক রাম—তাঁর হাজার নাম। খ্রীষ্টানেরা যাঁকে বলেন God, হিন্দুরা তাঁকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। একঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে 'জল' ঈশ্বর। খ্রীষ্টানেরা আর একঘাটে খাচ্ছে—বলছে Water; God, যীশু। মুসলমানেরা আর একঘাটে খাচ্ছে—বলছে 'পানি'; আল্লা।" এভাবে সর্বধর্মসমন্বয়বাদের জীবন্ত প্রতীক হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হলেন। ব্যবহারিক বেদান্তের উদ্গাতা হিসাবে বীর সন্ন্যাসী বলে খ্যাতি অর্জন করলেন সারা পৃথিবীতে।

সাধুরা রামকৃষ্ণকে পরমহংস বলতেন। তোতাপুরীর কাছে নিরাকার সাধনা করে বেদান্তে দীক্ষা হল রামকৃষ্ণের। তোতাপুরী তাঁকে নতুন নাম দিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। দুধে-জলে একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেও যিনি জল বাদ দিয়ে দুধটুকু গ্রহণ করতে পারেন, তিনিই পরমহংস। বৈদান্তিক সাধকদের চরম অবস্থা এটি;—জগৎকে মিথ্যা মনে করে সচ্চিদানন্দ তত্ত্বকে সার মনে করা। এ-সাধনায় উত্তীর্ণ হলেন রামকৃষ্ণ—পরমহংস বলে পরিচিত হলেন জগতে।

প্রথম থেকেই রামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চনকে ঈশ্বর-পথের প্রবল অন্তরায় বলে

মনে করতেন এবং কঠোর সাধনায় উভয়কে জয় করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট ৫১ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন-আলেখ্য নানাদিক থেকেই বিচিত্র ও হৃদয়গ্রাহী। বিশেষ করে ধর্মভাবাপন্ন মানুষদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন দেবত্বেরই মূর্ত প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু পণ্ডিতের কথা নয়, জীবন-পুঁথিরই পাতা। রামকৃষ্ণদেবের বাণীতে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির কথা প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধীজী বলেছেন, "আজকের সংশয়ের যুগে রামকৃষ্ণ হলেন উজ্জ্বল, প্রেমময় বিশ্বাসের প্রতীক।"

রামকৃষ্ণদেবের ঐতিহাসিক অবদান সম্পর্কে যত মতভেদের অবসরই থাকুক না কেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-আলেখ্য মধুর। সহজ জ্ঞান, পরিহাসরসিকতা, শিশুর মতো সারল্য, সকল মতে সমান শ্রদ্ধা এবং অসাধারণ চারিত্রমর্যাদা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকে আকর্ষণীয় করেছে। লৌকিক-ভাবে অশিক্ষিত হয়েও শাস্ত্রাদির অতি জটিল বিষয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতাও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাছাড়া, উনিশ শতকের প্রখ্যাত বাঙালী পুরুষদের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবও তাঁর বুদ্ধি ও মনীষার প্রমাণ।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে আজ ভগবানের আসনে বসিয়ে উনিশ শতকের 'যুগাবতার' বানাবার চেষ্টা হচ্ছে। কোনো কোনো পণ্ডিত বলছেন, "সমগ্র পৃথিবীতে যখন ইউরোপীয় জড়বিজ্ঞান আশঙ্কাজনকভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে যাইতেছে, তখন দুনিয়ার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভারতের অধ্যাত্মবাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ খুঁজিতেছেন। বিভিন্ন মত ও পথের মাঝে ভগবানকে পাইবার যে-আহ্বান তিনি দিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর চিন্তাশীল নায়কেরা পুনর্বার ভারতের এই সনাতন বাণীর মর্ম উপলব্ধি করিতেছেন।"

প্রশ্ন হবে 'ভারতের অধ্যাত্মবাদ' কি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি? না, সমাজ-বিকাশের এক বিশেষ স্তরে অধ্যাত্মবাদই সব সমাজের মূল দৃষ্টিভঙ্গি? ইউরোপীয় জড়বিজ্ঞান কি মানুষের মুক্তির পথ সুগম করেনি? এবং ভারত-বর্ষ কি ইউরোপীয় জড়বিজ্ঞান পরিহার করে প্রাক্-বৈজ্ঞানিক আমলে ফিরে যাবে? 'ভগবানকে পাবার আহ্বান' কী অর্থে ভারতীয়? ইউরোপে ভগবানকে পাবার আহ্বান ভাববাদী দার্শনিকেরা, ধর্মাত্মারা, কি দেননি? তাহলে ইউ-রোপে মধ্যযুগের ইতিহাস কি শুধুই মায়া? স্পিনোজার ইতিহাস কি শুধুই কল্পলোকের কাহিনী? তাই, "ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মধ্যে পথ খুঁজিতেছেন" কথার অর্থ কী? শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অভিনবত্বই বা কোথায়?

আমরা আগেই বলেছি যে, ভারতবর্ষে বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে প্রগতিশক্তির যে-সংঘাত চলেছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, জীবনের নব-মূল্যায়নের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। প্রগতিশক্তির দাবি হল জগৎ ও জীবনের নবরূপায়ণ, সমষ্টিকর্মের মাধ্যমে। প্রতিক্রিয়াশক্তির কথা হল 'ব্যক্তিগত বিকাশ' আধ্যাত্মিকতার পথে। রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে রইল, তার কারণ হল ভাগ্য-বাদ ও অতিপ্রকৃতিতে তার অন্ধবিশ্বাস, আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে তার

উদাসীনতা। প্রগতিশক্তির তাই দাবি হল এই যে পার্থিব জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আয়ত্ত করতে হবে, জনজীবনে সৃষ্টি করতে হবে কর্মচাঞ্চল্য। প্রতিক্রিয়াশক্তির কথা হল, অপার্থিব, অধ্যাত্মজগৎই সারসত্য—অধ্যাত্মবিকাশই আসল কথা মানবজীবনের।

আজ ভারতীয় জনতার চিত্তপটে নতুনের আহ্বান পৌঁছেছে, নিষ্কৃতির সন্তোষ কাটিয়ে উঠে ভারতের মানুষ রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করছে, ভারতে বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়ে উঠছে আসন্ন। এমন সময় ধর্ম-বিশ্বাসের পক্ষে, দৃষ্টির বিকারকে স্থায়ী করবার জন্য লেখনী ধরছেন কোনো কোনো পণ্ডিত, একসময়কার প্রগতিশীল সাহিত্যিক।

অচিন্ত্যবাবু ভগবান রামকৃষ্ণের অর্চনা করেছেন সাহিত্যের উপচারে। কিন্তু অচিন্ত্যবাবুর সৃষ্টি শুধু ভক্তহৃদয়ের গোপন অর্ঘ্য নয়। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বাস্তব, লৌকিক পুঁথির আকারে পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। আশা, পাঠকেরা ভক্তিরসাস্বাদের সঙ্গে সাহিত্যাস্বাদও করবেন।

ভক্ত যাঁরা—তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক লীলাপ্রসঙ্গ ভক্তিভরেই গ্রহণ করবেন। তাঁদের কাছে "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" অন্যদিকে বিচারপ্রবণ পাঠকের দাবি হবে, রামকৃষ্ণের সাধনার স্থিরযুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়ন। এ-মূল্যায়নে দেখা যাবে যে, বাঙালী জাতির ইতিহাস, আবেষ্টন ও আজকের প্রয়োজন অনুযায়ী যে সমন্বয়ী দর্শন প্রয়োজন, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়-বাদ সেই যুগান্তকারী জীবনবেদ নয়।

প্রথমত, স্বাধীন ভারতের রূপায়ণে আজ বৈষয়িক ও রাজনৈতিক জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। অধ্যাত্মজীবনের দিকে একান্ত দৃষ্টি দিয়ে সম্মিলিত সাধনার কথা ভুলে, ব্যক্তিগত সাধনাকেই যদি আজও অহেতুক গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে, স্বাধীন প্রগতিশীল ভারতের রূপায়ণ হবে ব্যাহত,—দৃষ্টির বিকারে। শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মজীবনের দিকেই একান্ত দৃষ্টি দিয়েছেন, বিজ্ঞানকে করেছেন উপেক্ষা, জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্য বিধান করে সমন্বয়ী জীবনদর্শন দিতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়বাদ নতুন মতবাদ নয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে-সমন্বয়ধর্ম প্রচার করেন ভারতের এক বিশেষ যুগে, যে-প্রেমধর্মের বন্যায় ভারতের চিত্তভূমিতে পলিমাটি জমেছে, ভারতের চিত্তভূমি হয়েছে উর্বরা, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়বাদ সেই প্রেমধর্মেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ, নতুন পরি-বেশে। বরং চৈতন্যের আমলে ধর্মবিপ্লবের যে-তাৎপর্য ছিল তৎকালীন সমাজে, উনিশ শতকে সে-তাৎপর্য ছিল না। উনিশ শতক থেকে বৈষয়িক ও রাজনৈতিক জ্ঞানকর্মযোগই মুখ্য হয়ে উঠেছে ভারতের রঙ্গমঞ্চে, ধর্মশাস্ত্রের কথা গেছে নেপথ্যে। কাজেই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল মধ্যযুগের ভারতে, আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়-বাদরে সে-ভূমিকা ছিল না।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন মত ও পথের মধ্যে "ভগবানকে পাবার আহ্বান" দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত ধর্মমতের সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতা খণ্ডন করে গেছেন। লৌকিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণের উদার অসাম্প্র-

দায়িকতা তাই বিস্ময়কর। কিন্তু যে ঈশ্বরপ্রীতিকে, অতীন্দ্রিয়ানুভূতিকে তিনি অবলম্বন করলেন জীবনে, তার সামাজিক সার্থকতা কতটুকু?

প্রথম কথা হল এই যে, "ভগবানকে পাওয়া" স্বাভাবিক সুস্থ মানবজীবনের সমস্যা নয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা ভক্তদের জীবনে ভগবানকে পাওয়ার সমস্যা স্বীকার করে নিলেও, সাধারণ মানুষের জীবনে ঈশ্বরানুভূতি অপরিহার্য নয়। সমষ্টি-মানুষের জীবনে যে-সমস্যা মুখ্যস্থান অধিকার করে না, সে-সমস্যার আলোচনা অবান্তর না হলেও নিষ্প্রয়োজনীয়।

তাছাড়া, যে ঈশ্বরকে পাবার কথা, প্রমাণাভাবে তিনি অসিদ্ধ। ঈশ্বর যে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নন, ঈশ্বরকে যে দেখা যায় না, শোনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, অর্থাৎ এক কথায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে যে পাওয়া যায় না—আমাদের দেশের সাংখ্যদর্শন এ-তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছিল বহুদিন আগে। আর প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হলে অনুমানও হতে পারে না। ধোঁয়া তার আগুনের মধ্যে নিয়তসম্পর্ক বার বার দেখে তবেই ধোঁয়া থেকে আগুনের অনুমান। কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় না হওয়ায়, ঈশ্বরানুমান হবে কেমন করে? শাস্ত্র ঈশ্বর প্রমাণ করে একথা বলারও তাৎপর্য কিছু নেই। কারণ শাস্ত্রপ্রমাণ মানা যুক্তিকে পরিহার করবারই নামান্তর তার যুক্তিকে পরিহার করলে দৃষ্টি-বিকারেরই সম্ভাবনা,—অন্য কিছু নয়।

অনেকে বলেন, ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয়সত্তা (শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য সাধকেরা যার সাক্ষাৎ করেছেন) অতীন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়। কিন্তু অতীন্দ্রিয়ানুভূতিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে অতীন্দ্রিয়সত্তা বা ঈশ্বর স্বীকার করা চলে না। এরকম যুক্তির ফলে চক্রকযুক্তিদোষের (Fallacy of petitio principii or begging the question) সম্ভাবনা দেখা দেয়। সব মিলিয়ে তাই বলা চলে যে প্রমাণাভাবে 'অতীন্দ্রিয়সত্ত' অসিদ্ধ।

যাঁরা ঈশ্বরদর্শনকে জীবনের পরমপুরুষার্থ মনে করেন, ঈশ্বরোপলব্ধিকে মনে করেন সাধকজীবনের পরাকাষ্ঠা, তাঁদের হয় মৌন থাকা উচিত, নয়তো তাঁদের মানা উচিত যে ঈশ্বরদর্শন বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি কিছুই প্রমাণ করতে পারে না। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের সাধকেরা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির, ঈশ্বরদর্শনের কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু একজনের উপলব্ধির সঙ্গে অন্য-জনের মিল নেই। আসলে "অতীন্দ্রিয় অনুভূতি" নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার : সুতরাং জীবনের নবরূপায়ণে একে কোনো বড়ো স্থান দেওয়া চলে না। অতীন্দ্রিয়সত্তা ধর্মশাস্ত্রেরই অধীন এবং অতীন্দ্রিয়ানুভূতি সাধকের ব্যক্তিগত উপলব্ধিরই কাহিনী। যুক্তির কষ্টিপাথরে, বিজ্ঞানের চাবিকাঠিতে এ-উপ-লব্ধির বিচার চলে না। তাই সামাজিক দিক থেকে এ-উপলব্ধি অগ্রাহ্য, অসিদ্ধ।

তাই সাধকদের অলৌকিক কাহিনী, লীলাপ্রসঙ্গ, ভক্তদের হৃদয়ে পরাশান্তি সৃষ্টি করলেও, সামাজিক অগ্রগতির দাবির সঙ্গে এদের কোনো যোগ নেই।

চতুর্থত, সাধকেরা যাকে ভাব-সমাধি বলেন, (শ্রীরামকৃষ্ণের অনেকবারই ভাবসমাধি হয়েছে) তার স্বরূপও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করা শক্ত। মনো-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যে সম্পূর্ণ

হবে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের প্রশ্ন না তুলে, সাধন-তত্ত্বের দিক থেকেও বলা চলে যে, ভাব-সমাধি অনির্দেশ্য ও অলৌকিক এবং সমাধির মাধ্যমে সত্যের সাক্ষাৎপ্রতীতি সম্ভব নয়।

অমলনরের সাধু শান্তিনাথ এ-প্রশ্ন তুলেছেন। সাধু শান্তিনাথ ভক্তি-সাধনা করেছেন, যোগ-সাধনা অভ্যাস করেছেন দীর্ঘদিন। সমাধিস্তরে পৌঁছেছেন বহুবার। শেষপর্যন্ত তিনি হয়ে উঠেছেন সংশয়বাদী, বলছেন, সত্য পাবার দিক থেকে বিশ্বাস (faith) অতি তুচ্ছ।

সাধু শান্তিনাথ বলছেন, সত্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে আরম্ভ করলে সত্যোপলব্ধিও নানা ধরনের হয়। সমাধিস্তরে যাঁরা পৌঁছচ্ছেন, সত্যের স্বরূপ নিয়ে তাঁদের মধ্যেও তাই মতানৈক্য। কথাটা অনেকখানিই সত্য। ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট সাধকদের সত্যোপলব্ধি আর বৌদ্ধ সাধকদের সত্যো-পলব্ধি তাই এক নয়। তাও সম্প্রদায়ের চীনা মরমী সাধকদের কথা হল "সব সরকারই অসৎ", অথচ খ্রীষ্টান ও ইসলামধর্মের সাধকেরা বলে "সর-কারের প্রতি আনুগত্য অবশ্যকর্তব্য।" শুধু বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্যই নয়, এক সম্প্রদায়ের সাধকেরা মনে করেন যে, অন্য সম্প্রদায়ের সাধকদের বক্তব্য অবিশ্বাস্য। অতীন্দ্রিয়ানুভূতি যদি তত্ত্বজ্ঞানের নিশ্চয় পথ হত, তাহলে, অতীন্দ্রিয়ানুভূতি-লব্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যে এত পার্থক্য কেন?

আসল কথাটা হল এই যে ভাব-সমাধির পথে সত্যের "সাক্ষাৎ প্রতীতি" সম্ভব নয়।

তাই যদি হত, তবে 'তত্ত্ব কেমন' এ-প্রশ্ন নিয়ে সাধকদের মধ্যে, দার্শনিক-মহলে মতবিরোধ থাকত না। তত্ত্ব-নির্ণয়-ব্যাপারে যুক্তিকে বড়ো স্থান দেওয়া ছাড়া তাই উপায় নেই। যুক্তির রাজপথ ধরে অগ্রসর হয়েই মানুষ অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, অসত্য থেকে সত্যে উপনীত হচ্ছে। অথচ, ধর্মের পথ মূলত বিশ্বাসের পথ—একনিষ্ঠ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পথ। তাছাড়া, ধ্যানের পথে সমাধির স্তরে উঠলে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানক্রিয়ার ভেদ থাকে না, জ্ঞেয়বস্তু কেমন, এ-প্রশ্নও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাই প্রকৃত সাধকের মৌন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথচ সাধকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলেন, ভক্তেরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে বিচারের যুক্তির কষ্টি-পাথরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার কাহিনী ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মসাধনারই সমন্বিত রূপ। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়, নিরাকার ও সাকার উপাসনার সমন্বয়, বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্রের সমন্বয়—এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। এ-বাণী ভারতের ভক্তিশাস্ত্রে বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে এবং আজ 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথ' বলে সর্বধর্মসমন্বয়বাদের কথা প্রায়ই প্রচারিত হয়, শ্রীচৈতন্যের নাম উচ্চারিত হয় না। শুধু তাই নয়, সহজ মানুষ শ্রীরাম-

কৃষ্ণ অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত মানুষের দুঃখদুর্দশা দেখে লোকহিতের যে-দীক্ষা দিলেন বিবেকানন্দকে, এ-সত্যও শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের স্তুতিবাদে আজ আবৃত। আসলে রামকৃষ্ণ দুজন। একজন ব্যথিত, বেদনার্ত মানবতার প্রেমিক—বিবেকানন্দের গুরু—শ্রীরামকৃষ্ণ; অন্যজন প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল শক্তির শ্রীরামকৃষ্ণ। একজন মর্তলোকের জীব—পরিহাসরসিক, সহজমানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্যজন 'নররূপী ভগবান'—অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সাধক —পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।

আজকের শাসকশ্রেণী শ্রীরামকৃষ্ণকে করে তুলেছে ভগবান, জনতার চিত্ত-বন্ধনের পালা স্থায়ী করতে, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পীড়নকে সমর্থন করতে। আজকের ভাবরাজ্যের সংঘাতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি উনিশ শতকের রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ঐতিহ্য প্রচ্ছন্ন রাখতে ব্যস্ত। আজ তাই ধর্মসাধকেরা 'যুগাবতার' বলে প্রচারিত, আর নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নায়ক যাঁরা—তাঁরা অবজ্ঞাত। আর আজকের পরিস্থিতিতে, এ মূল্যায়ন অদ্ভুত হলেও অহেতুক নয়।

সেই হেতুটা কি?

১৯৪৭ সালে ভেঁপু বাজল, তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ল, আমরা ব্রিটিশের অনুগ্রহে স্বাধীন হলাম। শ্বেতপ্রভুদের স্থানে দেশী নেতারা দিল্লীর মসনদে বসলেন। কিন্তু ভারতের অচলায়তন সমাজ অপরিবর্তিত রইল, ভারতের নবজন্ম হল ব্যাহত। যে-তামসিকতায় ভারতের সাধারণ মানুষ আচ্ছন্ন ছিল. যুগ যুগ ধরে, যে-মূঢ়তা ও জড়তা দেখে তেরো শো বছর আগে ধর্মকীর্তি "ধিক্ ব্যাপকং তমঃ"—"তমঃর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত চারিদিকে" বলে আক্ষেপ করেছিলেন, সে-তামসিকতা বিদূরিত হল না স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরেও। জনচিত্তে মূঢ়বিশ্বাস, মধ্যযুগীয় ধর্মভাব ও ধ্যানধারণা স্থায়ী হল নতুন শাসকদের কল্যাণে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শৌর্যে-বীর্যে, মানবধর্মে ভারতবর্ষ স্বপ্রতিষ্ঠ হল না ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে।

এ-হেন অবস্থায় জনচিত্তের হতাশা ও বিভ্রান্তি, আত্মশক্তিতে সাময়িক অবিশ্বাস স্বাভাবিক। আর এ-প্রবণতার সদ্ব্যবহার করছেন অনেকে। আজ তাই দিব্যজীবনের জয়গান, অলৌকিকতার সমাদর. শাসকশ্রেণীর তরফে। জীবনের সব বিচিত্রতাকে অতিক্রম করে সাহিত্যিকের আজ তাই এমন এক তথাকথিত উপলব্ধির স্তরে উৎক্রান্তি, যার মধ্যে সমন্বয়—যাতে শান্তি!! সাহিত্যিক আজ ধর্ম-সাধকের জীবনভাষ্য লিখে আশ্চর্য উত্তেজনাসৃষ্টি করেন। পণ্ডিতেরা ঘোষণা করেন, "ধর্মের পথই ভারতের পথ।" আর সমস্যা-সংকুল ভারতবর্ষের মানুষ এ-সান্ত্বনাবাণী শোনে, লৌকিক জীবনের অপ্রাপ্তিকে ভোলে অলৌকিক জীবনের কল্পনা করে। বঞ্চিত মানুষের বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে রক্ষণশীল শক্তির প্রতিনিধিরা আস্তিক্যবাদ, মূঢ়বিশ্বাস, বুদ্ধির বিকারকে প্রশ্রয় দেন, যুক্তিবিরোধী, বিজ্ঞান-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আমদানি

করেন দর্শনে, অর্থনীতিতে, সাহিত্যে। দার্শনিক তাই মিস্টিক হয়ে ওঠেন, সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন যোগী। এতে নগদ দক্ষিণাও মেলে আবার জনতাকে বোকা বানানোও চলে। তাই পাশ্চাত্যে যেমন এলিয়ট জীবনচর্চা ছেড়ে প্রবেশ করেন ক্যাথলিক-ধর্মের মূঢ়বিশ্বাসের অন্ধগলিতে, হাক্‌সলি অতীন্দ্রিয়ানুভূতির গুণগানে হয়ে ওঠেন পঞ্চমুখ, ইশারউড যোগসাধনার পথ ধরেন সাহিত্যসাধনা ছেড়ে, তেমনি ভারতবর্ষেও আজকাল বোধির (intution) গুণগান, ধর্মের গুণগান—বিত্তবানশ্রেণীর মধ্যে।

আজ তাই অরবিন্দের দিব্যজীবনবাদ নিয়ে আতিশয্য, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ নিয়ে আশ্চর্য উত্তেজনা। 'কল্লোল'যুগের অচিন্ত্যকুমারের তাই ভক্তির উপচারে শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা—জীবনপ্রেম থেকে ঈশ্বর-প্রীতিতে উত্তরণ।



সংস্কৃতি সংবাদ

বাংলা প্রগতি লেখক সম্মেলন

কিছুদিন থেকে বাংলা সাহিত্যেব জন্য একটা বিপুল উদ্যমের প্রযোজন খুবই দেখা যাচ্ছিল। বাঙালীব বিশেষ আশা ও গর্বের ধন হল তার সাহিত্য তার সংস্কৃতি। পরাধীনতা এই সাহিত্যকে রুদ্ধ করে রাখতে চেযেছিল। পুরুষানুক্রমে তাই বাংলা দেশে আশা জেগে এসেছে, একদিন এ সাহিত্য তার উপযুক্ত বিকাশ পাবে, তার দান হযে উঠবে আরো ব্যাপক, আবো পরিপূর্ণ।

কিন্তু দেশ 'স্বাধীন' হওযা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অবস্থাব বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। বরং নতুন আশংকা দেখা দিযেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকেই গেছে অবহেলিত, অবরুদ্ধ ; প্রাধান্য থেকেই গেছে ইংরেজি ভাষাব, ইংবেজি প্রভাবিত শিক্ষাব। তার ওপর নতুন কবে আমদানি করা অপসাহিত্যেব সর্বনাশা প্রভাব, নতুন করে জাগিয়ে তোলা বুদ্ধিবিকার ও অন্ধ কুসংস্কারেব স্রোত বাংলা সাহিত্যের স্বধর্মকে, তার মহান অতীত ও মহত্তর ভবিতব্যকে আক্রমণ করতে উদ্যত। বাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকটি শিল্পী ও সাহিত্যিক এই পবিস্থিতিতে চঞ্চল না হয়ে পাবেননি। মার্কিন সংস্কৃতির কুপ্রভাব সম্পর্কে কঠিন হুঁশিয়াবি জেগেছে ভাবতের অনেক মনীষীদের কণ্ঠেই। শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলার মতো অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের নতুন আত্মীযতাবোধ ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তবু যে উদ্যমের জন্য বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা কবছিল, তার অভাবটি মূলত থেকেই যাচ্ছিল। জনগণ একটি আহ্বানেব জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই আহ্বানের জন্য জনগণ অবশ্যই তাকিয়েছিলেন সরকাবের দিকে কিন্তু সেখান থেকে প্রত্যাশার কিছু মেলেনি ; তাকিয়েছিলেন—কংগ্রেসী সাহিত্যরথীদের দিকে। কিন্তু একালেব জাতীয়তাবাদের পোষক এই কেন্দ্রটি আজ বাংলার প্রকৃত সাহিত্যের জন্য অগ্রসর কবার পরিবর্তে পিছিয়ে থাকতেই পছন্দ করেছেন। তাহলে কে এই দায়িত্ব নেবে ?

স্বাভাবিকভাবেই, এ দায়িত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে এসেছেন বাংলাব গণতান্ত্রিক লেখকদের প্রতিষ্ঠান প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। ১১ই এপ্রিল থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যে সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তার আলাপ-আলোচনা, ঘোষণা ও প্রকাশ্য সম্মেলনের বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে এই নতুন উদ্যমেবই একটা শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে।

ভিত্তির ব্যাপকতা

মনে রাখা দরকার যে এ সম্মেলন সহজ ছিল না। সংঘেব বিদাযী সম্পাদক শ্রীযুত মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় যে বিবরণী পেশ কবেন, তাতে দেখা যায কি তীব্র নির্যাতন এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিযে এ সংঘকে টিঁকে থাকতে হয়েছে। কংগ্রেসী শাসনের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের যে পালা শুরু হয, তার ধাক্কা জনগণেব অন্যান্য অংশের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘেব ওপবেও পড়ে। গোপাল হালদার, হীরেন মুখো-

পাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সঙ্ঘের অধিকাংশ প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যিককর্মীকে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটক থাকতে হয়। সঙ্ঘের ওপরে চলে বারংবার পুলিস-হানা। এই নির্যাতন এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি কারণের ফলে সঙ্ঘের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তার ওপর সঙ্ঘের নীতি ও কার্যক্রমের মধ্যে গুরুতর ত্রুটিও ছিল। ফলে গত কয়েক বছর ধরে একনাগাড়ে একটা দুরবস্থার মধ্যে সঙ্ঘকে পড়ে থাকতে হয়। এই দুর্বলতা কাটিয়ে মতামতনির্বিশেষে সাহিত্যের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সমবেত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতি গোষ্ঠীবন্ধভাবে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেদের বর্ধিত করে গঠন করেন এক ব্যাপক প্রস্তুতি কমিটি। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ছোটো থেকেও গেলেও প্রগতিশীল সাহিত্যের আন্দোলন কিন্তু ছোটো ছিল না। সব দুর্যোগকে অস্বীকার করেই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তা ও প্রচেষ্টার এক ক্রমবর্ধমান জোয়ার স্বতস্ফূর্তভাবেই বেড়ে উঠেছে। এই বৃহত্তর ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে, যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়, তার মধ্যে বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি সঙ্ঘ প্রভৃতি থেকে শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। সম্মেলনকে আরো ব্যাপক করার জন্য প্রস্তুতি কমিটি সর্বসম্মতভাবে একটি আবেদন পত্র প্রচার করেন। এই আবেদন পত্রে, বাঙলা সাহিত্যের সম্মুখে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সাতটি সাধারণ প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মতামতনির্বিশেষে প্রত্যেকটি শিল্পী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীর কাছে আহ্বান জানানো হয়—"প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের নীতি ও সংগঠনকে আরো উপযুক্ত করে তুলে তাকে আপনার করে নিন. . মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনারা এক হয়ে দাঁড়ান। সমগ্র জাতি আপনাদের সমবেত ঘোষণার জন্য উন্মুখ।"

অভাবিত সমর্থন

এইভাবে যে সম্মেলন শুরু হল, তার ওপর চারিদিক থেকে মতামতনির্বিশেষে বর্ষিত হয়েছে এক অপ্রত্যাশিত সমর্থন। নির্বাচিত সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, রমেশচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল বসু এবং বিদায়ী সভাপতি গোপাল হালদারকে নিয়ে।

প্রস্তুতি কমিটির ঐক্যের ডাককে ধ্বনিত করে, প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নানামত ও নানাপথের প্রতিনিধিদের আহ্বান জানান জনকল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শান্তি স্বাধীনতা ও প্রগতির বাণী শোনানোর জন্য।

সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, জনকল্যাণ ও বাংলা সাহিত্যের জন্য আসুন একসঙ্গে চলি। কোন্ মতটা শ্রেষ্ঠ এইভাবেই তা যাচাই হতে পারে।

সম্মেলনের বিভিন্ন দিকে সভাপতিমণ্ডলী ও অতিথিদের মধ্য থেকে এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন মতামতের তাবতম্য বজায় রেখেও সম্মেলনের জন্য সমর্থন জানান বা অংশ গ্রহণ করেন বামপন্থী লেখক এবং প্রগতিশীল চলচ্চিত্রের দুঃসাহসী উদ্যোক্তা জ্যোতির্ময় রায়, জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাস্তবধর্মী শিল্পী শ্রীঅতুল বসু, কংগ্রেস-অনুরাগী সমালোচক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য এবং অধিকাংশ তরুণ প্রগতিশীল বা বামপন্থী লেখক ও শিল্পীবৃন্দ, যাদের মধ্যে যেমন ছিলেন

কমিউনিস্ট লেখকেরা তেমনি ছিলেন বহু অদলীয় লেখক এবং শ্রীঅমল দত্ত, শ্রীরমাপতি বসু প্রমুখ অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক মতামত সম্পন্ন প্রতিনিধিরা।

বস্তুত প্রায় পৌণে তিনশত প্রতিনিধি এবং আরো বহু আমন্ত্রিতের সমাবেশে এই যে সম্মেলন হয়, তার মধ্যে বিশেষ করে বর্তমান বাংলার কবি ও কথা সাহিত্যিকদের যে বিপুল অংশটির সমাবেশ ঘটে তাকে বাদ দিয়ে বর্তমান বাংলা সাহিত্য কল্পনা করা যায় না।

সম্মেলনের মধ্যে আরো যেটি প্রকাশিত হয়, তা হল বাংলা ভাষার বিপুল আত্মীয়তা-বোধ। সম্মেলনে প্রতিনিধি আসেন সিংভূম প্রভৃতি জেলা থেকে, সমর্থন জানিয়ে পাঠান দিল্লী রাজধানী সংস্কৃতি-পরিষদ, এবং এলাহাবাদ থেকে শ্রীঅরুণ মিত্র, বোম্বাই থেকে শ্রীনরেন্দ্র ঘোষ এবং আরো অনেকে। সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের অপর পার থেকে ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানান পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল সাহিত্যিক।

অন্যদিকে, বাংলার এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে পাঠান বিশ্ববিখ্যাত শান্তি-নেতা ডাঃ সইফুদ্দিন কিচলু, খ্যাতনামা হিন্দী সাহিত্যিক যশপাল, মহাকবি ভাল্লাথোল এবং আরো অনেকে। অভিনন্দন আসে সোবিয়েতের এরেনবুর্গ, সিমোনভ, মির্জা তুর শুন-জাদ্-এর কাছ থেকে, চীনের তিঙ-লিঙ ও 'পিপল্‌স্ ডেলি' পত্রিকার কাছ থেকে, তুর্কির নাজিম হিকমেত, আমেরিকার হাওয়ার্ড ফাস্ট, আয়র্লণ্ডের সিয়ান ও-কেসি এবং আরো অনেকের কাছ থেকে।

প্রস্তাব ও আলোচনা

স্বভাবতই সম্মেলনে সক্রিয় অংশ নেন প্রধানত তরুণ সাহিত্যিকেরাই। মতামতনির্বিশেষে তরুণ সাহিত্যিক ও বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি কর্মীদের পক্ষ থেকে যে উৎসাহ ও উদ্যোগ প্রকাশিত হয় তা রীতিমতো মূল্যবান।

প্রধানত তরুণ সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে বিপুলসংখ্যক প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এবং দুই বঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্যের সমালোচনা, পূর্ণাঙ্গ দাবির তালিকা প্রণয়ন, প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান দাবি, লোক-সংস্কৃতি রক্ষা, দেশের গ্রন্থাগারগুলির জন্য সাহায্য বৃদ্ধি ও বইয়ের ওপর থেকে বিক্রয় করের অবসান, নাটকের প্রিসেন্সরশিপ রহিত এবং সাধারণ নাট্যমঞ্চের দাবি। ১৯৪৯ সালে সাহিত্যিকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মিছিলে পুলিসের গুলিতে নিহত শহিদ রমেন মুখোপাধ্যায়ের নাম সম্মেলন স্মরণ করে এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বার্নাড শ' প্রভৃতি সাহিত্যিক এবং মহান স্তালিনের জন্য শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে।

উদ্বাস্তু লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের দুরবস্থা তথা দুঃস্থ সাহিত্যিকদের দুরবস্থা সম্পর্কে সম্মেলন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। নিবারণ পণ্ডিতের সাহায্যের জন্য সভা-স্থলেই বেশ কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। সমবেত প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে এই উপলক্ষে যে অকৃত্রিম দরদের একটি মনোভাব প্রকাশ পায়, তা দীর্ঘকাল মনে রাখার মতো।

সম্মেলন থেকে শিশু-সাহিত্যের জন্য একটি সম্মেলন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, গণনাট্য সঙ্ঘ এবং অন্যান্য অনুরূপ সঙ্ঘের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং বাংলা ভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে পরস্পর অনুবাদের ব্যবস্থার দাবিও জানানো হয়। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে

পাকিস্তানে প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাজ্জাদ জহীর প্রভৃতির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ এবং কোরিয়ায় শান্তির জন্য চীনের প্রস্তাবকে সমর্থনের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

এই বিস্তৃত প্রস্তাবাবলী ছাড়াও প্রতিনিধিরা ৭টি শাখায় ভাগ হয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন আবেদনপত্রের ৭টি প্রশ্নের ওপর। এই প্রশ্নগুলি হল (১) শিক্ষার অভাব, (২) ভাষা, (৩) আর্থিক দারিদ্র, (৪) বিদেশের বিকৃত সংস্কৃতির কুপ্রভাব, (৫) মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, (৬) সাহিত্যে জাতির সর্বাঙ্গীণ প্রতিফলন, (৭) শান্তি।

স্বভাবতই আলোচনার মধ্যে নানা মত এবং নানা প্রশ্নের অবতারণা হয়। সমস্ত শাখায় আলোচনাও স্বভাবতই সমান গভীর হতে পারেনি। আরো গভীর আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য একটা আগ্রহ সম্মেলনের পরেও অবশ্য থেকে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রত্যেকটি প্রশ্নে আলোচনার আগ্রহ জেগেছে বিপুল পরিমাণে এবং ঐক্যমতের দিকে লক্ষ্য রেখে কতকগুলি প্রাথমিক সুপারিশও সম্ভব হয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির পরিচালনায় শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় প্রকাশ পায় যে শিক্ষার বিস্তৃতি না ঘটাতে পারলে সাহিত্যের বিকাশও রুদ্ধ হবে। শিক্ষার বিকাশ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সাহিত্যের একটি জরুরী দাবি।

গোপাল হালদার, সুধীর করণ প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা অংশ গ্রহণ করেন ভাষা-সংক্রান্ত আলোচনায়। এই আলোচনায় সুপারিশ করা হয় যে বাংলার অভ্যন্তরে সরকারী ও সাধারণ কাজ এবং সর্বস্তরে শিক্ষাদান ইংরেজি বা অন্য ভাষায় না করে অবিলম্বে বাংলায় পরিচালনা করা এবং বাংলার ভাষাভিত্তিক সীমানা নির্ধারণ প্রয়োজন।

তাছাড়া বাংলা রাষ্ট্রে সাঁওতালি, গোর্খালি প্রভৃতি ভাষাভাষীদের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন এবং হিন্দুস্তানী ,ওড়িয়া প্রভৃতি অন্য ভাষাভাষীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা জরুরী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা অংশগ্রহণ করেন আর্থিক দারিদ্র্য সংক্রান্ত আলোচনায়। এই আলোচনায় দেখা যায় যে সাধারণ আর্থিক সংকট নিবারণ করতে সরকারের অক্ষমতার ফলে পুস্তক প্রকাশ, ফিল্ম প্রভৃতি শিল্পগুলি বিশেষভাবে আহত হয়েছে এবং সংস্কৃতির এই মাধ্যমগুলির অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থায় কতকগুলি বিদেশী স্বার্থ এবং সরকারপোষিত কিছু এক-চেটিয়া স্বার্থ সবচেয়ে বেশি সুবিধা করে নিচ্ছে এবং সবচেয়ে শোষিত হচ্ছেন দরিদ্র লেখক শিল্পীরা। কপিরাইট, 'রয়েলটি' প্রভৃতি প্রশ্নে তাঁদের বিশেষ স্বার্থরক্ষা এবং সংস্কৃতির মাধ্যম এই জাতীয় শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুশীল জানা প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনায়। এতে দেখা যায় যে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের পক্ষে বিদেশের কতকগুলি সাংস্কৃতিক প্রভাব একান্ত ক্ষতিকর। এই ঝোঁকগুলি প্রকাশিত হয় সাধারণত 'খুনখারাবির প্রবৃত্তি', যৌনবিকৃতি, হতাশাবাদ, বুদ্ধি-বিকার, ধর্মরহস্যবাদ, জাতি-বিদ্বেষ, যুদ্ধপ্রচার প্রভৃতি মারফত। এই ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে বাংলা সাহিত্যকে তার ঐতিহ্য নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়ার প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা। এই আলোচনায় প্রকাশ পায় যে নির্মল বুদ্ধির পরিবর্তে অদৃষ্টবাদ, অন্ধকুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রভাব আমাদের জনগণের ওপর এখনো বেশ রয়ে গেছে এবং এগুলি দূর করার জন্য বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সচেতনভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

জাতির সর্বাঙ্গীণ প্রতিফলন সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অচ্যুত গোস্বামী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা। আলোচনায় প্রকাশ পায় যে বর্তমান যুগে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তরাই জাতীয় জীবনের বৃহত্তম অংশ এবং প্রধানত এদের জীবন এবং অন্যান্য কিছু কিছু বিত্তবান অংশের জীবনকথাই জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত। আমাদের সাহিত্য এখনো এই বৃহত্তম অংশের মুখপাত্র হয়ে উঠতে পারেনি। প্রধানত জাতির এই বৃহত্তম অংশের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যকে হতে হবে সামাজিক অগ্রগতির প্রচালক।

যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত আলোচনায় প্রকাশ পায় যে প্রত্যেকটি সমস্যাই আরো জটিল হয়ে উঠছে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য। তাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সাহিত্যের একটি পবিত্র কর্তব্য।

নতুন কার্যকরী সমিতি

সম্মেলন থেকে আগামী বৎসরের জন্য একটি ব্যাপক পরিষদ গঠিত হয়েছে। এই পরিষদে আছেন অধিকাংশ প্রতিভাবান সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কর্মের প্রতিনিধিরা। পরিষদ ছাড়াও সম্মেলন নিম্নোক্ত কর্যকরী সমিতি নির্বাচিত করেছেন—

সভাপতি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। **সহ-সভাপতি**—অজিত দত্ত, শেখ গোমহানি, বিমলচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র সেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। **যুগ্ম-সম্পাদক**—ননী ভৌমিক, মণীন্দ্র রায়। **কার্যকরী সমিতি**—অনিলকুমার সিংহ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুলেখা সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, সুশীল জানা, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সমরেশ বসু, আশীষ বর্মণ, বরেন বসু, অরুণাচল বসু ও দু'জন কো-অপ্টেড্ সদস্য।

নতুন উদ্যমের জন্য

দীর্ঘদিন পরে অনুষ্ঠিত এই একটি সম্মেলনেই সব জমা কাজ করে ফেলা যাবে এটা অবশ্যই আশা করা ঠিক হবে না। প্রগতিশীল সাহিত্যের জন্য একটি সুস্থ ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল সম্মেলনের সামনে আশু কাজ। সেদিক দিয়ে সম্মেলন যে মূলত সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই ভিত্তি স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘ আহ্বান জানিয়েছেন ব্যাপকতর সাহিত্যিক সমাজের কাছে, জাতীয় সাহিত্যের কর্তব্যগুলিকে গ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু স্বভাবতই বহু ত্রুটিও থেকে গেছে। একটি ত্রুটি হল সৃজনী সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনার অভাব। সাধারণ সমস্যা নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হলেও যারা সৃষ্টি করছেন তাদের অন্তরঙ্গ বহু সমস্যার কোনো আলোচনা এই সম্মেলনে সমযাভাবে হতে পারেনি। আশা করি, নতুন কার্যকরী সমিতি সে-সমস্যাগুলির ধারাবাহিক আলোচনার জন্য উদ্যোগ নেবেন।

দ্বিতীয় ত্রুটি হল সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা। আমন্ত্রণ-পত্রাদি হয়তো সকলের কাছে পৌঁছয়নি, আহ্বান হয়ত আরো ব্যাপক হযনি। ব্যবস্থাপনায হযতো লোকাভাব ও শৃঙ্খলার অভাব দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার পর এই ত্রুটির জের অস্বাভাবিক না হলেও, আশাকরি নতুন কার্যকরী সমিতি ক্রমশ তাকেও শুধরে নিতে পারবেন।

এই ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও আশা আছে যে সম্মেলন যে বিপুল আশা জাগিযেছেন, যে

প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন তাকে তাঁরা দৃঢ়ভাবে সত্য করে তুলতে শৈথিল্য দেখাবেন না। বিশেষ করে সম্মেলনের ঘোষণাপত্রটি তার ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে।

সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত হল ভাষার ভিত্তিতে সঙ্ঘ গঠন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সঙ্ঘ নতুন নাম গ্রহণ করেছে "বাংলা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ"।

ইতিপূর্বে শিল্পীরাও এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে শিল্পীদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তা ও উদ্যোগের এতখানি বিকাশ হয়েছে যে তাদের একটি স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই সঙ্ঘের নামের সঙ্গে শিল্পীদের নামকে জড়িয়ে রাখা অসমীচীন বোধে 'শিল্পী' কথাটি সঙ্ঘের নাম থেকে বাদ দেওয়া স্থির হয়।

ঘোষণাপত্র

সঙ্ঘকে বিস্তৃত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য সংগঠনের কয়েকটি মূলনীতি গ্রহণ করা ছাড়া সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে একটি ঘোষণা-পত্র গ্রহণ করেছেন। এই ঘোষণা-পত্রটি বাংলা সাহিত্যের পবিত্র কর্তব্যগুলি নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ভিত্তি দিয়েছে, যেখানে মতামতনির্বিশেষে সাহিত্যের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীদের একত্র হয়ে দাঁড়াবার কোনো বাধা নেই। বাংলার সাহিত্য-শক্তি এ ঘোষণাপত্রকে সত্য করে তুলুক—

> আমরা চাই যে, আমাদের শিল্পসাহিত্যের বিকাশ হবে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের পথে। ইহাই ভারতবর্ষের জনসাধারণেরও আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য সমস্ত দেশপ্রেমিক লেখক ও শিল্পীর সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। আমরা আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত। এই ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর আমরা চাই তাকে অগ্রসর করতে আর এর মধ্যে যা কিছু মিথ্যা ও ক্ষয়িষ্ণু আমরা তাকে পরিহার করতে চাই।
>
> মুক্ত ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য আমাদের জনসাধারণ সচেষ্ট। বিশ্বের সমস্ত জাতির সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থায়ীভাবে স্থাপন করাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সাহিত্য উদ্বুদ্ধ হবে মানবতার প্রেরণায়, জীবনের প্রতি আস্থায়, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসে।
>
> মানুষের সৃজনীক্ষমতার প্রতি ঘৃণা, এক জাতির উপর অন্য জাতির আধিপত্য, জাতি ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ,—এ সব আমাদের জনগণের সুস্থ ঐতিহ্যের বিরোধী। জীবনের লক্ষ্যশূন্যতা, রিক্ত হতাশা, অদৃষ্টবাদ এবং বিজ্ঞানবিমুখিতা আমাদের সংস্কৃতির বিকাশকে ব্যাহত করে। অশ্লীলতা, যৌনবিকৃতিমূলক সাহিত্য, খুন-খারাবির ও বীভৎসতার সাহিত্যের আমরা বিরোধী।
>
> আমাদের সাহিত্যকে হতে হবে শিল্পসম্মত এবং সুন্দর। এর রূপ হবে জাতীয়, জনবোধ্য ও লোকহৃদয়গ্রাহী।
>
> ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি ভাষার ও সাহিত্যের বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগের আমরা পক্ষপাতী।
>
> আমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি ভাষার লেখকদের আহ্বান জানাই,—জনসেবার জন্য মিলিত হোন, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবন অর্জনের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করুন আপনাদের সৃষ্টি দিয়ে।
>
> বাঙালী লেখক হিসাবে আমরা আজকের বাঙালী জাতির ও বাঙলা সংস্কৃতির বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ; আমাদের বিশেষ দায়িত্বও সমস্ত হৃদয় দিয়ে স্বীকার করি।

বাঙলা দেশ আজ দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যত বিচ্ছেদই ঘটুক, দুই বাঙলার বাঙালীর মাতৃভাষা এক, এক বাঙলা সাহিত্যই তাহার সাহিত্য, এক বাঙালী সংস্কৃতিই তাহার সংস্কৃতি। দুই বাঙলার মধ্যে যে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই হাজার বৎসরের ঐতিহ্য অব্যাহত রাখা, ও সর্ব রকমের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা, বাঙালী জনসাধারণের দাবি, বাঙালী লেখকমাত্রেরই দায়িত্ব। প্রত্যেক বাঙালী লেখক ও প্রত্যেক বাঙালী সংস্কৃতিকর্মীকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা আহ্বান করি। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোক।

ননী ভৌমিক

চিত্রপ্রদর্শনী

ইনস্টিটিউট অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার শিল্পীদের একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এ-যুগের নতুন শিল্পাদর্শে উদ্বুদ্ধ জনকয়েক তরুণ শিল্পীর উদ্যোগে বছর চারেক আগে এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে এবং গত বছর পর্যন্ত প্রতি বছরে এঁরা নিজেদের বার্ষিক চিত্রভাস্কর্যরচনাগুলি সাজিয়ে একটি করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে আসছিলেন। এ-বছরে এঁরা যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন, তার দ্রষ্টব্যগুলি শুধু নিজেদের রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। প্রতিষ্ঠানের সদস্য নন—এমন অনেক শিল্পীর রচনাও এবারকার প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং এর ফলে অন্তত শিল্পীদের সমাবেশের দিক থেকে ইনস্টিটিউট অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার তাঁদের প্রদর্শনীর আসরকে অনেকখানি বিস্তৃত করেছেন। অবশ্য, সংঘটির নামকরণটুকু থেকে এর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের যে ব্যাপকতা আছে বলে মনে হয়, কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ততটা ব্যাপক ঠিক এখনও হয়ে ওঠেনি—এপর্যন্ত এই সংঘটির কাজ শুধু চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ আছে। অন্তত প্রতিষ্ঠানের নামের তাৎপর্যের দিক থেকে আশা করা অন্যায় নয় যে চিত্রকলা ছাড়াও সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগে কাজে নামতে পারেন এমন সব ব্যক্তিকে সদস্য করার দিকে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ক্রমশই সচেষ্ট হবেন।

এ-বছর থেকে প্রদর্শনীর আসরকে বাইরের শিল্পীদের মধ্যে বিস্তৃত করে দেবার ফলে সাধারণভাবে প্রদর্শনীর মান আগেরবারকার চেয়ে নিশ্চয়ই উন্নত হয়েছে। কিন্তু শিল্পীর সংখ্যা একশো জনেরও বেশি এবং প্রত্যেকের মাত্র একটা করে ছবি প্রদর্শিত হবার ফলে শিল্পীদের সম্বন্ধে আলাদা করে ধারণা করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না—এ ধরনের প্রদর্শনীর এই একটা সীমাবদ্ধতার দিক—বিশেষ করে শিল্পীরা যদি তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাটিকে উপস্থিত না করেন, তাহলে সমগ্রভাবে প্রদর্শনীটাও শুধু জনকতক শিল্পীকে এক জায়গায় উপস্থিত করা ছাড়া উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিশেষ কোনো তাৎপর্য পায় না। তবে, একটা প্রগতিশীল শিল্পাদর্শকে সামনে রেখে এতগুলি শিল্পীর রচনাকে এক জায়গায় উপস্থিত করার কিছুটা সার্থকতাও অবশ্য আছে।

এই প্রদর্শনীতে সদ্য পরলোকগত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনাকে উপস্থিত করা হয়েছিল। এগুলিতে যামিনীপ্রকাশের প্রথম দিককার চিত্রকর্মে যে বাস্তব-প্রবণতা আর শিল্পদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা আজকের বাস্তবতাবাদী শিল্প-রচনাপ্রয়াসীদের নিশ্চয়ই প্রেরণা জোগাবে। অতুল বসুর তেল-রঙের সুন্দর কাজটিও এই প্রদর্শনীর একটা মস্তবড়ো আকর্ষণ। আরেকটি অত্যন্ত বিশিষ্ট কাজ—অশোক গুপ্তর পেন্‌সিলে আঁকা প্রতিকৃতি 'শম্ভুদা'। রেখার সুপরিকল্পিত ব্যবহারে, টানের সুনির্দিষ্ট-

তায় এবং অঙ্কিত ব্যক্তিব ব্যক্তিত্বেব বর্ণনায় এটি সত্যিই খুব উঁচু দরেব বচনা। প্রকাশ দাসের 'কুড়ে ঘর' একটি চমৎকার স্কেচ।

প্রদর্শনীর অধিকাংশ শিল্পীই তরুণ এবং ছাত্র। এঁদের প্রায় সকলেরই রচনার মধ্যে নানান দিক থেকে প্রতিশ্রুতিব পরিচয আছে। একটা জিনিস বিশেষ করে লক্ষ্য করবেই হবেঃ এই সব নতুন শিল্পীদের আঁকা প্রায় প্রত্যেকটি ছবিরই বিষয়বস্তুর জীবনমুখীনতা। আমাদেব চিত্রকলায় বাস্তবতাকে পুনরঙ্গীকারের দিকে যে নতুন একটা উৎসাহ জেগেছে—এটা তারই একটা প্রকাশ। কিন্তু কোনো আর্টই শুধুই বিষয়সর্বস্ব নয়। চিত্রকলায় সেই বাস্তবতাকে সবচেযে সার্থকভাবে প্রকাশ কবার মতো রূপ-রীতি-আঙ্গিকের অনুসন্ধানের প্রয়াসও স্বভাবতই জাগছে। এবং কোনো কোনো ছবিতে সেই প্রয়াস একটু-আধটু বিপথ-চালিতও যে হচ্ছে না তা নয়। কযেকটি ছবির রচনাপদ্ধতি একটু বেশি চেষ্টাকৃত, কম্পোজিশন কিছুটা কৃত্রিম এবং বিদেশী আঙ্গিকের অনুকরণপ্রয়াস স্পষ্ট। কিন্তু এগুলির চেয়ে সংখ্যায় ঢের বেশি ছিল সৎ ও আন্তরিক বাস্তবধর্মী চিত্রবচনার প্রয়াস।

আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে চিত্রকলা সম্বন্ধে উৎসাহ জাগানো এবং শিল্পশিক্ষা-বিস্তারের কিছুটা দায়িত্ব শিল্পীদেরও অবশ্যই আছে। এই ইনস্টিটিউটের শিল্পীসদস্যরা যদি খানিকটা এই দায়িত্ব পালনের কাজে নামেন, তাহলে ভালো হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যেবা শিল্পের ব্যবহারিকতার দিকটিকে অস্বীকাব করেন না বলেই এ-কথা বলছি। সে দাযিত্ব পালন করতে হলে কিন্তু শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কলকাতার বাইবে অবশ্য এ-ধরনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার নানা অসুবিধে আর আর্থিক প্রশ্ন যে আছে তা জানি। কিন্তু তবু তো এসব অসুবিধেব মধ্যে দিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে হবে এইসব শিল্পীদের যাঁরা শিল্পের বৃহত্তব গণমুখাপেক্ষী সার্থকতায় বিশ্বাসী। আপাতত একটা এক্সপেরিমেণ্ট হিসেবে এই ইন্‌স্টিটিউটের শিল্পীরা কলকাতাব কাছাকাছি কোনো গ্রামে মেলা বা ওইরকম কোনো উপলক্ষে গিয়ে কিছু ছবি টাঙিয়ে আসর সাজিয়ে বসুন না? অন্তত যাঁদেব কথা মনে রেখে তাঁবা ছবি আঁকছেন, দেশের সেই সত্যিকাব জনসাধারণের মনে তাঁদেব ছবি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সে সম্বন্ধে সবাসরি জানতে পারাটাও একটা মস্তবড়ো লাভ।

রবীন্দ্র মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলন

আগামী ১৫ই মে থেকে ১৭ই মে

দলমতনির্বিশেষে প্রত্যেকটি সাহিত্যিক এবং প্রত্যেকটি বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন—আপনার মতামত জানান, সম্মেলনকে সফল করুন।

সূচীপত্র

দ্বাবিংশ বর্ষ ঃঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃঃ পঞ্চম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

ছোটগল্পের রচনারীতি ও প্রেমেন্দ্র মিত্র	অচ্যুত গোস্বামী	৩৪৭
কবিতা	প্রদ্যুম্ন মিত্র	৩৫২
	স্বদেশ সেন	
	বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী	
স্তালিনের শেষ বই	অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র	৩৫৭
রৌদ্র-দীপ্ত (গল্প)	মৃণাল চৌধুরী	৩৬৫
বঙ্কিম-সাহিত্য-জিজ্ঞাসা	গোপাল হালদার	৩৭২
স্তালিনঃ স্মৃতিচিত্র	জাঁ-রিশার ব্লখ্	৩৭৯
মাদারী (গল্প)	মনোরঞ্জন ঘোষ	৩৮৭
পুস্তক-পরিচয়	সুবিমল সেন	৩৯২
	ননী ভৌমিক	
	রবীন্দ্র মজুমদার	
সংস্কৃতি-সংবাদ	রবীন্দ্র মজুমদার	৪০৫
	নিরঞ্জন সেন	
শান্তির স্বপক্ষে	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৪১০
পাঠক-গোষ্ঠী		৪১৪
সম্পাদকীয়		৪১৮

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ,
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড থেকে মুদ্রিত ও 'পরিচয়' কার্যালয়
৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।

IVAN IVANOVICH

(স্তালিন-প্রাইজ প্রাপ্ত উপন্যাস, ১৯৪৯)

ডাঃ ইভান ইভানোভিচ আরঝানভ্-এর স্ত্রী ওল্গা স্বামীর কাছ থেকে অনেক কিছুই পেয়েছিলেন, তবু তাঁকে স্বামীকে পরিত্যাগ করে যেতে হয় জীবনের চরিতার্থতার সন্ধানে। সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে নারী চায় আপন প্রতিষ্ঠা, সমাজবিন্যাসে স্বকীয় স্থান। তাই আরঝানভ দম্পতির জীবনে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। এ-দ্বন্দ্ব পরিবার-সংক্রান্ত নতুন সাম্যবাদী চেতনার সঙ্গে পুরাতন গতানুগতিক চেতনার দ্বন্দ্ব। ডাঃ আরঝানভ সমাজতান্ত্রিক সমাজের সেরা মানুষদের মধ্যে একজন। জনসেবায় এবং সৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টায় তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। তবুও কেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করেন এবং স্ত্রী ওল্গার জীবনে তাভরভের-এর মতো প্রকৃত বন্ধুর আবির্ভাব ঘটে, লেখিকা কোপ্তায়েভা অনিন্দ্যসুন্দরভাবে এ কাহিনী রূপায়িত করেছেন IVAN IVANOVICH গ্রন্থে।

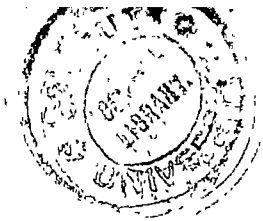
পৃষ্ঠা ৫৪৮, দাম ২।০

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

CURRENT BOOK DISTRIBUTORS

3/2, Madan Street

CALCUTTA-13.



দ্বাবিংশ বর্ষ
২য় খণ্ড। ৫ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

ছোট-গল্পের রচনারীতি এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র

অচ্যুত গোস্বামী

॥ এক ॥

আমার আলোচ্য বিষয় আসলে প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু এ-আলোচনার আগে ছোটগল্পের রচনারীতি সম্পর্কে সাধারণ একটি আলোচনা দরকার।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গল্প রচনা শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের আমল থেকে। এই সময়ে শুধু যে ব্যাপকভাবে বৈদেশিক গল্প-সাহিত্যের অনুশীলন শুরু হয় তা-ই নয়, প্রমথ চৌধুরী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায়, অনেক বিখ্যাত বৈদেশিক গল্প-লেখকের রচিত গল্প অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালী পাঠক-সমাজের করায়ত্তও হয়। স্বভাবতই এ-কালে যাঁরা গল্প লেখায় হাত দিয়েছিলেন তাঁদের লেখায় বৈদেশিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে মোপাসাঁর প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

প্রভাতকুমারের গল্পের প্রধান আকর্ষণ হল ঘটনা। ঘটনার আকস্মিকতা, বৈচিত্র্য বা অসামঞ্জস্য যে-সব কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে গল্পের রস-সৃষ্টিতে প্রভাতকুমারের প্রধান উপকরণ হল তাই। এইভাবে অজস্র গল্পের ভিতর দিয়ে তিনি যে বিরাট ঘটনাপঞ্জী পাঠক-সাধারণকে উপহার দিয়েছেন তা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবানুগ; পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয় না যে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলোকেই প্রয়োজনানুযায়ী ভেঙে-চুরে গল্পের কাঠামো তৈরি করেছেন। অথচ বাংলা গল্প-সাহিত্যে বাস্তবতার প্রবর্তক বলে প্রভাতকুমারের নাম নেই। কারণ কী, সে-আলোচনায় পরে আসছি।

কবি হলেও বাংলা গল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিরাট অবদানকে উপেক্ষা করার সাধ্য কারোও নেই। গল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমান্টিক। এই স্বার্থ-সংঘাতের কলুষে পূর্ণ মাটির পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত মানবিক গুণসমূহ আবিষ্কার করে বেড়িয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতার সীমা থেকেই তিনি শুধু গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেননি, উপকরণের জন্য ঐতিহাসিক কালের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, বা অপরিচিত পরিবেশকেও রেহাই দেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পেও ঘটনাই প্রধান আকর্ষণ, যদিও চরিত্রগত গতি-প্রকৃতিও তাঁর ঘটনার অন্তর্ভুক্ত।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের আমল থেকেই বাংলা সাহিত্যে একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ঘটনা বা কাহিনীকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার যে একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি হল, পরবর্তী গল্প-লেখকরাও তার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গেছেন। আমাদের লেখকদের উপর বিদেশী সাহিত্যের যত প্রভাবই পড়ুক, প্রারম্ভ-পরিসমাপ্তিহীন কাহিনীকে তাই বলে কোনো সুপারিশেই তাঁরা গল্পের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী নন। সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ কাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো গল্প (যেমন, 'নষ্টনীড়') এবং শরৎচন্দ্রের প্রায় সব গল্পই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসে পরিণত হয়েছে। বাংলা দেশের এই হালচাল দেখে প্রমথ চৌধুরী ছোট-গল্পের সংজ্ঞা-নির্ধারণ করতে গিয়ে দুটো জিনিসের উপর জোর দিয়েছিলেনঃ ছোট-গল্প ছোট হওয়া চাই এবং গল্প হওয়া চাই। অর্থাৎ রবীন্দ্র-আমলের দীর্ঘ-কলেবর গল্পগুলোকে ছোট করার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করলেও কাহিনীপ্রবণ বাঙালী পাঠককে কাহিনী থেকে বঞ্চিত করার সাহস তাঁর হয়নি।

অথচ বাস্তব জীবনে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ কাহিনীর সন্ধান খুব কমই মেলে, বোধকরি একেবারেই মেলে কিনা সন্দেহ। প্রভাতকুমারের পক্ষে অবশ্য সম্পূর্ণাবয়ব কাহিনী খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ছিল না। কারণ, জীবনের গভীরে প্রবেশ না করার ফলে জীবনের ক্ষেত্রের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-জাতীয় বড় বড় মাইল-পোস্টগুলিই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল এবং এইরকম মাইল-পোস্ট-চিহ্নিত করে দেখতে পারলে জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া শক্ত নয়। সম্পূর্ণ কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কাছেও সহজলভ্য ছিল। কারণ, তাঁর রোমান্টিক মনের সামনে স্থান-কালের সীমারেখা কোনো দুস্তর বাধা নয়। অনায়াসে একসঙ্গে বিশ-ত্রিশ বছর পার হয়ে গিয়েও তিনি ঘটনার সূত্র যথাযথ অনুসরণ করতে পারেন। কালের সাধ্য কি সেই সূত্রে এতটুকু ফাটল ধরায়? মানবমনের ঘাতপ্রতিঘাতের বাস্তব কাহিনী নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ কাহিনী রচনা করতে পেরেছেন ; কারণ, তাঁর এই রোমান্টিক বিন্যাস-রীতি (টেক্‌নিক) তাঁর সহায়ক হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তী কালের গল্প-লেখকরা কাহিনী নিয়ে সত্যিকারের বিপদে পড়েছেন। বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণ ঘটনার সন্ধান মেলে না বলে এমন কি উপন্যাসের বৃহৎ পরিবেশের মধ্যেও আধুনিক অনেক লেখক শুধু ঘটনা-প্রবাহের বিবরণই উপস্থিত করেন, সম্পূর্ণ ঘটনা নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যদিও গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে জীবনের একটি খুব ক্ষুদ্র, যদিও তাৎপর্যপূর্ণ, অংশমাত্র উপস্থিত করা সম্ভবপর, তবু সেই অতি-ক্ষুদ্র অংশটিকেও একটি পুরোপুরি কাহিনী হতে হবে। এই জটিল সমস্যার একটি অভিনব সমাধান বের করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট-গল্পের আলোচনায় তাই তাঁর বিন্যাস-রীতিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

একেবারে গোড়ার থেকেই প্রসঙ্গটার আলোচনায় অগ্রসর হওয়াই ভালো। গল্পের প্রয়োজনে কোনো লেখকের মনে প্রথম যে-কাহিনীটা দানা বাঁধে তার একটা পদ্ধতি আছে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, লেখক বস্তুতান্ত্রিকই হোন আর রোমান্টিক হোন, কোনো ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগা-

গোড়া পর্যবেক্ষণ করে ফটোগ্রাফারের মতো তিনি তার যথাযথ অনুবৃত্তি করার দায়িত্ব নেন না। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে শুধুই কতকগুলো কাটাছেঁড়া ঘটনা বা কোনো চরিত্রের ক্ষণদীপ্ত কোনো বৈশিষ্ট্য বা কোনো আবেগ বা অনুভূতি। অভিজ্ঞতার রাজ্যের এই বহু-বিক্ষিপ্ত মাল-মশলা-গুলোকে যোগ-বিয়োগ করেই লেখকের কাহিনী গড়ে ওঠে। লেখক হয়তো তাঁর মনের মতো চরিত্র খুঁজে পান খেলার মাঠে ; সেই চরিত্রকে তিনি হয়তো টেনে নিয়ে যান কোনো মফস্বলের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-বাড়ির অন্তঃপুরের পরিবেশে (যা হয়তো তিনি নিজে না দেখলেও বইয়ে পড়েছেন) ; আর যে অনুভূতি বা আবেগ তিনি চরিত্রটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চান তা হয়তো তিনি নিজেই অনুভব করেছিলেন প্রেক্ষাগৃহে শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখতে গিয়ে। অদ্ভুত এবং হাস্যকর মনে হলেও ঠিক এই প্রক্রিয়াতেই যে-কোনো গল্পের কাহিনীর জন্ম হয়, যদিও লেখক অনেক সময় নিজেও হয়তো বলতে পারবেন না ঠিক কোন্ কোন্ জায়গা থেকে তিনি কোন্ কোন্ উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ঠিক এই কারণেই যে-কোনো গল্পের কাহিনীই মিথ্যা, কারণ, বাস্তবের কোনো বিশেষ ঘটনাকে অনুসরণ করে কাহিনী রচনা প্রায় অসম্ভব। আবার প্রত্যেক গল্পের কাহিনীই মূলত সত্য, কারণ, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কোনো লেখকেরই নেই।

রোমান্টিক লেখক সাধারণত তাঁর গল্পেব কাহিনীকে আমাদের, মানে পাঠক-সাধারণের দৈনন্দিন পরিবেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন; চরিত্রগুলোকে অতিরঞ্জিত করেন; আর আবেগ বা অনুভূতি-গুলোকে সেই অনুপাতে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলেন। তাঁর বিশ্বাস এইভাবেই তাঁর কাহিনীর আকর্ষণীশক্তি বাড়ে। পক্ষান্তরে বস্তুতান্ত্রিক লেখক সাধারণ পাঠকের পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই তাঁর কাহিনীকে কল্পনা করেন, সাধারণ পাঠকের মতো ছোটখাটো লোকদেরই চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাদের জীবনে লভ্য ক্ষণভঙ্গুর আবেগ বা অনুভূতিকেই অবলম্বন করেন। তিনি জানেন এইভাবে কোনো কাহিনীকে কল্পনা করে নিলে তা দিয়েও রসানুভূতি উদ্রেক করা যায়।

কিন্তু ছোট-গল্পের ক্ষেত্রে কাহিনী-পরিকল্পনার আগেরও একটা ইতি-হাস থাকে। সাধারণত অনেক ছোট-গল্পের মূলেই খুব ছোট্ট তুচ্ছ একটি জিনিস থাকে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় লব্ধ ছোট্ট একটি বাক্য ব শব্দ পর্যন্ত কোনো লেখককে একটি কাহিনী-কল্পনার প্রেরণা জোগাতে পারে। এমন একটি কাহিনী লেখক কল্পনা করেন যার মধ্যে সেই তুচ্ছ বাক্য বা শব্দটি তার ষোলো আনা নাটকীয় সম্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বা বনফুলের প্রায় গল্পেরই পিছনে এই ধরনের প্রেরণা আবিষ্কার করা যায়। প্রভাতকুমারের গল্পের মূল প্রেরণা এসেছে কোনো তুচ্ছ ঘটনাংশ থেকে। কোনো চরিত্রের একটি খণ্ডিত, বিশিষ্ট প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের অনেক কাহিনী-পরিকল্পনার মূলে ছিল। আবার মূল প্রেরণা অনেক সময়ে কোনো ঘটনা বা চরিত্রের অংশ না হয়ে লেখকের কোনো ব্যক্তিগত আবেগ বা অনুভূতিও হতে পারে। অনুভূতি-কেন্দ্রিক রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কিছু কিছু পাওয়া

যায় ; কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ বিশিষ্ট গল্পেরই মূল প্রেরণা লেখকের কোনো সাময়িক বা স্থায়ী ব্যক্তিগত আবেগ বা অনুভূতি।

কাহিনীর মূল প্রেরণা নির্বাচনের ব্যাপারেও রোমান্টিক আর বস্তুতান্ত্রিকের পার্থক্য আবিষ্কার করা যায়। সেইসব ঘটনাংশ বা চরিত্রাংশই রোমান্টিক লেখকের মনে সাড়া জাগায় যাদের মধ্যে বৃহৎ কল্পনার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে বস্তুতান্ত্রিকের কাছে সেইসব জিনিসেরই মূল্য বেশি যার মধ্যে সমাজ-জীবনের ঘোমটা-ঢাকা বাস্তব অবস্থাটা আত্মপ্রকাশ করে। আশ্চর্যজনক বলে মনে হলেও সত্য বলে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদিও বৃহৎ জীবন, মহৎ প্রেম, বিরাট আত্মত্যাগ প্রভৃতি বড় বড় ভাব নিয়ে রোমান্টিক লেখকের কারবার, তবু তাঁর মন মূলত 'কংক্রিট', অর্থাৎ কাহিনীর উপকরণ হিসাবে কোনো ঘটনা-বিশেষ বা চরিত্র-বিশেষই তাঁর কাছে সর্বাধিক মূল্যবান। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকের মন অনেক বেশি 'অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট', কোনো ঘটনা-বিশেষ বা চরিত্র-বিশেষের নিজস্ব দাম তাঁর কাছে সামান্যই; সমাজ-জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটনে সেই ঘটনা বা চরিত্রের উপযোগিতা কতখানি তার উপর কাহিনীর উপকরণ হিসাবে তার মূল্য নির্ভর করে। বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-বিশ্লেষণ করে সমাজ সম্পর্কে কতকগুলো সাধারণ (জেনারালাইজ্‌ড) সিদ্ধান্তে উপনীত হন ; তারই ভিত্তিতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনীর উপকরণগুলোকে বিচার করেন। ছোট-গল্পের কাহিনী গড়ে তোলার কাজে অনেক সময়ই বস্তুতান্ত্রিক লেখকের সামনে যে মূল প্রেরণা তা এইসব সামাজিক সিদ্ধান্ত বা তার থেকে জাত লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ বা অনুভূতি। প্রক্রিয়াটা যে অনেকখানি 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট' তা সহজেই অনুমেয়।

একটা প্রচলিত ধারণা আছে, রোমান্টিক লেখকের রচিত কাহিনীতে বস্তুসত্য কম থাকে। কথাটা ভুল। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক ঘটনা অনুসরণ করে লেখা 'দেবী চৌধুরাণী' বা 'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী যে-কোনো বস্তুবাদী লেখকের বস্তুধর্মী কাহিনীর চেয়ে কম বস্তুসত্য বহন করে না। শেক্‌স্‌পীয়র বা টল্‌স্টয়-এর মতো দিক্‌পাল লেখকেরা শুধু যে তাঁদের কাহিনীতে Logic of Life বা জীবনযাত্রার সাধারণ সূত্রগুলোকে অনুসরণ করেছেন তাই নয়, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ সুগভীর জ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছেন, যা বর্তমান যুগের যে-কোনো বস্তুতান্ত্রিক লেখকের ঈর্ষার বস্তু। তবু তাঁরা রোমান্টিক লেখক। (অতিরঞ্জনের কথা যদি ধরা যায় তো সে দোষ থেকে বস্তুতান্ত্রিকরাও মুক্ত নন।) কারণ, মনের মতো ঘটনা ও চরিত্রকে কাহিনীর উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করার সময় বৃহত্তর সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে সেই ঘটনা বা চরিত্র কতখানি প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সচেতনভাবে তার হিসাব তাঁরা করেননি। ঠিক এই কারণেই প্রভাতকুমার বা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল বাস্তবানুরাগী কাহিনী নিয়ে লিখলেও রোমান্টিকধর্মী।

বৃহত্তর সমাজ-সত্যের ভিত্তিতে ঘটনা বা চরিত্র-বিশেষকে দেখেন বলে বস্তুতান্ত্রিকের কাছে বস্তুর দাম কম, বস্তুর উপর মননশীলতার দাম বেশি।

এবং শিল্পী-মনের কাছে এই মননশীলতা সবসময়েই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো কাজ করে না। বস্তু পড়ে পিছিয়ে, মননশীলতা চলে এগিয়ে, কখন যে মননশীলতার ভিত্তি হিসাবে বাস্তব বস্তু মরে গিয়ে মনগড়া বস্তু এসে জায়গা কবে নেয় বোঝাও যায় না। এইখানেই বস্তুতান্ত্রিকের বিপদ। নিজের সামান্য অভিজ্ঞতা এবং পুঁথি-পড়া বিদ্যার সাহায্যে একবার কতকগুলো সামাজিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর বস্তুতান্ত্রিক লেখক খুব সহজে বাস্তব জীবনকে অবহেলা করতে শেখেন। বিপদটা ছোট-গল্প লেখকদের কাছে আরও বেশি। ছোট-গল্পে বস্তুর পরিমাণ থাকে খুবই সামান্য: কাজেই বস্তুর দৃশ্যমান দিকে (অর্থাৎ যাদের নিয়ে কাহিনী তাদের আচার-নিয়ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা) লেখকের কোনো বড়রকমের ভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকে কম। কাজেই ছোট-গল্পের বস্তুতান্ত্রিক লেখক শুধু নিজের মননশীলতার উপর পনেরো আনা নির্ভর করে গল্প লেখার প্রয়াসী হতে পারেন এবং অনেক সময়ে খুব উৎকৃষ্ট গল্পও হয়তো সৃষ্টি করতে পারেন।

এবং এর বিস্ময়কর উদাহরণ হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

এ-ছাড়াও বস্তুতান্ত্রিকদের আরও এক ধরনের বিচ্যুতি দেখা যায়। এক ধরনের বস্তুতান্ত্রিক আছেন যাঁরা শিক্ষিত পাঠক-সমাজের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত অনেক পশ্চাদ্‌বর্তী কোনো সমাজের নিখুঁত চিত্র পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে প্রয়াসী হন। পাঠকদের কাছে প্রায় অপরিচিত অত্যন্ত পশ্চাদ্‌বর্তী কোনো সমাজের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য যে কত কৌতুকপ্রদ তাই উদ্‌ঘাটন করাতেই এই লেখকদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ। এই সমাজকে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন না, এদের পশ্চাদ্‌বর্তিতার কারণ তিনি অনুসন্ধান করেন না; এদের জীবন-সংগ্রামের কথা, যে শোষণ-যন্ত্রে তারা নিষ্পিষ্ট তার কথা, ইঙ্গিতেও তিনি প্রকাশ করেন না। হঠাৎ দেখলে এই লেখকদের নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক মনে হয়, কারণ এঁদের লেখায় শুধুই বস্তু, মননশীলতা কম। আসলে মননশীলতাকে গোপন করে রাখার প্রচেষ্টাতেই এঁদের মননশীলতা ব্যয়িত হয়। বর্ণিত সমাজের জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি বর্ণনায় এঁরা সিদ্ধহস্ত, তবু উল্লেখ করা ভালো যে এঁরাও অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট। কারণ, বর্ণিত সমাজের ব্যক্তিবিশেষের বা ঘটনা-বিশেষের কোনো দাম এঁদের কাছে নেই: যে-সব জিনিসগুলো পাঠক-সমাজের থেকে এই সমাজের তফাতটা সুপরিস্ফুট করে তা-ই তাঁরা বেছে বেছে নির্বাচন করেন। এই ধরনের বস্তুতান্ত্রিকদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলেন নুট্‌ হামসুন। বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এই ধরনের প্রচেষ্টার চমৎকার উদাহরণ। ছোট-গল্পের ক্ষেত্রে বাংলায় এ-ধরনের প্রচেষ্টা বিরল। সরোজকুমার রায়-চৌধুরীর কতক কতক গল্প উল্লেখ করা চলে। তারাশঙ্করেরও এই প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিন্যাস-রীতি এই ধরনের সাহিত্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

এই শ্রেণীর বস্তুতান্ত্রিকদের আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর হলেও উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, এঁদের থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পার্থক্যটা বোঝার প্রয়োজন আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বস্তুতান্ত্রিক ছোট-গল্পগুলির আলোচনাটা এবার অনেক সহজ হয়ে এসেছে। (ক্রমশ)

কবিতা

আইসেনহাওয়ারকে

প্রদ্যুম্ন মিত্র

অযুত অযুত চোখে কবিতার স্বপ্ন আজো,
হৃদয়ের কবোষ্ণ কুলায়
কামনা শাবক বাঁচে।
সবুজের দেশ
এক মুঠো শান্তিনীড়
এক মুঠো ভালোবাসা।
তুমি কোন্ চেঙ্গিসের প্রেত
আমাদের পৃথিবীতে বয়ে আনো লুণ্ঠনের ঝড় ;
তুমি কোন্ নিশাচর রক্তচোষা
বাদুড়ের মতো
শোষণে মরণে বোনো জাল!
তুমি ধ্বংস হও
রক্ত কান্না আর্তি তুমি যতোই বিছাও
আমরাই বাঁচি ঘর ঘর
আমাদের বসন্তের গান
আমাদের আকাশের নীল
বাঁচার পতাকা হল
আহতের খুন।
আমরা দুর্মর।
মনে রেখো, লোভী,
পৃথিবীর আদালতে তোমার বিচার
আসছে এমন দিন, এমন সকাল!

সহস্র বাহার

স্বদেশ সেন

একটি বনস্পতি আর সহস্র শাখার বসন্ত-ব্যজন
একটি সমুদ্রের মুখোমুখি সহস্র নদী আর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত দীর্ঘ দীর্ঘ মিছিলের
সেই এক সুর, সেই একটি মাত্র সুর।

কেউ তাকিয়েছে আকাশের দিকে মেঘের মত্ততায়
কেউ মাথা নামিয়ে দেখেছে ধূসর মাটির রঙ্
কেউ চোখ ফিরিয়েছে উত্তরে কেউ দক্ষিণে কেউ ঈশানে কেউ নৈঋতে
কেউ স্লোগানের বারুদে কণ্ঠ নিয়েছে ভ'রে
কেউ নির্বাক পাথরের মূর্তি, নিশ্চুপ
কারো চোখে পুরু কাঁচের চশমা
কারো বা কালো চোখের শানিত চাউনি
কারো নবনীত শরীরে পল্লবের মতো সাজানো পরিচ্ছদ
কারো বয়লারের আঁচ-লাগা কামিজে ঘামের দুর্গন্ধ
কারো স্বপ্ন একটি আশ্চর্য উজ্জ্বল আর
রক্তিম পতাকাকে ঘিরে
কারো বা অন্য কোনো পতাকার স্বপ্ন ;
তবু সেই একটি মিছিল
যেন একটি মাত্র সমুদ্রের বিস্তার
যার একটি মাত্র সুর কিন্তু সহস্র বাহার।

প্রত্যুষ থেকে প্রদোষ, প্রদোষ থেকে প্রত্যুষ
আমরা মিছিলের পানে তাকালাম,
কতবার ফিরে ফিরে এলাম ঘরের কোণটিতে ;
কত হাসি-কান্নার বেহাগ বাজল
কতবার কথা ক'য়ে উঠলাম, কতবার
দমকে দমকে বমি করে তুললাম যন্ত্রণা
লুঠের ক্ষেতে দাঁড়ালাম এক পলক
মরণ-যন্ত্রসন্ধির হাতল ঘুরিয়ে এলাম স্বেদাক্ত চেতনায়
কেউ হিমাচলে, কেউ কন্যা-কুমারিকায়
কেউ পঞ্চনদের সজল উপকূলে
ব্রহ্মপুত্রের ঘূর্ণির মোহানায় কেউ বা—
তারপর কখন মিছিলের সমুদ্রে গিয়ে মিশে গেলাম আমরা
মিশে গেলাম আমরা সেই মিছিলের সমুদ্রে—
যার একটিমাত্র সুর কিন্তু সহস্র বাহার।

আসন্ন্যা সকাল

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

এক ঃ সকাল

সহস্রফণা বয়লারের বিষোদ্‌গারে
বিবর্ণ শহরতলী ;
কলের বাঁশির মর্মান্তিক তর্জন আর
চা-রুটিতে কুলি-লাইনের সকাল এল।

পশ্চিম উপান্তে
গঙ্গার হাজার তরঙ্গে হাজার সূর্য ভাঙাগড়ার কারুকার্য,
পাতায় পাতায় প্রতিবিম্বিত ঝিক্‌মিক্‌ ভোর,
উদাস গোরুর পায়ে পায়ে
ঘাসের শিশিরে হাজার মুক্তোর অপমৃত্যু,
পাখির গান আর গঙ্গাতীরের সকাল।
বিরাট কারখানার ছোট্ট হাঁ-মুখে—
হুড়হুড় করে ঢুকল মানুষের ঘোলা গঙ্গাজল,
সৃষ্টি যন্ত্রণায় গোঙিয়ে উঠল প্রত্যেকটা যন্ত্র ;
জরাগ্রস্ত কদর্য রাস্তায়
বিলম্বত্রস্ত মজুরের হঠাৎ হোঁচটে
খিস্তি-খেউড়ে পেঁচার ঘুমের সকাল।
পুবের ইস্টিশানে
ত্রাহি ডাক ছেড়ে মালগাড়ি খালাস করল জঠরের ভার,
সাইডিং-এ জমা হল স্বর্ণগর্ভ ওয়াগনগুলো ;
সোনালি সূর্যে, গাঁট গাঁট পাটে,
ময়লা মজুর আর কয়লায়
হাজিরার হাঁকে মুনাফাভোজের সকাল এল।

দুই ঃ দুপুর

সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ
খাঁ-সাহেবের অঢেল টাকা আর লালসা—
হাতে হাতে ঘুরে পায়ে পায়ে কেঁদে
অবশেষে প্রৌঢ়ত্বে কুপাড়ার বসত ঘুচিয়ে
বারবধূ থেকে বারোয়ারী মায়ে রূপান্তর—
সানিয়া মায়ী।

গ্রেহাম রোডে নোংরা নর্দমা ডিঙিয়ে
কুলি লাইনের ঘুপসি ঘরে
বুড়ির বুকের নিচে মাথা গুঁজে বাঁচে
মানুষের দুটো আর গোটা তিন কুকুরের পথভ্রষ্ট শিশু।
মিল গেটে উদয়াস্ত চানা বেচে বুড়ি।
বিজয়ী পাপের কুটিল চিহ্ন সর্বাঙ্গে
জীর্ণ বুকে অগ্নিবর্ণ ঘৃণা ;
চানা দেয়, ফাউ দেয় হাসি ভালবাসা,
পচা ব্যবস্থার
দুর্গন্ধ ডোবার পাশে প্রাণের প্রতীক শুচিশুভ্র
সানিয়া মায়ী।

থেমে থেমে বাজল বারোটার ভোঁ,
একপাল মানুষ পিলপিল করে এল বেরিয়ে—
ওর দরদের হুকুমবরদার,
ওর চোখের জ্যোতি, কল্‌জের খুন,
একপাল মানুষ মাথা নোয়াল, হাসল একটু সবাই ;
পশরা গুটিয়ে নিল বুড়ি
গুটিগুটি ফিরে চলল লাইনের ঘরে।

তিন : সন্ধ্যা

গঙ্গার রাঙা ঘোলাজলে
অস্তাচলগামী দিনমণি,
ভোঁ বাজল ছ-টার, ছুটির—
কারখানার গর্ভ থেকে
হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল মানুষের ছিবড়েগুলো ;
গঙ্গার ঘাটে ধুয়ে সারগায়ের নুন, সারাদিনের ক্লান্তি
এক মুহূর্তে অবসাদের বোঝা উজাড় করে
জীবন মুখর হল।

যারা পারল না মিলিয়ে গেল তারা অন্ধকারে ;
দেশী মদের দুর্গন্ধে, গণিকার গলিত ক্ষতে
কলহ-কোঁদলে, তুচ্ছ মত্ততায়,
কদর্য চিৎকারে হতাশায় মানুষের অপমৃত্যু ;
জীবনের ভাঙা রাস্তায়,
ড্রেন উপ্‌চে পচা ময়লা উঠল।

এরি পাশে একজন-দুজন করে
ক্রমে
ভিড় জমে উঠল ইউনিয়ন অফিসে,
অগ্নিশুদ্ধ আত্মার অনির্বাণ অজেয় উদ্যমে
নিঃশ্বাসের দুরন্ত ঝড়ে উড়ল কালান্তের ছাই,
মুখ মেলল অবরুদ্ধ আগুনঃ
লকলক করে উঠছে জীবনের শিখা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দিন আসছে।

সব যন্ত্রণার শেষে
ঐকতানে একদিন এ-যন্ত্র চলবে
বুকের বয়লারে দীপ্ত উত্তাপের উদাত্ত আহ্বানে
সাড়া দেবে শ্যাফ্‌ট্‌গুলো,
আকাশে উঠবে শব্দ জীবনের রথচক্রবেগে
সব ধোঁয়া উড়ে যাবে কালের বাতাসে,
যুগান্তরে শোধ দিয়ে যুগান্তের পুঞ্জীভূত দেনা
জীবন-যন্ত্রের হাতে গড়া হবে সভ্যতার নতুন বসন।

দিন আসছে সন্ধ্যার অন্ধকারে॥



স্তালিনের শেষ বই*

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ক। অর্থনৈতিক বিকাশ ও মানবমুক্তি

উৎপাদন-শক্তির প্রভূত বিকাশ ও প্রাচুর্যের সংস্থান ব্যতীত মানুষ প্রকৃতির দাসত্ব থেকে এবং নিজের সামাজিক কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই মুক্তি যে মানবজাতির লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইতিহাস সুস্পষ্ট-রূপে সাক্ষ্য দেয় যে মানবজাতির গতি ওই দিকে। সমাজবিকাশের নিয়ম অনুসারে মানবজাতি সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে পূর্ণ সাম্যের, পূর্ণ মুক্তির ও পূর্ণ স্বনিয়ন্ত্রণের দিকে।

কিন্তু মানবসমাজের ও প্রতিটি ব্যক্তির মুক্তি যাতে অবশেষে সাধিত হয়, সেইজন্যই মানবের ইতিহাসে প্রথমে যুগ যুগ ধরে প্রয়োজন হয় সমাজের এক অংশের মানুষের দ্বারা অন্য অংশের উপর শোষণ ও বলপ্রয়োগ। মানবের আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে ইতিহাসে পর পর এসেছে তিনপ্রকার শ্রেণী-সমাজ: (১) দাস সমাজ, (২) সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও (৩) পুঁজিবাদী সমাজ। এদের প্রত্যেকটিরই ভিত্তি ছিল এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ, এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর রাষ্ট্রগত বলপ্রয়োগ। এই তিনপ্রকার সমাজ-ব্যবস্থাই উদ্ভূত হয়েছিল বিকাশমান উৎপাদন-শক্তির তদানীন্তন স্তরের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় এমন উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা উৎপাদন-শক্তির অধিকতর বিকাশের এবং প্রাচুর্যের সংগ্রামে মানবজাতিকে ক্রমশ জয়ী ও অগ্রসর করে দেওয়ার জন্য।

উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক উভয়ের অবিচ্ছেদ্য সংযোগে গঠিত হয় একটি বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতি।১ উৎপাদন-পদ্ধতিই হল একটি বিশেষ

---

* জোসেফ স্তালিন: **সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা-বলী**; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা সংস্করণ; কলিকাতা-১২; দাম—আট আনা।

স্তালিনের এই শেষ বইটির তাৎপর্য যুগান্তকারী। রচনাটি শত বৎসরের মার্কসবাদী বিজ্ঞানের শেষ ফল। প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে বইটি অবশ্য পাঠ্য।

১। উৎপাদন মানুষ একা করে না, করে দলবদ্ধভাবে, সমাজবদ্ধভাবে। এই অর্থে সকল উৎপাদনই সামাজিক উৎপাদন। সামাজিক উৎপাদনে মানুষ একদিকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত করে এবং অন্যদিকে অপর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত করে। জোসেফ স্তালিন এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "সামাজিক উৎপাদনের দুটি দিক আছে; এই দুটি দিক যদিও পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট তবু তারা দুটি ভিন্ন ধরণের সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে: একটি হল, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক (উৎপাদন শক্তি) আর অপরটি হল, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের

সমাজব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ। উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের দ্বারাই এক সমাজব্যবস্থার স্থলে অন্য সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং এই প্রয়োজন সংসাধিত হয় সমাজবিকাশের একটি সাধারণ নিয়ম অনুসারে। সেই নিয়মটি হল এই যে "উৎপাদন শক্তির চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ককে অতি অবশ্যই খাপ খেতে হবে।"১ এই নিয়ম সকল সমাজব্যবস্থাতেই কার্যকরী ও অলঙ্ঘনীয়।

উৎপাদন-শক্তির বিকাশে উৎপাদন-সম্পর্কের ভূমিকাটি হল দ্বন্দ্বমূলক। নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক প্রথম দিকে উৎপাদক-শক্তির বিকাশের প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে। পরে উৎপাদন-সম্পর্ক পুরানো হয়ে যায় এবং উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে অসমঞ্জস ও তার বাধাস্বরূপ হয়ে পড়ে। তখন উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যবিধানের নিয়ম অনুসারে পুরানো উৎপাদন-সম্পর্ক বাতিল করে নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন সমাজবিন্যাস।

স্তালিন মন্তব্য করেছেনঃ

> "অবশ্য, উৎপাদনের নতুন সম্পর্ক চিরকাল নতুন থাকে না, থাকতে পারে না; তারা পুরানো হয়ে আসে, উৎপাদন শক্তির অধিকতর বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে; ক্রমে উৎপাদন শক্তির অগ্রগতির প্রধান উৎসের ভূমিকা ছেড়ে তারা হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদন শক্তির শৃঙ্খল স্বরূপ। এই অবস্থায় এই সব সেকেলে উৎপাদন সম্পর্কের জায়গায় দেখা দেয় নতুন উৎপাদন সম্পর্কসমূহ; উৎপাদন শক্তিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে প্রধান উৎসের ভূমিকা এরাই গ্রহণ করে।
>
> "এইভাবে উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তিকে শৃঙ্খলিত করে রাখার ভূমিকা ছেড়ে উৎপাদন শক্তিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায় আর উৎপাদন শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রধান উৎসের ভূমিকা ছেড়ে পরিণত হয় উৎপাদন শক্তির শৃঙ্খলে—উৎপাদন সম্পর্কের এই বিশেষ ধরনের অগ্রগতিই মার্কসীয় বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের একটা প্রধান উপাদান।"২

সমাজবিকাশের এই নিয়ম অনুসারেই দাসসমাজ বাতিল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং সেটিও পরে বাতিল হয়ে দেখা দিল পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কও পুরানো এবং উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে অসমঞ্জস হয়ে পড়েছে বহুদিন আগে থেকেই। সোবিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা রদ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-

---

পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ক (উৎপাদন সম্পর্ক)। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই হোক কিংবা অন্য যে-কোন সমাজবিন্যাসেই হোক্—একমাত্র যখন উৎপাদনের এই দুটি দিকই বর্তমান থাকে তখনই সম্ভব হয় সামাজিক উৎপাদন।" (সোবিয়েৎ ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, পৃঃ ৫০)।

১। জোসেফ স্তালিনঃ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, পৃঃ ৪।

২। ঐ, পৃঃ ৪৯।

ব্যবস্থা।৩ ইওরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র গড়া হচ্ছে।

সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে উৎপাদক-শক্তির উন্নতি ও প্রসারের জন্য প্রভু-দাস সম্পর্ক, জমিদার-ভূমিদাস সম্পর্ক, ধনিক-শ্রমিক সম্পর্ক—এই সকল শোষণমূলক উৎপাদন-সম্পর্কের আবশ্যকতা ছিল। এক যুগের পর অন্য যুগে দাস, ভূমিদাস, কৃষক ও শ্রমিককে শোষণ ও শাসন করেই শ্রেণীসমাজ উৎপাদন-শক্তির বিকাশসাধন করেছে, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বাড়িয়েছে, সভ্যতা গড়েছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুশীলন করেছে। যতদিন উৎপাদন-শক্তির উন্নতির জন্য শোষণ ও বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা ছিল ততদিন মানবের সামাজিক ও ব্যক্তিগত মুক্তি সম্ভব ছিল না এবং তার কোনো বাস্তব ভিত্তি বিদ্যমান ছিল না।

কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা পরিণতি লাভ করার পর উৎপাদন ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে উৎপাদন-শক্তিগুলি সামাজিক চরিত্র ধারণ করে। পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি তখন উৎপাদন-শক্তির শৃঙ্খলে পরিণত হয়। উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তখন উৎপাদনের উপকরণগুলিকে জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। মানুষের দ্বারা মানুষের সকল শোষণের অবসানই তখন উৎপাদন-শক্তির অধিকতর বিকাশের ও সমাজের আরো উন্নতির একমাত্র ও অলঙ্ঘনীয় শর্ত হয়ে ওঠে।

ইতিপূর্বে বহু বিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলির আবশ্যকতা ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু তার ফলে মেহনতি মানবের শৃঙ্খলমোচন ঘটেনি, শুধু এক শ্রেণীর শোষকের আসনে অন্য শ্রেণীর শোষক অধিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উৎপাদন-শক্তিগুলিকে জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে

৩। এ-বিষয়ে স্তালিন মন্তব্য করেছেনঃ "উৎপাদন শক্তির চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ককে অতি অবশ্যই খাপ খেতে হবে—এই অর্থনৈতিক নিয়ম পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনেক কাল ধরেই প্রবলভাবে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। এখনো পর্যন্ত যদি তা প্রকাশ্যে নিজেকে জাহির করতে না পেরে থাকে তাহলে তার কারণ সমাজের ধ্বংসপ্রায় শক্তিগুলির পক্ষ থেকে তাকে জোরালো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই কারণেই এই বাধাকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন হয় একটা শক্তির—সামাজিক শক্তির। আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষক সমাজ—যারা ছিল সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ—তাদের মৈত্রীই ছিল এই ধরনের শক্তি। অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশে এখনো এরকম কোন শক্তি নেই।" (সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, পৃঃ ৫)।

উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধ শোষক শ্রেণীর সঙ্গে শোষিত শ্রেণীগুলির ক্রমশ তীব্রতর শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রামের রূপে অভিব্যক্ত হয়। সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রবর্গই সেই সামাজিক শক্তি যা ধনিক শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলিকে জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করে নতুন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

পরিণত করে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের চিরতরে অবসান ঘটায়১ এবং প্রবর্তিত করে এক নতুন ঐতিহাসিক যুগ যখন মানুষ প্রকৃতির ও নিজের সামাজিক কর্মের দাস না হয়ে প্রভু হতে পারে।

শোষণ ও বলপ্রয়োগ পাশবিক ব্যবস্থা সন্দেহ নেই কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এই সকল পাশবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেই কেবল মানবজাতি আজ সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছে যখন প্রকৃত মানবিক জীবন ও মুক্তি তার পক্ষে শুধু সম্ভব নয়, তার বাঁচার পক্ষে এবং অধিকতর সমাজবিকাশের পক্ষে অপরিহার্যও বটে।২ সেই জন্যই আজ পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বলপ্রয়োগ এত ঘৃণ্য, এত বর্বর, এত অনাবশ্যক এবং এত চরমমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল।৩

খ। সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠন

পুঁজিবাদের উচ্ছেদের পর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, মার্ক্স তার নাম দিয়েছিলেন সাম্যবাদী সমাজ, সাম্যবাদ অথবা কমিউনিজম। মার্কসবাদী বিজ্ঞানের মতে সাম্যবাদের পর পর দুই পর্যায় আছে—প্রথমটির নাম সমাজতন্ত্র এবং দ্বিতীয়টিরই নাম প্রকৃতপক্ষে সাম্যবাদ। সমাজতন্ত্র থেকে ক্রমে ক্রমে মধ্যবর্তী ব্যবস্থা অবলম্বন করে সাম্যবাদের দিকে এগুতে হয়।

সমাজতন্ত্রে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটে এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে৪ রাষ্ট্রক্ষমতায় ও রাষ্ট্রকর্মে সকল মেহনতি মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বিপুলতম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রের আমলে টাকাকড়ির প্রচলন থাকে, ব্যবহার্য দ্রব্য (অথবা উপভোগ্য দ্রব্য) পণ্য-

---

১। স্তালিন বলেছেনঃ "সোবিয়েৎ সরকারকে যা করতে হয়েছিল তা পূর্বতন সমস্ত বিপ্লবের মত এক ধরনের শোষণের জায়গায় অন্য এক ধরনের শোষণ কায়েম করা নয়, কিন্তু তাকে শোষণের পুরোপুরি অবসানই করতে হয়েছিল।" (সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, পৃঃ ৪)।

২। মানবজাতির ইতিহাসে শোষণ ও বলপ্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাব ও অবশেষে অবশ্যম্ভাবী অন্তর্ধান সম্বন্ধে মার্কসবাদের এই বৈজ্ঞানিক ও কর্মাহ্বান-পূর্ণ বিশ্লেষণকে ভাববাদীরা পরিত্যাগ করে শুধু বলেন যে শোষণ খারাপ, শোষণ খারাপ ও শোষণ খারাপ! অথচ দুঃখের বিষয় যে তাঁদের অনেকেই সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন যে ভাববাদী ব্যাখ্যাটি অধিকতর বৈজ্ঞানিক !!

৩। মানবজাতি নিজের মুক্তির জন্য কেন দাসপ্রথারূপ পাশবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, সে সম্বন্ধে এঙ্গেল্‌স মন্তব্য করেছেনঃ "কেননা এটা সত্য কথা যে মানুষ পশু থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং সেই হেতু তার পক্ষে বর্বর এবং প্রায় পাশবিক উপায় অবলম্বন করে নিজেকে বর্বরতা থেকে মুক্ত করার প্রয়োজন হয়েছিল।" (অ্যান্টি-ডুরিং)।

৪। 'একনায়কত্ব' শব্দটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ। রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত সারমর্ম প্রকাশ করার জন্য মার্কসবাদ দেখিয়ে দেয় যে প্রতি রাষ্ট্রই কোনো-না-কোনো শ্রেণীর একনায়কত্ব, সেই রাষ্ট্রে সেই শ্রেণীর হাতেই থাকে একচেটিয়া অস্ত্রশক্তি, বলাধিকার, আইন প্রণয়ন ও আইন রদ করার ক্ষমতা, রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাস্তি বিধানের ক্ষমতা

রূপে উৎপন্ন হয় এবং বেচাকেনা হয়। মজুরির বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষ শ্রম করে। 'শ্রমের সমতা ও মাহিনার সমতা নীতি সমাজতন্ত্রে আক্ষরিক ভাবে পালন করা হয়। শিল্পপ্রধান শহর কর্তৃক কৃষিপ্রধান গ্রামাঞ্চলের শোষণ এবং মানসিক শ্রম কর্তৃক কায়িক শ্রমের শোষণ অবশ্যই অবসান করা হয়। কিন্তু বিরোধ না থাকলেও শহর (শিল্প) এবং গ্রাম (কৃষি), এই উভয়ের মধ্যে মৌলিক ও গৌণ পার্থক্য কিছু কিছু বিদ্যমান থাকে। কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যেও বিরোধ চলে যায় কিন্তু মৌলিক ও গৌণ পার্থক্য কিছু কিছু থেকে যায়।

সোবিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক শ্রেণী যখন ক্ষমতা দখল করে তখন দেশটি ছিল কৃষিপ্রধান। দেশে অসংখ্য মাঝারি, ছোট ও অত্যন্ত ছোট চাষী ছিল। গৃহযুদ্ধে ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপপ্রসূত যুদ্ধে জয়লাভের পর সমাজতন্ত্র গঠনে দুটি সমস্যা লেনিন ও স্তালিনের কাছে গুরুতর রূপে দেখা দিলঃ (১) দ্রুত শিল্পায়নের সমস্যা; (২) কৃষিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমস্যা। এই দ্বিতীয় সমস্যাটিই ছিল অধিকতর জটিল ও কঠিন। জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল বটে কিন্তু অসংখ্য ছোট ও মাঝারি চাষীর চাষকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ভিত্তিতে ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক চাষে পরিণত করা বাস্তব অবস্থার প্রতিকূল ও অসম্ভব ছিল এবং সেরূপ কোনো চেষ্টা করলে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ভেঙে যেত এবং সমগ্র কৃষক-সমাজ শত্রুতে পরিণত হয়ে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যেত। এঙ্গেল্‌স তাঁর জীবিতকালেই সকল মার্কসবাদীকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে যেখানেই বড় একটা কৃষককুল আছে, সেখানেই চাষীকে জমিহারা না করে শ্রমিক শ্রেণীর ও শ্রমিক-রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার সাহায্যের দ্বারা এবং শিক্ষার ও প্রচারের দ্বারা চাষীদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক কৃষি সমবায় গঠন করাই কৃষিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট ও দ্রুততম পথ। লেনিন ও স্তালিন এঙ্গেল্‌সের নির্দিষ্ট পথই গ্রহণ করলেন। "জিনিসের মাধ্যমে কর" এবং "সমবায় সম্বন্ধে" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে লেনিন কৃষিতে সমবায়ের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ ছকে দিলেন। স্তালিনের অসামান্য ও দিগ্বিজয়ী প্রতিভা বিরাট তত্ত্বগত ও কর্মগত সংগ্রাম চালিয়ে এই মহতী পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করে পৃথিবীর ইতিহাসে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্তোই আর একটি যুগান্তর সৃষ্টি করল।

ইত্যাদি। গণতন্ত্র ও 'একনায়কত্বের' মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই। সকলপ্রকার গণতন্ত্রই এক একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব। বুর্জোয়া গণতন্ত্রও বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব, মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ধনিকের স্বপক্ষে তা গণতন্ত্র, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের বিপক্ষে তা একনায়কত্ব। এর সঙ্গে শ্রমিক 'একনায়কত্বের' তুলনা করলে আমরা দেখি যে তা হল গণতন্ত্রের বিপুলতম প্রসার কেননা তা শতকরা নিরানব্বই জন মেহনতি মানুষের স্বপক্ষে গণতন্ত্র এবং শতকরা এক জন শোষকের বিপক্ষে একনায়কত্ব। তাও প্রয়োজন হয় এইজন্য যে ক্ষমতাচ্যুত শোষকগণ আগের চেয়ে দশগুণ উৎসাহের সঙ্গে ক্ষমতা পুনরধিকারের জন্য বিদেশী আক্রমণকারীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে অর্থাৎ গণতন্ত্রবিরোধিতা করে।

ফলে সোবিয়েত ইউনিয়নে দুটি স্বতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক এলাকা সৃষ্ট হয়েছেঃ একটি শিল্পের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সম্পত্তির ভিত্তিতে ও অন্যটি কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ-খামার সম্পত্তির ভিত্তিতে। স্তালিন সোবিয়েত ইউনিয়নে শ্রমশিল্প ও কৃষির মধ্যেকার মূল পার্থক্য সম্বন্ধে লিখেছেনঃ "মুখ্যত এবং প্রধানত পার্থক্য হল এই যে, শ্রমশিল্পে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপন্ন মালের মালিকানা হল জনসাধারণের কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে মালিকানা জনসাধারণের নয়, পক্ষান্তরে সেখানে আছে গোষ্ঠীগত, যৌথখামারের মালিকানা।" (সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, পৃঃ ২১)।

শিল্পের ও কৃষির মধ্যে এই পার্থক্য থাকার ফলে সেখানে শিল্পের ও কৃষির মধ্যে বিনিময় পণ্য-বিনিময় রূপে সাধিত হয়। তাই পণ্যোৎপাদন ও মূল্যসংক্রান্ত নিয়ম সেখানে এখনো চালু রাখতে হয়েছে যদিও মূল্যসংক্রান্ত নিয়ম সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে না।

কায়িক ও মানসিক শ্রমের মূল পার্থক্য হল তাদের মধ্যেকার "সাংস্কৃতিক ও টেকনিক্যাল জ্ঞানের স্তরের পার্থক্য।" (স্তালিন)। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলন, স্তাখানোভাইট আন্দোলন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও টেকনিক্যাল শিক্ষার বিরাট বিস্তার যদিও সোবিয়েত ইউনিয়নে কায়িক শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক ও টেকনিক্যাল স্তর বহু উচ্চে উন্নীত করেছে, তথাপি তাঁদের অধিকাংশ এখনও ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিক্যাল কর্মীদের পর্যায়ে উন্নীত হননি। এই কারণেই আমরা দেখি যে শ্রমবিভাগের শাসনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক একটি মানুষ যেমন এক একটিমাত্র কাজে সারাজীবন বাঁধা পড়ে থাকে, সেই ব্যবস্থার কিছু কিছু জের এখনও সোবিয়েত সমাজে অবশিষ্ট আছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন সম্বন্ধে স্তালিন এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে এর অর্থ হল "শুধু যে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি তাই নয়, পরন্তু ভারী শিল্পের বিকাশ, এবং সর্বোপরি মেশিন নির্মাণ-শিল্পের উন্নতি" (জোসেফ স্তালিন, সংক্ষিপ্ত জীবনী, ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ৯১)। স্তালিন আরও দেখিয়েছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন মেহনতি জনগণের জীবনধারণের মানকে সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ উন্নত করতে বাধ্য। সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস স্তালিনের এই তত্ত্বের যাথার্থ্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে।

মানবমুক্তির দিক্ থেকে দেখলে বিচার করতে হবে যে সোবিয়েত বিকাশসাধন করেছে, পূর্ণ প্রাচুর্যের সংস্থানের দিকে কতটা এগিয়েছে, প্রকৃতির ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠনের ফলে সেখানকার মানুষ উৎপাদন-শক্তির কতটা উপর ও নিজের সামাজিক কর্মের উপর কতটা প্রভুত্ব বিস্তার করতে পেরেছে। এই সকল জয় সম্পন্ন হলেই কেবল সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং মানব পরিপূর্ণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত মুক্তির জগতে অধিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং দেখা যাক্, সাম্যবাদ ও পরিপূর্ণ মানবমুক্তির স্বরূপ কি।

গ। মানবমুক্তি ও সাম্যবাদ

কার্ল মার্কস তাঁর "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা" নামক পুস্তিকাটিতে

সাম্যবাদী সমাজের দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ পূর্ণ সাম্যবাদের লক্ষণ এইভাবে নির্দেশ করেছিলেনঃ

> "সাম্যবাদী সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে, যখন শ্রমবিভাগের অধীনে ব্যক্তির দাসত্ব-মূলক নতিস্বীকার এবং তারই সঙ্গে কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিরোধ অন্তর্হিত হয়েছে, যখন শ্রম জীবনযাত্রার উপায়মাত্র না হয়ে নিজেই জীবনের একটি মৌলিক আবশ্যকতায় পরিণত হয়েছে; যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহিত উৎপাদন শক্তিগুলি বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং সমবায়গত ধনের সকল উৎস অধিকতর প্রাচুর্যের সহিত প্রবাহিত হচ্ছে—এর পরই কেবল বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্ত সম্পূর্ণভাবে পিছনে ফেলে আসা চলতে পারে এবং সমাজ নিজের নিশানে খোদিত করতে পারেঃ প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।"

মার্কসের এই ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সাম্যবাদ ও পূর্ণ মানব-মুক্তির নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখতে পাইঃ

(১) প্রকৃতির নিয়মগুলিকে আয়ত্ত করে ও শাসন করে মানুষ ওই সকল নিয়মকে নিজের ইচ্ছার বশীভূত করতে পারবে ও নিজের কাজে লাগাতে পারবে। এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের স্বরাজ। মানুষ হবে প্রকৃতির দাস নয়, প্রভু।

(২) সামাজিক-অর্থনৈতিক নিয়মগুলিকে আয়ত্ত করে ও শাসন করে মানুষ ওই সকল নিয়মকে নিজের ইচ্ছার বশীভূত করতে পারবে ও নিজের ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারবে। পুঁজিবাদী সমাজে এঙ্গেল্‌সের ভাষায়, মানুষ নিজের সামাজিক কর্মকে শাসন করতে পারে না, মানুষের উৎপন্ন দ্রব্য মানুষের উপর প্রভুত্ব করে। তারই অভিব্যক্তি আমরা দেখি পুঁজিবাদী উৎপাদনের অরাজকতার মধ্যে, পুঁজিবাদী সংকটের মধ্যে। স্তালিন দেখিয়েছেন যে উৎপাদনের উপকরণগুলি জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পর সমাজ কর্তৃক পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন-শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও সুসম বিকাশ সম্ভবপর হয়। এঙ্গেল্‌স এ-সম্পর্কে বলেছেনঃ

> "এই সময় থেকে মানুষ পূর্ণ সচেতনতার সহিত নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই রচনা করবে, এই সময় থেকেই যে সকল সামাজিক কারণ মানুষ কর্তৃক চালু করা হবে, সেগুলির কার্য হবে মুখ্যত এবং ক্রমাগত আরো বেশী বেশী করে মানুষের ইচ্ছাকৃত কার্য। আবশ্যকতার রাজ্য থেকে মুক্তির রাজ্যে মানুষের এটা উল্লম্ফন।" (অ্যান্টি-ডুরিং)।

স্তালিন দেখিয়েছেন যে সমাজতন্ত্রের যে সকল অর্থনৈতিক নিয়ম আছে সেগুলিকে আবিষ্কার করে ও নিজের বশে এনে তবেই মানুষ পরিকল্পিত অর্থনীতির ও উৎপাদন-শক্তির সুসম বিকাশের সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে।[১] এইভাবেই মানুষ এঙ্গেল্‌সের ভাষায় নিজের সামাজিক কর্মের প্রভু হতে পারে এবং নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের শাসন থেকে মুক্ত হতে পারে।

১। স্তালিন, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, পৃঃ ৩১-৩২।

স্তালিন এই শিক্ষা দিয়েছেন যে মানুষ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়মকে রদ করতে পারে না বা রূপান্তরিত করতে পারে না। এই সকল নিয়মকে জেনে ও মেনে, তাদের কর্মপরিধিকে সংকুচিত করে এবং ওইগুলিকে নিজের কাজে লাগিয়েই মানুষ নিয়মগুলির উপর প্রভুত্ব করতে পারে। এঙ্গেলসের ভাষায়, আবশ্যিকতার স্বীকৃতিই হল মুক্তি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়মের উপর মানুষের শাসন বহুদূর প্রসারলাভ করলেও অসম্পূর্ণ থাকে। সাম্যবাদী সমাজে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়মের উপর মানুষের পূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেইজন্যই মানুষ লাভ করে পূর্ণ মুক্তি।

(৩) সাম্যবাদী সমাজে মানুষ সমাজগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রত্যেক ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিজের ইচ্ছার দ্বারা চালিত হবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। রাষ্ট্র, আইন-কানুন, ডিসিপ্লিন অর্থাৎ বাধ্যতামূলক নিয়মশৃঙ্খলা সাম্যবাদী সমাজে থাকবে না। প্রতিটি ব্যক্তি কি কাজ করবে, কিভাবে কাজ করবে, কতক্ষণ কাজ করবে, তা হবে সম্পূর্ণভাবে তার নিজের ইচ্ছাধীন। কাজ তখন হবে "জীবনের প্রধান প্রয়োজন"। "কাজ বোঝার পরিবর্তে হবে আনন্দের বিষয়"। (এঙ্গেলস)। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখেছিলেন, "মোদের যেমন খেলা তেমনই যে কাজ জানিস নে কি ভাই।" সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। নিয়ম শৃঙ্খলা লেনিনের ভাষায় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হবে। ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বা 'স্বরাজ' হবে সমাজের স্বাধীনতার অপরিহার্য শর্ত।

(৪) শিল্প ও কৃষির মধ্যে, কায়িক ও মানসিক শ্রমিকের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত যে মূল পার্থক্য স্তালিন দেখিয়েছেন, তা বিলুপ্ত হবে। কিন্তু গৌণ পার্থক্য কিছু কিছু থেকে যাবে।

(৫) শ্রমবিভাগের দাসত্ব বিলুপ্ত হওয়ার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি নানা টেকনিক্যাল বিদ্যায় ও সংস্কৃতিতে পারদর্শী হয়ে নিজের কাজ ইচ্ছামতো বেছে নেওয়ার দরুন এবং কাজ আনন্দে পরিণত হওয়ার দরুন যেহেতু প্রাচুর্যের পূর্ণ সংস্থান হবে তাই তখন টাকাকড়ি, কেনা-বেচা, পণ্যোৎপাদন, দাম, পারিশ্রমিক, মজুরি ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। যার যে জিনিস যতটা প্রয়োজন সে সেই জিনিস ততটাই সামাজিক ভাণ্ডার থেকে ইচ্ছামতো পেতে পারবে। বুর্জোয়া অধিকারের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হবে। লেনিনের ভাষায়, মানুষ আর শাইলকের মতো হিসাব করবে না কে কার চেয়ে আধঘণ্টা বেশি খাটল বা কম মজুরি পেল। জনসাধারণের সম্পত্তির পবিত্রতা সকলের কাছেই হবে অলঙ্ঘনীয়। নতুন ধরনের দায়িত্বশীল মানুষ গড়ে উঠবে বলে কেউই আর আকাশের চাঁদ পেতে চাইবে না।

(ক্রমশ)

রৌদ্র-দীপ্ত

মৃণাল চৌধুরী

ভাড়াটে ঠিক হয়ে গেছে।

আগামী মাসের ২রা তারা আসবে। সোমা-দীপেনের খালি করে যাওয়া ঘরখানা পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন। ঘরে তো আছে· গুটিকতক বই আর ছোটখাটো টুকিটাকি। বড় বৌ শেফালীই দায়িত্ব নিল—ওই তো ঝিটিমিটি কতকগুলো। আমরাই সরিয়ে দেবে। কি রে অমু?

সায় জানাল মেজ-বৌ অমিতা।

দুপুরের কাজশেষে শেফালী-অমিতা তালা খুলে ঘরে ঢুকল। বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে ঘরটির শূন্যতায়। স্বভাব-কৌতূহলে যার মুখে হাসি লেগেই থাকে সেই অমিতাও গম্ভীর।

তাক থেকে পঞ্চম কি ষষ্ঠ বইখানা টানতেই শেফালীর হাতে এসে পড়ে তিনখানা হাতে লেখা কাগজ। সুন্দর হস্তাক্ষর সোমার শ্যামলসুন্দর মুখখানা ভাসিয়ে আনে চোখের সামনে। জানলার পাশে আলোয় এসে পড়তে শুরু করে শেফালী...

...কলম হাতে তুলতেই মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের নায়িকার কথা। কোনোদিন স্বামীকে চিঠি লেখবার সুযোগ জোটেনি সে ভদ্র-মহিলার। আমারও তাই। সবমুহূর্তেই তুমি ছিলে পাশে। মত, পণ, কর্ম সব কিছুই এক সুরে গাঁথা। তাই হয়তো আজকের এই দূরত্ব (অবশ্যই বাইরের) এত ব্যথিয়ে তুলছে অন্তর।

যাক্ গে বলছিলাম রবীন্দ্রনাথের নায়িকার কথা। ভদ্রমহিলার চিঠি-লেখার সুযোগ জুটল যখন সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল স্বামীর কাছ থেকে তখন। তুমি ভাবনা করো না তাই বলে। রবীন্দ্রনাথের নায়িকার সঙ্গে মিল পেয়েছি তোমার আমার মধ্যেও, চিঠিলেখার মতো ফাঁক ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের নায়িকার মাত্র তিনটে পয়সার অভাবে কসবা থেকে দেশপ্রিয় পার্কে হেঁটে যেতে হয়নি। আজ দিন সাত হল ঘুরে বেড়াচ্ছি নিত্যবাবুর পেছনে। কোন্ এক গার্লস স্কুলের টিচার করে দেবেন বলেছেন। তাই কসবা থেকে দেশপ্রিয় পার্ক—যাতায়াত।

এক একবার তোমার উপর রাগ হয়। মনে হয় তুমি চলে গেছ নিরাপদ দূরত্বে। এইসব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেয়েছ অনির্দিষ্টকালের জন্য। কিন্তু আমি হাবুডুবু খেয়ে চলেছি।

বাবা কতদিন বাঁচবেন বলা না গেলেও—এ-কথা তোমাকে জানিয়ে দিতে পারি—দেশের যা আবহাওয়া—তুমি ফিরে এসে আর দেখতে পাবে না। মা শুধু ঝগড়া করছেন সকলের সঙ্গে। কারণে অকারণে। ঠাণ্ডা মেজাজের মা-র এখনকার মেজাজ দেখে চিনতেই পারবে না। এ সবকিছুর মূল কারণ?

দুবেলা খাওয়া জুটছে না।

তোমার আমার ঘরটা ভাড়া দেব ঠিক করেছি। কিন্তু ভাড়াটের জন্য একটা রান্নার জায়গা করে দিতে হবে। প্রশ্ন করছ তোমার দাদা দুটি ঘুমিয়ে রয়েছেন কি?

না। ঘুমিয়ে তাঁরা নেই। সজাগ হয়ে নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তুলছেন। অর্থাৎ দায়িত্ব এড়িয়ে সুখ-স্বর্গ খুঁজছেন। এমন কি আয় তাঁদের! এক-সঙ্গে চেষ্টা করলে আর কিছু না হোক—সুস্থ আবহাওয়া থাকে সংসারে। কিন্তু তাঁরা দু'জন যা করছেন!

তোমার মতো সহ্যগুণ আমার নেই। তবু আমি বড়দি মেজদিকে নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছি, নানা কায়দা-কৌশলে। কিন্তু ফল সেই এক। কোথায় যেন মৌলিক ত্রুটি রয়েছে আমাদের। নইলে এমন সহজ কথা—বাঁচবার পথটি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি না কেন?

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি। জবাব পাই—তোমার ক্ষমতাটা আমার নেই। কোলে উঠে বসলেই আপন হওয়া যায় না।

তাই বলে ভেবো না আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। এক একবার ইচ্ছে করে বাড়ির সবগুলো লোককে একখানে বসিয়ে বুঝিয়ে দি—তাদের চিন্তার অসঙ্গতি আর নানা কিছুর কার্যকারণ-সম্পর্ক।

যাক আর তত্ত্ব নয়। আমার চিন্তা-ভাবনাও নয়। কিছু সংবাদ দি এবারে।

সুবীর। তোমার ভাইপো সুবীর।

কলেজে যায় এখনো নামেই। সারাদিন কোথায় থাকে, কি যে করে তার ফিরিস্তি শুনলে তোমার কেমন লাগবে ভাবতে পারছি না। আমার দিশে-হারা লাগে।

কিছুদিন হল শুনছি সে নাকি প্রেমে পড়েছে। আহা বেচারী! কতই আর বয়স। এ ব্যাপারে সবাই দায়ী করছে, তোমাকে-আমাকে। ভালোবেসে বিয়ের রেওয়াজ এ সংসারে তোমার-আমার আমদানি। সুতরাং সুবীরের বিকৃতি আর তোমার-আমার সম্পর্ক বিচারের কষ্টিপাথর এক।

কি করে বোঝাবো বড়দিকে—সমস্ত দেশের বিকৃতির অন্যতম শিকার তার সুবীর! নইলে কিশোর ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র এমন ফলাও করে মেয়ে-বন্ধু নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, না যতো রাজ্যের নোংরা অলিগলিতে যাতায়াত করে!

অধিকাংশ বই পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কিনলেও আমাদের সংগ্রহের মূল্য কম ছিল না। তোমার আমার টিউশনির উপার্জনে কেনা বইগুলো আবার যথাস্থানে ফিরে যাচ্ছিল সুবীরের সাহায্যে। সেদিন ধরলাম হাতে-নাতে। ওর পকেট থেকে বেরুল 'লাইট-হাউসে'র দু'খানা টিকেট। হলিউডের খুব নামওলা এক ছবি দেখবে ও আর ওর সেই মেয়ে বন্ধুটি। ধারকর্জ করে টিকেট কিনেছে। এখন শোধ করতে হবে, সুতরাং...রবীন্দ্রনাথকে যেতে হবে কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বই-এর দোকানে। পয়সার প্রয়োজন হলে ওকে চাইতে বলেছি। যে করে হোক দেব।

তুমি এ-অবস্থায় কি করতে সে কৈফিয়ত না নিয়ে বলছি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

সময় কম। এখুনি বেরুতে হবে। নিত্যবাবুকে ধরে যদি হিল্লে হয়। তীব্র অভাবে চেনা মানুষগুলো, মনের দোসরেরা এমন বদলে গেছে!

থেকে থেকে হৃদয়টা মুচড়ে ওঠে। তুমি নেই পাশে। কত কমজোরী মনে হয় নিজেকে। এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছুবে না জেনেও লিখছি। তোমার কথা ভাবলে মনে জোর পাই।

নতুন খবর শোনো বাংলা মায়ের। কৃষাণ জনতা রুখে দাঁড়িয়েছে। মহানগর কলকাতা'র মজুর-মধ্যবিত্ত-ছাত্র—এরাও সামনের সারিতেই।

রাত দিন কাজ। কর্তব্য। সংসারে তীব্র অভাব। বিকৃতিঘেরা পরিবেশ। শাসকের রক্তচক্ষু। অসহনীয় বোঝাকে ঝেড়ে ফেলবার মরণ-পণ নিয়ে এগিয়ে চলেছি কমরেড। ইতি—

সোমা
নবেম্বর, ১৯৪৮

রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতে গেলেই শেফালীর মনে পড়ে—দীর্ঘশ্মশ্রুসমন্বিত এক ঋষির পবিত্র মুখচ্ছবি। আর ছেলেবেলায় ঘাড় দুলিয়ে মুখস্ত করা কবিতা—

আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।

তাই গল্পগুচ্ছের 'স্ত্রীর পত্র'র নায়িকা তার অজানাঅচেনা। কিন্তু সোমা তো তার জানা-চেনা। চিঠি বুঝতে অসুবিধে হয় না। এমনিই ছিল সে। কি ধাতুতে যে গড়া ছিল! নিজের কথা সবাইকে ছাড়া ভাবতেই পারত না।

মনের অগোচর তো পাপ নেই। শেফালীই পারেনি তার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে। নিজের বিদ্যের আর চরিত্রের সীমাবদ্ধতার জন্যে। সোমা এসেছে সরল হৃদয়ে।

আজ এই মুহূর্তেই সে যেন হৃদয়ের অনেক কাছে মনে হয়।

লড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ওরা। সে লড়াই শেফালীদেরও। কিন্তু মূল্য দেওয়া হয়নি।

কি ওটা বড়দি, কি? কৌতূহলে এগিয়ে আসে অমিতা।

সোমার চিঠি। এই নে—

অমিতা চিঠিখানা টেনে নেয়। শেফালী দ্বিতীয়খানার ভাঁজ খোলে...

সকালে উঠতেই কান্না শুনলাম। বড়দির কান্না। কারণ বুঝে পেলাম না। জিজ্ঞেস করেও জবাব পেলাম না। মেজদিকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি জবাব দিলেন, আনন্দের সঙ্গেই বলা চলে, যদিও গোপন করবার চেষ্টা ছিল!

ভাবতে মনটা বিষিয়ে ওঠে। এমন স্তরেও মানুষ নামতে পারে! পরিবারের এতবড় অসম্মান—পেটের ছেলে নয় বলেই—গায়ে লাগবে না!

আসল খবর শোনো। সুবীর গতরাতে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। মুখুজ্জেদের ছোট বৌ'এর গলা থেকে হার নিতে গিয়ে। এখন হাজতে আছে।

এদিকে অবস্থাটা চিন্তা করো!

করবার কিছুই নেই। হাতের বাইরে মামলা। আগে সুযোগ পেলে হয়তো মুখুজ্জেদের বলে কয়ে অন্য ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু রাতেই হাজতে পাঠিয়েছে। এই নিয়ে তৃতীয় দিন ধরা পড়ল এক বাড়িতেই। আমি জানতাম না। বড়দি জানতেন। বলেননি কিছুই। কেন যে এমন লুকন-ঢাকনের পালা! হয়তো বড়দি ভাবেন অন্য দশজনের মতো তুমি আমিও সুবীরকে 'পচে-যাওয়া সংশোধন-অতীত' ছেলে বলে গণ্য করব!

তুমি হয়তো বলবে সুবীরের অনেকদিন থেকে আনাগোনা এ পথে। দেশের বিকৃত পরিস্থিতিতে এ পথের উৎসাহই পেয়েছে। কিন্তু বড়দির চিন্তাধারা —সুবীর আর ফিরবে না সুস্থজীবনে। একমাত্র ছেলে চোর। আর সে চুরি প্রিয়তমার জন্যে। এ বয়সে প্রিয়তমা জোটানোয় তাকে উস্কেছে তোমার আমার উদাহরণ!

আর এই মনোভাব পুষে চলতে গিয়ে বড়দি আমাকে আর সহ্য করতে পারেন না। আকারে ইঙ্গিতে অনেকদিন থেকেই এর প্রমাণ মিলেছে। ইদানিং আমি তাঁকে কিছু সরলভাবে বললেও বলেন—এই নাকি আমার চালাকি!

বিয়ে হয়ে এসেই তাঁর হাতে-গড়া আদরের ঠাকুর-পোকে পর করে দিয়েছি। এখন তো বাবা মা থেকে সকলেই আমার হাতের মুঠোয়। সুবীর জাহান্নামে যাচ্ছে জেনেও না-জানার ভান করেছি। বিদ্যেবুদ্ধিওলা, পেটে পেটে শয়তানি!

বুঝি বড়দির দুঃসহ অবস্থা। মায়ের প্রাণ। বৃহৎ পৃথিবীকে এড়িয়ে চলা মায়ের প্রাণ!

বাড়ির আবহাওয়া?

সেই পারস্পরিক অবিশ্বাস আর হিংসে প্রবল হয়ে উঠছিল, অভাব বেড়ে ওঠার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। তাকে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে দমাতে পেরেছিলাম—নিত্যবাবুর সাহায্যে গার্লস স্কুলের 'টিচার' হয়ে। কিন্তু এ ঘটনাটি নিয়ে বেগ পেতে হবে।

তোমার কলেজ থেকে চিঠি এসেছে। সঙ্গে 'মনিঅর্ডার'। একমাসের মাইনে দিয়ে তোমাকে চিরতরে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আর তুমি অধ্যাপক নও। শুধু রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি!

আমাদের "স্বাধীন" কমনওয়েলথের প্রতাপে জন-জীবন অতিষ্ঠ! পরপর তিনদিন ছাত্রদের উপর হামলা হয়ে গেল। আইনের 'টেকনিক্যাল' মর্যাদার জন্যে বেশ কিছু সংখ্যক বলি হল।

সংবাদপত্রে জানলাম তোমরা নাকি অনশন করেছ। কারাপ্রাচীরের অন্ধকারে সীমাহীন বর্বরতার বিরুদ্ধে।

পথে ঘাটে জনতা নিত্যনতুন ইতিহাস রচনা করছে। আমি কিন্তু ইতি-

হাসের পেছনে নেই! পারিবারিক শোচনীয় দুর্দিনকে সঙ্গে নিয়েই চলেছি। দু'দিকের লড়াই।

তুমি আমার এ লেখাগুলো পাবে না জেনেও রোজ লিখে যেতে ইচ্ছে করে। তোমাকে ভাবলে মনে জোর পাই, আর আত্মসমালোচনাও হয়।

আমি কিন্তু আর দেশের অন্য দশজনের মতো নই। অনন্যা! একটা কেউকেটা! পথে বেরুলে, ঘরের পাশে যেখানেই হোক পেছনে থাকে কারো কারো সদা-সতর্ক দৃষ্টি। হয়তো কোনো এক সকালে দেখবে তোমার পাশে নিয়ে হাজির করেছে—সসম্মানে। ভাবছি বাড়ির কি হবে!

টিচারির টাকাগুলো বন্ধ হলে উপায় হবে কি?

আজ সারাদিন অসম্ভব খাটুনি গেছে। চোখ টেনে আসছে ঘুমে..."

এরপর বোধহয় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল সোমা। চিঠিখানি অসমাপ্ত। শেফালীর মন ভরে ওঠে দুঃখে। সোমা তাদের জন্যই ভাবত! কি ভুলই না বুঝেছিল তাকে! সকলকে সুখী করবার কতোই না ব্যাকুলতা ছিল তার। যত ভাবে, তত দুঃখ বাড়ে বৈ কমে না!

বাড়িতে একখানা ফটো নেই মেয়েটার।

মুখখানি মনে পড়ে। বধূবরণ করেছিল শেফালীই। মুখের কোণে সেই মধুর হাসি। টানাটানা কাজল-কালো চোখ দুটি। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মেয়েটি। কতভাবেই না নিজেকে সে ছড়িয়ে দিয়েছিল সকলের মধ্যে। বক্রকুটিল স্বার্থবোধ তাকে ঘিরে রাখেনি। তাই না শেফালীর শত দুর্ব্যবহারেও তার ব্যবহার ছিল মধুর।

সুবীর যখন একের পর এক অন্যায় করে চলেছে, সকলে তাকে ঘৃণাই করতে শুরু করল। সংশোধনের চেষ্টা তো দূরের কথা, সুবীরের মা বলে শেফালীও পেয়েছে ঘৃণা। একমাত্র সোমাই সুবীরকে আগলে নিয়েছিল সংশোধনের জন্য। পারেনি। সে দোষ তো তার নয়!

শেফালীর অনুতাপভরা অন্তর ভেবে চলে।

অমন কাজলকালো বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটি পরিশ্রম আর চিন্তায় শেষ দিকে বিবর্ণ কালো হয়ে উঠেছিল। শামলা চামড়া কর্কশ কটাশে হয়েছিল। কত না পরিশ্রম! সইবে কত—স্কুল মাস্টারি। রাতদিন সভা-সমিতি-শোভাযাত্রা-প্রতিবাদ।

শেফালীর দিন কাটে ভারতীয় নারীর অতি প্রাচীন ছন্দে। সোমার কাটত রূঢ় বর্তমানকে নিয়ে। সংঘাত অনিবার্য। আজ যখন সোমা অনুপস্থিত তখন সে জীবন, ভাবতে গিয়ে শেফালীর মাথা নুয়ে আসে দরদে। দু'চোখ ভরে ওঠে জলে। ইচ্ছে করে যে শত্তুরেরা এমন মেয়েকে কেড়েছে তাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়।

দেখি ওখানা? অমিতা হাত বাড়ায়।

শেফালী তৃতীয়খানার ভাঁজ খোলে।...

তখন ভর-সন্ধ্যে।

ঘরেই বসেছিলাম। অন্ধকারে চুপ করে। তোমার কথাই ভাবছিলাম। আমি কিন্তু গিয়েছিলাম, ফিরিয়ে পাঠালেন চারুদিরা। তাই একাকী বসে মনের তারগুলোর ব্যথা-বিদীর্ণ কান্না শুনছিলাম।

দরজার কাছে পদশব্দে উঠে দাঁড়ালাম। আলো জেবলে দেখলাম—সুকোমল। সেই সুন্দর ঝকঝকে কালো টানা স্বপ্নালু চোখওলা সুকোমল! চিন্তায় গম্ভীর, দরদে গভীর। ঝাঁকড়াচুলো তুমি যাকে বলতে জাত-কবি সেই সুকোমল! আজ তাকে আর চেনবার উপায় নেই। কান্না পায় ওর অবস্থা দেখে। খায় কি খায় না ঠিক নেই। কোথায় থাকতে হয় না হয় কোনো নির্দিষ্টতা নেই। শাসকের অন্যায় আদেশ ঝুলছে ওর নামে।

এ সব সত্ত্বেও সে এসেছিল। না এসে পারেনি।

এসে কোনো কথা না বলে চেয়ারটায় বসে থাকল।

কিছু সময় কাটল নিঃশব্দে।

বসো। তোমার খাবার ব্যবস্থা করে আনছি। আমি বললাম।

তবু ও নির্বাক।

খাবার এল। চুপচাপ খেয়ে নিল। ও কি বোবা হয়ে গেছে!

ব্যথায় কবিকেই তো মুখ খুলতে হবে! ভাষা দিতে হবে রুদ্ধ আবেগের! কিন্তু...

পরপর দু'টো বিড়ি টেনে বলল—যাই, তুমি কোনো চিন্তা করো না সোমাদি। আমি সংবাদ পেয়েছি—দীপেনবাবুর কিছু হয়নি। বলেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমার ব্যথা কমিয়ে দিতে কবি মিথ্যে কথা বলে গেছে।

ব্যথাকাতর ও ভুলে গেছে—আজকের প্রভাতী সংবাদপত্রের পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে তোমার নাম—আরো অনেকের সঙ্গে। আর কোনোদিন তুমি সংবাদ ছিলে না জাতীয়বাদী পত্রিকার। কিন্তু আজ যে রক্তের স্বাক্ষরে অন্যদিন।

এমন বীভৎস অন্যায়ের প্রতিবাদে স্তম্ভিত সারাদেশ। থমথমে আবহাওয়া। আগামীকাল প্রতিবাদ-জমায়েত। তার প্রস্তুতিতে কেটেছে সারাদিন। আজকে চারুদিরা বাদ দিতে পারেননি আমাকে, চেষ্টা করেছিলেন। অনেকেই ভুলে যান—তুমি আর আমি পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলেম ২১শে নবেম্বরের প্রতিবাদমুখর গুলি-বেঁধা ধর্মতলার মোড়ে!...

এই পর্যন্ত পড়ে শেফালী চিঠিখানা অমিতার হাতে দেয়।—নে তুই পড়। জোরে জোরে পড়।

অশ্রুভারাতুর শেফালীর কণ্ঠ। আজ তারা ঘর খালি করছে—ভাড়াটের জন্যে। বছর তিনেক আগে এক সন্ধ্যায় জেলের অন্ধকারে গুলিতে হুমড়ি খেয়ে মরল দীপেন। আর তার প্রতিবাদে দুদিন পর কলকাতার পথে সোমা।

ঘর তো খালি হয়ে গেছে সেদিনই।—ঠিক সর্বনাশের আগের দিন হতভাগিনী এখানা লিখেছিল।

অমিতা চিঠির বাকি অংশ পড়তে শুরু করে—

তুমি নেই! কথাটা ভাবতে বেদনাতুর হয়ে ওঠে মনটা। সহ্য করতে ইচ্ছে হয় না। এ সব কথা তুলে তোমাকে ছোট করতে চাই না। মানুষকে ভালো-বেসেছিলে। ভালোবেসেছিলে শ্যামল বাঙলা দেশকে আর তার এক 'শামলা' মেয়েকে। তাই না জীবনের অসহনীয় শত্রুর বিরুদ্ধে ফেটে পড়লে—প্রাণের ঝড়ে। তোমার এ ভালোবাসার মর্যাদা আমি রাখবই, কমরেড।...



ভ্রম সংশোধন

গত নববর্ষ (বৈশাখ, ১৩৬০) সংখ্যায় কয়েকটি গুরুতর মুদ্রাকরপ্রমাদ ঘটেছে।

(১) 'বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা' প্রবন্ধের ৩২৫ পৃষ্ঠায় ২৮-২৯ লাইনে 'অতি-শ্রদ্ধেয় সমালোচক'-এর পরিবর্তে হবে 'অতি-শ্রদ্ধায় সমালোচক'।

(২) ৩২৬ ও ৩২৭-এর পাতাদুটি ওলটপালট হয়ে গেছে, অর্থাৎ ৩২৬-এর পাতা হবে ৩২৭-এর পাতা এবং ৩২৭-এর পাতা হবে ৩২৬-এর পাতা।

(৩) রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈপরীত্য' প্রবন্ধের ২৮০ পৃষ্ঠায় ১৩-র লাইনে 'সেই মহান বলিষ্ঠ ঘোষণা'-র পরে এই ক'টি লাইন বাদ গেছে ঃ

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।"
'অচলায়তন' নাটকের নিম্নলিখিত সংলাপটি লক্ষ্য করুন ঃ....

এবং (৪) ২৩৮ পৃষ্ঠায় ২৪ লাইনে 'কর্মবৃত্তি' স্থলে 'কর্মবৃত্তি' হবে।

আমরা এই ভুলগুলির জন্য অত্যন্ত দুঃখিত।

বঙ্কিম-সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

গোপাল হালদার

বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনার চক্রে যোগদান করতে চাই। যোগদান করতে চাই বাঙালী পাঠক হিসাবে, 'পরিচয়'-এর সম্পাদক হিসাবে নয়। অর্থাৎ এটি আমার নিজের কথা, সম্পাদক-মণ্ডলীর মত হতেও পারে, না হতেও পারে। লেখকের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সম্পাদক যেমন নিজের বলে স্বীকার করবেন না, তেমনি আলোচনার নামে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতেও সম্পাদক বর্তমান লেখককে কোনো সুযোগ দেবেন না। অলমতিবিস্তারেণ।

অলমতিবিস্তারেণ, অর্থাৎ Brevity is the soul of wit; মিতভাষিতই সুভাষিত—বিশেষত 'পরিচয়'-এর পরিসরে। তাই ভূমিকায় বলে নিতে চাই কয়েকটি কথা—সাধারণ সদিচ্ছাসম্পন্ন পাঠক আমার বক্তব্যকে কি দৃষ্টিতে বিচার করবেন, তা। এ-কথা বেশ জানি, অন্য পাঠকও আছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সাধারণদের জন্যই লিখি সর্বাগ্রে এই ভূমিকাঃ (১) আমার বক্তব্য এখনো আমার চূড়ান্ত বিচার নয়, সজ্ঞান জিজ্ঞাসা। (২) রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়দের সঙ্গে এ-জিজ্ঞাসায় আমার মনান্তর সুদৃঢ়; অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর সঙ্গেও আমার মতান্তর সুস্পষ্ট। যদি তা পাঠকদের নিকট পরিষ্কার না হয় সে আমার লেখার দোষে।

এবার পটভূমিকাও বলে নিইঃ বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা ঊনবিংশ শতকের বাঙালী (সামান্যাংশে সর্বভারতীয়) সমাজ-সমস্যার বিচারের সঙ্গে জড়িত। বাঙলা দেশের ও ঊনবিংশ শতকের সম্বন্ধে বিচার শেষ হয়নি। আমার বিবেচনা অন্যত্র বলেছি। সংক্ষেপেঃ যুগটা ঔপনিবেশিক সমাজের যুগ—জীবনে-চিন্তায় স্ববিরোধ তার প্রায় প্রত্যেকটি ধারায়। এ-শতকের কোনো একটি বড় প্রয়াসকে শতকরা শত-মাত্রায় প্রগতি-সম্পন্ন বলা সম্ভব নয়, এবং প্রায়ই কোনো একটি বড় প্রয়াসকে একেবারে শতকরা শত-মাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল বলা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য এমন মানুষ দু'একজন আছেন যাঁরা, আমার বিবেচনায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ প্রগতিশীল—যেমন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত (দু'জনেই আমার বিবেচনায়, সাহিত্য-শিল্পী নন, প্রবন্ধ-সাহিত্যিক, গদ্যের স্রষ্টা)। এঁদের তুলনায় কোনো কোনো দিকে রামমোহনও খাটো হয়ে যান—যদিও তিনিই 'যুগ-প্রবর্তক'। অন্যদিকে এমন মানুষও ছিলেন যাঁরা শতকরা নব্বই ভাগই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। বঙ্কিমকেও 'উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায়' বলে সেদিনে যাঁরা হিন্দুসমাজ-নাশী মনে করতেন, তাঁরাও সংখ্যায় তো কম ছিলেন না। তবু **মোটের উপর** ঊনবিংশ শতকের বাঙালী জীবন ছিল প্রগতিরই দিকে গতিশীল: ঊনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যও ছিল **মোটের উপর** স্বাধীনতাবাদী, অল্পাধিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী (মুখে ও মনে); কিন্তু সে পরিমাণে গণতান্ত্রিক নয়, সে পরিমাণে ভারতীয় সামন্তরাদবিরোধীও নয়। গণতন্ত্রবাদী তেমন নয়, তার কারণ সাহিত্যস্রষ্টাদের

সামাজিক পিছুটান। ভদ্রলোকের টিকি বাঁধা তখনো সাম্রাজ্যবাদের জুতোয়, জমিদারিতন্ত্রে ও চাকুরিতে। চাকুরের সাহিত্য অল্পাধিক চাকরের সাহিত্য। সেই কারণেই সম্পূর্ণ পরিমাণে তা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীও নয়। যেহেতু ব্রিটিশ-শাসন তখন দণ্ডধারী (প্রেস-অ্যাক্ট না মেনে কি এখনো উপায় আছে?)। তাই কমলাকান্তের মতোই ধোঁয়ার ছল করে কাঁদতে হত, এটি স্মরণীয়। আবার এই ব্রিটিশ-শাসনও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে নগ্নরূপে প্রতিক্রিয়াশীল বলে তখনকার স্বাধীনতাকামীদের সাধারণ চোখে ধরা পড়েনি। তাই দেখি অমন বিদ্যাসাগর সিপাহী-বিদ্রোহের দিনে সিপাহীদের সামন্তবাদী সংস্কারের ভয়ে রাত জেগে সংস্কৃত কলেজ পাহারা দেন, বৃদ্ধ-বিপ্লবী রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে হেড্ মাস্টারি করতে করতে চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন—সিপাহীরা নতুন শিক্ষাদীক্ষা সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে। হরিশ মুখুজ্জের মতো লোকই কি সমর্থন করেছেন সিপাহীদের? তাই সেদিনের কোনো একটি বাঙালীর মুখেও সিপাহী-বিদ্রোহের প্রকাশ্য-সমর্থন পাই না ('হুতোম'-এর বক্রোক্তি সুবিদিত)। এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহের স্পষ্ট উল্লেখ না করলেও নিশ্চয়ই ছিলেন স্বাধীনতাকামী; সিপাহী-বিদ্রোহে আস্থাশীল নয়, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে অনেক বিষয়েই বিদ্রোহী (কোনো কোনো বিষয়ে অবশ্য ইংরেজের মুখাপেক্ষী ছিলেন কোনো কোনো ব্রাহ্ম)। অপ্রাসঙ্গিক না হলেও সিপাহী-বিদ্রোহ এখানে আলোচ্য নয়, তার স্ববিরোধিতাও স্পষ্ট। তা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যতটা, ততটা সামন্ততন্ত্র-বিরোধী নয়। আর আমার নিজের জিজ্ঞাস্যঃ উত্তর ভারতে যদিও তা জন-বিদ্রোহ ছিল, বাঙলার জনগণের কোনো অংশকে সিপাহীরা স্পর্শ করতে পেরেছিল কি? অবশ্য এ প্রসঙ্গে এখানে অলমতিবিস্তারেণ।

ঊনবিংশ শতকের এই স্ববিরোধী বাঙালী সমাজ ও বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজের মধ্যে বঙ্কিম কতটা ছিলেন প্রগতিপন্থী, কতটা প্রতিক্রিয়াশীল? তা-ই জিজ্ঞাস্য। কিন্তু তার আগে আর একটু কথা স্থির করা প্রয়োজন—বিচারের পদ্ধতিটা কি? আমার বিবেচনায়, প্রধান প্রধান ধারা হল এই (আরও অপ্রধান ধারা আছে, অনু-ধারা আছে)ঃ (১) সাহিত্য-বিচার ও আর্থিক-রাষ্ট্রিক বিচার এক জিনিস নয়, পরস্পর সম্পৃক্ত জিনিস। (২) আর্থিক অবস্থা হল base বা মূলগত এবং সাহিত্যবস্তু হল শিরঃস্থানীয় (সুপারস্ট্রাক্চার)। স্তালিন-উদ্ধৃতি না দিলেও বোধহয় এটা স্বীকার্য। (৩) তাই আর্থিক অবস্থারই অনুযায়ী শিরঃস্থানীয় সৃষ্টি হয়, কিন্তু তা শুধুমাত্র অবস্থার নিছক প্রতিফলন বা ফটোগ্রাফ্ নয়। অর্থাৎ মূলগত বস্তুর সঙ্গে শিরঃস্থানীয় বস্তুর সম্পর্কটা জটিল, অনেক সময়েই দুর্লক্ষ্য। এমন কি, যথার্থ সৃষ্টিতে সেই তত্ত্ব থাকে গুপ্ত। এ-বিষয়েও এঙ্গেল্স-এর উদ্ধৃতি দেওয়া চলে। শিরঃস্থানীয় বস্তুবিচারে তাই তো এত শিরঃপীড়া। বিচারে যান্ত্রিকতা (মেকানিস্টিক্), হাস্যকর, ক্ষতিকর। (৪) শিরঃস্থানীয় সর্ববস্তুই সমান দুর্লক্ষ্য নয়। আইন-কানুন, সামাজিক প্রথা-নিয়ম তদ্গতি (অবজেকটিভ্)-প্রধান বলে যত সহজে যাচাই করা যায়, দর্শন, সাহিত্য-শিল্প মদ্গতি-প্রধান (সাব্জেক্টিভ্) বলে তত সহজে যাচাই করা যায় না। তা বহুবিচার সাপেক্ষ। (ক) সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন

রূপ-ধারার বিচারেও দেখি কোনোটির বিচার সহজ, কোনোটির সহজতর, আবার কোনোটির বিশেষ অনুসন্ধেয়, দুর্লক্ষ্য। প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিচার সহজ, স্যাটায়ার বা বিদ্রূপের বিচার সহজতর। অথচ কথাকাব্য ও কথাসাহিত্যের বিচার তত সহজ নয় (নাটকে বাস্তবতা কিন্তু সহজ প্রত্যক্ষ), গীতি-কবিতায় ও গানে এ-বিচার প্রায়ই সুকঠিন। (খ) বাঙলা দেশের ঔপনিবেশিক জীবনের আত্মদ্বন্দ্ব সেখানেও প্রতিফলিত হচ্ছে, তা স্মরণীয়। অনুসন্ধেয় তাই, কোথায় হচ্ছে ও কতটা। যা সহজে চোখে পড়ে (যেমন, সাম্প্রদায়িকতা বা ইংরেজপ্রীতি বলে) তা-ও আবার মর্মত অন্যরূপ হতে পারে—সর্বত্র নয়। বিশিষ্ট বস্তু বিষয়ে, এ-সত্য মনে না রাখলে বিচারও সত্য হবে না। বিচার-সংকটে উক্ত পদ্ধতির সঙ্গে আরও যোগ করা যায়ঃ (৫) উক্ত কারণে, এক-একটা যুগ-বিচার (যেমন, ঊনবিংশ শতক) যতটা সুসাধ্য, এক-একটি সাহিত্যিক (যেমন, বঙ্কিম)-বিচার ততটাই কঠিন হওয়া অসম্ভব নয়। আর এক-একটি রচনার বিচার মূল্যহীন না হলেও তা থেকে সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক। (৬) অতএব, বিশেষ একজন সাহিত্যিকের বিচারকালে (ক) তাঁর সামগ্রিক রচনা সমগ্রভাবে বিচার করা শ্রেয়; (খ) তাঁর পরিচয়-সূচক প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা সে পক্ষে সর্বাধিক গুরুতর (তাতেও স্ববিরোধিতা থাকতে পারে); (গ) তাঁর রচনা **পাঠক-সাধারণের** মনে তাঁর কালে কি ছায়াপাত করেছে এবং এখনই বা কি ছায়াপাত করে—এ-সবই অনুধাবনীয়। নইলে বিশেষ বিশেষ উক্তি-উদ্ধৃতি বিচার নয়, সে তো ওকালতির মারপ্যাঁচ। (৭) আর একটা কথা গোড়াতেই যেন বুঝে রাখি—"সাহিত্য-বিচারে সাহিত্য বিচার করছি, না, মানুষ ও তার মতামতের বিচার করছি? তাহলে সহজেই রায় দেওয়া যায় বঙ্কিমের ক্ষেত্রে—বঙ্কিম ডিপুটিবাবু, ব্রাহ্মণের সন্তান, অতএব ব্রিটিশের বান্দা, সামন্ততন্ত্রের স্তম্ভ। ঠিকই, কিন্তু তা বঙ্কিম-সাহিত্য বিচার নয়, ভাল্‌গার মার্কসবাদ মাত্র। পদ্ধতির ফিরিস্তি বাড়ানো চলে, কিন্তু তা থাক্।

এবার বঙ্কিম-আলোচনার সাম্প্রতিক পূর্বকথা একটু স্মরণীয়। ঊনবিংশ শতক ও সে-প্রসঙ্গে বঙ্কিমকে নিয়ে মোটামুটি এ-কয়টি আলোচনা আমার বিবেচ্যঃ 'মার্কস্‌বাদী'তে রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ; 'পরিচয়'-এ অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ; 'পরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের আলোচনা; 'সাহিত্য-পত্রে' (মাঘ, ১৩৫৯) ভবানী সেনের "ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শগত সংগ্রাম" এবং 'সাহিত্যপত্রে' পতঞ্জলি রায়ের 'আনন্দমঠ'-এর তথ্যগত বিচার (শেষ লেখাটি সাহিত্যগত বিচারও কিনা, বেজ্-সুপারস্ট্রাক্‌চার সম্পর্কের বিচার কিনা, লেখক তা স্পষ্ট করে বলেননি। তাঁর তথ্য অবশ্য সর্বাংশে স্বীকৃত)। আমার বিবেচনায়, এখানে মোটামুটি দুটি দিক দেখছিঃ নীরেন্দ্র-পক্ষ এবং ভবানী-পক্ষ। ভবানী-পক্ষে শেষ লেখককে ধরব কিনা জানি না, কিন্তু ধরব 'মার্কস্‌বাদী'র রবীন্দ্র গুপ্ত ও 'পরিচয়'-এর রবীন্দ্রনাথ গুপ্তকে। রবীন্দ্র গুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ গুপ্তে তফাত বাস্তবত কী জানি না, কিন্তু বাহ্যত 'নাথ'-এর এবং অন্তরের দিক থেকে ১৯৪৮ ও ১৯৫২-এর। একজন উদ্ধৃত করছেন কার্ল মার্কস (তা কে না করে?)ঃ "Revolutionary in relation to Conservative, Conservative in relation to Revolutionists." ('পরিচয়', বৈশাখ,

১৩৬০)। অন্যজন নিজের ভাষায় বলছেনঃ "বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন রক্ষণশীলদের মধ্যে উদারপন্থী, কিন্তু উদারপন্থীদের মধ্যে রক্ষণশীল।" ('সাহিত্যপত্র', মাঘ, ১৩৫৯)—এটি শুধুমাত্র মেকলের স্টিলের বিষয়ক উক্তির প্রতিধ্বনি নয়; হয়তো স-নাথ রবীন্দ্র (গুপ্ত) ১৯৫২ সালে আর ১৯৪৮ সালের অ-নাথ রবীন্দ্র (গুপ্ত)' মহাশয়ের মতো রবীন্দ্র (নাথ ঠাকুরকে) নস্যাৎ করবেন না; নিশ্চয়ই মানবেন ঊনবিংশ শতকে বাঙলা দেশে 'কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লব' প্রারব্ধ ও সম্পূর্ণ হয়ে যায়নি, এবং তাই ঊনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্য (রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব, 'নীলদর্পণ' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বাদ দিলে) শ্রমিক বিপ্লবের সম্মুখীন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াত্মক প্রতিলিপিমাত্র নয়। সে-যুগে (এবং এ-যুগেও) বুর্জোয়া বিপ্লব সুসম্পন্ন হয়নি, এবং ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যে ও সমাজে তাই ছিল আত্মদ্বন্দ্ব, ছিল তা বঙ্কিমে, ছিল তা দীনবন্ধুতেও (?)। কিন্তু উভয়েরই আসল বিচারপদ্ধতি এক—বঙ্কিম যখন প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল মতামত পোষণ করতেন, বঙ্কিম-সাহিত্যও তখন উক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধারার প্রতিফলনমাত্র না হয়ে যায় না। বর্ষবৃদ্ধিতে এই জীবিত রবীন্দ্রদের যা কিছু মতান্তর তা ঘটেছে, ঘটেনি মনান্তর।

এ-মনের সঙ্গে আমার মনের মিল নেই, মতেরও নেই; কারণ, আমার বিবেচনায়, এ-মন হচ্ছে মেকানিস্টিক্, আর এ-মত ডগ্‌মা। এ-প্রসঙ্গেই বলে নিই—নীরেন্দ্র-পক্ষের সঙ্গে আমার মনের মিল আছে, কিন্তু মতের ক্ষেত্রে আছে মাত্রার বেশ কিছু পার্থক্য।

আমি কি চোখে বাঙলা সাহিত্যের ঊনবিংশ শতক দেখি, তা উপরে যত সংক্ষেপে সম্ভব বলেছি। আমি কি পদ্ধতিতে বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা করি, তা-ও উপরে লিখেছি। এর পরে বিশদ করে বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা—এই পরিসরে —অনেকটা অসম্ভব, কতকটা অনাবশ্যক। তবু সূত্রাকারে তা বলছি, তাতে ভবানী-পক্ষের সঙ্গে আমার মনের গরমিল বোঝা যাবেঃ (১) বঙ্কিম-সাহিত্য বিচারে কে প্রধান, কে অপ্রধান? প্রবন্ধকার বঙ্কিম, না সাহিত্য-স্রষ্টা ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিম? প্রবন্ধকারের মধ্যেও আবার 'সাম্য', 'বাঙ্গলার কৃষক', 'কৃষ্ণ-চরিত্র', 'মুচিরাম গুড়', 'অনুশীলনতত্ত্ব', 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতির স্রষ্টা বঙ্কিমও আছেন, এবং 'প্রচার'-এর লেখক (তখন অক্ষয়কুমার সরকারও ছিলেন তাঁর সহযোগী), বিধবাবিবাহ-বিরোধী, প্রেস-অ্যাক্‌ট-জমিদারতন্ত্রের সমর্থনে প্রবন্ধকার বঙ্কিমও আছেন। যিনি আগে তিনিই প্রধান? না, যিনি পরবর্তী তিনিই প্রধান? বঙ্কিম কি আগে মরলে বেঁচে যেতেন? (মৃত্যু দুজনার মাঝখানে এসে দাঁড়ালে আমরা অন্তত বেঁচে যেতাম। কত সুবিধা ও কত অসুবিধাও না হত দু'পক্ষের এদিকে!)।

এ-সব প্রশ্নে আমার একটি মানদণ্ড—সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতিরঃ সামাজিক অবস্থা সাহিত্য-সৃষ্টিতে কি পরিমাণে, কি পথে প্রতিফলিত হয় ও এ-ক্ষেত্রে বঙ্কিম-সাহিত্যে ঔপনিবেশিক যুগের ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে কী হয়েছে। দ্বিতীয় মানদণ্ডঃ পাঠক-সাধারণের জীবনের ও চেতনার সাক্ষ্য। অর্থাৎ, কোন্ বিশেষ প্রভাব পাঠক-সাধারণের মনে পড়েছে? ডিপুটিবাবু ও উপন্যাস-স্রষ্টায় একেবারে সর্বাংশে তফাত না করেও বলতে পারি, বঙ্কিমের

উপন্যাসই এখানে প্রধান বিচার্য, প্রবন্ধ ও মতামত গৌণ। কে আজ ততটা মনে রাখে 'অনুশীলন', 'কৃষ্ণ-চরিত্র', 'সাম্য' ও 'বাঙ্গলার কৃষক'-এর বঙ্কিমকে? সবাই মনে রাখে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে। নইলে তো একথাও মনে করতে পারিঃ শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বঙ্কিম বাঁকা কেন?' ('ধর্মতত্ত্ব' ও 'অনুশীলন'-এর ধর্ম-ব্যাখ্যা রামকৃষ্ণের বিচারে 'বাঁকা')। বঙ্কিম উত্তর দেন, 'জুতোর চোটে'। এ কোন্ জুতো? ১৯৪৭-এও যে মাথা থেকে নামেনি, আর 'ডিপুটি বঙ্কিম' যা তখনকার মতো সাগ্রহে বহন করে বেড়িয়েছেন। আবার, সাহিত্য-স্রষ্টা বঙ্কিমেরও সমগ্র উপন্যাসই ('কমলাকান্ত' শুদ্ধ), আমার বিবেচনায়, প্রধান; এবং তার মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় ('আনন্দমঠ' শুদ্ধ, যদিও 'আনন্দমঠ' সাহিত্য হিসাবে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়) উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহই গ্রাহ্য। এবং বঙ্কিমের প্রভাব কি রূপে পড়েছে বাঙালী সমাজে, সাহিত্যে, তা বিচার্য এদের বিচারের সঙ্গে। বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টির ফল সংক্ষেপেঃ শতকরা ৫৪ জন বাঙালী, মুসলমান বাঙালী, তাতে ক্ষুব্ধ। এ-ক্ষোভ কতকটা তাঁদের প্রীতিবশত হতে পারে (যা কাজী আব্দুল ওদুদ চমৎকাররূপে বিশ্লেষণ করেছেন), কিন্তু এ একটা বাস্তব সত্য, বৃহৎ সত্য, স্মরণীয় সত্য। বঙ্কিম তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদের সর্বস্বীকৃত স্রষ্টা নন (যেমন স্রষ্টা নজরুল)। তিনি তাঁর সৃষ্টিদ্বারা বাঙালী জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছেন প্রেরণা জুগিয়ে, খর্বিত করেছেন মুসলমান বাঙালীকে প্রতিক্রিয়াশীলদের দিকে ঠেলে দিয়ে। এ-মত যদি নীরেন্দ্র-পক্ষ গ্রহণ না করেন তবে আমি নীরেন্দ্র-পক্ষীয় নই।

এই সঙ্গে এ-সত্যটাও আমি জানি—(ক) সংখ্যাধিক পাঠকের সাক্ষ্যই সাহিত্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়; (খ) মুসলমান পাঠক একটু অবিচারও করেন বঙ্কিমের প্রতি: (গ) উপন্যাসের বঙ্কিম ইতিহাসে যে হিন্দু বনাম মুসলমানের সংগ্রাম দেখেন তা ইতিহাসে তো একেবারে মিথ্যা নয়; কিন্তু তথাপি অনেকাংশেই তা আসলে শাসক-শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে আক্রান্ত বনাম আক্রমণকারীর, অত্যাচারী প্রবল বনাম অত্যাচারিত সমসাময়িক দুর্বলের সংগ্রামের প্রতিলিপি —ধোঁয়ার ছল করে কাঁদা। 'আনন্দমঠ'-এর উপর ইংরেজ অকারণে তখন চটেনি। কিন্তু তাই সব নয়—সে ধোঁয়া যে হিন্দু-মুসলমান দুয়েরও চোখে যায়; সে ধুলো যে ইংরেজের চোখে যত না পড়ে তার চেয়ে বেশি পড়ে হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর চোখে। ১৯০৫ পর্যন্ত কেন, 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'রাজসিংহ', হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' হতে এ-ভাবেই আমরা নিজেদের মনের উদ্দেশ্যকে মুখের কথায় ব্যর্থ করেছি বার বার—বিংশ শতকের রঙ্গমঞ্চেও। (ঘ) ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত তথাপি বঙ্কিমের প্রভাব মুখ্যত সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে, বাঙালীর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে কার্যকর ছিল। তারপরে এ-কথা ক্রমশই অসম্ভব হয়ে গিয়েছে। (ঙ) এ-প্রসঙ্গেই একটি প্রধান কথা বোঝবার মতোঃ ঔপনিবেশিক বাঙালী সমাজে স্বাজাত্যবোধ যখন জাগল তখন (রঙ্গলালের সময় থেকে) তা ইতিহাসে খোঁজে মাল-মশলা। দুর্ভাগ্যক্রমে, বঙ্কিমের কাল পর্যন্ত ভারতের জন-ইতিহাস অজ্ঞাত ও অকল্পনীয় ছিল; জানা ছিল মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান

শাসকবর্গের দ্বন্দ্বের ইতিহাসই। বঙ্কিম সেই মধ্যযুগের মধ্য থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন জাতীয় আত্মমর্যাদার ও জাতীয় আত্মবিকাশের নতুন বস্তু। তাতে ভুল ছিল অনিবার্য—কারণ, মধ্যযুগের (শাসক-বিধৃত) ইতিহাসই যে 'ট্রু নেশন' নামক মিথ্যা তত্ত্বের পরিপোষক। (চ) সেই ঔপনিবেশিক স্বাজাত্য-বোধ বঙ্কিমের আত্মমর্যাদা-বোধকে এর পরে আরও তাড়িত করে বিজয়ী ইংরেজের বিরুদ্ধে (রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিবর্তে) বিজিত (হিন্দু) ভারতের ও বাঙালী (হিন্দু) সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনায় প্রবৃত্ত করে। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে ও উপন্যাসের তলায় এই জাতীয় মর্যাদা দ্বারা সংক্ষুব্ধ মন কি দেখা যায় না? সেই জাতীয় মর্যাদা-বোধ (বেশে যা হিন্দু জাতীয় মর্যাদা-বোধ) তাঁকে বিজেতার সাংস্কৃতিক জয়ের বিরুদ্ধে (তিনি যদিও বুর্জোয়া বিজ্ঞান ও যুক্তি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন) তাড়িত করেছে আরও বিপথে—জাতীয় সংকীর্ণতায়, যা দেখা দিল তাঁর হিন্দু-সামন্ততন্ত্রের ভাবাদর্শ আঁকড়িয়ে ধরায়। কিন্তু এখানেও বঙ্কিমের ভ্রান্তির শেষ নয়। আত্মভ্রষ্টতাই আবার বারে বারে শিল্পী বঙ্কিমের, স্রষ্টা বঙ্কিমের কলম চেপে ধরে তাঁকে বাধ্য করেছে আপন চরিত্র-পরিকল্পনা ব্যাহত করতে, ব্যাহত করতে আপনার স্রষ্টাসত্তাকে—উপন্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে হাস্যকর করে তুলতেও। এই কথা (ঙ) ও (চ) নীরেন্দ্র-পক্ষ বা ভবানী-পক্ষ স্বীকার করবেন কিনা জানি না।

কিন্তু আসল কথা বঙ্কিমের উপন্যাস—সমগ্র উপন্যাস (আখ্যানের গলদ পূর্বে দেখেছি)। তার মধ্যে আসল কথা, দুটি প্রধান বুর্জোয়া সত্য তাঁর উপন্যাসে অনির্বাণ—তিনি মানুষের সামন্ত-সামাজিক বন্ধন ছেদন করে তাকে ব্যক্তিসত্তার বেদীতে দাঁড় করিয়েছেন। এর দুটি দিকঃ (ক) নর ও নারী দুইই ব্যক্তিসত্তায় মহীয়ান হয়ে উঠেছে। এর আগে বাঙলা সাহিত্যে চরিত্র-সৃষ্টি ছিল সামান্য, কবিকঙ্কণে, 'অন্নদামঙ্গলে'। দীনবন্ধুতে তার বোধ সীমাবদ্ধ হলেও প্রখর। কিন্তু ব্যক্তিসত্তার যথার্থ উপলব্ধি বঙ্কিমেই প্রথম, আর বঙ্কিমের প্রেরণায় বাঙলা সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাঁর পরে তা অনিবার্য। (খ) মানুষ ও জীবন দ্বন্দ্বময়, মানুষ একরঙা ছবি নয়, মানুষের জীবন একটানা বয়ে যায় না—নগেন্দ্রনাথ নিজের একনিষ্ঠতা হারান, গোবিন্দলাল রূপের মোহে গুণ ত্যাগ করেন। ভ্রমর আধুনিক মর্যাদাময়ী নারী, সূর্যমুখী আধুনিক পতিপ্রাণা নারী। আর কুন্দ ও রোহিণীও নিজেদের সঁপে দেয় পরপুরুষের প্রেমে। দিবেই তো, মানুষ তারা। শুধু কি তাই, আপন প্রকৃতি ও ঘটনার দ্বন্দ্বে কুন্দ আত্মহত্যা করে, আর সেই দ্বন্দ্বে প্রথম পাতার রোহিণীর ভিতর থেকে অনতি-বিলম্বে বেরিয়ে আসে ব্যাপিকা রোহিণী; সে হয়ে দাঁড়ায় শেষ পাতায় স্বৈরিণী রোহিণী। হবেই তো, বিধবা হলেও সব মানুষ এক নয়, সর্ব-পরিবেশ এক নয়। ধর্মপত্নীত্ব-স্বীকৃতি ও উপপত্নীত্ব-স্বীকৃতি এক জিনিস নয়। কুন্দ রোহিণী নয়, রোহিণী কুন্দ নয়। সূর্যমুখী ভ্রমর নয়, ভ্রমরও সূর্যমুখী নয়। এক হলে, জীবনের অনেক জঞ্জাল চুকে যেত, মানুষের অনেক বৈচিত্র্য বেশ একমেটে, সরল হয়ে উঠত—মানুষও দ্বন্দ্বময় হত না। এবং মেকানিস্টিক মার্কসবাদের সাহিত্য-বিচারে সুবিধা হত; অথবা ক্রিয়েটিভ্ আর্ট ও ক্রিয়েটিভ্ মার্কসবাদ দুইই অচল হয়ে যেত।

এই বিচারে আমি সম্পূর্ণ নীরেন্দ্র-পক্ষীয়, আর ভবানী-পক্ষীয় নই, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই প্রগতিশীল শিল্পচেতনাও বঙ্কিম বারে বারে বিসর্জন দিয়েছেন মতবাদগ্রস্ত হয়ে, এ-কথাও কিছুমাত্র হাল্কা করা চলবে না। এখানে নীরেন্দ্র-পক্ষ একটু অ্যাপলোজেটিক্, আমি তা নই, আমি এখানে কতকটা ভবানী-পক্ষীয়।

ইচ্ছা থাকলেও বঙ্কিমের প্রধান প্রধান উপন্যাস নিয়ে একে একে বিচার করা এখানে সম্ভব নয়, তা দেখছি। ছোট ছোট কথা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেমন, বঙ্কিমের দৈববলে বিশ্বাস, অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস। বুর্জোয়া সাহিত্যেই কি ওসব একেবারে অজ্ঞাত? উপন্যাসে সেদিন অলৌকিক, ওদিনের 'দৈবঘটনা' (অ্যাকসিডেন্ট) এবং সর্বশেষে এদিনের মনোবিজ্ঞানের আকস্মিক 'ফাল্ পাড়া'। তবু নিশ্চয়ই তা ত্রুটি।

হয়ত আলঙ্কারিক উক্তি, কিন্তু তবু বলব—বঙ্কিম শেক্সপীয়র নন, বঙ্কিম টল্স্টয়ও নন। এ-বিষয়ে আমি নীরেন্দ্র-পক্ষীয় নই। টল্স্টয়ের পাতায় রুশ কৃষক জীবন্ত, বঙ্কিমের উপন্যাস কৃষকবর্জিত।

সংক্ষেপে বঙ্কিম-সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় আমার শেষ কথা বলিঃ এ-বিচারে শেষ কথা নেই—তা বলবেন সচেতন জনসমাজ ও তাঁদের সচেতন সাহিত্য-বিচারকরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে। অন্তত আমার এখনো শেষ কথা নেই, আছে জিজ্ঞাসা।

যে-কথাটিতে তথাপি সমগ্রভাবে দেখলে আমি অনুমোদন পাই, তা মেলে কাজী আব্দুল ওদুদের বঙ্কিম-বিষয়ক চিন্তায়ঃ "নব-বাঙ্গালীত্বের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র"। নব-বাঙালীত্ব সমগ্রভাবে দেখলে নিশ্চয়ই প্রগতিশীল। "কিন্তু সমগ্রভাবে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি মহান বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হবার সামর্থ্য তাঁর (বঙ্কিমের) ছিল না।" (শাশ্বতবঙ্গ, পৃঃ ২৩৮)। নিশ্চয়ই এ তেমনি প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর অক্ষমতা।

কিন্তু এক-কথায় বঙ্কিম কি?—জিজ্ঞাসা করবেন এক-কথার বন্ধুরা। ঊনবিংশ শতকের বাঙলা সম্বন্ধে এক-কথা খাটে না, খাটে না বঙ্কিম সম্বন্ধেও। এরূপ ক্ষেত্রে এক-কথা=ফরমুলা=ডগ্মা।

অলমতিবিস্তারেণ।

স্তালিন: স্মৃতিচিত্র

জাঁ-রিশার ব্লখ

(মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ)

— পূর্বানুবৃত্তি —

সেই জীবন্ত মানুষটিকে আমি যেমন দেখেছি—কাছে থেকে তাঁর প্রকৃত মানবিক সত্তা যেমন প্রত্যক্ষ করেছি সেই কথাই বলার চেষ্টা করছি। বলছি লেখক হিসাবে, রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নয়।

প্রথম দু'বার আমি স্তালিনকে দেখি ১৯৩৪ সালে। একবার তাঁকে দেখি ১লা সেপ্টেম্বর রেড্ স্কোয়ারে যে যুব-উৎসব হয় সেখানে; আর একবার দেখি সোবিয়েত ইউনিয়নের যে দুটি জাতীয় উৎসবের দিন তারই এক দিন—৭ই নভেম্বর। তিনি ছিলেন লেনিনের সমাধিসৌধে, আর আমাদের আসন ছিল অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট মঞ্চে। আনন্দে, যৌবনে, স্ফূর্তিতে উচ্ছল স্তালিনের সেই মূর্তি। পাঁচসালা পরিকল্পনা নিশ্চিতভাবে জয়যুক্ত হবার প্রথম সূচনা দেখা যায় এই ১৯৩৪ সালেই। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ভারি শিল্প গড়ে তোলা; নির্দিষ্ট সময়ের এক বছর আগেই ১৯৩২ সালে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল হাল্কা শিল্পের গোড়াপত্তন করা: নিত্যব্যবহার্য যে-সব দ্রব্য তখনো ভীষণ দুষ্প্রাপ্য সোবিয়েত জনসাধারণের হাতে তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। ১৯৩৪ সালেই এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয় এবং ইতিমধ্যেই তার সুফল ফলতে শুরু করে। প্রাচুর্য দেখা দিল, পণ্যভারে দোকানপাট উঠল ভরে, একটার পর একটা রেশন কার্ড তুলে দেওয়া হতে লাগল, সেই প্রথম ছিটের কাপড় বেরুল সুতাকল থেকে, গার্হস্থ্য তৈজসপত্র বাজারে উঠল।

ঠিক এই সময়েই সোবিয়েত সাহিত্যিকদের প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করা স্থির হয়। সোবিয়েত ইউনিয়নের চারিদিক থেকে ৬০০ সাহিত্যিক তাতে যোগ দেন।

এই সময়েই আবার রাজনৈতিক অপরাধীদের দণ্ডাজ্ঞা মকুব করার পাইকারী হুকুম জারী হয়। একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রকে সম্ভব করে তোলার স্তালিনীয় নীতির তীব্র বিরোধিতা করার জন্য বা পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির বিরুদ্ধে নাশকতায় লিপ্ত থাকার অপরাধে যে-সব নামকরা ব্যক্তিকে পদচ্যুত করে পুলিশের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল, তাদের আবার কাজের সুযোগ দেওয়া হল, দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও দেওয়া হল অনেককে।

১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে সোবিয়েত ইউনিয়ন যেন আশা ও জয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দীর্ঘ সতেরো বছরের সংগ্রাম ও যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পেয়ে যেন ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল এক আলোকের শিখরে উঠে এল সোবিয়েত দেশ। এই বছরের ১লা সেপ্টেম্বর ও ৭ই নভেম্বরের এই দুটি দিনে স্তালিনের এই প্রতিচ্ছবিটুকুই শুধু আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।

কিন্তু শত্রুপক্ষ শুধু অপেক্ষায় ছিল। তার ঘাঁটি বার্লিনে, সোবিয়েত ইউনিয়ন ও বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে আক্রোশে হুমকিতে চেঁচিয়ে সে গলা ফাটিয়ে ফেলছে। এই শত্রুপক্ষের দিকে আছে বাকি দুনিয়ার তারা সকলেই যারা সোবিয়েত শাসনের যে কোনো জয়কেই নিজেদের পরাজয় বলে মনে করে।

তাছাড়া সোবিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরেই ছিল শত্রুর ঘাঁটি। মরিয়া হয়ে যারা সমাজতন্ত্রের দিকে বিপ্লবের জয়যাত্রাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়, পুরানো সমাজের সেই সব অবশিষ্ট অংশ এবং নতুন সমাজেরও কিছু কিছু লোক— তারাও এই শত্রুর দলে।

"মিঃ পিক্‌উকের এত্‌ভেঞ্চার" অবলম্বনে জনৈক সোবিয়েত লেখকের রচনা একটি নাটকের প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখতে গিয়েছি কয়েক সপ্তাহ বাদে। চমৎকার নাটক, আজ পর্যন্ত প্রতি বছরই এর অভিনয় হয়ে আসছে। বাইরে তখন বরফ পড়ছে, ডিসেম্বর মাসের শুরু, শীতকাল। আমার এক ফরাসী বন্ধু বছরখানেক সোবিয়েত ইউনিয়নে বাস করছিলেন। থিয়েটারের বক্সে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীকে দেখে আলাপ করতে গিয়েছিলেন। দুই দৃশ্যের অন্তর্বর্তী সময়ে ফিরে এসে একেবারে হতভম্ব হয়ে চাপা গলায় বললেনঃ "এই কিছুক্ষণ আগে কিরভ খুন হয়েছেন।"

ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে হলে জানা চাই নিহত ব্যক্তিটি কে। নিঃসন্দেহে কিরভ ছিলেন স্তালিনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম, সবচেয়ে নিকট সহকর্মীদেরই একজন। দশ বছর আগে যেমন স্তালিনের নাম বিদেশে কেউ জানত না, তেমনি কিরভের নামও বিদেশে পরিচিত ছিল না। তিনি ছিলেন বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সংগঠকদের অন্যতম, গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী আক্রমণের যুগে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সক্রিয় সামরিক নেতাদের একজন। রুশ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ তারই বিশ্বস্ত প্রতীক কিরভ। বল্‌শেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পরেই যে সব রাজনৈতিক কাজকে সবচেয়ে দায়িত্ব-পূর্ণ বলে গণ্য করা হত, তারই একটি ছিল লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে পার্টি সেক্রেটারির পদঃ এই কাজের ভার ছিল কিরভের।

(এই পদে তাঁর শূন্য স্থান গ্রহণ করেন জ্‌দানভ। ১৯৪১ সালের সেই মর্মান্তিক দিনে জ্‌দানভ এই পদে থেকেই ভরোশিলভের সহযোগিতায় লেনিন-গ্রাদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নিয়ে স্বীয় প্রতিভা ও উদ্যমের বলে সোবিয়েত ইউনিয়নের এই দ্বিতীয় রাজধানীতে হিটলারী আক্রমণ প্রতিহত করেন।)

এই লেনিনগ্রাদকে কেন্দ্র করেই ১৯১৭ সালে বিপ্লবের শক্তি উৎসারিত হয়েছিল। বারো বছর আগে সারা সোবিয়েত ইউনিয়নে শিল্পের ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও এই শহরই ছিল রুশদেশের শ্রমিক শ্রেণীর মর্মস্থল। আততায়ীরা জানত যে, বল্‌শেভিক পার্টির সবচেয়ে প্রতিভাবান নেতাদের অন্যতম কিরভকে খুন করে তারা আসলে সোবিয়েত ইউনিয়ন ও স্তালিনেরই কলজের খুব কাছাকাছি আঘাত হানতে পারবে। কার্যত তারা স্তালিনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মন্ত্রশিষ্যদেরই একজনকে ঘায়েল করতে সমর্থ হয়েছিল।

পনেরো বছর আগে লেনিনের উপর হামলার পরে এই প্রথম আরেকজন

সোবিয়েত রাষ্ট্রনেতার প্রাণনাশের চেষ্টা সফল হল। রিভলভারের এই এক আঘাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আততায়ীরা আক্রমণের জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে ওত পেতে আছে। সোবিয়েত দেশের সদ্যোজাত সুখ সেই একটি আঘাতে যেন চুরমার হয়ে গেল।

পরে সোবিয়েত ইউনিয়নে যে-সব প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক মামলা হয়, যার কথা নিয়ে এত লেখা হয়েছে এবং আরও হচ্ছে, তা যে কী ঘটনাচক্রের ফল সেকথা উল্লিখিত পরিস্থিতি বিচার করলেই বোঝা যাবে। আমি নিজে দেখেছি যে, বহু সোবিয়েত নাগরিকের পক্ষে এই হত্যাকাণ্ড যেন এক ব্যক্তিগত সর্বনাশ, এক ঘোর হতাশার সৃষ্টি করে। উপরন্তু, এই হত্যাকাণ্ড থেকেই শুরু সুদীর্ঘ তদন্তের ইতিহাস। সন্দেহ নাই যে, এরই ফলে শেষ পর্যন্ত সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং তৎসহ আমরা ও সারা দুনিয়া রক্ষা পাই। কারণ, এই তদন্তে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল আবিষ্কৃত হয়; লালফৌজের জনৈক প্রধান সেনাপতি মার্শাল তুকাচেভ্স্কি পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন।

এ বিষয়ে আমেরিকান সাংবাদিক ডুর‍্যান্টি গত যুদ্ধের সময় যা লিখে গিয়েছেন তার উপর আর বেশি কিছু বলার নেই। তাঁর লেখা একটু তুলে দিচ্ছিঃ

> সোবিয়েত দেশে পার্টি ও রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে অযোগ্য ব্যক্তিদের যে অনেক সময় অপসারণ (পার্জ) করা হয়, সেই প্রসঙ্গে সম্প্রতি আলোচনার সময় জনৈক উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্মচারী একদিন অনেক দুঃখে একটা কথা বলেন, আমি তা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তিনি বললেনঃ "সত্যিই, এ বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার; মনে হয় যেন ভয়ানক বোকামি ছাড়া আরকিছু নয়। তবে, ভুলে যাবেন না যে, এঁরা যখন রাশিয়াতে পঞ্চম বাহিনীকে গুলি করে মেরেছেন, তখন ফ্রান্সে আমরা তাদেরই হাতে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছি। এখন দুই দেশের দিকে তাকিয়ে ফলাফল তুলনা করে দেখুন!"

তৃতীয় দর্শনে স্তালিনের চেহারায় যে গভীর পরিবর্তন লক্ষ্য করি তার তাৎপর্য বোঝাবার জন্যই এত সব কথা বলতে হল। কিরভের শব ট্রেড ইউনিয়ন প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য রেল স্টেশন থেকে যে শোকযাত্রা হয় তারই মধ্যে তাঁকে দেখলাম মেট্রোপোল হোটেলে আমার জানালা থেকে। স্তালিন ছিলেন সেই শবযাত্রার পুরোভাগে। জানালায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম লিঅঁ মুশিনাক ও আমি; স্তালিনের চোখেমুখে বেদনার সেই চিহ্ন দেখে উভয়েই বিস্মিত হয়ে গেলাম। তিনি যে শুধু তাঁর প্রিয়তম বন্ধুদেরই একজন হারিয়েছেন শুধু তাই নয়, তাঁর সমস্ত কর্মের ফল, সোবিয়েত ইউনিয়ন, দুনিয়ার শান্তি, গোটা ভবিষ্যৎ—সব কিছুই যেন বিপন্ন হয়ে পড়েছে তাঁর কাছে। দুদিন পরে আরও তিনজন সোবিয়েত নেতার সঙ্গে তিনি যখন রেড স্কোয়ারে কিরভের শবাধার কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তখন তাঁর মাত্র হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে। লেনিনের সমাধিসৌধের অনতিদূরে ক্রেমলিনের প্রাচীরগাত্রে সেই শবাধার রক্ষিত হবে। ভুল করে যাঁকে লোকে মনে করে অটল

প্রকৃতি, তাঁর সেই স্তম্ভিত বেদনার প্রতিকৃতিটি আমি কখনোই বিস্মৃত হবো না।

সাতটি বছর কেটে গেল। আর সে কী সময়! এখন ১৯৪১ সালের কথা বলছি।

নাৎসী-অধিকৃত পারী শহরে আত্মগোপন করে প্রতিরোধ-সংগ্রামের প্রথম দিককার সংগঠনগুলির সঙ্গে কয়েক মাস কাজ করলাম। (সত্যি বলতে) এগুলি সবই ছিল কমিউনিস্ট সংগঠন; নিন্দুকরা যে আজও বলে বেড়ায় যে কমিউনিস্টরা নাকি প্রতিরোধশুরু করার জন্য ১৯৪১-এর ২২শে জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, সে-কথা আদৌ সত্য নয়। কিন্তু শীঘ্রই পারীর রাস্তায় আর পা বাড়ানো আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়াতে আমি শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হই। সবে মস্কো এসে পৌঁছেছি, এমন সময় পয়লা মে'র উৎসবে পঞ্চম বার স্তালিনকে দেখার সুযোগ হল।

এ বছর রেড স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজে যেন ইচ্ছা করেই লাল-ফৌজের নানাবিধ যুদ্ধযন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিলঃ তাতে ছিল অধুনাতম কায়দায় তৈরি ট্যাংক, অন্যান্য যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্র, এমন কি বহু ঊর্ধ্বে নীল আকাশে অদৃশ্যপ্রায় আলোকপিণ্ডের মতো অতিবেগে ধাবমান সর্বশেষ মডেলের জঙ্গী বিমান তাও ছিল। কী রকম উৎসুক তৎপরতায় যে জাপানী ও জার্মান উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দূরবীক্ষণে লক্ষ্য স্থির করে এই ধাবমান জ্যোতিষ্কগুলির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের চেষ্টা করছিল! গম্ভীর, একাগ্র দৃষ্টিতে স্তালিন কুচকাওয়াজ দেখলেন। সামরিক কুচকাওয়াজের পরেই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রেড স্কোয়ারে জনসাধারণের অতিকায় শোভাযাত্রা বন্যার মতো বাঁধ ভেঙে এলো। মনে হল মস্কোর সেই বিশাল জনসমষ্টিকে, রাশিয়া, সোবিয়েত সমাজ ও সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভরসা সেই লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী নরনারীকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তিনি যেন এক গভীর আনন্দে ভরে উঠলেন!

স্তালিনের সঙ্গে ষষ্ঠবার আমার সাক্ষাৎ সে একেবারে আরেক রকমের। কিন্তু এবার আর চোখে দেখা নয়, অথচ এতবার দেখার মধ্যে এবারের স্মৃতিটিই বোধ হয় আমার মনে সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় হয়ে থাকবে।

ছ'মাস বাদে। অবস্থা সাংঘাতিক বদলে গেছে! পয়লা মে'র সেই সামরিক ও বেসামরিক শোভাযাত্রার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই শ্বেতসাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত গোটা ফ্রন্ট জুড়ে ২৬০ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে শত্রুর হামলা শুরু হল। তার সেই অস্ত্রসজ্জার কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। এর চেয়ে বৃহত্তর সেনাবল কেউ কখনও দেখেনিঃ ২৬০ ডিভিশন সৈন্য—ষোলো মাস কাল সম্মুখ সমরে তারা পরীক্ষিত হয়েছে, একটার পর একটা চমকপ্রদ লড়াই জিতে তাদের মাথা গেছে ঘুরে, একঁ রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ড পদানত করার জয়গর্বে তারা আত্মহারা। পাঁচটি জাতির সম্মিলিত বাহিনী এখন ধাবিত হল স্বাধীনতার শেষ দুর্গ এই রাশিয়াকে মানচিত্র থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে।

হিটলারের অভিপ্রেত নির্ঘণ্টের হিসাবে একটু বিলম্বে হলেও, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নাৎসী বাহিনী প্রায় মস্কোর উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। তখন থেকেই শহরে প্রায় অর্ধ-অবরোধের অবস্থা। বেপরোয়া হয়ে শত্রুরা অবিরাম হানা দিতে লাগল রাজধানীর উপর। তারা যে এগুচ্ছে, এবং কখনও কখনও খুব মারাত্মক গতিতে এগুচ্ছে, সে-সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না। স্তালিন অবশ্য সে অবস্থায়ও মস্কো ত্যাগ করেননি; যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য পাঁচজন "পিপলস্ কমিশারের" সঙ্গে তিনি শহরেই থেকে গেলেন।

আগেই বলেছি যে, তথাকথিত অকর্মক অধিবাসীদের সঙ্গে আমরাও লোকাপসারণের ফলে রাজধানী ছেড়ে ভল্গার তীরবর্তী কাজানে গিয়ে উঠি।

কাজানের লোকসংখ্যা হঠাৎ বেড়ে পাঁচলাখ থেকে দশ লাখে দাঁড়ালঃ শহরের বাস্তব ও মানসিক জীবনযাত্রা তখন একেবারেই আড়ম্বরহীন, খাদ্যে টানাটানি, বাসস্থানেরও কোন স্বাভাবিক বন্দোবস্ত নেই। তখন যানবাহনের একচেটিয়া ব্যবহার চলছে সামরিক প্রয়োজনে ও কারখানাগুলিকে স্থানান্তরিত করার কাজে। ফলে, সাইবেরিয়াসহ রুশদের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তরঙ্গাহতের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনতার জন্য আবশ্যক খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিল। তার উপর আবার প্রচণ্ড শীত।

জয়লাভের জন্য জনসাধারণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাদের আত্মত্যাগ এবং গবর্নমেণ্ট ও সেনাপতিমণ্ডলীর ধীর, স্থির, অবিচল বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা—এক কথায়, জাতির এই সংগ্রামরত মহান মূর্তি দেখেছিলাম বলেই আমার আস্থা ও আশা কখনও একেবারে লোপ পায়নি। তথাপি, একথা অস্বীকার করতে পারি না যে, আসন্ন বিপদের চাপ ও দুর্যোগের ভিড়ে মন সত্যই বেদনাবিদ্ধ হয়ে ছিল।

৬ই নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই একটা প্রকাণ্ড, ঠাণ্ডা রুন্‌কনে বাড়িতে অন্ধকারে আমরা সব জমায়েত হলাম। প্রেসের যন্ত্রপাতি ও বইয়ের গাদায় ভর্তি বাড়িটা। এই ছিল তখন তাতার লেখক-সংঘের অফিস। মস্কো থেকে লোকাপসারণের ফলে যত লেখক এখানে এসেছিলেন তাঁদেরও হেডকোয়ার্টার এই বাড়িতে। রেডিওর লাউডস্পীকারের চোঙের তলায় গম্ভীর, নিঃশব্দ একদল মানুষ আমরা সেখানে জড়ো হলাম।

একটু আগেই রেডিওতে বলেছে যে, কী যেন একটা জরুরী ঘোষণা করার আছে। তারপর—হঠাৎ সেই রাত্রি, সেই অন্ধকার, সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা, সেই উৎকণ্ঠা ভেদ করে স্তালিনের কণ্ঠস্বর। সেই ভাষণের প্রতিটি শব্দ একজন আমার কানে কানে অনুবাদ করে দিল।

স্তালিন কি বল্লেন?

আজ চার মাস যুদ্ধের পরে একথা আমাকে খুব জোর দিয়েই বলতে হচ্ছে যে, বিপদ হ্রাস পাওয়া দূরের কথা, বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্রাইন, বিএলোরুশিয়া, মল্‌দাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া, এস্তোনিয়া ও আরও কয়েকটি অঞ্চলের বেশ একটা বড়ো অংশ শত্রুর করায়ত্ত হয়েছে; ডনেৎস্-এর উপকূল পর্যন্ত তারা ঠেলে এগিয়ে এসেছে; ঝড়ের মেঘের মতো তার আঘাত উদ্যত হয়ে আছে লেনিনগ্রাদের

মাথায়; আমাদের গৌরবময় রাজধানী মস্কোও বিপন্ন। জর্মান ফাশিস্ত হানাদারেরা আমাদের দেশ লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে, শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবীর মেহনতে গড়া শহর গ্রাম সব ধ্বংস করে ফেলছে। আমাদের দেশের অসামরিক জনসাধারণের উপর হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালাচ্ছে হিটলারী বাহিনী, আবালবৃদ্ধবনিতা কারও নিস্তার নাই। আমাদের দেশের যে সব অঞ্চল জার্মানদের হস্তগত হয়েছে, সেখানেই আমাদের ভাইবা অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে পড়ে কাতর আর্তনাদ করছে।

আমাদের সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর যোদ্ধারা শত্রুর রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছেন। শত্রুর পাশবিক আক্রমণ নির্ভীকভাবে প্রতিহত করে তাঁরা আমাদের পিতৃভূমির সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করছেন; সাহসিকতায় ও বীরত্বে তাঁরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। কিন্তু কোনরকম ক্ষতি স্বীকারেই শত্রুপক্ষের কুণ্ঠা নেই; স্বসৈন্যের রক্তপাতে তার এতটুকু এসে যায় না; লড়াইয়ে তাদের যে সব বাহিনী বরবাদ হয়ে যাচ্ছে তার জায়গায় তারা আবার আনকোরা সব ফৌজ রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিচ্ছে, এবং মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে শীত এসে পড়ার আগেই লেনিনগ্রাদ ও মস্কো দখল করে নিতে, কারণ তারা জানে যে, শীতের মধ্যে তেমন সুবিধা করে ওঠা যাবে না।

চার মাসের যুদ্ধে আমাদের ৩,৫০,০০০ সৈন্য নিহত হয়েছে, ৩,৭৮,০০০ নিরুদ্দিষ্ট; আহত হয়েছে ১০,২০,০০০ জন।

এই প্রচণ্ড দুঃসংবাদের পর সেই একই রকম শান্ত, সুগম্ভীর, হয়তো বা একটু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে স্তালিন বলে চলেছেনঃ

ঐ একই সময়ের মধ্যে হতাহত ও বন্দী সব মিলিয়ে শত্রুর লোকসান হয়েছে চল্লিশ লক্ষেরও বেশি সৈন্য।

কোনও সন্দেহ নাই যে, চার মাস যুদ্ধের ফলে জার্মানী সোবিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে অনেক বেশি হীনবল হয়ে পড়েছে। কারণ জার্মানীর বিজার্ভ বাহিনী ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে আসছে, অথচ সোবিয়েত রিজার্ভ বাহিনী এই সবে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে নামতে শুরু করেছে।

আমাদের দেশ আক্রমণের সময় জার্মান ফাশিস্ত হানাদারেরা ভেবেছিল দেড়মাস দুইমাসের মধ্যেই সোবিয়েত ইউনিয়নকে নির্ঘাত "খতম করে" দিয়ে তারা এই সামান্য সময়ের মধ্যেই উরাল পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সমর্থ হবে। একথাও বলা দরকার যে এই "বিদ্যুৎগতি" জয়ের পরিকল্পনা জার্মানরা মোটেই গোপন করে রাখেনি। বরং উল্টে, একথা তারা প্রাণপনে প্রচার করেই বেড়িয়েছে। কিন্তু এই "বিদ্যুৎগতি" পরিকল্পনাটির চরম নির্বুদ্ধিতা, চূড়ান্ত অসারতা তো বাস্তব ঘটনাতেই প্রমাণ হয়ে গেল। আজ বলা চলে যে এই উন্মাদ পরিকল্পনা একেবারে নিশ্চিতরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

এরকম একটা উক্তির মূল্য, তার গুরুত্ব বেশ ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। কারণ সকলেই জানেন যে বক্তা এমনই এক ব্যক্তি যাঁর পক্ষে সত্যের অপলাপ করা বা মিথ্যা আশায় শ্রোতাদের ভোলাবার চেষ্টা করা একেবারে অসম্ভব; দীর্ঘকাল চিন্তা না করে, ওজন না করে তিনি কোনও মতামত প্রকাশ করেন না।

পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে বোমাবিধ্বস্ত মস্কোর ভূগর্ভস্থ রেল-পথের সবচেয়ে গভীর এক অংশে মস্কো সোবিয়েতের এই অধিবেশন হয়। সেখান থেকে আমরা তখন এক হাজার কিলোমিটার দূরে। তাঁর শেষ কথাটিতে হর্ষধ্বনি ও হাততালির প্রচণ্ড আওয়াজ ভেসে এলো রেডিওতে। আর এখানে, এই মফস্বল শহরের কনকনে অন্ধকারের মধ্যে বসে রেডিওর লাউডস্পীকারের কালো চোঙটা ঘিরে আমরাও তার প্রতিধ্বনি জানালাম আমাদের হর্ষধ্বনিতে, আমাদের কৃতজ্ঞতার কলরবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই, সারা সোবিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে, এমন কি জার্মান ফ্রন্টের ওধারে পার্টিজান যোদ্ধাদের ঘাঁটিতে ঐ কথা, ঐ আশ্বাসবাণী, ঐ প্রতিশ্রুতি ঠিক একইভাবে কান পেতে শুনেছে আরও কত লোক, শুনে একইভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে।

বক্তৃতার বাকি অংশে এই কথাটিই আরও বিশদভাবে, আরও যুক্তি দিয়ে সাজিয়ে বলা হয়েছে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সামরিক অসাফল্যের কারণ কি তা স্তালিন এতটুকু না রেখে-ঢেকে সোবিয়েত দেশবাসীর নিকট বর্ণনা করলেন ; মিত্র পক্ষের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনার বিবরণও পেশ করলেন। সোবিয়েত জনসাধারণের সামনে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা শুরু হচ্ছে, তার কথাও একে একে বলে গেলেন। শত্রুশক্তিকে ধীরে ধীরে বিনষ্ট করার যে প্রস্তুতি চলছে, তাও তিনি বিশ্লেষণ করে দেখালেন। জয়লাভের জন্য অগ্রসর হতে গেলে সৈন্যবাহিনী ও বেসামরিক জনতাকে যে সব কর্তব্য পালন করতে হবে, তার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা পাওয়া গেল তাঁর বক্তৃতায়। ফাশিস্ত সাম্রাজ্যবাদের ধ্রুব পরাজয়ের কথা ঘোষণা করে তিনি ভাষণ সাঙ্গ করলেন এই ক'টি কথায়—"আমরা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছি, আমাদের জয় হবেই।"

সারা দুনিয়ার স্বাধীনতার জন্য আমাদের সকলের ভাগ্য নিয়ে এই যে নাটকীয় লড়াই তারই এক উৎকণ্ঠিত, অভিনিবিষ্ট দর্শক ছিলাম সেদিন। চিন্তায় বা কথায় এতটুকু অত্যুক্তি না করে আজ পাঁচ বছর পরে বলতে পারি যে, এই বক্তৃতাই সমগ্র যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল আমাদের স্বপক্ষে।

৬ই নভেম্বরের এই সন্ধ্যাটির আগে পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের সাহস ছিল একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ; স্বাভাবিকভাবে যার মনের যতটুকু জোর, তাই ছিল তার আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি। অভিযানের পথে শত্রুরা যে কম বেশি ঘা খাচ্ছে তা সকলেই বুঝছিলাম, কিন্তু তবু দেখছিলাম যে মোটামুটি সর্বত্রই তারা জয়ের পর জয় লাভ করছে। সোবিয়েত শক্তি ও সোবিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল, তবু তাঁদের সমগ্র কর্মপন্থার পরিপ্রেক্ষিতটি যেন তখনও ঠিক চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আমাদের আশাবাদের ভিত্তি ছিল নেহাত মানসিক, বা বলা যায় দার্শনিক। বাস্তব বা যুক্তিসঙ্গত কোন ভিত্তি তার কিছু ছিল না।

স্তালিনের ভাষণ থেকেই এই প্রয়োজনীয় খতিয়ান, এই বাস্তব ভিত্তি, এই সব তথ্য পাওয়া গেল। ক্ষমতাভার গ্রহণের পর থেকে যিনি কোনদিন একবারও তোষামুদে কথা বা একটিও মিথ্যাকথা বলেনি, একবারের জন্যও যাঁর কখনও

কোনও মৌলিক ভুল হয়নি, তাঁরই কথা ঃ

> শত্রুর পরিকল্পনা একেবারে ভ্রূণেই নষ্ট হয়েছে, একথা নিশ্চিত বলা চলে..... জয়লাভের উপায় আমাদের হাতেই আছে.....এই কর্তব্য আমরা সাধন করতে পারি, এবং তা আমাদের করতেই হবে.....শত্রুর পরাজয় নিশ্চিত.....আমাদের জয় হবেই.....

সোবিয়েত যুদ্ধের নৈতিক ইতিহাসের দুটি পর্যায় ঃ এক হচ্ছে ৬ই নভেম্বরের বক্তৃতার **আগে**, আর এক পর্যায় ৬ই নভেম্বরের বক্তৃতার **পরে**। এর পরে আর কখনও, এমনকি পরের বছর বসন্তকাল, শীত ও শরৎকালে যখন শত্রুসৈন্য কাস্পিয়ান ও ভল্‌গার উপর আধিপত্য স্থাপন করে সেই ঘোর দুর্যোগের দিনেও, এমন কি স্তালিনগ্রাদের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তেও সোবিয়েত নরনারীরা আর কোনদিন নিরাশ হয়ে পড়েনি।

এই হল ষষ্ঠবার আমার স্তালিনকে দেখা।

(ক্রমশ)

অনুবাদ ঃ **রণজিৎ গুহ**



মাদারী

মনোরঞ্জন ঘোষ

'ডিমি-ডিমি-ডিমি-ডিমি, ডিডিম-ডিম্-ডিডিম-ডিম্'—ডুগ্‌ডুগি বাজে। তারাসপ্তকের তীব্র সুরে সঙ্গে সঙ্গে বেজে চলেছে একটা বাঁশি।

লোকটার বাঁ-হাতে ডুগ্‌ডুগি আর অন্যহাতে একটা তিনফুটোওয়ালা পিতলের বাঁশি। অদ্ভুত দক্ষতা! বাঁ-হাতে 'ডিম-ডিম-ডিম-ডিম' তাল আর ডান-হাতের বাঁশিটাকে ঠোঁটের কাছে ধরে ফুঁ দেয়। 'চলে নহী জানা' কিংবা 'এক দিল্‌কে টুক্‌রে হজার হুয়ে' অথবা অন্য কোনো একটা সিনেমা-সঙ্গীতের সুর ভাঁজবার চেষ্টা চলেছে। হাঁপিয়ে উঠেছে। গলাটা এক-একবার ফুলতে ফুলতে গলগণ্ড-রোগীর মতো হয়ে উঠছে। এই বুঝি ফেটে যায়! নিমেষে বুঝি একেবারে চিপ্‌সে যাবে। —চিপসে গেল গলাটা—পূর্বের সুদীর্ঘ ফুঁ-টা শেষ করে নতুন দমে ফুঁ দেয়।

কৌতূহলী জনতা। লোকটাকে ঘিরে প্রায় পনেরো হাতের পরিধিতে একটা চাপা ভিড়। সামনে বৃত্তাকারে সারি বেঁধে ছোট ছোট ছেলের দল বসে আছে। লোকটা ক্রমাগত ঘোরে সেই সীমারেখা ধরে। বাঁ-হাতের ডুগ্‌ডুগি বারকয়েক বেজে ওঠে জলদে—'ডিডিম্-ডিম্'। একেবারে সমের মাথায় যেন থেমে যায় উভয় বাজনা। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। নোংরা ফতুয়াটা ঘামে ভিজে গা'র সঙ্গে সপ্‌সপিয়ে লেপ্‌টে গেছে।

কণ্ঠস্বর বটে! গাঁজাখোরের মতো বসা-গলায় লোকটা চিৎকার করে ওঠে, 'ভাইয়োঁ, তুম্ সব জেন্টুলম্যান তামাসা দেখনেকো জুটে হো। মগর আফসোসকী বাত, তুমলোগ্‌মেভী চোট্টা-বেইমান হৈ। হোশিয়ার। ইধর মেরা কমাল দেখতেহী রহ্ জাওগে, আওর বগল্‌সে বেমালুম তুম্‌হারী জেবকা রুপেয়া-পৈসা মনিঅডার হো জায়গা—রসিদভী নহী মিলেগা।' —ডুগ্‌ডুগি আর বাঁশিটা নিচে রেখে হাতজোড় করে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। কালো-কালো দাঁতের সারি বেরিয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে বলে, 'ক্যা, মেরী বাত তুম নহী সমঝে! কহ্‌নেকা মতলব হৈ কি, পকিটমারসে বহুত হোশিয়ার।'

লোকটা একটা মাদারী। অর্থাৎ, রাস্তায় রাস্তায় বাজি দেখিয়ে বেড়ায়। কাছারি বা স্টেশনরোডে, শহরের সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত স্থান বেছে নিয়ে ডুগ্‌ডুগি আর বাঁশির ঐকতানে আকৃষ্ট করে জনতা। তারপর জাদু-প্রদর্শনী। 'মিস্‌মির্জাম' না জানলেও বাক্‌পটুতার বলে জনতাকে দাঁড় করিয়ে রাখে শেষ অবধি—নিজের কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত।

অদ্ভুত তার খেলা। দর্শকের আংটি চেয়ে নিয়ে একটা টিনের ডিবের মধ্যে রাখে। সর্বসমক্ষে একটা থান ইটের ওপর বসিয়ে রাখে ডিবেটাকে। তারপর মিনিট দশেক অক্লান্ত 'কন্‌সার্ট' বাদ্যের পর খেলার পূর্বে রেশটুকু টেনে আনে—'হাঁ, অব্ খেল শুরু।' দর্শকদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করে বলে, 'আও জোয়ান, আংগুটি নিকাল লো।' আংটি নিতে গিয়ে দেখা

যায় ডিবে থেকে আংটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। লোকটা বোকার মতো হাসতে হাসতে ফিরে আসে, বলে, 'আংগুটি গায়েব হো গয়া।' মাদারী হাসে আর বলে, 'ঝুট্ কাহে বোল্‌তা বাহাদুর, পরায়া চীজ গায়ব করনেকা মন্তর মৈ নহী জানতা। আওর ভাইয়া, চোরিকা মন্তরমে তুমভী পাক্কা নহী হো—পকড়া গয়ো। নিকালো জল্‌দ্—মালিককো ওয়াপস কর দেঁ।' এ-কথার যেন জবাবই নেই। লোকটা হাসতেই থাকে বোকার মতো। মাদারী যেন এবার চটে যায়। চিৎকার করে ওঠে, 'ক্যা, নহী দেগা? মাদারী কো তুম্ ধোঁকা নহী দে সক্‌তে হো।' কথার শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে খানিকক্ষণ। হঠাৎ ব্রস্তে একপাশের ভিড় সরাতে সরাতে বলে ওঠে, 'পক্‌ড়ো, পক্‌ড়ো উস্ কন্দুওয়ালাকো। চোট্টা ভগ রহা হৈ।'

একটা লোক হাতে একটা লাউ নিয়ে যাচ্ছিল। ধরে এনে লাউটা কেটে ভেতর থেকে বেরোল পূর্বোক্ত আংটি। হতবাক জনতার বিস্ময় আত্মপ্রকাশ করে কানফাটা করতালিতে। মাদারী শেষ খেলা শুরু করেছে। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, আশ্চর্যজনক, খেলা—'এক্‌স্‌রাই' (এক্‌স-রে আই)। নিজের সাত-আট বছরের ছেলেটাকে 'মিসমির্জাম' করে সর্বসমক্ষে জমির ওপর শুইয়ে দেয়। চাদর-বোরা-গামছা অনেক কাপড়-চোপড় দিয়ে ঢাকা দেয় ছেলেটার আপাদমস্তক। তারপর জনতাকে উদ্দেশ করে বলে, 'ভাইয়োঁ, অব লড়কা কুছ্ দেখ্ সক্‌তা হৈ? মেহেরবানীসে জোরসে আওয়াজ দো।'

অনেকের কণ্ঠস্বর, 'না, না, কিছুই দেখতে পারে না।'

'বহুত খুব। সাব্বাস আগলা লড়কাসব—জোরসে তালি বাজাও।'

মাদারী ডুগ্‌ডুগি হাতে উঠিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে, 'বোল্ বেটা মুন্নি, মেরা হাথ্ মে ক্যা হ্যায়?'

কাপড় ঢাকা দেওয়া মুন্নি কণ্ঠস্বরকে লম্বা করে দুলিয়ে ছেড়ে দেয়—'হাথ্ মৈঁ ডুগ্-ডু-গি...।'

মাদারীর অনুরোধে এবার দর্শকরাও নানাভাবে পরীক্ষা চালায়। 'বেটা' মুন্নিও দোলানো সুরে একে একে জবাব দিতে থাকে, 'মুট্‌ঠিমে পৈসা, ঘড়ি, আংগুঠি, মিট্টী, কুছ নহী—খালি হাথ...।'

মাদারীর বিনীত কণ্ঠস্বর, 'মেহেরবান, অব্ লড়কাকো জমিন্ সে দশ হাথ উপর উঠা দেঙ্গে। তুম্ সব অস্থিরসে (স্থির হয়ে) বৈঠো।'

দু'জন দর্শক নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে করতে ভিড় ঠেলে বাইরে চলে যাচ্ছিল—'ধ্যাৎ বোকা, ছেলেটাকে আবার শূন্যে ওঠাবে কি? ও আবার জাদু জানে নাকি—ভিড় জমিয়ে রাখবার ফিকির।'

কথাগুলো মাদারীর কানে যায়। চিৎকার করে ওঠে, 'ক্যা কহা, খড়া রহো। মাদারীকা কমাল দেখ্ যাও। য়্যাদ্ রখো, মৈ গোরখপুরকা রহনেবালা, গুরু গোরখনাথকে চেলা হুঁ।'

ব্রস্তে একপাশে রাখা ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে একটা চক্‌চকে ছোরা। দর্শকের সামনে তুলে ধরে বলে, 'ভাইয়োঁ অসলী জাদু দেখলাউঙ্গা। অপ্‌না বেটাকা হাথ-পাও-শর বুট্টি বুট্টি কাট্‌কর গোরখপুরী জাদু দেখলাউঙ্গা। অলখনিরঞ্জন।' বলেই লাফিয়ে গিয়ে বাঁ-হাতে মুন্নির

একটা হাত চাদরের তলা থেকে টেনে বাইরে আনে। ডান-হাতের ছোরার ধারটা পরীক্ষা করে নেয় একবার। এইবার হাতটা কেটে ফেলবে। দর্শকরা আর বুঝি সহ্য করতে পারে না! চোখের সামনে কাটাকাটি দেখা অসম্ভব। সমস্বরে বাধা দিয়ে ওঠে, 'খবরদার, খবরদার মাদারী।'

মাদারী নিরস্ত হয়। মুখে হাসি। বলে, 'ইতনা কমজোর। জাদুকা হাসি উড়াতে হো আওর কমাল দেখনেসে ডর যাতে হো। কোই বাত নহী। মৈ চাদ্দরকা নিচেহী ছুরা চালাকর দেখলাউঙ্গা। কোই ডর নহী।' ওস্তাদকী দোয়াসে মেরা প্যারা লড়কা ফির আচ্ছা হো যায়গা।'

'কালী, কালী মহাকালী, বৈঠি বড়পিপর কী ডালি, চাওয়ে চনা বজাবে তালি, কালী কাল কুধায়ে...।' শূন্যে তাকিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে নেয় মাদারী। চাদরের নিচে ছোরাশুদ্ধ হাতটা চালিয়ে দেয়। বেশ বোঝা যায় মুন্নির গলায় ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করে একেবারে স্থির হয়ে যায়। রক্তমাখা ছোরাশুদ্ধ হাত বাইরে আনে মাদারী। দর্শকরা হতবাক। মাদারীর কণ্ঠস্বর যেন নিস্তেজ হয়ে আসে। বলে, 'প্যারে ভাইয়োঁ, অপ্‌না মাশুম বেটাকা খুনসে জাদু দেখলায়া—মগর ক্যোঁ? পেট্‌কা বাস্তে। একটুরা রোটিকে লিয়ে। জঁহাতক পার লগে, এক পাই-দু'পাই মেরা মুর্দা বেটাকা উপর ফেঁকো।'

এপাশ-ওপাশ থেকে পয়সা, আনি, দুয়ানি, চারানি পড়তে থাকে।

পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আবার ডুগ্‌ডুগি আর বাঁশি বাজায় ছেলেটার চার-পাশে ঘুরে ঘুরে। গলা ছেড়ে ডাকে, 'উঠ্‌ বেটা মুন্নি।' তিন ডাকের পর বোরা-গামছাঢাকা ছেলেটা উঠে বসে। চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে দাঁড়ায় একটা রোগা চেহারার ছেলে। মুন্নি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

'ডিম্‌-ডিম্‌-ডিম্‌' ঢিমে তালে বাজে ডুগ্‌ডুগি। খেল খতম।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। কেমন একটা ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা নামে চারদিকে। ঝোলার মধ্যে সব সরঞ্জাম ঢুকিয়ে সেটা মুন্নির কাঁধে দিয়ে মাদারী বলে, 'ডেরা যাও, মৈ বাজারসে আটা-সতুয়া লে কর আতাহুঁ।'

তিনদিন পর আজ মাদারী ঝোলা নিয়ে বেরিয়েছে। মুন্নিটার জ্বর একেবারে ছাড়েনি, তবুও বেরোতে হয়েছে ওকে নিয়ে। বাড়িতে আর একটা পয়সাও নেই। খাবে কী? মুন্নির অসুখ মানেই রোজগার বন্ধ। ওকে বাদ দিয়ে তো মাদারীর কোনো ইল্‌ম্‌ই নেই। ওর জন্য একটু দুধ আজ নিতেই হবে। নইলে শরীরে জোর পাবে কি করে। কাল আবার 'তমাশা' দেখাতে বেরোবে তো!

পাঁচ-সাতজন লোক তখনও মাদারীর সঙ্গে ছিল। 'কন্দুওয়ালা', 'এক্‌সরাই'-এর পরীক্ষক, পয়সা-ঘড়ি-আংটি ইত্যাদির প্রশ্নকর্তারা, আর জাদুর প্রতি অবিশ্বাসী ছেলেদুটো। এরা সকলেই মাদারীর শেখানো লোক। দর্শকের মাঝে দাঁড়িয়ে নিখুঁত অভিনয় করে গেল। কড়ার মতো প্রত্যেকের পাওনা মিটিয়ে দেয়। প্রায় ঘণ্টা দুই চিৎকার করে খেলা দেখিয়ে মাদারীর অংশে বেঁচেছে দেড়টাকা মাত্র।

এখন অবসাদ! স্ফূর্তি আর নেই, আছে শুধু ক্লান্তি। মাদারী ক্লান্ত পদক্ষেপে চলে বাজারের দিকে। মনে মনে বুঝি হিসাব করে দেখে দেড়টাকার কী কী 'সওদা' কিনবে। ছেলের জন্য কতটুকু দুধ কিনবে। ক্লান্তি দূর করবার জন্য সর্বাগ্রে চাই খানিকটা দারু—কড়া মদ। তিরিশের দাম বড্ড বেশি, পঞ্চাশই নিতে হবে।

ভাট্টিখানা—দেশী মদের দোকান। অনেক লোক এদিক-ওদিক জমির ওপর বসে গেছে। সামনে দু'একটা বোতল, চুক্কর (মাটির ছোট ছোট গ্লাস) আর শালপাতার ঠোঙায় দারুর চাখ্না—ছোলাভাজা, পেঁয়াজের বড়া, বাসি মাংস ইত্যাদি। কারো কারো সামনে আবার নিজের নিজের বমিও রয়েছে। স্পিরিট, চাট্ বমি ইত্যাদির পাঁচমেশালি দুর্গন্ধ—বাতাস ভারি এখানে। ভারি বাতাসে নিঃশ্বাস যারা টানতে আসে এখানে তারা প্রায় সকলেই দিনমজুর। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের উপার্জন নিয়ে এসে বসেছে দেহ-মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য। কাল আবার খাটতে হবে—রোজগার করতে হবে।

মাদারী চার আনার দারু আর চার পয়সার চাখনা নিয়ে বসে একপাশে। চুক্করে চুমুক দেয় আর ভাবে। পয়সার হিসেব করে। জরু, দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে। অন্তত, তিন পোয়া আটা নিতেই হবে। এতেই লাগবে বারো আনা। দাম না তো যেন আগুন। শাকের সের ছ' আনা। একসের না কিনলে কি করে এতগুলো লোকের চলবে! তারপর আবার তেল-নিমকও চাই। আর ভাবা যায় না। এত পয়সা কোথায় পাবে। চিন্তাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। নাঃ, হিসাবটা আগেই ঠিক করে নিতে হবে। চাই আর একটু দারু। আবার কেনে। চিন্তাশক্তিটা ক্রমশ যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ঘন ঘন চুমুক দেয়। পাত্র খালি করে। আবার ভরে আনে। হিসেব করতে শুরু করে আবার। চিন্তাকীটগুলো মাথার ভেতর পিল্‌পিল্ করে বেড়াচ্ছে। একসময় হঠাৎ অস্পষ্টভাবে অনুভব করে তার সব পয়সা ফুরিয়ে গেছে।

রাত বাড়ে। উল্লাস বাড়ে ভাট্টিখানার। গান-চিৎকার, হাসি-হুল্লোড়ের ছড়াছড়ি। গুলজার হয়ে ওঠে জায়গাটা।

মাদারী একসময়ে ওঠে। টলতে টলতে চলতে থাকে ধর্মশালার পথে—'ডেরা'য় যাবে।

মাদারীর ঘরটার সামনে রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো এসে আছড়ে পড়ে আছে। দরজার কাছেই মাদারীর জরু দাঁড়িয়ে। মাদারীকে দেখে সে এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে, আটা-সতুয়া আনোনি? মাদারী নির্বিকার। জবাব দেবার চেষ্টাই করে না। ঘোলাটে দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর মুখপানে।

গুলাবিয়া আর বুঝি রাগ সামলাতে পারে না। ফেটে পড়ে, 'বেইমান, লড়কা-বাচ্চা ভুখা পড়া হৈ, আওর বাপ আয়া পীকর (পান করে)। পিসাব (প্রস্রাব) ক্যোঁ নহী পীতা, পিসাব...।'

মাদারী নির্বোধের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'খবরদার গুলাবিয়া, গালি মত দে হাঁ'...তারপর কী ভেবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে—'থোড়াই অপ্না পৈসামে দারু পীয়া—দোস্ত পীলায়া। মৈ পৈসা ক'হাসে লাতা! আজ তো এক পাইভি আমদানি ন হুয়া...।'

গুলাবিয়া আর থাকতে পারে না, চিৎকার করে ওঠে, 'ঝুট্, বিলকুল ঝুট ...বে-ইমান, বিমার বেটাকে কমাইসে তেরা কোন্ হক্ হৈ?'

চেঁচামেচি শুনে মুন্নিও এসে মা'র পাশে দাঁড়ায়। বাকি ছেলেমেয়ে দুটো ছোট—বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

মুন্নির দিকে ফিরে গুলাবিয়া জিজ্ঞেস করে, 'আজ কিতনা কমায়া রে মুন্নি?' কথার শেষে মা সস্নেহে নিজের আরও কাছে টেনে আনে ক্ষুধাকাতর অসুস্থ ছেলেকে।

মা'র কথায় সায় দিয়ে মুন্নি বলে, 'হাঁ মা, আজ বহুত কমায়া।'

ছেলের সাক্ষ্যে ধরা পড়ে যায় মাদারী। হঠাৎ এক প্রচণ্ড ক্রোধ ফুঁসে ওঠে ওর অপ্রকৃতিস্থ মাথার মধ্যে। পায়ের কাছ থেকে একটা থান ইট কুড়িয়ে নেয়। কুৎসিত এক গালাগালির সঙ্গে ছুঁড়ে মারে সেটা জরু-বেটাকে লক্ষ্য করে। মুন্নি আর্তনাদ করবারও সময় পায় না। লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত দেহটা। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর সামনে ছিটকে পড়ে মাথার ঘিলু আর তাজা রক্ত। মাদারী কেমন যেন হক্চকিয়ে যায়। গুলাবিয়ার চিৎকারে আশ-পাশ থেকে লোক দৌড়ে আসতে থাকে। স্পিরিটের নেশাটা ছুটে যায় মুহূর্তে। ছুটবার নেশাটাই প্রবলভাবে পেয়ে বসে মাদারীকে। পালাবার আগেই ধরা পড়ে যায় খুনী।

বিচারালয়। গুলাবিয়া কাতর অনুনয় জানিয়েছিল বারবার—'হুজুর, মাদারীকো মাফ্ কর দিয়া যায়, নহী তো হমসব ভুখা মর জাউঙ্গা...।'

গুলাবিয়ার চোখের জল দেখে আইনের চোখ আর্দ্র হয়নি। বিচারকের রায়ে মাদারীর ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

আশেপাশের লোকের কাছ থেকে শুনে গুলাবিয়া যখন বুঝল, হুকুমটা সত্যিসত্যিই ফাঁসির তখন সে হাহা করে কেঁদে উঠল। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যও এগিয়ে এল কিছু লোক। এমন সময় হঠাৎ শোনা যায় একটা কর্কশ বসা-গলার পরিচিত চিৎকার—'আরে গুলাবিয়া অপ্না মাশুম বাচ্চাকো খুন দেখ্কর তু ডর গঈ! ঘবড়ানেকী বাত নহী। হামারা প্যারা লড়কা ওস্তাদকী দোয়াসে ফির ঠিক হো যায়গা।...ইয়ে তো শির্ফ্ গোরখপুরী জাদু। হাঃ—হাঃ—হাঃ। ...লে আও, জল্দ্ লে আও, মুন্নি-টুন্নি-পন্না সবকো লে আও। মৈ অস্লী গোরখপুরী জাদু দেখলাউঙ্গা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ।'...

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসছে মাদারী।

মাদারীর হাসি শুনেই গুলাবিয়ার বিলাপ থেমে যায় মুহূর্তে। টুন্নি-পন্নাকে কোলের ভেতর চেপে ধরে অদ্ভুত আতঙ্কে।

মাদারী চটে ওঠে, 'ক্যা নহী লাতী! ডর গঈ! আচ্ছা, মৈ চাদ্দরকা নিচেহী ছুরা চালা কর দেখলাউঙ্গা। অলখনিরঞ্জন!'—কাঠগড়া থেকে বেরোবার চেষ্টা করতেই প্রহরীরা ধরে ফেলে, টানতে টানতে নিয়ে চলে আদালতের বাইরে।

মাদারী ফিরে ফিরে পিছনে তাকায়। দূর থেকে তখনো শোনা যায় ওর ক্রম-অপসৃয়মান কণ্ঠস্বর, 'প্যারে ভাইয়োঁ, অপ্না মাশুম বাচ্চাকো খুনসে জাদু দেখলাকর মৈ পেট্কাবাস্তে কুছ্ মাঙ্তাহুঁ। জ'হাতক পার লগে—এক পাই, দু'পাই মেরা মুর্দা বেটাকা উপর ফেঁকো।...'

পুস্তক পরিচয়

রুমানিয়ার সাহিত্য

MUD-HUT DWELLERS : Mihail Sadoveanu. ... Rs. 1|4|-
ILL WEED : Aurel Baranga. .. .. Rs. 1|4|-
প্রাপ্তিস্থানঃ **ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ,** কলকাতা—১২

পূর্ব ইউরোপের ছোট্ট দেশ রুমানিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সে-দেশ ছিল আধা-ঔপনিবেশিক ও কৃষিপ্রধান এবং সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শিকার। এই দেশ ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে সেদিন পর্যন্ত আমরা বিশেষ কিছু জানতাম না। সম্প্রতি ইংরেজিতে অনূদিত কয়েকটি রুমানিয়ান উপন্যাস ও নাটকের মারফত সে-দেশের সংস্কৃতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাহারিউ স্তান্‌কু-র 'যেযারফুট' বইটি, 'রুমানিয়ান রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস ও উপন্যাসের খণ্ডাংশ, এবং বর্তমানে আলোচ্য বই দুটি। রুমানিয়ার সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'রুমানিয়ান রিভিউ' পত্রিকার ১১-১২ সংখ্যায় প্রকাশিত ইঅন লুকা কারাগিয়ালে-র 'হারানো চিঠি' নাটকটি। রুমানিয়ার সাহিত্যের এই ক্লাসিক নাটকটিতে উনিশ শতকের শেষদিককার বড় জমিদার ও বুর্জোয়াশাসিত সমাজের ছবি তার সমস্ত কদর্যতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। এ নাটকটি শুধু যে শাসক-শ্রেণীর প্রতি ব্যঙ্গ তা-ই নয়, তখনকার নিয়মতান্ত্রিক বুর্জোয়া সরকারের মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছেন এই নাটকের মধ্যে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর সময়কার সমগ্র সামাজিক অবস্থাকে। তিনি ছিলেন এই জমিদার-বুর্জোয়াশাসিত রাষ্ট্রের নির্মম সমালোচক।

'মাট-কোঠার বাসিন্দা' বইটিও পুরনো সামন্তবাদী রুমানিয়ার প্রতিচ্ছবি। এর লেখক মিহাইল্ সাদোভানু রুমানিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি সাহিত্যচর্চা করছেন। রুমানিয়ার জনগণের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ রূপ নিয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর সাহিত্য-জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী-বুর্জোয়াশাসনের মধ্যে। তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে মানুষ ও মানবতার প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসার বাণী, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস আর সুগভীর আশা। পূর্ব-সূরীদের মহান ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে প্রধানত তিনিই অসীম সাহসের সঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এনেছেন অত্যাচারিত, নিপীড়িত নিচুতলার মানুষদের। তাদের তিনি আদর্শবাদী রূপ দেননি, তিনি তাঁর সৃষ্টিতে তাদের দেখিয়েছেন দুঃখে সুখে, তাদের শ্রমের মধ্যে। স্বদেশের প্রতি তাদের অসীম ভালোবাসা ও উৎপীড়কের প্রতি অপরিসীম ঘৃণার দিকও তিনি দেখিয়েছেন। শোষণ ও নিপীড়নকে তিনি সাহিত্যভাত করেছেন তার সমস্ত ক্লিন্নতা ও ভয়াবহতা সমেত এবং তার দ্বারা জমিদার-বুর্জোয়া শাসনের স্বরূপ উন্মোচিত করে সাহায্য করেছেন প্রগতির শক্তিকে।

সাদোভানু-র সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, মানুষ কি করে এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং নিজেদের উন্নতির পথ খুঁজে পেতে পারে, তারই অক্লান্ত

অনুসন্ধান। তাঁব উপন্যাসে এই অনুসন্ধান হল জমিদার ও বুর্জোয়াশাসিত জনগণের (প্রধানত কৃষক) অশান্ত মনোভাব ও প্রশ্ন-জর্জর মনের প্রতিফলন। কিন্তু মহৎ বাস্তববাদী সাহিত্যিক হয়েও ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসের আগে (ঐ মাসে রুমানিয়া সোবিয়েত লাল ফৌজের সহায়তায় জমিদার-বুর্জোয়াশাসনের অবসান ঘটায়) সে-পথের কোনো সন্ধানই তিনি দিতে পারেননি। তার আগে পর্যন্ত তিনি কেবল পথ খুঁজেই বেড়িয়েছেন। মুক্তির পর তিনি দেখেন সোবিযেত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বাস্তব রূপ। নিজের দেশে তিনি দেখেন রুমানিয়াব শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে দেশেব সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেন যে শ্রমিক শ্রেণীই জনগণের শ্রেষ্ঠ সম্পদের ও ঐতিহ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। এবং শ্রমিকশ্রেণীব রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্তের পরেই শিল্পসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব। এই নতুন চেতনার স্বাক্ষর আমরা পাই তাঁর সাম্প্রতিক বইগুলিব মধ্যে। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'মিত্রিআ ককোর', উপন্যাসটি বিশ্বশান্তি সংসদের শান্তি স্বর্ণপদক পেয়েছে। তাঁরই কথায়, "সাহিত্যকে কখনো শ্রমিক শ্রেণীর চিরন্তন স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। সাহিত্য-কর্ম হযে দাঁড়াব পার্টিকাজেবই অঙ্গ।" এই সমাজতান্ত্রিক-বাস্তববাদী রূপান্তর সূচিত করছে সাদোভানুর সাহিত্যসৃষ্টির নবরূপায়ণ, তাঁর পুরনো সৃষ্টির সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণগুলির উন্নততর স্তরে উৎক্রমণ।

সাদোভানু-র রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর ভাষা। যখন শাসকরা রুমানিয়ান ভাষাকে ঘৃণা করত, যখন বহু লেখক কস্‌মোপলিটানিজম-এব বিষে জর্জরিত, রুমানিয়ান শ্রমিক-কৃষকেব আর্ট ও ভাষা, তার শিল্প-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জন্য তখন তিনি তাদের ভাবারও উন্নতিতে সাহায্য করেন প্রচুর। সাদোভানু যে ভাষা সৃষ্টি কবলেন তা একদিকে যেমন তাঁর নিজস্ব অন্যদিকে তেমনি তা জনসাধারণেরও ভাষা। সাধারণ মানুষেব কথাবার্তার ভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহাব করে তাকে আরও ঐশ্বর্যবান করে তুললেন তিনি। তাঁর হাতে রুমানিয়ান ভাষা অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠল, সক্ষম হল সঠিক ও সুন্দবভাবে রুমানিয়ার জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনাকে রূপ দিতে, রূপ দিতে স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে।

প্রকৃতি তাঁর নিকট অপরিচিত, ভয়ানক কিছু নয়। মানুষেব সঙ্গে প্রকৃতিব নিবিড় যোগ তাঁর রচনায় পবিস্ফুট। প্রকৃতি মানুষেব শত্রু নয় বন্ধু। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, বিদেশী আক্রমণকাবীর বা পুঁজিবাদের শোষণেব হাত থেকে মানুষের রক্ষাস্থল। এমনকি মানুষেব অগম্য স্থান যখন তিনি বর্ণনা করেন, তখনও তাঁর বর্ণনার মধ্যে বোধ করা যায় মানুষের উপস্থিতি। অবশ্য, তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় সাদোভানু প্রকৃতিকে দেখেছেন নতুন দৃষ্টিতে। প্রকৃতিব মধ্যে তিনি আজ দেখেন নতুন সম্পদ, বিজ্ঞান ও টেক্‌নিকেব সাহায্যে যাকে মানুষের কাজে লাগানো যাবে।

কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির সর্বপ্রধান বাণী হল মানবিকতাব বাণী। মানবিক মানুষেব প্রতি অসীম ভালোবাসা, মানুষেব সৃজনীশক্তির উপর অচঞ্চল ও প্রগাঢ় বিশ্বাসই তাঁর সাহিত্যের মূল কথা।

সাদোভানুর 'মাট-কোঠার বাসিন্দা' বইটি ১৯১২ সালে লেখা। এবং আমবা যতদূর জানি তাঁর আর কোনো বই ইংরেজিতে এ-পর্যন্ত অনূদিত হয়নি। শহর থেকে অনেক দূরে, সভ্যতার আলো যেখানে পৌঁছয়নি, তেমনি এক অঞ্চলের কাহিনী এই বইটি।

বয়ার (বড় জমিদার) জর্জ আদ্রামানু-র জমিদারি রুমানিয়াব এক নির্জন অংশে অবস্থিত। আধুনিক সভ্যতার কোনো স্পর্শ সেখানে লাগেনি। আদিম পদ্ধতিতেই

সেখানকার কাজ চলে। সেখানকার চাষীদের জীবনে নেই কোনো বৈচিত্র্য, কোনো ছন্দপতন। সকাল থেকে সন্ধ্যা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা ভরে তোলে জমিদারের গোলা। সেখানে জমিদারই সর্বেসর্বা, তিনিই সম্রাট, দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী। কিন্তু আভ্রামানু অবশ্য ভালো-মানুষ। তিনি নিজেও খাটেন, সৎ ও বিশ্বাসী গোমস্তা থাকা সত্ত্বেও, খবর রাখেন খুঁটিনাটি জিনিসের।

তাঁর জমিদারিতে একদিন এল এক আগন্তুক—নিতা লেপাদাতু। বয়সে যুবক, কর্মঠ, শক্তিমান ও আত্মমর্যাদাবান। অন্য এক বয়ারের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে সে চলে এসেছে এখানে। আলাপ হল অভ্রামানু-র পুরনো প্রজা নাস্তাসি খুড়ো ও তার মেয়ে মার্গিওলিতার সঙ্গে। সে কাজ পেল সেখানে, কাজ হল জমিদারের গোরুবাছুরের তত্ত্বাবধান। পরিচয় হল জমিদারের গোমস্তা ফালিবোগা ও অন্যান্য চাষীদের সঙ্গে। অল্পসময়েই সে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল অন্যান্য চাষীদের ফালিবোগার অতীত সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। আভ্রামানুর জমিদারিতে নানা চরিত্রের লোকই কাজ করে। সে বিশ্বাসী, কর্মঠ কিন্তু উগ্রচণ্ড। প্রথম আলাপেই ঠোকাঠুকি বাঁধল তার নিতার সঙ্গে। কিন্তু চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়েও বশ করতে পারল না তাকে। জীবনে এই প্রথম সে সম্মুখীন হল বিরোধিতার। নিতাকে সহ্য করতে না পারলেও সমীহ করতে শিখল, বোধহয় স্নেহও করতে শুরু করল। নিতাও নিজের কাজে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করল। ইতিমধ্যে সে ভালোবাসল মার্গিওলিতাকে, মার্গিওলিতাও তাকে ভালোবাসে। দু'জনে বিয়ের ও বিয়ের পরবর্তী জীবনের কথা ভাবে। এরই মাঝে একদিন শীতের সময় প্রবল ঝড়ে ঘরচাপা পড়ে নিতা মরমর, তাকে উদ্ধার করে আনল ফালিবোগা। সুস্থ হয়ে ওঠার পর সে বিয়ে করল মার্গিওলিতাকে, জমিদার তাকে একখণ্ড জমি উপহার দিলেন। পরে সে হল মেয়র। আর এদিকে আভ্রামানু বিয়ে করলেন আর এক বয়ারের মেয়েকে। তিনি শহুরে মেয়ে, অজপাড়াগাঁ তাঁর সহ্য হয় না। স্ত্রীর আর এক বয়ারের মেয়েকে। তিনি শহুরে মেয়ে, অজপাড়াগাঁ তাঁর সহ্য হয় না। স্ত্রীর মন জুগিয়ে চলেন আভ্রামানু। দেশবিদেশ ঘুরে ঘুরে ও তাঁর খেয়ালখুশি বজায় রাখতে গিয়ে তিনি নিজের জমিদারি বিক্রি করে আর একটা জমিদারি কেনেন। আর এটা বেহাত হতে হতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

মোটামুটি এই হচ্ছে 'মাট-কোঠার বাসিন্দা'র কাহিনী। গল্পটি একনিঃশ্বাসে পড়া যায়। 'মাট-কোঠা'র চাষীদের জীবন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই ঘনিষ্ঠভাবে। তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করে নিজের নিজের অভিজ্ঞতার। কিন্তু আসলে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। নিজেদের গ্রামের(?) বাইরে কেউ কোনোদিন যায়নি। ইতালি দেশের নাম শুনলে মনে হয় সে তো পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। রেলগাড়ি তাদের কাছে আশ্চর্য বস্তু। কোনোরকমে শুধু দিনযাপন. শুধু প্রাণধারণ, ঢিমে তালে একই ছন্দের দৈনন্দিন অনুবৃত্তি। নিজেদের ভাগ্যকে দোষী করা আর 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন' মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তর নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ-জীবন বদলাতে পারলে হত। কিন্তু নিজেদের জীবনকে পরিবর্তন করার কোনো পথের হদিশই তারা জানে না। কিন্তু তাই বলে তারা কেউ হেয় নয়। তারা মানুষ, তাদের চরিত্র মানবিকতায় সমুজ্জল। এমন কি জমিদার ও ফালিবোগার মধ্যেও সাদোভানু মানবিক সদ্‌গুণ দেখতে পান। তাদের খারাপের চেয়ে ভালোর দিকই তিনি দেখান। তাঁর কাছে তারাও মানুষ, মানবিক মানুষ। এবং সাদোভানুর কাছে তা

অস্বাভাবিক কিছু নয়। গভীর সমবেদনা ও ভালোবাসার সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই সমস্ত চরিত্রকে। তাদের দুঃখদুর্দশায় তাঁর সহানুভূতির অন্ত নেই। বইটি পড়ে পাঠক খুশি হবেন বলে আমরা আশা করি। পুরনো সামন্তবাদী রুমানিয়ার চাষীজীবনের সঙ্গে পাঠকের ঘটবে অন্তরঙ্গ পরিচয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রুমানিয়াতে নিয়ে এল হিটলারি নাৎসীবাদের চরম শোষণ ও অত্যাচার। সমস্ত দেশ জুড়ে চলল প্রতিক্রিয়ার তাণ্ডব। অবশেষে সোবিয়েত লাল-ফৌজের সহায়তায় সে-দেশ হল মুক্ত। রুমানিয়ার শ্রমিকপার্টির নেতৃত্বে শুরু হল সমাজতন্ত্রের দিকে তার জয়যাত্রা। সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের সমূলে উচ্ছেদ করে, আত্ম-শক্তিতে, সোবিয়েতের ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্যে, শুরু হল কৃষিপ্রধান ও পরনির্ভর দেশ থেকে শিল্পোন্নত-আত্মনির্ভর দেশে পরিণত হবার যাত্রা। এই প্রচেষ্টায় নানা বাধা ছিল স্বাভাবিক। রুমানিয়ার শিল্পোন্নতি রোধ করার জন্য পুঁজিবাদীরা ও পশ্চিমী শক্তিগুলি নানাভাবে চেষ্টা করেছিল গুপ্তচর ও দেশদ্রোহীদের সাহায্যে। পুরনো বুদ্ধিজীবীদের, যাঁরা দেশ ছেড়ে চলে যাননি অলীক আশায় ভর করে, তাঁদের অপরিণত রাজনীতিজ্ঞানের সুযোগ নিয়ে তারা চেষ্টা করত তাঁদের কাজ বানচাল করে দিতে। কিন্তু সফল তারা হয়নি বহুক্ষেত্রেই। দেশপ্রেমিক, কর্তব্যনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা তাদের খপ্পরে পড়েননি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন সত্যকে, চিনেছেন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সত্যকার চেহারাকে। বুঝেছেন, তাঁরা গম্বুজবাসী নন, মাটির বাস্তব পৃথিবীকে এড়িয়ে চলা যায় না ; বুঝেছেন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সঙ্গে তাঁদের সত্যকার যোগ কোথায়, দেশের উন্নতির জন্য তাঁদের কাজের মূল্য কতটা ও কি ভাবে তাঁরা সাহায্য করতে পারেন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে।

'আগাছা' নাটকটি নতুন রুমানিয়ার নতুন মানুষের এমনই একটি কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। এর মূল প্রতিপাদ্য পুরনো বুদ্ধিজীবীর রূপান্তর, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ সূত্র কী এবং স্বদেশের নতুন জীবন গড়ার কাজে তাঁর কার্যকরী সহযোগিতাই বা কি রকম। নাট্যকার বাহাদুরি সাফল্যের সঙ্গে এই সংগ্রামের বিশিষ্ট দিকগুলি, এবং জীবন ও জনগণের সঙ্গে যোগের ফলে সৎ বুদ্ধিজীবীর জীবনে যে পরিবর্তন এল ও তার ফলে সৃষ্টির যে নতুন উদ্দীপনা তিনি পেলেন তা দেখিয়েছেন। 'আগাছা' এই সমস্যাকেই সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছে যে, ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত না হলে বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব নয় ; বিজ্ঞানীরা কোনো স্থায়ী কাজই করতে পারেন না, যদি না তা দেশ ও জনগণের প্রতি ভালোবাসাজাত হয়, যদি জীবন ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা তার পেছনে না থাকে।

আন্দ্রেই বারুলিআ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি তাঁর স্ত্রী ইরিনা ও সহকারী মারিন ও ইওআনার সঙ্গে একত্রে গবেষণা চালিয়ে 'কাস্ট আয়রন' তৈরির এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁদের এই গবেষণার সময় তাঁরা আর একটি নতুন ধাতু বের করেন, তার নাম ইন্ডিআম। ইন্ডিআম ও সীসার অ্যালয় টিনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাবে। ফলে রুমানিয়াকে আর কোনোদিন বিদেশাগত ও বেশি দামের টিনের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে না। শিল্পের বিকাশে সাহায্য হবে প্রভূত। কিন্তু তাঁর এ-আবিষ্কার নষ্ট করে দিতে না পারলেও, যদি পিছিয়ে দেওয়া যায় বেশ কিছুদিন, যদি তাঁকে নিরুৎসাহ করে দেওয়া যায়, তাহলে সুবিধা এক স্বার্থসম্পন্ন ওলন্দাজ কোম্পানির। সে-চেষ্টা তারা করল

ইওআনাব মারফত। কিন্তু ইরিনা, মাবিন ও পার্টির সাহায্যে সফল হল বার্লিআর আবিষ্কাব।

মোটামুটি এই হল নাটকটিব মূল ঘটনা। এবং এই চারটি চবিত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নাটকটি। এদের আশেপাশে আমরা দেখতে পাই বার্লিআর স্কুল-জীবনের বন্ধু কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার স্তেণ জাহারেস্কু ও তার সংকীর্ণমনা, পেটি-বুর্জোয়া স্ত্রী আনিতাকে এবং বোহেমিয়ান, জীবনে-উদ্দেশ্যহীন, 'সর্ববিদ্যাবিশাবদ' ফানুস ভিক্তর দুমিত্রেস্কুকে। আব দেখতে পাই শ্রমিক পার্টির প্রতিনিধি কমরেড সেফ্রোনিকে।

বার্লিআ প্রৌঢ়, পুবনো দিনের বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানকে তিনি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখেন না। তাঁর ধাবণা বিজ্ঞানের চর্চা বিজ্ঞানের জন্যই, যদি কোনো আবিষ্কারের ব্যবহাবিক কার্যকারিতা থাকে তো থাকুক, তাতে বিজ্ঞানীর কিছুই এসে যায় না। শুধু তাই নয়, মানুষ সম্পর্কেও তাঁর ধারণা পুরনো বুর্জোয়াদের মতোই। সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন মানুষ জন্ম নিচ্ছে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক যে নতুন রূপ নিচ্ছে সে-সম্বন্ধে তিনি সচেতন নন। তাই ইওআনা—যে তাঁর প্রিয় সহকারী মারিনের স্ত্রী—তার প্রতি তিনি আসক্ত, কিন্তু তাতে প্রেমেব বলিষ্ঠতা নেই; অথচ তিনি শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন ইবিনাকে, সুখে দুঃখে দীর্ঘ পনেরো বছরের জীবনসঙ্গিনী। এবং তাঁর এই মনোভাবের ফলাফল সম্পর্কে তাঁর বিশেষ চেতনাও নেই। এটা যে শুধু তাঁব নিজের একাব ব্যাপাব নয়, এতে তাঁদের চাবজনেব জীবনেব ভালোমন্দও যে জড়িত সে-সম্বন্ধেও যে তিনি খুব সজ্ঞান তার কোনো পরিচয় আমরা পাই না। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক ও দেশপ্রেমিক। কাবখানায় পরীক্ষার ফলে যখন জানা গেল যে তাঁদের দীর্ঘ আঠাবো মাসের পরিশ্রম সফল হযনি তখন তিনি এক্কেবারে ভেঙে পড়লেন না। তখনই ভুল বের করতে শুরু করলেন। হতাশা অবশ্য এসেছিল, কিন্তু তা তিনি কাটিয়ে উঠলেন। পবে জানা গেল যে কারখানার পবীক্ষার ভুলের কাবণ সাবোতাজ এবং তার স্বীকৃতিতে বার্লিআ আরও জানলেন যে ইওআনাই ওলন্দাজ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে এই কাজ কবেছিল। তিনি ইওআনার স্বরূপ জানলেন, বুঝলেন ক্ষণিক মোহের বশে কি আগাছাকেই না ভালোবেসে স্থান দিয়েছিলেন নিজেদেব মধ্যে। তিনি বুঝলেন ইওআনা তাঁকে কোন্ অতলে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এবং ইরিনা ঠিক কী। আর সে আগাছাকে তিনি উচ্ছেদ করলেন নির্মমভাবে।

ইরিনা ও মারিন—দুজনেই বিজ্ঞানী। মারিন এসেছে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকে। নিজেব চেষ্টায় সে বিজ্ঞানী হয়েছে। পার্টি ও দেশের প্রতি অসীম ভালোবাসা তার সারা মনপ্রাণ জুড়ে। এই দুটি জিনিস ও বিজ্ঞানের প্রতি অসীম বিশ্বাস তাকে ইবিনা ও বার্লিআর প্রিয়পাত্র কবে তুলেছে। ক্ষণিকের পরাজয়ে সে আত্মবিস্মৃত হয় না, ভেঙে পড়ে না হতাশায়। নতুন উদ্যমে ও উৎসাহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সে এগিয়ে আসে আরব্ধ কাজ শেষ কবতে। এদিক থেকে ইরিনাব সঙ্গে তার মিল অনেক। দৃঢ়চিত্ততায়, কাজে একান্ত-চিত্ততায়, দেশের উন্নতির সঙ্গে নিজেদের গবেষণাকে অঙ্গীভূত করে কাজ করে যাওয়াতে তারা রুমানিয়ার নতুন মানুষ ও নতুন বিজ্ঞানীর প্রতিচ্ছবি।

আর ইওআনা—এই নাটকের 'আগাছা'। তার জন্ম বুর্জোযাব ঘরে। বাবা ছিলেন মিল-মালিক। দেশ জনগণতন্ত্রী হবার পরে যখন মিল গেল হাতছাড়া হয়ে তখনই সে আসে কাজ করতে। আলাপ হয় মারিনেব সঙ্গে ও তাকে বিয়ে করে। কিন্তু পবে সে স্বীকাব কবে যে নতুন রুমানিযাব প্রতি তার নেই বিন্দুমাত্র ভালোবাসা। নতুন

রুমানিয়ার উন্নতিতে তার কোনো আনন্দ নেই। রুমানিয়া যদি কৃষিপ্রধান আদিম জীবন নিয়েও কাটায় তাহলে তার কিছু এসে যায় না। সে চায় নিজের জন্যে সুখ, আনন্দ আর প্রেম (!)। মারিনকে সে ভালোবাসে না। বার্লিআর প্রতি সে আসক্ত, সে চায় বার্লিআর আবিষ্কার যাতে সফল না হয়, এবং চেষ্টা করে বার্লিআকে নিয়ে বিদেশে চলে যেতে; সেজন্য সে ওলন্দাজ কোম্পানির টাকা নিয়ে পরীক্ষা বানচাল করে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হয় না কোনো কিছুতেই। অবশ্য, তার এইসব কাজের উদ্দেশ্য (মোটিভ) কী, তা নাটকে খুব গভীরভাবে ফুটে ওঠেনি বলে মনে হয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আসাটাই এই ধরনের হীন কাজের ও মনোভাবের প্রধান কারণ অবশ্যই বটে, তবুও নাট্যকার ইওঅনার উদ্দেশ্য ও তার চরিত্র যদি আরও একটু পরিষ্কার করে বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে ভালো হত।

এই একটি ত্রুটি বাদ দিলে নাটকটি সার্থক। নাটকটির ও তার বিকাশে নাট্যকার উঁচুদরের মুন্‌শিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা আশা করি নতুন রুমানিয়ার এই নাটকটি বাঙালী পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

সুবিমল সেন

বিবর্তিত গ্রাম

গৌরীগ্রাম ॥ রমেশচন্দ্র সেন। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। পৃ—৩৩২। দাম পাঁচ টাকা।

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের বাজারে কোথায় যেন একটা ক্ষণদীপ্তির অভিশাপ আছে। বিগত যুগের সাহিত্যিকদের মতো কোনো দীর্ঘ নিষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথ-সুলভ সাতযুগ ধরে ক্রমাগত নতুনের মধ্যে বিকাশ দেখতে পাব বলে আশা করা সহজ নয়। ফলে, একদিকে বেস্ট্ সেলারের মরশুমী উত্তেজনা, অন্যদিকে উনিশে প্রতিভাবান, একুশে বিখ্যাত এবং তিরিশে বিস্মৃত 'সাহিত্যিক'দের করুণ সংখ্যাধিক্য।

এই অবস্থায় যখন দেখি একজন সাহিত্যিক চমক সৃষ্টি করতে না পারলেও বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই ব্যর্থতা বৃদ্ধি করেননি, নাম হওয়ার আগে যিনি কিছু ভালো লিখেছেন, নাম হওয়ার পরেও তিনি খারাপ লিখতে শুরু করলেন না, আগের বইয়ের প্রতিশ্রুতিকে পরের বইয়ে সত্যিই অগ্রসর করতে সমর্থ হলেন, তখন আনন্দিত না হয়ে পারি না। শ্রীরমেশচন্দ্র সেনের সাম্প্রতিক উপন্যাস "গৌরীগ্রাম" বাঙলা সাহিত্যের দরদী পাঠকদের কাছে তেমনি আনন্দের কারণ হবে।

ক্ষণদীপ্তির উত্তেজনা এবং বেস্ট্-সেলারি বিজ্ঞাপনের ভিড়ে প্রবীণ সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেনের নাম হয়তো এতদিনও যোগ্য সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করে উঠতে পারেনি। একথা সত্য হলে, তা আমাদের দুর্ভাগ্য। শ্রীযুক্ত সেন তাঁর বয়সী অন্যান্য খ্যাত-অখ্যাত ঔপন্যাসিকদের তুলনায় খুবই কম লিখেছেন। সম্ভবত তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচটির বেশি নয় এবং 'গৌরীগ্রাম'ই তাঁর পঞ্চম। কিন্তু আনন্দের কথা যে, এই পাঁচটি উপন্যাসেই তিনি যে ক্রমাগ্রগতির অঙ্গীকার রেখেছেন, সাহিত্যিক নিষ্ঠার যে-পথটি কেটে গেছেন, তা দুর্লভ এবং মূল্যবান।

গত মহাযুদ্ধের সময়কার পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম 'গৌরীগ্রাম'কে নিয়ে উপন্যাসের

কাহিনী। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় যুদ্ধের এরোপ্লেন। সরকার বাজেয়াপ্ত করে গ্রামের মানুষদের অন্যতম প্রধান জীবিকা নৌকা। যুদ্ধের মধ্যে একদিকে জমে ওঠে সাধারণ গ্রামবাসীদের চরম দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ এবং কণ্ট্রোলের নামে চোরাবাজার, অন্যদিকে বড়ো হয়ে ওঠে গ্রামের জোতদার হারান নন্দী, চা-বাগানের ঘুষের পয়সায় বড়লোক ফুটু ভুঁইয়ারা। এর মধ্যে গ্রামের অন্যদিকে সুকুমারের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হতে থাকে গ্রামের গরিবরা, তাদের সংঘ জনকল্যাণের মধ্যে—ধীরে ধীরে চেতনা বাড়ে, কৃষকদের অসংগঠিত বিক্ষোভ সংগঠিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় হারান নন্দীর ভাগচাষীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে।

এই পটভূমিকায় লেখক এঁকেছেন একটি মাঝি পরিবারের বিবর্তনের ছবি। নৌকা বাজেয়াপ্ত হবার পর জীবিকার সন্ধানে গোকুল রওনা হয় শহরের দিকে। শহরে বারবনিতার ঘরে চাকরি নিয়ে অপমানিত হয়ে গোকুল যায় কলকাতায়। সেখানে আগস্ট বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে মিশে ধরা পড়ে যায় জেলে। জেল থেকে ফিরে দেখে কলকাতা ভরে গেছে ভিখিরীতে, মন্বন্তরে। সে নিজেও ছন্নছাড়া বুভুক্ষু অবস্থায় একদিন ভিখিরীদের জুটিয়ে খাদ্যের দোকান লুঠ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। মারের চোটে পঙ্গু ও স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায় একদিন সে আবার ফিরে আসে গ্রামে।

গ্রামের মধ্যে গোকুলের বৌ পথ চেয়ে থাকে গোকুলের। নানা দুর্ভোগ ও অপমানের মধ্য দিয়ে অন্যের ঘরে খেটে খেটে সে মানুষ করে তুলতে চায় তার ছেলে মানিক আর মেয়ে কুমিকে। মানিক ধনীদের বাড়িতে মা'র অপমান দেখে নিজে ভাগচাষে খেটে রোজগারের চেষ্টা করে। মানিকের মধ্যে ছিল মেধা, কবিতা বাঁধার শক্তি। দুঃখকষ্টের মধ্যে সে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে জনকল্যাণের একজন কিশোর কর্মী এবং তরুণ 'কবিদাব'। সে গান বাঁধে 'আংগেরেজে আনছ মজার কল, লোক-ঠকানো কণ্ট্রোল'। চাষীদের জন্য নতুন গান শোনায়—'মজুর চাষী আমরা কিসে কম'।

উপন্যাস পরিণতি পায় ফসলের ভাগ নিয়ে জোতদার নন্দী ও চাষীদের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে। পঙ্গু গোকুল ইতিমধ্যে খানিকটা সুস্থ হয়ে এগিয়ে যায় চাষীদের মধ্যে। বলে, ছেলে যায় বাপের পথে, এবার বাপই যাবে ছেলের পথে। সংঘর্ষে মারা যায় গোকুল এন্তাজ এবং আরো কয়েকজন। কিন্তু সংগ্রাম থামে না। গোকুলের বাল্যবন্ধু ভীমই হয়ে ওঠে সেদিন চাষীদের স্বাভাবিক নেতা। গোলাপী তার ছোটো মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে কান পেতে থাকে মাঠের কলরবের দিকে। ওই কলরবের মধ্যে আছে ভীম—গোকুলের বাল্যবন্ধু, যে মানুষটা তাকে চিরকাল নীরবে ভালোবেসে গেছে, আছে তার ছেলে মানিক, যে বলে গেছে—"শেষপর্যন্ত আমরাই জেতব মা, গরিবদুঃখীরা।" এই আশা ও অপেক্ষার বাণীই উপন্যাসের শেষ বাণী।

নানা ছোটো বড়ো চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়ে রমেশবাবু উপস্থিত করেছেন এই কাহিনীকে। এ কাহিনী বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলের সত্যকার কাহিনী। তাতে তিনি ক্ষমাহীনভাবে এঁকেছেন যুদ্ধকালীন ইংরেজ সরকারের অব্যবস্থা ও আগস্ট বিক্ষোভ-দমনকারী গোরা পুলিসদের নিষ্ঠুর মূর্তিকে, আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রাম্য শোষকদের কয়েকটি জীবন্ত চরিত্র—গ্রামের অধিকাংশ জমির মালিক হারান নন্দীকে, মুখে যার 'শ্রীহরি শ্রীহরি' বুলি, লীগ মন্ত্রিসভার এম, এল,এ-দের সঙ্গে যার খাতির, এবং দারোগা-পুলিস যার মুখাপেক্ষী। এঁকেছেন হারানের বিধবা বোন সুদখোর একটি জীব—হরিমতীকে, এককণা সুদও যে ছাড়ে না, এবং পাছে কিছু ধান চাষীরা নিয়ে যায় এই ভয়ে

যে ঠায় দাঁড়িয়েছিল হাঙ্গামাব মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত স্বপক্ষের গুলিতেই যাকে প্রাণ দিতে হয। অন্যদিকে গভীর দরদের সঙ্গেই আবার রমেশবাবু ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রামের মাঝির সরল বধূ গোলাপীকে, স্বামীর জন্য তাব প্রতীক্ষা, সংসারের জন্য তার পরিশ্রম এবং স্বামীর বাল্যবন্ধু ভীমেব প্রতি অন্তলীন হৃদযাবেগের জন্য তাব ভীত অন্তর্দ্বন্দ্বকে। এঁকেছেন গ্রাম্য বিধবা বৃদ্ধা উলকি পিসিকে—সুদূর বাল্যকালে দুবাব মাত্র যে স্বামীকে চোখে দেখেছিল, এবং সারাজীবন 'সীতা সতী গৌরী সতী' করতে করতে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিযেছে; ভীমকে, উদাব, বলবান এবং সরল; মণিবাম কবিদারেব ছোট্টো বউ ভদ্রা, যে স্বামীকে ভালোবাসত, তবু ঘর ছেড়ে বেরিযে গিয়েছিল বোষ্টমী হয়ে; গোলাপীর মতো যে সহজ নয়, কিন্তু চবিত্রের আন্তবিক মাধুর্য যার বেদনায় সুন্দর; উদার সম্ভ্রান্ত মুসলিম মোদাব্বেব, যিনি গরিবদের পক্ষে দাঁড়াতে দ্বিধা করেন না। গ্রামেব এই অজস্র চরিত্রকে বিশেষ করে মেযে-চবিত্রগুলিকে রমেশবাবু এত সত্য করে হাজিব করেছেন যে তাদেব মানুষ বলে, এবং বাঙলা দেশেব গ্রামের মানুষ বলে চিনতে এতটুকু কষ্ট হয না। মানুষ সম্পর্কে, বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলি সম্পর্কে যে একটি শান্ত স্বচ্ছ বরদ উপন্যাসেব সর্বত্র তা রমেশবাবুর ইতিপূর্বেকাব লেখাব এবং এ-লেখাটিব প্রধান বৈশিষ্ট্য। শবৎচন্দ্রের অনুগামী এই স্বচ্ছ মানবিকতার সঙ্গে সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে তাঁর লেখার আব একটি মূল্যবান প্রসাদগুণ—মৃদু পরিহাসপ্রিযতা। শরৎচন্দ্রেব পর হতে গুরুত্বপ্রযাসী উপন্যাস থেকে এই গুণটিও যেন অদৃশ্য হতে শুরু কবেছে। হাস্যোজ্জ্বল মানবিকতার বদলে ভালো হলে জ্বালাময় ব্যঙ্গ এবং খাবাপ হলে অর্থহীন ভাঁড়ামিব প্রাবল্যই বর্তমানে অধিক। বমেশবাবুর লেখা পড়ে মনে হয়, বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে স্বাভাবিক দবদী পরিহাস বসটাও যথেষ্ট শক্তিশালীভাবে এখনো এবং ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হতে সক্ষম। বালক গোকুল বিযে করল, আব বয়স বাড়ল তার বাল্যবন্ধু ভীমেব, বুড়ি নিস্তাবের মুখে লাল দাড়ি দু'গাছা অদৃশ্য হযেছে দেখে তাব মৃত্যুভীতি, থানায় বন্ধ ছেলেকে দেখতে এসে থানার বাইরে থেকে বুড়িমাব হাঁক-ডাক, গ্রাম্য পুরুতের সবল অজ্ঞতা এবং পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষার কথনভঙ্গিব সবস সৌন্দর্য—চবিত্রগুলিকেই শুধু উজ্জ্বল করে তোলে না, প্রযোজন হলে তাদেব জীবনেব হাহাকারকেও গভীব করে দিযে যায়।

যুদ্ধেব বিরুদ্ধে এক সত্য প্রতিবাদ এবং বাঙলার কৃষকদের ঐতিহাসিক আশা-আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত 'গৌবীগ্রামে'ব বহুল প্রচার আশা করি।

এই প্রসঙ্গে বাঙলাদেশেব আর একজন খ্যাতনামা লেখকেব তুলনা সম্ভবত অকারণ হবে না। তিনি তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ় অঞ্চলের গ্রামেব মূর্তি এঁকে তারাশঙ্কর যখন ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত, তখন প্রকাশিত হয়েছিল রমেশবাবুর প্রথম উপন্যাস 'শতাব্দী'। এ উপন্যাসেও রমেশবাবু এনে দিলেন বাঙলা দেশেব আর এক অঞ্চলের গ্রাম—পূর্ববঙ্গ। তদানীন্তন তারাশঙ্কবের মতো বমেশবাবুর এ লেখাতেও ছিল ইতিহাস-বোধের এক মূল্যবান প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তারপর থেকে এই দুই লেখকের পথ হয়েছে ভিন্ন। 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে'ব পর তাবাশঙ্কর যখন পিছু হটছিলেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায', প্রায সেই সময়েই রমেশবাবু এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর দ্বিতীয উপন্যাস 'কুরপালা'য়। 'কুরপালা'র কাহিনীও একটি গ্রামের বিবর্তনের কাহিনী—অভিজাত জমিদাব বংশের ভাঙন, নতুন ব্যবসায়ী ও মহাজন বঙ্কিম কুণ্ডুর জমিদারি লাভ, কৃষকদের জমি গ্রাস ও সুতাকলেব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিযেই এই বিবর্তনেব পথবেখা। কিন্তু 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' যেখানে মায়ায মতিচ্ছন্ন, "কুরপালা'য সেখানে ১৯৩০ সালের গ্রামাঞ্চলেব ঐতিহাসিক দৃঢ়তা। হাঁসুলী

বাঁকে যেখানে গ্রাম ভেঙে পড়ে উপকথাব মোহপটে এবং অপ্রাকৃত বন্যার জোড়াতালিতে, 'কুরপালা'য় সেখানে দুর্দশা আসে সত্যকার জমিদাবের অত্যাচারে, মহাজন বঙ্কিম কুণ্ডুর শ্যেনবুদ্ধি শোষণে, কংগ্রেস নেতাদের আত্মবিক্রয়ের বাস্তবতায়। 'হাঁসুলী বাঁকে'র পর থেকে তাবাশঙ্কবের পিছু হটায় যখন ঐতিহাসিক সততা বিসর্জিত, তখন রমেশবাবু এগিয়ে এসেছেন 'গৌরীগ্রামে'—যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, এবং শোষকদের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের অনিবার্য সংগ্রামের ঐতিহাসিক পর্যায়ে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত লেখাতেই যেখানে পুবাতন অভিজাতদেব সম্পর্কে মোহ, রমেশবাবুর অধিকাংশ লেখাই তখন প্রধানত অতীত সম্পর্কে বিচাবশীল এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয়শূন্য।

প্রধানত, কাবণ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বমেশবাবুর দৃষ্টিতেও কমবেশি অস্পষ্টতা হযতো চোখে পডবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'গৌরীগ্রাম'-এ যে জনকল্যাণের নেতৃত্বে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হযে উঠছেন, বাস্তবে তার সত্য প্রতিরূপ খুঁজতে গেলে যুদ্ধকালীন কমিউনিস্ট কৃষক ও গ্রাম সংগঠনগুলিকেই নির্দিষ্ট করতে হয়। কিন্তু কেন জানি, সুকুমারেব জনকল্যাণ প্রসঙ্গে রমেশবাবু তাদেব কমিউনিস্ট সত্তাটি নির্দিষ্ট কবতে দ্বিধা কবেছেন। তাছাড়া, কৃষক সংগঠকদের ছবিটিও খানিকটা ভাসা ভাসা হয়েছে। যে 'বেমব্রাঁ'-বর্ণে ঐতিহাসিক নায়কদেব অঙ্কিত কবাব প্রয়োজন মার্কস জ্ঞাপন করেছিলেন, সে বর্ণগভীবতা অনুপস্থিত।

রমেশবাবুব লেখাব আর একটি সাধাবণ ঘাটতির দিক হল এই যে, তাঁব উপন্যাসে ঘটনা চবিত্রের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অনেক সময় মনে হয় তারা যেন গতিময় হযে ওঠেনি, বিচ্ছিন্ন বিবরণমূলক, ও একরঙা হয়ে আছে। মাত্র ৩৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে যে বিরাট উপন্যাসের উপকরণকে রমেশবাবু ধরতে চেয়েছেন, তাতে হয়তো এটা খানিকটা অবশ্যম্ভাবী। হয়তো তাঁর বুদ্ধিতে দেখা ইতিহাসের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী হৃদয়ের যোগ পবিপূর্ণ হযনি। শুধু ঘটনা চরিত্রের সত্য রূপরেখাই নয়, তাদের আবেগ ও বর্ণের পূর্ণতাও সার্থক উপন্যাসের পক্ষে অপবিহার্য। আবেগঘন এই জীবন্ত জগত যদি আরো ফুটে উঠত—তবে এমনিতেই যা অভিনন্দনীয়, সেই 'গৌরীগ্রাম'কে বাঙলা সাহিত্যের এক বৃহৎ সৃষ্টি বলে স্বাগত করা কঠিন হত না।

ননী ভৌমিক

মধ্যবিত্তের জীবনপ্রয়াস

মহানগরী ॥ সুশীল জানা। দিগন্ত পাব্‌লিশার্স। ২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলকাতা—২৯। তিন টাকা।

ছোট এই উপন্যাসের ভূমিকাটুকুতে লেখক বলে নিয়েছেন—এটা একটা উপন্যাসমালাব প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডটিব নাম 'কানা-গলি'—মাত্র ১৭০ পৃষ্ঠায় শেষ। মহানগরী কলকাতাব কোনো-এক বন্ধমুখ কানা-গলি : "শেষ হয়েছে খোলার চালের বিবাট এক বস্তিতে। দু-পাশে জব চার্নকেব আমলেব আদ্যিকালের কলকাতার নিচু নিচু বাড়ি। কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। পুরানো বাড়িগুলোর কি খোলা নর্দমার বোঝবার উপায নেই।" কানা-গলির এই বুদ্ধশ্বাস আব নিস্তরঙ্গ আঁবহাওয়ায় প্রধানত দু-টি নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাকুরে পবিবারের পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে এই অতি-ক্ষুদ্র উপন্যাস।

সংবাদ-সরববাহ-প্রতিষ্ঠানের চাকুরে সুধীব—সিনিক, স্কেপ্‌টিক্, সবকিছুতে তার

প্রচণ্ড অবিশ্বাস। প্রায় পঞ্চাশ-বছর বয়সী তার কেবানি দাদা হরেন—আপিস আর টিউশানি করে যে সংসারের বোঝা টেনে টেনে ক্লান্ত। হরেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্বল্পশিক্ষিতা, ভীরু যুবতী স্ত্রী মাধুরী—কানা-গলির এই বোবা আবহাওয়ায় যার যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবদমিত। হরেনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দু-টি ছেলে : রুনু যে তার ষোল-বছর বয়সের স্বপ্ন নিয়ে যক্ষ্মায় মরে গেল আর একুশ-বছরের তরুণ শৈলেন যে তার বাবার দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নিতে না পেরে আলাদাভাবে মেস-এ গিয়ে থাকে। অন্য একটি পরিবারে আছে টেলিফোন-গার্ল জয়ন্তী—জীবন-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে নতুন একটা বিশ্বাস আর চেতনার আভাস পায়। তার পঙ্গু বাবা, কিশোর-ভাই বাসুদেব, উদারপন্থী বড়ো-চাকুরে কাকা আর কিশোরী-বোন বাসন্তী, স্বার্থপর কাকিমার চাপা-চাপা অব্যক্ত কুটিলতায় যার মন এই বয়সেই সংকীর্ণ আর অকালপক্ক হয়ে উঠেছে।

প্রধানত এই দু-টি পরিবারকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ-বিরতির অব্যবহিত পরেকার কলকাতার পটভূমিকায় লেখক আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের একদিকে সর্বাঙ্গীণ ভাঙন আর অন্যদিকে এক নতুন সংগ্রামী চেতনায় তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ছবি এঁকেছেন এই উপন্যাসে। সুধীর-মাধুরী-জয়ন্তীর কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে অনেকবার এসেছে একাধিক পার্শ্বচরিত্র—সুধীরের কলেজ-জীবনের বন্ধু-বান্ধবের দল যারা এককালে ভবিষ্যৎ জীবনের রোম্যান্টিক স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু আজ যাদের অনেকেই জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত, ছত্রভঙ্গ, অবিশ্বাসী আর হৃতউদ্যম। তারক, মাখন, ডাক্তার রায়—এরা আজকের ছন্নছাড়া, লক্ষ্যহীন, খুঁড়িয়ে চলা মধ্যবিত্ত জীবনের একটা বড়ো অংশের প্রতীক। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই দিকটাই একান্ত নয়, একমাত্র নয়। সেই অন্যদিকটাও আছে এই উপন্যাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে তাদের সংগ্রামী অস্তিত্ব নিয়ে। সুধীরের সহকর্মী অবনী, কবি-বন্ধু অরুণ, টেলিফোন-এক্স্‌চেঞ্জ-এ জয়ন্তীর বান্ধবী পারুল আর অন্যান্য বাঙালী-অবাঙালী-ফিরিঙ্গি কর্মী মেয়েরা—যারা কোথাও দল বেঁধে, কোথাও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করছে, লড়াই করছে শুধু আপিসে-কর্মক্ষেত্রে উপরওয়ালার অমানুষিকতার বিরুদ্ধেই নয়, সমাজে-পরিবারে জীর্ণ কুসংস্কারের বাধাকে অস্বীকার করার কাজেও।

ছোট ছোট টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি আর ঘটনার গ্রন্থিতে গাঁথা এই উপন্যাসটি কিছুটা এপিসোডিক—ধারাবাহিকতার অভাব আছে বলে মনে হয়। তবে সুশীল জানার রচনার মুন্‌শিয়ানা সমস্তক্ষণ পাঠকের মন টেনে রাখে। কতকগুলি ঘটনা—একটু বিচ্ছিন্ন মনে হলেও—বর্ণনার গুণে জোরালো নাটকীয়তা অর্জন করেছে। যেমন, মালিকের গুণ্ডাদের লাঠির ঘায়ে বস্তি-উচ্ছেদের সময়ে নর্দমার পাশে বার্জামিস্ত্রি বৈজনাথের পুত্রবধূ পাববতিয়ার সন্তান-প্রসব।

সুশীল জানার লেখনী সংযত আর পরিণত, তাঁর ভাষা স্বচ্ছ আর সাবলীল, কাহিনীর আবহাওয়া গড়ে তোলায় তাঁর ক্ষমতার পরিচয় আছে এই বইয়ে আগাগোড়া। বিশেষ করে, জীবনের স্বপ্ন চাপা-পড়া কানা-গলির সংকীর্ণ আর দম-আট্‌কানো অবরুদ্ধ আবহাওয়াটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জীইয়ে রাখার ব্যাপারে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই বইয়ের দুর্বলতার দিক হচ্ছে এর অসম্পূর্ণতা। হয়তো একটা বড়ো উপন্যাসের খণ্ড হিসেবেই এই অসম্পূর্ণতাটুকু এতে থেকে গেছে। কিন্তু উপন্যাস-মালার প্রতিটি খণ্ড-উপন্যাসেরও মোটের ওপর একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করা দরকার। তা নইলে পাঠক-মনে একটা অতৃপ্তির ভাব থেকে যায়। 'মহানগরী' ('কানা-গলি') পড়ার পর এই অতৃপ্তিটা জাগে এর গল্পাংশের পরস্পর-অসম্পর্কিত বা ঢিলেঢালাভাবে সম্পর্কিত

এপিসোডিক ধবনধারনেব জন্যে তো বটেই। তাছাড়া, বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের—বিশেষ কবে প্রধান পাত্রপাত্রীদেব—চবিত্রের বিকাশ আর বিবর্তনের দিক দিযেও এই উপন্যাসে অসম্পূর্ণতা আছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলির যে-বিকাশের আশা পাঠকের মনে জাগে, লেখক সে আশা মেটাননি। এতগুলে ঘটনার পরেও তাব সমস্ত বুদ্ধিগত উপলব্ধি, বিচক্ষণতা আর সচেতনতা নিয়েও নায়ক সুধীর শেষপর্যন্ত একইবকম নির্বিকাব আর সিনিক থেকে গেল। মাধুরী তার প্রথম দিকের ভীরুতা আর আড়ষ্টতা শেষের দিকে কিছুটা কাটিয়ে উঠলেও সেও অসহায়ত্বের চেতনায় পালাল তার গ্রামের বাপেব বাড়িতে। একটি উজ্জ্বল চরিত্র জযন্তী— যে তার বিশ্বাসের সংগ্রামী বলিষ্ঠতা কিছুটা পবিমাণে নিজের আশেপাশে সঞ্চারিত কবতে পেরেছে। কিন্তু সুধীব আর তাব বন্ধুদের নিয়ে অন্যান্য চরিত্রগুলি বেশ কিছুটা বিমূর্ত বা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্‌ থেকে গেছে। এই অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শনের জন্যই সুশীল জানার মতো শক্তিমান লেখকও কাহিনীর সূত্রে বা চরিত্রগ্রন্থনে কোনো কোনো জায়গায় বাঁধা-ধরা ছক এড়াতে পারেননি। অরাঙালী টেলিফোন-গার্ল পম্মজ যখন পাবুলের মাথায় হাত বুলিযে বলে "পুবানা ঘব্‌কা বাত্‌ ছোড়্‌ বহিন। মুঝলোগ নয়া ঘর বনায়েঙ্গী" কিংবা মাধুরীব সঙ্গে সংলাপে সুধীব যখন বাববার নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের রূপক-অর্থে কানা-গলির প্রসঙ্গে বলে "ওই সমস্ত খোলাপথ এসে মাথা ঠুকছে আমাদের এই কানা-গলিতে—মাধুরী বিশ্বাস ক'বো না" অথবা কবি অরুণ যখন সুধীরকে বলে "শুধু বিপ্লবই তাকে (অর্থাৎ তার ভূতপূর্ব প্রেয়সী মালতীকে) জন্ম দেবে" তখন এসব কথা বেশ একটু কৃত্রিম, মামুলি আর বক্তৃতাগন্ধী বলে মনে হয়। স্থানবিশেষে মানুষ যে এমন কথা বলে না, তা নয়। কিন্তু গল্পের পাত্রপাত্রীদের দিয়ে এসব কথা বলাবাব আগে উপযুক্ত ঘটনার আবহাওযা সৃষ্টি করতে হয এবং সেই পটভূমিকায় পাঠকমনে একটা আন্তরিক আবেগের তীব্রতা সৃষ্টি কবতে হয—যা না কবলে এ ধবনের কথাবার্তা ঠিক স্বাভাবিকতা পায় না, জোব করে চাপানো একটা কৃত্রিম অতি-নাটকীয়তাব আভাস এসে যায়। আনন্দেব কথা, এই ধবনের অতি-নাটকীয়তা এই উপন্যাসের মাত্র দু-চার জায়গায় আছে।

আজকেব মধ্যবিত্ত জীবনেব দৈনন্দিনতা আব মানসা, তার দুর্বলতা আর সংগ্রামেব আশা-আকাঙ্ক্ষা নিযে মোটের ওপর একটা সর্বাঙ্গীণতায ফুটেছে—এটা এই উপন্যাসের সার্থকতাব দিক। এর ঘটনাব বিচ্ছিন্নতা আব চরিত্র-বিকাশেব অসম্পূর্ণতাটুকু পরবর্তী খণ্ডে পূর্ণতা আব পরিণতি পাবে বলে আশা কবি।

রবীন্দ্র মজুমদার

ADVANCING TO COMMUNISM : F. Dubkovetsky. As. 6
TWO COLLECTIVE FARMS :
G. Nikolayeva & P. Azhirkov. As. 6
CURRENT BOOK DISTRIBUTORS : 3/2, Madan St. Cal-13.

সোবিযেত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায সমস্ত জমির মালিক সেখানকার জনসাধাবণ। সমস্ত চাষেব কাজই হয সাম্যবাদেব নীতিব ভিত্তিতে। উৎপাদনেব অন্যান্য ক্ষেত্রেব মতো কৃষিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সেখনে আব নেই। নেই জমিদার প্রভৃতি শোষণকারীবা। নেই ছোট ছোট জমির মালিক হিসেবে সাধারণ কৃষকও। ছোট ছোট খেতের বদলে আজ সেখানে আছে সত্যিকাব দিগন্তবিস্তৃত খেত। একজন নয়, দুজন নয়,

কলেক্‌টিভ ফার্ম-এর সমস্ত চাষীই তার মালিক। সমস্ত জমিই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ফার্ম ও কলেক্‌টিভ ফার্ম-এর অধীনে। চাষের কাজ হয় সমবায় প্রথায় আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও উন্নততর কৃষিবিজ্ঞানের সহায়তায়। ফলে শস্যোৎপাদন বেড়েছে প্রচুর, কিন্তু কমেছে চাষীর দৈহিক শ্রম। আজকে সেখানে চাষীরা পেয়েছে নিজেদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সুযোগ। আধুনিক সভ্যতার সমস্ত কিছুই তার করায়ত্ত। আজকে তাকে জমি চাষ করে আকাশের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করতে হয় না জলের জন্যে। তার জন্যে বিজ্ঞানকে সে ব্যবহার করছে, খাল কেটে সে জলের ব্যবস্থা করছে; এমন কি শস্য ও মাটির প্রকৃতিও বদলে ফেলছে বিজ্ঞানের সাহায্যে। সয়েল ইরোশন-এর ফলে মাটি পতিত হবার ভয় নেই—বরং বিজ্ঞানের সাহায্যে জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়িয়ে সে আজ উৎপন্ন করছে আগের তুলনায় চতুর্গুণ ফসল। গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গোরু তার কাছে আর স্বপ্ন নয় বাস্তব সত্য। তার দেশ আজ সত্যিই ধনেধান্যে-পুষ্পে-ভরা।

কিন্তু আজকের এই ঐশ্বর্য তারা পায়নি জাদুর সাহায্যে, কোনো আলাদীনের প্রদীপও তাদের হঠাৎ বড়লোক করে দেয়নি। এর জন্যে তাদের মেহনত করতে হয়েছে। সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও অনেকদিন তাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে জমিদার ও কুলাকদের সঙ্গে। সে সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম ছিল না। বহু রক্তপাত করে, বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, কৃষকদের অন্ধ সংস্কার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে জয় করে এই কলেক্‌টিভ ফার্ম-এর জন্ম। এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার সময় বহু ভুলত্রুটি ঘটেছে। কিন্তু সেগুলো শুধরে নিয়ে, সোবিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে শস্য-শ্যামল কলেক্‌টিভ ফার্ম।

এই কলেক্‌টিভ ফার্ম সম্বন্ধেই লেখা এই বই দু'টি দুবকোভেত্‌স্কির 'অ্যাডভান্সিঙ্‌ টু কমিউনিজম' শুধু তাঁর আত্মজীবনী ও 'গেইন্‌স অব অক্‌টোবর' ফার্ম-এর উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির কাহিনী নয়। সোবিয়েতে কলেকটিভ ফার্ম প্রতিষ্ঠার পথি-কৃৎদের মধ্যে দুবকোভেত্‌স্কি একজন। ১৯২২ সালের ৭ই নভেম্বর জন্ম নেয় সোবিয়েতের সর্বপ্রথম স্থাপিত কলেক্‌টিভ ফার্মগুলির একটি—তার নাম হয় 'মৌচাক আর মৌমাছি'। পরে এর নাম পালটে রাখা হয় 'গেইন্‌স অব অক্‌টোবর'। দুবকোভেত্‌স্কি এর জন্ম থেকেই এর চেয়ারম্যান। বহু বাধাবিঘ্ন, বহু ভুলত্রুটি অতিক্রম করে ধীরে ধীরে এই ফার্ম সারা সোবিয়েতের আদর্শ ফার্মগুলির একটি হয়ে ওঠে। যখন এঁরা কাজ শুরু করেন তখন কোনোরকমের আদর্শ ছিল না এঁদের সামনে। কিভাবে কাজ করতে হবে, কৃষকদের ব্যক্তিগত জমি আদৌ থাকবে কিনা, তারা বাস করবেই বা কিভাবে—একটা বিরাট বাড়িতে কমিউন করে, না নিজের নিজের আলাদা বাড়িতে—কাজের ধারা হবে কিরকম, ফার্ম-এর উৎপন্ন শস্যাদি ভাগ হবে কিভাবে—এসব কোনো প্রশ্নের সমাধান তখনো হয়নি, কোনোরকম চিন্তাও বিশেষ ছিল না এসবের উত্তরের জন্য—শুধু এটুকু জানা ছিল—পুরনো পদ্ধতিতে চাষ করা আর চলবে না, পুরনো জীবনযাত্রা পদ্ধতিও বদলাতে হবে—নতুনভাবে সমস্ত কিছু করতে হবে—লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক কৃষিপদ্ধতি। কোন্ পথে, কিভাবে? নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ও কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় আস্তে আস্তে এঁরা সে-সব প্রশ্নের সমাধান করে এগিয়ে চলেন সুখসমৃদ্ধির ও জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে—সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে। তারই সুন্দর বিবরণ দুবকোভেত্‌স্কির এই বইটি।

গালিনা নিকোলায়েভা ও আঝিরকভ-এর লেখা 'দুটি কলেক্‌টিভ ফার্ম' বইটি দুবকোভেত্‌স্কির চেয়ে স্বতন্ত্র। এই বই দু'টি থেকে আজকের সোবিয়েত কলেক্‌টিভ

ফার্ম-এর চাষীরা সোবিয়েত সরকারের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য নিয়ে শস্যের প্রাচুর্য গড়ে তোলবার জন্য কিভাবে কাজ করছে তারই সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই। গালিনা নিকোলায়েভা বর্ণনা করেছেন রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের একটি কলখজ (কলেক্‌টিভ ফার্ম)। সেখানকার জমি ছিল অনুর্বর, কলখজ-এর অন্যান্য বিভাগ, পোল্‌ট্রি ফার্ম, পিগ ফার্ম, ক্যাটল ফার্মও ছিল না আশানুরূপ অবস্থায়। ১৯৩৮ সালে সেখানে এলেন নতুন একজন অ্যাগ্রোনমিস্ট (কৃষিবিজ্ঞানী) ভাসিলি মিখাইলোভিচ বুশাইয়েভ—পরে অবশ্য তিনি এই 'ট্রাক্টর কলখজ'-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে জমিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে আস্তে আস্তে সেখানে জমির ফলন বাড়তে শুরু করল। কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানকার উৎপাদন বেড়ে গেল আগের চেয়ে দু'গুণেরও বেশি। শুধু শস্যের ফলনই যে বাড়ল তা নয়, অন্যান্য বিভাগেও উন্নতি দেখা গেল। কেন? উত্তর হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্ত কাজ করবার জন্য। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা নিকোলায়েভা দিয়েছেন অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষায়। তাঁর বইটি কিন্তু কৃষককে বাদ দিয়ে কৃষির বর্ণনা নয়। কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাঠককে পরিচিত করেছেন সোবিয়েত কৃষিকর্মীদের সঙ্গেও—তাদের জীবনধারা, কাজের প্রতি তাদের মনোভাব সব কিছুর সঙ্গেই।

আঝিরকভ লিখেছেন তাঁর নিজের পরিচালনাধীন বোরেত্‌স কলখজ-এর কথা। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব দিয়ে দেখিয়েছেন সোবিয়েত কলখজ-এর উন্নতির প্রকৃতি। কলখজ-এর আয় হয় কিভাবে, কি কি খাতে এবং তা বণ্টনই বা হয় কিভাবে। সেই সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে "বোরেত্‌স কলখজ' গড়ে উঠল পুরোগামী (ফ্রন্ট র‍্যাঙ্ক) কলখজ হিসাবে।

এই বইদুটির মারফত পাঠক পরিচয় পাবেন সোবিয়েতের কৃষিপদ্ধতির। পরিচয় পাবেন নতুন সোবিয়েত কৃষকের, যারা আর প্রকৃতির দাস নয়, প্রকৃতি আজ যাদের দাস। আজ সোবিয়েত কৃষক প্রকৃতিকে পাল্টাচ্ছে নিজের প্রয়োজনে, অনুর্বর জমিকে করছে উর্বর, মরুভূমিকে পরিণত করছে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা প্রান্তরে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিজয় অভিযানে তাদের প্রধান হাতিয়ার বিজ্ঞান। কিন্তু এ সব থেকেও কাজ বিশেষ কিছু হত না যদি না সে দেশে প্রতিষ্ঠিত হত সমাজবাদী ব্যবস্থা ও কলেক্‌টিভ ফার্ম। কারণ, এই বিজয় অভিযান চালানো কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতার বাইরে। এর জন্যে প্রয়োজন সমাজের সকলের সমবেত প্রচেষ্টা। প্রয়োজন সকলের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সমাজের সকল মানুষের জীবন আরও সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ করে তোলবার জন্য সকলের শুভেচ্ছা।

সুবিমল সেন



সংস্কৃতি সংবাদ

পঁচিশে বৈশাখ

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির বর্ষপঞ্জীতে তিনটি স্মরণীয় তারিখ খুব কাছাকাছি। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন— যে রবীন্দ্রনাথ এ-যুগের বাঙালীর সবচেয়ে বড়ো এক পরিচয়। শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের জীবনের সর্ববিভাগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুহীন স্বাক্ষর। পঁচিশে বৈশাখ তাই আমাদের সবচেয়ে স্মরণীয় আর অবশ্য-পালনীয় জাতীয়-দিবস। পঁচিশে বৈশাখ-কে কেন্দ্র করে তাই রবীন্দ্র-উৎসব পালনের ব্যাপারটা দেশের সর্বত্র ক্রমশই ব্যাপকতা পাচ্ছে, প্রতিবছরই আগের বছরের তুলনায় পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানের সংখ্যা রীতিমত বেড়ে চলেছে। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের এই সার্বজনীনতা এবারে বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা গেছে। শহরের পাড়ায় পাড়ায়, শহরতলিতে আর গ্রামে বড়ো থেকে অতিক্ষুদ্র সবরকমের প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংঘ, ইশ্‌কুল, কলেজ, আপিস-কর্মচারীদের ইউনিয়ন ইত্যাদি সর্বত্র এবারের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব বিশেষ আগ্রহ আর আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। আমাদের আজকের ধ্যান-ধারণা-জীবনবোধ আর সব মিলিয়ে একটা সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধির প্রধান উৎস যে রবীন্দ্রনাথ, আমাদের মানস-অস্তিত্বের প্রধানতম প্রতীক যে রবীন্দ্রনাথ—তারই স্বীকৃতি রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের এই সার্বিক আর স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপকতা।

কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের সংখ্যাতীত অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। সেটা হচ্ছে সাধারণভাবে অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে যুগোপযোগী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুন ব্যাখ্যা শোনা-জানার আগ্রহ। প্রতিবারের মতো এবারেও 'অফিসিয়াল' পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠান যথারীতি হয়েছে, 'অনুমোদিত' অনুষ্ঠানও হয়েছে একাধিক যেখানে জনতার ভিড় ঠেকাবার জন্যেই হয়তো প্রবেশার্থীর পক্ষে টিকিট কেটে ঢোকার নিয়ম চালু করতে হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে জাঁকজমকের আড়ম্বরটাই প্রধান হয়ে উঠতে দেখা যায়। তাছাড়া, এ সব জায়গায় ভাষণ ইত্যাদি যা দেওয়া হয়ে থাকে তা এতোই মামুলি, কৃত্রিম আর অতি-ভক্তির উচ্ছ্বাসে আবিল যে আজকের শ্রোতার দল আর তাতে বিশেষ আগ্রহ-নিবিষ্ট হন না। এই সব সাহিত্য-ব্যবসায়ী অধ্যাপক-সমালোচক-বক্তারা সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সেই এক চিরকেলে অতিমানবিক ভাববাদী ব্যাখ্যার স্কুলপাঠ্য পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন দিনের পর দিন। ইতিমধ্যে আমাদের জাতীয় জীবন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গত এক দশকে প্রচণ্ড ওলোট্-পালটের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দিকে যেমন, তেমনি নূতন সৃষ্টির প্রয়াসের দিকেও এই জাতীয় জীবনের গতি রীতিমত বেগ সঞ্চয় করেছে। এই ভাঙা-গড়ার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় মানসে কোথাও সুস্পষ্টভাবে, কোথাও অস্পষ্টভাবে একটা নতুন চেতনা এসেছে। সে চেতনার ভিত্তি গণমুখাপেক্ষী একটা ব্যাপক সামাজিক উপলব্ধি—বাস্তব জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি থেকে প্রেরণা আহরণ করার উপলব্ধি; বস্তুজগতের থেকে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মানস-ঐশ্বর্যগুলিকে বিচ্ছিন্ন না করে, যুক্ত করে দেখার উপলব্ধি। এ উপলব্ধিও আমরা পেয়েছি

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই—যে-রবীন্দ্রনাথ সংসারের শত-কর্মে-রত আর-সকলের সংস্পর্শ থেকে পালিয়ে গিয়ে দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি উদাসীন হাওয়ায় তরুছায়ে একা বসে বাঁশি বাজানোর বিরুদ্ধে কবিকে উঠে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছিলেন আজ থেকে ষাট বছর আগে। কিন্তু একথা ভাববাদবিলাসী এই সব রবীন্দ্রসাহিত্য-ব্যবসায়ীরা প্রাণপণে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেন ; রবীন্দ্রনাথকে এঁরা এক অতীন্দ্রিয় লোকের কুঠুরীতে তালা বন্ধ করে রেখে চাবির গোছাটা যেন পকেটে নিয়ে ঘুরছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত বলেই, আমরা—সাধারণ মানুষরা—রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে আজকের জীবনসন্ধানের বাস্তব আর প্রত্যক্ষ নির্দেশ পেতে চাই . প্রাণের মূঢ় অপচয়ের বিরুদ্ধে, ক্ষয় আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে সৃষ্টিশীল আত্মপ্রতিষ্ঠার কার্যকরী প্রেরণা পেতে চাই। তাই, আজ আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গতানুগতিক কূপমণ্ডুকসুলভ তত্ত্বগতভাষণ শুনে মন ভরে না। তাই, অসংখ্য রবীন্দ্র-উৎসব-সভায় আজ বাস্তববাদী আর প্রগতিশীল সাহিত্যিক-সমালোচক-ব্যাখ্যাকারদের ডাক পড়েছে। জীবনের আর সমাজের নতুন চেতনায় যাঁরা উদ্বুদ্ধ, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি বলেন, কি ভাবে রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁরা তাঁদের সামাজিক-মানসিক সৃষ্টির কর্মক্ষেত্রে প্রেরণা আহরণ করেন—এসব কথা শুনবার জন্যে সাধারণ সাহিত্যানুরাগী মানুষের এক বিরাট অংশ আগ্রহশীল।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে গিয়ে আর দেখাতে গিয়ে, তাঁর রচনাবলীর যুগোপযোগী, বাস্তবমুখাপেক্ষী, নতুন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যিক-সমালোচকদের অনেক সময়েই ভুল হয়। অনেক ক্ষেত্রে অতি-কথন প্রশ্রয় পায়। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে ফর্মুলায় ফেলে ব্যাখ্যার প্রয়াসে আরেক ধরনের কূপমণ্ডুকসুলভ সংকীর্ণতার পরিচয় ফুটে ওঠে। অনেক সময়ে রবীন্দ্ররচনাবলীর বিশালতাকে সমগ্রভাবে না ধরে, শুধু দুটো-চারটে বচনাকেই অতিগুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডিতভাবে উপস্থিত করা হয়। যেমন, অনেক সময়ে দেখেছি, নোগুচি আর মিসেস ব্যাথবোন-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় চিঠি দু-খানি, "হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য" কবিতায় জাপানী সৈন্যদের কৃত্রিম যুদ্ধভক্তিবিলাসের ওপর কবির নিদারুণ কশাঘাত, "সভ্যতার সংকট"-এ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড অভিশাপ আর "রাশিয়ার চিঠি"তে সাম্যবাদী নবজীবনের উদ্দেশে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন—শুধু এইগুলিই বারবার করে উল্লেখ করা হয় রবীন্দ্রনাথকে "প্রগতিশীল" বলে "প্রমাণ" করার চেষ্টায়। এসব রচনা যে রবীন্দ্রনাথের কীর্তিপর্বতমালার একেকটি অতিবিশিষ্ট সমুন্নত চূড়া, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, রবীন্দ্ররচনাবলীর মর্মগ্রহণে সমগ্রতার বোধে না এসে, শুধু এইটুকুর মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখাটা মস্তবড়ো ভ্রান্তি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রত্যেকটি মহাকবিই মূলত তাঁর দেশের ও কালের সামাজিক-মানসিক জীবনের সমগ্রতাকে প্রকাশ করেন। সম-সাময়িক জীবনের সংঘর্ষ-বিরোধের দ্বান্দ্বিক সূত্রের টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে একটা উপলব্ধির সংহতি এনে তাকে সাহিত্যে রূপায়িত করেন। সেই সৃষ্টির পেছনে থাকে তাঁর একটা সামগ্রিক সাধর্ম্যব্যাপ্তি (কম্‌প্রিহেন্‌শন্‌)। সমসাময়িক কালের ব্যাপক মানবিক অভিজ্ঞতাগুলির এক সামগ্রিক চেতনা আর সেই চেতনার প্রকাশ যে যে-কোনো সাহিত্য-সৃষ্টির গোড়ার কথা—একথাটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হই বলেই আমাদের এই ধরনের সব খণ্ডিত আর সংকীর্ণ বিচারের ভুল ঘটে মাঝে মাঝে।

কিন্তু এরকম ভুল কিছু কিছু হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ এই নতুন আর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করার চেষ্টা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দিকে তাই,

এই ধরনের প্রয়োগক্ষেত্রের ভ্রান্তি কিছু পরিমাণ ঘটবেই। ইতিমধ্যে, পঁচিশে বৈশাখ বছরে বছরে ঘুরে আসবে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে, মননে আর চেতনায় আরও ব্যাপক, আরও সর্বাংগীণ প্রতিষ্ঠা পাবেন; পঁচিশে বৈশাখকে কেন্দ্র করে আমরা প্রাণের উৎসব উদ্‌যাপন করতে থাকব বছরের পর বছর।

ঊনত্রিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখের অব্যবহিত পরেই আসে ঊনত্রিশে বৈশাখ—সুকান্তের উদ্দেশে স্মৃতিতর্পণের দিন। এক হিসেবে দেখতে গেলে পঁচিশে বৈশাখের পরে ঊনত্রিশে বৈশাখ যেন একটা প্রতীকী তাৎপর্য পায়। রবীন্দ্রনাথ যে জনতার জীবনের শরিক আর মাটির কাছাকাছি-থাকা কবির বাণীর জন্যে কান পেতে ছিলেন, সুকান্ত সেই বাণীরই এক আশ্চর্য কাব্য-সম্ভাবনাকে বয়ে এনেছিল। মাত্র একুশ বছর বয়সে সুকান্তের অকালমৃত্যু তার রচনায় পূর্ণতা আর পরিণতির সম্ভাবনাকে খণ্ডিত করে দিয়ে গেছে। কিন্তু তবু, সুকান্ত যে অবিসংবাদিতরূপেই সংগ্রামী জনসাধারণের কবি, তার কবিতার বহুল আর ব্যাপক প্রচারই একথার অন্যতম প্রমাণ। সুকান্তের মতো এতো অল্প বয়সে আর এতো অল্প লিখে আর কোনো কবি আমাদের জনসাধারণের হৃদয়ে এতবড়ো জায়গা জুড়ে বসতে পারেননি। সুকান্তের কবিতার বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষতা, তার প্রকাশভংগির সরল আর ঐতিহ্য-অনুসারী গ্রহণযোগ্যতা আর সর্বোপরি তার আশ্চর্য আবেগের আন্তরিকতাই তাকে আমাদের জনসাধারণের মনে এতো কাছাকাছি আনতে পেরেছে। সুকান্তের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিদের একাংশের মধ্যে যে কৃত্রিম একটা বুদ্ধিজীবিসুলভ তির্যক ভংগি ছিল বা আছে, কবিতার রচনাশৈলির আর প্রকাশভংগিতে মৌলিকতার নামে এক ধরনের দুর্বোধ্যতা আছে এবং কাব্যের সহজ আবেগের জায়গায় একটা চেষ্টাকৃত মননপ্রয়াস আছে, সুকান্তের কবিতা এসব থেকে একেবারেই মুক্ত। পক্ষান্তরে, সংগ্রামী সাধারণের কথা বলতে গিয়ে সুকান্ত কোথাও তার রচনার কাব্যপ্রসাদগুণকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি, বাস্তবতার নামে সে ছন্দোবদ্ধ সাংবাদিকতা করেনি। সুকান্তের কবিতা যে সহজ কাব্যসৌন্দর্যের পথে এসে জীবনের সংগে যুক্ত হয়েছে—এইটেই সুকান্ত সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা।

সুকান্ত-স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে তার রচনাবলীকে আরও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পরিচয় করিয়ে দেবার একটা কার্যক্রম যদি নেওয়া যায়, তাহলে ভালো হয়। বছর দুয়েক আগে একবার প্রস্তাব উঠেছিল সুকান্তের কবিতার একটা বাছাই করা সংকলনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের। প্রস্তাবটিকে অবিলম্বে সংগঠিতভাবে কার্যকরী করা উচিত—বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত প্রয়াসে সুকান্তের যে কয়েকটি কবিতা সম্প্রতি ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে, তা অনুবাদ হিসেবে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। বাংলা প্রগতি-লেখক সংঘ যে সুকান্তের নামে একটা বার্ষিক সাহিত্য-পুরস্কার দেবার প্রস্তাব নিয়েছেন তাঁদের এবারকার সম্মেলনে, এটাও খুব ভালো কথা। এর জন্য অর্থসাহায্যের আহ্বানে, আশা করি, সাহিত্যানুরাগীরা সোৎসাহ সাড়া দেবেন। তাছাড়া, আরেকটি জিনিসের বিশেষ চাহিদা আছে বলে মনে করি ঃ সুকান্তের প্রকাশিত কাব্যপুস্তকগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই বেশ কিছুসংখ্যক অপরিণত কবিতা স্থান পেয়েছে যেগুলি সুকান্ত বেঁচে থাকলে ছাপার অক্ষরে বেরোত কিনা সন্দেহ ; প্রত্যেকটি বই কেনাও কোনো একজন ক্রেতার পক্ষে অধিকাংশক্ষেত্রেই সম্ভব নয়; তাই, সুকান্তের সার্থক আর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটা বাছাই করা সংকলন প্রকাশ করলে সাধারণ লোকের বিশেষ

সুবিধে হয়। তাতে অবশ্য আলাদা আলাদা বইয়ের বিক্রি কিছুটা কমে গেলেও, সুকান্তের কবিতার ব্যাপকতর প্রচারের কথা ভেবে, আশা করি, প্রস্তাবটি সুকান্তের বইয়ের প্রকাশকরা ভেবে দেখবেন।

এগারোই জ্যৈষ্ঠ

নজরুলের পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে এবার তিনি লণ্ডনগামী এক জাহাজের যাত্রী। দীর্ঘ-কালের রোগভোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাতে তিনি বাঙলার কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রকে আবার সোনার ফসলে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন, সেই আশায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিদেশের চিকিৎসালয়গুলিতে। ইওরোপযাত্রার আগে থেকে কিছুদিন ধরে তিনি বাঁচির মানসিক রোগের চিকিৎসাগারে ছিলেন। সেখানকার ডাক্তাররা তাঁর রোগমুক্তির সম্ভাষনার আশ্বাস দিয়েছেন। যদি সত্যিই নজরুল সুস্থ হয়ে ওঠেন, তাহলে তিনি আবার আগেকার মতো অগ্নিগর্ভ কবিতা রচনা করতে পারুন বা না পারুন, তাঁর নিরাময়টুকুই হবে একটা মস্ত বড়ো লাভ। আমাদের মধ্যে তাঁর সুস্থ আর প্রাণোচ্ছল উপস্থিতিটাই আবার প্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে। আজকের দুই বাঙলার নানান্ দুর্বিপাকের গ্লানিকে কাটিয়ে উঠে যে সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধ বাঙালী হিন্দু-মুসলমানে মনে এক নতুন উপলব্ধি আনছে, নজরুল সেই মিলিত উপলব্ধির সব-চেয়ে বড়ো প্রতীক। তাই নজরুলের চিকিৎসার জন্যে, তাঁর বিদেশ যাত্রার জন্যে দুই বাঙলার জনসাধারণ মিলিতভাবে অর্থসাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, আরও এগিয়ে আসবেন—কারণ, নজরুলকে সুস্থ করে তোলার সবরকম চেষ্টা করার জন্যে আরও অর্থের দরকার।

রবীন্দ্র মজুমদার

গণনাট্য-সম্মেলন

চার বছর বাদে এবার বোম্বাইতে গণনাট্য-সংঘের সারা-ভারত সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল গত ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বেশ কিছুদিন থেকেই একটা নতুন নাট্যআন্দোলনের প্রয়াস দেখা দিয়েছে, যার পেছনে গণনাট্য সংঘের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণাকে অস্বীকার করা যায় না। নতুন আর ভালো নাটক সম্বন্ধে জনসাধারণের সত্যিকার আগ্রহ আর চাহিদা দেশের সর্বত্র—শহরে, মফস্বলে, পাড়ায় পাড়ায়—নাট্যসম্প্রদায়, গানের দল ইত্যাদির জন্ম দিচ্ছে। আমাদের নাট্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন যে একটা নতুন মোড় নিতে চাচ্ছে—এটা তারই একটা মস্তবড়ো সুলক্ষণ। কিন্তু আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করছে। এই সব প্রচেষ্টাকে মোটামুটি একটা সুসংগঠিত রূপ দিতে না পারলে আন্দোলন শক্তিশালী হবে না—এটাও অনুভব করা যাচ্ছিল। সেই সংগঠিত রূপ যাতে দেওয়া যায়, গণনাট্য-আন্দোলনকে যাতে নতুনভাবে শক্তিশালী আর সৃষ্টিশীল করে তোলা যায়, আমাদের নাট্য-সংস্কৃতিকে যাতে নতুন সজীবতায় জীইয়ে তোলা যায়—এসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে পথনির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে এবারকার গণনাট্য সম্মেলন ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সাতদিনব্যাপী সম্মেলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা বিশেষ উৎসাহ আর আগ্রহ নিয়ে প্রত্যেকটি প্রস্তাবের আলোচনায় যোগ দেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের যোগদান। এবারকার সম্মেলনে

গণনাট্য-সংঘের বাইরেকার অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের যোগদানও একটা উল্লেখযোগ্য দিক। তাছাড়া, সংগঠনিকভাবে না হলেও ব্যক্তিগতভাবে বহু বিখ্যাত নাট্যকার, অভিনয়শিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, সিনেমাশিল্পী, পরিচালক ইত্যাদি যোগদান করেন। গণনাট্য- সম্মেলনের এই ধরনের ব্যাপক অনুষ্ঠান এর আগে হয়নি। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উদয়শঙ্কর, সুসজ্জিত আর সানাই-মুখরিত সম্মেলন-মণ্ডপে প্রায় দশ হাজার নর-নারীর উপস্থিতির উদ্দীপনার মধ্যে। সভাপতি-মণ্ডলীতে ছিলেন বাঙলার নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্র সেনগুপ্ত, মহারাষ্ট্রের নাট্যপরিচালক শ্রীচিন্তামণি রাও কোল্‌হাটকর, দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রী টি সম্মুখম্, পাঞ্জাবের গায়িকা শ্রীমতী সুরিন্দর কাউর, বোম্বাইয়ের সিনেমা-গল্পলেখক ও পরিচালক খাজা আহ্‌মেদ আব্বাস ও ফণী মজুমদার, উত্তর ভারতের নাট্যকার ও লেখক অমৃতলাল নাগর এবং আসামের গীতিকার অধ্যাপক আবদুল মালেক। তাছাড়া বিভিন্ন অধিবেশনে চিত্রপরিচালক বিমল রায়, ইংরেজ সিনেমা-শিল্পী হার্বার্ট মার্শাল, গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম নেতা অন্নাভাও সাঠে, নাট্যকার-অভিনেতা শ্রীতুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি ভাষণ দেন।

প্রতিনিধি-সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশের রিপোর্ট পাঠের পর সংগীত, নাটক আর সিনেমা সংক্রান্ত তিনটি কমিশনের বৈঠক বসে এবং প্রতিনিধিদের আর তরুণ গণনাট্যকর্মীদের পক্ষে এই কমিশনগুলির আলাপ-আলোচনা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ হয়। ঘোষণাপত্র, প্রস্তাব—ইত্যাদির আলোচনাতেও বিশেষ উৎসাহ নিয়ে সবাই যোগদান করেন। কিন্তু সবচেয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় সাতদিনব্যাপী সম্মেলনের প্রতিদিনের শেষে চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন প্রদেশের গণ-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। তামিলনাদ, কেরল, আসাম, পাঞ্জাব, রাজস্থান, কর্ণাটক, পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসংগীত; বাঙলার নাটক; দিল্লীর নৃত্যনাট্য; মণিপুর, মহারাষ্ট্র, উত্তর-প্রদেশ, অন্ধ্রের নৃত্য; ইত্যাদি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল, উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছিল সকলের কাছ থেকে। পক্ষান্তরে অনেকগুলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিল্পগত অনুত্তীর্ণতার জন্যে কঠিন সমালোচনাও পেয়েছে দর্শকদের কাছ থেকে। এইসব দুর্বল আর অসার্থক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যর্থতা থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়েছে যে সংগীত-নাটক-নৃত্য ইত্যাদির বিষয়বস্তুটা যতই ভালো হোক না কেন, আর্ট হিসেবে তাকে শিল্প-রসোত্তীর্ণ করে তুলতে না পারলে সেটা কোনো তাৎপর্য পাবে না, জনসাধারণকে তা অনু-প্রাণিত করতে পারবে না। বিষয়বস্তুর বাস্তব বলিষ্ঠতা আর শিল্পগত রসোত্তীর্ণতা —এই দুইয়ের উপযুক্ত সমন্বয়েই আর্টের গণমুখাপেক্ষী সার্থকতা।

নিরঞ্জন সেন

শান্তির স্বপক্ষে

বিশ্ব শান্তি ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলন

পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বলতর সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে ১৯৫৩ সাল। দেশে দেশে নানা দল নানা মতের এত বেশি লোক এর আগে আর কখনও শান্তির জন্যে এত ব্যাকুল হয়নি, শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে এত বেশি সংগঠিত, সংঘবদ্ধ হয়নি। সারা পৃথিবীর মন আর কখনও এমন করে একসুরে বাঁধা পড়েনি, এমন করে একটি মাত্র শব্দে বিশ্ব-মানবের মনের কথাটি আর কখনও ব্যক্ত হয়নি।—শান্তি, শান্তি চাই।

হিংস্র হিংসা, ষড়যন্ত্র আর কুৎসার কুৎসিত অন্ধকারে শান্তির দীপশিখাটি আঁচল আড়াল দিয়ে নিয়ে এল ১৯৫৩ সাল।

আর বিশ্ব-মানবের এই মর্মবাণী আজ নতুন করে মুখর হয়ে উঠল আবার শান্তি-সমৃদ্ধির দেশ সোবিয়েত ইউনিয়নের কণ্ঠে। সোবিয়েতের নীতি অবশ্য চিরদিনই শান্তির নীতিঃ পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্রের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ বসবাসের নীতি; জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, সহযোগিতা, সমান অধিকার ও পরস্পরের স্বাধীনতা অঙ্গীকারের নীতি। তবু এই ১৯৫৩-য় সোবিয়েতের শান্তির ডাক এত অপ্রতিরোধ্য, সহযোগিতার প্রসারিত হাত এমন অব্যর্থলক্ষ্য যে সে-ডাকে সাড়া দিতে সে-হাত ধরতে সবচেয়ে অনিচ্ছুক যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—সারা পৃথিবীতে সেই রাষ্ট্র আর তার হিংসার নীতি আজ সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন, সবচেয়ে বেশি কোণঠাসা। সোবিয়েত আর চীনের শান্তি-সহযোগিতার ডাক এমন কি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধলিপ্সুদের 'সুখী পরিবার'-এও গৃহবিবাদ ঘটাচ্ছে। কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি বিষয়ে চৌ এন লাইয়ের প্রস্তাব, বন্দী-বিনিময় ব্যাপারে কোরীয়-চীন পক্ষের মীমাংসা-প্রস্তাবের পর আজ ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীও বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার বৈঠক বসানোর কথা বলছে, আমেরিকার কথামতো ইন্দোচীনে ভিয়েৎ-মিনের 'আক্রমণের' প্রশ্নটি সম্মিলিত জাতিসংঘের বৈঠকে উত্থাপন করতে অস্বীকার করছে ফ্রান্স। আর ক্রমশ-কোণঠাসা আমেরিকা একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে—পররাষ্ট্র-সচিব জন ফস্টার ডালেসকে মুস্কিল-আসান করতে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে বিশ্ব-পর্যটনে, ইওরোপে আর এশিয়ায়, দূর প্রাচ্যে আর মধ্য প্রাচ্যে আমেরিকার যুদ্ধ-নীতির স্বপক্ষে ছলেবলে-কৌশলে সমর্থন আর সহযোগিতা আদায়ের জন্যে।

হিংস্র হিংসা, ষড়যন্ত্র আর কুৎসার কুৎসিত অন্ধকারে তবু শান্তির দীপশিখাটি আঁচল আড়াল দিয়ে নিয়ে এল ১৯৫৩ সাল।

এই আন্তর্জাতিক অশান্ত পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল কলকাতায়, গত ১৫ই থেকে ১৭ই মে। সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল সেই সময়ে—ভারতীয় শান্তি-আন্দোলনের নেতা, শান্তি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্তালিন-পুরস্কারবিজয়ী ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলুর ভাষায়—যখন "শান্তির শিবির যুদ্ধের শিবিরের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী", যখন "যুদ্ধোন্মাদদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার বাস্তব সম্ভাবনা সমুপস্থিত।"

প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল এমন এক সময়ে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার ব্যাপারে ভারতবর্ষ আর তার গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। বিশেষ করে এশিয়ায়

জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ, আয়তন ও ভৌগোলিক সংস্থানের দিক থেকে ভারতবর্ষের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। এবং বর্তমানে তা এতই অনন্যসাধারণ যে ডাঃ কিচলুর উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা চলে, "সোবিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পাশে বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে আজ যদি ভারতবর্ষও দাঁড়ায় তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা হবে সুদূরপরাহত।"

সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল এমনি এক তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে, বিশ্বশান্তি রক্ষায় ভারতবর্ষ যখন ক্রমশ তার দায়িত্বপালনের যোগ্য হয়ে উঠছে। সারা ভারত শান্তি সংসদের সম্পাদক শ্রীরমেশ চন্দ্রের ভাষায়, যখন "ভারতবর্ষের জনগণের শান্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে চলেছে, ভারতীয় শান্তি আন্দোলনে জয়ের সূচনা ঘটেছে।" জনমতের চাপে ভারত গবর্নমেণ্ট দক্ষিণ কোরিয়া থেকে যখন মেডিক্যাল মিশন কার্যত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সেই সময়ে, এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু যেদিন পার্লামেণ্টে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সোবিয়েতের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করলেন, কোরিয়ায় যুদ্ধ-বন্দী বিনিময় বিষয়ে কোরীয়-চীন পক্ষের আট-দফা প্রস্তাবকে সমর্থন করে বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলির আলোচনা বৈঠকের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন, ঠিক সেইদিনই সম্মেলনের এই অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

এবং এবারের সম্মেলনের আকৃতি ও তার তিনদিনের অনুষ্ঠানের প্রকৃতি থেকেও এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ভাবতের ও পশ্চিমবঙ্গের শান্তি-আন্দোলন আগের চেয়ে বেশি ব্যাপ্ত, বেশি প্রতিনিধিমূলক হয়ে উঠেছে, এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দ্রুত নিজ দায়িত্ব গ্রহণেব উপযুক্ত হয়ে উঠছে। এক কথায়, এদেশের শান্তি-আন্দোলন এতদিনে শৈশবাবস্থা অতিক্রম করতে চলেছে। একদিকে আন্তর্জাতিক অবস্থার পটপরিবর্তন সম্পর্কে চেতনা ও সেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে পা-মেলানোর চেষ্টা অন্যদিকে একই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জাতীয় রূপ পরিগ্রহের প্রচেষ্টা, জাতীয় আশা-আকঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সামঞ্জস্য ও সংগতিসাধনের প্রয়াস—এ-সম্মেলনের একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

সভাপতিমণ্ডলীতে দল-মত-পেশার বিচিত্র সমাবেশ, উপস্থিত প্রতিনিধি, নিমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শকদের সংখ্যা এবং প্রতিনিধিত্বের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে বিপুল জনসমাবেশ প্রমাণ করেছে, বহুবিচিত্র এমন কি পরস্পরবিরোধী দল-মত-আদর্শ ও পেশার মানুষকেও একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ করে ব্যাপক প্রতিনিধিমূলক গণ-অন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে এদেশের শান্তি-আন্দোলন। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বৈজ্ঞানিক ; কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীশচীন সেনগুপ্তর মতো সাহিত্যিক ; শ্রীঅতুল বসু ও শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো চিত্র ও নাট্যশিল্পী ; ডাঃ ত্রিগুণা সেনের মতো শিক্ষাবিদ ও ডাঃ এ সি উকিলের মতো চিকিৎসাবিদ ; ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো সাংবাদিক। এছাড়া বিশিষ্ট শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও শ্রমিক নেতারাও ছিলেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। মণ্ডলীর প্রধান ছিলেন ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের ব্যবহারজীবী শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী।

উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে আর কোনও প্রাদেশিক শান্তি-সম্মেলনে এত বিভিন্ন দল-মত-পেশার মানুষ এত বেশি সংখ্যায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। এবার কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪৬২ জন প্রতিনিধি ও ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি, ২২৮ জন দর্শক ও প্রায় দু'শো আমন্ত্রিত অতিথি সম্মেলনে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-সংগঠনের নানা স্থানীয় ও আঞ্চলিক শাখা-সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছাড়া একাধিক শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, লেখক, চিত্র ও নাট্যশিল্পী, চিকিৎসাবিদ, ব্যবহারজীবী, শিক্ষক, ছাত্র ও মহিলা

সংগঠনের সভ্যরাও প্রতিনিধি, দর্শক ও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সম্মেলনে যোগ দেন। আরও আসেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৬ জন ও উড়িষ্যা থেকে একজন ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি।

এমন কি সাধারণ মানুষ—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এ-পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় শান্তি-আন্দোলন সম্পর্কে যাঁরা বেশ কিছুটা নিরুৎসাহ ছিলেন—তাঁরাও যে আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন, ক্রমশ আন্দোলনের নিকটবর্তী হচ্ছেন, প্রকাশ্য অধিবেশনে এবার হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশের মধ্যে তার প্রমাণ মিলল। শান্তি-আন্দোলনে এমন জন-সমর্থন এর আগে আর দেখা যায় নি।

অন্যদিকে সম্মেলনের প্রকৃতি বা তিনদিনব্যাপী প্রতিনিধি-সম্মেলন, কমিশন-বৈঠক ও প্রকাশ্য অধিবেশনে আলাপ-আলোচনা ও প্রস্তাবের বিষয় ও ধরন থেকে একথা আরও স্পষ্ট যে এদেশে শান্তি-আন্দোলন এতদিনে পরিণত, দায়িত্বশীল গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছে, শান্তি-প্রতিষ্ঠাকে কার্যকরী করে তোলার মতো দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠছে। সম্মেলনে আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় বহু পরস্পরবিরোধী মতামত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উগ্রতা ও দলীয় সংকীর্ণতা ইত্যাদি প্রকাশ পেলেও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মত ও নিম্নতম মতৈক্যই অর্জিত হয়েছে এবং মঞ্চ থেকে গালভরা অবাস্তব প্রস্তাব গ্রহণ না করে জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ও আশু কার্যকরী হওয়া সম্ভব এমন সমস্ত প্রস্তাব ও দাবি উপস্থিত করা হয়েছে।

এবারকার সম্মেলনের পরিণত প্রকৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ এই যে, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার আলোচনায় শিল্প-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবার যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়েছে। সম্মেলনে "শান্তি ও সংস্কৃতি" নামের কমিশনে বাংলার বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিক যোগ দেন এবং এই কমিশন একটি প্রস্তাবে দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের কাজে শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সর্বশক্তি নিয়োগ ; চলচ্চিত্র ও প্রচার-পুস্তিকা মারফত সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিবিদ্বেষের প্রচার রোধ ; লেখক-শিল্পী-শিক্ষাব্রতী-বিজ্ঞানী-চিকিৎসাবিদ-ইঞ্জিনিয়ার-সাংবাদিক-ব্যবহারজীবী-ছাত্র ইত্যাদি সম্প্রদায় ও জীবিকার ভিত্তিতে বিভাগীয় সম্মেলন আহ্বান ; আন্তঃ-প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক বিনিময়—পরস্পরের সাহিত্য তর্জমা ইত্যাদি; ভারত ও অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ; আগামী বছর ২৫শে বৈশাখ "জাতীয় রবীন্দ্র-দিবস" হিসেবে উদ্‌যাপন ও সে-উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলনের নেতাদের আমন্ত্রণ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন কমিশনের বৈঠকে অন্যান্য যে-সমস্ত বিষয় আলোচিত হয় ও যে-সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলি এইরকম ঃ

"তৃতীয় যুদ্ধের আশংকা" নামে প্রস্তাবে অবিলম্বে পঞ্চ বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের আবেদন জানানো হয়। "কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি" প্রস্তাবে কোরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ এবং নিরপেক্ষ ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মিলিত সম্মেলন আহ্বানের দাবি জানানো হয়। "ঔপনিবেশিক প্রশ্ন ও শান্তি" প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-গুলির দ্বারা পরিচালিত ঔপনিবেশিক যুদ্ধ, সন্ত্রাসনীতি ও বর্ণবৈষম্যের রীতি বন্ধ করার ও সমস্ত উপনিবেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানো হয়। "জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তি" প্রস্তাবে যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজে ভারতের জল, স্থল ও আকাশপথ ব্যবহারের এবং ভারত, পাকিস্তান ও কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ বিরোধ মীমাংসায় বিদেশী হস্তক্ষেপের প্রতি-

বাদ কবা হয এবং সর্বপ্রকার বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসাব দাবি জানানো হয়। "পাক-ভারত সম্পর্ক" প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা, পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ও উভয়ের জাতীয় সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির আবেদন জানানো হয়। "ডালেসের ভারত আগমন" প্রস্তাবে জনসাধারণের কাছে মিঃ ডালেসের যুদ্ধলিপ্সু ও চক্রান্তকারী স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের অঙ্গীকার করা হয়। এবং "শান্তি ও ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন" নামের প্রস্তাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতি ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তার প্রতিকার হিসেবে ভারত গবর্নমেণ্টের কাছে এই মর্মে দাবি জানানো হয় যে, কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে রাজনৈতিক শর্ত-কণ্টকিত কোনো ঋণ বা টেক্‌নিক্যাল সাহায্য নেওয়া চলবে না, সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীন বাণিজ্যের নীতি কার্যকরী করতে হবে, দেশের সামরিক বাজেটের ব্যয় হ্রাস করতে হবে, ইত্যাদি।।

সম্মেলন বহুক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করলেও এই তিনদিনের অনুষ্ঠানেব মধ্যে দিয়ে এদেশে শান্তি-আন্দোলনের কতকগুলি গুরুতব অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির দিকও আব একবার লোকচক্ষে উদ্‌ঘাটিত হল।

শান্তি-আন্দোলন এদেশে পুরোপুরি প্রতিনিধিমূলক গণ-আন্দোলন হিসেবে এখনও গড়ে ওঠেনি। এখনও পর্যন্ত দেশের অসংখ্য সমাজসেবী সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক প্রতি-ষ্ঠান, দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী ও অসংগঠিত নবনারী এ-আন্দোলনের আওতার বাইরে রয়ে গেছেন। এখনও এ-আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবং এই দল, গোষ্ঠী ও কর্মীদের অধিকাংশই আবার বামপন্থী। আজও আন্দোলনকে একাংশেব দলীয় বুদ্ধি ও সংকীর্ণতা দিয়ে আচ্ছন্ন কবার চেষ্টা দেখা যায়, আজও কখনও কখনও শান্তি-আন্দোলনের ব্যাপ্ত গণতান্ত্রিক চরিত্রকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির প্রতিরূপ বলে ভুল করা হয়। এবং এইভাবে আন্দোলনের প্রসারে বাধার সৃষ্টি হয।

সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে শান্তি-আন্দোলনের অপর একটি গুরুতর দুর্বলতার দিক আবও একবার উদ্‌ঘাটিত হল। সেটি হচ্ছে, আন্দোলনে সাধারণভাবে দেশের বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতি-বিদদের একটি অগ্রণী অংশ, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের অনুপস্থিতি। অথচ একথা অনস্বীকার্য যে-কোনো দেশে শান্তি-আন্দোলনকে পুরোপুরি কার্যকরী করে তুলতে হলে এই বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের সংঘবদ্ধ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

তবু, এবাবের সম্মেলনে যে অভিনব চেতনা, কর্মপ্রেরণা ও পদ্ধতিব সাক্ষাৎ মিলল, সে-জোয়ার অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় এ-সমস্ত ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা একদিন কোথায় ভেসে যাবে।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পাঠকগোষ্ঠী

কার্ল মার্কস্-এর "স্বীকারোক্তি"

মহাশয়,

সদ্যপ্রাপ্ত বৈশাখ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ আপনারা কবিলিপিতে যে প্রশ্নোত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্য আপনারা রবীন্দ্র-ভক্ত পাঠক মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিতেছে কার্ল মার্কস-এর জীবনেও ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। পরিচয়-এর পাঠকবর্গের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যেমন ঔৎসুক্য আছে, মার্কস সম্বন্ধেও হয়তো তেমন থাকিতে পারে। এই ধারণায় ঘটনাটির বিবরণ আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি।

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ডের শিক্ষিতমহলে একরকমের খেলার চলন ছিল, যাহার নাম "স্বীকারোক্তি", (কনফেশন্স্)। ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর এই খেলার বিশেষত্ব। মার্কস্-এর দুই কন্যা, লরা ও জেনি একসময়ে তাহাদের বাবাকে এই খেলায় যোগ দেওয়াইতে পারিয়াছিল। যে কাগজের খণ্ডটিতে তাহাদের প্রশ্ন ও মার্কস-এর উত্তর লিপিবদ্ধ ছিল তাহা হারাইয়া যায়; তাহার পুনরুদ্ধার হয় মার্কস-এর মৃত্যুর পরে। এই খেলার ভাষা ছিল ইংরেজী। মার্কস্-এর "স্বীকারোক্তি" নীচে দেওয়া গেল।

Confessions :

Your favourite virtue—**Simplicity.**
Your favourite virtue in man—**Strength.**
Your favourite virtue in woman—**Weakness.**
Your chief characteristic—**Singleness of Purpose.**
Your idea of happiness—**To fight.**
Your idea of misery—**Submission.**
The vice you excuse most—**Gullibility.**
The vice you detest most—**Servility.**
Your pet aversion—**Martin Tupper.**
Favourite occupation—**Bookworming.**
" Poet—**Shakespeare, Aeschylus, Goethe.**
" Prose writer—**Diderot.**
" Hero—**Spartacus, Kepler.**
" Heroine—**Gretchen.**
" Flower—**Daphne.**
" Colour—**Red.**
" Name—**Laura, Jenny.**
" Dish—**Fish.**
" Maxim—**Nihil humanum a me alienum puto. [I regard nothing human as alien to me.]**
" Motto—**De omnibus dubitandum. [Doubt everything.]**

KARL MARX.

ইহা স্পষ্ট যে 'স্বীকারোক্তি'গুলি হলফ করিয়া করা হয় নাই। খেলাচ্ছলে লিখিত হইলেও ইহার মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে।

কতকগুলি উত্তর নিছক রহস্য। তাঁহার প্রিয় ফুলের নাম 'ড্যাফ্‌নি'; কেননা ইহা 'লরেল-জাতীয় ফুল, আর লরেল-এর সহিত লরা-র সংযোগ সহজবোধ্য। এবং তাঁহার প্রিয় 'ডিশ্' হইল 'ফিশ' ইংরেজী ভাষায় মিলের টানে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি আপন স্ত্রীকে লইয়া সরস ব্যঙ্গ। ফ্রাউ মার্কস ছিলেন মার্কস্-এর সুদীর্ঘ ও কঠোর জীবনসংগ্রামে উপযুক্ত সঙ্গিনী। তাঁহাদের চারিটি সন্তানের অকালমৃত্যু ঘটে অর্থাভাবে। সাংসারিক জীবনে মার্কসকে যে অপমান সহিতে হইত তাহাতে ফ্রাউ মার্কস-এর অন্তর বিদীর্ণ হইত। ইহার জন্য মাঝে মাঝে তিনি যে দুঃখ প্রকাশ করিতেন, মার্কস্-এর মন্তব্যে তাহারই প্রতি সানুরাগ কটাক্ষ রহিয়াছে। যে "সরলতা"-কে মার্কস্ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন তাঁহার প্রিয় গুণ, তাহা তাঁহাদের দুজনের জীবনেই অবিসংবাদিতভাবে বিদ্যমান ছিল।

আপন চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব কি, এই প্রশ্নের 'উত্তরে' মার্কস্ লিখিয়াছেন, উদ্দেশ্যের ঐকিকতা, অর্থাৎ ব্রতনিষ্ঠা। একটিমাত্র ব্রতের সাধনে সমস্ত জীবনকে নিবেদন করার যে উদাহরণ মার্কস-এর জীবনে পাওয়া যায়, তাহা সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে দুর্লভ। সংগ্রামেই যে তাঁহার আনন্দ ও নতিস্বীকারেই দুঃখ, এ উক্তিগুলি, মনে হয়, পরিহাসের পরিধি ভেদ করিয়া গিয়াছে। ইহাও সত্য যে দাসত্ব-কে তিনি ভাবিতেন সব চেয়ে ঘৃণার্হ। কিন্তু কোন্ অপরাধকে সবচেয়ে সহজে মার্জনা করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কস যখন লেখেন প্রবঞ্চিত হইবার প্রবৃত্তি, তখন স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি নিজেকে লইয়াই ব্যঙ্গ করিতেছেন। কারণ, অসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও, মার্কস্ অনেক সাংসারিক বিষয়ে ছিলেন মহাঅনভিজ্ঞ, এবং চতুর লোকের পক্ষে তাঁহাকে ঠকানো মোটেই কঠিন ছিল না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে তাঁহার প্রিয় পেশা, প্রকৃত পক্ষে, বই ঘাঁটা; তাঁহার জ্ঞানের বিস্তার ছিল বিশ্বকোষের মতো; একাধারে এমন পাণ্ডিত্যের সমাবেশ বিস্ময়কর ও অতুলনীয়। একথা মনে রাখিলে সহজেই বোঝা যায় কেন মার্টিন টাপার নামক ইংরেজ লেখকের রচনা তাঁহার "প্রিয় বিরক্তি"। টাপার নাম এখন একেবারে লুপ্ত; কিন্তু এক সময়ে তাঁহার "প্রোভার্বিয়াল ফিলসফি" নামক অতিতুচ্ছ গ্রন্থ দশ লক্ষ কপিরও বেশী বিক্রয় হইয়াছিল।

কাহারা তাঁহার প্রিয় কবি? মার্কস্-এর উত্তর। —শেক্‌সপীয়র, ঈস্‌কিলাস, ও গ্যেটে—তাঁহার রচনার সহিত পরিচিত পাঠকের নিকট উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। প্রিয় গদ্য-লেখক হিসাবে দিদেরো-র নামকরণে বোঝা যায় সাহিত্যিক গুণবিচারে মার্কস-এর অমোঘ দৃষ্টি; দিদেরো-র রচনাশৈলীর সমাদর শতাব্দীরও অধিককালের ব্যবধানে না কমিয়া নিরন্তর বাড়িতেছে। মার্কস-এর প্রিয় বীরপুরুষ দুইজন; একজন কর্মবীর স্পার্টাকাস ও অন্যজন বিজ্ঞানবীর কেপলার। ইঁহাদের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। হাওয়ার্ড ফাসটের-এর উপন্যাসে মার্কস-এর প্রিয় বীর নূতন জীবন লাভ করিয়াছে; কেপলার-এর সংগ্রামশীল জীবনকথা আজও অনুরূপ পুনরুজ্জীবন লাভ করে নাই, ইহা আমাদের পক্ষে অগৌরবের কথা।

গ্যেটেব ফাউস্‌ট্‌-এর নায়িকা যে হইবেন মার্কস্‌-এর প্রিয় নায়িকা তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তবে, কাহারো কাহারো ধারণায়, এই স্বীকারোক্তিতে আছে রহস্যের অন্তরালে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ। গ্রেচেন-এর অনেক মাধুর্য ফ্লাউ মার্কস-এর চবিত্রে বিদ্যমান ছিল।

মার্কস্‌-এর শেষ দুটি স্বীকারোক্তি লাতিন ভাষায়। একটির অর্থ যাহা কিছু মানবীয় তাহা আমার পর হইতে পারে না; অন্যটির, সব কিছুই বিচাব করিবে। যে মহাজীবনের লক্ষ্য ছিল সর্বমানবের মুক্তি ও পদ্ধতি ছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, তাহার পক্ষে ইহার চেয়ে উপযোগী বাণী বা মন্ত্র খুঁজিযা পাওয়া দুষ্কর।

পরিশেষে স্বীকার করিতেছি, এই পত্রের তথ্যাদি রিয়াজানোভ হইতে গৃহীত।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

বাস্তববাদ প্রসঙ্গে

'পরিচয়'-এ 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদ' প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধটি যে মূলত একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সমস্ত বিষয়টিব ওপব আলোকপাত করেছে, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে স্থানে স্থানে বক্তব্য অস্পষ্ট।

ননীবাবুই বলেছেন, "প্রকৃত বাস্তববাদ হল সাহিত্যে প্রকৃতই বাস্তবকে প্রতিফলিত করা।" এই সূত্র ধরে কি একথা বলা যায় না যে তারাশঙ্কর বা সতীনাথ ভাদুড়ীর আলোচ্য বইগুলিতে আমাদের দেশের এক বিশেষ সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে? "হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়" প্রধান বক্তব্য তো আমাদের মনে হয়েছে কিভাবে আধুনিক যন্ত্রযুগ বা বিশেষভাবে, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশের গ্রামগুলিকে তছনছ করে দিচ্ছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর "ঢোঁড়াই চরিত মানস"ও বিহারের অমানুষিক গবীব গ্রামগুলোব এক নিখুঁত জীবনচিত্র। অবশ্য একথা অস্বীকার কবার উপায় নেই যে ঢোঁড়াইয়ের চরিত্র মোটেই আশানুরূপ পরিণতি লাভ করেনি। কিন্তু তাহলেও সমগ্র সৃষ্টিটিকে অস্বীকার করা যায় কি করে?

ননীবাবু লিখেছেন, "বাস্তবক্ষেত্রে এদেশে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদেব প্রতিষ্ঠাব ফলে সমাজের সম্যক অভিজ্ঞান এবং জীবনের প্রান্তক্ষেত্রের সত্যটুকুই মাত্র নয়, সবচেযে মূলসত্য সবচেয়ে সংগ্রামী এবং সবচেয়ে গভীব ভাবসম্পদ অর্জন বর্তমান বাংলা সাহিত্যেব পক্ষে সম্ভব এবং প্রকৃত বাস্তবতাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়েছে একথা কি বলা চলে?

আমাদের দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থাটা সাহিত্যের অসম্পূর্ণতাগুলির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এ অবস্থায় 'টাইপিক্যাল' চরিত্র সৃষ্টিও সম্ভব হয় না। কাবণ তা যথেষ্ট প্রতিনিধিমূলক হবে না যেহেতু আমাদের চারপাশে এই ধরণের চরিত্রের যথেষ্ট অভাব।

শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,
সালকিয়া।

বাংলা মঞ্চে গোর্কি

ফাল্গুনের পরিচয়ে 'বাংলা মঞ্চে গোর্কি' শিরোনামায় বেহালার শৌখিন নাট্যসংঘ কর্তৃক গোর্কির 'মা' এর অভিনয়ের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। পড়ে মনে হল গোর্কির 'মা'-এর বাংলা নাট্যরূপের প্রকাশ্য অভিনয় ওই ৬ই ফেব্রুয়ারির অভিনয়টির আগে আর হয়নি। অর্থাৎ ওইটিকেই প্রথম অভিনয় হিসেবে ধরা হয়েছে। ৬ই ফেব্রুয়ারীর অভিনয়টিকেই যদি প্রথম অভিনয় বলে মনে করা হয়, তবে সেটার মধ্যে একটু ভুল আছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫২) বহরমপুর ক্রান্তি শিল্পী সংঘ একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অংশ ছিল গোর্কির 'মাদারের' বাংলা নাট্যরূপের অভিনয়। এই অভিনয়কে রূপদান করেন ক্রান্তি শিল্পীসঙ্ঘের শিল্পীবৃন্দ। বাংলা নাট্যরূপটি রচনা করেন স্থানীয় কোনো নাট্যকার। এই অভিনয় দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং বলতে পারি অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সেইদিক দিয়েও এবং প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবেও এই আয়োজনটি যথোচিত স্বীকৃতির দাবি রাখে। নমস্কার, ইতি—

গৌরী চট্টোপাধ্যায়,
চুঁচুড়া।

পরিচয়ের কবিতা

দীর্ঘকাল যাবৎ আমি পরিচয়ের একজন পাঠক। কিন্তু কিছুকাল থেকে পরিচয়ের কবিতাগুলি পড়ে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারছি না। বিশেষ করে স্তালিন-সংখ্যার মঙ্গলাচরণ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি দু'একজনের কবিতা ছাড়া অধিকাংশ কবিতাই হতাশ করেছে। শুধু স্তালিন-সংখ্যাই নয়—অন্যান্য সংখ্যাতেও কবিতাপদবাচ্য নয়, এমন রচনা প্রকাশিত হতে দেখেছি। খ্যাতনামাদের রচনা এবং অজানা লেখকের রচনা উভয়েই হয় গতানুগতিকতায় নয় স্থূল অক্ষমতায় পীড়িত। পরিচয়ের তুলনায় অন্য কাগজে যে ভালো কবিতা প্রকাশিত হয়, তাও বোধ হয় নয়। কারণ কি জানি না। কর্তব্য নির্ধারণের ভার আপনাদের। আমি শুধু এই দিকটায় আপনাদের এবং কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই খুশি হব। নমস্কার। ইতি—

সত্যকিঙ্কর রায়,
কলকাতা।



সম্পাদকীয়

অভিষেক

একটি অভিষেক আমরা চেয়ে এসেছি বারবার; ক্ষুধা আর নগ্নতা আর অবমাননার ধূমাঙ্কিত কালির মধ্যে একটি উৎসবের প্রতীক্ষা আমরা বহন করেছি দীর্ঘ দিন। এ-প্রতীক্ষা ভাষা পেয়েছে আমাদের সাহিত্যে, আমাদের কবিতায়, আমাদের রবীন্দ্রনাথে।

সে-অভিষেক মানুষের। আমরা চেয়েছি উৎসব জাগুক ক্ষমতার জন্য নয় ফসলের জন্য, কবিতার জন্য, বিজ্ঞানের জন্য; আমরা চেয়েছি মাথায় মুকুট তুলব দেশজননীর, রাজা করব শিশুদের। ইতিমধ্যে কৃত্রিম কণ্ঠস্বরে ঘোষণা হয়েছে স্বাধীনতার, ধীরে ধীরে তা বিবর্ণও হয়ে গেছে। শুধু রুক্ষ হয়েছে আমাদের প্রতীক্ষা—শুধু আরো ক্ষুধিত হয়ে উঠেছে আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

সহসা আজ কলরব জেগেছে অভিষেকের। সন্দেশখালীতে যে-শিশু ক্ষুধায় প্রাণ দিয়েছে, ঘরে লাস চাপা রেখে যে-মা ভিক্ষায় বেরিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর রাজ-শকট তার কাছে এসে থামল না, সে-শকট গেল ইংরাজ মহারানীর পাদদেশে, নত মস্তকে তাঁর স্বর্ণাঞ্চল চুম্বনের মদির উৎসবপ্রাঙ্গণে।

কিন্তু এ কীসের প্রহসনে যোগ দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী? ভারতবর্ষের তিরিশ কোটি জীবন আর দু'শো বছর ধরে প্রতীক্ষমান সমস্ত পূর্বপুরুষদের ক্ষুধিত অতৃপ্ত চোখ স্থির হয়ে আছে ওই উৎসবের দীপ্তির দিকে; কারণ, ও-দীপ্তি যে আমাদের, আমাদেরই ঘর থেকে চুরি করা কোহিনূর মণির ঝলক! ও যে আমাদের, আমাদেরই ক্ষুধিত দেশবাসীর রক্তজলকরা মেহনতের স্বর্ণ-টঙ্কার! এ যে আমাদের, আমাদেরই প্রতিবেশী মিশর-কেনিয়া-মালয়বাসীদের বিরুদ্ধে হত্যাভিযানের গুরু গুরু শব্দ।

অপরাধ-চেতন পণ্ডিতজী বোঝাতে চান এ-রাজসম্মান আনুষ্ঠানিক, এ-দাসসমাবেশ লজ্জার নয়।

কিন্তু কাকে বোঝাবেন তিনি? ভারতবর্ষের কোটি কোটি টাকা ব্রিটিশ মূলধনের যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ প্রত্যেকটি যন্ত্র চিৎকার করে বলছে, মিথ্যা কথা! বন্দরে বন্দরে পণ্যবাহী প্রত্যেকটি ক্রেন সাক্ষ্য দেবে—মিথ্যা কথা! সমর-বিভাগের প্রতিটি মানচিত্র, প্রতিটি গোপন পরিকল্পনা মাথা নাড়বে—মিথ্যা কথা!

'মিথ্যা কথা' ফাঁস করে দিয়েছিলেন স্বয়ং চার্চিল ঃ এ শুধু ব্যবসার খাতিরে ট্রেডমার্কের বদল। 'মিথ্যাকথা' ঘোষণা করছে দৈনন্দিন সংবাদপত্র ঃ শুধু অভিষেকই নয়, আসলে আয়োজন হয়েছে ছোট্ট একটু সম্মেলনের, তাতে চার্চিলের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হবেন কমনওয়েলথ-প্রধানমন্ত্রীরা। সেখানে স্থির করে দেওয়া হবে ভারতসমেত বিভিন্ন কমনওয়েলথ দেশের অর্থনীতি, এবং বিশেষ করে নির্দিষ্ট করা হবে চার্চিলের সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির প্রতি ভারতবর্ষ ও অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশের সমর্থন।

পণ্ডিত নেহরুর স্তোকবাক্য আমরা তাই মানতে রাজী নই। ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বের নামে সম্রাজ্ঞীর রাজ্যাভিষেকের প্রতি এতটুকু আনুগত্য প্রকাশের কোনো অধিকার কোনো প্রধানমন্ত্রীর নেই, থাকতে পারে না। আমরা চাই সাম্রাজ্যবাদী কমনওয়েলথ রাজনীতি থেকে ভারতবর্ষের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ। আমরা চাই অভিষেক,—অভিষেক প্রকৃত স্বাধীনতার, প্রকৃত শান্তির।

সূচীপত্র

দ্বাবিংশ বর্ষ ঃঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃঃ ষষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৬০

ভাষা-সমস্যার স্বরূপ ও মীমাংসা		৪১৯
ভাষা-সমস্যার মূলসূত্র	গোপাল হালদার	৪২৩
কবিতা	বিষ্ণু দে	৪৩২
	পূর্ণেন্দু পত্রী	
ছোটগল্পের রচনারীতি ও প্রেমেন্দ্র মিত্র	অচ্যুত গোস্বামী	৪৩৫
ভূদান (গল্প)	সুধীর করণ	৪৪৩
পরিচয়-এর কুড়িবছর	হিরণকুমার সান্যাল	৪৫২
স্তালিনঃ স্মৃতিচিত্র	জাঁ-রিশার ব্লখ্	৪৬০
পুস্তক-পরিচয়	লীলা মজুমদার	৪৬৭
	রবীন্দ্র মজুমদার	
	সত্য গুপ্ত	
	ননী ভৌমিক	
চলচ্চিত্র	মণীন্দ্র রায়	৪৮৫
সংস্কৃতি-সংবাদ	অমল দাশগুপ্ত	৪৮৭
	ননী ভৌমিক	
	কল্যাণ চৌধুরী	

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড থেকে মুদ্রিত ও 'পরিচয়' কার্যালয় ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত।

শান্তির ভরসা

জার্মান-সমস্যা আজো বিশ্ব-সমস্যার অন্যতম প্রধান। ঐক্যবদ্ধ জার্মানি প্রতিষ্ঠার পথে আজো প্রতিশ্রুত চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। এই সেদিন বার্লিনের সোবিয়েৎ-অধিকৃত এলাকায় এক হাঙ্গামার খবর আমরা কাগজে পড়লাম। এক পক্ষ খবর দিলেন পূর্ব জার্মানিতে সোবিয়েতের অধিকার-কালীন শাসন-নীতিই নাকি এই হাঙ্গামার মূল কারণ, সোবিয়েৎ চায় জার্মানদের দাস-শ্রমিকে পরিণত করতে।

সমস্যাটি যে অত্যন্ত জটিল সন্দেহ নেই। বার্লিন পতনের পর পূর্ব জার্মানিতে সোবিয়েতের শাসন-নীতি কী হল—এ-প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। মুক্তিদাতার রূপটি কেমন হয় যখন সে হয় শাসক? ফ্যাসীবাদে-বন্দ জার্মান নরনারীর কাছে বিদেশী সমাজতান্ত্রিক সরকারের শাসন কেমন লাগল, শাসন-ব্যবস্থা কী রূপ পরিগ্রহণ করল—এই পরম কৌতূহলজনক পটভূমিকায় ভাদিম সোবকো এক উপন্যাস রচনা করেছেন—GUARANTEE OF PEACE. নানান বিশিষ্ট ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে রমণীয় হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি। বিধ্বস্ত দেশ, বিক্ষুব্ধ ও বিহ্বল মানুষ, এর মাঝে সমাজতন্ত্রের বীজমন্ত্রে গড়ে উঠল যে নতুন আশান্বিত সমাজ, শান্তির পক্ষে সে এক বড়রকমের ভরসা বৈকি।

স্তালিন-পুরস্কার প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ৫৪৩, মূল্য ১৷৷৶০

স্তালিনের কলেক্টেড ওয়ার্কস-এর

প্রথম খণ্ড এখন পাওয়া যাচ্ছে।

CURRENT BOOK DISTRIBUTORS

3/2 Madan Street

CALCUTTA-13.



দ্বাবিংশ বর্ষ
২য় খণ্ড। ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৬০

ভাষা-সমস্যার স্বরূপ ও মীমাংসা

১। দুই বাঙলা ঃ এক ভাষা, এক সাহিত্য

প্রায় হাজার বৎসব ধরিয়া বাঙলা ভাষা বাঙালী জাতির মাতৃভাষারূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বাঙালী জাতিকে একটি বাষ্ট্রজাতিতে ("নেশন") পরিণত হইবার পক্ষে সহায়তা দান করিয়াছে। আজ সেই বাঙালী জাতি দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত। রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক বিচ্ছেদে তাহার জাতীয় সত্তা আজ সংকটাপন্ন, এমনকি, তাহাব ভাষাও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙালীর বিভাগে নানা বিপদ ও জটিলতায় নিপতিত। দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বাঙালীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ দুই বাষ্ট্রের নিজ নিজ জনসাধারণ স্বেচ্ছায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থিব করিবেন, এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নাই। সেই কথা মানিয়া লইয়াও দৃঢ়-কণ্ঠে বলা যায—বাঙলা ভাষার ও বাঙলা সাহিত্যের সংযুক্ত ঐতিহ্য ও স্বচ্ছন্দ বিকাশধারা অব্যাহত রাখা দুই রাষ্ট্রের বাঙালী জনসাধারণের ও বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী-দের আজ একটি পবিত্র কর্তব্য। উভয় বাঙলার মধ্যে তাই ভাষার, সাহিত্যের ও সংস্কৃতির সর্বরকমের সুস্থ আদানপ্রদান, যোগ ও বিনিময় অক্ষুণ্ণ রাখিবাব জন্য উভয় বাঙলার জন-গণ ও বুদ্ধিজীবীরা উদ্যোগী থাকিবেন।

কাবণ, দুই বাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও বাঙালীর সংস্কৃতি এক, সাহিত্য এক এবং তাহার ভাষা এক বৈ দুই হইতে পাবে না। রাজনৈতিক, এমনকি সামাজিক পরিবর্তনেও ভাষার কোনো মূলগত পরিবর্তন সহজে সাধিত হয় না। প্রধানত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আবাব জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় মানসিকতা ও জাতীয় চরিত্র বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয় ও রূপায়িত হইয়া উঠে। বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য পৃথিবীর প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বাঙালীর মাতৃভাষা, সকল বাঙালীর নিজস্ব সাহিত্য, সকলের সমবেত উত্তরাধিকাব। বাঙলা-ভাষীর সংখ্যা হিসাবে ও সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষের হিসাবে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষার মধ্যে বাঙলাব স্থান—এই সত্যও অপরিবর্তনীয।

২। মূল প্রশ্ন

১৯৪৭-এব পরে দুই রাষ্ট্রস্থ বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যকে তথাপি কয়েকটি বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতাপ্রসূত বিরোধিতাব সম্মুখীন হইতে হইতেছে। প্রধানত দুই প্রশ্নকে আশ্রয় কবিযা এই বিভ্রান্তি ও বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। যথা, (১) ভারত-রাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষার সহিত বাঙলা ভাষার সম্পর্কে কী? (২) পশ্চিম বাঙলা রাজ্য ও পূর্ব পাকিস্তান বাজ্যে সরকারী কার্যে ও শিক্ষাদীক্ষায় বাঙলা ভাষার স্থান কোথায়?

ভারতেব ও পাকিস্তনের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক বিকাশ, ও জনগণেব ভাষাগত অধিকারের দাবিকে মনে রাখিয়াই এই সব প্রশ্নেব গণতান্ত্রিক বিচার ও উত্তর স্থির করিতে হইবে।

৩। ভারতবর্ষের ভাষাগত পরিস্থিতি

ভারতবর্ষ বহুজাতির দেশ; যাহাদের মাতৃভাষা বিভিন্ন এমন ছোটবড় বহু জাতি (নেশন), অধিজাতি (ন্যাশ্‌নালিটি), উপজাতি (ট্রাইব্‌) ও কৌমের (ক্ল্যান্‌) মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। এই মহাভূমির দুই রাষ্ট্রের সম্বন্ধেই সাধারণভাবে বলা যায়—ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্তান, দুইই বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র।

এই দুই রাষ্ট্রেই বাঙালী, হিন্দুস্তানী, মরাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোনো কোনো ভারতীয় জাতির ভাষা ও পাকিস্তানকে বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী প্রভৃতি পাকিস্তানী জাতির ভাষা প্রায় 'জাতীয় ভাষায়' পরিণত হইয়াছে এবং অন্যতম প্রধান ভাষারূপে রাষ্ট্রের স্বীকৃতিলাভও করিয়াছে। কিন্তু সাঁওতালি (মুণ্ডারি), গোণ্ড, ওরাঁও হইতে আরম্ভ করিয়া গোর্খালি, মৈথিলি, ভোজপুরিয়া, মালবী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভারতের কয়েকটি অধিজাতি-উপজাতির ভাষা এখনো ততটা উন্নতিলাভ না করিলেও সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে, শিক্ষা প্রভৃতিতেও ইহাদের কতকটা ব্যবহার স্বীকৃত হইয়াছে। পাকিস্তানেও এইরূপ অপরিণত অধিজাতির বিকাশ ও ভাষার সংহতি না চলিতেছে তাহা নয়। যেমন পশ্‌তু, বালোচী। অবশ্য এইসব পরিচিত ভাষা ছাড়াও দুই রাষ্ট্রেই অনেক ছোটছোট উপজাতির ভাষা আছে যাহা নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, কিংবা বিকাশলাভের সুযোগ পায় নাই এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে বিকাশলাভ করার সম্ভাবনা। যেমন, ভারতের শবর (অস্ট্রিক), কন্ধ (দ্রাবিড়), কোদণ্ড (দ্রাবিড়), নেওয়ারী, লেপ্‌চা, গারো, টিপরাই (ভোট-চীনা) প্রভৃতি। এবং পাকিস্তানের ব্রাহুই (দ্রাবিড়), শিণা, চিত্রলী, বাশগলী (ইরানী) ও আরাকানী, পার্বত্য চট্টগ্রামী (কুকি-চীনা) প্রভৃতি ভাষা। এইসব এবং এইরূপ অনেক ভাষা এখনো বিচ্ছিন্ন কৌম-জীবনযাত্রার ভাষামাত্র, সভ্যতার আদানে-প্রদানে ভাঙিয়াচুরিয়া ইহাদের কোন্‌ কোন্‌ ভাষা টিঁকিবে, টিঁকিলে কিভাবে টিঁকিবে তাহা এখনো বলা অসাধ্য।

এইসব কারণে ভারত ও পাকিস্তানের ভাষাগত বৈজ্ঞানিক জরিপ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এবং তৎ পর বিশেষভাবে স্মরণীয় এই কথা যে, বিশেষ বিশেষ ভাষা-বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে শিক্ষিত মানুষেরা কি ভাষা বলেন বা শহরে কি ভাষা চলে, তাহার অপেক্ষাও বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে গ্রামাঞ্চলের ভাষাকে। বিশেষ করিয়া কৃষক-সাধারণের ভাষাকে। উহাই বিচারের প্রধান মানদণ্ড।

বর্তমান সময়ে ভারতের ও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু ইহাই বলা চলে যে ঃ (ক) এখনো পর্যন্ত এইসব বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশে কোনো একটি সর্বজাতিস্বীকৃত আদানপ্রদানের ভাষা নাই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার শাসন ও শোষণের দায়ে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালাইলেও তাহা শতকরা ১৫ জনের অধিক লোকে জানে না—কোনো জাতিরই জনগণ ইংরেজি বুঝে না। এই সাম্রাজ্যবাদী ভাষার চাপের অবসান না হইলে কোনো রাষ্ট্রেরই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইবে না। কোনো জাতি, অধিজাতি বা উপজাতির ভাষাও আপনার বিকাশের পথ উন্মুক্ত দেখিবে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসরণে কোনো একটিমাত্র ভাষাকে এইরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াস ভ্রান্তিজনক ও অ-গণতান্ত্রিক প্রয়াস। ভারত-রাষ্ট্রে হিন্দীকে 'রাষ্ট্রভাষা'-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় ও পাকিস্তানে উর্দুকে ঐরূপ প্রতিষ্ঠাদানের চেষ্টায় এই দুই

বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র আপনাদের সত্তার মূলোৎপাটন করিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে বিপন্ন করিতেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে জাতিতে জাতিতে, ভাষায় ভাষায় বিরোধ বাধাইতেছে।

এই কথা সত্য যে, ভারত-রাষ্ট্রে হিন্দীভাষাই অন্য ভাষার অপেক্ষা বহুল পরিমাণে পরিচিত এবং হিন্দী-উর্দু ও হিন্দী-হিন্দুস্তানী—বাজার-হিন্দীর সমস্যার কোনো সুসমাধান হইলে হিন্দী-ভাষারই পক্ষে কেন্দ্রীয় 'রাষ্ট্রভাষা'র পদলাভ যথাকালে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে হিন্দী সেই পদ এখনকার মতো উদ্ধতভাবে রাজশক্তি ও ধনিকশক্তির সাহায্যে কবলিত করিতে গেলে ভারতীয় অন্যান্য জাতি ও ভাষা নিশ্চয়ই হিন্দীবিরোধী হইয়া উঠিবে এবং হিন্দীরও ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক প্রসারের পথে বাধাই জমিতে থাকিবে।

বাঙালী জনসাধারণ হিন্দী ভাষার ভবিষ্যৎ প্রসারে আশাহীন নয় বলিয়াই হিন্দীভাষী জনসাধারণ ও সাহিত্যিকদের নিকট এই দাবি করিতেছে যে, "আপনারা হিন্দীপ্রচার আন্দোলনকে সরকার ও ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের কবল হইতে মুক্ত করিয়া সুস্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং হিন্দীকে অকালে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাইবার লোভ ত্যাগ করিয়া ভারতের সকল ভাষার সঙ্গে তাহাকে সমান মর্যাদায় প্রধানতম ভাষারূপে গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হউন। সঙ্গে সঙ্গে সহজ, জটিলতাবর্জিত হিন্দুস্তানী যাহাতে ভারতের সকল জাতির আদানপ্রদানের ভাষা হইয়া উঠে এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সর্বস্বীকৃত প্রধানতম ভাষা হইয়া উঠিতে পারে সেইজন্য অন্য-ভাষীদের বিশেষ করিয়া দ্রাবিড়ভাষীদের সমর্থন সংগ্রহ করুন।"

(খ) ভারত-রাষ্ট্র বা পাকিস্তান-রাষ্ট্রের মতো বহুজাতিক রাষ্ট্রের পক্ষে আভ্যন্তরীণ কর্ম পরিচালনায় একটি রাষ্ট্রভাষা অপেক্ষা প্রয়োজন প্রত্যেকটি ভাষাকেই সমমর্যাদাশালী রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করা।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে জাতিরা স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হইলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদের সৌকর্যের জন্য, একটি নিখিল ভারতীয় অনুবাদক সার্ভিস (ভারতীয় হিসাব পরীক্ষক সার্ভিস প্রভৃতির মতো) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘের (ইউ, এন্, ও) অনুরূপে ভারতরাষ্ট্রের ও পাকিস্তানরাষ্ট্রের কেন্দ্রে ও প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভা, এবং সরকারী কমিটি অধিবেশনে, সভা-সমিতিতে তৎক্ষণাৎ অনুবাদের (সাই-ম্যাল্‌টেনিয়াস্ ট্রান্‌স্লেশন্) ব্যবস্থা করা সম্ভব। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকটি ছাত্রের পক্ষে মাতৃভাষা ছাড়াও দ্বিতীয় কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষার সাধারণ জ্ঞান-লাভের আয়োজন করা চলে। এইরূপে নানাভাবে আদানপ্রদানের ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য পরিচালনা করা যায়।

৪। ভাষা-মীমাংসার মূল নীতি

ভারতীয় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও ভারতের ভাষাবিষয়ক পরিস্থিতি স্মরণ করিয়া তাই বাঙালী জনসাধারণ মনে করে যে—ভারতীয় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য অবিলম্বে এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ঃ

(১) ভাষাভিত্তিতে রাজ্যগঠন ও রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।

(২) আক্ষুদ্র প্রত্যেকটি অধিজাতি, উপজাতি, কৌমকে নিজ নিজ এলাকায় 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' ও ভাষাগত স্বাধীনতাভোগের অধিকার দান করা—সঙ্গে

সঙ্গে অনগ্রসব কৌম, উপজাতি বা অধিজাতিদেব দ্রুত অগ্রগতির জন্য সর্ববিধ সহাযতা দান করা

(৩) ঐতিহাসিক বা স্বাভাবিক পথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের ফলে ভাষার যে পরিণতি ঘটিতেছে তাহাব নামে যেমন বৃহৎ ভাষাব গ্রাসেচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না, তেমনি যেখানে উপভাষা (ডায়ালেক্ট) মিশিয়া জাতীয় ভাষা রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—মিশ্রণে, যৌগাযোগে ভাষা-সংহতি দেখা দিতেছে, তাহারও পথরোধ করা চলিবে না।

৫। বাঙলা রাষ্ট্রে বাঙলার দাবি

বাঙলা ভাষার স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বিকাশ সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত বাঙালীর দাবি এই যেঃ

(১) বাঙালীর জাতীয় রাষ্ট্রে বাঙলাই সরকারের শাসনের, বিচারের ও সর্ববিধ শিক্ষার ভাষা রূপে গ্রাহ্য হউক—এইসব বিভাগে ইংরেজির অবসান হউক।

(২) বাঙলার অধিবাসী প্রত্যেকটি অধিজাতির (যথা, সাঁওতাল, গোর্খা প্রভৃতির) ও উপজাতির (যথা, টিপ্রাই, মণিপুরী, ওবাঁও, লেপ্চা প্রভৃতির) নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষাব ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওযা হইবে।

(৩) কার্যসূত্রে বাঙলার অধিবাসী প্রত্যেকটি জাতির সংখ্যাল্প গোষ্ঠীকে (যেমন, শ্রমিক-অঞ্চলের হিন্দুস্তানী, ওড়িয়া প্রভৃতি) নিজ ভাষায় শিক্ষাদীক্ষা ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ দেওয়া হউক।

১১ই—১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৩-এ অনুষ্ঠিত বাংলা প্রগতি-লেখক সঙ্ঘের পঞ্চম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব।



ভাষা-সমস্যার মূলসূত্র

গোপাল হালদার

ভাষা ও জাতি-সমস্যার বিচারে স্তালিনের মতো গুরু আর নেই। সে-বিচার সার্থক প্রমাণিত হয়েছে সোবিয়েত ইউনিয়নে। ভারতবর্ষের ভাষা-সমস্যায় আজও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর বিচারই বহুলাংশে সুচিন্তিত। তাতে অসম্পূর্ণতা যা থাকে তার কারণ, তিনি ঐতিহাসিক শক্তিতে আস্থাশীল নন। কিন্তু ভাষা-সমস্যা ও জাতি-সমস্যা আসলে পরস্পর-বিজড়িত। আর এই জটিল প্রশ্নকে আবার ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে তার স্বরূপ বোঝা যায় না, তার সক্রিয় সমাধান সম্ভবপর হয় না। তাই স্তালিনের বিচার ও স্তালিনের নীতিই হল ভাষা ও জাতি-সমস্যার প্রশ্নে চরম বিচার ও সঠিক সমাধান।

এ-ব্যাপারে সোবিয়েত ইউনিয়নের সমস্যা অনেকাংশে ভারতবর্ষেরই অনুরূপ ছিল। প্রজাতন্ত্রী চীনের সমস্যা সে-তুলনায় আমাদের সমস্যার মতো নয়। অবশ্য মনে রাখা দরকার, সোবিয়েতের ও আমাদের সমস্যারও পার্থক্য অনেক। যুদ্ধের আগে সোবিয়েতের প্রায় ১৮ কোটি লোকের মধ্যে ১১ কোটি লোক ছিল রুশ-ভাষী আর অন্যান্য ভাষার তুলনায় রুশ ভাষা ছিল সাহিত্যে ও সামর্থ্যে অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষে হিন্দী বা অন্য কোনো ভাষা সংখ্যাবলে এ-প্রতিষ্ঠা দাবি করতে পারে না; কোনো ভারতীয় ভাষা প্রকাশ-শক্তিতেও এতটা বিকাশ লাভ করেনি। সোবিয়েত ইউনিয়নের রুশ-ভাষার সঙ্গে ভারত-রাষ্ট্রের হিন্দী-ভাষার তুলনা তাই মোটেই খাটে না। তাছাড়া, লক্ষণীয় এই যে, সোবিয়েত বিধানে কোনো ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' বলে আইন করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। তার মূলে আর একটা কথা আছেঃ সোবিয়েত ইউনিয়ন ভাষা-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে বিপ্লবের পরে, বিপ্লবী নীতিতে। এই কারণেই রুশ-ভাষা অন্য ভাষাকে গ্রাস না করে তাদের বিকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। আমরা ভাষা-সমস্যার সমাধান(?.) খুঁজছি বিপ্লব বাদ দিয়ে। তাই আমাদের একটিমাত্র প্রধান ভাষা যখন নেই, প্রত্যেক স্ব-স্ব প্রধান ভাষা প্রতিবেশী ভাষার উপর বিরূপ। হিন্দী হতে চায় ইংরেজির মতো রাজতক্তে সমাসীন। বিপ্লবের যুগে বিপ্লবকে ঠেকাতে গিয়ে যত রকমের সম্ভব জটিলতা আমরা সর্বত্রই সৃষ্টি করছি। ভাষা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রেও দেখছি তারই প্রতিফলন—চিন্তার অরাজকতা, উগ্র অহংকার, মারাত্মক সংকীর্ণতা।

ভাষা-ক্ষেত্রের অরাজকতা

এ-সমস্যা যে ভারতবর্ষে আসবে তা অজানা ছিল না। স্তালিন বহুপূর্বেই বলেছিলেন—ভারতবর্ষে যেদিন বিপ্লব দেখা দেবে, সেদিন নতুন নতুন কত জাতি যে মাথা তুলে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তথাপি আমাদের হিন্দুস্তানী বন্ধুরা ভাবছেন পাঞ্জাব থেকে বাঙলা পর্যন্ত সমস্ত দেশ জুড়ে নাকি এক

"হিন্দুস্তানী জাতি" শের শাহ্-এর আমল থেকেই জন্মলাভ করেছে, শুধু তার নামকরণই বাধা! পশ্চিম বাঙলা ও বিহারের শিক্ষিত(?) বর্গরা ভাবছেন ছোটনাগপুর হয় বাঙালীর রাজ্য, নয় বিহারীর, যেন সাঁওতাল, ওরাঁও প্রভৃতি 'ঝাড়খণ্ড'-এর জাতিদের ভাষাও নেই, অস্তিত্বটাও গৌণ! ধলভূমের বাঙালীরা ভাষার ক্ষেত্রে বিহারী-শাসকবর্গের অত্যাচারে জর্জরিত; আসামেরও বাঙালীর সেই অভিযোগ। অভিযোগ হয়তো মিথ্যা নয়, কিন্তু বিচার হবে কি দিয়ে? পাটনায় সম্প্রতি কৌতুক ও বেদনার সঙ্গে দেখছিলাম দুই রাজ্যের বাঙালী-বিহারী শিক্ষিতদের(?) লড়াই। মনে হচ্ছিল যেন দুই দলই মনে করেন, ভারত-রাষ্ট্র বলে কোনো রাষ্ট্র নেই, এ যেন রাইন্-এর দু'পারের দুই জাতির লড়াই! গত পুজায় আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, বৈচিত্র্যে ও তার মানুষের সৌহার্দ্যে যখন উৎফুল্ল বোধ করেছি, তখনি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করতে বাধ্য হয়েছি আসামের ভাষা-সংকট, জাতি-সংকট। আসাম রাজ্যের লোক-সংখ্যা মোট ৯০ লক্ষের মতো। তার মধ্যে অসমীয়া-ভাষী হবেন ২৫ লক্ষের উপরে ৩০ লক্ষের নিচে, বাঙলা-ভাষী ২০ লক্ষের উপরে। আর তাছাড়া, খাসিয়া, লুসাই প্রভৃতি জাতিরা আছে কয়েক লক্ষ করে, ক্ষুদ্র উপজাতিরও অভাব নেই। এক-কথায়, মনে হল—ভারতবর্ষ যেমন পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ, আসামও তেমনি ভারতবর্ষেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। আর ভারতীয় রাষ্ট্রে হিন্দীরই মতো অসমীয়া-ভাষাও আসামে প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যোগী। শুধু বাঙলা-ভাষার প্রাধান্যমুক্ত হয়েও অসমীয়া-ভাষা আজ সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সমগ্র আসাম রাজ্যের একমাত্র রাজ্যভাষা হতে অসমীয়া উদ্‌গ্রীব। ক্ষমতাচ্যুত বাঙালী অবশ্য আসামে নিরুপায় বোধ করছে; কিন্তু অসমীয়ার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে আসাম রাজ্যের সদ্য-জাগ্রত খাসিয়া, লুসাই প্রভৃতি জাতিরা। (নাগাদের কথা উল্লেখ করছি না। কারণ, তারা ভারতীয় রাষ্ট্রেও যোগদান করতে অস্বীকৃত।) এলাহাবাদে গত পুজায় অনুভব করেছিলাম হিন্দীর খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতির প্রধান দাবি হচ্ছে—উত্তর প্রদেশে উর্দু ভাষাকে রাজ্য-ভাষা বলে পরিগণিত যেন না করা হয়। সরাসরি এ-দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রগতিবাদী হিন্দী সাহিত্যিকরাও ভরসা পান না। উর্দু অবশ্য (বিহার, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে বাঙলার মতো) আপনার কর্মফল ভোগ করছে। এবং অনেক সয়ে গেলেও ক্ষণে ক্ষণে সেই জ্বালায় প্রতিবাদও করে, বাঙলা কিন্তু এখন আর তা করতেও সাহসী নয়। দিল্লীতে প্রগতি-লেখকদের সম্মেলনে খড়ী বোলির সম্মুখে হিন্দী ম্রিয়মান প্রতিপন্ন হচ্ছিল; মনে হচ্ছিল প্রায় আর এক ভাষা! কিন্তু পরিচালক সমিতির সদস্য নির্বাচনের প্রশ্ন যেই এল অমনি 'হিন্দী-সংসার' চারটি আসন নিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে উর্দু-প্রতি-নিধি জানালেন হিন্দী যদি চারটি আসন পায় তাহলে উর্দুরও চারটি না হলে চলবে না। হিন্দী ও উর্দু যদি এতই স্বতন্ত্র ভাষা হয়, তাহলে সমগ্র ভারতে 'হিন্দী-সংসার' কাদের নিয়ে? আর সে-সংসারে হিন্দী-হিন্দুস্তানী প্রভৃতি দ্বন্দ্বই কি মিটেছে? বিহারের লেখক-বন্ধুরা অসহায় বোধ করলেন—'হিন্দী-সংসার'-এর গণনায় এ-সময়ে তাদের স্থান নেই। দক্ষিণের অন্ধ্রভাষী বন্ধুরা সবিনয়ে, কিন্তু স্পষ্ট করে জানালেন—হিন্দীর ও হিন্দী-উর্দুর এই সংযুক্ত

সংখ্যাপ্রাবল্যে দক্ষিণের আপত্তি আছে। দক্ষিণ ভারতকে হিন্দী-বিরোধী করে তোলা ১৯৪৭-এর পরেকার হিন্দী-প্রচারক ও ভারতীয় লোকসভার হিন্দী-ওয়ালাদেব অন্যতম কীর্তি।

অবজ্ঞাত কৃষক-জনতা

কিন্তু আরও জটিল প্রশ্নও আছে। বিহাবে (মে, ১৯৫৩) মানভূমস্থ পদস্থ বাঙালী বলছেন—"ভাষাগত রাজ্যসীমা-নির্দেশের প্রশ্ন তুলে আমাদের বিপন্ন কবছেন কেন পশ্চিম বাঙলাব বাঙালীরা? এমনিই তো আমাদের নানা বিপদ বিহাবে—অন্য যেকোনো জাত হলে চাকরি পাব, বাঙালী হলে নয়।" তারপর —"মানভূমের লোকমত নিলে আমরা মানভূমের বাঙালীরা কি বাঙলায় যাব? না। সেখানে যে আরও চাকরি পাব না।" অর্থাৎ, চাক্‌রে বাঙালী মনে করে সে-ই একমাত্র বাঙালী, বেন মানভূমের বাঙালী বলতে সেই শতকরা একটি বাঙালীকেই বুঝতে হবে। এই চাক্‌রে বাঙালী তার চাকরির গরজে বাঙলা-ভাষা ছেড়েও হিন্দী নিতে অস্বীকৃত হবে না—হিন্দী যখন বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রভাষা; এবং তাতে যখন সমগ্র ভারতে চাকরিলাভের সুযোগ মিলবে। ঠিক এই কাবণেই মণিপুরেব বাঙলা-ভাষী শিক্ষিত মণিপুরী আজ আর বাঙলা না পড়ে হিন্দী পড়তে উৎসাহী। কারণ, মণিপুর কেন্দ্র-শাসিত, বাঙলার অন্তর্ভুক্ত তা আর হবে কিনা সন্দেহ; এবং ভারতবর্ষে ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দীই আজ চাকরির চাবিকাঠি। অনেকটা এরূপ কারণেই মিথিলাব (বিহারের) ভূমিহাররা অনেকে মৈথিলীর পরিবর্তে হিন্দী গ্রহণে উদ্যোগী—চাকরির সুবিধা হবে। আর মৈথিল ব্রাহ্মণরা আবার মৈথিলী প্রচলনে উৎসাহী—মিথিলায় তারাই হবে দ্বাবভাঙ্গার মহারাজার প্রভাবে অগ্রগণ্য। (বিহাবে অবশ্য রাজনৈতিক- সামাজিক সব প্রশ্নেবই সঙ্গে জড়িত থাকে ভূমিহাব, কায়স্থ, ছত্রি প্রভৃতি জন্মগত জাতি বা 'কাস্ট'-এর প্রশ্ন।) দুই দলই ভাবে না—মিথিলার সাধারণ মানুষ কি ভাষায কথা বলে, কি ভাষায় তাদের শিক্ষাদীক্ষা সহজ, কি তারা চায়।

দেখা যাচ্ছে, ভাষা-সমস্যায় একটা বড় রকমের জটিলতা সৃষ্টি করেছে এই চাকবিজীবীরা এবং এরাই শিক্ষিত বলে মুখর। ভাষা নিয়ে যে তর্কবিতর্ক চলছে তা চালাচ্ছেন এই শিক্ষিতরা। এ তর্কবিতর্কের পিছনে বেশ একটা প্রেবণা হচ্ছে চাকবিব বখরা। শিক্ষিতদের বিবেচনায় তাঁরাই হবেন এই বিচারে মানদণ্ড! বিহার-রাজ্যে একমাত্র শহুরে মুসলমানরাই উর্দুভাষী বলে হিন্দী জানেন, এবং মুসলমান-হিন্দু সবশুদ্ধ বড় জোর শতকরা ১৫টি লোক সাক্ষর, অর্থাৎ ইস্কুলে গিযে হিন্দী শেখেন। শতকরা ৮৫ জন বিহার-বাসী তাই হিন্দী বলেনও না, শেখেনও না। হিন্দীকে সেখানকার ভাষা হিসাবে তাই এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন বড় জোর মাত্র তার শহুরে ও শিক্ষিত শ্রেণীরাই। বাকি ৮৫ জন বিহার-বাসী কি করবেন না করবেন তার প্রশ্নও কেউ তোলে না। অর্থাৎ ভাষা-সমস্যার এই বিতর্কে আমরা মূলেব কথাটাও বিস্মৃত হচ্ছি —দেশটা কাব? শিক্ষিতদেরই শুধু, না সাধাবণ মানুষেব?

কোন্ অঞ্চলেব ভাষা কি হবে তা স্থির করবার উপায় কি? শাসক-গোষ্ঠীর মর্জি? নিশ্চয়ই না। শিক্ষিত ও চাকরিজীবীদের কথা? নিশ্চয়ই

না। শহুরে শিল্প-শ্রমিকদের সাক্ষ্য? তা-ও না। কারণ, তাহলে জামশেদপুরের ভাষা হিন্দী(?), কলকাতার শ্রমিক-এলাকার ভাষা 'বাজার-হিন্দী' এবং বোম্বাইর ভাষাও হয়তো আর একধরনের 'বাজার-হিন্দী'। আবার স্তালিনের কথাই স্মরণ করতে হয়। স্তালিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—বাকুর শ্রমিকের ভাষা দিয়ে জর্জিয়ার ভাষা-সমস্যার মীমাংসা করা চলবে না। তিনিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জাতি-সমস্যা ও ভাষা-সমস্যার জড়িত প্রশ্নে প্রধান সাক্ষী হল কৃষক, যে জমিতে বাঁধা, দেশে বাঁধা, দেশের অধিবাসী। শ্রমিক এই কৃষকের সাক্ষ্যকেই গ্রাহ্য করে সর্বাগ্রে কৃষক-সাধারণকে প্রতিষ্ঠিত করবে তার সামাজিক অধিকারে ও সাংস্কৃতিক অধিকারে।

আলোচনার চতুঃসীমা

বাঙলা দেশের ভাষা-সমস্যার আলোচনা করতে আজ যখন আমরা বাধ্য হচ্ছি তখন তাই গোড়াতেই কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে। কি চৌহদ্দির মধ্যে আমরা এ-আলোচনা নিবদ্ধ করা সমীচীন মনে করি। তা এই ঃ প্রথম নীতি হচ্ছে ভাষা ও জাতি-সমস্যায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নীতি। এই কথা বোঝা দরকার, সমাজবিকাশের নিয়মেই এক-একটা স্থায়ী জন-সমষ্টি এক-একটি বিশেষ বাসভূমিতে নিজেদের আর্থিক জীবনযাত্রা, নিজেদের ভাষা এবং নিজেদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলে বিশিষ্ট মানসিক-সাংস্কৃতিক ধারা অবলম্বন করে জাতি (নেশন) হয়ে ওঠে। এরূপ জাতি ছাড়াও অনেক জন-সমষ্টি বাইরের চাপে বা সুযোগের অভাবে এসব গুণের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারেনি, কিন্তু সে-পথেই অগ্রসর হয়ে তাদের মধ্যেও (খ) কেউ স্থায়ী জন-সমষ্টিরূপে জাতীয়তার (নেশনত্বের) অন্তর্নিহিত গুণাবলীর যথেষ্ট অধিকারী, তাদের বলা যায় অধিজাতি (ন্যাশ্‌নালিটি), তাদের ভাষা হয়তো সম্পূর্ণ 'ভাষা' বা অধিভাষা (ডায়ালেক্‌ট); (গ) কিন্তু সে-স্তরে পৌঁছাবার পূর্বে স্থায়ী সমষ্টি হবার পথে এখনো উপজাতি (ট্রাইব্‌) রয়েছে, তাদের ভাষাও হয়তো উপভাষা (ট্রাইব্যাল বুলি)। সমাজের যথেষ্ট বিকাশ হলে, বিশেষ করে আর্থিক লেনদেন ('মার্কেট') বিস্তারলাভ করলে এরূপ উপজাতি অন্য জাতি বা অধিজাতির সঙ্গে মিশে; কিংবা কাছাকাছি কয়েকটি উপজাতি মিলে নিজেদেরই একটি উপভাষাকে অবলম্বন করে একটি অধিজাতিতে উন্নীত হতে পারে, তাদের উপভাষাও এরূপ বিকাশের ফলে অধিভাষা (পূর্ণ ডায়ালেক্‌ট) বা ভাষায় (ল্যাঙ্গোয়েজ্‌) পরিণত হতে পারে। কদাচিৎ এরূপ 'উপজাতি' একা থেকে একটি স্বতন্ত্র অনুজাতিও (ন্যাশ্‌নাল গ্রুপ) গঠন করে। (ঘ) এদের ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অস্থায়ী জন-সমষ্টি থাকে যারা সমাজবিকাশে এখনো কৌমের (ক্ল্যান্‌) পর্যায়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোত্রে বিভক্ত, ভাষাও যাদের 'বুলি' (ক্ল্যান-স্পীচ্‌) মাত্র। সমাজবিকাশের নিয়ম হল আর্থিক প্রগতি ঘটলে কয়েকটি কৌম মিলে তৈরি হয়ে ওঠে উপজাতি, তখন তাদের বিভিন্ন কৌমভাষা ভেঙেচুরে গড়ে ওঠে 'উপভাষা'।

সাধারণভাবে কথাটা এই—জাতি-বিকাশের একটা প্রক্রিয়া (প্রোসেস্‌) আছে। সমাজবিকাশের নিয়মে নিকটবর্তী কৌমসমূহ মিলে 'উপজাতি' হয়। আবার

'উপজাতি' ক্রমশ অগ্রসর হয়ে হয় একা, কিন্তু বেশি-সময়েই নিকটবর্তী অন্য জন-সমষ্টির সঙ্গে মিশে হয় 'অধিজাতি'। আবার অধিজাতি আর্থিক-রাষ্ট্রিক বিকাশ সম্পূর্ণ করে হয় জাতি (নেশন)। এদের ভাষাও তেমনি বুলি থেকে হয় উপভাষা, এবং উপভাষা (ডায়ালেক্ট) ক্রমে হয় 'পূর্ণ ভাষা'।

কিন্তু এই সাধারণ নিয়ম হলেও বাস্তববাদীদের পক্ষে জানা প্রয়োজন—(ক) জাতি-বিকাশের প্রক্রিয়ায় কোন্ জনসমষ্টি কখন বিশেষ কোন্ পর্যায়ে আছে, প্রত্যেকের যথার্থ (কংক্রিট) অবস্থা কি; যেমন, দার্জিলিঙ্-এর গুর্খাদের অবস্থা কি? তারা কি 'অধিজাতি'? এবং (খ) জাতি-বিকাশের প্রক্রিয়া (প্রোসেস্ অব ন্যাশ্নাল ডেভ্লপমেন্ট) সেই বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ জাতির পক্ষে কি বিশেষ রূপ গ্রহণ করছে, যেমন, কোন্ 'উপজাতি' একাই তখনকার মতো 'অনু-জাতি' (ন্যাশ্নাল গ্রুপ) হয়ে থাকতে পারে। দার্জিলিঙ্-এর 'লেপ্চা', 'ভুটিয়া' কি গুর্খাদের (অধিজাতি) সঙ্গে মিশে যাবে, না, কি? চা-বাগানের নানা-জাতির (কৌম ও উপজাতি) মানুষ মিলে কি এক হচ্ছে, না, কয়েকটা নতুন জন-সমষ্টির সৃষ্টি করছে? বলা বাহুল্য, এসব বহু অনুসন্ধান-সাপেক্ষ এবং এই অনুসন্ধান-কালে বাস্তববাদী যেমন বাইরের চাপ, সুযোগের অভাব প্রভৃতি বিচার করবেন, তেমনি কিছুতেই এই সত্য বিস্মৃত হবেন না যে, বিশেষ জন-সমষ্টির মনোভাব, তার নিজস্ব স্বার্থ কি, কি তার নিজস্ব দাবি, অথবা তার কোন্ মনোভাব প্রভাবশীল অন্য জাতির প্রচারের দ্বারা সাময়িকভাবে উদ্ভূত।

ভাষা ও জাতির ক্ষেত্রে এই হল বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রথম প্রতিজ্ঞা, বাস্তব-বাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয়ত, এই সমাজবিকাশের ধারা অনুযায়ী ভাষা ও জাতি-সমস্যা সমা-ধান করতে হলেই আমরা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা মানতে বাধ্য হই। তা হচ্ছে, ভাষা ও জাতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ। তার ফলে আবিষ্কৃত হল স্তালিনের ব্যাখ্যাত 'জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি'। প্রত্যেক জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অবশ্য নীতি হিসাবে লীগ্ অব্ নেশন্স্-এর দৌলতে এখন সর্বগ্রাহ্য (উইলসন এই শীলমোহর তার গায়ে এঁকে দিয়ে গেছেন)। প্রত্যেক জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির স্বরাজও তাই অবশ্যগ্রাহ্য। তাহলেও লীগ্ অব্ নেশন্স্-এর সময় থেকে এই ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দেখা গিয়েছে—এই গণতান্ত্রিক জাতীয় নীতি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা কোথাও প্রয়োগ করেনি। সমাজবিকাশের ধারা বুঝলে এটাও বুঝব যে আসলে ধনিক-শাসক শ্রেণী এই নীতি কার্যত গ্রহণ করতে পারে না। সংক্ষেপে হলেও কথাটা এদেশে এ-মুহূর্তেও বুঝবার মতো।

ধনিক-গোষ্ঠী চায় 'মার্কেট' বা পণ্য-উৎপাদন ও বিক্রয়ের সুযোগ। সামন্ত-তন্ত্রের বাধা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসীমা ভেঙে এক রাষ্ট্রের আয়ত্তে এক মার্কেট স্থাপন ধনিকদের লক্ষ্য। এই মার্কেটের দায়েই তারা চায় আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য এক ভাষার আধিপত্য; বিভিন্ন জাতি ও ভাষাকে যথাসম্ভব চেপে রাখাও তাদের তাই একটা স্বার্থ। ইংরেজ ভারতবর্ষে ভারতের বিকাশোন্মুখ সকল জাতিকে চেপে রেখে গড়েছিল তার এক-রাজ্য, সকল ভাষাকে চেপে চালিয়েছিল তার এক-ভাষা। ইংরেজি ভাষার মারফত ইংরেজ এই লক্ষ্য সিদ্ধ

করত, এখনো করছে। তাদের পরেই ভারতের প্রধান ধনিক-গোষ্ঠী এখন মারোয়াড়ী ও গুজরাতী ধনিক-বণিকেরা। এরা কেউ হিন্দী-ভাষী নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মার্কেট আয়ত্ত করবার জন্য এরা তবু চায় একটি ভাষা; এবং অনেকাংশেই হিন্দী উত্তরাপথে কাজ-কারবারে বহুল প্রচলিত। উত্তর প্রদেশের হিন্দুস্তানী-ভাষী শাসক শ্রেণীও আজ ভারতবর্ষে বেশি ক্ষমতাপন্ন। তাই ভারতীয় ধনিক ও ভারতীয় শাসক-যূথ আজ একযোগে ইংরেজির স্থলে হিন্দীকে আশ্রয় করে আপনাদের শোষণ-রাজ্য ও শাসন-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর। ভারতের সব জাতির যোগাযোগের একটি ভাষার প্রয়োজন আছে এ-কথা স্বীকার করেও এই প্রসঙ্গে যা লক্ষ্য করা প্রয়োজন তা এই—ভারতীয় জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশের সুযোগ—এই গণতান্ত্রিক নীতি এই নিখিল ভারতীয় ধনিক-শাসক শ্রেণীর অভিপ্রেত নয়। বাঙালী, মারাঠী, অন্ধ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষী ক্ষুদ্রতর ধনিক-শ্রেণী বরং তা দাবি করবে, প্রত্যেকেই তারা প্রবলতম ধনিক-শাসকগোষ্ঠীর গ্রাসমুক্ত হতে চাইবে নিজেদের প্রাণের দায়ে। কিন্তু এই নানা জাতির নানা ভাষী ধনিক-স্বার্থে মিল সামান্য। সাম্রাজ্যবাদী নিয়মে তাই বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীও নানাভাবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগাবে এবং এই জাতীয় দাবিসমূহকে জাতির বিরোধ, ভাষার বিরোধ, প্রাদেশিকতার বিরোধে পরিণত করতে চাইবে—যেমন ইংরেজ করতে চাইত। বিহারে, বাঙলায়, আসামে আমরা তা স্পষ্টই দেখছি। কাজেই, এই জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি-সম্বন্ধে যা বুঝবার তা এই যে, সর্বভারতীয় শাসক-শক্তি তার বিরোধী হবে, প্রত্যেক জাতির ক্ষুদ্রতর ধনিক-গোষ্ঠী নিজ দাবিকে বাড়িয়ে অন্য জাতির দাবিকে খর্ব করতে চাইতে পারে; একমাত্র সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী, হবে এই জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতির পরিপোষক।

তৃতীয়ত, জাতি-সমস্যার বিচারে ও ভাষার বিতর্কে প্রধানতম মানদণ্ড হল কৃষক-সাধারণ ও পল্লীগ্রামের মানুষ; অন্যেরা গৌণ। এদিকে তাদের প্রধান সহায়ক ও নেতা হয় শ্রমিক শ্রেণী।

চতুর্থত, ভারত-রাষ্ট্র (বা পাকিস্তান-রাষ্ট্র) বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র। জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ও ভাষাগত স্বরাজের উদ্দেশ্য সে-রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করে বিচ্ছিন্ন করা নয়, বরং উদ্দেশ্য—প্রত্যেক জাতি, অনুজাতি, উপজাতিকে স্বেচ্ছায় ভারত-রাষ্ট্রের (বা পাকিস্তান-রাষ্ট্রের) সংগঠক করে তোলা, গণতান্ত্রিক ঐক্য ও সামাজিক বিকাশের পথে বহুভাষিক ও মহাজাতিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করা—যে-সংস্কৃতি হবে গণতান্ত্রিক, জাতীয় ও বিজ্ঞানসম্মত।

ভাষা-সমস্যার আলোচনা এই চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ না রাখলে আলোচনা বানচাল হবার সম্ভাবনা। তথাপি, ভাষার বিচারে আর দু'একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। যেমন, ভাষা আর নৃ-গোষ্ঠী এক না হতেও পারে। নৃ-বিজ্ঞান মতে আমরা বাঙালীরা মোটেই আর্য নই, কিন্তু আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা আমরা গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ, নানা কারণে কোনো জন-সমাজ ক্রমে ক্রমে নিজের ভাষা ছেড়ে দিয়ে অন্য এক ভাষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কোনো জন-সমষ্টি নিতান্ত ক্ষুদ্র না হলে এবং নিজ ভাষা বিষয়ে অচেতন না হলে তাকে তার ভাষা

ছাড়ানো ও ভোলানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমনকি, একবার নিজের ভাষা ভুলে গেলে আবার সেই গৃহীত ভাষাকে ছেড়ে নিজের ভাষা পুনর্গ্রহণও সহজ হয় না। তারই দৃষ্টান্ত আয়র্লন্ড। শত তিনেক বৎসরে আইরিশ ভাষার পরিবর্তে প্রবলতর ইংরেজি ভাষা আইরিশদের ভাষা হয়ে গিয়েছে। আয়র্লন্ডের জাতীয়তাবাদী শাসকরা তিরিশ বৎসর ধরে প্রাণপণে তাদের সেই কেল্‌টিক ভাষা পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করছে। কিন্তু ইংরেজি এখনো বে-দখল হয়নি। তার কারণ, প্রথমত, কালক্রমে আয়র্লন্ডের তা নিজ ভাষা হয়ে গিয়েছে এবং আয়র্লন্ডের মানুষ জীবিকার দায়ে ইংরেজি-ভাষীদের (ইংরেজ ও মার্কিন) মুখাপেক্ষী—ইংরেজি তাই কেউ ছাড়তে পারছে না।

দ্বিতীয় কথা, ভাষা আর লিপি এক কথা নয়। ভাষার প্রাণ ধ্বনি, উদ্দেশ্য সামাজিকভাবে ভাবের আদানপ্রদান। লিপির সাহায্যে এই উদ্দেশ্য আরও সুসাধ্য হয়। কিন্তু লিপি হচ্ছে ধ্বনির প্রতীক মাত্র। একই ধ্বনি আমরা বাঙলা অক্ষরেও লিখতে পারি—'বাঙালী', 'বাংগালী'; আবার নাগরী অক্ষরেও লিখতে পারি **बांगाली** কিংবা রোমক অক্ষরেও লিখতে পারি bangali এবং একটু চিহ্ন যোগ করলে তা বিশুদ্ধও হয়, যেমন bāṅgālī বর্ণমালার প্রশ্ন স্বতন্ত্র; কিন্তু তাতে যে ভাষার ক্ষেত্রে গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে তা হিন্দী ও উর্দুর কথা মনে রাখলেই বুঝতে পারি।

ভারতবর্ষের ভাষাসমূহ যে-অক্ষরে লেখা হয় মূলত তা ব্রাহ্মী-লিপি থেকে জন্মেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা এসব বিভিন্ন লিপিতে লিখিত হত। মগধে (ওড়িষ্যা ছাড়া), বাঙলায়, আসামে উদ্ভূত হয় আমাদের প্রাচ্য-ধরনের লিপি। বাঙলা দেশে সংস্কৃত ও বাঙলা লেখা হত বাঙলা লিপিতে, এখনো সংস্কৃত বাঙলা লিপিতেই লেখা হয়। মিথিলার লিপিও বাঙলার অনুরূপ, আসামের নিজ লিপিও বাঙলার মতোই। বিহারে নাগরী লিপি গৃহীত হয়েছে মাত্র ১৮৮০-এর কাছাকাছি—ইস্কুলে হিন্দী গ্রাহ্য হবার পর থেকে। তার আগে কায়েতী লিপিতে দলিলপত্র লেখা হত, এখনো তা অচল হয়নি। বিশেষ বিচারে না গিয়ে তবু বলতে পারি—কোনো কোনো লিপি লেখার পক্ষে বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকর। যেমন, রোমক বর্ণমালায় একটু চিহ্ন সংযোগ করে আমরা ভারতবর্ষের প্রায় সকল ভাষাই লিখতে পারি। নাগরী বর্ণমালার ত্রুটি আছে। কিন্তু বাঙলা বর্ণমালার ত্রুটি নাগরীর থেকেও বেশি।

ভাষা ও জাতি-সমস্যার আলোচনায় সমাজবিকাশের ধারা, গণতান্ত্রিক নীতি, কৃষক ও গ্রাম্যজনতার গুরুত্ব যাঁরা না মানেন, এমনকি ভারত-রাষ্ট্রের (বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের) ভাবী সুস্থ বিকাশের মূল সূত্রগুলো যাঁরা সমর্থন করেন না, তাঁদের সঙ্গে মৌলিক বিচারই প্রয়োজন, তা মাসিকপত্রের এক-আধটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। এই চৌহদ্দির মধ্যে আলোচনা করতে গেলেও এই পরিমিত স্থানের মধ্যে আলোচনা শেষ করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কারণ, ভারতবর্ষ কি ছোট দেশ? সে যে রুশিয়া ছাড়া ইউরোপের মতো, প্রায় একটি মহাদেশ। এই ইউরোপ-খণ্ডে কত রাষ্ট্র, কত জাতি, কত ভাষা, তা কি আমরা ভেবে দেখি? বরং ইউরোপীয় জাতিদের তুলনায় আমরা একদিকে অনেকটা বেশি পরস্পরের

নিকটতর। আমাদের সম্মিলিত জীবন সম্ভব। ভারতভূমি অবশ্য দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের (ও পাকিস্তানের) জাতিদের পরস্পরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মীয়তাবোধ সুস্থির, এক ভাষার অভাবেও তা ব্যাহত হয়নি। তবে নিশ্চয়ই শাসনের ও সামাজিক আদানপ্রদানের জন্য কোনো একটি ভাষা রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতি গ্রহণ করতে পারলে এই রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ আরও সুদৃঢ় হয়। কিন্তু সেরূপ কোনো ভাষা এখন স্বীকৃত হবে কিনা তা নির্ভর করে ভারতীয় (বা পাকিস্তানী) জাতিদের বিকাশের উপর, বাস্তব অবস্থার যথাযথ উপলব্ধির উপর ও অবস্থানুরূপ ব্যবস্থাপনার উপর।

সাম্রাজ্যবাদী পথ বনাম গণতান্ত্রিক পথ

জাতি-বিকাশের এই স্তরটা যথার্থ বুঝলে আমরা বুঝতে পারি—সৌভাগ্য হোক বা দুর্ভাগ্য হোক, কোনো স্থায়ী সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাবে ভারতবর্ষে সর্বজাতির গ্রাহ্য কোনো এক-ভাষা ও সর্বজাতি মিশিয়ে এক-জাতি (নেশন) গড়ে ওঠেনি। ভারতভূমির আধুনিক প্রধান-প্রধান জাতিদের বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল (৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শতকের মধ্যে) বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি আধুনিক ভাষার জন্মের সঙ্গেই। এসব জাতি পূর্ণাঙ্গ নেশন হতে পারেনি নানা সামাজিক-রাষ্ট্রিক কারণে। কিন্তু তাই বলে যতদূর এসব জাতি ও ভাষা বিকাশলাভ করেছে তাতে এখন তাদের চাপা দিয়ে সমস্ত ভারত জুড়ে (বা পাকিস্তান জুড়ে) এক-জাতি গড়া, এক-ভাষা চালানো শুধু অসম্ভব নয়, অভাবনীয়। সম্ভবত পাঠান-রাজত্বেও (১৩শ—১৫শ শতকে) তা সম্ভব হত না, মুঘল-রাজত্বের পরে (১৮শ শতকে) আর তা অসম্ভব। বরং ইতিমধ্যে (১৯শ-২০শ শতকে) ওসব প্রধান-প্রধান ভাষা ছাড়াও সামাজিক বিকাশে আরও ছোট ছোট ভাষাও জন্মলাভ করেছে। তাদের আশ্রয় করে সে-সব ভাষাভাষীরা জাতিত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং (স্তালিন যেমন বলেছেন) জাতীয় বিপ্লবের নিয়মেই এসব ছোট ছোট জাতি, অধিজাতি, অনুজাতি, উপজাতিও দাবি করবে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার। সভ্যতার এ-যুগে, ভারতীয় জাতিসমূহের বিকাশের এই স্তরে **উপর থেকে চাপ দিয়ে** তেমন এক 'রাষ্ট্রভাষা' গঠন বা তেমন এক 'রাষ্ট্রজাতি' গঠন আর সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি এই জাতিগঠনের ও রাষ্ট্রচালনার এই পথই চেনে—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টান্ত দেখে আমরাও ভাবি এই বুঝি জাতিগঠনের একমাত্র পথ। অতএব, সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে ভারতের (বা পাকিস্তানের) ভাষা- ও জাতি-সমস্যার সমাধান কখনো হত কিনা সন্দেহ। এখন গণতান্ত্রিক পথে ছাড়া তার সমাধান নেই। সেই গণতান্ত্রিক পথে নিচে থেকে গড়ে না তুললে আজ ভারতীয় রাষ্ট্র (বা পাকিস্তান রাষ্ট্র) কারও ঐক্য, কারও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশও সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, গণতান্ত্রিক শক্তি এসব রাষ্ট্রে গড়ে উঠলেই এই ভাষা- ও জাতি-সমস্যার আসল সমাধান সম্ভব। এবং ভারত-খণ্ডের দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক বন্ধনও তখন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে পরিণত হবে। অবশ্য, তার

পূর্বে নিস্ক্রিয় হয়ে থাকবার কারণ নেই। যখন যতদূর সম্ভব আমরা এই ভাষা- ও জাতি-সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকব, কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে; মনে রেখে কৃষক ও গ্রাম্যজনতার দাবি এবং ভারতের (বা পাকিস্তানের) ঐক্যেরও দাবি। তা না হলে সুবিধাবাদিতা ও সাময়িক অপকৌশলের দ্বারা আমরা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলব।

কবিতা

২৫শে বৈশাখ

বিষ্ণু দে

আমরা যে গান শুনি, গান করি আকাশে হাওয়ায়
ফুলে ফুলে বনে পথে ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় সকালে,
আমরা যে ছবি দেখি আঁকি ঘন ছন্দের মায়ায়
রঙের রেখার মূর্ত্তি কল্পনার নব নব তালে
আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা
হাজার সন্ধ্যার সূর্য প্রত্যুষের হাজার সবিতা—

রবীন্দ্রব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
স্তব্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।

জঙ্গম সূর্যকে জানি আমাদের জঙ্গী প্রতিদিনে
অবিচ্ছিন্ন মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে যুগ যুগ ব্যেপে
প্রতিটি ঊষায় রাত্রে মধ্যাহ্নের বটে দগ্ধতৃণে
গলাপিচে বৈশাখীর ভবিষ্যতে ঝড়ে মেতে ক্ষেপে
প্রতিটি সূর্যাস্তে আর সূর্যোদয়ে চৈতালী নিদাঘে
আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রাণে হিম মাঘে

আমরা তো জানি তুমি আকস্মিকে গরমবাজারে
রুদ্ধগতি, গড়ি তাই জীবনের ঝর্না, জেনো কবি,
প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে লাখে হাজারে হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দভৈরবী।

বাগনান

পূর্ণেন্দু পত্রী

এদিকে নদীর বান
ওদিকে নদীর বান
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব একাকার।

গাঁয়ে যত বৌ ছিল—ঢেউ
গাঁয়ে যত বুড়ি ছিল—ঢেউ
ছেলে বুড়ো বাকি নেই কেউ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব একাকার।

মধ্যাহ্ন-সূর্যের তীব্র ক্রোধাগ্নির
কী প্রচণ্ড ছাট্।
তারই দিকে ছড়িয়ে ললাট
ট্রেনে ট্রেনে আসে ঢেউ
প্ল্যাটফর্ম জোয়ারে টলমল।
প্রাণাবেগে চঞ্চল প্রবল
গাঁয়ের নদীর ঢেউ
সাঁকো ভেঙে
বাঁধ ভেঙে
জলাজমি ছাপায় ঝাঁপায়।
জল স্থল অন্তরীক্ষ চৌদিক কাঁপায়
জলদ-গম্ভীর বজ্রনাদে।
কাঁটাতারে ঘেরা থানা পোস্টাফিস
বাজার দোকান
পথ ঘাট মাঠ ইস্টিশান
থেকে থেকে নড়ে ওঠে
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে
জিন্দাবাদে দৃপ্ত জিন্দাবাদে।
শত শত রক্তিম নিশান
রক্তময় শত শত পলাশের ফুল
ঢেউয়ে ভাসে
ঢেউয়ে হাসে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব একাকার।

সারারাত গানের জোয়ার
সারারাত প্রাণের জোয়ার
দু'চোখ হারিয়ে যায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব একাকার।

জন্মদুঃখী কৃষকের দুটি হাতে দোতারার তার
ঢেউ তোলে অস্থির কান্নার।
পঞ্জরাস্থি ছিঁড়ে ফেলে
কবিয়াল গায় কবিগান।
দুর্জয় বক্তৃতা শোনে
আবালবনিতাবৃদ্ধ
মধ্যবিত্ত মজুর কৃষাণ।

একটা মুখের পাশে শত শত প্রতিজ্ঞার মুখ
একটা বুকের কাছে শত শত উদ্বেলিত বুক
মুখে ঢেউ
বুকে ঢেউ
দু চোখ হারিয়ে যায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব একাকার।

[গত মে মাসে বাগনানে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের ঘটনা নিয়ে লেখা।]



ছোটগল্পের রচনারীতি ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

অচ্যুত গোস্বামী

॥ ২ ॥

'হয়তো' নামক প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি ছোট-গল্প থেকে আলোচনা শুরু করা যাক। এক দুর্যোগময় রাত্রে একটি ভাঙা সেতু পার হওয়ার সময় একটি মেয়ে হঠাৎ নিচে পড়ে গেল। সঙ্গী পুরুষটি হতভম্ব। তখন লেখক এগিয়ে এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করলেন। তারা যখন চলে গেল তখন পিছন থেকে তিনি শুনতে পেলেন মেয়েটি বলছে যে, ছেলেটি তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল বলেই তার মনে হয়েছিল। এই তাৎপর্যপূর্ণ কথাটুকু শুনে লেখকের মনের কল্পনায় একটি কাহিনী দানা বেঁধে উঠল।

ছোট-গল্পটাই একটা কল্পনা-করা জিনিস; কিন্তু সেই কল্পনার মধ্যে আর একটি কল্পনার অবতারণা করাটা অভিনব। অনেক নাটকে যেমন অভিনয়ের মধ্যে অভিনয়ের কথা থাকে। 'হয়তো' এবং আরও এক-আধটি গল্পে কল্পনার মধ্যে কল্পনা হয়তো লেখক নিছক অভিনবত্ব হিসাবেই অবতারণা করেছেন, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে লেখকের রচনা-বৈশিষ্ট্যের খানিকটা আভাসও পাওয়া যায় না কি?

'হয়তো' গল্পে লেখক অতঃপর যে কল্পিত কাহিনীটির বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, ঐ মেয়েটি একটি ভাঙাচোরা ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-বাড়িতে বধূ হিসাবে এসে উপস্থিত হল। তার স্বামী মহিমও এই ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। ঘৃণা, সন্দেহ, আর তাদের ঢেকে রাখার জন্য ছলনা—এই হল মহিমের মানসিক বৈশিষ্ট্য। লাবণ্যের অসহায় বধূজীবনের ভীতি আর এই ঘৃণা, সন্দেহ, এই দু'এর টানা-পোড়েনে অবশেষে মহিম একদিন লাবণ্যকে নিয়ে সুস্থ-জীবনের ব্যক্ত উদ্দেশ্যে অথচ লাবণ্যকে কোনো ফাঁকে জীবন থেকে সরিয়ে দেবার গোপন অভিসন্ধি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

লেখকের এই 'কল্পিত' কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয় বাহাদুর কল্পনা বটে! যেমন পরিবেশ, তেমনি চরিত্রগুলো, কোনোটাই সহজ-সাধারণ নয়। সবাই যেন কোমর বেঁধে জীবনের ব্যতিক্রম হবার সাধনায় মগ্ন। এই ভয়ঙ্কর জটিল বহুদূরপ্রসারিত কাহিনীর প্রতিটি গ্রন্থি শক্ত সূত্রে গ্রথিত, গল্পের জগৎটাকে একবার বাস্তব বলে মেনে নিলে প্রত্যয়ের কোনো ব্যাঘাত হয় না। তবু এই জটিল কাহিনীটি যে লেখকের বুদ্ধি-প্রধান কল্পনায় সৃষ্টি করা একটি চমৎকার করে সাজানো নিটোল কাহিনী তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আমাদের পরিচিত বাস্তব পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বাইরে নিয়ে গিয়ে লেখক তাঁর উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে সেই বাস্তব থেকেই সংগৃহীত উপকরণের অংশবিশেষকে ছেঁকে নিয়ে (অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট করে) তাঁর কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। পূর্বে বলেছি, বাংলা ছোট-গল্পে একটি সম্পূর্ণাবয়ব কাহিনী উপস্থিত করার একটা ঐতিহ্য

আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র অদ্ভুত কুশলতার সঙ্গে সে-ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয়, স্থান-কালের বাধা ডিঙিয়ে সুদূর কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তিনি যে-কাহিনীর জন্ম দিয়েছেন তা বিন্যাস-রীতির দিক দিয়ে রোমান্টিক।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই পর্যায়ের আরও কয়েকটা গল্পের আলোচনা করা যাক। 'শৃংখল' গল্পে বৌ-এর পক্ষ নিয়ে ছেলে মাকে গঞ্জনা দেয়। কিন্তু তা বৌ-এর প্রতি ভালোবাসার মোহে নয়। বৌকেও সে তেমনি ঘৃণা করে, ফলে বৌ-ও তাকে ঘৃণা করতে শিখল। মায়ের মৃত্যুর পর সে বৌকে কৌশলে সরিয়ে দিতে চাইল। বৌ তার চাল ধরে ফেলে সময়মতো তার পিছু নিল। জীবন ভরেই তারা পরস্পরকে ঘৃণা করেই চলেছে; তবু কেউ কাউকে ছাড়তেও পারে না। ঘৃণা করবারও তো একটা অবলম্বন চাই। 'কুয়াশায়' গল্পে একটি অসহায় বাল-বিধবা মেয়ের মনে প্রেম জাগ্রত করে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল যে ছেলেটি, তার বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। মেয়েটি আত্মহত্যা করল। 'মৃত্তিকা' গল্পে আছে একটি ভয়ঙ্কর অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পঁচিশ বছর ধরে অপেক্ষা করার রোমাঞ্চকর কাহিনী। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের মুহূর্তে তা সফল হল না। ভূমিকম্প হয়ে গোটা বাড়িটাই বিধ্বস্ত হল। 'পুনাম' গল্পে বাপ-মায়ের ভবিষ্যতের আশা বংশের একমাত্র দুলাল ছেলেটি অস্বাভাবিক-রকমের স্বার্থপর। এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'চিরদিনের ইতিহাস' প্রভৃতি আরও কয়েকটি গল্প উল্লেখযোগ্য।

লক্ষণীয় যে উল্লিখিত সবগুলি গল্পেই লেখক শুধু মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, সন্দেহ, স্বার্থপরতা আর প্রতিশোধ গ্রহণের চিত্র উপস্থিত করেছেন। মানুষের এইসব জঘন্যতম বৃত্তিগুলির পরিপুষ্টি এবং বিকাশের জন্য যে অনুকূল আবহাওয়া প্রয়োজন তার দিকে দৃষ্টি রেখে লেখক তাঁর কাহিনীর জন্য সবচেয়ে নারকীয় পরিবেশসমূহ কল্পনা করেছেন ছোট ছোট অথচ অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় (সাজেস্‌টিভ) ঘটনা এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে লেখক যে নিটোল কাহিনীটি গড়ে তুলেছেন তাদের ভিতর যাতে মানুষের এই বৃত্তিগুলি ঘোল আনা নাটকীয় ভয়াবহতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ফলে কাহিনীর বীভৎস জগৎটি পাঠকের মনে দাগ কেটে কেটে বসে যায় আর সমাজ আর জীবন সম্পর্কে একটা দারুণ নৈরাশ্যের অনুভূতিতে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। নরকে বিভিন্ন পাপের জন্য বিভিন্ন শাস্তির কতকগুলো ধারাবাহিক দৃশ্য সম্বলিত একটি সুপরিচিত পটচিত্র আছে। শিশুমনে এই চিত্রটি দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করে: জীবনের কারাগারে একটু এদিক-ওদিক হেলার শোচনীয় পরিণাম দেখে সে স্বভাবতই শিউরে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই গল্পগুলো বয়স্ক পাঠকের মনেও অনুরূপ ত্রাস সৃষ্টি করে: জীবনে বিশ্বাস, ক্ষমা, ভালোবাসা সবই মায়া মাত্র, আসল শাশ্বত সত্য হচ্ছে ঘৃণা, সন্দেহ, প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সব গল্পই এই পর্যায়ের নয় (অন্যান্য পর্যায়ের গল্পের আলোচনায় পরে আসছি)। কিন্তু এই গল্পগুলোর মধ্যেই প্রেমেন্দ্রবাবুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি সুপরিস্ফুট হয়েছে যে সাহিত্যিক ভাবধারার মধ্যে তিনি লিখেছেন তারও শ্রেষ্ঠ পরিবাহক এই গল্পগুলি।

আগেও বলেছি, আবারও বলি, এই গল্পগুলির বিন্যাস-রীতি রোমান্টিক। আগের দিনের রোমান্টিক বিন্যাস-রীতির সাহায্যে আমরা যে মানবিক গুণাবলীর প্রাচুর্যের কাহিনী পেতাম এতে যদিও ঠিক তার বিপরীত জিনিসটা পাচ্ছি, তবু কাহিনী রচনার পদ্ধতিটা এক। যত ক্ষয়িষ্ণু ঘুনে-ধরা সমাজই হোক, তার মধ্যে ঘৃণা, সন্দেহ আর স্বার্থপরতার জয়যাত্রার মধ্যেও খানিকটা ভালোবাসা, বিশ্বাস আর পরার্থপরতার সংমিশ্রণ থাকবেই, না হলে নিরঙ্কুশ অধঃপতনের থেকে মানব-সমাজের পুনরগ্রগমন কখনোই সম্ভব হত না। বাস্তবতার এই সামগ্রিক সত্যের থেকে লেখক শুধু তার একটা দিকই বেছে নিয়েছেন এবং সেইখানেই বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়েছে। তারপর জীবনের এই কুৎসিত দিকটা বাস্তবে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে লেখক আর তার খোঁজ করেননি। কিভাবে কাহিনীটা সাজালে এই দিকটা সবচেয়ে নাটকীয় ভয়াবহতা নিয়ে প্রকাশ পায় লেখক শুধু তাই ভেবেছেন। রোমান্টিক বিন্যাস-রীতির এইটেই বিশেষত্ব। সেই জন্যই বস্তুতান্ত্রিক বিন্যাস-রীতিতে সম্পূর্ণাবয়ব কাহিনী সৃষ্টি কঠিন এবং পরিত্যাজ্য হলেও প্রেমেন্দ্রবাবুর কাছে তা সহজ, তাঁর বুদ্ধি-প্রধান কল্পনার কাছে অনায়াসসাধ্য। তাঁর উদ্দেশ্যের দিক থেকে কাহিনীগুলো সার্থক হলেও কৃত্রিম।

এইবারে আসে এই গল্পগুলোর পিছনে লেখকের যে মূল প্রেরণা ছিল, তার প্রশ্ন। আগেই বলেছি, বস্তুতান্ত্রিক লেখকের মূল প্রেরণা সাধারণত থাকে কতকগুলো সামাজিক সিদ্ধান্ত বা তার থেকে জাত আবেগ বা অনুভূতি। এই মূল প্রেরণার ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র বস্তুতান্ত্রিক এবং সেই জন্যই তিনি বাংলার বস্তুতান্ত্রিক গল্পসাহিত্যের অগ্রদূত বলে পরিচিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কালে আমাদের দেশের অগ্রসর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে এবং তা ইউরোপীয় ধনিক গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। সেই সঙ্গে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পূর্ববর্তীদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২১-র অসহযোগ আন্দোলনের পরাজয়ের পর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হলেও তা অর্জনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তীব্র আত্ম-অবিশ্বাস জেগেছিল। এই পরিতৃপ্তির সম্ভাবনাহীন তীব্র আশার প্রতিক্রিয়া হিসাবে নিজের দেশের প্রচলিত সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেগেছিল তীব্র ঘৃণা ও আক্রোশ। বিশ্ব-অর্থনীতির ক্ষেত্রের সঙ্গে তো বটেই, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্কের উপরে স্বভাবতই এই ঘৃণা আর আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল। এই তীব্র ঘৃণা আর আক্রোশই হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লেখাগুলির মূল প্রেরণা। সঙ্গে হতাশা এবং আত্ম-অবিশ্বাস ছিল বলে এই ঘৃণা হয়ে উঠেছিল নিশ্ছিদ্র। উপরে বর্ণিত প্রায় সমস্তগুলো গল্প বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে লেখক সর্বত্রই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্কগুলিকেই আক্রমণ করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, রিক্ত বৈধব্যজীবন, প্রেমের ছলনায় কাম-ক্ষুধাতুরের কারসাজি, বিকৃত যৌনজীবন, পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থপরতা আর লোভের জঘন্য প্রকাশ—এইসব ধরনের বিষয়বস্তু নিয়েই

এই পর্যায়ের গল্পগুলো লেখা। আমাদের দেশের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাই যদিও লেখাগুলোর কেন্দ্র, কিন্তু লেখক নিজেও এই সমাজের অংশীভূত বলে, সমাজের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে নিজেও ক্ষতবিক্ষত বলে, নিজের বিষয়বস্তুর থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। ফলে এই সমাজ-ব্যবস্থার থেকে যে কোনোদিনই মুক্তি সম্ভবপর সে-বিশ্বাস লেখক হারিয়ে ফেলেছেন, এমন কি মানব-জীবনের যে কোনো ক্রম-কল্যাণকামী অগ্রগতির ধারা আছে সে-বিশ্বাসও তাঁর নেই। জীবনের যা-কিছু ভালো এবং সুন্দর, যা-কিছু সুখকর তা ক্ষণস্থায়ী, জীবনের শাশ্বত সত্য হল দুঃখ আর মৃত্যু। ('প্রথমা'র কবিতা : 'বুক দিল যে, ভুখ দিল যে, দুখ দিতে সে ভুললো না; মৃত্যু দিলো লেলিয়ে পিছে পিছে')। হতাশা আর ঘৃণার থেকে লেখকের মনে যে তীব্র অসহিষ্ণুতার জন্ম হয়েছিল তার ফলে বস্তুজগতের নৈর্ব্যক্তিক অনুশীলন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তাঁর এই সময়কার কবিতাগুলোর মতো এই গল্পগুলোও অনেকখানি কাব্যধর্মী; আর তারই প্রমাণ লেখকের রোমান্টিক বিন্যাস-রীতি।

রোমান্টিক বিন্যাস-রীতির আরও একটা কারণ আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কালের লেখক সে-কালে 'আর্টের জন্যই আর্ট'-এর জয়গানে বাংলাদেশের সাহিত্যিক আবহাওয়া মুখরিত। যদিও এই নীতির সমর্থনে প্রেমেন্দ্রবাবু কোথাও কিছু লিখেছেন বলে চোখে দেখিনি, তবু এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে তিনি এই নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে, যে-সময়ে তিনি জীবনের ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের মূল্যবোধ প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন, সে-সময়ে এই নীতি তাঁর কাছে বিশেষ উপযোগী বলে বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। জীবনের আর কোনো কিছুরই কোনো মূল্য নেই, একমাত্র তাঁর নিজের অর্থাৎ শিল্পীর মূল্য ছাড়া। সেইজন্যই সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মনে যে সামাজিক সিদ্ধান্তের জন্ম হয়েছিল, সমাজকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার কোনো তাগিদ তিনি বোধ করেননি; বা তাঁর বস্তুতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগুলিকে কাহিনীতে রূপ দেওয়ার সময় যথাসম্ভব অবিকল বাস্তব ঘটনাসমূহকে সংযোজন করারও দরকার বোধ করেননি। বাস্তব ঘটনার চেয়ে শিল্পীর কল্পনা তাঁর সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলে তাঁর মনে হয়েছে।

তবু প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলো তাঁর সময়ের হিসাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই হিসাবে যে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত লেখকই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-নীতির কিছু কিছু অসম্পূর্ণ সমালোচনা করলেও তার ক্ষয়িষ্ণু রূপটাকে উদ্ঘাটন করেননি। প্রেমেন্দ্র মিত্রও অবশ্য এই সমাজের কোনো সম্পূর্ণ চিত্র দেননি, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম লেখক যিনি এই সমাজের নিরবয়ব বর্বরতাকে ঘৃণার বস্তু হিসাবে উপস্থিত করেছেন।

লেখাগুলোর শিল্পমূল্য কতখানি সে-প্রশ্ন উঠতে পারে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ-গল্পগুলো রচনাকালের এত বছর পরেও আজও যে-কোনো পাঠকের বিস্মিত স্বীকৃতি আদায় করতে পারে। কিন্তু গল্পের আকর্ষণী শক্তিই তার শিল্পমূল্যের একমাত্র নিরিখ নয়। পাঠককে একটি

সহজ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে অনুরোধ করি। যদি কেউ এমন কথা ঘোষণা করত যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই গল্পগুলিই বাংলা সাহিত্যের গল্পের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় এবং প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা, তবে কি আমরা সুখী হতে পারতাম? যে বাংলা সাহিত্যে আমরা নিশ্চিত মনে জানি যে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মতো বিরাট ঐতিহ্য আছে সেখানে প্রেমেন্দ্রবাবুর জন্য একটি ছোট্ট উজ্জ্বল কোণ ছেড়ে দিতে আমরা ইতস্তত করব না। কিন্তু তার বেশি নয়।

প্রেমেন্দ্রবাবুর যে-গল্পগুলোর কথা এতক্ষণ আলোচনা করা গেল সেগুলো তাঁর রচনামালার সবচেয়ে পরিণত স্তর। স্বভাবতই এই স্তরের আগে একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা আবিষ্কার করা যায়। মোটামুটিভাবে প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনায় তিনটে পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্যায়গুলো সত্যিই কালানুক্রমিক কিনা আমার পক্ষে অনুসন্ধান করে দেখা সম্ভব হয়নি, তবে দেখা উচিত বলে মনে করি। আমার বিশ্বাস, ঠিক লাইন টেনে এই পর্যায়গুলো ভাগ করতে চাইলে ভুল হবে। তবে কতকটা কালানুক্রমিকতা থাকা একেবারে অসম্ভব নয়।

প্রেমেন্দ্রবাবুর মধ্যম পর্যায়ের গল্পগুলোর মধ্যে 'ময়ূরাক্ষী', 'মহানগর', 'ভস্মশেষ', 'সত্যমিথ্যা', 'লজ্জা', 'চুরি', 'সংসার সীমান্তে', 'পটভূমিকা" প্রভৃতি গল্পগুলি পড়ে। এবং আরও আগে প্রথম পর্যায়ের মধ্যে 'শকুন্তলা', 'সংক্রান্তি', 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা', 'দিবাস্বপ্ন' প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের মধ্যে প্রেমেন্দ্রবাবুর 'মিছিল', প্রথম পর্যায়ের এবং 'উপনয়ন' মধ্যম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে লেখক 'সিনিক' হয়ে ওঠেননি। অনেকগুলোই সমসাময়িক কালের খুব প্রচলিত প্রেমের ব্যাপারের অম্লমধুর রস নিয়ে লেখা। লেখক এখন প্রেম মানুষকে মহৎ করে বা প্রেমের মোহিনী শক্তি আছে এ-সব কথা বিশ্বাস করেন। যেমন 'সংক্রান্তি' গল্পে নায়ক তার অপরিসীম দারিদ্র্যের জন্য আত্মহত্যার সংকল্প নিয়ে আফিম খেয়েছিল। কিন্তু তারপর একটি পত্রে তার প্রেমাস্পদার দারুণ দুরবস্থার কাহিনী জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করার প্রয়োজনে বেঁচে ওঠার তীব্র ইচ্ছা বোধ করতে লাগল। 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা' গল্পের নায়ক বিবাহ-বিরোধী। পিতার আদেশে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েও বৌকে তার পিত্রালয়ে ফেলে রেখেছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রে একবার বৌ-এর পিত্রালয়ে রাত্রিযাপন করতে বাধ্য হওয়ার পর তার পূর্বমনোভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল।

'মিছিল' উপন্যাসটিতে কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীর বিচিত্র জীবনের একটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। এই কর্মীরা প্রাণের আবেগে উচ্ছল, সমাজকে কলুষমুক্ত করতে তারা সর্বদাই ব্যগ্র। সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যেও লেখক মহৎ মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছেন এই বইয়ে, বইয়ের সুর মোটের উপর আশাবাদী।

মধ্যম পর্যায়ের গল্পগুলিতে লেখক আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছেন। এই সমাজের নীচতা, কদর্যতা, কুসংস্কারসমূহ এবং উৎপীড়ন-ব্যবস্থা লেখকের মনকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

তবু এই পরিবেশের মধ্যেও যে মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বই লোপ পেয়ে গেছে, বা এই সমাজ-শৃঙ্খলকে এড়ানোর ক্ষমতা যে মানুষেব নেই, লেখক এখানে অতটা বিশ্বাস করেন না। বরং এই সমাজের মধ্যেই তিনি এমন সব অদ্ভুত মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছেন, এমন সব ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখেছেন, যার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন না করে লেখক পারেন না। এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রেব বিশেষ প্রভাব আবিষ্কার করা যায়, তেমনি ব্যক্তিত্বপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

'সাগর সঙ্গমে' গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন যে, একটি নিষ্ঠাবতী বিধবা একটি বেশ্যাকন্যার স্পর্শভয়ে ভীত। দৈবক্রমে নৌকাডুবির ফলে সেই মেয়েটি যখন অসহায় হয়ে বিধবাটির একান্ত মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল, তাঁর ভিতর এমন মাতৃত্ববোধ জেগে উঠল যে তিনি তাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। মেয়েটির মৃত্যুর পর তিনি অনায়াসে তাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিলেন। 'লজ্জা' সতীত্বের নীতি অনুযায়ী ভ্রষ্টা অথচ অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববতী একটি মেয়ের কাহিনী, এ-সব গল্পে শরৎচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

'মহানগর' গল্পে একটি মেয়ে দুর্বৃত্তদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হবার ফলে পরিণামে বারবনিতা হয়েছে। পিতা তাকে গ্রহণ করেননি। তার ছোট ভাই বহুকষ্টে তাকে আবিষ্কার করল; সে যখন বুঝতে পারল যে সমাজ তার দিদিকে গ্রহণ করবে না তখন সে প্রতিজ্ঞা করল যে বড় হয়ে সে দিদিকে উদ্ধার করবে। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখক এখানে স্পষ্টতই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

'উপনয়ন' উপন্যাসটিতে লেখক অত্যন্ত কদর্য পারিবারিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে কি করে একটি বালক ধীরে ধীরে শেষপর্যন্ত একটি দলের হাতে পড়ে পেশাদার ভিক্ষুকে পরিণত হল তার কাহিনী দিয়েছেন। এক সন্ন্যাসী শেষে ছেলেটাকে উদ্ধার করে সমাজ-কল্যাণের কাজে লাগান। এই বইয়েও লক্ষণীয় যে, কদর্য সমাজ-জীবনের মধ্যেও ছেলেটির ভিতরকার প্রাণের দীপ্তি নষ্ট হয়নি। সুযোগ পেয়েই সে ভালো হয়ে উঠল। আর সে যে ভালো হল সে-ও নেহাতই একটি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মারফত।

'সংসার সীমান্তে' গল্পটিতে একটি বারবনিতা ও একটি চোরের অদ্ভুত পারস্পরিক আসক্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উৎপীড়িত এবং পতিত নারীর মধ্যে একনিষ্ঠ ভালোবাসার সন্ধান করতে পেরেছেন লেখক।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আরও কয়েকটি গল্প আছে সেগুলিকে এই তিনটি পর্যায়ের কোনোটির মধ্যেই ঠিক ঠিক ফেলা যায় না। যেমন 'স্টোভ', 'জ্বর' 'ছুরি', 'পিস্তল'; 'সৈনিক' মনোবৃত্তির দিক দিয়ে লেখাগুলোকে তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে, কিন্তু আক্রমণের লক্ষ্যস্থল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নয়। শেষের তিনটি গল্প যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে লেখা। বিশেষ করে শেষ গল্পটিতে কতকগুলি বেওয়ারিশ, অত্যন্ত দুঃস্থ ছেলে-মেয়ের তাদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা লেখকের খানিকটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সূচনা প্রকাশ করে।

"প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বল্পকালীন সাহিত্য-জীবনে (তাঁর শিশু-সাহিত্য এবং সিনেমা-সাহিত্যের প্রসঙ্গ বাদ দিলে) যে ক্রমপরিণতির পরিচয় পাওয়া গেল সংক্ষেপে তার পুনরালোচনা করা যাক। শরৎ-সাহিত্যপুষ্ট আবহাওয়ায় তিনি প্রথমে রোমান্টিক মূল প্রেরণা (বা দৃষ্টিভঙ্গি) এবং রোমান্টিক বিন্যাস-রীতি নিয়ে লিখতে শুরু করেন। ক্রমশ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে সমাজচেতনা একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে থাকে এবং তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-জীবনের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু এখনো তিনি 'রোমান্টিক'দের মতো মানুষের অন্তর্নিহিত মানবতাবোধে বিশ্বাস হারাননি। তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি আর একটু বাড়ার পরে আমাদের দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতি তাঁর কাছে দুর্বার অনতিক্রম্য নাগপাশ বলে বোধ হল। এই নাগপাশকে ছিন্ন করে তাঁর স্বপ্নের ইউরোপীয় বুর্জোয়া অর্থনৈতিক জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলে বোধ হওয়ায় নিজের দেশের অবস্থার প্রতি তাঁর মন হতাশা এবং ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে গেল। জীবনের সমস্ত পুরোনো রোমান্টিক মূল্যবোধ তিনি হারিয়ে ফেললেন অথচ নতুন কোনো মূল্যবোধ সে শূন্যস্থানকে পূরণ করল না। একমাত্র বেঁচে রইল তাঁর নিজের অর্থাৎ শিল্পীর মূল্য। এইভাবে 'আর্টের জন্যই আর্ট' নীতির প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে তিনি তাঁর অসম্পূর্ণ, অনৈতিহাসিক, যদিও বস্তুতান্ত্রিক সামাজিক সিদ্ধান্তকে শিল্পে রূপ দেওয়ার জন্য তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করার বা লব্ধ অভিজ্ঞতাকেই আরও নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর অসম্পূর্ণ সামাজিক সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করার জন্য তিনি একটি কল্পনার বস্তুতান্ত্রিক জগৎ সৃষ্টি করলেন আর উপকরণ বাস্তবের থেকে সংগৃহীত হলেও তা বস্তুজগতের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। এই রোমান্টিক বিন্যাস-রীতি নিয়ে গোড়াতে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প-সাহিত্যের শিল্পমূল্য পুরোপুরি বুঝতে হলে তা অপরিহার্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আর একটা কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বস্তুতান্ত্রিক লেখক হলেও এবং নিম্নমধ্যবিত্ত এবং আরও নিম্নস্তরের সমাজ-জীবনকে সাহিত্যে উপস্থিত করলেও সংঘবদ্ধ মজুর-জীবনকে কোথাও ভুলেও স্থান দেননি। অথচ তাঁর সময়ে মজুর-আন্দোলন বেশ অগ্রগতিশীল ছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করা খুব কঠিন নয়। প্রথমত, মূলত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন লেখকের মনকে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের গ্লানি যতটা নাড়া দিয়েছে বুর্জোয়া সমাজ-জীবনের গ্লানির ততটা নাড়া না দেওয়াই স্বাভাবিক। আর দ্বিতীয়ত, রোমান্টিক বিন্যাস-রীতির পক্ষে মজুর-জীবনের অত্যন্ত স্পষ্ট চেহারাটা খুব উপযোগী নয়, তাকে নিয়ে কোনো রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায় না।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প-সাহিত্যের এই পরিণত রূপ এককালে বাংলা সাহিত্যে বেশ ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। অন্তত দু'জন খুব শক্তিশালী লেখক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' পর্যায়ের গল্পগুলির ক্ষেত্রে) এবং সুবোধ ঘোষ (তাঁর 'ফসিল' পর্যায়ের গল্পগুলির ক্ষেত্রে) এই রচনা-রীতি অনুসরণ

করে তাঁদের সাহিত্য-জীবন শুরু করেন। তিনজনের ক্ষেত্রেই সামাজিক সিদ্ধান্ত কমবেশি স্বতন্ত্র হলেও অসম্পূর্ণ; তিনজনেই রোমান্টিক বিন্যাস-রীতির সাহায্যে বুদ্ধিপ্রধান কল্পনা দিয়ে সামান্য বাস্তব উপকরণ থেকে জমকালো রহস্যময় সাজানো গল্প বানিয়েছেন। আবার প্রেমেন্দ্রবাবু যেমন সহজেই তাঁর রচনা-রীতিতে বিরক্ত হয়ে অল্পদিন পরেই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাহিত্য-রচনাই ছেড়ে দিয়েছেন; তেমনি পরবর্তী লেখকরাও ভিন্ন পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। মানিকবাবু জনপ্রিয়তা হারানোর ভয় সত্ত্বেও নিষ্ঠুর সংযমের সঙ্গে কল্পনার বস্তুতান্ত্রিক জগৎ-সৃষ্টির প্রবণতার থেকে মুক্তিলাভ করে একটি সুস্থ সমাজবোধ অর্জনের চেষ্টা করছেন। আর সুবোধবাবু বুর্জোয়ার নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে একটি ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ইতি-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের অসম্ভব প্রচেষ্টায় মগ্ন হয়েছেন। পরপর তিনজন শক্তিশালী সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেই এমন একটা জমকালো জনপ্রিয় রচনা-রীতি যে শেষপর্যন্ত তাঁদের শিল্পীজীবনে গুরুতর বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা কৌতুকপ্রদও বটে শিক্ষাপ্রদও বটে। বস্তুতান্ত্রিক হয়েও যে-লেখকেরা প্রতি-নিয়ত তাঁদের অভিজ্ঞতার পরিধিকে বিস্তৃত করতে সচেষ্ট নন, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সঙ্গে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে করে নিজেদের পূর্ব সিদ্ধান্তকে সংস্কার করতে তৎপর নন, এক-কথায় যাঁরা বস্তুকে বাদ দিয়ে বস্তু-তান্ত্রিক, জীবনকে বাদ দিয়ে জীবন-শিল্পী, তাঁদের এই পরিণতিই স্বাভাবিক এবং অবধারিত।

গত সংখ্যায় এই প্রবন্ধে রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে টল্‌স্টয়ের নাম করা হয়েছিল। এই নামটি বাদ দিয়ে পড়ার জন্য অনুরোধ জানাই।—লেখক।

ভূদান

সুধীর করণ

মাহাতোদের গ্রাম। বন্ধুর শুষ্ক অবারিত প্রান্তর একটা বিরাট ধূসর কচ্ছপের মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে যেন। তার ওপর এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে মহুয়াগাছ আর বহু পরিশ্রমে তৈরি করা এলোমেলো কতকগুলো খেত। নারকোলের উপরিভাগের মতো শক্ত মাটি। এই মাটি কেটে তার ভেতর থেকে রস সংগ্রহের কঠিনতম প্রচেষ্টা যারা করেছে তারাই পাশের গাঁয়ের অধিবাসী কুর্মি-মাহাতোর দল। ধলভূমের কঠিন বুক চিরে কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচে থাকার জন্য তাদের পেশীকে তারা কাজে লাগিয়েছে বহুদিন ধরে। কিন্তু পাথরের বুক থেকে জলের ধারা টেনে আনবার পক্ষে তাদের কোদাল আর কাঠের লাঙল যে একেবারেই অনুপযোগী, তারা সে কথা মানবার বা জানবার সুযোগই পায়নি কোনোদিন।

দূরে দেখা যায় একটা পাহাড়। ওরা বলে ডুংরি—অর্থাৎ ছোটো পাহাড়। বিরাট একটা অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো লম্বা হয়ে পড়ে আছে। লালচে রঙ। এককণা মাটিও নেই তার ওপর; গাছও নেই ঘাসও নেই। এক-তাল কঠিন পাথর স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। তার পেছনেই লম্বা হয়ে চলে গেছে পাথুরে দেয়াল। সারি সারি সবুজ পাহাড় ধলভূমের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে গিয়ে দলমা পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে। এর মধ্যে পাহাড়-প্রাচীরের কোলভরা জমিটুকু শুধু উর্বর। পাহাড়ের বুক থেকে বর্ষার জল গড়িয়ে পড়ে ধানচাষের উপযোগী খেতের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে জমি গরিবদের জন্য নয়; সে জমি সব রর্ধিষ্ণুদের, সাউ-মহাজনদের। বাকি সমস্ত জায়গা ধূ ধূ করে মরুভূমির মতো। বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে আছে বলেই সেই মরুর বুকেও এখানে ওখানে কোদাল চালিয়ে কিছুটা জায়গা সমতল করে আউশ ধানের অথবা 'কদো' আর শ্যামাঘাসের চাষ করে মাহাতোরা, কয়েক পুরুষ ধরে।

এরই মধ্যে মরুভূমির মাটি আঁকড়েই পড়ে আছে চরণ মাহাতে। সম্পত্তি তার তিন-চার বিঘে জমি আর একটা মহুয়াগাছ। নিজের হাতে মাটি কেটে ওই জমি তৈরি করেছিল তার ঠাকুরদাদা। তার ঠাকুরদাদাই ওই জায়গাটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল জমিদার-কাছারি ঘাটশীলা থেকে। জমি তো নয়, পাথর।

সেই পাথর ফাটিয়ে ধান। সারা বছরের কঠিন সংগ্রামের পর অপূর্ব সেই পৌষ মাস। শুধু একটা মাস, তবু। সারা বছরে সাধের দিন ওই একবার, মকরসংক্রান্তির সময়, 'টুসু পরবে'। মেয়েদেরই উৎসব ওটা। একমাস ধরে টুসু দেবীর মূর্তির সামনে গান গায় মেয়েরা। মকর সংক্রান্তির দিন টুসুর বিসর্জন। নতুন জামাকাপড় পরে ছেলে মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সবাই মেতে ওঠে সেদিন। পিঠের ধুম পড়ে যায়। মেয়েদের মধ্যে টুসু গান গাইতে পারে বলে

নাম আছে রুকমিনির. চরণ মাহাতোর বউ। পৌষের গোটা মাসটাই গান নিয়ে মেতে থাকে সে। পৌষের গোটা মাসটা মন ভরে থাকে চরণ মাহাতোরও। কারণ এই একটা মাসই শুধু ধানের মাস। তার পর শেষ হয় পৌষ, শেষ হয় টুসু পরব। আর এদিকে যৎসামান্য পাওয়া ধানের গোলাটাতেও টান পড়ে। শীত গিয়ে আসে বসন্ত। আর গরিব মাহাতোদের ঘরে পরব শেষ হয়ে জাগে ক্ষুধা।

বসন্তের সেই ক্ষুধার সময় অসময়ের বন্ধু শুধু ওই মহুয়া গাছটা।

বসন্তের সারা রাত ধরে টুপটাপ করে মাদক ফুলগুলো ঝরতে থাকে গাছের তলায়। সোনা সোনা রঙ, রসে টইটম্বুর। বসন্তের উন্মাদ করা রাতে তারা ভূমিশয্যায় লুটিয়ে পড়ে। ভোর সকালে উঠে মেয়েরা মহুয়ার ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।

যাদের নিজের জমির ওপর গাছ আছে, তাদের তো কথাই নেই; সকাল-বেলায় গিয়ে কুড়োলেই হল। মাঘ পেরোলে এই ফুলগুলোই প্রাণ বাঁচায় ওদের। মহুয়া ফুল শুকনো করে, চালের গুঁড়ির সঙ্গে মিশিয়ে পিঠে তৈরি করে খায়; গুড় দিয়ে নাড়ু বানিয়ে রাখে। তারপর মাঝে মাঝে শরীরকে চাঙ্গা করবার জন্য বোতলভরা নির্যাসও দরকার হয় বৈকি।

কিন্তু কিছুদিন থেকে এই খাদ্যটুকুর ওপরেও এসে হামলা শুরু করেছিল একটা ভালুক। চরণ মাহাতো খেপে উঠেছিল; ধানের জমিগুলো কেমন করে যে আস্তে আস্তে ভজহরি দাসের কবলে গিয়ে পড়েছে, তা তেমন মাথায় ঢোকেনি চরণের। কিন্তু ভালুকটাকে চিনতে তার ভুল হয়নি।

ভালুকটাকে মারার জন্য সারারাত সে বসেছিল গাছের ওপর। ফিরে এল বিজয় গর্বে সত্যি সত্যি ভালুকটাকে মেরে—"মারলম গো, কাকা। শালা চোরের সাতদিন তো গিরস্তের একদিন। মহুয়া ফুলকে আর তলায় পড়তে দিলেক নাই। দিন দিন রাইতের বেলায় আইসে সব শালা খাঁয়ে লিবেক। কাল গোটারাত গাছের উপরে বসে কাঁটাইছি।"

মাদী ভালুক। দুটো ছানাও আছে সঙ্গে। দেখে খুব খুশি হয়েছিল রুকমিনি; খুশি হয়ে সাধ করে বাজারের বিক্রি দুধটা বাজারে না পাঠিয়ে খেতে দিয়েছিল তার বাহাদুর স্বামীকে। সারাদিন ধরে লোকে গিয়ে গিয়ে দেখে এসেছে ভালুকটাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাত দিয়ে পরখ করে ভালুকটাকে, রুগ্ন ছেলেকে কেউ শুইয়ে দেয় ভালুকের দেহের ওপর। সারা-দিন ধরে সুযোগ পেলেই চরণ একবার করে জানিয়েছে—"শালা চোরের সাতদিন তো গিরস্তের একদিন....."

তারপর রাত্রে ঘুমোতে গেছে নিশ্চিন্ত হয়ে। আজ আর ভালুকটা আসবে না।

কিন্তু ঘুম আসেনি তেমন। অত পরিশ্রম, আগের রাতের অতখানি অনিদ্রা সত্ত্বেও ঘুমের বদলে বরাবরই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দুশ্চিন্তা।

বসন্তের জ্যোৎস্না। শিমুলগাছটার নিষ্পত্র ডালে অজস্র ফুলের ছড়াছড়ি। নেবু ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে চরণের নাকে। গরমটা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল চরণ। দাঁড় দিয়ে বোনা, বাঁশের খাটিয়ার ওপর একটা কাঁথা পেতে শুয়ে আছে সে, বাইরের বারান্দায়। সত্যি, মেয়েটা

খুবই ভালো; প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে চরণকে। সাধআহ্লাদ করতে কে আর মানা করে বল; অভাবের জ্বালাতেই তো সব নষ্ট। তারও কি সাধ হয় না বৌকে একটা ভালো শাড়ি কিনে দিতে, বাজারের মেয়েরা যেমন পরে? তারও কি সাধ হয় না সোনার চুড় গড়িয়ে দিতে? রুপোর হাঁসুলিখানার পরিবর্তে একগাছি সোনার হার—; ভজহরিদাসের পুত্রবধূর গলায় যেমনটি আছে—? নিতাই কাকাকে ফালের দামটা না দিলেই নয়। কালবাদে পরশু জমিটায় লাঙল দিতে হবে। কম পক্ষে, যোগ বুঝে চার-পাঁচটা চাষ না দিলে ও জমিতে যে ঘাসও হবে না—। ওঃ থাকত যদি কয়েক বিঘা শোল জমি তাহলে এমন দুর্দশা কি তার হত। সোনা ফলিয়ে দিত। কাঁচা সোনা। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যে সব জমি, সে সবই তো প্রায় ভজহরি দাসের। মাহাতোদের জমিই তো ছিল ও সব। নানা ফন্দীফিকিরে হাতিয়ে নিয়েছে দাস। আর এধারের ধুধু করা ফাঁকা মাঠও তো বন্দোবস্ত নিয়ে রেখেছে। কি করবে কে জানে? বাঁশবাগান করবে শুনছি। যুদ্ধ বাধলে নাকি একটা বাঁশের দাম এক টাকা, আরো বেশি পাওয়া যায় সময় সময়। ভগবানের বিচার—! কারো একছটাক-ও জমি নেই, কারো শ' শ' বিঘা। এই সময় খবরটা এনেছিল রুকমিনি—

ঘুমালে নাকি গোঃ

চিন্তার সুতোটা জটপাকিয়ে এলোমেলো হয়ে, ছিঁড়ে যায় শেষ পর্যন্ত।

রুকমিনি?

হুঁ গো, আমিই। ভাবলম ঘুমালে কি না দেখে যাই—। ঘরের ভেতরে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতে চায় রুক্‌মিনি।

শুন্‌ ইদিকে—, শুয়ে শুয়েই ডাক দিল চরণ—

কেনে? লীলায়িত হয়ে ওঠে রুক্‌মিনির দেহখানি।

জ্যোৎস্নাটা যেন দিনের মতো স্বচ্ছ। মহুয়া ফুলের মাদকতায় বাতাস যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে চরণের একপাশে বসে পড়ল রুক্‌মিনি।

রুক্‌মিনির হাতদুটি, নিজের বুকের ওপর তুলে নেয় সে।

বেশ রাতটি, না রে? চরণ উৎসুক চোখে প্রশ্ন করে।

খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে রুক্‌মিনিঃ হায় মাগো, রকম দেখ! জোছনা-রাত বেশ হবে নাই তো, কি আঁধার রাত বেশ হবেক?—

চরণের হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়ে রুক্‌মিনি—

উঠলি যেঃ চরণ ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা বলে।

আসিছিলম বলতে তুমাকে। কাল যাওনা কেনে চাকুলিয়া বাজারে। উখানে মিটিন হবেক, শাউড়ি শুইনে আইল—।

মিটিং? কিসের মিটিং? চরণ বলে। তা মিটিং তো দিনরাত হচ্ছে আজকাল। আমি সিখানে যাব কেনে? আমরা কি মিটিং করি যে, যাব? মিটিং তো কংগ্রেস করে, ভজহরিদাস করে। ভোটের সময় দেখলি নাই, কেমন মিটিং—চল্ল, দিন আর রাত, রাত আর দিন। বস্‌ ভোটও ফুরাল, মিটিংও ফুরাল।

কি জানি বাবা, কিসের মিটিন্‌ঃ রুক্‌মিনি জবাব দেয়।

~ত' মা' যে কিছু বলল নাই আমাকে?

আর বলবে কখন? তুমি তো সন্ধের বেলা বেরাঁই গেলে। ফিরলে তো রাত কইরে। মা, তখন ঘুমাঁইছে। একটু ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বলেঃ না বাবা শুঁয়ে পড়ি যাই, রাত হই'ছে ঢের—। পা বাড়ায় রুক্‌মিনি—।

আমিও ঘুমাই এখন, কাল শালা রাতভর গাছের উপর বসে কাটাইঁছি। পাশ ফিরে শোয় চরণ।

সকালেই, মিটিং-এর খবরটা পাওয়া গেল বুড়ির কাছে। ভজহরিদাসের বাড়িতে কয়েকদিনের বাকি পয়সা আনতে গিয়ে, শুনে এল মিটিং-এর কথা। কারা নাকি এসেছে হিল্লী-ডিল্লি থেকে—। গরিব লোকদের জমি দিবে বিনা পয়সায়। কথাটা শুনেই বুড়ির চোখদুটি আঁধার রাতের বিড়াল-চোখের মতো জ্বল জ্বল করে উঠেছিল। কংগ্রেসকর্মী দাস মশাইকেই জিজ্ঞাসা করল সেঃ জমি দিবে বাপ? বিনা পইসাতে? উরা কি জমি লি'য়ে আসিয়ে'ছে সাথে করি?

দুর্ বুড়ি—, বুড়ির বোকামি দেখে হেসে ওঠেন ভজহরি দাস। —জমি সব বড়লোকরা ছাড়ি দিবেক, গরিব লোকের লাগি, বুঝলি?

বুড়ি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়? বিশ্বাস করতে চায় না। তবুও কি যেন একটা অনাগত আশায় তার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার দন্তহীন মুখটা যেন রসালো হয়ে ওঠে। জমি? জমি, উয়ারা ছাড়ি দিবেক গরিব-লোকের লাগি?

কিছুক্ষণ ধরে কথাই বলতে পারে না বুড়ি।

একটা কথা বলব বাবা, রাখবে বুড়ির কথা? ভজহরি দাসের দিকে ব্যাকুল দু'টি শীর্ণ চোখ তুলে ধরে বুড়ি—

কি বল্ না? ভজহরি দাসের মুখেচোখে করুণার ছাপ ফুটে ওঠে।

বড় গরিব বাবা আমরা। আমার চরণকেও জমি দিবি বাবা। ভগমান ভালা করবেন। আর কিছু বলতে পারে না বুড়ি।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই পাবে, সব গরিব লোকই জমি পাবে। তবে চরণ হয়তো কম পাবে; তার-তো তবু দু'এক বিঘা আছে। অনেকের যে একেবারেই নাই— ভজহরি আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

উ জমিতে কিছু হয় নারে বাবা, কিছু হয় না। জলা জমি দু'বিঘা পেলে, তবু—।

—দেখি কি হয়, মিটিং-এ আসতে বলিস চরণকে।

চণ্ডীতলায় মিটিং বসেছে। ভজহরিদাস লোকজন বসাচ্ছেনঃ বসে পড়, বসে পড় সব। এক্ষুণি সভার কাজ শুরু হবে। দূরের গ্রাম থেকেও লোক এসেছে। রাস্তায় নাকি লোক ভরা। যতো গরিব মানুষের দল। জমির বুকে ফসল ফলাতে উৎসুক। জমি পাবার আশায় ছুটে এসেছে সবাই।

চরণ মাহাতো, হারান মাহাতো, বুড়ো নলিন কামার, নারান মাঝি, টুলা হেমরম, যতীশ কাটারি, সুবল তাঁতি এবং আরো কয়েকজন হন্তদন্ত হয়ে পথ চলেছে। তাড়াতাড়ি না গেলে জমি হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে। লোক-তো আর কম যাবে না!

পাহাড়-গোড়ার দু'টো বিঘা জমিন যদি পাই হে, তাহলেও কিছুটা বাঁচোয়া, —চরণ বলে। সংসার আব চলে না।

সুবল তাঁতি বলেঃ উ সব জমিতো ভজহরি দাসের বটে। দিবেক কি? মনে ত হয় না যে, দিবেক? দূর বোকা,—জবাব দেয় বুড়ো নালন কামার—, জমি কি ভজহরি দাস দিবেক? মন্ত্রী না কে আইছেন যে, উই তো দিবেক?

কিশোরীপুরের রাস্তায চানা সাঁওতালেব সঙ্গে দেখা। জ্বরে ভুগে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। হাঁটতেই পারে না। সে-ও লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে—।

টুলা হেমরম বলেঃ তুই কেনে যাচ্ছু হে, রোগা লোক—

আর ভাই না গেলে কি আমাকে দিবেক? চানা উত্তর দেয়। যাতেই হবেক, মরি আর বাঁচি—। নিজের জমি থাকলে, আর এমুন দশাটা হয় আমার! খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে পাশাপাশি প্রত্যেক গ্রামে। বুকে তাদের, কিসেব যেন একটা স্পন্দন। আশা-নিরাশার অদ্ভুত—একটি হাতছানি,—তাদের চোখেব দৃষ্টিকেও ঝাপসা করে দিয়েছে যেন। জমি,—ফসল ফলাবাব জমি—! ভাগ-সাঁজার জমি নয়, একেবারে নিজের জমি।

সুবল তাঁতি, বিশ্বাসই করতে পাচ্ছে না,—কলিযুগে এমনটি হয়! কি জানি বাবা, উয়ারা তো বলিছিল জমিদারি থাকবেক নাই, জমির মালিক হবেক কিসান। ভোটের সময় কত কি বলিছিল। হয়তো সেই ভোটের কথাই রাখবেক উয়ারা। জমি দিতেও পারে। উয়াদেব তো অনেক জমি। চরণ মাহাতো বলেঃ জমি-দারি তো লিই লিছে গবরমিন্ট। লুটিশ দিয়ে যায় নাই ত'দের?, বলে নাই যে ইবার থাকু খাজনা লিবেক গববমেন্ট?

হাঁ তা'ত বলিছে, টুলা হেমরম বলে—, আব জমির মালিক যে চাষী হবেক বলিছিল—?

হঁ, চাষী হবেক না আর কিছু। উয়ারা ভোটের সময়ে বলে উ কথা—

জায়গাটা গমগম কবছে। সাঁওতাল মাহাতোব দল দূব দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে। চরণ মাহাতোর দলটি এসে যখন পৌঁছুল, তখন সামনের দিকে আর জায়গা নেই। ওরা একপাশেই দাঁড়াল গিযে। চরণেব মনে হল, ভজহরি দাস যেন চরণকে দেখেছে। খানিকটা ভরসা পেল সে।

একটি টেবিলের ওপর ফর্শা একটি কাপড় পাতা রয়েছে। টেবিলের পেছনে কয়েকটি চেয়ার আব বেঞ্চে বসে আছেন, শেঠ ভগবানদাস ঝুনঝুন-ওয়ালা, কাঠ-ব্যবসায়ী রতনলাল সামন্ত, গ্রামপঞ্চায়েতের 'সরপঞ্চ' আর 'মুখিয়া', এবং এ অঞ্চলের কয়েকজন খ্যাতনাম্া ধনী লোক। প্রায় ছশো বিঘা জমির মালিক হারাধন মাইতিও এসেছেন। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন প্রসিদ্ধ কর্মী নরহরি উপাধ্যায়। চুপ কর ভাই সব। এবারে সভার কার্য আরম্ভ হবে। কোলাহল বন্ধ কর—ঃ ভজহরি দাস শুদ্ধ বাঙলায কথা বলেন। সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেবার সময়, বড়ো বড়ো শব্দ দিয়ে কথা তৈরি কবেন তিনি: অনেকসময় শব্দের অপপ্রয়োগ তো হয়ই, অর্থান্তরও হয়। ভজহবি দাস, উদ্যোক্তাদের অন্যতম।

সভাপতি নরহবি উপাধ্যায় ঘোষণা করলেনঃ প্রথমে রামধুন সংগীত—

কয়েকজন ছোকরা উঠে দাঁড়াল বিকৃতকণ্ঠে বাঙলা কীর্তনের সুরে 'রামধুন' গাইতে লাগলঃ রঘুপতি রাঘব রাজারাম.....

শেঠ ভগবানদাস, কর্মী ভজহরি দাস, স্বয়ং সভাপতি এবং আরো কয়েকজনের কণ্ঠ থেকেও ঐকতান ধ্বনিত হলঃ সবকো সুমতি দে ভগবান—

সুবল তাঁতি, বৈষ্ণব মানুষ। গলায় কণ্ঠী-ও আছে তার। ভাবলঃ সুমতি তা হলে হই'ছে উয়াদের। শেঠজীও গান ধরেছেন—!

জনতা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ভজহরি দাস গলা খাঁকারি দিয়ে, মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে, সভাপতির পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরই বক্তৃতা দেবার পালা—

ভাইগণ! বন্ধুগণ! আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আজকে এই যে আমরা জুটেছি—মানে উপস্থিত হয়েছি, তার কারণ কি? কারণ আছে। কি, না— ভূমিদান যজ্ঞ। অর্থাৎ ভূমি তোমরা পাবে। তোমাদের 'দুঃখ দারিদ্র্যতা'—অতীব ভয়াবহ হয়েছে। সরকার, আমাদের এখন। এই সরকারই আপনাদের দুঃখ কষ্ট মানে 'দারিদ্র্যতা' 'মেনটেন' করতে পারবেন—অর্থাৎ কিনা —সভাপতি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন একদা। ইংরেজি 'মেনটেন' শব্দটার অর্থ তিনি জানতেন, ভজহরি দাসকে অপরের অজ্ঞাতে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন তিনি—। উদ্দেশ্য, তাঁকে থামিয়ে দেওয়া, না হয় আর-ও কতো ভুল শব্দ প্রয়োগ করবেন তিনি। দাস কিন্তু উল্টো বুঝলেন। আরও উৎসাহিত হয়ে এমন অনেক কিছুই বলে গেলেন, যার অর্থ কেউ কেউ বুঝল, অধিকাংশই বুঝল না। 'ভূদানযজ্ঞের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, রামব্রিজ সহায়, সুদূর পাটনা থেকে এসেছেন। রাষ্ট্রভাষায় বক্তৃতা দেবার সময় বেশ একটু হৈ হল্লা হল—

চুপ কর, চুপ কর সব—ঃ ভজহরি দাস হেঁকে ওঠেন—

হঁ বুঝতে লারছি কিছু—অনেকেই গুজ গুজ ফুসফুস করে—।

রামব্রিজ সহায় দৃপ্তকণ্ঠে উদ্দীপ্ত করে তোলেন চেয়ার-বেঞ্চে উপবিষ্ট কয়েকজনকে। ভূদান যজ্ঞে ভূমিদান করবার জন্য আহ্বান জানান তিনি। ভূমিসমস্যা সমাধানের একমাত্র বাস্তব পন্থা এই ভূদান যজ্ঞকে সার্থক করে তোলবার জন্য সকলকেই আহ্বান জানান তিনি।

সর্বশেষে সভাপতির ভাষণ। নরহরি উপাধ্যায়, বিগত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন এই অঞ্চল থেকেই। বহুদিনের পুরাতন কর্মী। জমিদার জোতদার, মাড়োয়ারি মহাজনদের আহ্বান জানান তিনি জমি দান করবার জন্য।

পেছন থেকে একটা গোলমাল শোনা যায় হঠাৎ। কারা যেন জোর গলায় কথা বলছে। সকলের দৃষ্টিই নিবদ্ধ হল ওইদিকে—।

ভজহরি দাস আবার হাঁকলেনঃ চুপ কর ভাই সব। ইবারে জমি দেওয়ার পালা। সভাপতি উদাত্ত আহ্বান জানালেন, শেঠজী ভগবানদাসকে।

ভগবানদাস একটা কাগজে সই করে দিলেন। সভাপতি ঘোষণা করলেন শেঠ ভগবানদাসজী ঝুনঝুনওয়ালা, মিলমালিক ও জমিদার, ভূদান যজ্ঞে একশো বিঘা জমি দান করলেন।

একটা গুঞ্জন শোনা গেল চারদিকে। যেন মৌনমক্ষির ঝাঁক মৌচাকের পাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।

চরণ মহাতোর চোখদুটো আশার আনন্দে জ্বলে উঠে তক্ষুণি স্তিমিত হয়ে গেল। কারণ শেঠজীর ধানের কল এখানে থাকলেও তাঁর জমি-তো এ অঞ্চলে নেই। সে-তো হলুদপুকুর অঞ্চলে—।

জনতা, আশায় আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে যেন। গুঞ্জন-ধ্বনি বেড়েই চলে।

হারাধন মাইতি, মুখটা গম্ভীর করে কাগজে সই করে দিয়ে গেলেন।

সভাপতি যেন কি বললেন তাঁর কানে কানে।

মাইতি একবার মাথা নাড়া দিয়েই, নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। সারা রাজ্যের বিরক্তি তাঁর মুখে চোখে—

সভাপতি ঘোষণা করলেনঃ শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন মাইতি—দান করেছেন পঞ্চাশ বিঘা।

এগিয়ে এলেন ভজহরি দাস। বিগত যুদ্ধের বাজারে খড় আর বাঁশের ব্যবসায় বড়লোক হয়ে গেছেন। বিগত নির্বাচনে যথেষ্ট খেটেছেন তিনি।

কাগজে সই করে দিয়ে, নাদুসনাদুস ভুঁড়িটাকে একটু দুলিয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে যে-দিকে চরণ-মাহাতোর দলটি দাঁড়িয়েছিল, সেই দিকেই এগিয়ে যান। মুখে আত্মপ্রসাদের স্নিগ্ধ হাসি। করুণায় বিগলিত অবস্থা।

সভাপতি ঘোষণা করলেনঃ বিখ্যাত কর্মী, উদারহৃদয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ভজহরি দাস ভূদানযজ্ঞে দেড়শো বিঘা জমি দান করেছেন।

দেড়শো বিঘা জমি? ধন্য দাসজী। সব জমিইতো তাঁর পাহাড়ের গোড়ায়। ওইদিকেই তো তাঁর দেড়শো বিঘা জমি! সোনা ফলে জমিতে—। পাহাড়ের জল এসে তাঁর জমিগুলিতেই জমা হয়। জয়, ভজহরি দাসের জয়ঃ কয়েকজন উৎফুল্ল হয়ে বলে। চরণ মাহাতো, নলিন কামার, টুলা হেমব্রমের বুক টিপটিপ করতে লাগল। সত্যি তাহলে জমি পাওয়া গেল! কলিকালে রাম-রাজ্য! গুঞ্জনধ্বনিটা বেড়ে উঠে কোলাহলে পরিণত হল।

চারদিকে ধন্য ধন্য রব।

ভজহরিদাস তখন একপাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরাচ্ছেন। চরণ মাহাতো এবং আরো কয়েকজন ঘিরে ধরল তাকে—

আমাকে কমপক্ষে পাঁচ বিঘা দিবেন দাস মশায়ঃ চরণ বলে

আমাকেও মনে রাখবেন। বড় কষ্টে পড়েছি—

আমরা-ও পাবো তো?

অনেক কষ্টে লাঠি ধরে, চানা সাঁওতাল প্রায় শেষের দিকে হাজির হয়েছে। ভিড় ঠেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাস মশায়ের কাছে পৌঁছুল।

আমাকে দিবি রে বাপ দু'বিঘা—। কত দিনের সাধ আমার। জমিজায়গা কিছু নাই আমার।

জনতা ভজহরি দাসকেই ঘিরে ফেলতে চায় যেন। গোলমালটা বেড়ে ওঠে ক্রমশ।

একজন যুবক এসে সভাপতির পাশে দাঁড়িয়ে জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলঃ ভাই সব—

সভাপতি, তার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। বললেনঃ আপনি কে?

আজ্ঞে আমিও কর্মী ঃ যুবকটি উত্তর দিল। তারপর জোরগলায় হেঁকে উঠল।

ভাইসব—, আপনারা শুনুন—

জনতা এগিয়ে এল কিছুটা—।

—মোটমাট তিনশো বিঘে জমি আজকে পাওয়া গেল। খুবই ভালো কথা সন্দেহ নেই। সভাপতি বক্তাকে তাঁদের স্বপক্ষেরই ভেবে আর বাধা দিলেন না, ছোকরা মানুষ—, বক্তৃতা দেবার শখ হয়েছে দিক্‌গে—

কিন্তু তিনশো বিঘা জমির জন্য কতজন এসেছেন আপনারা। কমপক্ষে তিন হাজার লোক। হিসাব করে দেখুন ক' কাঠা করে ভাগে পড়বে। চার কাঠা করে, মাত্র চার কাঠা করে।

সভাপতি বিরক্ত হয়ে ভজহরি দাসের খোঁজ করতে লাগলেন।

ভজহরি দাস এগিয়ে এসে জোর করে থামিয়ে দিতে চাইলেন, যুবকটিকে। জনতা গর্জন করে উঠল এবারঃ বলতে দিন, আমরা শুনবো। বল ভাই, বলে যাও। যুবকটি জোর গলায় বলে উঠল— শেঠজীর জমি এ অঞ্চলে নয়, হলুদ-পুকুর অঞ্চলে পাঁচশো বিঘা ডাঙা মাঠ কিনেছেন তিনি। তোমাদের কিছু লাভ নাই তাতে। আর ভজহরি দাস মশায় পাহাড় ধারের দেড়শো বিঘা জমি দান করেননি। দান করেছেন ওই যে দেখা যাচ্ছে—দূরে ফাঁকা মাঠটা—যেখানে বর্ষাকালেও মাটিকাটা যায় না—। যে জায়গাটা উনি মাত্র পঞ্চাশটাকা সেলামী দিয়ে বন্দোবস্ত করিয়েছেন—।

না, আর বলতে দেওয়া যায় না ছোক্‌রাকে। ভজহরি দাস গর্জন করে উঠলেন। যুবকটিকে জোর করে ধরে টেনে আনলেন তাঁরা—।

চরণ মাহাতোর দলটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি কথাটা। তা হলে ওই ডাঙা জমি! যার মাটি কাটলে পাথর বেরোয়! তিনপুরুষ ধরে লাঙল চালালেও যার কঠিন আবরণকে ভেদ করা যাবে না?

একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হল চারদিকে—।

সভাপতি, সভাত্যাগ করে চলে গেলেন—

উ জমি আমরা নাই লিব—। উয়ার সাথে হাল-লাঙগল, দিলেও নাই লিব। পাথরের বুকে কি চোট্ লাগবে কোদালের—?

নাই লিব, নাই লিব, উ জমি—জনতা ক্রোধে যেন ফেটে পড়তে চায়। ভজহরি দাস নিজের ঘরে গিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেনঃ শালাদের ভালো করতে যাওয়াই ঝক্‌মারি। ভূদানযজ্ঞের মাহাত্ম্য বুঝল না—শালারা—ভাঙা মন নিয়ে এক একটি দল এগিয়ে গেল গাঁয়ের পথে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। পাঁচ মাইল পথ হাঁটতে হবে চরণকে। টুসুপরবের সময় একটা গান গাইত বুকমিনি। সেই গানটার দুটো কলি মনে পড়ল তার

মনভুলানো কথা রে মন, মনভুলানো কথা
বাঁঝা মেয়া কি বুঝিবেক গভ্‌ভধারীর বেথ—

রুক্‌মিনি, আর চরণের মা বুড়ি, প্রতীক্ষা করছিল উৎসুক আগ্রহে। নেবু ফুলের গন্ধটা, চাঁদের আলোর সঙ্গে যেন মিশে গেছে।—

চরণ আসতেই প্রশ্ন করে বুড়িঃ ক বিঘা পালি রে বাপ—

চরণ—কথা বলল না।

নাই পালি? বুড়ি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

না, কেউই পায় নাই। নাই লিলম আমরা। উ শালা বারো যুগের পড়া মাঠ লিয়ে কি করব আমরা?

বুড়ির মনটা ভেঙে যায়, বলেঃ অ—

খাওয়া দাওয়ার পরে, দাওয়ায় একটা চাটাই নিয়ে শুয়ে পড়ে চরণ। বেশ লাগছে বাতাসটা। কাল সকালেই ওই কাঁঠখোট্টা জমিতে লাঙল চালাতে হবে।

বুড়ি ঘুমুচ্ছে অঘোরে গোয়ালের ধারে।

রুক্‌মিনি আসতেই তাকে পাশে টেনে নিল চরণ। বললেঃ গা না সেই গানটা সেই টুসু পরবের সময় গাস। সেই যে—, মনভুলানো কথা রে মন, —রুক্‌মিনি, স্বামীর বুকে মাথা রেখে গুন্‌গুন্‌ করে গেয়ে ওঠে—ঝুমুরের সুরে—

মনভুলানো কথারে মন, মন-ভুলানো কথা—

বাঁঝা মেয়া কি বুঝিবেক, গভ্‌ভধারীর বেথা—

গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে চরণ। তার বুকে মাথা রেখে, রুক্‌মিনি-ও। রাতে স্বপ্ন দেখল চরণঃ পাহাড়ের কোল-ঘেঁসা উর্বরা জমির ওপর লাঙল চালাচ্ছে সে।



পরিচয়-এর কুড়িবছর

হিরণকুমার সান্যাল

তেরো

বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার আলোচনা ঃ বিপিনচন্দ্র পাল

এর আগের কিস্তিতে বাস্তবতাবোধ-প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির ও ধূর্জটি মুখুয্যের দুটি প্রবন্ধের একটু তুলনামূলক আলোচনা করেছিলাম। এ হল পরিচয়-যুগের বাস্তবতাবোধ। এর বহুদিন আগে যে একদা একাধিক বাংলা সাময়িক পত্রিকার পাতায় বাস্তবতা সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা হয়ে গিয়েছিল সে-কথা আমার মনে ছিল না। মনে যখন পড়ল তখন যথাসম্ভব অর্থাৎ মাল-মশলার পরিমাণ অনুযায়ী ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া যাক।

বিপিনচন্দ্র পাল জনসাধারণের কাছে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে চরমপন্থী দলের অন্যতম পুরোধা হিসাবে। এই পরিচয়ের স্মৃতিই আজ আমাদের মনে প্রবল হয়ে আছে। সাহিত্যিক বিপিনচন্দ্রের খ্যাতি এত বেশি ব্যাপক হয়নি। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি আজ প্রায় লুপ্ত হলেও বাংলা সাহিত্যের এক একটি রত্ন। এই রকম একটি লুপ্ত রত্ন তাঁর অধুনা দুষ্প্রাপ্য "চরিত-কথা" গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ। এইটি প্রথম প্রকাশিত হয় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর ১৩১৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়।

ঐ প্রবন্ধটিতে বিপিনবাবু বোধহয় বাংলা-সাহিত্যে প্রথম 'বস্তুতন্ত্রতা' কথা ব্যবহার করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা বস্তুতন্ত্রতাহীন। এক্ষেত্রে বিপিনবাবু বস্তুতন্ত্রতার বিচার করেছেন শুধু ধর্মসাধন-প্রসঙ্গে। সুতরাং তাঁর 'বস্তুতন্ত্রতা' ঠিক আধুনিক বস্তুতন্ত্রতা কিনা বিবেচ্য।

কিন্তু ঐ প্রবন্ধেই পরে তিনি সরাসরি অভিযোগ আনেন যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বাস্তবতাবর্জিত। কেননা,

> .."আপনার জমিদারির পল্লিসমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও, ঔদার্য-সাধনের আন্তরিক আগ্রহচেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও, বাংলার পল্লিজীবন ও বাঙালীর সাচ্চা প্রাণটা চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।"

বিপিনবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের ছিল শুধু "মায়িক" সৃষ্টির মোহিনী প্রভাবে মানুষকে মাতিয়ে তোলার ক্ষমতা।

বিপিনবাবুর প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের রত্ন, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক রত্ন নয়। আলোচ্য প্রবন্ধটির কলঙ্ক কোথায় অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৩১৯ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে তা বিশদভাবে আলোচনা করেন তাঁর "রবীন্দ্র-

নাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন" প্রবন্ধে। অজিতবাবু বিপিন-বাবুর অভিযোগের যথোচিত জবাব দিতে পেরেছিলেন কিনা তা আমার আলোচ্য নয়, তাই ঐ প্রবন্ধটির শুধু উল্লেখমাত্র করলাম।

বাস্তবতাবোধ ও বস্তুতন্ত্রতা ঃ সবুজপত্র-যুগ

এব পর সবুজপত্র-যুগে বাস্তবতা-প্রসঙ্গে আর একবার যে-আলোচনা জমে উঠল, রবীন্দ্রনাথ শুধু তার নিষ্ক্রিয় উপলক্ষ্য ছিলেন না, তাতে যোগ দিয়েছিলেন তীব্র উৎসাহে।

সবুজ-পত্রের প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩২১) রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির একেবারে গোড়ায় আছেঃ

> "লোকেরা কিছুই ঠিকমত কবিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সময খারাপ পড়িযাছে, এই সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ কবিযা মানুষ দিব্য আবামে থাকে, এটা প্রাযই দেখিতে পাওয়া যায়।
>
> "অতএব যদি এমন কথা কৈহ বলিত যে আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যেব সৃষ্টি কবিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধাবণেব উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষাব কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব আমিও দেশেব অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিযা বলিতাম কথাটা ঠিক বটে, এবং নিজেকে এই দলের বাইরে ফেলিতাম।
>
> "কিন্তু একেবাবে আমার নাম করিযা কথাগুলি প্রযোগ করিলে অন্যের তাহাতে যতই আমোদ হোক আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথ একালের বাংলা জানতেন না, তাই 'অংশ গ্রহণ করতে পারি না' লেখেননি। যাই হোক, 'বাস্তব' প্রবন্ধটির উপলক্ষ্য ছিল ঐ বছরেরই আষাঢ় সংখ্যার প্রবাসীতে ছাপা ও শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'লোকশিক্ষা ও জননায়ক' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ নিয়ে বিতর্কের শুরু। পুরনো প্রবাসী ঘেঁটে দেখবার সুবিধা হয়নি, প্রয়োজনও নেই, কেননা রাধাকমলবাবু তাঁর বক্তব্য আর একবার আরো পরিষ্কার করে জানালেন ১৩২১ সালের মাঘ মাসের সবুজ-পত্রে 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধে। এটি হল রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধের জবাব।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পের গোড়ার কথা,

> "আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এই জন্য লোকে আমাকে সদাসর্বদা যে বঙে বঞ্জিত কবিয়া থাকে তহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমাব সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয—কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনো-হাবী তো নহেই।"

গল্পটি বেরিয়েছিল ১৩২১ সালের আষাঢ় সংখ্যার সবুজপত্রে অর্থাৎ প্রবাসীর 'লোকশিক্ষা ও জননায়ক' প্রবন্ধের একেবারে সঙ্গে সঙ্গে। রাধাকমল-বাবু ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে যে-রঙে রঞ্জিত করেছিলেন তাতে কালিমার আতিশয্য ঘটেছিল কিনা বলতে পারি না, কিন্তু তাঁর কথাগুলি যে কবির পক্ষে

খুব মনোহারী হয়নি তার প্রমাণ 'বাস্তব' প্রবন্ধ। নতুন তিনি লিখতেন না,

> "যাঁহারা অবাস্তব সাহিত্য সম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস খুলিবার কাজ করিতেছেন।"

এ হল উষ্মার কথা। এ-জাতীয় উষ্ম রবীন্দ্রনাথের রচনায় মাঝে মাঝে পাওয়া যায় ও তাতে তাঁর রচনার রস আরো গাঢ় হয়। আসল কথা হল এই রস—রবীন্দ্রনাথের মতে। কিন্তু

> "যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন—'দাড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিষটার বস্তু-পরিমাণ করা যায় না একথা সত্য কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ত প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।'
>
> "নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়?"

এখনকার দিনের বৈজ্ঞানিক সমালোচক সাহিত্যের যাচাই করতে গিয়ে রসের আধার সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত হন, কিন্তু তাই বলে শুধু নিরেট বস্তুপিণ্ডকে সাহিত্যশিল্পের মানদণ্ড বলে নিশ্চয়ই মেনে নেন না। তখনকার দিনের সমালোচক কি করেছিলেন দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথের জবাবে 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধে রাধাকমলবাবু লিখেছিলেনঃ

> "সাহিত্যের চরম সাধনা হইয়াছে যুগধর্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।
>
> "যুগধর্ম প্রকাশ করিতে যাইলে সাহিত্যকে বাস্তবের সহিত আত্মীয়তা করিতে হইবে, সাহিত্যকে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বড়লোক, দীন, মধ্যবিত্ত, লোকসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে, নিখিলের সংস্রবে না থাকিলে সাহিত্যে বাস্তবতা আসিবে না।..'
>
> "সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই রসসৃষ্টি করে। রস জিনিষটার একটা আধার থাকা চাই, সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্তন হইতেছে; যুগে যুগে বাস্তব বিভিন্ন হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসও বিভিন্ন হইতেছে।"

মনে হয় মোটের ওপর রাধাকমলবাবু তো বেশ ভালো কথাই বলেছেন, তবে রবীন্দ্রনাথ এত উত্তপ্ত হয়েছিলেন কী কারণে?

যতদূর মনে পড়ে, তাঁর প্রথম প্রবন্ধে রাধাকমলবাবু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে দু'চারটি দৃষ্টান্ত বাদে তাঁর রচনায় যথেষ্ট বস্তু পাওয়া যায় না, তাই রবীন্দ্রসাহিত্য ও তখনকার রবীন্দ্রপ্রভাবান্বিত বাংলা-সাহিত্য লোকশিক্ষার উচ্চ আদর্শে পৌঁছতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এই অভিযোগের উত্তরেঃ

> "কিন্তু লোকশিক্ষার কী হইবে? সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে। লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু

সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখিকাঙালের ঘরকর্নার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড় বড় রাজা, বড় বড় বীর এবং বড় বড় বানরের বড় বড় ল্যাজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে "

রাধাকমলবাবু এর উত্তরে লিখলেনঃ

"রবীন্দ্রবাবু আধুনিক ভারতের একজন যুগনির্দেষ্টা, আধুনিক ভারতীয় সমাজের তিনি একজন প্রধান শিক্ষক,—তাঁহার সাহিত্য আমাদিগকে এক নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতেছে—কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে আজ এ কী কথা!"

এর-পর রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিবাদে রাধাকমলবাবু লিখেছিলেনঃ

"আমাদের দেশের লোকসাধারণের ইস্কুল-মাস্টারির ভার লইয়াছে—রামায়ণ মহাভারত।.....রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাবলী অসাধারণ, ইহা কিয়দংশ সত্য, কিন্তু সাধারণ ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া কবি মানুষের এরূপ সাধারণ সুখদুঃখের কথা বলিয়াছেন". ....ইত্যাদি।

তারপর

"সাধারণ লোকে আপনার গরজে এ সাহিত্য পড়ে, একথা বলিলে কবি-প্রতিভাকে খর্ব করা হইবে। কবি সাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিবার জন্য এ সাহিত্যের সৃষ্টি করিযাছেন,—এ ক্ষেত্রে সাধারণের গরজ নহে, কবিরই গরজ।"

এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের অনেক কথাই যে উষ্মার আবেগে লেখা তা আগেই বলেছি, তাই জায়গায় জায়গায় মনে হয় তিনি যেন অনর্থক কলহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। রাধাকমলবাবুর লেখা বিশ্লেষণমূলক কিন্তু এই বিশ্লেষণ যে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক নয় তা আশা করি এখনকার পাঠকদের কাছে স্পষ্ট। কবি সচেতন ও সাক্ষাৎভাবে ও সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইস্কুলমাস্টারির ভার অবশ্যই নেন না, কিন্তু তাঁর প্রতিভা সমসাময়িক সমাজের শিক্ষাদীক্ষা, সুখদুঃখ আত্মসাৎ করে তাঁর রচনায় প্রতিফলিত করে বলেই তা শুধু সমসাময়িক নয়, ভাবী কালের শিক্ষার ও আনন্দের খোরাক হয়। যে-কবির প্রতিভা যত বেশি, সমাজের সঙ্গে যোগ যে-কবির যত নিবিড়, তাঁর বেলায় এই কথা তত বেশি খাটে।

এই হল মোটামুটি এখনকার কালের কথা। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর আগের লেখকের কাছে কী করে এসব কথা প্রত্যাশা করা যায়?

রাধাকমলবাবু তাঁর সমর্থনে জার্মান দার্শনিক রুডল্‌ফ্‌ অয়কেন্‌-এর 'মেন কারেন্টস্‌ অফ্‌ মডার্ন থট্‌'-এই থেকে একাধিক অংশ উদ্ধার করেছিলেন। দুটি উদ্ধৃতি পুনরুদ্ধার করে দিলামঃ

"Was it not characteristic of the great works of art which have made a permanent appeal to man that in them all opposition between form and content was overcome; in their perfection of form

have they not at the same time given full expression to the content of the inner life? Should not art take up the problems of humanity and attempt to solve them after its own fashion?"

যে-সব মহৎ শিল্পসৃষ্টিতে মানুষ নিত্যরসের সন্ধান পেয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য কি এই নয় যে, সেইসব সৃষ্টিতে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের বিরোধ একেবারে দূর হয়েছে, তাদের বহিরঙ্গের চরম উৎকর্ষ ফুটে উঠেছে মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশে? মানব-জীবনের বিচিত্র সমস্যার বিচার ও স্বকীয় অভ্যস্ত রীতিতে এইসব সমস্যার সমাধানই কি আর্টের উদ্দেশ্য নয়?

গোলমাল হয়েছে ঐ inner life নিয়ে। রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন কবির অন্তরের অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদের কথা, বিশেষ জোর দিয়েছিলেন কবির অন্তরের ধ্রুব আদর্শের ওপর। তাই, প্রকৃত বাস্তব কি তার ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছিলেনঃ

"ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মত আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে-লোক ভয় করে, যে-লোক বাঁধা নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে তাহারা, ইংরেজই হউক আর বাঙালীই হউক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হোক জীবন হইতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানবচিত্ত-তত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।"

'ভিতরকার বাস্তব' কথাটি খুব জুতসই নয়, কিন্তু বাদবাকি কথাগুলি এখনকার বাস্তববাদীরা নিশ্চয়ই মূল্যবান মেনে নেবেন।

রাধাকমলবাবুর প্রবন্ধ থেকে অয়কেন্-এর আর একটি লোভনীয় উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারেঃ

"Literature has an obvious task. It should help to clarify our ideas, to bring to clear expression all that is around us and within us, to point out simple lines of development amidst the chaos of appearances with which we are surrounded. It should as far as possible gather life into a whole and at the same time assist in the work of developing it. For this purpose it has need of an inner superiority to raise it above the oppositions of the age, of an energetic synthesis which can reject as well as absorb, of a courageous and powerfully progressive spritual creation."

আমাদের নানা ধারণাকে স্পষ্টতর করা, আমাদের পরিবেশের ও আমাদের অন্তরের সকল বস্তুকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা, প্রত্যক্ষ জগতের বিচিত্র বিভ্রমের মধ্যে সহজ গতিপথ নির্দেশ করা—নিঃসন্দেহে এই হল সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্যের কর্তব্য যথাসম্ভব জীবনকে অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত করা ও জীবনের পরিপূর্ণতর বিকাশে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন সমসাময়িক সকল বিরোধের উপরে উঠবার মতো স্বকীয়

উৎকর্ষ, গ্রহণ ও বর্জন করবার মতো সক্রিয় সমন্বয়ের শক্তি, নব নব উন্মেষশালী অধ্যাত্মসম্পদ সৃষ্টি করার মতো উদ্যোগ ও সৎসাহস।

তখন অয়কেন্ ও বের্গসঁ মননশীল বাঙালীর মনের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সবুজ-পত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী তো কথায় কথায় বের্গসঁর দোহাই পাড়তেন, তাই সুকুমার রায় উপহাস করে 'ক্যাবলের পত্র' বলে একটি রচনায় লিখেছিলেন,

"বের্গসঁ বলেছেন মানুষ আর যাতেই বাঁচুক মাথা কেটে ফেললে আর বাঁচে না।"

ঠিক কথাগুলি মনে নেই। ঐ রচনাটি বেরিয়েছিল সবুজ-পত্র যুগের প্রবাসীতে। পরে শনিবারের চিঠিতে ওটি পুরোপুরি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

সম্পাদক হিসাবে প্রমথ চৌধুরীমশায় এই বিতর্কে যোগ দিলেও বের্গসঁর কথা এই প্রসঙ্গে একবারও বলেননি, শুধু বার্নার্ড শ ও অয়কেন্-এর দু'চারটি কথা তুলে দিয়েছিলেন। সেগুলি এমন কিছু নয়। রাধাকমলবাবুর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সবুজ-পত্রের যে-সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল ঐ সংখ্যাতেই 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' এই প্রবন্ধে প্রমথবাবু নিজের প্রশ্নের জবাবে লিখেছিলেনঃ

> "এ বাক্যটি বাংলা সাহিত্যে পূর্বে ছিল না। সুতরাং এই অপরিচিত আগন্তুক বাক্যটির কুলশীলের সন্ধান নেওয়া আবশ্যক। এ বাক্যটি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নেই, দর্শন শাস্ত্রে আছে।"

এরপর শঙ্কর ঘেঁটে প্রমথবাবু আবিষ্কার করলেন যে দার্শনিক অর্থে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞানই হল যথার্থ বস্তুতন্ত্রতা। তারপর,

> "রাধাকমলবাবু কিন্তু যদৃচ্ছং তল্লিখিত অর্থে ও বাক্য ব্যবহার করেন নি, কেন না যে-কবির হাতে বাংলার মাটি ও বাংলার জল পরিচ্ছিন্ন মূর্তি লাভ করেছে তাঁর কাব্যে যে পূর্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্রতা নেই, একথা কোনও সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। দেশের রূপের সম্বন্ধে যিনি দেশসুদ্ধ লোকের চোখ ফুটিয়েছেন—তাঁর যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান নেই, একথা চোখের মাথা না খেয়ে বলা চলে না।"

অতএব

> "ইওরোপীয় সাহিত্যের রিয়ালিজ্‌ম্‌-ই নাম ভাঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে 'বস্তুতন্ত্রতা' নামে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার বিচার করতে হলে অন্তত দু'কথায় এই রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর পরিচয় দেওয়াটা আবশ্যক।"

অতঃপর ঠিক দু'কথার পরিচয়ঃ

> "আইডিয়ালিজম্-এর মূল কথা হচ্ছে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং রিয়ালিজম্-এর মূল কথা জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা।"

প্রমথবাবু আরো লিখেছিলেনঃ

> "রাধাকমলবাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইওরোপের গত শতাব্দীর মেটেরিয়ালিজম্-এর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বই আর কিছু নয়।"

এই মেটেরিয়ালিজ্‌ম্‌ কী জাতীয় তার ব্যাখ্যা করে প্রমথবাবু লিখেছিলেনঃ

"রাধাকমলবাবু উদ্ভিদ্‌-জগৎ হতে যে উপমা দিয়েছেন, ইওরোপে ঘোর মেটেরিয়ালিজ্‌ম্‌-এর যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে সেতুস্বরূপ ব্যবহৃত হত। মাটি জল আলো ও বাতাস প্রভৃতির যোগাযোগে জীব সৃষ্ট হয়েছে এবং জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তার মনের সৃষ্টি হয়েছে—এই বিশ্বাস-বশতই ইওরোপের একদল বস্তুতান্ত্রিক-দার্শনিক ধর্ম কাব্য আর্ট নীতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপার সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ওরূপ ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থারই বর্ণনা করা হয়েছিল—কাব্য প্রভৃতির বিশেষ-ধর্মের কোনও পরিচয় দেওয়া হয়নি। দার্শনিক ভাষায় বলতে গেলে তাঁরা কাব্যের উপাদান-কারণকে তার নিমিত্ত-কারণ ব'লে ভুল করেন।"

এই অভিযোগ অবশ্য যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও পারিপার্শ্বিক প্রভাববাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রমথবাবু কোনোদিনই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মেনে নেননি, ফলে তাঁর লেখায় নানা উলটো-পালটা কথা পাওয়া যায়। যেমনঃ

"গাছের ফুল আকাশে ফোটে, কিন্তু তার মূল যে মাটিতে আবদ্ধ—সে কথা আমরা সকলেই জানি, সুতরাং কবিতার ফুল ফুটলেই আমরা ধরে নিতে পারি যে মনোজগতে কোথাও-না-কোথাও তার মূল আছে। কিন্তু সে মূল ব্যক্তিবিশেষের মনে নিহিত নয়, সমাজের মনে নিহিত, এই হচ্ছে নূতন মত। এ মত গ্রাহ্য করবার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এই যে, সামাজিক মন ব'লে কোন বস্তু নেই, ও পদার্থ ইংরাজিতে যাকে বলে এ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্‌শ্যন্‌।"

শেষ পর্যন্ত প্রমথবাবু রায় দিয়েছেন এই বলেঃ

"রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর পুতুলনাচ ও আইডিয়ালিজ্‌ম্‌-এর ছায়াবাজি উভয়েই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে সেকারণ যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়।"

খুবই ভালো কথা। কিন্তু এরপরও একটু খোঁচা আছে, তা একেবারেই বীরবলীয়। যথা—

"রিয়ালিজম্‌-এর উচ্চবাচ্য ইওরোপীয় সাহিত্যেই যখন বিরক্তিজনক, তখন বাংলা সাহিত্যে তা একেবারেই অসহ্য। ইওরোপ বিজ্ঞানের বলে বস্তু-জগতের ওপর প্রভুত্ব—অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিক দর্শন আমাদের মনের ওপর প্রভুত্ব করছে।..... ইওরোপ পঞ্চভূতকে তার দাসত্বে নিযুক্ত করেছে—আর আমরা তাদের পঞ্চদেবতা ক'রে তোলবার চেষ্টায় আছি।"

মোট কথা, প্রমথবাবু যুক্তিবাদের তরোয়াল খেলেছেন বীরবলী কায়দায়। এই রকম বেপরোয়া তরোয়াল খেলার বিপদ এই যে, এতে শুধু প্রতিপক্ষের নয়, নিজেরও মাথা কাটা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খেলোয়াড় অতি সাবধানে নিজের ও রবীন্দ্রনাথের মাথা বাঁচিয়েছেন। কিন্তু রাধাকুমুদবাবুর মাথায়ও যে বিশেষ চোট লেগেছে তা মনে হয় না, কেননা তাঁর লেখাটি সুযুক্তিতে ঠাসা। অনুমান হয়, রাধাকুমুদবাবুর বয়স তখন বছর পঁচিশেকের বেশি ছিল না। ঐ বয়সে অতখানি সাফল্যের সঙ্গে ঐরকম জটিল বিতর্কে বাংলা সাহিত্যের একেবারে মহারথীরা বাদে আর ক'জন নেমেছেন জানি না।

পাঠকদের আর একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। একদা রবীন্দ্রনাথের মুখেই আমরা শুনেছিলাম যে 'সহিত' থেকে 'সাহিত্য' কথাটির উৎপত্তি, অর্থাৎ সাহিত্যের ভিত্তি সমাজ। কিন্তু স্থূল হস্তের খোঁচা খেয়ে অনেক সময়ে সাহিত্যকলা সম্বন্ধে তিনি অনেক এলোমেলো কথাও বলেছেন ও যখন তখন সাহিত্যকলা-প্রসঙ্গে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন ভাববাদীর রসবিলাসে। কিন্তু সবুজপত্রের 'বাস্তব' প্রবন্ধে তাঁর সবচাইতে মূল্যবান কথা এই যে, "যেখান হইতে যেমন করিয়াই হোক, জীবন হইতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানব-চিত্ত-তত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।" রোমান্টিক হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রচনা এই জাতীয় সংক্রামক মানবতায় মহীয়ান। [ক্রমশ]



স্তালিন: স্মৃতিচিত্র

জাঁ-রিশার পথ

(মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ)

— পূর্বানুবৃত্তি —

সপ্তম ও অষ্টম বার সাক্ষাতের কথা।

তিন বছর পেরিয়ে যেতে হবে এক লাফে। জয়লাভ হয়েছে স্তালিনগ্রাদে, আর তারই পাশাপাশি জয়—উত্তরে ভরোনেজে, দক্ষিণে ককেশাস্ অঞ্চলে। একটার পর একটা ক্ষমাহীন অবিশ্রান্ত আঘাতে উক্রাইন ও নীপার থেকে বিতাড়িত হয়ে শত্রুপক্ষ একেবারে সম্পূর্ণ পরাজয়ের মুখে। তারা বিতাড়িত হয়েছে বিয়েলোরুশিয়া থেকে, বিতাড়িত আফ্রিকা থেকে। অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও মিত্রসৈন্য ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করেছে। মুক্তি পেয়েছে পারী। রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন নিয়েও ফ্রান্স তার অবশিষ্ট শক্তিতে উত্থিত হয়েছে। শুধু সমুদ্রকূলের দুই একটি ছোটখাটো অঞ্চল ছাড়া আমাদের দেশ শত্রুর কবল থেকে একেবারে মুক্ত। আর, পুনরুজ্জীবিত ফ্রান্সের প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি, পররাষ্ট্রের সঙ্গে এদেশের প্রথম যুদ্ধোত্তর সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য মসিয়ে বিদোকে সঙ্গে করে মস্কোয় এসে পৌঁছলেন জেনারেল দ্য গল্।

ফরাসী প্রতিনিধিদলকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য যে ছোটখাটো মধ্যাহ্ন-ভোজের আয়োজন করা হয় পৌঁছনোর পরের দিনই, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। আট দিন বাদে সন্ধি উপলক্ষ্যে ও অতিথিদের বিদায়ের আগে ক্রেমলিনের এক প্রকাণ্ড হলে স্তালিন সরকারী ভোজসভায় নিমন্ত্রণ জানালেন। (৮০ জনের মতো ব্যবস্থা, সোবিয়েত সরকারের গণসচিব ও লালফৌজের মার্শালরা সকলেই প্রায় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে।)

সরকারী কর্মচারীদের ছাড়া বাকি যে অল্প ক'জনকে নিমন্ত্রণ করা হয়, আমি তাদের অন্যতম; এমন কি মনে হয়, ফরাসী, সোবিয়েত ও মিত্রপক্ষীয় সব ধরে'ই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র বে-সরকারী লোক। বলতে বাধা নেই, আগের সপ্তাহের সেই ভোজের মতো এবারেও আহার্যের প্রকাণ্ড তালিকাটিতেই আমার মন ছিল সবচেয়ে বেশি। সাঁ-সিম নিজেই যেমন বলেছেন, চোখের খিদে মেটাবার মতো যথেষ্টই ছিল সে-তালিকায়, আর সেদিক থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কোনও চেষ্টাই আমি করিনি। স্তালিন তাঁর প্রধান অতিথিকে সঙ্গে করে যেখানটিতে বসেন, কপালগুণে (শুধু কপাল?) তারই ঠিক মুখোমুখি টেবিলের উল্টো দিকে আমার আসন পড়ত প্রত্যেক ভোজে। সেই অতি সুস্বাদু ভোজের দু-এক গ্রাস খাওয়া হয়তো আমার কম হয়ে থাকবে, কিন্তু আমার মুখোমুখি আসীন যাঁরা তাঁদের আকার-ইঙ্গিত, চালচলন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কথাবার্তা কিছুই আমাকে এড়াতে পারেনি।

আগের রবিবারের ভোজসভায় সোবিয়েত সরকারের নেতা ও অস্থায়ী ফরাসী সরকারের নেতা উভয়েরই ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট কুণ্ঠা, হৃদ্যতার যথেষ্ট

অভাব ছিল; কিন্তু আজ এই সন্ধ্যার নিমন্ত্রণে দেখলাম স্তালিন খুব খোশ-মেজাজে আছেন। স্বাস্থ্যপান উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র-সচিব মলোতভের সরকারী বিবৃতির আনুষ্ঠানিক প্রতিভাষণ দিলেন বিদেশী অতিথিরা; তার পরেই স্তালিন স্বয়ং উঠে স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করলেন। সেই শুরু হল সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে বলা তাঁর চমকপ্রদ বক্তৃতা একটার পর একটা। সোবিয়েত সরকারের প্রত্যেকটি প্রধান শাসনবিভাগ, লালফৌজের প্রত্যেক সামরিক অঙ্গের উল্লেখ করলেন তিনি একে একে। বিভাগীয় ও সামরিক নেতারা সকলেই সেই টেবিলে উপস্থিত। নাম করে তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যপানের সময় রসিকতা করে খুব মেজাজীভাবে তিনি তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলেন বক্তৃতায়, আর সমবেত সেই সব মার্শাল ও জেনারেলদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

দু'-একটা মজার চুটকি ঘটনার কথা বাদ দিয়ে যাই। স্তালিন একবার (সেই পঁয়ত্রিশে কি পঁয়তাল্লিশ বার না বিশ বার হল?) স্বাস্থ্যপান প্রস্তাব করেন সেই কথাই তাড়াতাড়ি বলে ফেলি। তাঁর যেন আর ক্লান্তি নেই। উঠে বললেনঃ "মলোতভ আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমি আর একবার স্বাস্থ্যপান করতে চাই।" তারই পরে শুনলাম তিনি বলছেনঃ

> "ফ্রান্সের যা আমরা সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি, তার মধ্যে আছে তার ফাশিস্ত-বিরোধী যোদ্ধৃবৃন্দ, রণক্ষেত্রে তার সৈন্যবাহিনী, সমশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাঁদের শোণিত মিশেছে আমাদের শোণিতে, সাহসে শৌর্যে ও বিনয়গুণে যাঁরা আমাদের যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। এরই প্রতিনিধি যে-মানুষটি, ফরাসী জঙ্গী বাহিনী নর্মান্দি-নিয়েমেনের সেই সেনাপতির স্বাস্থ্যপান করি!"

তারপর দেখি এক আশ্চর্য ব্যাপার। স্তালিন আসন ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড হলের প্রায় আধাআধি এগিয়ে গেলেন লেফ্‌টন্যান্ট-কর্নেল পুইয়াদের সঙ্গে দেখা করতে। স্বাস্থ্যপানের সময় অন্য সকলের সঙ্গে যেমন গেলাস ঠুকতে হয়, এবার আর তেমনটি না করে মার্শাল দেখলাম নিজের ডান হাতে সেই ফরাসী লেফ্‌টন্যান্ট-কর্নেলের হাতখানি জড়িয়ে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে একত্র পান করার যে প্রথা সেই ভঙ্গিতে স্বাস্থ্যপান করলেন।

পাশে যাঁরা বসে ছিলেন, খুবই উত্তেজিত হয়ে তাঁরা তক্ষুনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন, এ হচ্ছে জর্জীয় প্রথা। যারা এরকমভাবে পরস্পরের বাহু-লগ্ন হয়ে মদ্যপান করে, জর্জীয় প্রথা অনুযায়ী তারা একই রক্তঋণে আমৃত্যু ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধা।

সমবেত সকলের মধ্যে যথেষ্ট আবেগ ও বিস্ময় দেখা গেল। স্তালিনের অন্য সব কাজ ও আচরণের মতো এ ব্যাপারটা নিয়েও লোকে অনেক চিন্তা করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ঘটনায় চিন্তার খোরাক অফুরন্ত।

ফরাসী যোদ্ধাদের সঙ্গে, হাতিয়ার-হাতে লড়াই করে যে-সৈনিকরা তাদের সঙ্গে, ভাল্‌মী ও ভর্দ্যার উত্তরাধিকারী, বির-হাকিমের বাহিনী ও মাকিদের সহযোগী যে সাধারণ পদাতিক ও সামান্য সিপাই তাদের সকলের সঙ্গে স্তালিন তাঁর আত্মীয়তা-বোধ ব্যক্ত করলেন এইভাবে।

সেই সন্ধ্যায়ই আরও একটু পরে এই কথা আরও স্পষ্ট বোঝা গেল। এমন একটা ঘটনা ঘটল যা খুব সাধারণ ব্যাপার বলা যায় না, আর লোকে সেকথা জানেও না খুব বেশি। চারজন ফরাসী ব্যক্তি শুধু এর সাক্ষী। এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি আমি কখনও ভুলতে পারব না।

রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ আমরা স্তালিনের নিজের ছোট সিনেমা হলটিতে গেলাম। ক্রেমলিনের মধ্যে তিনি এটি তৈরি করিয়েছেন। অবসর সময়ে এইখানে তিনি তাঁর পছন্দসই সোবিয়েত ও বিদেশী ফিল্মগুলি প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করেন। মনে হল হলটিতে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন লোক ধরে। আরাম কেদারাগুলির মাঝে মাঝে বসানো টেবিলে সাজানো ফুলদানি, ফলের ডালা, পিরিচ, গেলাস।

কয়েকটি টুকিটাকি ব্যাপার ঘটল যার স্থান শুধু কূটনীতির ইতিহাসে; সে বিষয়ে আমি কিছু বলছি না। তারপর জেনারেল দ্যগল্, মসিয়ে বিদো ও তাঁদের সঙ্গীরা কেউ ঘুমোতে গেলেন, কেউ বা গেলেন ফিরে কাজ শুরু করতে, কারণ ততক্ষণে সন্ধিচুক্তি কোন্ অতলে ডুবে গেছে, তাকে আবার টেনে তোলা দরকার। আমরা তখন বসে সোবিয়েত মার্শাল ও গণসচিবদের সঙ্গে তাঁদের আর তখন অন্য কোথাও যাবার তাড়া নেই। আর ফরাসীদের মধ্যে তখনও সেখানে উপস্থিত শুধু এই ক'জনঃ মিলিটারী মিশনের অধ্যক্ষ জেনারেল পেতি, নর্মান্দি-নিয়েমেন রেজিমেন্টের সেনাপতি লেফ্‌টন্যান্ট-কর্নেল পুইয়াদ, জেনারেল দ্যগলের সামরিক কেন্দ্রের জনৈক কর্মচারী, মস্কোতে ফরাসী দূতাবাসের সংবাদবিভাগের কর্তা, আর আমি।

স্তালিন শ্যাম্পেন আনিয়েছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে আমরা পাঁচজন ফরাসী। হাসতে হাসতে তিনি লেফ্‌টন্যান্ট-কর্নেল পুইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেনঃ

—"আমাদের জঙ্গী বিমান ইয়াক-৩ নিয়ে খুশি তো আপনারা?"

—"চমৎকার, মসিয়ে মার্শাল। আমরা তো খুব খুশি আপনাদের এই বিমান-বহরের কাজ দেখে। একেবারে সেরা জিনিস, যেমন জোরে চলে, তেমনি চালানো সহজ, লড়বার মতো হাতিয়ারও যথেষ্ট.."

—"বেশ ভালো মেশিন। মনে হয় আরও ভালো জিনিস বানাতে পারব আমরা। ইয়াকভ্‌লেভকে জিজ্ঞেস করুন। ঐ তো সে দাঁড়িয়ে কথা শুনছে এখানে।"

(মার্শাল ইয়াকভ্‌লেভ হচ্ছেন সোবিয়েত ইউনিয়নের সর্বপ্রধান বিমান-নির্মাতা। তাঁরই নামে ঐ বিমানের নাম রাখা হয়েছে। সোবিয়েত মার্শাল ও জেনারেলদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি কথাবার্তা শুনছিলেন।)

স্তালিন বললেনঃ "ইয়াক-৯ বিমান চেনেন? আচ্ছা, আমাদের বিমান-বহর যদি ইয়াক-৯ দিয়ে সাজাই তো কী বলেন?"

পুইয়াদ বললেনঃ "না না, ওসব কিছু করবেন না মসিয়ে মার্শাল। ইয়াক-৯ ভালো বিমান, বলা যায় খুবই ভালো বিমান। কিন্তু বিনা দ্বিধায় নিজের কথা বলতে পারি, ইয়াক-৩ আমি পছন্দ করি বেশি।"

স্তালিনঃ "আচ্ছা শুনুন, ইয়াক-৯ সম্পর্কে আমার ধারণা এই। খুব

ভারী জার্মান ট্যাঙ্ক-বাহিনীর সঙ্গে লড়াইতেও আমরা আমাদের পদাতিকদের অপরাজেয় করে তুলেছিলাম কি করে, জানেন? আমরা তাদের জুড়ে দিয়েছিলাম খুব জবরদস্ত গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে; এই পদ্ধতির ব্যবহার আগে আর কখনও হয়নি। এই আক্রমণের মুখে শত্রুরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে, অসাড় হয়ে পড়ে। বিমানযুদ্ধেও গোলাগুলির অনুরূপ প্রয়োগের কথা ভেবে দেখুন না একবার? ধরুন, ইয়াক-৯ বিমানে আমি যদি ২০ বা ৪০ সাইজের কামান বসাইঃ কী ভীষণ তেজ গোলার! দূর থেকেই শত্রুকে ঘায়েল করে দেওয়া যায়, কোনও ঝক্কি নেই, শত্রুপক্ষের একখানা বিমানও রেহাই পাবে না।"

—"না, না, মসিয়ে মার্শাল। আমি মোটেই একমত নই আপনার সঙ্গে।"

—"কেন নয়?" স্তালিন জিজ্ঞেস করলেন। প্রতিবাদে তিনি এতটুকু বিরক্ত হন্‌নি। ফরাসী দেশের এতটুকু একটি মানুষ তাঁর কোন ভয় নেই, সহজ তাঁর আচরণ। দরদভরা চোঁখে স্তালিন তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

লেফ্‌টন্যান্ট-কর্নেল পুইয়াদ বললেনঃ

—"আমার বিচারে বিমানের উৎকর্ষ তার গতিকৌশলে, অস্ত্রসজ্জায় নয়। তত্ত্বের দিক থেকে একথা খুবই ঠিক যে আপনার ঐ গোলাবর্ষণের ফল শত্রুর উপর খুবই সাংঘাতিক হতে পারে। কিন্তু আমি পাইলট থাকব বিমানের মধ্যে; শত্রুর বিমান একবার যদি পিছন দিক থেকে এসে আমাকে ধরে ফেলতে পারে, তাহলে আর আপনার ঐ কামানবন্দুক আমার কী কাজে লাগবে? দুই পাইলটের কে আগে এসে অপরের ল্যাজে ঠোক্কর দিতে পারে এই হল সমস্যা। যে আগে পৌঁছবে সেই পারবে প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে। আর বিমান দু'খানির মধ্যে যেখানা ভারী কম, যার গতি বেশি দ্রুত সেই পারবে আগে পৌঁছতে। তাছাড়া, মসিয়ে মার্শাল, আপনার ঐ যে দুই কামানের কথা বলছেন..."

স্তালিন হেসে খুব বন্ধুভাবে বললেনঃ

—"মলোদিয়েৎজ্‌ ফ্রান্‌ৎসুজ! (সাবাস ফরাসী তুমি!) শক্ত লোক বটে, ভারী একগুঁয়ে। এমনি লোক আমি চাই। এমনি দুনিয়া আমাদের যে শক্ত না হলে চলে না। নরম হলেই সর্বনাশ, একদম পিষে মেরে ফেলবে।"

যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের হাতে-হাতে শ্যাম্পেনের গেলাস বিলি করে বললেনঃ "আসুন!"

তারপর আবারঃ

—"আমাদের শ্যাম্পেন তেমন খারাপ নয়, নয় কি? তবে আপনাদের দেশে যেমন তার মতো নয়। ওরকমটি আর পাওয়া যায় না। বেশ কয়েক বছর হল আমি ফ্রান্স থেকে একজন কারিগর আনিয়েছি; ফলে, একটু ভালো হয়েছে জিনিসটা, কিন্তু এখনও যথেষ্ট নয়।

"লড়াইয়ের আগে আমরা তৈরি করতুম এক কোটি বিশ লাখ বোতল শ্যাম্পেন। এখন মাত্র সত্তর লাখ। আর, ফ্রান্সে আপনারা বানাতেন প্রায় তিন কোটি বোতল। দশ কোটি বোতল শ্যাম্পেন কামনা করে ফ্রান্সের স্বাস্থ্যপান করি আমি।" বলে তিনি পুইয়াদের সঙ্গে গ্লাস ঠুকলেন।

—"আপনার ভবিষ্যদ্বাণী মানতে আমি খুবই রাজি, মসিয়ে মার্শাল। তবে শুধু এক শর্তে ঃ এর সবটা যেন আমাদের ফরাসীদেরই খেতে না হয়। কারণ, তাহলে আমাদের দিয়ে আর কিছু হবার আশা নেই।"

—"সত্যি,—কাজ অনেক! আচ্ছা, বলুন তো, আপনাদের ক'ডিভিশন ফৌজ আছে সবশুদ্ধ? অর্থাৎ, হাতিয়ার নিয়ে লড়াইতে নামবার মতো ক'ডিভিশন?"

পুইয়াদ বললেন ঃ "বেশ ভালো অবস্থায়, লড়াইয়ে নামবার মতো ফৌজ পাঁচ ডিভিশনের বেশি নেই।"

—"সে কি? ফ্রান্স এত বড়ো দেশ, হাতিয়ার নিয়ে তৈরি ফৌজ তার শুধু পাঁচ ডিভিশন! ফরাসী সেনাবাহিনীর শক্তি হোক ষাট ডিভিশন, এই কামনা করে আমি স্বাস্থ্যপান করি!"

অতি সামান্য ব্যাপার একটা। লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল পুইয়াদ ধূমপায়ী। কথা বলার সময় নিজেরই সিগারেটের একটুখানি ছাই অলক্ষ্যে তাঁর সামরিক পোশাকে পড়ে যায়। স্তালিন ছিলেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। দেখতে পেয়ে সস্নেহে হেসে তিনি সন্তর্পণে ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, আর বলতে গিয়ে চোখমুখ যেন গাম্ভীর্যে ভরে উঠল ঃ

—"ফরাসী ও সোবিয়েত যোদ্ধাদের মধ্যে পরস্পর ভুল বোঝার কোন সম্ভাবনা নেই। যত গোল বাধায় কূটনীতি-বিশারদরা, তারা কোন কাজের নয়। আমাদের উচিত ওদের সব দাবিয়ে রাখা। ঐ দেখুন আবার কে এলো ঃ মলোতভ বুঝি। লোকটা ওদেরই মধ্যে মন্দের ভালো, ওঁকে না হয় সাবাড় করা যাবে সবশেষে!"

কার্যত, মলোতভ প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্তালিনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে খবর দিয়ে যাচ্ছিলেন কী করে দুই পক্ষের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা আলাপ-আলোচনার সাহায্যে মতামতের পার্থক্য কমাবার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতক্ষণে চুক্তি ঠিক হয়েছে, তাই মলোতভ এসেছেন স্তালিনকে নিয়ে যেতে। সন্ধির সর্বশেষ কয়েকটি বিষয় একটু দেখে দিয়ে তাতে সই করতে হবে তাঁকে। স্তালিন তাই আমাদের ওখান থেকে বিদায় নিলেন। যাবার সময় খুব মজা করে বললেন ঃ

—"যাই এখন বাঘের মুখে মাথা পেতে দিই।"

তখন ভোর সাড়ে চারটা। ঘণ্টা তিনেক ধরে আড্ডা দিয়েছি আমরা।

সেদিন স্তালিনের মধ্যে যে কতখানি সুরসিকতা, স্ফূর্তি, বন্ধুত্ব ও খোশ-মেজাজী ভাব দেখেছি তা আর বলে বোঝাতে পারব না।

কতবার যে তিনি নিজের হাতে ক্রমাগত আমাদের শ্যাম্পেনের পাত্র ভরে দিয়েছেন। আলাপের কত খুঁটিনাটি তত্ত্ব মিশে গিয়েছে কত রসিকতায়, বেচারী রুশ দোভাষী তার ঠেলায় যেই যেই হারিয়ে ফেলেছে অমনি অতি বাছা বাছা বুলিতে তাকে বিদ্ধ করেছেন স্তালিন। দেখে মনে পড়ছিল জেনারেল পেতির কাছে শোনা গল্প আগের বছর যখন মার্শাল স্তালিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন সেই কথা।

সাক্ষাতের পর জেনারেল পেতি অনুমতি চেয়েছিলেন রণক্ষেত্রের সেই সব এলাকা দেখার যেখানে সবচেয়ে আধুনিক ও সবচেয়ে গোপন সামরিক অস্ত্রের প্রয়োগ করা হচ্ছে। উত্তরে স্তালিন বলেনঃ

—"ফরাসীদের কাছে আমাদের গোপন করবার কিছু নেই। আপনার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।"

জেনারেল পেতি হয়তো পছন্দ করবেন না যে স্তালিন সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে-ভাষায় তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তা আমি উদ্ধৃত করি। আরো অনেক কিছুর মধ্যে একবার খুব আশ্চর্য হয়েই তিনি বললেনঃ

"অবাক হয়ে যেতে হয় দেখলে যে এতখানি যাঁর বুদ্ধি, চিন্তায় এত স্পষ্টতা, তথ্যের উপর এত দখল, এত তীক্ষ্ণধী যে-মানুষটা সে কী করে এত সরল হতে পারে, ফরাসীরা যাকে বলে এত 'ভালোমানুষ'।"

তবে, এই ভালোমানুষী, খোশমেজাজী ব্যক্তিটিই আবার দরকার হলে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক আলোচনায় খুবই কঠিন, এমনকি মাঝে মাঝে একটু কর্কশও হতে পারেন। শোনা যায় মসিয়ে চার্চিল ও আরও কয়েকজনের মনে এই আলাপচারী ব্যক্তিটির স্মৃতি বেশ খানিকটা অপ্রিয় হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দুই দিকের মধ্যে অসামঞ্জস্য কিছু নেইঃ দৃঢ়তাই তাঁর সদাশয়তার ভিত্তি; নম্রতারই অপর দিক তাঁর অনমনীয়তা সেই সব বিষয়ে যেখানে তিনি বোঝেন কিছুতেই আপোস করা চলে না।

সোবিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, বিশেষ করে স্তালিনের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্কের কথা হচ্ছে। মন্দ হয় না যদি এই প্রসঙ্গে এমন কতকগুলি তথ্যের অবতারণা করি যা এখনও লোকে সবটা ভুলে যায়নি। এ-বিষয়ে বিশদভাবে জানা যায় সোবিয়েত সরকারের এক প্রধান শত্রু, দেশত্যাগী রুশ রাজনৈতিক কর্মী মিলিউকভের রচনা থেকে। মিলিউকভ ছিলেন ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সরকারের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব। "রুশদেশের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মিলিউকভ লিখেছেন যে বিপ্লবের আগে জার-সরকার ফরাসী ব্যাঙ্কগুলি থেকে যে ধার করেছিল, স্তালিন ১৯২৬ সালে তা শোধ দেবার প্রস্তাব করেন। অথচ, ধার নেবার সময় থেকে জার-শাসনের বিরোধীরা সকলে, এমন কি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে নরমপন্থীরাও বলেছেন যে এই ঋণ স্বীকার করা হবে না কিছুতেই।

যাই হোক, ১৯২৬ সালে স্তালিন ফ্রান্সকে ১৮৬০ কোটি পোয়াঁকারে ফ্রাঁ দেবার প্রস্তাব করেন। তাছাড়া, ফ্রান্সকে তিনি সবচেয়ে "সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি" হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও রাজী হন। এই সুবিধা পেলে তখনকার সেই মন্দার সময় আমাদের শিল্পের একটা প্রকাণ্ড বাজার মিলত, এবং সম্ভব হত পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির ঠিক পূর্বাহ্নে সোবিয়েত ইউনিয়নে মার্কিন, ব্রিটিশ ও জার্মান শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা।

বিনিময়ে স্তালিন কি চেয়েছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন ছ' বছরের মধ্যে ১২ কোটি ডলার পর্যন্ত ধার, যা হত তখনকার তিনশো কোটি পোঁয়াকারে ফ্রাঁর সমান।

পোঁয়াকারে সরকার সেই প্রস্তাব শুষ্কভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই-সব বলশেভিক, আর তাদের তথাকথিত সমাজতন্ত্র গঠনে আস্থা কি? আর, কে এক স্তালিন—তার কথারই বা কি দাম?

মনে রাখা উচিত, ফরাসী সরকার যখন একদিকে উত্তমর্ণ হিসাবে ধ্বজা উড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আরেক দিকে ঠিক তখনই আমেরিকার কাছে তার নিজের ঋণ সে বেমালুম অস্বীকার করে।

একথাও আমি ফরাসীদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে সারা সোবিয়েত ইউনিয়নে একটিমাত্র বিদেশী পতাকা উড্ডীন আছে। এবং উড্ডীন আছে এমনই এক জায়গায় যাকে কোটি কোটি সোবিয়েত দেশবাসী তাদের জাতীয় বিবেকের পীঠস্থান বলে মনে করে। **লেনিনের মাথার ঠিক পিছনে,** রেড স্কোয়ারের সমাধিসৌধের অভ্যন্তরে দেখতে পাবেন পারী কমিউনের পতাকা।

মস্কোর বলশয় থিয়েটারে মঞ্চের পর্দায় সোবিয়েত বিপ্লব ও পারী কমিউনের প্রধান প্রধান ঘটনার তারিখগুলি সব একই সঙ্গে মুদ্রিত আছে, একথা সোবিয়েত দেশে ফরাসী বা বিদেশী যেকোনও পর্যটকই লক্ষ্য করে থাকবেন।

.....

মনে করিয়ে দেবার দরকার কি যে সোবিয়েত নৌবাহিনীর দুটি প্রকাণ্ড যুদ্ধজাহাজের নাম রাখা হয়েছে "মারা" ও "কম্যুন দ্য পারী"? [ক্রমশ]

অনুবাদ ঃ **রণজিৎ গুহ**



পুস্তক পরিচয়

পূর্ণতার পথ

HARVEST: Galina Nikolayeva. Rs. 2-4-0.
কারেন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, ৩।২ ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

এই উপন্যাসখানি ১৯৫০ সালে বিখ্যাত স্তালিন প্রাইজ লাভ করার গৌরব অর্জন করেছিল। সোবিয়েত রাশিয়ার প্রাণধারার কাহিনী. নাবীব সৃজনশীল সহানুভূতিময় দৃষ্টি দিযে দর্শন কবা। সাধারণ মানুষের কঠোব পরিশ্রম দিয়ে মাটিতে যে সোনালী ফস্ল ফলায়, কেবলমাত্র সে ফসলের কাহিনী নয। তাব সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ জীবনেও চেষ্টা কবলে যে ফসল ফলানো যায় তারই গল্প। কাহিনীতে বর্ণিত আছে সমবায় কৃষিকেন্দ্রগুলিব কর্মপদ্ধতি ও পবিবেশেব কথা। সেখানে যারা কাজ করে সেই সকল নরনারীর দৈনন্দিন কর্মজীবনেব ধারা এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত ঘরোযা জীবনেব সুখদুঃখ, আশানৈরাশ্যের ওঠাপড়া, আব সবচেয়ে বড় কথা একটা বলিষ্ঠ গঠনশীল আদর্শবাদ, জগতের ও প্রত্যেকটি মানুষের ভালো দিকটার উপর যাব দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আবার ভুলচুক সংশোধন করে দেবার ও অপরাধেব দণ্ড দেবাব সুবুদ্ধি, সাহস ও শক্তি আছে। এমনধারা আদর্শবাদ হাওয়ায় ভেসে না বেড়িয়ে মাটিকে অবলম্বন কবে প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

যুদ্ধে নিদারুণভাবে আহত হয়ে ভাসিলি বট্‌নিকফ্‌ দুটি বছর হাসপাতালে পড়ে রইল, দিবারাত্র সর্বাঙ্গে নিদারুণ যন্ত্রণা, একেবারে শিশুর মতো পবমুখাপেক্ষী হয়ে। ডাক্তারবা একরকম জবাব দিয়ে গেলেন। দেশের বাড়িতে যুবতী স্ত্রী ও দুটি কন্যা আছে, কাছে বুড়ো বাপ-মা, ভাইবাও আছেন। তাঁদের কাছে ভুল সংবাদ গেল যে ভাসিলি মরে গেছে। সেকথা জেনেশুনেও ভাসিলি প্রতিবাদ করল না, কারণ এমন পঙ্গু জীবনের দুঃখ স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে বরং মবাই ভালো।

দুতিন বছর পরে, ১৯৪৬ সালে, একটা সংকটপূর্ণ অস্ত্রোপচারের ফলে ভাসিলি সম্পূর্ণ ভালো হযে গেল। খবব না দিয়ে, বুকভবা আশা নিয়ে ভাসিলি বাড়ি গিয়ে দেখে ইতিমধ্যে তার মৃত্যুর জন্য কিছুদিন শোক করে তার স্ত্রী আভ্‌দোতিয়া দুর্বলদেহ কিন্তু উদারচিত্ত স্তেপানকে 'বিবাহ' করেছে। এব মধ্যে ভাসিলি উপস্থিত হল। নিদাবুণ আঘাতে স্তম্ভিত হলেও ভাসিলি ভুলে গেল না সে পার্টি-মেম্বার। ধীরভাবে জিনিসপত্র কিছু ভাগাভাগি করে নিযে স্তেপানকে সে বিদায় দিল। তারপর নিজের ভাঙা পারিবারিক জীবনকে জোড়া লাগাতে বসল। সে ভীষণ কঠিন কাজ।

পার্টি তাকে পাঠিয়েছে নিজের গাঁযে "১লা মে" নামক সমবায় কৃষি-কেন্দ্রের ভাব দিয়ে। কাবণ, বহুবছরব্যাপী অনুপস্থিতি, অলসতা ও উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে ঐ কেন্দ্রটি অবনতির সবচেয়ে নিচের ধাপে নেমে গেছে। যথেষ্ট ফসল হয় না, ভালো ফসল হয় না। রোগা ও বুগন গোরুগুলো ভালো দুধ দেয় না, ভেড়াগুলোও তথৈবচ। একটা ইলেক্‌ট্রিক স্টেশন আছে বটে, সে-ও নামে মাত্র, গোটাকয়েক আলো জ্বলে, কিন্তু কেন্দ্রের কাজ সবই

হাতের জোরে চালানো হয়। ইলেক্‌ট্রিশিয়ান নববিবাহিতা পত্নীকে নিয়েই মশগুল। আধুনিক যন্ত্রপাতি কিছুই নেই, সেকেলে জিনিস দিয়ে, অনুপযুক্ত লোক দিয়ে কোনোওমতে কেন্দ্রটি টিকে আছে। আগে এর রুত সুনাম ছিল! তখনকার কর্মীরা অনেকেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে বা পঙ্গু হয়েছে, আর তরুণ যারা বড় হয়েছে তাদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকুও নেই। এই কেন্দ্রকে তার পুরোনো সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ভাসিলিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সে-অঞ্চলে মাত্র আর একজন পার্টি-মেম্বার আছে, আর সেই বিভাগের (রিজিঅন) পার্টি-সেক্রেটারি নিজের পারিবারিক সুখ ভুলে গিয়ে নিজের স্ত্রী ভালেন্‌তিনাকেও সাহায্য করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেমন করে ধীরে ধীরে অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায়, আত্মসংযম, পরিশ্রম আর স্বার্থত্যাগ দিয়ে এই তিনটি মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করল, উপন্যাসটি তারই গল্প।

অস্বাভাবিক কিছু নেই, সোবিয়েত রাশিয়ার সাধারণ কর্মী ও কৃষিজীবীদের সুখদুঃখ দুনিয়ার আর সকলের চেয়ে ভিন্ন নয়। তারাও স্ত্রীপুত্রকে ভালোবাসে, পিতৃশোকে কাঁদে, ঈর্ষার বশবর্তী হয়, লোভে পড়ে অন্যায় করে, তাদের মধ্যেও এক-আধজনা উচ্ছৃংখল চরিত্র থাকে, বিশ্বাসঘাতক দুর্বল মানুষ থাকে। পৃথিবীর আর সব দেশের মতো বৃষ্টি না পড়লে তাদেরও ফসল শুকিয়ে যায়, বেশি বৃষ্টি পড়লে তাদেরও ফসল ভেসে যায়। সময়মতো চিকিৎসা না হলে তাদেরও যুবকরা মরে যায়, উপযুক্ত কাজ না করলে তাদেরও চাকরি যায়। সাধারণ মানুষ তারাও, প্রভেদ শুধু এই যে, তাদের চোখের সামনে একটা সক্রিয় আদর্শবাদ তুলে ধরা আছে। তারা বিশ্বাস করে সাধারণ কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত সুখকে ত্যাগ করতে হয়, নিজের ও পরস্পরের দোষত্রুটির কঠিন সমালোচনা করতে হয়, যার মধ্যে যা ভালো আছে সেটাকে কাজে নিযোজিত করতে হয়।

গল্পটি আগাগোড়া বেঁচে থাকার আনন্দে ভরপুর. যদিও কোথাও কৌতুকরসের নামগন্ধ নেই, মাঝে মাঝে বরং কথামালার কথা মনে পড়ে। কিন্তু গড়ে তুলবার, সৃষ্টি করবার, সার্থক করবার যে আনন্দ তা কৌতুকের চেয়ে অনেক বড় জিনিস, এই গল্পে তারই প্রাচুর্য আছে। কতকগুলি জীবনের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যর্থতা চোখের সামনে ধীরে ধীরে সার্থক হয়ে ওঠে। পড়ে মানবজীবনের উপর শ্রদ্ধা এসে যায়।

ছাপা ও বাঁধাই নিখুঁত, মূল্যের অল্পতা বিস্ময়কর, এ-সকল বিষয়েও প্রকাশকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাতে হয়। আর আধুনিক সোবিয়েত রাশিয়ার এমন একটি সহজ ও স্বচ্ছ এবং প্রাণবন্ত চিত্রের জন্য লেখিকার নিকট ঋণ অপরিশোধ্য। পড়ার পর প্রতি পাঠকের এই সকৃতজ্ঞ মনোভাব, মনে হয়, অবশ্যম্ভাবী।

লীলা মজুমদার

আচার-বিচার

পূজা-পার্বণঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি॥ বিশ্বভারতী॥ দাম ৩,
বাংলার পালপার্বণঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী॥ বিশ্বভারতী (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ)॥ দাম ॥০

ভারত সংস্কৃতির একটা সর্বাঙ্গীণ পরিচয় নিতে গেলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ধর্মোৎসব-পূজা-পার্বণ-ইত্যাদি সম্বন্ধে না জানলে চলে না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাংস্কৃতিক-

নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন যিনিই করবেন, তাঁর পক্ষেই এই সব সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানিক-ক্রিয়াকাণ্ডের উৎপত্তি আর প্রকৃতি সম্বন্ধে জানাটা অপরিহার্য। কারণ, একদিকে যেমন এই সব পূজাপার্বণগুলি ভারতীয় লোকসংস্কৃতির বুনিয়াদি আধার, অন্যদিকে তেমনি উৎসব ইত্যাদির আনুষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থার বিবর্তন আর ক্রমবিকাশের অনুসরণে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ও ইতিহাসের অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের কার্যকারণসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের এই সব পূজা-উৎসব-পাল-পার্বণের উৎপত্তি আর ক্রমবিকাশের ইতিহাস বড়ো বিচিত্র। আমাদের আজকের সমাজে যে-সব পূজা-অনুষ্ঠান প্রচলিত, সেগুলির অধিকাংশেরই উৎপত্তি অতিসুদূর অতীতে আদিম সমাজের মানুষদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে। নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের ছাত্রমাত্রেই জানেন, আদিম মানুষের অত্যন্ত প্রত্যক্ষ আর ব্যবহারিক কতকগুলি প্রয়োজনবোধ থেকেই বিশেষ কতকগুলো ক্রিয়ানুষ্ঠান বা রিচুয়াল্‌স্‌-এর জন্ম। মানুষের কতকগুলি সমবেত কামনাকে প্রত্যক্ষ রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যটাই ছিল প্রধান। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার তাগিদ থেকেই এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানের উৎপত্তি। শিকারে বেরুবার আগে আদিম মানুষ দল বেঁধে নেচে নেচে হরিণ-শিকারের সমস্ত ব্যাপারটার অভিনয় করে নিত আহার্য সংগ্রহের বাস্তবরোধটুকু আরও খানিকটা শানিয়ে নেবার জন্যে। এটা একটা সমবেত অনুষ্ঠান, প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানের অংশীদার। পরে সমাজের বিকাশ ও বিবর্তনের ফলে সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ একদল লোকের ওপর ভার বর্তিয়েছিল সমাজের আর-সকলের প্রতিনিধি হিসেবে এই সব ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করবার। তারই থেকে ম্যাজিক রিচুয়ালস্‌ বা ইন্দ্রজাল-তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদির জন্ম—যার পরবর্তী বিবর্তন বিভিন্ন ধর্মক্রিয়াচারে। যেমন, অনাবৃষ্টিতে ফসল মরে যাচ্ছে, তাই ম্যাজিসিয়ানকে সকলের হয়ে বৃষ্টি নামাবার নানারকম প্রক্রিয়া করতে হচ্ছে। প্রত্যক্ষকে প্রতীকের সাহায্যে রূপায়িত করার ব্যাপারটা এসেছে এইভাবে। তারপরে, রীতিমতো শ্রেণীসমাজের বিকাশের মধ্যে দিয়ে সংগঠিত রিলিজিয়ন এসেছে, নানান্‌ দেবদেবীর পরিকল্পনাকে আশ্রয় করে নানান্‌ কাল্ট গড়ে উঠেছে, ম্যাজিসিয়ান্‌রা হয়ে উঠেছে পুরোহিত। কিন্তু এই সব পূজাপার্বণের মূল তাৎপর্যটা ঠিকই থেকে গেছেঃ একদিকে সামাজিক মানুষের কামনার প্রতিচ্ছবিকে রূপ দেওয়া, অন্যদিকে অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলিকে বশে আনা। আজকের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় যে সব শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান-মন্ত্রপাঠ-আবৃতি-আচমন-আহরণ-কথাশ্রবণ-ঘটস্থাপন ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ড অনুসরণ করা হয়, সেগুলির অনেকখানিই হচ্ছে আসলে সেই আদিম মানুষের ম্যাজিক রিচুয়ালস-এর স্মৃতির ভগ্নাংশ। ভারতবর্ষের আদিবাসীদের সেই সব অনুষ্ঠান আর্যেরা পরবর্তীকালে ক্রমশই বহুলাংশে নিয়েছে, আর্য সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এসবের বিবর্তনও ঘটেছে বড়ো বিচিত্রভাবে। আজ আমরা যে সমস্ত ধর্মপূজা-ইত্যাদি আর্য-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রবিধি বলে জানি, আসলে তা প্রাক্‌-আর্য বা অনার্য আর আর্য ধর্মক্রিয়াচারের সমন্বিত রূপ। বহু বহু যুগ ধরে আদিম আদিবাসী ভারতীয়দের বিভিন্ন গোষ্ঠী, কোম, জনের আর বিভিন্ন দেশখণ্ডের এই সব ক্রিয়ানুষ্ঠান-ধর্মপার্বণ একটু একটু করে আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহে তাদের প্রবাহ মিশিয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মকর্মে যে বিভিন্ন দৈববিশ্বাস, দেবদেবীর রূপ-কল্পনা-প্রতিমালক্ষণ, পূজানুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি দেখা যায়, তার অনেকখানিই যে আমাদের আদি-পূর্বপুরুষ সেই অনার্যদের কাছ থেকেই আত্মসাৎ করা—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। আর্যেরা সেইসব আচারানুষ্ঠান তাদের ধর্মকর্মে

নানাভাবে চোলাই করে নিয়েছে, শাস্ত্রবিধি তৈরি করে সেগুলিকে উন্নততর একটা রীতিবহুল সোফিস্‌টিকেশন-এর স্তরে নিয়ে গিয়েছে, আদিম মন্ত্রপাঠের ধ্বনিসর্বস্বতার জায়গায় আশ্চর্য সুন্দর কাব্যমণ্ডিত অর্থপূর্ণ শ্লোক এনে বসিয়েছে, বিচুয়াল্‌স্‌-এর স্থূলতার দিক-টিকে বর্জন করে পূজানুষ্ঠানগুলিকে শিল্পসুষমাময় করে তুলেছে, প্রাকৃতিক আর দৈনন্দিন জীবনের নানা বৈচিত্র্যের আর রূপপরিবর্তনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ঢুকিয়েছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়-বিদ্যানিধির "পূজা-পার্বণ" বইটি সেই পুরাণ-শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি বহুল-অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা। বিদ্যানিধি মহাশয় আমাদের দেশের স্বল্পসংখ্যক জ্ঞানশ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম। পঁচানব্বই বছরের এই জ্ঞানবৃদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, কৃষিবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বহু বিভিন্ন বিষয়কে আচার্য যোগেশচন্দ্র তাঁর গবেষণাপূর্ণ অনুশীলনের অর রচনার দ্বারা পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর বৈদিক যুগের কালনির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা এই বিষয়ে পরবর্তী গবেষকদের পথনির্দেশ হয়ে আছে এবং তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষের প্রণয়ন যে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি, সে কথা সকলেই জানেন। এই "পূজা-পার্বণ" বইটিতেও বিদ্যানিধি মহাশয়ের সেই অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য, মনীষা আর গবেষণা-ক্ষমতার পরিচয় আছে প্রতি পৃষ্ঠায়। সেই সঙ্গে আছে তাঁর সুন্দর, সবল, সহজবোধ্য লিপিকুশলতার পরিচয়। বইটির প্রথম খণ্ডে আছে দোলযাত্রা, শারদোৎসব, রাসযাত্রা, স্বরস্বতী—এই কয়েকটি পূজা এবং দশহরা, বারুণী, কোজাগরী-লক্ষ্মী, মহালয়া, দীপালী ইত্যাদি কয়েকটি পার্বণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। দুর্গোৎ-সব হিন্দুর সবচেয়ে বড়ো পূজা-উৎসব। নানান্‌ দিক থেকে এই দুর্গোৎসবের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের পুরোটাই তাই এই দুর্গোৎসবের আলোচনা। দুর্গার আদিরূপ আর তার বিবর্তন, দুর্গার প্রতিমালক্ষণের ব্যাখ্যা, মহিষমর্দিনী-পরিকল্পনার রূপক ব্যাখ্যা, তার পৌরাণিক তাৎপর্য, মৎস্যপুরাণ-মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইত্যাদি আর দেবীপুরাণ-বৃহদ্ধর্মপুরাণ ইত্যাদি কয়েকটি উপপুরাণ থেকে দুর্গোৎসবের কালনির্ণয় ও পূজাপদ্ধতির বর্ণনা—ইত্যাদির বিশদ আর গবেষণাপূর্ণ আলোচনা আছে দ্বিতীয় খণ্ডে।

এই সব পূজা-উৎসবের ক্রিয়াচারের অনেকগুলির সঙ্গেই ঋতু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃ-তিক রূপপরিবর্তনের আর সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের বার্ষিক স্থানবিবর্তনের যোগাযোগটা সুস্পষ্ট। পুরাণ-ইত্যাদিতে সেই সব দেবদেবী আর তাঁদের পূজোকে কেন্দ্র করে নানা উপাখ্যান-কাহিনী-ইত্যাদি প্রচলিত আছে। অনেক ক্ষেত্রে এইসব উপাখ্যান-উপকথার মধ্যে জ্যোতিষের আর প্রাকৃতিক নিয়মকানুনগুলির অতিসুন্দর রূপক প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র সেই জ্যোতিষতত্ত্ব-নিহিত রূপকগুলি অসাধারণ বিদ্যাবত্তার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে-ছেন এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ করে বুঝিয়েছেন। হিন্দুর এইসব প্রধান প্রধান পূজা-উৎসব-গুলি স্মরণাতীত প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বাসন্ত-বিষুব, শারদ-বিষুব, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, ঋতু-আরম্ভ ইত্যাদি প্রধান প্রধান জ্যোতিষিক যোগ উপলক্ষ্যেই যে এই পূজা-উৎসবগুলির সূত্রপাত—এই মতটি বিদ্যানিধি মহাশয় এই বইয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশেষ করে, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, মহিষমর্দিনী ইত্যাদি কতকগুলি অধ্যায়ে এইসব পূজাপার্বণের সচিত্র অ্যাস্ট্রনমিক্যাল তাৎপর্য-ব্যাখ্যাগুলিতে বিদ্যানিধি মহা-শয়ের সুগভীর পাণ্ডিত্য আর বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় আছে। "পূজা-পার্বণ" বইটি প্রধানত বিভিন্ন হিন্দু পূজা-পার্বণের অ্যাস্ট্রনমিক্যাল্‌ তথ্য ও তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ।

আলোচ্য পূজা-পার্বণগুলির কোনটির বৈদিক, কোনটির পৌরাণিক উৎপত্তি আর

তাদের পূজাপদ্ধতির জ্যোতিষাশ্রিত রূপক ব্যাখ্যার দিকেই লেখক খুব বেশি মন দিয়েছেন। কিন্তু এইসব পূজাপার্বণগুলির কোনো-কোনোটির উৎপত্তির ব্যাপারে যে আদিম ভারতীয় আদিবাসীদের বিভিন্ন লৌকিক ক্রিয়াচারের ব্যাপক প্রভাব অনস্বীকার্য, সেদিকে বিদ্যানিধি মহাশয় খুব বেশি জোর দেননি। অবশ্য, তিনি যে একেবারেই এ দিকটা উল্লেখ করেননি, তা নয়। গৌণভাবে করেছেন। যেমন, দোলযাত্রা সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয়ের বক্তব্য ঃ "ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ ঋবির উত্তরায়ণ-আরম্ভে নূতন বৎসর আরম্ভ করিতেন। তোমাদের দোলযাত্রা তাহারই স্মৃতি।" তারপরে তিনি রবিপথে সূর্যের অয়ন-ক্রান্তি-নক্ষত্রসংস্থানের সুন্দর রূপক-বিশ্লেষণ দিয়েছেন যা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু দোলযাত্রার এমন কতকগুলি দিক আছে যেগুলির থেকে তার প্রাক্-বৈদিক আদিম চরিত্র সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। বসন্তকালে পরস্পরের গায়ে রঙিন জল ছিটিয়ে আমোদ করা, সমবেতভাবে নাচ-গান (কোনো কোনো অঞ্চলে অশ্লীল খেউড়) করা ইত্যাদির মধ্যে আদিম 'সেক্স্-বেভেল্‌রি'র অপভ্রংশ থেকে গেছে নিশ্চয়ই। দোলযাত্রার একটা অবশ্যপালনীয় অঙ্গ বহ্ন্যুৎসব যার চলিত নাম যোগেশচন্দ্র বলেছেন 'চাঁচর।' আমার যেখানে বাড়ি, সেই মুর্শিদাবাদ জেলায় একে বলে 'মেড়া-পোড়া।' মেড়া, অর্থাৎ ভেড়া। খড়পাতা জড়ো করে সেটাকে ভেড়া বলে পুড়িয়ে দেওয়ার এই ব্যাপারটা আসলে আদিম মানুষের 'স্কেপ্-গোট্ রিচুয়াল-এরই একটা ভারতীয় রকমফের। এই ভেড়া বা পুরাণোক্ত মেণ্ঢাসুরের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় যোগেশচন্দ্র অজ-একপাদ নক্ষত্রের প্রচলিত রূপক বিশ্লেষণ করে বলছেন, "দোলোৎসব আদি। পরে ইহার সহিত বসন্ত-প্রবেশজনিত উৎসব ও আরও পরে মদনোৎসব যুক্ত হইয়াছে।" কিন্তু কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে তা কি এত নিঃসংশয়ে বলা চলে? এমনও তো হতে পারে যে আদিম অনার্য ভারতীয়দের সামাজিক অমঙ্গল-অকল্যাণের প্রতীককে পুড়িয়ে মারার এবং প্রজননশক্তি বাড়াবার ইচ্ছা থেকে একটা বিশেষ ক্রিয়াচারকেই আর্যেরা আত্মসাৎ করে নিয়ে, তারপরে সেটাকে "শুদ্ধিকরণ" করবার জন্যে ভাদ্রপদা-মেণ্ঢাসুরের কল্পনা করেছে, তার মধ্যে অন্যান্য অনুষ্ঠান ঢুকিয়ে সেটাকে একটা জ্যোতিষাশ্রয়ী ব্যাখ্যা দিয়েছে। সরস্বতী আর দুর্গা সম্বন্ধে অনুরূপ কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যার আলোচনায় বিদ্যানিধি মহাশয় যাননি। কিন্তু তা না গেলেও, ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত সরস্বতীর পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের বাগীশ্বরী-কল্পনার মধ্যে দিয়ে আমাদের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর আধুনিক রূপকল্পনার যে উল্লেখযোগ্য আর বিস্তৃত বর্ণনা আচার্য যোগেশচন্দ্র দিয়েছেন, তা অপূর্ব সুন্দর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, আটত্রিশ পৃষ্ঠায় যে ছাতিমগ্রামের চতুর্ভুজা-সরস্বতীর ছবি দেওয়া আছে, তার প্রতিমালক্ষণের সঙ্গে বৌদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিমালক্ষণের অনেকাংশে মিল আছে—বিশেষ করে ওপরের দুই হাতের মুদ্রাধারণে। দুর্গার প্রতিমালক্ষণের বিবর্তন আর তার রূপকের বর্ণনাতেও বিদ্যানিধি-মহাশয় অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দুর্গা-পূজার উৎপত্তিকে কি সম্পূর্ণভাবেই বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা যায়? বেদোক্ত শারদীয় যজ্ঞের অনেকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান দুর্গা-পূজাবিধির মধ্যে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আজও পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু বিদ্যানিধি-মহাশয় তো নিজেই উল্লেখ না করে পারেননি যে "কেহ মনে করিয়াছেন, ইহা শবর জাতির উৎসব ছিল। কেহ মনে করিয়াছেন, আসামের অসভ্য পার্বত্য জাতির নিকট হইতে হিন্দুরা দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান শিখিয়াছে"—যদিও তিনি মোটেই এ মত গ্রাহ্য করেননি। তাছাড়া, ঋক্-বেদের রুদ্র-শিব পরবর্তী বেদগুলিতে শান্ত-শিবে পরিবর্তিত হয়ে পুরাণে তিনি লিঙ্গপূজার সঙ্গে যুক্ত হলেন—আদিম

মানুষের প্রজনন-ক্রিয়াচারের সঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের শিশ্নতান্ত্রিক আচারানুষ্ঠানের এই বিচিত্র যোগাযোগ শিবের মারফতে কি করে ঘটল, সে প্রশ্ন বারবার মনে জাগলেও, বিদ্যানিধি-মহাশয়ের এই বইয়ে তার কোনো উল্লেখ নেই।

কিন্তু, এসব কথা নিতান্ত আলোচনা-প্রসঙ্গেই বললাম। বিদ্যানিধি-মহাশয়ের বইয়ের এই অপরিপূর্ণতার দিকটি নেহাতই গৌণ। বইটির মস্তবড়ো সার্থকতার দিক হচ্ছে, সমাজ-তাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক আলোচনার একটি অপরিহার্য দিক বোধহয় এই প্রথম বাঙলা ভাষায় আত্মপ্রকাশ করল। পুরাণ, অর্থাৎ পুরাবৃত্ত বা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। সেই অর্থেই 'ঐতিহাসিক' কথাটা যোগ করছি। আচার্য যোগেশচন্দ্র তাঁর আজীবন জ্ঞানসন্ধানের দ্বারা বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অনেক নতুন নতুন সঞ্চয় আহরণ করে দিয়েছেন। এই বইটি তাঁর সেই কীর্তি-তালিকায় নূতনতম সংযোজন। ভারতসংস্কৃতির প্রত্যেকটি ছাত্রের পক্ষে এই 'পূজা-পার্বণ' বইটি যে অবশ্যপাঠ্য, সে কথা বলা বাহুল্য।

বিদ্যানিধি-মহাশয়ের বইটির পটভূমি মোটের ওপর সর্বভারতীয়। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ছোট বইটিতে আছে বিশেষ করে বাঙ্‌লা দেশে অনুষ্ঠিত পাল-পার্বণগুলির সংক্ষিপ্ত আর অতি সুন্দর বর্ণনা।

বাঙ্‌লার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো আধার আমাদের এই সব লৌকিক পাল-পার্বণ, মেয়েলি ব্রত-আচার ইত্যাদি। মাঠে হাল চালাবার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াবার, শালি-ধান বুনবার, ফসল কেটে গোলায় তুলবার দিনে অপূর্ব সুন্দর শিল্পসুষমাময় আনন্দমণ্ডিত নানা ধরনের বিচিত্র সব আচারানুষ্ঠান গ্রামবাঙ্‌লার কৃষিজীবনে প্রাণ দৈনন্দিন ব্যাপার। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এই লৌকিক পাল-পার্বণগুলি ঋতূৎসব, শস্যোৎসব, পিঠাপর্ব, সন্তানোৎসব, স্বজনোৎসব, সমাজমঙ্গলমূলক পূজানুষ্ঠান (যেমন, পুকুর-প্রতিষ্ঠা, কুয়ো খোঁড়া, মন্দির-সংস্কার প্রভৃতি), অমঙ্গলবিনাশক অনুষ্ঠান (যেমন, সর্পভয়, ওলাওঠা, বসন্ত, অগ্নিভয় প্রভৃতি নিবারণের জন্য) ইত্যাদি কতকগুলি ভাগে ভাগ করে নিয়ে ক্রমান্বয়ে বিবরণ দিয়ে তাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দরভাবে।

এই সব লোক-উৎসবগুলির মূলতত্ত্বটি সহজঃ পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজের মানুষের উৎসবই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়েত আনন্দকে উপলক্ষ্য করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশভেদে কালভেদে এগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম আর পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়। বাঙ্‌লা দেশেও তাই হয়েছে। কিন্তু বাঙ্‌লার এই সব লোক-উৎসবপার্বণগুলির একটি অন্যসাধারণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের এই সব পাল-পার্বণগুলি বাঙ্‌লার আদিতম জন ও কোমের আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে আজও পর্যন্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আদিম পূর্বপুরুষদের সেইসব ক্রিয়াচার আমাদের জন-সাধারণ আজও পর্যন্ত যেরকম প্রায় অবিকৃত অবস্থায় টিঁকিয়ে রেখেছেন, ঠিক সে রকমটি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বড়ো একটা দেখা যায় না। অন্য প্রদেশগুলিতে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গণসংস্কৃতির এই লৌকিক ক্রিয়াচারগুলির অধিকাংশই এমনভাবে আত্মসাৎ করে নিয়ে শাস্ত্রবিধিনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছে যে তাদের স্বাধীন সত্তাটি অনেকখানিই চাপা পড়ে গেছে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির আওতার সম্পূর্ণ বাইরে লোকধর্মসংস্কৃতির এরকম সহজ সানন্দ সরলতা আর শিল্পসুষমামণ্ডিত অনায়াসপটুত্ব বাঙ্‌লা ছাড়া অন্য কোনো প্রদেশে বোধহয় এতটা খাঁটি অবস্থায় আর পাওয়া যায় না। বাঙ্‌লার এই বৈশিষ্ট্যের কারণটা খুঁজে পাওয়া যায় ইতিহাসের মধ্যে। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বাঙ্‌লার লোকঐতিহ্যের যে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ ছিল, সেটা ইতিহাসের নানা জায়গায় পাওয়া যায়। এবং এর জন্যে অন্যান্য আর্য-

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রধর্মানুসারীদের কাছে বাঙলা দেশকে গঞ্জনাও সইতে হয়েছে। এ দেশ নাকি বেদ মানে না, তাই এ দেশের লোক তাঁদের ভাষায় অপৌরুষেয়; স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান মানে না, তাই অস্মার্ত; ইত্যাদি।

সত্যই তাই। বাঙলার লোকধর্মে শাস্ত্রীয় নিয়ম-নির্দেশ প্রায় একেবারেই বাদ। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের সেখানে ঠাঁই নেই বললেই চলে। সেকথা চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ও বলেছেন। বার-ব্রত-ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি তো পুরোপুরি মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত। আর, এইসব মেয়েলি বার-ব্রত-পাল-পার্বণের মতো এমন সুন্দর অনুষ্ঠান আর কোন্ দেশে আছে? স্বামী-পুত্র-ভাই-স্বজনের আর সমাজের সকলের মঙ্গল কামনায় ভাদুলিব্রত, লক্ষ্মীব্রত, ভাই-ফোঁটা, ষষ্ঠীব্রত, সুবচনী (চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন ('শুভ-চনী'). পুণ্যিপুকুর, মাঘমণ্ডল ইত্যাদির মতো এমন স্নিগ্ধ সুন্দর কাব্য-মাধুর্যমণ্ডিত ছড়ায় গাঁথা আর আল্পনার শিল্পশ্রীতে আঁকা অনুষ্ঠান অন্য কোথাও খুব কমই আছে।

অবশ্য বাঙলার পাল-পার্বণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিরই উৎপত্তি যে আদিম, তা নিশ্চয়ই নয়। অনেকগুলি বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পাল-পার্বণ-উৎসব আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। বৈদিক পূজা-উৎসবগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলছেন, "বাংলা দেশে বৈদিক যাগযজ্ঞ বা খাঁটি বৈদিক উৎসব নাই বলিলেই চলে। অথচ বেদের মন্ত্র কিছু-না-কিছু সমস্ত ধর্মকার্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত ক্রিয়াগুলি (নামকরণ, অন্ন-প্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি) প্রায় সবই মুখ্যতঃ বৈদিক নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য ইহাদের সঙ্গে কালক্রমে যে অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান সংযুক্ত হয় নাই তাহা বলা চলে না।" অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান সংযুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে মাত্র একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: বাঙলা দেশের বিবাহ-অনুষ্ঠানে গায়ে-হলুদ, স্ত্রীআচার, বাসিবিয়ে, গুটিখেলা, দইমঙ্গল, লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন, ইত্যাদি সমস্তই আদিবাসীদের আদিম ক্রিয়াচার থেকে নেওয়া যার মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতীক-অভিনয় হয়ে থাকে। আসলে, আমাদের বিবাহব্যাপারে কন্যাসম্প্রদান, অগ্নিযজ্ঞ আর সপ্তপদী (সাতপাক)—এই মন্ত্রাংশটুকু ছাড়া বাকি সবটাই অবৈদিক, অস্মার্ত আর অব্রাহ্মণ্য।

পৌরাণিক-তান্ত্রিক উৎসবগুলিকে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় তিনভাগে ভাগ করে নিয়ে বিবরণ দিয়েছেন। সত্যনারায়ণের পুজো আর পাঁচালি-গান, জন্মাষ্টমী, বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর পুজো ইত্যাদি বৈষ্ণব অনুষ্ঠান। শিবরাত্রি, চড়ক-গাজন, নীলের উপবাস ইত্যাদি শৈব অনুষ্ঠান। কালীপুজো, বটন্তীপুজো, মঙ্গলচণ্ডীপুজো এবং দুর্গাপুজোর নানাবকম রকমফের—যেমন, বনদুর্গা, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, বিন্ধ্যবাসিনী, ইত্যাদির পুজাপার্বণ শাক্ত অনুষ্ঠান। এই শেষোক্ত অনুষ্ঠানগুলি প্রায় সবই তান্ত্রিকদের শক্তিসাধনার পরিকল্পনা থেকে এসেছে। অন্যান্য আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক আর লৌকিক উৎসবগুলির মধ্যে শনিপূজা (পূর্ববঙ্গে); কার্তিকপূজা (মুর্শিদাবাদ জেলায়); ইন্দ্রপূজা (বীরভূম-মেদিনীপুর জেলায়), বিশ্বকর্মা-পূজা (কারুশিল্পীদের মধ্যে); গন্ধেশ্ববী পূজা (বেনে-সম্প্রদায়ের মধ্যে); ধর্মঠাকুরের পূজা (নিম্ন পশ্চিমবঙ্গে); সুন্দববন-অঞ্চলে ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণ বায়; রংপুরের পাগ্‌লা-কুকুরের ভয-নিবারক পাগ্‌লা-দেবতা; বীরভূমের ভাঁজো-সুন্দরী ইত্যাদির কথা শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর বইটিতে আছে। এই সব লৌকিক পার্বণগুলির কোনো-কোনোটিতে আবার বাঙলার হিন্দু-মুসলমান লোক-সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। সত্যপীরের শিরনি খাওয়া আর মুশকিল-আসানের ফোঁটা

কাটার সঙ্গে আমরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানেরা তো অবাল্য-পরিচিত।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে প্রকাশিত এই 'বাংলার পাল-পার্বণ' বইটি আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু বহু তথ্যে সমৃদ্ধ আর সুখপাঠ্য। বইটির অনেক জায়গায় ফুটনোট-এ প্রসঙ্গক্রমে মূল্যবান কতকগুলি পাঠনির্দেশ বা রেফারেন্স দেওয়া আছে। তাছাড়া, কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ—যেগুলিতে সমসাময়িক পূজা-পার্বণোৎসবগুলির তালিকাপঞ্জী ও বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে—সেই সংস্কৃত গ্রন্থগুলির একটা তালিকাও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় দিয়েছেন। তথ্য, বিবরণী আর গ্রন্থপঞ্জীর সমন্বয়ে এই ছোট বইটি বিশেষ মূল্যবান্ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্র মজুমদার

প্রতিবেশী দেশ

মস্কো থেকে চীনঃ গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বেঙ্গল পাবলিশার্সঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ঃ দু'টাকা বারো আনা
নয়াচীনে যা দেখেছিঃ মঞ্জুশ্রী দেবীঃ প্রগতি-প্রকাশনীঃ ২, পাম প্লেস, কলিকাতা-১৯ঃ একটাকা চার আনা।

আলোচ্য বইখানির নাম 'মস্কো থেকে চীন' হলেও, চীনের মহাবিপ্লব সে-দেশে যে অভূতপূর্ব জীবন এনে দিয়েছে মুখ্যত তারই উপরে লেখা। হাজার হাজার বছরের ভূমি-দাসত্ব, শত শত বছরের বিদেশী শোষণ, নিপীড়ন ও গোলামি, সর্বোপরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী চিয়াং দস্যুদলের অমানুষিক বর্বর নৃশংসতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে চীনের ৪৮ কোটি সাধারণ সংগ্রামী মানুষ কেমন করে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে নতুন জীবন গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষদর্শী লেখিকা নিপুণহাতে এঁকেছেন তারই ছবি।

লেখিকা ইউরোপ থেকে মস্কো হয়ে গিয়েছিলেন চীনে। মস্কোয় অবস্থিতি তাঁর অল্প সময়। তবুও দক্ষশিল্পী যেমন স্বল্প কয়েকটি পরিমিত রেখার টানে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর চিত্রে ভাব ও রূপের সমৃদ্ধি অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে তেমনি লেখিকা সোবিয়েত মানুষের জীবন, মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য তাঁদের প্রকৃতি-বিজয়ের অপ্রতিহত অগ্রগতি, দুনিয়ার সংগ্রামী মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ববোধ আর কোটি কোটি মানুষকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার সাম্রাজ্যবাদী খুনের চক্রান্তের প্রতি অপরিসীম ঘৃণার যে চিত্র এঁকেছেন তাও অতুলনীয়।

মস্কোর পথে লেখিকা চলেছেন চীনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নেমে পড়ল উড়োজাহাজ। ছাড়তে দেরি হচ্ছে। কারণ, আবহাওয়া সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত নিয়ম নেই রুশ উড়োজাহাজ ছাড়বার। ক্রুদ্ধ বিরক্ত এক ধনী মার্কিন যাত্রী প্রশ্ন করলেনঃ "এই যে সময় নষ্ট করে তোমরা পয়সা খোয়াচ্ছ, তাতে লাভ কি? এভাবে কি ব্যবসা চলে কখনও?" সোবিয়েত মানুষ জবাব দিল, "মানুষের জীবনের চেয়ে বেশী মূল্য আমরা কিছুকেই দিই না। মানুষকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে যদি সরকারের কয়েক শ রুবল লোকসান যায়, যাকনা। মানুষের জীবন নিয়ে আমরা ব্যবসা করি না।"

হয়তো অবাক হয়ে ভেবেছিলেন সেই ধনী মার্কিন ভদ্রলোকঃ এরা কি বোকা! মানুষের জীবন ছাড়া আবার ব্যবসা হয় নাকি কখনও! কোটি কোটি মানুষের রক্ত নিষ্কাশন করে তবেনা জমে ওঠে সোনা—ব্যাংকভরা মুনাফার মোটা অঙ্ক!

কিন্তু মানুষের জীবনের প্রতি এই অপরিসীম মূল্যবোধ, মর্যাদাবোধ, মমত্ববোধই সমগ্র সোবিয়েত দুনিয়ার প্রাণশক্তি; প্রাণ-শক্তি পূর্ব ইউরোপের জন-গণতন্ত্রের দেশগুলির আর মুক্ত মহাচীনের।

তাই মানুষের জন্য প্রকৃতির ভাণ্ডার জয় করে কবে সোবিয়েতের মানুষ এগিয়ে চলেছে সুখ সমৃদ্ধিভরা সাম্যবাদের যুগ গড়ে তুলতে, এগিয়ে চলেছে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পূর্ব-ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে; আর নবজাগ্রত মহাচীন চলেছে এগিয়ে দুর্বার বেগে আটচল্লিশ কোটি চীনের মানুষের জন্য গড়ে তুলতে সুখ, শান্তি ও প্রাচুর্যভরা উন্নত জীবন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত। তাই "আমরা শান্তি চাই। মানুষের জন্য গড়তে চাই।"—এই হচ্ছে শোষণ-মুক্ত দুনিয়ার মূল মন্ত্র।

আজ থেকে দু'বছর আগে লেখিকা চীনে যান। চীনের গণ-সরকারের বয়স তখন সবে মাত্র দু'বছর। দু'বছর আগেও যে চীনের বেশিরভাগ চাষী ছিল জমিহীন, দুর্ভিক্ষ ছিল যাদের চিরসাথী; বেকার মজুর ও মধ্যবিত্তের ভিড়ে যেখানে পথ চলা ছিল ভার; যেখানে নারী ছিল ক্রীতদাসী, নারীদেহ নিয়ে যেখানে চলত অবাধ ছিনিমিনি খেলা, মাত্র দু'বছরের ভিতরে কেমন করে সেই ৪৮ কোটি মানুষের দেশ দুর্ভিক্ষ বেকারি, ভিক্ষা ও গণিকাবৃত্তিকে সমূলে উৎখাত করে গড়ে তুলছে নতুন জীবন, বইখানির ভিতরে লেখিকা লিপিবদ্ধ করেছেন তারই প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত।

লেখিকা নিজের চোখে দেখেছেন মুক্ত চীনের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ভূমি সংস্কারের পদ্ধতি; প্রত্যক্ষ করেছেন গণিকাবৃত্তি উচ্ছেদের অভিযান; দেখেছেন কারখানায় কারখানায় মজুরদের স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎপাদনবৃদ্ধির উৎসাহভরা প্রচেষ্টা। দেখেছেন স্কুলে, নার্সারিতে, আর ঘরে ঘরে ফুলের মতো শিশুর সুন্দর হাসিভরা মুখ। চাষী মা "হো"-এর মতো একমুঠো অন্নের জন্য তাঁর বুকছিঁড়ে বুকের মানিককে বিক্রি করে দিতে হয় না তার স্বামীকে। বিক্রি করতে হয়না নিজেকে একপেট ভাতের বিনিময়ে নারী ব্যবসায়ী পশুদের কাছে। মেয়ে হওয়ার অপরাধে আজ আর লজ্জা, ভয় ও দুঃখে মৃতপ্রায় হতে হয় না কোনো মাকে, কাং কা-চিং-এর মায়ের মতো। "মেয়ে বোঝা—বাড়তি পেট" বলে বিক্রি করে দিতে হয়না আজকের দিনের কাং কা-চিংদের অন্যের অনাগত সন্তানের ভাবী বধূ কিম্বা ক্রীতদাসী হিসাবে; যেমন দিতে হয়েছিল একদিন আজকের মুক্তচীনের বিপ্লবী বীরাঙ্গনা চু-তে পত্নী কাং কা-চিং-এর মাকে তাঁর চল্লিশ দিনের শিশুকন্যাকে। কিন্তু সে দিনের সেই দুঃখী জেলের মেয়ে শিশু ক্রীতদাসী কাং কা-চিং তার সতেরো বছরের দুঃসহ ক্রীতদাসীর পশু-জীবন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেবল নিজের জীবনেই আনেননি মুক্তি, চীনের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম মহান নেত্রী, মুক্তি এনেছেন চীনের কোটি কোটি নারীর জীবনে। নতুন চীনে মেয়েরা পেয়েছে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার; নতুন চীনের বিবাহবিধি বাতিল করেছে সামন্ততান্ত্রিক বিবাহপদ্ধতি; বাতিল করেছে ঘৃণ্য পণপ্রথা, যৌতুক আদায়, বহু-বিবাহ, উপপত্নী গ্রহণ, শিশুবিবাহ। পাত্র-পাত্রী দু'জনার সম্পূর্ণ মত থাকলে তবেই হবে বিয়ে। নির্দিষ্ট হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, কর্তব্য, বাপ মা ও সন্তানে সম্পর্ক, বিবাহ বিচ্ছেদের কানুন। ". মানুষ এখন ভালোবাসার বদলে বৌ পায়, পয়সার বদলে নয়। এখন মেয়েদের আমরা নিজেদের সমান বলে ভাবতে শিখছি" —উ সু-চাং গাঁয়ের তরুণ চাষীর কণ্ঠে বেজে ওঠে নতুন চীনের প্রতিধ্বনি।

লেখিকা এক দিকে যেমন নিজের স্বচ্ছ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে জানতে চেষ্টা করেছেন নতুন চীনের এই সাফল্য আর সম্ভাবনাভরা উজ্জ্বল ভবিষ্যত; তেমনি চু-তে, চৌ এন

লাই, লিউ শাউচি প্রভৃতি নতুন চীনেব কর্ণধার, কাং কা-চিং, তেং ইং-চাও, বিখ্যাত লেখিকা লী পা-চাও প্রভৃতি মহিলা নেত্রীদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ আলোচনার ভিতর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কবেছেন নতুন চীনের এই নয়া গণতন্ত্রেব বাস্তব রূপ।

কি গাঁয়ে, কি শহবে, কারখানায়, স্কুলে, কি ছোটো বড়ো কর্মী, নেতা কি সাধারণ মানুষ, সবাব মুখেই শুনেছেন ভারত আর ভারতবাসীব প্রতি অকুণ্ঠ ভ্রাতৃত্বভরা গভীর ভালোবাসার কথা—দেখেছেন প্রত্যেকটি মুখে গভীর উৎকণ্ঠা আব বেদনার ছায়া, শুনেছেন ভরসার বাণী। "...ভারতবর্ষ-সোবিয়েত-চীন, এই তিনটি দেশের মুক্তি মানে দুনিযার মুক্তি। সোবিয়েত আর চীন আজ মুক্ত। দুনিযার মানুষ তোমাদের দিকে তাকিযে—সূর্যের দেশ ভারতবর্ষের দিকে।" —উড়োজাহাজেব সহযাত্রী কিয়েফ-এর সেই সোবিযেত মানুষটির কথার প্রতিধ্বনি আজ মহাচীনেব সর্বত্র।

"নয়াচীনে যা দেখেছি"র লেখিকা আবও পবে ১৯৫২ সালেব সেপ্টেম্বরে চীনে যান এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে, পশ্চিম বাঙলার মেয়েদের প্রতিনিধি হিসাবে। আলোচ্য বইখানির ভিতরে তিনি তাঁর চাব সপ্তাহের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। "মস্কো থেকে চীনে'ব লেখিকা দেখে এসেছিলেন মহাচীনের মহা জাগবণের যে প্রাবম্ভ, 'নয়াচীনে যা দেখেছি'র লেখিকা দেখে এলেন তারই সাফল্যভবা দ্রুত অগ্রগতি। মহাচীনেব মহাবিপ্লব সমগ্র দেশ জুড়ে যে বিবাট সৃজন প্রতিভাকে করেছে বন্ধনমুক্ত দেখে এলেন তারই বিকাশ। কতদ্রুত চীনের মানুষ সুন্দব কবে, শক্ত কবে গড়ে তুলছে তাদেব দেশ। মাত্র চার বছরেব ভিতরে মানুষের মর্যাদাপ্রাপ্ত নতুন চীনেব শ্রমিকেরা কেমন দ্রুত করে চলেছে শিল্পের প্রসার; যুগ যুগের জমিব ক্ষুধার পবিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চাষী খেত ভরিয়ে তুলছে সোনার ফসলে; গড়ে উঠেছে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ; সবাই পাচ্ছে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা। দেশজোড়া জেগে উঠেছে "মানুষের জন্য গড়ার" উন্মাদনা, অভিনব সাডা। তাই বিস্ময়ে অভিভূত গান্ধী শিষ্য রবিশঙ্কব মহারাজ বলে উঠলেনঃ এ আমরা কোথায় এলাম? এই কি স্বর্গ?

এই স্বর্গই রচনা কবে চলেছে মুক্ত চীনের মানুষ আজ দেশজুড়ে। কিন্তু "মানুষের জীবন" নিয়েই যাদের ব্যবসা সেই সাম্রাজ্যবাদীসের পক্ষে তা অসহ্য। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে তাবা জোট পাকাচ্ছে মহাচীনের মুক্ত মানুষেব পায়ে আবার দাসত্বের শৃঙ্খল পরাতে। কিন্তু "হো পিন ওয়ান শোযে" "শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!"—জাগ্রত নতুন চীনের নতুন মানুষের কণ্ঠেব এ আওয়াজ সাম্রাজ্যবাদী খুনীদেব প্রতি বলদৃপ্ত হুঁশিয়াবি।

"মস্কো থেকে চীন" ও "নযাচীনে যা দেখেছি" দুখানা বই-ই আজকের চীনকে জানার ও বোঝার দিক থেকে সার্থক রচনাব দাবি বাখে। তাই বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে যে বই দুখানি সমাদৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই। **সত্য গুপ্ত**

বাঙলায় গোর্কি

অভাগাঃ ম্যাক্‌সিম গোর্কি। অনুবাদঃ সত্য গুপ্ত। নবভারতী। দাম ৩৲

'অভাগা' গোর্কিব প্রথম উপন্যাস। ইতিপূর্বেই তিনি অবশ্য ছোটো গল্প লিখে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির নাম মনে করতে গেলেও 'অভাগা'র

নাম প্রথম মনে পড়ে না। কিন্তু প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'অভাগা'র একটি বিশেষ মূল্য আছে। এ মূল্য গোর্কিও নিজে দিতে চেয়েছিলেন। এ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৪ সালে নিঝ্নি নভগরোদ শহরের একটি স্থানীয় পত্রিকায়। মৃত্যুর পূর্বে গোর্কি এই উপন্যাসখানির সংস্কারও করেছিলেন, যদিও তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে।

কাহিনীটি এই—রাত্রে টহল দেবার সময় চৌকিদার কুড়িয়ে পায় একটি শিশুকে। বাপ মা তাকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপর। এই শিশুটিই অভাগা পল। ছেলেটির ওপর মায়া পড়ে নারী-বিদ্বেষী এক গম্ভীর প্রকৃতির সেপাই, আরিফি গিব্লির। অনাথ আশ্রমের দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে খানিকটা বেড়ে উঠে পল আসে গিব্লির ঘরে। সেখানে পাখি আর বই আর গম্ভীর সৎ মানুষটির সঙ্গে পল বেড়ে উঠতে থাকে। বাল্যকালটা তার কাটে অন্যছেলেদের কাছ থেকে বিদ্রূপ সহ্য করে। পড়াশুনাতে বিশেষ এগোতে পারে না। এরই মধ্যে একদিন গিব্লি পাগল হয়ে গেল। লোকে বললে, নির্জনতাপ্রিয় লোকটা বই পড়ে পড়ে পাগল হয়ে গেছে। গিব্লির কিছু টাকাকড়ি ছিল, কিন্তু সে টাকা পল পেল না, তাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নিল গিব্লির এক বন্ধু। পল টের পেল, মুখের ওপর বলল সেকথা তারপর নিরুপায় হয়ে যোগ দিল জুতোর ছোটো কারখানায়। নানা ধাক্কা খেতে খেতে সে হয়ে উঠেছিল নির্বাক, সঙ্গীহীন। জুতোর কাজ সে অবশ্য ভালোই করতে পারত, খাটতে পারত বেদম, কিন্তু আনন্দের মুখ সে দেখেনি। এই অবস্থায় কারখানার ওপর তলায় এল নতুন ভাড়াটে নাতালিয়া। নাতালিয়া ভদ্র ঘরের মেয়ে। এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঝিগিরি করার সময় তাকে খোয়াতে হয় তার কুমারীত্ব। তারপরে ঘরেও স্থান না পেয়ে ক্রমশ দেহের ওপরই তাকে নির্ভর করতে হয়েছে। সাধারণ গণিকার মতো তাকে দেখা যায় অন্যলোকের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে, মদ খেয়ে ফিরতে, কোনো কোনো দিন মার খেয়েও ফিরতে, বাকি পয়সার জন্যে গালাগালি দিতে দিতে।

একদিন আকস্মিকভাবে দেখা হল পলের সঙ্গে নাতালিয়ার। টাইফাস রোগে কাবু হয়ে পল পড়ে ছিল কারখানার নিচু তলার স্যাঁতসেতে গুদামঘরে। জলের জন্যে কাতরাচ্ছিল। নাতালিয়া তার সঙ্গিনীসহ ওদিকদিয়ে যাবার সময় অনুকম্পায় ওর কাছে আসে, এবং আসার পর কিছুটা পরিচর্যাও শুরু করে দেয়, তারপর উদ্যোগ করে পাঠায় হাসপাতালে। এমনিভাবে ওদের মধ্যে গড়ে ওঠে একটা সম্পর্ক—অনুকম্পা থেকে বন্ধুতা, তারপর প্রেম। দুনিয়ার ওপর বিশ্বাস হারানো, সঙ্গীহীন, এবং পালক পিতার উপদেশ মতো নারীবিদ্বেষী অভাগা পল হঠাৎ আবিষ্কার করে—একটি নারীর সাহচর্য কি বিপুল আনন্দের উৎস হয়ে এসেছে তার কাছে। নির্বাক পলও মুখ খোলে আস্তে আস্তে। আস্তে আস্তে সে স্বপ্ন দেখতে থাকে। সে ভাবে, নাতালিয়াকে সে উদ্ধার করবে তার এই পাপ ব্যবসা থেকে, তাকে বিয়ে করবে। তারা ঘর বাঁধবে স্বামী-স্ত্রীর মতো, পল তৈরি করবে একটি জুতোর দোকান, সে দোকান এ দোকানের মতো এত নোংরা কদর্য হবে না, হবে পরিচ্ছন্ন সুন্দর। নাতালিয়াও লুব্ধ হয়—তার জীবনে পলের মতো এত সৎ এত ভালো পুরুষ সে যেন দেখেনি। জীবনে সে বন্ধু পায়নি, পল তার বন্ধু। মন খুলে সে পলের সঙ্গে আলাপ করে। আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে কাঁদে ভালোবাসায়, আলিঙ্গন করে আবেগে। কিন্তু, এতো ভালো, এতো বড়ো এ স্বপ্ন যেন সফল হবার নয়। নাতালিয়ার ভয় হয় পল যদি শেষপর্যন্ত সাধারণ পুরুষদের মতোই হয়ে পড়ে, প্রাথমিক মোহ কেটে যাবার পর সারাজীবন ধরে যদি তাকে পূর্ব জীবন নিয়ে খোঁটা দিতে থাকে? মারতে

থাকে? অনেক ঘা খাওয়া নাতালিয়া এত ভালোর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না। পলকে মাঝে মাঝে মনে হয় সে যেন বোকা। পাপ ব্যবসা চালিয়েই যেতে থাকে। ভালোবাসার অকৃত্রিম মুহূর্তে সেকথা পলের কাছে স্বীকারও করে ফেলতে তার বাধে না।

কিন্তু উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে পল। যাকে সে ভালোবেসেছে, যাকে ভালোবেসে তার জীবনে এসেছে প্রথম অরুণোদয় তাকে সে কিছুতেই নোংরামির মধ্যে যেতে দেবে না। তার ওপর আর কারো অধিকার সে মানতে রাজী নয়। নাতালিয়ার পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করে পল। চারিদিকের কদর্য পরিস্থিতির মধ্যে পলের এই অনুনয় মনে হয় সঙের মতো। চারিদিককার নির্মম ভাগ্য যেন ঘরের মাতাল খদ্দের আর বারবনিতাদের অট্টহাস্যে পরিহাস করে ওঠে পলকে। পল ফিরে আসে তারপর পরদিন শান্তভাবে যায় নাতালিয়ার কাছে; অবরুদ্ধ আবেগে পল নাতালিয়াকে জানায় তার অচঞ্চল প্রেমের কথা। নাতালিয়া অকৃত্রিম বেদনায় চোখের জল চাপে। তারপর পল তেমনি দৃঢ়ভাবে হত্যা করে নাতালিয়াকে। বুঝি এমনি করেই সে নাতালিয়াকে রক্ষা করতে চাইল পঙ্কিলতা থেকে। মরা নাতালিয়াকে জড়িয়ে ধরে পল কাঁদতে লাগল অঝোরে। বিচারে দীর্ঘ কারাদণ্ড হল পলের। সে শুধু একবার চেয়েছিল নাতালিয়ার কবরটা দেখতে। বিচারকেরা তা দেখতে দেননি।

এই হল গল্প—এবং বলা বাহুল্য এই প্রথম উপন্যাসেই গোর্কির যা বৈশিষ্ট্য তা অপ্রতিরোধ্য ভাবে জেগে উঠেছে পাতায় পাতায়। সে বৈশিষ্ট্যগুলি এমন যা রুশ-সাহিত্যের প্রাক-গোর্কি যুগ থেকে গোর্কি যুগের মানবধর্মকে সুস্পষ্টরূপে সূচিত করতে সক্ষম। এখানে যার সূচনা সেই মানবধর্মের পরিণত রূপকে আমরা বলতে পারি প্রলেতারীয় মানবধর্ম। টল্‌স্টয় অথবা চেখভ্‌-এর মানবতার সঙ্গে এর তফাত প্রবল এবং ডস্টয়েভ্‌স্কির শিল্পের সঙ্গে এর বৈপরীত্য তীক্ষ্ণ।

এর একটি প্রকাশ হল সমাজের নিচুতলার মানুষদের কাহিনীকে মূল্য দেওয়ায়। গোর্কির পূর্বেও রুশ সাহিত্যে এবং কিছুটা নরওয়েজিয়ান সাহিত্যে এরকম কাহিনীর দৃষ্টান্ত কম নয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে গোর্কির তফাত হল এই যে নিচুতলার এই মানুষেরা গোর্কির কাহিনীতে আসেনি অনুকম্পার পাত্র হয়ে, এবং কখনোই আসেনি অধঃপতিত পরাজিত অমানবিক জীব হিসেবে, তারা এসেছে নায়ক হিসেবে, চারিদিককার দুর্দশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার স্পর্ধা নিয়ে, অনাগতভবিষ্যতে যারা ইতিহাসের মোড় ঘোরাবে, সেই লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে মানুষদের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে ধ্বনিত করে।

সন্দেহ নেই যে, অভাগা পলের কাহিনী এবং ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পূর্ববর্তী বহু কাহিনীতেই সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ কিংবা এই নিপীড়িত মানুষদের জয়লাভের কোনো ঘটনা গোর্কি আনেননি। অভাগা পল এবং তার বহু চরিত্রই শেষপর্যন্ত ঘা খেয়েছে; বাহ্যিকভাবে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু এই পরাজয়কেও বোঝা দরকার। সে যুগে রাশিয়াতে সামাজিক পরিস্থিতি এমন যে জয়লাভ তখনই সম্ভবপর নয়। শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলিকে কিভাবে একটি অমানুষিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চাইছে তার নির্মম উদ্ঘাটন ছিল তখন একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি ঐতিহাসিক গতিও তখন দেখা দিয়েছিল যা সেই মুহূর্তের পরাজয় সত্ত্বেও ভবিষ্যতে জয়লাভের জন্য সংগ্রামশীল। পরাজয় এখানে প্রকৃত পরাজয় নয়, সংগ্রামের একটি অবস্থা। গোর্কির নাটকগুলি পড়লে (কারণ জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন এখানেই সবচেয়ে নাটকীয়) একথা কখনো মনে হয় না যে নিপীড়নটাই ভাগ্য, অধঃপতনটাই সত্য। বরং সবসময়েই মনে হয় আরো একটি অঙ্ক বাকি আছে, এবং তার বাস্তব অভিনয় ঘটবে রাজপথে, ব্যারিকেডে। এক অন্ধকার কদর্য পটভূমিকায় গোর্কির

অনেক কাহিনী শুরু কিন্তু তার নায়কেরা কদর্যের মধ্যে থাকলেও কদর্যকে মানতে পারে না। পলের মতো তারা শিশু অবস্থাতেও প্রতিবোধ করে যায়, স্বপ্ন দেখে মুক্ত জীবনের, মানবিক সার্থকতার। এবং এ স্বপ্ন তাদের কাছে বিলাস নয়, তার জন্য মূল্য দিতে তারা প্রস্তুত। এই হল গোর্কি। বিষণ্ণতা, করুণা, হতাশা বা আত্মপীড়ন-এর 'শিল্প' রেওয়াজকে ওলটপালট করে দিয়ে পাঠকের মনে অনিবার্যভাবে এই অলিখিত শেষ অংকের জন্য সক্রিয় প্রতীক্ষা জাগিয়ে তোলাই হল গোর্কি-শিল্পের বিপ্লবী নতুনত্ব।

মানুষ সম্পর্কে এই অপূর্ব মহত্ত্ববোধ, এবং শ্রমিক ও নিপীড়িতদের মধ্যেই প্রকৃত নায়ককে আবিষ্কার করেই গোর্কি গোর্কি। মানবিক মহত্ত্বের সংগে সম্পর্কিত হয়ে আছে প্রেম সম্পর্কে গোর্কির ধারণা প্রেমের যে ধারণা গোর্কি তাঁর বিভিন্ন লেখায় উপস্থিত করতে চেয়েছেন শক্তিতে ও গৌরবে তার তুলনা বিরল। শোনা যায় তাঁর কবিতা Death and the maid পড়ে স্তালিন লিখেছিলেন যে, এ ফাউস্টের চেয়েও বড়ো। এক বালিকার প্রেমের কাছে মৃত্যুর পরাজয় এর কাহিনী। অভাগা পলের কাহিনীতেও কি আশ্চর্য মহিমায় গোর্কি এঁকেছেন এই কদর্য পরিবেশের মধ্যে মহিমময় একটি প্রকাশ, একটি অপূর্ব অরুণোদয়ের মুল্য—যখন অভাগা পল আর গণিকা নাতালিয়া পরস্পরকে ভালো-বাসল। জীবনসম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আস্বাদে এ ভালোবাসাকে গোর্কি এঁকেছেন নিতান্ত বাস্তব করে, বিশ্বাসযোগ্য করে, কিন্তু কিছুতেই মামুলি করে নয়, তুচ্ছ করে নয়, এঁকেছেন উজ্জ্বলরঙে।

এবং প্রবল ভালোবাসার উল্টোপিঠেও আছে ঘৃণা। ভালোবাসতে হলে যা ঘৃণ্য তাকে ঘৃণা করার উপদেশও গোর্কি দিয়েছিলেন। নেতিমূলক চরিত্রের নির্মম উদ্ঘাটন যে গোর্কির বিভিন্ন লেখার একটি দিক, তার পেছনে আছে এই ক্ষমাহীন ঘৃণার ক্ষমতা।

শ্রমিক ও নিপীড়িতদের মধ্যে নায়ককে আবিষ্কার করার সংগে সম্পর্কিত হয়ে আছে গোর্কি-সাহিত্যের আর একটি মহান মূল্যবোধ—শ্রমের প্রতি মর্যাদা। গোর্কির উপন্যাসে, নাটকে, আত্মজীবনীতে বারবার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্যভাবে গোর্কি প্রকাশ-করে গেছেন শ্রমের এই অমর তাৎপর্য। যারা অলস, যারা নিষ্ক্রিয়, যারা মেহনতকে শ্রদ্ধা করতে পারে না গোর্কি তাদের ক্ষমা করেননি। একদা তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি এক-জন সমালোচক হতাম, এবং ম্যাক্সিম গোর্কি সম্পর্কে একটি বই লিখতাম, তবে তাতে আমি এই কথা বলতাম, যে গোর্কি আজ যা হয়েছেন তা হতে পেরেছেন তার কারণ পরি-শ্রমের বিরাট তাৎপর্য তিনি ধরতে পেরেছিলেন; এই পরিশ্রমই সৃষ্টি করে যা কিছু মূল্য-বান তাকে, এ পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর ও মহান তাকে।"

গোর্কির বৈশিষ্ট্যের এই কতকগুলি দিক আমাদের পক্ষে স্মরণ করার বিশেষ প্রয়োজন এই জন্য যে, এ সম্পর্কে নানা মাত্রার ভুল ধারণা আমাদের এখানে রয়ে গেছে বলে ভয় হয়। দেখা যায় এমন কাহিনী এদেশে লেখা হয়েছে যা মাত্র কদর্য, অথচ তা প্রশ্রয় পেতে চেয়েছে শিল্প বলে। গোর্কিকে লক্ষ্য করলে দেখব, তিনি কদর্যের কাহিনী আদৌ লেখেননি লিখেছেন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী। এমন কাহিনী লেখা হয়, যা নিছুতলার অথচ যার মধ্যে নায়কের তাৎপর্যের ও মানবিক মহত্ত্বের কোনো উদ্দীপনা নেই। গোর্কি তা কল্পনা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এমন কাহিনী লেখা হয়, যা মাত্র রোমান্সের, অথচ তার মধ্যে না আছে শ্রম-জীবনের বাস্তবতা! না আছে প্রেমের গৌরব। গোর্কির কাছে যা অসহ্য।

প্রথমে জীবনেই গোর্কির লেখায় এই সমস্ত দিকগুলি অবশ্যই পূর্ণ বিকশিত রূপে

আসতে পারেনি। কিন্তু এতটা পরিমাণে এসেছিল, যাতে প্রাক্-গোর্কি যুগ থেকে গোর্কিকে গুণগতভাবে তফাত করে দেখা সম্ভব ছিল। প্রথম রুশ-বিপ্লবের সময়, বিশেষ করে 'মা' উপন্যাসে এই তফাত সুস্পষ্টতর হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী কালে সে তফাতকে গোর্কিই নির্দিষ্ট করেন সমাজতান্ত্রিক-বাস্তববাদ-এর প্রতিষ্ঠায়। শিল্প তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এবং এ-যুগে সাহিত্যের গুরু হিসাবে গোর্কির নাম আজ সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল মানব-সমাজের কাছে স্বীকৃত। প্রগতিশীল বাঙলা সাহিত্যকেও যদি আজ অগ্রসর হতে হয় তবে গোর্কি-সাহিত্য তার কাছে অপরিহার্য। সুখের বিষয়, বহু-দিন পূর্বেই আমাদের দেশে গোর্কির 'মা'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, এবং আজ পর্যন্ত তার ক্রমাগত নতুন সংস্করণ প্রমাণ করছে, যে সাধারণ বাঙালী পাঠক গোর্কিকে ভালো-বাসতে দ্বিধা করেন না। আরো সুখের বিষয় এই যে সম্প্রতি নানা দিক দিয়ে, নানা প্রকাশকের উদ্যোগে গোর্কির অন্যান্য বহু-পুস্তকের অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এটা যে হতে পারছে, তার জন্য আমরা প্রথমেই সমস্ত অনুবাদক ও প্রকাশকদের অভিনন্দন জানাই। গোর্কির গল্প এবং গোর্কির উপন্যাসই শুধু নয়, গোর্কির নাটক এবং গোর্কির প্রবন্ধগুলি আজ আমাদের খুবই দরকার। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের স্বপক্ষে দাঁড়াবার সংগ্রামে এ লেখাগুলি আজও অমূল্য।

কিন্তু অনুবাদের প্রশ্নটাও অবশ্য জরুরী। বাঙালী পাঠক কিছুই যখন পেত না তখন অনুবাদে সংক্ষেপিত 'মা'কে তারা ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আজ যখন বাংলা অনুবাদের বাজার আগের চেয়ে অনেক প্রসারিত, তখন আশা করব প্রকাশকরা যেন শুধু বাজারের জন্যই গোর্কির অনুবাদকে আশ্রয় না করেন। অন্যদিকে অনুবাদের যাথার্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য সাহিত্যিকরাও যেন তাঁদের দায়িত্ব না বিস্মৃত হন। শ্রীসত্য গুপ্ত খ্যাতিমান অনুবাদক, তবু গোর্কির আস্বাদ তাঁর লেখায় আরো ফুটলেই সুখী হতাম। অন্যান্য অনুবাদকদের অনেকের লেখা সম্পর্কেও এমনি আক্ষেপ থেকেই যায়। আরো মনে হয় যে বাঙলার সাহিত্যিকেরা বোধ হয় এখনো গোর্কি সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্ব অনুভব করেননি; নইলে, চীন দেশে তাঁদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লু-সুন যখন নিজ মৌলিক রচনার চেয়েও উৎসাহিত হতে পারেন গোর্কি-অনুবাদের দুরূহ কাজে, তখন আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের কাছ থেকেও কি এ সম্পর্কে তেমন আগ্রহ আশা করা শক্ত? তদুপরি, এদেশে রুশভাষার চর্চাও কিছুটা শুরু হয়েছে। ইংরেজি মারফত না হয়ে মূল রুশ থেকে অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য বাংলায় এখনো কি দাবি করা যায় না?

এই আক্ষেপটা জানিয়ে রেখেও ইতিমধ্যে বাঙলায় যে অনুবাদগুলি আজ আমাদের কাছে সহজলভ্য, পাঠকদের সুবিধার জন্য তাদের নাম উল্লেখ করে দিচ্ছি। ১৮ই জুন গোর্কির মৃত্যুদিবস গেছে। গোর্কিকে স্মরণ করার সময়, বাঙলায় গোর্কির সাহিত্যের আরো প্রচার হোক এই আশা করি—

"মা"—অনুবাদক ঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

"মা"—অনুবাদ ঃ বিমল সেন

ক্লিম (আর্তামনোভজ্)—অনুবাদ ঃ শীতাংশু মৈত্র, (১ম খণ্ড—২৲, ২য় খণ্ড—৫৲

ভাঙন (আর্তামনোভজ্)—অনুবাদ ঃ সুনীল দত্ত, ৫৲

জীবন প্রভাত (ক্লিম সামগিন)—অনুবাদ ঃ ঋষি দাস, ২৲

টলস্টয়ের স্মৃতি—অনুবাদ ঃ ঋষি দাস, ২৲

লেনিনের সাথে—অনুবাদ ঃ ঋষি দাস, ২
একদিন যারা মানুষ ছিল—অনুবাদ ঃ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।
নবজাতক—অনুবাদ ঃ নীহার দাশগুপ্ত।
গর্কির গল্প—অনুবাদ ঃ খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
সহযাত্রী—অনুবাদ ঃ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।
আমার যৌবন-স্মৃতি ঃ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
(তালিকা অসম্পূর্ণ)

গর্কির রচনাবলী ও রচনাকাল

১৮৬৮ সালে নিঝনি-নভগরোদ শহরে এক কাঠের আসবাবপত্র নির্মাতা ছুতার মিস্ত্রির ঘরে আলেক্‌সেই পেশকভ—ম্যাক্‌সিম গোর্কি জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৭২ সালে তাঁর বাবার ও ১৮৭৮ সালে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয। মায়ের মৃত্যুর পরেই দশ বছরের বালক গর্কিকে নিযুক্ত করা হল একটা জুতার দোকানে ছোকরা পরিচারকের কাজে।

১৮৮০ সালে তিনি একটা স্টিমারে বাসন মাজার কাজ করেন। তারপর ১৮৮১ থেকে '৮২ পর্যন্ত প্রথমে একটা বইয়ের দোকানে পরে একটা আইকন চিত্রনের দোকানে শিক্ষানবিসী করেন।

১৮৮৪ সালে বেকার অবস্থায় সহায়সম্বলহীন হয়ে গোর্কি আসেন কাজানে। এই সময়ে একদল ভবঘুরের সঙ্গে মিশে নদীর তীরের জাহাজঘাটাগুলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন।

১৮৮৮ সালে ভল্‌গার তীরবর্তী ক্রাস্‌নভিদভো গ্রামে গর্কি বৈপ্লবিক প্রচার কাজ শুরু করেন। পরে কাজানে এসে প্রথমে একটা রুটির কারখানায় কারিগর হিসাবে ও পরে কাস্পিয়ান মাছের আড়তে কাজ করেন। ঐ বছরেই তিনি দরিন্‌কা রেল স্টেশনে রাত-চৌকিদারের কাজ পান এবং পরবর্তীকালে বহু ছোট ছোট স্টেশনে মাল পরিদর্শক হিসাবে ও মাল ওজন করার কাজ করেন।

১৮৮৯ সালে গর্কি প্রথম গ্রেফতার হয়ে নিঝ্‌নি-নভগরোদ জেলে বন্দী থাকেন। মুক্তির পরেও কিছুকাল পুলিসের নজরবন্দী অবস্থায় কাটান। এই সময়ে তিনি ভল্‌গা, দন, ক্রিমিয়া ও ককেশাস অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। শুরু হল গর্কির সাহিত্য-জীবন।

১৮৯২ সালে গর্কির প্রথম ছোট গল্প "মাকার চুদ্রা" তিফ্‌লিসের "কাভ্‌কাজ" সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হল। তার পরেই

১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হল "এমেলিয়ান পিলিআই" ও "দি সিস্‌কিন দ্যাট্‌ লাইড অ্যান্ড দি উড্‌প্যাকার দ্যাট লাভ্‌ড দি ট্রুথ।"

১৮৯৪ সালে গর্কি তাঁর প্রথম উপন্যাস "লাক্‌লোস পাভেল" রচনা করেন। এবং ঐ বছরেই তাঁর "গ্রান্ডফাদার আর্খিপ অ্যান্ড ইয়ং আলেক" "মাই ট্রাভলিং কম্পেনিয়ন" "ওয়ান্স ইন্‌ অটাম", "এ মিস্টেক" ও "এ সঙ্‌ অব দি ফেল্‌কন" প্রকাশিত হয়।

১৮৯৫ সালে রচনা করেন "কন্‌ক্লুশন", "ওল্‌ড ইজেরগিল" এবং গর্কির বিখ্যাত গল্প "চেলকাশ"ও এই বছরেই প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'সামারা গেজেটে' তিনি কিছু

কাল কাজ করেন ও "ইগ্‌দিয়েল খ্লামিদা" এই ছদ্মনামে বহু ছোট ছোট কথা লেখেন।

১৮৯৬ সালে সামারা গেজেটে, নিঝ্‌নি-নভগরোদ পেজ, ওদেসা নিউজ প্রভৃতি সংবাদপত্রে গর্কির বহু ছোটগল্প, কথাচিত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হতে থাকে। এই বছরেই তিনি পালমোনারি টিবারকিউলোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ক্রিমিয়া যান। "দি অ্যাফেয়ার উইথ্ দি ক্লাম্পস্" ও "অন এ ব্যাফ্‌ট" তাঁর এই বছরের রচনা।

১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়, 'কনোভালভ', 'গলৎভা ফেযার', 'মিশ্চিভাস ল্যান্ড', 'দ অবলুভ্‌স', 'ডাউন অ্যান্ড আউট্‌স', 'মল্‌ভা', 'ফ্রম বোরডম', 'মাই ফেলো ট্রাভ্‌লার', 'দি খান অ্যান্ড হিজ সন', 'বোলস্', 'কমরেডস্', 'হার্টএক্', 'ভিভদ্', 'ভাবেন্‌কা ওলেসোভা', 'এক্স-মেন', ইন দি স্টেপ', 'জাজ্‌এরিনা', 'অ্যান ইনসোলেন্ট ম্যান'।

১৮৯৮ সালে গর্কি পুনরায় গ্রেফ্‌তার হয়ে সশস্ত্র পুলিস পাহারায় তিফ্‌লিস জেলে প্রেরিত হন। মে মাসে মুক্তি পেয়েও পুলিসের নজরবন্দী থাকেন অনেকদিন। এই বছরই প্রথম তাঁর বই 'টেল অ্যান্ড স্কেচ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। আর প্রকাশিত হয় 'এ শেডি ক্যারেক্টার', 'এ রিডার', 'চেইন অ্যান্ড আর্তেল'

১৮৯৯ এই সালে প্রকাশিত হয় 'ফোমা গর্‌দিয়েফ্', 'টোয়েন্টি সিক্স মেন অ্যান্ড এ গার্ল', 'কিবিল্‌ভা', 'কন্‌সার্নিং দি ডেভিল', 'বেড ভাস্কা', 'দি হাঙরি ওয়ান্‌স' ও ১৯০০ সালে "থ্রি"।

১৯০১ সালে সাইক্লো যন্ত্রে ছাপা "সরমভোর শ্রমিকদের প্রতি অপরাধমূলক আবেদনপত্র" প্রচারের অভিযোগে আবার তিনি গ্রেফ্‌তার হন। পরে স্বাস্থ্যভগ্ন হওয়ায় জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। "সঙ্ অব দি স্টর্মি পেত্রেল" এই বছরেই প্রকাশিত হয়।

১৯০২ সালে পুলিস পাহারায় গর্কি নির্বাসিত হন আর্জামাসে। এই বছরেই তিনি রুশিয়ান অ্যাকাডেমির সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাসের আদেশক্রমে সে নির্বাচন নাকচ হয়। এই সময়েই গর্কি সক্রিয় সোস্যাল ডিমোক্রাট কর্মীদের ঘনিষ্ট সাহচর্যে আসেন। 'কমন প্লেস ফোক্' এবং 'লোযার ডেপ্‌থ্‌স' ও 'স্মাগ্ সিটিজেন' নাটক দুটি তাঁর এই সময়ের রচনা।

১৯০৪ সালে গর্কির সম্পাদনায় "জ্‌নানিয়ে" কোম্পানি কতৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। "এ ম্যান" ও "সামার ফোক" নাটকটিও এই বছরেরই রচনা।

১৯০৩ সালে ১১ই জানুয়ারি গর্কি পুনরায় গ্রেফ্‌তার হয়ে "পিটার অ্যান্ড পল" দুর্গে কারারুদ্ধ হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি সরকারকে উচ্ছেদ করার আহ্বান জানিয়ে এক ইস্তাহার রচনা করেছেন। কিন্তু জনসাধারণের চাপে জার-সরকার বাধ্য হয় গর্কিকে মুক্তি দিতে। নোটস অন কমন প্লেস পিপ্‌ল, সোলজার, প্রিজন, চিল্ড্রেন অব দি সান, "থ্রি সজ", "বুকোইওমভ", "দি স্টোরি অব ফিলিপ ভাসিলিয়েভিচ" তাঁর এই বছরের রচনা। এই বছরেই তিনি লেনিন সম্পাদিত বলশেভিক পত্রিকা "নভইযা ঝিজ্‌ন্"-এ (নতুন জীবন) লিখতে আরম্ভ করেন।

১৯০৬ সালে বলশেভিক পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গর্কি আমেরিকায় যান।

নিউইয়র্কের রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করেন। ফ্রান্সে ফরাসি সরকার কর্তৃক জার সরকারকে ঋণ দানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালান। পরে অক্টোবর মাসে কেপ্রি দ্বীপে এসে বসবাস করতে থাকেন।

"রুশিয়ান জার", "এনিমিজ্" (নাটক), "সিটি অব দি ইয়োলো ডেভিল", "ম্যাগনিফিসেন্ট ফ্রান্স", "ওয়ান অব দি কিংস অব দি রিপাব্লিক", "কমরেড্", "পিলার অব মর্ব্যালিটি", "বাববারিযান" (নাটক), "দি কিংডম অব টেণ্ডিয়াম", "মব". "মাই ইন্টারভিউ", "দি মাস্টার্স অব লাইফ", "এ প্রিস্ট অব মর্ব্যালস্", এবং "ফেয়ার ফ্রান্স" এই বছরে প্রকাশিত হয়।

১৯০৭ সালে গর্কি প্রতিনিধি হিসাবে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির লুন্ডন কংগ্রেসে যোগ দেন। এইখানেই লেনিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন।

গর্কির বিখ্যাত উপন্যাস "মা" (মাদার) এই বছরের রচনা। এছাড়া "জানুযারি নাইন্থ"ও প্রকাশিত হয় এই বছরেই।

১৯০৮ সালে লেনিন কেপ্রি দ্বীপে গিয়ে গর্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'লাইফ অব এ্যান আন্ওয়ান্টেড', 'সিনিসিজ্ম', 'দি কন্ফেশন', 'দি লাস্ট ওয়ান্স' (নাটক) তাঁর এই বছরের রচনা।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়—"অকুরড টাউন", "দি স্পাই", "সামার", এবং

১৯১০ সালে,—"টেলস্", "মরদোভিয়ান", 'সেলফ্-টট্ রাইটার'।

১৯১২ সালে—"টেল্স", "বার্থ অব এ ম্যান", "ইতালিয়ান টেলস্", "রুশিয়ান টেলস্", "অ্যান ইন্সিডেন্ট ফ্রম দি লাইফ অব মাকার" ও

১৯১৩ সালে রচনা করেন, "ইন্ ওল্ড রুশিয়া", "দি মাস্টার", "চাইল্ডহুড", "দি কারা-মাজভ স্পিরিট", এই বছরের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি রুশিয়ায় ফিরে আসেন এবং "প্রস্ভেশ্চেনিয়ে" (শিক্ষা) কাগজের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

১৯১৪ সালে গর্কি শ্রমিকশ্রেণীর লেখকদের সর্বপ্রথম গল্প সঞ্চয়নের ভূমিকা লেখেন এবং "চাইল্ড্হুড" শেষ করেন।

১৯১৫ সালে সর্বপ্রথম গর্কির সম্পাদনায় "লেতোপিস্" সাহিত্যপত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। "আউট ইন্ দি ওয়ার্ল্ড" তাঁর এই বছরের লেখা।

১৯১৭ সালে গর্কি পেত্রোগ্রাদে "সোসাইটি অব কালচার অ্যান্ড ফ্রিডম" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ সালে স্থাপনা করেন ওয়ার্ল্ড লিটারেচার পাবলিশিং হাউজ, "লাইফ অব দি ওয়ার্ল্ড" সিরিজ সম্পাদনা করেন। "বিকলেকশনস্ অব টলস্টয়" এই বছরেই প্রকাশিত হয়।

১৯২০ সালে রচনা করেন "ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন"।

১৯২১ সালে পুনরায় তিনি পালমোনারি টিবারকিউলোসিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে বিদেশে যান।

১৯২২ সালে "লিওনিদ আন্দ্রিয়েভ", "ভি, জি, কোরোলেন্কো" এবং "দি ওল্ড ম্যান", "কুইযার পিপল", "দি জিকভস্" ও "চিল্ড্রেন" নাটক ক'খানি রচনা করেন।

১৯২৩ সালে রচনা করেনঃ 'দি টাইমস্ অব কোবোলেন্কো', 'মাই ইউনিভার্সিটিস্', "ফার্স্ট লাভ", "টেলস অব আনরেক্যুইটেড লাভ", "এ ওয়াচম্যান", "অন দি হার্ম অব ফিলসোফি", "এন, ই, কেরানিনপেত্রাপাভ্লভ্স্কি", "এ, পি, চেখভ", "লিও

টল্‌স্টয়", "এম, এম, কত্‌সিউবিনস্কি", 'হরো রুশিয়ান্', "দি বার্থ অব ম্যান", "দি আইস্‌ব্রেকার", "গুবিন", "নিলুশ্‌কা", "দি সিমেট্রি", "দি স্টিমার", "এ উওম্যান", "ইন্ এ মাউন্টেন ডেফাইল", "কালিনিন", "দে আর কামিং", "দি ডেড্ ম্যান", "হুজ্‌পজ্", "অ্যান ইভিনিং অ্যাট শামভস্", অ্যান ইভিনিং অ্যাট্ পানাশ্‌কিন'স্", "অ্যান ইভিনিং অ্যাট্ সুক্‌মদিযখকিন'স্", "লাইট্ গ্রে অ্যান্ড লাইট ব্লু", "এ বুক", "হাউ দে কম্পোজড্ এ সঙ্", "বার্ডস্ সিন", "এ সিলভার টেন কোপেক পিস", "হ্যাপিনেস্", "এ হিরো", "এ ক্লাউন", "অনলুকার", "তিম্‌কা", "এ লাইট মাইন্ডেড ম্যান", "স্লাস্তি-মর্‌দাস্তি", "বাই চান্‌গুল রিভার", "এ জলি চ্যাপ্", "এ মেডেন অ্যান্ড ডেথ্", "এ ব্যালাড অব কাউন্টেস হেলেন দ্য কুবসি", "এ রোমান্টিক", "এ মর্দভিনিয়ান উওম্যান", "এ লিট্‌ল গার্ল", "এ ফেয়ার", "এ থ্রেপট্", "ব্যান্ডিট্", "কম্‌প্লেনট্‌স", "ফ্রাগমেণ্টস ফ্রম মাই ডায়েরি"।

১৯২৪ সালে রচনা করেন 'জীবন-স্মৃতি' ঃ "নোটস্ ফ্রম এ ডাইরী"; তাছাড়া, "স্মল টাউন", "ফায়ার্স" "এন, এ, বুগ্রভ", "এবাউট এস, এ, টলস্টয়া", "ডেজ উইথ লেনিন"; এই বছরেই গর্কি ইতালির সরেন্তোতে বসবাস করতে শুরু করেন।

১৯২৫ সালে রচনা করেন ঃ "দি হার্মিট", "কাবামোরা", "দি আর্তামানভস্", "অ্যান ইন্‌সিডেন্ট", "দি রিহার্সাল", "দি স্কাই ব্লু লাইফ", "এ স্টোরি অ্যাবাউট দি আনইউজুয়াল", "ভি. লেনিন", "সের্গেই ইয়েসেনিন", এন, এফ, আনেনস্কি, অ্যাবাউট গারিন মিখাইলভ্‌স্কি, দি গাইড, "অ্যাবাউট কক্‌রোচেস", "নোটস্ অব এ লীডার", "এ স্টোরি অব এ হিরো", "দি স্টোরি অব এ নভেল", "দি ফলস্ কয়েন", "মার্ডাবার্স", "অ্যান এম্‌ব্লেম", "এ স্টোরি অব আনরিকুইটেড লাভ"।

১৯২৬ সালে রচনা করেন, "এল, বি, ক্রাসিন্"।

১৯২৭ সালে "লাইফ অব ক্লিম সামগিন" উপন্যাসের প্রথম খণ্ড বাইস্ট্যান্ডার্স, এবং "টেন ইয়ার্স", "নিউ অ্যান্ড ওল্‌ড", "মাই গ্রিটিংস", "টু অ্যানোনিমাস অ্যান্ড সিউডোনিমাস্ রাইটার্স" প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯২৮ সালে "লাইফ অব ক্লিম সামগিন"-এর দ্বিতীয় খণ্ড "ম্যাগনেট" এবং "আওয়ার অ্যাচিভ্‌মেণ্ট", "কালচার", "টু মেকানিক্যাল সিটিজেন অব দি সোবিয়েত ইউনিয়ন", "দি রেড আর্মি", "বেনিফিট্‌স্ অব লিটারেসি", "লিটারারি বিগিনার্স", "লিটারেচার অব দি পিপ্‌ল অব দি ইউ, এস, এস, আর" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন।

১৯৩০ সালে গর্কি প্রতিষ্ঠিত দুটি সাহিত্যপত্র "জা রুবেঝম"-এর (বিদেশ) এবং "লিতেরাতুরনায়া উচভা"-র (সাহিত্য শিক্ষ) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই বছরেই তিনি "লাইব্রেরি অব নভেলস্" গ্রন্থমালার সম্পাদনা করেন। "লাইফ অব ক্লিম সামগিন"-এর তৃতীয় খণ্ড—"আদার ফায়ার্স"ও রচনা করেন এই বছরই। এ ছাড়া, "স্টোরিজ অব হিরোজ", "অন গার্ড ফর দি সোবিয়েত ইউনিয়ন" ও "উওম্যান", "ওয়াইজ ফোক", "ইফ এনিমি উইল নট সারেন্ডার, হি মাস্ট বি ডেস্ট্রয়েড", "হিউম্যানিস্ট", "অন লিটারেচার", প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন।

১৯৩১ সালে গর্কির "গৃহ-যুদ্ধের ইতিহাস" রচনার প্রস্তাব গৃহীত হয়। "এ হ্যাবিকেন ডেস্ট্রয়িং দি ওল্‌ড ওয়ার্লড", "ফাক্টস অব লাইফ", "আন্ডার দি রেড ব্যানার",

"টু পারটিসিপ্যাণ্টস্ ইন দি সিভিল ওয়ার", "এ হিস্টরি অব মিলস্ অ্যান্ড ফ্যাক্টরীস্" "স্টোরি অব এ ইয়ং ম্যান", "অন পোয়েটস্ লাইব্রেরি", "টকস্ অন দি ক্রাফট" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন।

১৯৩২ সালে রচনা করেন, "ইগোর বুলিচভ" নাটক; তাছাড়া "অন হুজ সাইড, মাস্টার্স অব কালচার ?", "দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি নিউ", "লিটারারি টেক্নিক", "টু দি ডেলিগেটস টু দি অ্যান্টি-ওয়ার কংগ্রেস", "সোলজার্স আইডিয়াজ" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন।

এই বছরই গর্কির সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয় এবং সমগ্র সোবিয়েত দেশে এই উপলক্ষ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৩ সালে গর্কি রচনা করেন, "দস্তিগাইয়েভ অ্যান্ড আদার্স" নাটক, ও "এডুকেশন ইন ট্রুথ", "সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম", "হামকস্ অ্যান্ড পিবিয়ডস", "প্রোজ", "অন প্লে" প্রভৃতি প্রবন্ধ।

১৯৩৪ সালে সোবিয়েত সাহিত্য এবং "ভাষা" "টক্ টু ইয়ং পিপ্‌ল", "প্রোলেটারিয়ান হিউমানিজম", "লিটারারি কিউরিওসিটি", "এ হিস্ট্রি অব উওম্যান" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন।

১৯৩৫ সালে "কালচার এ্যান্ড দি পিপ্‌ল" এবং "দি নিউ ম্যান," "অন কালচার", "এ হিস্টরি অব দি কান্ট্রি সাইড", "অন টেলস" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন।

১৯৩৬ সালে "দি লাইফ অব ক্লিম সামসিন" উপন্যাসের শেষ খণ্ড, "দি স্পেক্টার" রচনা শেষ করেন।

এই বছর ১৮ই জুন মাক্সিম গর্কি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সংকলক ঃ সত্য গুপ্ত

চলচ্চিত্র

হিন্দী চলচ্চিত্রে নতুন পথ

'দো বিঘা জমিন' ছবিখানির কাহিনী-রচনা এবং সংগীত-পরিচালনা করেছেন সলিল চৌধুরী, প্রযোজনা এবং পরিচালনা করেছেন বিমল রায়। ফলে প্রগতিশীল দর্শকমহলে ছবিখানির বিষয়ে কৌতূহল ছিল। আর দেখে খুব আশ্বস্ত হওয়া গেছে যে, সে প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। 'দো বিঘা জমিন' সচেতন দর্শকদের তো বটেই, সাধারণ দর্শকদেরও খুশি করতে পেরেছে।

সচেতন আর সাধারণ দর্শকমণ্ডলীকে এইভাবে পরস্পর-বিরোধী ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়তো সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক, কিন্তু class আর mass বলে দুটি মার্কামারা কথা চিত্র-সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে বলেই বিষয়টাকে এভাবে উপস্থিত করতে হল। চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারো কারো মুখে শুনেছি, যে-ছবি class অর্থাৎ বিদগ্ধ ভদ্রলোকেরা গ্রহণ করেন, তা যে mass অর্থাৎ হাটুরে মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারবে তা নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে কেউ কেউ আধুনিক সাহিত্য, কিংবা আরো ভালো করে বলতে গেলে, আধুনিক কবিতার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্তমান সমালোচকের বিবেচনায় সে তুলনা বিভ্রান্তিকর। লিখিত সাহিত্য এবং দ্রষ্টব্য চলচ্চিত্রের আবেদন দ্বিবিধ। তাই যে জীবন-আলেখ্য বিশেষভাবেই চোখে দেখে রসগ্রহণের জন্যে

নির্মিত, তা বসোত্তীর্ণ উপায়ে উপস্থিত করতে পারলে একই সঙ্গে class ও mass-এর কাছে গ্রহণীয় হতে পারে। তবে সাহিত্যের মতোই 'রসোত্তীর্ণ উপায়ে উপস্থিত করাব' পদ্ধতি প্রত্যেকটি বিশেষ ছবির ক্ষেত্রেই আলাদা—পরিচালকের কৃতিত্ব হচ্ছে সেই বিশেষ পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রয়োগে।

'দো বিঘা জমিনে'র পরিচালক হিসেবে বিমল রায় এ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। কাহিনীটিকে তিনি যেভাবে সহজ অনাড়ম্বর অথচ আবেগময় উপায়ে উপস্থিত করেছেন, তা হিন্দী ছবির আজগুবি জগতে তো বটেই, ঈষৎ সাবালক বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও সুলভ নয়। এক্ষেত্রে তাঁকে সজাগ থাকতে হয়েছে দু'দিক থেকেই—হিন্দী ছবির আচমকা ঘটনার চমৎকারিত্ব এবং বাংলা ছবির সংলাপ-ভারাক্রান্ত পণ্ডিতম্মন্যতা, এই দুই বিপদ থেকেই আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। আর বহুলাংশে তিনি সার্থকও হয়েছেন।

ত্রুটি রয়ে গেছে প্রধানত গল্পবিন্যাসের জোড়গুলিতে এবং কাহিনীর শেষ পর্বে। শম্ভু যখন গ্রাম ছেড়ে কলকাতা যাত্রা করে, তখন গ্রামের নারীপুরুষ মিলে যে সম্মিলিত গানের বিদায়-ভাষণ দেয়, সেটা শট-পরিকল্পনার দিক থেকে কাঁচা; এবং শিক্ষিতা প্রতিবাসিনী মহিলার ঘুমপাড়ানি গানও কাহিনীর গতিবেগের দিক থেকে বর্জনীয় ছিল। তেমনি অপ্রয়োজনীয় হচ্ছে হাসপাতালে শম্ভুর পত্নীবিয়োগ—এই ঘটনা ঘটা-বা-না-ঘটার সঙ্গে কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এ ঘটনা না ঘটলেই যেন সপরিবারে নিরাশ্রয় শম্ভুর ভয়াবহতা আরও প্রকট হয়ে উঠতে পারত।

এর জন্যে অবশ্য পরিচালক নন, কাহিনীকারই দায়ী। এবং কাহিনী রচয়িতা হিসেবে সলিল চৌধুরীকে আরও কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

শম্ভুর এই কাহিনীর কাঠামোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার সাদৃশ্য আছে। সেই জমিদারের স্বার্থে মিথ্যা দেনার খতে জমি থেকে উচ্ছেদ, এবং শেষ পর্যায়ে সাতপুরুষের মাটিতে ফিরে এসে চুরির দায়ে অপমানিত হওয়া—আর মনে মনে বলা, 'তুমি মহারাজ সাধু হ'লে আজ, আমি আজ চোর কটে!' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এ-কাহিনী রচনা করেছিলেন, তারপর থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সময়ের এই বিরাট ব্যবধানে ভারতীয় চাষী-সমাজেও চেতনার পরিবর্তন এসেছে। কৃষি-আন্দোলন, কৃষিবিদ্রোহ এগুলি আজ প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার পর্যায়ভুক্ত। চাষীরা আজ আর বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে না, প্রায়ই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সলিল চৌধুরীর 'দো বিঘা জমিনে' এই বাস্তব অবস্থার কোনো প্রতিফলন দেখা গেল না। এবং সেই কারণে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যেও শম্ভুর সংগ্রাম অত্যন্ত বেশি সত্যসন্ধ আর তারই ফলে কিছুটা ভাববাদী-লক্ষণাক্রান্ত। অবশ্য একথা ঠিক যে এখনও জমিদারের চক্রান্তে জমি থেকে কৃষক-উচ্ছেদ হয়, এবং তারা ফ্যাক্টরিতে গিয়ে মেহনত বিক্রি করে, শহরে গিয়ে রিক্‌শা টানে কিংবা নিরুপায় হয়ে যাযাবর জীবন যাপন করে। কিন্তু প্রথমের দিকে সে বিনা প্রতিরোধে জমি ছাড়তে রাজী হয় না, এবং এই প্রতিরোধ একটা সাংগঠনিক রূপ নেয়—একক আবেদনের পর্যায়ে থেকে যায় না। (অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একক পর্যায়ে থেকে গেলেও, আজকের ভারতীয় কৃষিসমাজের সেইটেই প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয় নয়।) তবে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে রচয়িতার স্বাধীনতা ঔপন্যাসিকের চেয়ে সংকীর্ণ; সেন্সারের কাঁচি অনেক বেশি নিরঙ্কুশ। কাজেই বাস্তবের প্রকৃত প্রতিফলন এক্ষেত্রে হয়তো প্রায় অসম্ভব। আমরা তার ইঙ্গিতটুকু পেলেও খুশি হতাম।

কিন্তু যা পাইনি তার চেয়ে যা পেয়েছি তাও সামান্য নয়। ভারতীয় কৃষিকুল জমি

ও বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত হয়ে কীভাবে সর্বহারার শ্রেণীতে এসে জমছে এবং কী অবর্ণনীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে পুরনো জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে, আর প্রত্যাহত হয়ে ফিরছে, তার জীবন্ত চিত্র পাওয়া গেল সলিল চৌধুরীর এই কাহিনীতে। আশাকরি সূচনার এই সাফল্যকে পূর্ণতর বিকাশের দিকে চালিত করতে পারবেন তিনি। প্রগতিশীল সংস্কৃতি-কর্মী হিসেবে আমরা তাঁকে আন্তরিক সমর্থন ও অভিনন্দন জানাই।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয়, পরিচালনা এবং কাহিনী সবই ব্যর্থ হয়ে যেত যদি 'দো বিঘা জমিনে' একটি সুন্দর অভিনেতা-অভিনেত্রীগোষ্ঠীর সহায়তা না পাওয়া যেত। আর এর মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক শম্ভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ বলরাজ সাহানী। তাঁর অভিনয় এত বাস্তবানুগ এবং জীবন্ত যে তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রথমশ্রেণীর অভিনেতা হিসেবে অভিনন্দন পাবেন। অন্য সুঅভিনয়ের দৃষ্টান্ত আছে লালু ওস্তাদ, বাড়িওয়ালী, এবং শম্ভুর স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণদের মধ্যে।

ছবিখানির আবহসংগীতে বৈশিষ্ট্য আছে।

মণীন্দ্র রায়

সংস্কৃতি সংবাদ

মৃত্যুঞ্জয়ী রোজেনবার্গ

সভ্যমানুষের বিবেককে ডলারের দেশে ইলেক্‌ট্রিক-চেয়ারে বসিয়ে হত্যা করা হল। শুধু বিবেক-হত্যা নয়, যান্ত্রিক একটা পদ্ধতি অমানুষদের হাতে পড়ে কত নৃশংস হতে পারে রোজেনবার্গ-হত্যা তারও একটা নিদর্শন। চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তিন সেকেন্ড থেকে সাতান্ন সেকেন্ড পর্যন্ত শক্ খাইয়ে রসিয়ে-রসিয়ে মানুষ খুন করার এই বর্বর পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমন ঘটনার সন্ধান একমাত্র মধ্যযুগের ইতিহাসেই পাওয়া সম্ভব। কলকাতার চারশো-চল্লিশ ভোল্টের ট্রামের তারে ছোঁয়া লাগলে সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে মৃত্যু হয়, সুতরাং যে-দেশে সাতান্নো সেকেন্ড চার্জ দেবার পরেও সংজ্ঞাহীন মানুষটির সামনে দাঁড়িয়ে জল্লাদ-ডাক্তারদের ফিস্‌ফিস্ করে আলোচনা করতে হয় এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিপতি উৎকর্ণ হয়ে শেষ 'স্বীকারোক্তি'-র জন্যে অপেক্ষা করে—সে-দেশে মানুষ খুন করার পিছনেও যে কী বহুবিস্তৃত পরিকল্পনা তা কল্পনা করে প্রত্যেক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সৎ মানুষই শিউরে উঠবেন।

তবুও, এমন একটি দেশেও, মাত্র একজন লোকের 'স্বীকারোক্তি'-র উপরে সম্পূর্ণ বিচার-প্রহসনটি খাড়া করতে হয়েছে। নাম ডেভিড গ্রীন্‌গ্লাস, এথেল রোজেনবার্গের সহোদর ভাই। পাঠ্যজীবনে যে-লোক স্কুলপাঠ্য পদার্থবিদ্যা ও গণিতে পাশ-নম্বর তুলতে পারেনি, উত্তর-জীবনে সে-ই এক আণবিকবোমার কারখানায় দু-জন বৈজ্ঞানিকের আলাপ-আলোচনা আড়াল থেকে শুনেই কী করে যে আণবিকবোমার 'স্ফোপন রহস্য' এমন অনায়াসে রপ্ত করে ফেলে, সেই রহস্যের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক-চেয়ারে প্রাণবিয়োগ হতে দীর্ঘ তিন

মিনিট সময় লাগার রহস্যও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। শুধু তাই নয়। এই আশ্চর্য প্রতিভাধর লোকটি শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আণবিকবোমার গোপন-রহস্য আয়ত্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, মাত্র দশ ইঞ্চি লম্বা ও আট ইঞ্চি চওড়া এক টুকরো কাগজে আণবিকবোমার গোপন তথ্য এমন প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে পেরেছে যে রোজেনবার্গ-দম্পতি মারফত সেই কাগজের টুকরোটি হস্তগত হওয়ামাত্র শত্রু-দেশ সোবিয়েতের পক্ষে আণবিকবোমা তৈরির দুরূহ কাজ পট্‌কাতৈরির মতো সহজ হয়ে ওঠে! লেদ্‌মেশিনের একজন মিস্ত্রির পক্ষে এমন অসাধ্যসাধন একমাত্র মার্কিনী যন্ত্রপুরীতেই সম্ভব!

আমেরিকার কয়েকজন অগ্রগণ্য আণবিকতথ্যবিশেষজ্ঞ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ডাঃ ব্যাল্‌ফ্‌ ল্যাপ্‌কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আণবিক গুপ্ততথ্য কাগজের একটি পৃষ্ঠায় লেখা সম্ভব কিনা? তিনি জবাব দিয়েছেন, কাগজের এক পৃষ্ঠায় সম্ভব নয়, এক টন কাগজেও সম্ভব নয়। ডাঃ ওপেন্‌হাইমার বলেছেন, আসলে আণবিক গুপ্ততথ্য কথাটা ভুল; আণবিক তথ্য সম্পর্কে অপ্রকাশিত বা গুপ্ত বলে কিছু নেই; বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জনকয়েক লোকের মধ্যে কখনোই সীমাবদ্ধ থাকে না। নোবেল-পুরস্কারবিজয়ী অধ্যাপক উরে শিকাগো থেকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। টেলিগ্রামের মূল বক্তব্য: রোজেনবার্গ দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা যুক্তি ও ন্যায়বিরোধী; একমাত্র গ্রীনগ্লাসের সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করে অভিযুক্তদের দোষ সপ্রমাণ করবার চেষ্টা হচ্ছে; পদার্থ-রসায়ন-গণিতশাস্ত্রে গ্রীনগ্লাসের যতটুকু জ্ঞান তা নিয়ে তার পক্ষে আণবিকবোমার জটিল তথ্যে দন্তস্ফুট করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যে-আমেরিকায় সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিকে পর্যন্ত বিরুদ্ধে রায়দানের জন্যে পদচ্যুতির হুমকি দেওয়া হয়, সেখানেও সুপ্রীম কোর্টের ন-জন বিচারপতির মধ্যে তিনজন বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।

শুধু আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক স্তরের মানুষ এই বিচারপ্রহসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রোজেনবার্গ দম্পতির মুক্তি দাবি করেছেন। শুধু দু-জন মানুষের প্রাণরক্ষার মানবিক দাবি নয়, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে যে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে সে-সম্পর্কে চেতনাও প্রত্যেক দেশের সাধারণ মানুষকে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ-ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৯২৭ সালে সাক্কো ও ভাঞ্জেতির হত্যাকাণ্ডের পর রম্যাঁ রোলাঁ বলেছিলেন: এই আদালতী হত্যাকাণ্ড আমেরিকাকে সারা পৃথিবীর কাছে হেয় করেছে; হত্যাকারীরা আমেরিকার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী। রোজেনবার্গ দম্পতির হত্যাকাণ্ডের পর ইলিয়া এরেনবুর্গ বলেছেন: রোজেনবার্গ দম্পতিকে প্রাণ দিতে হল কারণ তারা শান্তি চেয়েছিলেন, কারণ যুদ্ধবাজরা বলি চায়, কারণ মহাসাগরের অপর পারে এখনো এমন একদল লোক আছে যারা চায় নিজের দেশের মানুষকে ধোঁকা দিতে, সারা পৃথিবীর মানুষকে আতঙ্কিত করতে এবং যুদ্ধ উস্‌কিয়ে তুলতে। কিন্তু ঘটনার গতি হবে অন্যরকম। দু-জন নির্দোষ মানুষের রক্ত পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের শান্তিকামীদের আরো দৃঢ়সংবদ্ধ করে তুলবে।

এই দৃঢ়সংবদ্ধ শান্তিকামনার লক্ষণ রোজেনবার্গের মামলাচলাকালীন সময়েই ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল। একটিমাত্র ঘটনাকে উপলক্ষ করে এতবড় সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। এত বিভিন্ন বিচরণক্ষেত্রের মানুষের এক সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইতিহাসও অভাবিতপূর্ব। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ও ধর্মগুরু পোপ শুধু নন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট থেকে কলকাতার ট্রামকোম্পানির পয়েন্টসম্যান পর্যন্ত কেউ-ই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেননি। রোজেনবার্গ-দম্পতির হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে আমেরিকার বড় বড় শহরেই শুধু নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও মিছিল হয়েছে। ইতালিতে শ্রমিকরা পনেরো মিনিট ধর্মঘট করেছিলেন, লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীর আবাস বিক্ষোভকারীদের স্লোগানে কেঁপে উঠেছিল।

এই পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদ-আন্দোলনের মধ্যে আরেকটি সত্যও পাঠ করা যায়। বোজেনবার্গ হত্যাকাণ্ডের পিছনে যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে, যে ষড়যন্ত্রের অক্ষ-রেখা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পশ্চিম বার্লিন পর্যন্ত বিস্তৃত, তা ব্যর্থ হবেই। শান্তিকামী দেশের বিরুদ্ধে কুৎসারটনা ও নির্দোষ মানুষকে হত্যা তৃতীয় মহাযুদ্ধকামীদের আসল রূপকেই উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে রোজেনবার্গ-দম্পতি মৃত্যুকে জয় করেছেন। তাঁদের আদর্শ লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, দেশে দেশে এক দৃঢ়সংবদ্ধ শান্তিকামনায় তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন।

অমল দাশগুপ্ত

চতুর্থ বিশ্বযুব উৎসব

আগামী ২রা আগস্ট থেকে বুখারেস্ট শহরে চতুর্থ বিশ্বযুব-ছাত্র শান্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসব চলবে ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত।

এবারকার উৎসব আয়োজনে আগের উৎসবগুলিকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় দেশ থেকে ত্রিশহাজার দর্শক ও প্রতিনিধি উৎসবে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা। এই উপলক্ষে তরুণ লেখক, কবি, সাংবাদিক ও শিল্পীদের পক্ষে একটি বিশেষ আকর্ষণ—একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু : শান্তি ও মৈত্রীর জন্য ৪র্থ বিশ্বযুব-ছাত্র শান্তি-উৎসব; বিশ্বজনগণের জন্য শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও মৈত্রী; উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কাজ।

উৎসবের প্রধান কথাটি অবশ্য শান্তির কথা। দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষের বেড়া ভেঙে সারা দুনিয়ার তরুণদের এই বিরাট সমাবেশ এই মূল কথাকেই তুলে ধরতে চায়, যে রণক্ষেত্রে নয়, বিশ্বের তরুণেরা মিলতে চান খেলার ময়দানে, সংস্কৃতির আসরে। এই শান্তির কথা সামনে রেখে প্রতিনিধিদের যে অধিবেশনগুলি হবে, তার মধ্যে বিশেষ করে নির্দিষ্ট করা হয়েছে কয়েকটি স্বতন্ত্রদিবস—যুবদাবি-দিবস, ঔপনিবেশিক যুব-দিবস, ছাত্র-দিবস ইত্যাদি।

সারা দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও উৎসবের জন্য উদ্যোগ শুরু হয়েছে। আশা-করা যায় যে, ভারতবর্ষ থেকে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি উৎসবে যোগদিতে পারবেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, গোষ্ঠ পাল প্রভৃতিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও একটি জতীয় প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির ঠিকানা : প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন অফিস ২নং লিন্ড্‌সে স্ট্রীট। প্রতিনিধি প্রেরনেচ্ছু সংগঠনগুলি এই কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে আশা করি। আন্তর্জাতিক উৎসব চলাকালীন এখানেও যাতে যুবকেরা একটি সমর্থনসূচক উৎসব বা সমাবেশ অনুষ্ঠান করতে পারেন তার জন্যেও কমিটি উদ্যোগ নিচ্ছেন।

স্বভাবতই এই উদ্যোগ ও উৎসবের মধ্যে দল মত ও ধর্মবিশ্বাসের কোনো বাধা নেই। আমরা আশা করি ভারতের এবং বাংলার যুবছাত্রেরা এ উৎসবকে সফল করার জন্য এগিয়ে আসবেন।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণ লেখক ও শিল্পীদের কাছে বিশেষ আবেদন যৌবনের এই সাধারণ উৎসবের মেলায় আপনাদের যোগ্য ভূমিকা আপনারা গ্রহণ করুন। যৌবনের অধিকারের প্রশ্নে, যৌবনের সম্মিলিত জাগরণের মুহূর্তে সংস্কৃতি পিছিয়ে থাকতে পারে না।

ননী ভৌমিক

সিনেট নির্বাচন

রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট কনস্টিটুয়েন্সী থেকে ২৫টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। নির্বাচন উপলক্ষে প্রধান যে প্রশ্নটি স্বভাবতই আমাদের মনে আসে তা হল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পুনর্গঠনের প্রশ্ন। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণের মাত্রা বাংলা সরকার ও কর্পোরেশনকেও ছাড়িয়ে গেছে। বারম্বার ফেলের বহর এবং নানাদিক দিয়ে শিক্ষার সংকোচের ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় জীবনকেই আঘাত করতে উদ্যত। দীর্ঘদিন থেকে, শিক্ষক-ছাত্র-অধ্যাপকদের মধ্যে এ নিয়ে আলোড়ন ও আন্দোলন চলেছে। দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সরকার এবং উভয়ের সঙ্গে জড়িত কতিপয় স্বার্থ এই গণতান্ত্রিক দাবিগুলির বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেননি। শিক্ষা-সংস্কারের জন্য এই আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কার সমিতি নামক সংগঠনটির নাম উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর অক্টোবর মাসে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপকদের এক সাধারণ সভায় এই সমিতিটি গঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এই সমিতির সভাপতি এবং অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীজয়ন্ত দাশগুপ্ত যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে সমিতি একটি সুচিন্তিত কার্যক্রম গ্রহণ করে তার জন্য আন্দোলন করে চলেছেন।

নির্বাচন উপলক্ষে এই সমিতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নেমেছেন এটা আনন্দের কথা। ২৫টি আসনের জন্য সমিতি ২৫ জন প্রার্থীকে মনোনীত করেছেন। আমরা আশা করি যে বাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় শিক্ষিত ও সুধীসমাজ শিক্ষা-সংস্কার সমিতির আদর্শকে সমর্থন করবেন এবং এঁদের মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করবেন।

কল্যাণ চৌধুরী

সম্প্রতি 'পরিচয়' অফিসের ফাইলগুলি পুনর্বিন্যাস করার পর রবীন্দ্র মজুমদার লিখিত একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না প্রবন্ধটি প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। যদি কেউ সেটির খোঁজ পেয়ে থাকেন তবে দয়া করে পরিচয়-অফিসে জমা দেবেন।

—পরিচয়।